পুজো সংখ্যা ২০১৬ PART01

৫৮তম সংখ্যা, ৩৫তম ইনটারনেট সংখ্যা

চয়ন



প্রচ্ছদ শিল্পী-দেবাশিস সিনহা

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী



উমাদিদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা



সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, পুরাণ, ভারতের বনাঞ্চল, জাপানের গল্প · দেশবিদেশের ভূত



মহাশ্বেতা

লোককথা, সিনেমা হল ভূতের আড্ডার গল্প



তাপস মৌলিক

অন্নপূর্ণা, বিজ্ঞাপন, নতুন বই
কার্যনির্বাহী সম্পাদক- শব্দপদ্রুম

জয়ঢাকের ইউনিকোড কম্পোজিটর টিম



মনস্বিনী



দেবপ্রিয়া



ঋত্বিক



মহুল

এই সংখ্যার আঁকিয়েরা



শিবশংকর ভট্টাচার্য



অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়



মৌসুমী



অর্ক



অংশুমান



পিয়ালী



শিমুল



শাম্ব



সংস্মিতা



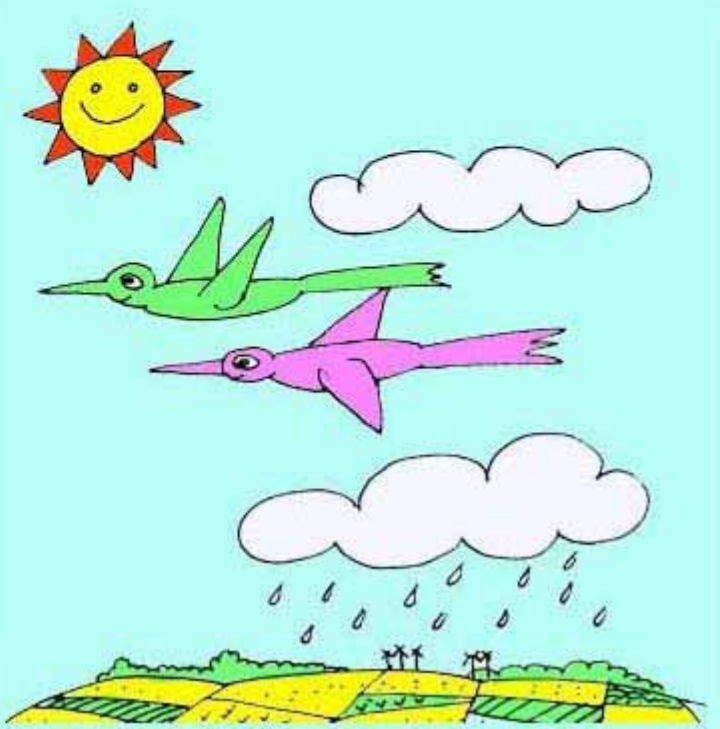
শ্রীময় দাশ

জয়ঢাক শারদীয় ২০১৬ ১ম খণ্ড

সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল	সম্পাদক
পুজো স্পেশাল	কাকতাড়ুয়ার খাতা	সম্পাদনা অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়
পুজো স্পেশাল	বিটুর বন্ধুরা	মালিনী
পুজো স্পেশাল	চলো যাই যাদুঘরে	দিলীপ রায়চৌধুরি
পুজো স্পেশাল	জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির	অনুপূর্বা রায়
পুজো স্পেশাল	নাটক-রাজপুত্তুর	কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন	ভবিষ্যতের বিজ্ঞাপন	ইন্দ্রশেখর
জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন	বর্তমানের বিজ্ঞাপন	তাপস মৌলিক
ধারাবাহিক গ্রাফিক নভেল	দুর্জয়	দেবসেনা নন্দী
কমিকস	রাশিয়ান কমিকস-দাঁড়া দেখাচ্ছি	সংগ্রাহকঃ সৌরভ দত্ত
কমিকস	টাফি	জ্যাক ব্র্যাডবেরি ভাষান্তর সুমিত রায়
কমিকস	টোটা আর টিটো-	হ্যারল্ড নের। অনুঃ তাপস মৌলিক
পুজোর উপন্যাস	বারে বারে আসে	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
পুজোর উপন্যাস	রংঝুরি রহস্য	মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
পুজোর উপন্যাস	সমুদ্রগুপ্তের তরবারি	পুষ্পেন মণ্ডল
পুজোর উপন্যাস	ধন্দ যত নন্দকে নিয়ে	শিশির বিশ্বাস
পুজোর উপন্যাস	আজব বাঘের তাজ্জব কাণ্ড	চিত্ত ঘোষাল
বড়ো গল্প	পেঁচো ও বেয়ারা ইমেল	অনিরুদ্ধ সেন
বড়ো গল্প	ফুল ও পরীর গল্প	উদয়ারুণ রায়
বড়ো গল্প	মিনুর লাল ঘুড়ি আর লামিয়া	সায়ক আমান

গল্প	কু উ উ উ ঝিক্ ঝিক্	শিবশংকর ভট্টাচার্য
গল্প	চম্পকলাল	অমর মিত্র
গল্প	দুই বুড়ির গল্প	শুভময় মিশ্র
গল্প	সবচে সেরা ম্যাজিক	জয়দীপ চক্রবর্তী
গল্প	শুদ্ধ ভক্তের ঘড়ি	চুমকি চট্টোপাধ্যায়
গল্প	পূর্বজন্ম	অর্ক পৈতন্ডী
গল্প	হ্যাংলা	অনন্যা দাশ
গল্প	লোকটা	প্রকল্প ভট্টাচার্য
গল্প	তপনানন্দ সেন ও তাঁর ভূতুড়ে ঘুড়ি	অরিন্দম দেবনাথ
গল্প	ভয়	অদিতি ভট্টাচার্য
গল্প	বিবর্তন	বৈশাখী ঠাকুর
গল্প	ওরা ভূত	সাগরিকা রায়
গল্প	বাঁশিওয়ালা	তরুণ সরখেল
গল্প	ভেবলি ভালো আছে	তাপস মৌলিক
গল্প	ওহ্ আচ্ছা আচ্ছা	শুভজিত বরকন্দাজ
গল্প	সূর্যশেখরের ধাঁধা	যশোধরা রায়চৌধুরি
গল্প	ছায়া ফেলে যায়	তন্ময় বিশ্বাস
গল্প	হংসরাজের বংশধর	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে রৌদ্র ছিল ভালো
নীলে সাদায় মাখামাখি
হলুদ রঙের আলো
এবেলা আকাশ জুড়ে
কালো মেঘের সাজ
বিকেলে বৃষ্টি হবে আজ
ঝড় আসবে মেলে হাওয়ার পাখা
শক্ত হবে বাসার ভেতর থাকা
হুহুম হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে ডানা
এদেশ ওদেশ স্বদেশ বিদেশ
যেথায় খুশি যা না



মেঘরৌদ্রের এমন শরৎকালে সবাই আনন্দে থেকো। শারদ আনন্দের ভাগ সব্বাই পাক। আর হ্যাঁ, হুহুম হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে ডানা–ওই পাখিদের মতন ঘুরতে যেও কিন্তু শরৎকালে। পুজোর কটা দিন ছেড়ে, পাহাড়ে সমুদ্রে আনন্দ করে এসো।

ভালোবাসায়,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদাদিদিরা

পুজোয় চাই–কাকতাড়ুয়া

মলাট

কাকতাড়ুয়ার খাতা



মাঠের মধ্যে কাকতাড়ুয়া
থাক না ওটা, থাক
তাকিয়ে দ্যাখ ওর মাথাতে
ঘুম দিয়েছে কাক



কাকটা কোথা? দেখছি না তো!
শুধুই কালো হাঁড়ি
দেখবি কী রে? ওর ভেতরেই
কাককাকিনীর বাড়ি!



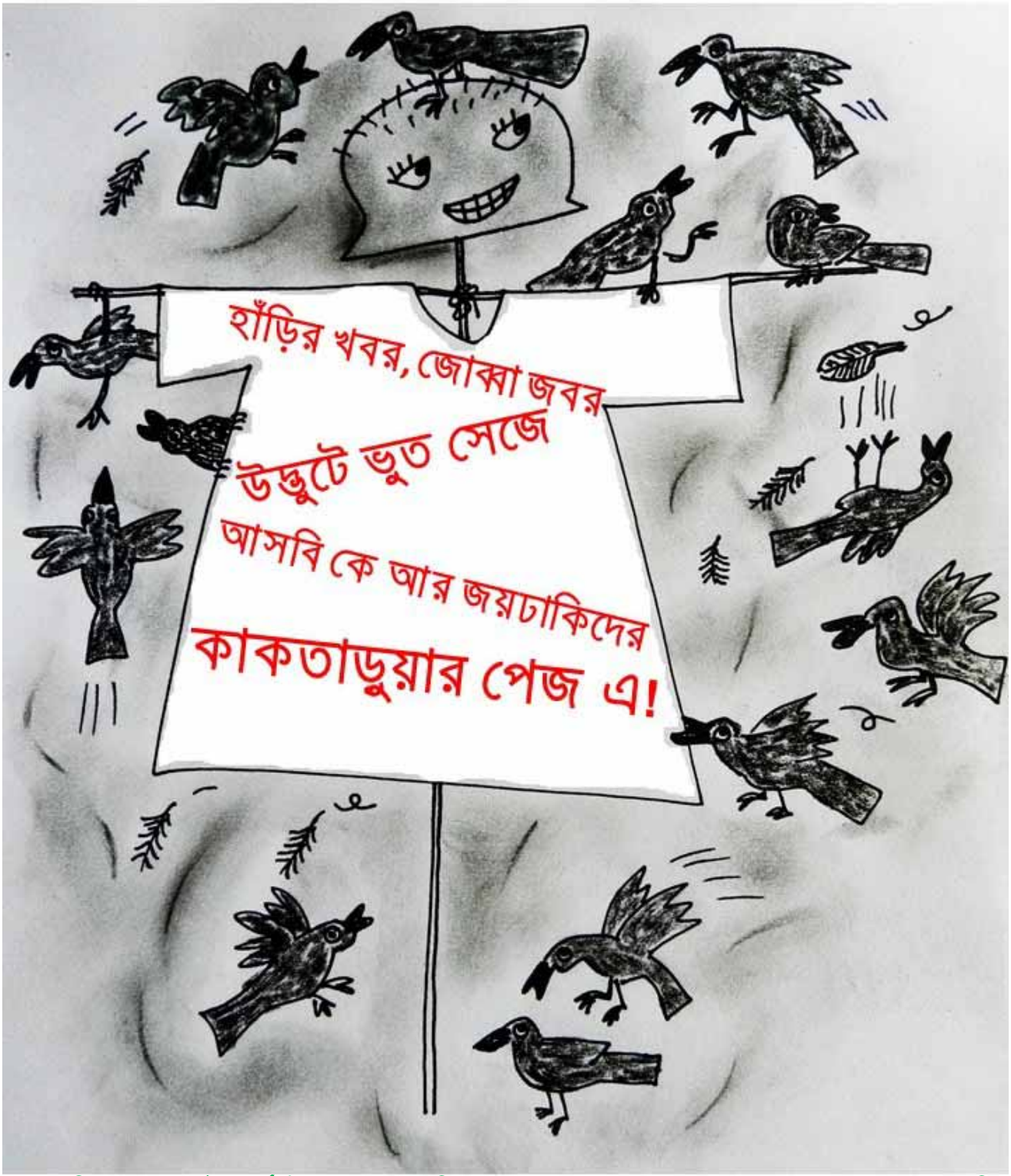
মানবি না তুই? এই নে তবে
ছু মন্তর ক্লিক
কাকতাড়ুয়ার মাথার ওপর
কাক ফিরেছে ঠিক

গল্পে,গানে,ছন্দে ছড়ায়
কাকতাড়ুয়ার ঝাঁক

একটি জয়ঢাক নিবেদন

লেখায়ঃ

কিশোর ঘোষাল, কৌশিক ভাদুড়ি, তরুণকুমার সরখেল, প্রকল্প ভট্টাচার্য,রুচিস্মিতা ঘোষ,
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত ধরচৌধুরি, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, অমলেশ রায়, অংশুমান দাশ,
অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, তাপস মৌলিক,সরিত চ্যাটার্জি



রেখায়ঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য, ইন্দ্রশেখর, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, অংশুমান দাশ, অতনু দেব, রুচি-রঙ্গ
কণ্ঠেঃ শ্রেষ্ঠা, মহুল, দেবপ্রিয়া, মহাশ্বেতা, ঋত্বিক,মধুজা, নিধি, তাপস, অরিন্দম, বাসব,
সুরেঃ প্রদীপ মুখার্জি, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য,তাপস মৌলিক, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, শীলা চট্টোপাধ্যায়

কাকতা(ড়ুয়া)লিকা



১। কাকশনারি

২। কাকছড়ুয়া

৩। কাকটেল

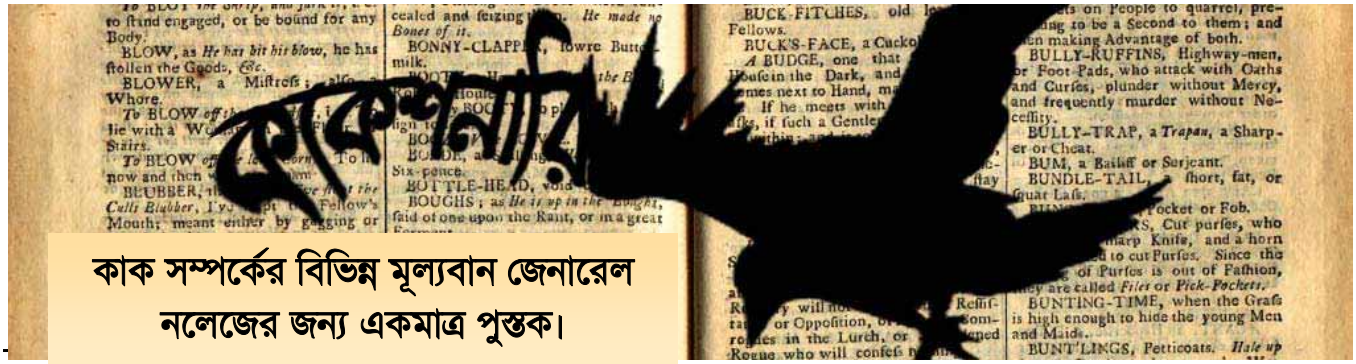
৪। কাকপ্রবচন

৫। কাকগণিত*

৬। কাকার্টুন

*সাবধান!! আইনস্টাইন ও নিউটনদিগের জন্য।

খাতার শুরুতে কাক বিষয়ে কিছু দরকারি কথা



কাকস্য পরিবেদনা---→ পরী রেগে গিয়ে কাককে কামড়ে দিয়েছে।



(কথাটা শুনে বাঘা বলে মুলোর মতন দাঁতওলা পরি আমি রোজ দেখি ইশকুল যাবার রাস্তায়। ইশকুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বলেই কাগজকলম টেনে নিয়ে খসখসিয়ে এই ছবিটা এঁকে দিলঃ





ক্রোন মিটার-ন'মিটার লম্বা কাক

কাকামণি-→যে কাকের ঠোঁটে মণি
টুক্‌রো---→দুটো কাক
পাক্‌রো---→ কাকের ঠ্যাং
ম্যাক্রো---→কাক যখন ছাগলের মত ডাকে
আক্রোমন-→একটি কাকের মন
ক্রোধী----→কাকের বুদ্ধি
ক্রোক-----→কাকের প্রথম ব্যাঞ্জণবর্ণ
শুক্রোবার-→কাকেদের শু পরার দিন।
ক্রোমাগত-→কাকেদের মা মারা গিয়েছেন।



প্রশ্নঃ কাকতাড়ুয়ারা পুরুষ কেন? মেয়েরা কাক তাড়ায় না কেন?
উত্তরঃ তাড়ায়। তাদের কাকিতাড়ুয়া বলে। শেয়ালদা গ্লোব নার্শারির পাশে তাদের চারা বিক্রি হয়। দশটাকা পিস।

প্রশ্নঃ পলিক্রোমাটিক শব্দটি ব্যাখ্যা কর।
উত্তরঃ একটা বিহারি কাকের নাম ছিল পলি। তার গায়ে উকুন হয়েছিল। তার মালিক একটা শব্দে ডাক্তারকে রোগটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। শব্দটা হল পলিক্রোমেটিক

ক্রোমাগনন→কাকেরা জয়ঢাক পত্রিকা নয়। তারা আমাদের পূর্বপুরুষ

ফোটোক্রোমেটিক লেন্স-→কাকের মাথার উকুনের ফটো তুলতে যে লেন্স ব্যবহৃত হয়

কাকলি----------→জগতবিখ্যাত কারাটেকা কাক।

কাঁকর----------→মৃত কাঁচা কাক

কাঁকলাশ---------→কাকের শব

প্রশ্নঃ CROWদিয়ে বাক্য বানাও
উত্তর:নcrow সংকুল নদীতে যে নিশ্চিন্তে তcrow পান করতে পারে, তার দিকে বcrow দৃষ্টিতে তাকানো পাপ।

কাঁকরোল--------→কাকেদের কান্নার রোল, মরা কাক রুটিতে মুড়ে প্রস্তুত রোল

কাকছড়ুয়া

কাকের নামতা



কাক এক্কে কাক
কাক দুগুণে ঢাক
তিন কাক্কে তাকুরতুকুর
চার কাক্কে চাক
পাঁচ কাক্কে কাক্কা
ছয় কাক্কে ছক্কা
সাত কাক্কে শাক
আট কাক্কে আঁক
নয় কাক্কে নাক
দশ কাক্কে অংকসারের টাক।



কোকিলকথা

ও আমার কাকতাড়ুয়া, আমায় খ্যাদাসনা রে,
কালো বটি, কোকিল আমি, দ্যাখ চেয়ে
আমারে!
বিশ্বেস হচ্চে না কি?
একবার কুহু ডাকি?
এ হে হে গাইবো কী গান, গলায় যে
ব্যাথারে!!

সংতাড়ুয়া

একটা ডাণ্ডা লম্বা করে
একটা আড়াআড়ি,
লম্বাটাতে জামা ঝোলে
মাথা তো তার হাঁড়ি!
হাঁড়িতে কে চোখ এঁকেছে
গোল্লা গোল্লা করে,
পালাবে কি, কাক বাবাজি
দেখে হেসেই মরে!!





জয়ঢাকি সব জবর জাবর
কাকতাড়ুয়ার বাড়া
উদ্ভুটে সব গপ্প শুনেই
একপায়ে সব খাড়া।

কাগা



কাক নয় রে কাগা
দিলি তো ঠিক দাগা!
কাকতাড়ুয়া এতোল বেতোল
রাত্রিদিনই জাগা
কাক নয় রে কাগা।
হাঁড়ির মাথায় ধাগা
কাকতাড়ুয়া খ্যাংরা সে হোক
রোদজলেতে বাঘা।



গুজব

কাকতাড়ুয়া কাক তাড়ায়?
খবর পেলি কোন পাড়ায়?
তাড়াবে সে কখন? কাকে?
সারাটাদিন ব্যস্ত থাকে
নিজের কালো টাক সারায়
সুযোগ পেলেই হাত বাড়ায়
ছেঁড়া কামিজ লটরপটর
কঞ্চিদেহে খটর খটর
একটা ঠ্যাঙে ধান মাড়ায়



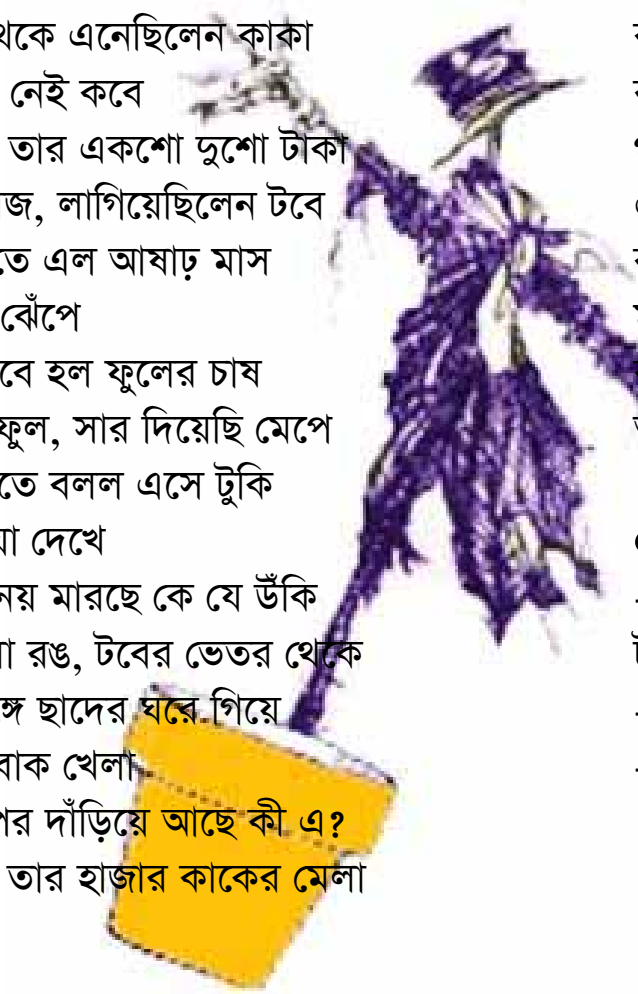
দিন ফুরোলে শহরগ্রামে যখন ভূতেল আঁধার নামে
ঘুমোয় সবাই খুব আরামে শেয়াল ডাকে হুক্কা হুলুমহুয়া
তখন বাঁধে হাঁটলে একা নিঝুম মাঠে মিলবে দেখা

ভিড় করেছে একশো কাকতাড়ুয়া

বীরপুরুষ

আমার দেশে বীরের বেশে
যায় আপিসে কাকতাড়ুয়া ।
সকালে গায় গিটকিরি গান
সন্ধেবেলায় হুক্কাহুয়া ।

কাকতাড়ুয়ার গাছ



জাপান থেকে এনেছিলেন কাকা
ঠিক মনে নেই কবে
দাম ছিল তার একশো দুশো টাকা
বেগুনী বীজ, লাগিয়েছিলেন টবে
তারপরেতে এল আষাঢ় মাস
বৃষ্টি এল ঝেঁপে
কাকার টবে হল ফুলের চাষ
দোপাটি ফুল, সার দিয়েছি মেপে
দুদিন যেতে বলল এসে টুকি
ও দাদা যা দেখে
দোপাটি নয় মারছে কে যে উঁকি
মিশকালো রঙ, টবের ভেতর থেকে
টুকির সঙ্গে ছাদের ঘরে গিয়ে
দেখি, অবাক খেলা
টবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কী এ?
চারপাশে তার হাজার কাকের মেলা
কাকার আনা বেগুনি বীজখানা
বর্ষাতে জল পেয়ে
গজিয়েছে এক কাকতাড়ুয়ার ছানা
এদিক ওদিক দেখছে চেয়ে চেয়ে
কাকতাড়ুয়া ছাদেই এখন থাকে
মজায় সারা বেলা
কাকেরা কেউ ভয় পায়না তাকে
আমার সাথেও করে ক্রিকেট খেলা

এর উত্তরে পাঠকের প্রতিক্রিয়া

-জাপানিতে কাকাহাসি কাকাতুয়া বীজ
টবে পুঁতেই দেখা গেল বাপরে সে কী চিজ।
-কাক তাড়ুয়ার বীজ আমায় দুটো প্লিজ।
-দিতেই পারি এলে আমার বাড়ি
ছক্কা হাঁকাও কাকতাড়ুয়ারর বলে
তবেই দেয়া চলে।

তুয়া ও তাড়ুয়া





কাকাতুয়া আর কাকতাড়ুয়ায়
তফাত সামান্যই
দুচার কথায় কই
এ সাদা ও কালোএ পাজি ও ভালো
এ খায় কাঁঠাল ওর প্রিয় তেলকই
এটা স্থূলবপু ওইটা সুক্ষ
এটা পণ্ডিত ওটা গোমুখ্য
ওটা সাদাসিধে এইটা রুক্ষ
শুধু করে হইচই
কাকাতুয়া আর কাকতাড়ুয়ায় তফাত সামান্যই
সাদা ঝুঁটি বেঁধে এটা স্কুলে যায়
দাঁড়ে বসে সুখে রামদানা খায়
পড়ে মোটামোটা বই
কাকতাড়ুয়াটা খাড়া থাকে মাঠে
রোদঝড়জল তার গায়ে হাঁটে
সূর্য গজায়, ফের বসে পাটে
তার ছুটি মেলে কই
রাত্রে যখন স্বপ্নেরা আসে
কাকাতুয়াটাকে বড়ো ভালোবাসে
কাকতাড়ুয়ার গায়ে চাঁদ হাসে,
বলে এস কথা কই।
কাকাতুয়া আর কাকতাড়ুয়ায় তফাত সামান্যই

কাকতাড়ুয়ার বন্দনা



তোমার মাথায় টাক ছিল
আর টাকের পরে কাক ছিল গো
কাক ছিল কাক ছিল

টাকপাতিলে একটি ঢিলে
ভেবেছিলাম কাক তাড়াব
তাড়াব তাড়াব
তোমার মাথায়--

কেলে টাকে ঠুকল কাকে
তারসাথে ঢিল লাগল টাকে
জোড়া গুঁতোয় ফাট গিল টাক
ফাট গিল ফাট গিল
তোমার মাথায়--

গায়ে তোমার ছেঁড়া জামা
পরিয়েছিল পল্টুমামা
সেই জামাতে খড়ের মাসল
ঢাকছিল ঢাকছিল
তোমার মাথায়–

কাগাবগার পাঁচালি

কাকেরা কা কা করে
কাকে কে ডেকে যায়
কেকীতে কেকা ডাকে
কোকিলে কূ কূ গায়।
‘কোঁকর কো কো’ ক’রে
কুঁকড়ো ডাকে ভোরে
কাননে কাকাতুয়া
কলকাকলি করে।
কাকেরা কাঁকিনাড়া
বকেরা বকখালি
কাগাবগাতে মিলি
গাহিনু এ পাঁচালি।।

কোকাকোলা কি কোকো
কাকু-কাকি কী খায়?
কুকিজে নাকি কেকে
খোকা-খুকু ভুলায়?
কাকেবকেতে থাকে
কত কী কথকতা
ককবরক বলি
বোঝ কি বোঝ না তা?
বকের বকবকে
কাকের কা কা রবে
কাগাবগাতে মিলে
পাঁচালি গাই সবে।।



কাকতাড়ুয়া

কাকতাড়ুয়া এক পায়েতে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়
ঘুমোনো তো যাবে না আর, দু’চোখ বুজে যায়।
পরের জমি, পরের ফসল দেখে রাখাই কাজ
কাকতাড়ুয়া পাহারা দেয় সকাল দুপুর সাঁঝ।
তার শরীরে্র ছেঁড়া জামা হাওয়ায় শুধু ওড়ে
বৃষ্টিজলে ভেজে সে আর খররোদে পোড়ে।
কাকতাড়ুয়ার সাধ হয়, সে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
পারে না সে কোথাও যেতে, যাবে কোথায় দূরে?

কাকতাড়ুয়াও কাঁদতে পারে আকাশ কেবল জানে
ফুরফুরে এক মন আছে তার কেউ কি সেটা মানে?
যখন ভোরের শিশির-ভেজা সবুজ মাঠটা জাগে
কাকতাড়ুয়া দু’চোখ মেলে দ্যাখে সবার আগে।
জোনাকিদের নাচ দেখে সে একলা আঁধার রাতে
লক্ষ প্রদীপ জ্বলে নেভে, থাকে না কেউ সাথে।
কাকতাড়ুয়া আকাশের ওই চাঁদকে দেখে হাসে
জ্যোৎস্না এসে হাত ধরে তার, লুটায় চারিপাশে।

বেকারতাড়ুয়া



আমাদের এদিকে কাক তাড়ুয়াদের চাকরি চলে যাচ্ছে।
খাঁ খাঁ মাঠ পড়ে আছে, নেই কা-কা স্বর
মেঠো ইঁদুরেরা সব ছেড়ে গেছে ঘর।
ফুটি ফাটা মাটি তার ফসলের গান
ভুলে গেছে, মানুষেরা খায় বীজ-ধান।
একপাশে পড়ে আছে মরা নদী খাত
জলের স্মৃতিও নেই, এমনি বরাত।
কাকতাড়ুয়ারা আজ কাকে যে তাড়ায়
কাকে বলে – “কাকে, আমি আছি পাহারায়!”

হাসিস নে

কাকতাড়ুয়া কাকের ছা
দেখবি কিন্তু হাসবি না
আলকাতরা চোখ কি মুখ
ঢলকা জামায় ঢাকছে বুক
খ্যাংরা ঝুটি একলা পা
কাক বসেছে উড়ছে না



তনুকাক

তনুকাক হাঁকডাক কদ্দিন পর
কাকতাড়ু ভেগে গেছে এইবেলা ধর
হ্যাঙারে হ্যাংলা জামা খেরোকাঠি পা
তনু গায় রোদে ভাজা ধাধাপানিধা
কাকে ভরা শহরের কলকাতা নাম
কাকতাড়ুয়ারা থাকে ধাম মিহিজাম
রাতবিরেতেতে তারা খোলাজামা গায়
স্বপ্নের ফিরি করে পসার জমায়
কাক নেই তাও দেখো তাড়ুয়ারা আছে
গল্পের গরু খুঁজে তুলে দেয় গাছে।
(এইটে আমাদের তনুদিদিকে নিয়ে লেখা)

বিয়ের খবর

কাকতাড়ুয়া বর কত্তা কাকের নাকি বিয়ে
কার্ড বাড়িয়ে নেন্তন্ন করলে আমায় টিয়ে
টিয়ের বাড়ি ময়নাগুড়ি টিয়ে কনের সই
বগামামা পিসিতুতো ভাই যে দেয় ক্ষেতে মই।



জামতাড়াকথা ১

জামতাড়াতে চিত্ত অতি
সুপ্রসন্ন থাকে
ওইখানেতে রেলেরা হর্ণ
বাজায় কাকের ডাকে
কাক বা কাকু তাড়ায় না কেউ
চায় না বাড়ি ভাড়া
বাড়ি কোথায় রেল কোয়ার্টার্স
শুদ্দু তাড়া তাড়া।

জামতাড়াকথা ২

কাকের তাড়ায় বানালো গ্রামছাড়া
কাকতাড়ুয়া পৌঁছল জামতাড়া।
স্টেশন রোডে রিক্সা ছিল দুটো
কি আর বলি,কাক-ই করলো ফুটো
রিকশাওলা ইনকারিল ভাড়া ।

দইতাড়ুয়া

পোশাক আশাক কাকতাড়ুয়ার, হাসি লেগে ঠোঁটে
কাকবাবাজি এগিয়ে এল ভয় পেল না মোটে
হাঁড়ি-মাথায় বসল এসে বন্ধু ভেবে তাকে
মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পেয়ে কা কা করে ডাকে
টাটকা নতুন কাকতাড়ুয়া, মিষ্টি দইয়ের হাঁড়ি
সইলনা তর কাকবাবাজী তাইতো তাড়াতাড়ি
ছাড়িয়ে মাথা কাকতাড়ুয়ার বসল গিয়ে পাশে
দইটি খেয়ে কাকবাবাজী ক্যাঁককেকিয়ে হাসে।



অহংকাক

কাকতাড়ুয়া কাকতাড়ুয়া
আমি হলাম কাক
কাকতাড়ুয়া এই আমাকে
আচ্ছা করে দ্যাখ
চোখ নেই তোর দেখবি কিরে
মাথাটাই তো হাঁড়ির
তোর মাথাতে বসেই চালাই
জলপুলিশের ফাঁড়ি
কাকতাড়ুয়া আমার মাথা
বেলের মতন ন্যাড়া
তোর হাঁড়িটাই খুলে মাথায়
বুদ্ধি আমার বাড়া!



কাক ও কাকতাড়ুয়া

এক যে ছিল কাকতাড়ুয়া হাত ছড়িয়ে মাঠে
সারাটা দিন রোদে জলে এমনি করেই কাটে
কেউ করে না যত্ন আদর কেউ বলে না আহাঃ
ছেলে, বুড়ো, চাষি, মজুর মজায় হাসে হা,হা
একদিন এক কাক উড়ে তার বসল এসে মাথায়
কাকের বাড়ি এ গ্রামে নয়, তা ছিল কলকাতায়

গল্প করে কাকতাড়ুয়া কাকের সঙ্গে কষে
“মিথ্যে তোমায় বকব না ভাই অল্প-সল্প দোষে
দাঁড়িয়ে থাকি রোদে-জলে, তাইতো হাঁড়ি মুখ
ছেঁড়া জামা বলে আমায় ভেবো না উজবুক

বসো যখন আমার মাথায় রা কাড়ি না মোটে
সবার সাথেই কুশল জানাই যে যখনই জোটে
তবুও দেখি আমার দিকে তাকাও ভয়ে ভয়ে
ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াও অযথা বিস্ময়ে”

কাক বলে “আমি তো ভাই কলকাতায় থাকি
তোমার মত একটিও ঠিক দেখতে পাবে নাকি
তা বলে ভাই ভেবো নাকো সুখে থাকি ঘরে
ওখানে তো মানুষগুলোই হ্যায়, হুস্, হাস্ করে
এক মাত্র তুমিই দেখি গল্প কর হেসে
কাকতাড়ুয়ার অভাব তো নেই আমাদের এই
দেশে।”

কাক,কৌড়ি



পানকৌড়ি সেটাও বোধায়
কাকের নিকট জ্ঞাতি
দাঁড়কাক তার অগ্রজ আর
কনিষ্ঠটি পাতি

পানকৌড়ি মৌরী খেতে
আসত আমার ক্ষেতে
এ সব কথা যত্ন করে
বলত যেতে যেতে।

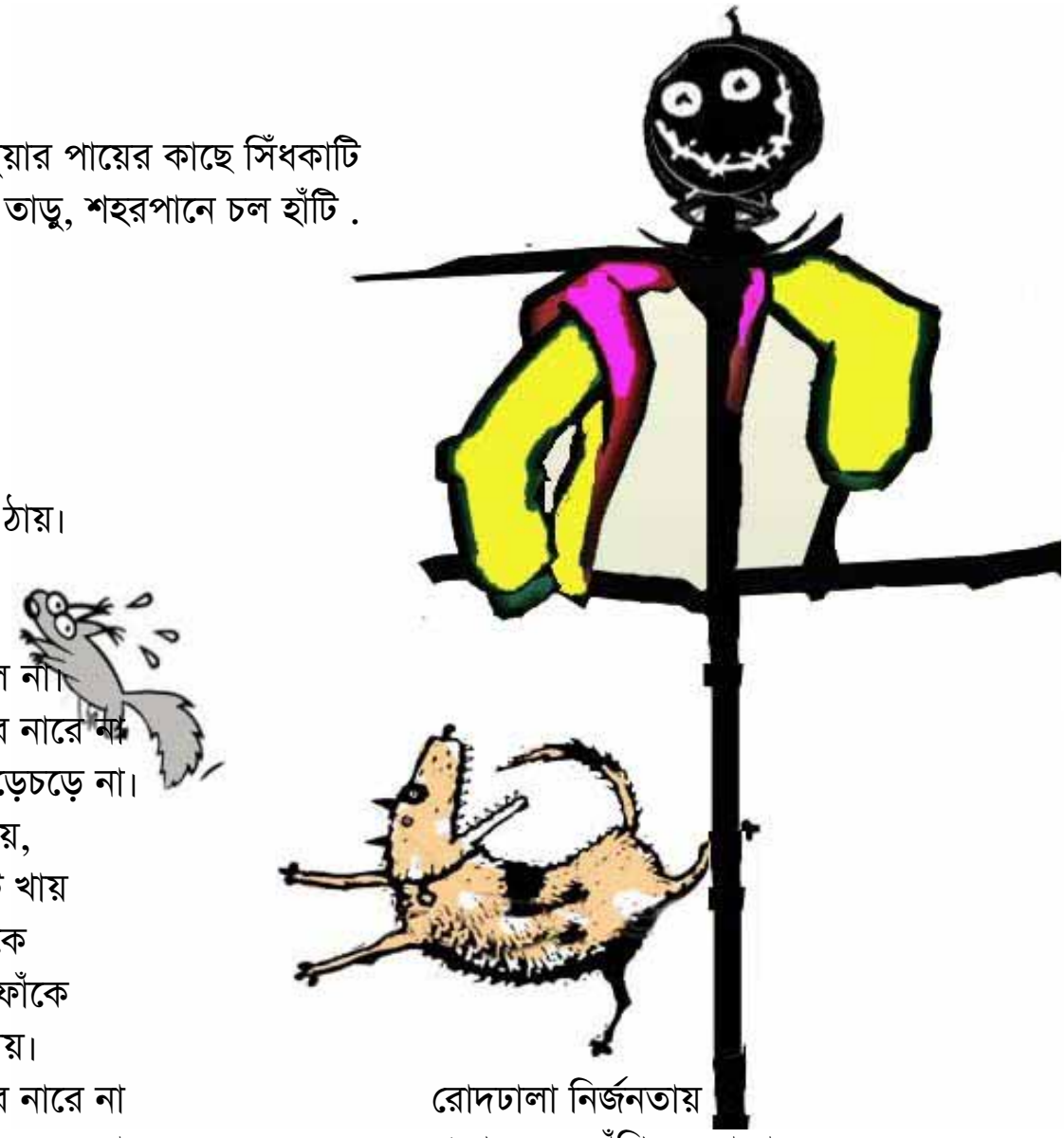
কাকধার্মিক

কাকত্ব পাইয়াছি আমি
বিশ্বের কিছুই চাইনা
কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রো ডায়নামিক্স
সম্পর্কে আমার ভাই না।



পানুকথা

সিঁধেল পানু কাকতাড়ুয়ার পায়ের কাছে সিঁধকাটি
নামিয়ে রেখে বললো তাড়ু, শহরপানে চল হাঁটি .



একপা'য়

সে সারাদিন একপায়
একলা দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়।
কখনো সুগোল টাকে
ঠোকরায় যদি কাকে
দেঁতো হাসে কিছু বলে না।
না নারে না,নারে নারে নারে না
সে যে কোনোমতে নড়েচড়ে না।
সে সারাদিন দেখে যায়,
ভুলো রোদে লুটোপুটি খায়
মাঝে মাঝে এসে তাকে
শুঁকে নেয় নিয়ে এক ফাঁকে
কাঠবিড়ালির পিছে ধায়।
না নারে না,নারে নারে নারে না
সে যে কোনোমতে নড়েচড়ে না।
ছমছমে অমাবস্যায়
সিঁধকাটি ফেলে গঙ্গায়
রতন গেল শহরে
সিঁধ কেটে খোড়ো ঘরে
দুটো পেট তাও চলে না (মোটে)
রোদঢালা নির্জনতায়
পথে যেতে বাঁশি কে বাজায়?
মাথার হাঁড়িটি খুলে
টিউকল থেকে তুলে
জল খেয়ে ফের রেখে যায়।
না নারে না,নারে নারে নারে না
সে যে কোনোমতে নড়েচড়ে না।

প্রশ্নমালা

লাউ দিয়ে লাউ শাক
খায় যেই রোগা কাক
ঝোল ঝোল দুপুরের আহারে
বাগানেতে কাকিনি
গায় কোন রাগিনী
কানে কানে বল দেখি আমারে।

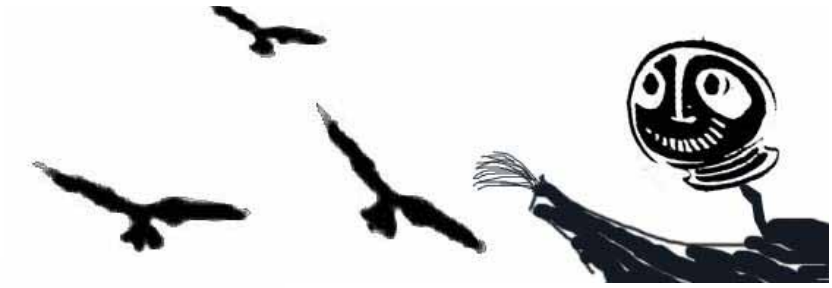


কাকতাড়ুয়ার জামা

দাঁড়িয়ে আছে সা-পালোয়ান গামা
দেহের থেকে মুণ্ডু ভারি, লটর পটর জামা।
কেউ জানে না, বলছি তোমায় খালি
ওই জামাটা আমার,ওকে পরতে দিলাম কালই।
অল্প হেসে ছ্যাতলা পড়া দাঁতে
কাকতাড়ুয়া থ্যাঙ্কু দিল জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতে।
চম্পাবরণ চাঁদের আলোর নীচে
হুক্কা-হুয়া একলা শেয়াল সাক্ষী ছিল, ফিচেল।
সত্যি বলতে, রাত্রি মধ্যযামে
স্বার্থ ছিল অন্য আমার, বদান্যতার নামে।
সবাই জানে, এমনিতে রাম-ভিতু
দুই হাঁটুতে কাঁপন ধরে ছয়-ছ'খানা ঋতু,
মাস্টা'মশাই যে'মনি বলেন - দাঁড়া।
ঝুপসি পাতার বেল গাছেতে কে যেন দেয় নাড়া
সন্ধে হলেই, চোখ বুজে তিন লাফে
দৌড় লাগাই, ঘাড়ের ওপর এই বুঝি কেউ চাপে।
সকাল বেলা রোদের আলোয় দেখি
নতুন জামায় কাকতাড়ুয়ার রূপ খুলেছে সে কী!
চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে, পাছে
ভুল করে কেউ ফুল ছিঁড়ে নেয় সূর্যমুখী গাছের।
মাঠের মধ্যে সমস্ত রাত একা
যেখান দিয়ে তেপান্তরের রাস্তা গেছে বেঁকা
কাকতাড়ুয়ার ছদ্মবেশে দেখে
আমায় সবাই বীরপুরুষই ভাবছে, শিশির মেখে।
কিচির মিচির শব্দ পেয়ে ঘুরে
হঠাত্ দেখি একশ' পাখি আসছে এদিক উড়ে।
ধন্যি বটে কাকতাড়ুয়ার সাহস
কাঁধের ওপর কাক বসলেও বলছে না -ভাগ্
বায়স।

পরিবেদনা

কাকস্য পরিবেদনায়
কাকতাড়ুয়ারা ভেবে সারা
কাকেদের যদিও তাড়ায়
কা কা রব ভালোবাসে তারা।





তাড়ুয়া বনাম চাষি

ঘোড়ামুরগার মাঠ দিয়ে এক চাষি
সন্ধ্যেবেলায় ফিরছিল সে ঘরে,
হঠাৎ একটা কালো ভূতের ছানা
মাঝ রাস্তায় এলো কেমন করে ?

চাষি ভাবে ছোট্ট ভূতের ছানা
ঝোলায় ভরে ঘরে নিয়ে এসে
পোষ মানাবো, খেতে দেবো আর
একখানা নাম রাখবে ভালোবেসে।

ঝোলা নিয়ে ভূত ধরবে বলে
চাষি-ভায়া যেই না গেল কাছে,
দেখল ওটা কাকতাড়ুয়া স্বয়ং
কালি-ঝুলি গায়েই মেখে আছে।

চাষি তখন হালকা চাঁদের আলোয়
ভূত না পেয়ে বলল তাড়ুয়াকে,
চল্ তোকে আজ পৌঁছে দিয়ে আসি
আকাশজালের দুরন্ত "জয়ঢাকে"।

দাবিদাওয়া

মজুমদারের শার্ট ছেঁড়া আর হারুময়রার হাঁড়ি
ক্ষান্ত না তো এতেও তোরা,করিস বাড়াবাড়ি
একখানা চোখ ট্যারা ,রঙও কালো ভুষি
আরেকখানা ঠ্যাং দিবিনা ? তাতেও কঞ্জুসি ?
একটা মোটে ঠ্যাং, তাতে কি , নজরে নেই ফাঁকি
জোছনা বারিষ রৌদ্র মেখে সবকিছু খোঁজ রাখি
ঠিক জানি কে নৌকো বানায় অঙ্কবইয়ের পাতে
দুপুরে কে ঘুম না দিয়ে টো-টো করে ছাতে
করবো কি ফাঁস? আরেকখানা ঠ্যাং যদিনা পাই,
চেক-কাটা শার্ট,ঘড়ি এবং গামছাবাঁধা টাই ।

যৌথতাড়ুয়ার গান

সব জয়ঢাকি মিলে একমাস তিলে তিলে লিখে প্রস্তুত হুয়া যৌথ কাকতাড়ুয়া--সম্পাঃ)

কাকতাড়ুয়ার তাড়া খেয়ে
চেপে আলকাতরার পিপে
পৃথিবীর যত কাক আছে
সবাই ভিড়েছে কাকদ্বীপে।
সেই থেকে তিষ্ঠোনো দায়
কাকদ্বীপে,সব কা-কা-ময়

ময়দানবের মাসি তাই
কাল ভোরে পালালো দুবাই।
সেইখানে করছাড়া শপে
ঢুকে ময়দানবের বুয়া
সস্তায় কিনে নিল দুটি
কলে চলা ক্রৌঞ্চতাড়ুয়া।

ক্রৌঞ্চতাড়ুয়াদুটি চিনে
চাউমিনে চলে, রোজ তাই-
ব্যাটারি না,বুয়া এনে কিনে
ঢেলে দেয় নুডলের কাই।
সাথে নিয়ে ক্রৌঞ্চতাড়ুয়া,
নুডলের কাই ভরা পিপে
ফিরে এল দানবের বুয়া
প্লেনে চড়ে সোজা কাকদ্বীপে।
কাকদ্বীপে রোদ ভাজাভাজা
পাখিদের চান-ঘষা-মাজা
ঘুচে গেছে,জল নেই মোটে
গেঁড়ি গুগলিও নাহি জোটে।



কাকদ্বীপে জঙ্গল নাই
ক্রৌঞ্চতাড়ুয়া পথে খাড়া
পেটভরা চাউমিন কাই
সুগন্ধে দেশ মাতোয়ারা

মাসাপথে সে খবর পেয়ে
ডানা মেলে লাখোকোটি কাকে
আকাশকাঁপিয়ে এল ধেয়ে
কানে তালা ধরে তার ডাকে
কাকদ্বীপে কাকেদের বাসা
সাতখানা আলমারি তাক
নুডলের কাই দিয়ে ঠাসা
খিদে পেলে খায় যদি, খাক!
কাকদ্বীপ ছেড়ে আরও দূরে
চলে যাবে কাকতাড়ুয়ারা
রাশিবিজ্ঞান কষে বসে
কাগজে কলমে তাড়া তাড়া
যারা সব বিজ্ঞানী হেন
জয়ঢাকি বলে মুখ ঢেকে
কাকেরা তাদের নেবে চিনে
কাকতাড়ুয়ারা বলে হেঁকে।
কাকতাড়ুয়ারা মিলে বসে
কঠিন গণিতে দেয় মন
ভারত সাগরে খুঁজে দ্বীপ
থাকিবেন সব বাপধন।

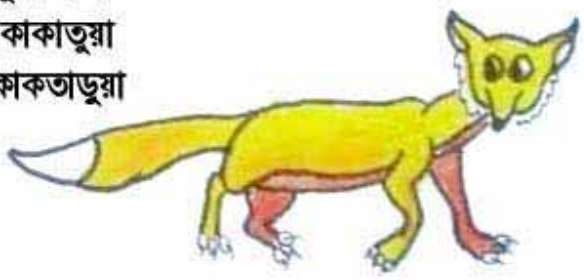




কাকতাড়ুয়া

ছাদের ওপর কাকতাড়ুয়া
দেখল সাদা কাকাতুয়া
শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া
পহেলি পুছি ছোটা বুয়া
ইয়ে শিয়াল কাঁহা সে আয়া
ক্যাদেখকর মুক্কা খায়া
জানে কেবল কাকাতুয়া
যো ভি দেখা কাকতাড়ুয়া

এই লেখাছবিটা পাঠিয়ে দিল
রুচিরঙ্গ দুভাইবোন মিলে



হারিতকুমার

কাক-কোকিল

ছিল কাকতাড়ুয়া–হল--



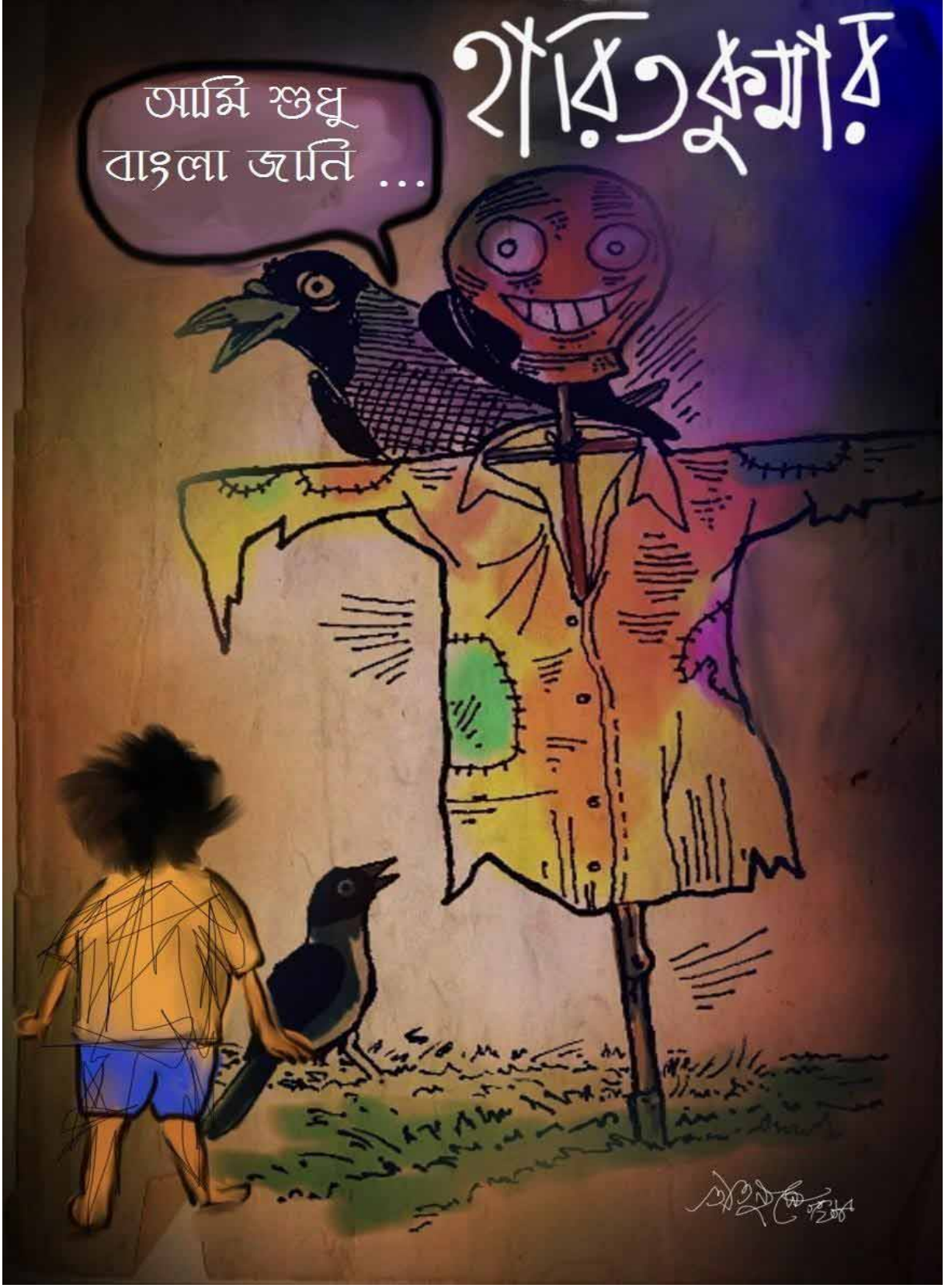
কাকতাড়ুয়া উপন্যাস (অসমাপ্ত)

বায়স-কোপ

তুমিও
এসো

কাথিন-কথা

কাকফুলকথা



আমার একটা পোষা কাকতাড়ুয়া ছিল। তাকে আমি কড়ুয়া ডাকতাম। সে হিন্দিভাষায় কথা বলত। একদিন একজন বিড়াল একজন পাখিকে ডিনার করার জন্য তার মাথায় থাবা মারল। কড়ুয়ার হাঁড়ি ফেটে গেল। তখন আমি কাঁদলাম। তখন কাকা নতুন হাঁড়িতে আলকাতরা ও চুণ দিয়ে মাথা এঁকে কড়ুয়ার মাথা ফিরিয়ে দিল। আমি খুশি হয়ে বললাম কৈসন হো কড়ুয়া? তখন সে বলল, আমার নাম হারিতকুমার। আমি শুধু বাংলা জানি....

ছিল কাকতাড়ুয়া–হল--

হেমন্তে ক্ষেতে ছোলার চাষ দিয়েছিল চাষী। ক্ষেতে সে বসাল এক সজনের ডাল। তাইতে বাঁধল আড়কাঠি। তার গায়ে একটা পুরোন পাঞ্জাবি চাপিয়ে মাথায় কালো হাঁড়ির গায়ে চোখমুখ এঁকে দিতেই কাকতাড়ুয়া তৈরি। পাখিরা ভয়ে ক্ষেত ছেড়ে পালাল।

তারপর শীত এল। ফসল উঠল। ফাঁকা ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া একলা দাঁড়িয়ে রইল। তার কাছে কেউ আসে না। এমনি করে শীত গিয়ে যেই বসন্ত এল, তখন একদিন হঠাত ঘুম ভেঙে জেগে উঠল সে।টের পেল তার শরীরের মধ্যে ছুটে চলা রসের শিরশিরে ছোঁয়া। আস্তে আস্তে গায়ের থেকে দুটো জাত বের করল সে। ছেঁড়া পাঞ্জাবির ফুটো দিয়ে আকাশের দিকে মেলে ধরল হাতদুটো। তারপর, তার বিচ্ছিরি মাথাটাকে ছুঁড়ে ফেলে বের হয়ে এল আরো একটা শক্তিশালী হাত। বসন্তের হাওয়া তাকে আদর করতেই সেইসব নতুন হাতের গায়ে জেগে উঠল কুঁড়িরা। তারপর, একদিন মানুষেরা দেখল ফাঁকা মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে আছে সবুজসাদায় সাজা এক ফুলন্ত গাছ। পাখিরা আর তাকে ভয় করে না।



(আমরা জানতুম কোকিলই কাকের বাসায় ডিম পেড়ে রেখে যায় । তাপসকাকু এসে বলল, না, অতীতে অন্তত একবার কাকেরা ব্যবস্থাটাকে পাল্টে দেবার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু তার ফলে বিশ্বের প্রাণীসমাজের কি হাঁড়ির হাল হয়েছিল আর কিভাবে তার নিরসন করা গেছিল এসব নিয়ে তোমাদের তাপসকাকু একটা রচনা লিখে দিয়েছেন । মুশকিল হচ্ছে , তোমাদের বায়োলজির শিক্ষকমশাইরা রেগে যেতে পারেন, তাই ওটাকে আমরা গল্প নাম দিয়ে কাকটেলের পাতায় রেখে দিলাম ।একদম খাঁটি গল্প, আগাগোড়া সত্য দিয়ে মোড়া ।)

কাক-কোকিল সংবাদ



দিব্যি ছিল কোকিলেরা। কাকের বাসায় ডিম পেড়ে খালাস, তা দেওয়ার ঝামেলা নেই, ছানা মানুষ করার, থুড়ি, কোকিল করার ঝক্কি নেই; খাওদাও ফুর্তি করো আর মনের সুখে গান গাও। তাদের বিন্দাস কুহু কুহু গানে বসন্তকাল মুখরিত, আকাশ বাতাস চমকিত।

যত ঝঞ্ঝাট মা কাকের। দিনরাত বসে বসে তা দাও রে, ডিম ফুটে ছানা বেরোলে ঠোঁটে করে খাইয়ে দাও রে, বাসায় আগলে রাখো রে। বাবা কাকেরও নাকানিচোবানি অবস্থা; নিজের ছানারা প্লাস কোকিলের ছানারা, সকলের জন্য খাবার যোগাড় করা। চাট্টিখানি কথা? তারপর যখন কোকিলছানারা এট্টু বড় হয়েছে, তাদের ওপর মা কাকের মায়া পড়ে গেছে, তখন একদিন ফুড়ুৎ করে তারা উড়ে যেত নিজের বাপ-মায়ের কাছে।

একদিন দুপুরবেলা, সাত দু'গুণে তখন ঠিক কত হয়েছে জানতে ঘুঘু এসেছে শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচের কাছে। দেখে সে বাসায় নেই। কাক-গিন্নী বলল, "দেখুন গে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন! এতগুনো ছানার জন্য খাবার যোগাড় করতে হয় কিনা!"

খুঁজতে খুঁজতে ঘুঘু সেই বিকেলবেলা কাক্কেশ্বরের দেখা পেল।

"এই যে ভায়া, বলি তোমার যে দেখা মেলাই ভার! কতক্ষণ ধরে খুঁজছি! সাত দু'গুণে দুপুরবেলা ঠিক কত হয়েছিল জানার খুব দরকার ছিল, তা এখন তো প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল!"

"আর বোলো না ভাই! দেখছই তো ছানাদের খানা যোগাতে হিমশিম খাচ্ছি। আমার কি আর অঙ্ক কষার সময় আছে? কতদিন যে স্লেট নিয়ে বসা হয় না! দুঃখের কথা আর বলব কী!"

"বলিহারি ভায়া তোমাদের! অন্যের ছানার জন্য অত কেন খেটে মর তোমরা? কোকিলের ছানা কোকিল বুঝবে। তারা বাঁচল না মরল সে নিয়ে তোমার অত উদ্বেগ কীসের? কোকিলের কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই?"

"আহা, তা বললে কী হয় ভাই? ছোট ছোট ছানা, বাপ-মা দেখে না বলে তাদের কি কেউ নেই? কোকিলের কথা ছাড়ো। সে অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?"

"শোনো ভায়া, সে নবকুমারের জমানা চলে গেছে! ছাড়ো তো ওসব সেন্টিমেন্ট! এখন মডার্ন টাইমস। যার যার তার তার, হিজ হিজ হুজ হুজ হার হার হুর হুর। শুধু নিজের ছানাদের খাওয়াও।"

“সে আমি পারব না ভাই। কোকিলের একটা ছানাও আমার বাসায় মারা গেলে পুরো কাকেদের বদনাম হয়ে যাবে। তবে, সত্যিই আর আমি পারছি না বন্ধু। অন্য কোনও বুদ্ধি দাও না, তোমার তো শুনি পেটে পেটে খুব বুদ্ধি।”

“হুম, বুঝলাম,” ঘুঘু খুব খানিক পেট-টেট চুলকে বলল, “তা একটা কাজ করতে পারো। এত বছর ধরে তো নিজের ছানাদের সঙ্গে কোকিলের ছানাদেরও বড়ো করলে। এবার কোকিলের ওপর ব্যাপারটা চাপাও না। সারাজীবন কুহু কুহু করে গান গেয়ে কাটালেই হবে? তারাও একটু দায়িত্ব নিতে শিখুক, সংসারধর্ম পালন করুক।”

“কী করতে বলো?”

“বলি কি, সামনের মরশুমে তোমরা সবাই আগেই কোকিলদের বাসায় ডিম পেড়ে এসো। তারপর নিজেদের বাসা ভেঙে দিয়ে কটা দিন এখানে-ওখানে কাটিয়ে দাও, ফুর্তি-টুর্তি করো। তোমাদের বাসা না পেয়ে নিজের বাসাতেই ডিম পাড়তে বাধ্য হবে কোকিল। নিজেদের ছানা তোমাদের ছানা সবাইকে ওরাই বড়ো করুক না। একটু প্রতিদান দিক।”

“বাঃ বাঃ, এ বুদ্ধিটা তো মন্দ দাও নি হে। দেখি সবার সঙ্গে কথা বলে।”

ব্যাস, শুরু হল কাকেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস, কানে কানে কানাকানি, গভীর রাতে লাইট অফ করে আন্ডারগ্রাউন্ড মিটিং। গোপন ইস্তেহার বিলি হল। সাংকেতিক মেসেজ ছড়িয়ে পড়ল, ‘কাক ডাকে কা কা; আমি নই, সে বোকা।’ কাকে কাকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।

পরের বছর একদিন কোকিলেরা দেখল তাদের বাসায় কাকেরা ডিম পেড়ে গেছে। এদিকে তাদেরও ডিম পাড়ার মরশুম চলে এসেছে। আঁতিপাঁতি করে খুঁজে একটাও কাকের বাসা পেল না তারা। সব বাসা ভাঙা, কাকেরা ভাগলবা। কী আর করে! অগত্যা নিজের নিজের বাসাতেই ডিম পেড়ে আপন ডিম কাকের ডিম সবেতেই তা দিতে শুরু করল। থেমে গেল গান, শিকেয় উঠল সঙ্গীতসাধনা।

ওদিকে কাকেদের আর পায় কে! বেজায় ফুর্তি তাদের। অ্যাদ্দিনে এট্টু অবসর পাওয়া গেছে। ভোর থেকে পাড়ার ইলেকট্রিকের তারে বসছে তাদের আড্ডা, তুমুল হইচই শোরগোল। এইবারে কোকিলদের জব্দ করা গেছে।

একদিন ঘুঘু সেখানে হাজির হল বাহবা নিতে।

“কী ভাইসব, কেমন বুদ্ধি দিয়েছিলাম বলো?”

“ওফ, জব্বর! তোমার কোনও তুলনা নেই। তবে কিনা কাজকম্ম নেই, সময় কাটে না!”

“সময় কাটে না তো গান গাইলেই পারো! অ্যাদ্দিন কোকিল গান শুনিয়েছে, এবার নয় তোমরা শোনালে।”

কাকেরা সবাই বলল, “ঠিক ঠিক, আমরা গান গাইব। শুরু করা যাক।”

তারপর যা শুরু হল, শুনলে কুম্ভকর্ণ চমকে ঘুম ভেঙে খাট থেকে পড়ে যেতেন। অন্য পাখিদের মতো কাকেরা তো রেগুলার রেওয়াজ করে নি, তাদের অত ফুরসৎ ছিল নাকি! দিনরাত তো খেটে মরত আর খাবার নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করত। সবারই গলা মোটা, ভাঙা – ফাটা কাঁসরের মতো কর্কশ। সুর লাগে না, তাল কেটে যায়, ‘সা’ গাইতে ‘কা’ বেরোয়।

ঘুঘুর তো কান ঝালাপালা। সে নিজেই বুদ্ধি দিয়েছে, তাই একেবারে বারণ তো আর করতে পারে না! এসে বলল, “বাঃ বাঃ, ভালোই হচ্ছে। তবে এট্টু সুর লাগিয়ে ভাই। কথা ঠিকই আছে, সুর হচ্ছে না। মানে একশোয় পঞ্চাশ।”

কাক্কেশ্বর বলল, “আমরা ওই কোকিলদের মতো ন্যাকা ন্যাকা মোলায়েম গান গাই না। এ হল র‍্যাপ, হার্ড রক আর সাম্বার ফিউশন। এবার একটা বাংলা ব্যান্ড বানাব আমরা। সবাই মিলে কোরাস গাইব। একটা গান লিখেছি। শুনবে? চলো ভাই সবাই গলা মেলাও আমার সঙ্গে –

দেয়ার ওয়াজ আ ফুল
বাঞ্চ অফ ক্রো
সোমবার থেকে শু-ক্র
টানত ঘানি, কী হয়রানি
ফুরসৎ নেই এক টু-করো
দেন দ্য ঘুঘু টোল্ড দেম
হোয়াট এ রাবিশ! শেম শেম!
যেমন কুকুর, তেমন মুগুর
ডু দ্য সেম ট্রিক, প্লে আ গেম
প্লান্ট ইওর এগ ইন দেয়ার নেস্ট
স্ট্র্যাটেজি-তে সেটাই বেস্ট
কোকিলসেনা, মেটাক দেনা
তোমরা ক’দিন এনজয় রেস্ট।”
সো দ্য ক্লেভার বাঞ্চ অফ ক্রো
উলটে দিলো চ-ক্র
গাইল গানা, ধিন তা না না
সোমবার থেকে শু-ক্র।...”

ঘুঘু প্রাণপণে কান চাপা দিয়ে উড়ে পালাল।

কাকেদের গানের গুঁতোয় পাড়ার যত ছেলেবুড়ো, পশুপক্ষী সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত, ত্রাহি ত্রাহি রব চারিদিকে। কয়েক জনের তো কানে শর্ট সার্কিট হয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে গেল! গান শুনেই ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে সবাই, বুঝেছে এসব ঘুঘুর কারসাজি। পাখিরা সকলে মিলে ঘুঘুকে একদিন ঘেরাও করল।

ছাতারে আর শালিকরা বলল, “ওরে ব্যাটা ঘুঘু, এই বুঝি তোর বুদ্ধির বহর? তুই কিনা আবার বুদ্ধির বড়াই করিস! বলি শুনে রাখ, পরের মরশুমে ফের যদি ওই কাকেদের ব্যান্ড শুনতে হয়, তাহলে তোকে পাড়াছাড়া করব, ঘুঘুডাঙায় তোদের হেড আপিসে নালিশ করে দেব।”

ব্যারিস্টার প্যাঁচা, বি. এ., এল. এল. বি., লং কোট ঠিক করতে করতে গম্ভীর স্বরে বলল, “শোনো বাপু, প্রকৃতিতে কার কী ভূমিকা সব সংবিধানে লেখা আছে। যেমন খুশি চেঞ্জ করলেই হল নাকি? সংশোধনী প্রস্তাব আনো আগে।”

ঘুঘু ওদের ঠাণ্ডা করতে বলল, “ওকে ফ্রেন্ডস, কুল কুল। লেট মি সি, দেখি কী করা যায়!”

অনেক ভেবেচিন্তে একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুঘু হাজির হল কোকিলদের কাছে।

কোকিলরা তো ঘুঘুকে পেয়েই ছেঁকে ধরল একেবারে, “এটা তুমি কী করলে ঘুঘুদাদা! আমরা কত সুন্দর গান শোনাতাম সবাইকে, খাঁটি দেশীয় রাগসঙ্গীত, সে তোমার প্রাণে সইল না? এখন এই সারাদিন বসে ডিমে তা দেব, কাচ্চাবাচ্চা বড়ো করব তো সঙ্গীতসাধনা করব কখন?”

ঘুঘু বলল, “প্রতি বছরই তো কাকেদের ঘাড়ের ওপর ছানার ভার চাপিয়ে দাও, নিজেরা ধেই ধেই করে গেয়ে বেড়াও। এবার নয় তোমরাই করলে কাজটা, একটু দায়িত্ব-টায়িত্ব নিতে শেখো!”

“ঘুঘুদাদা, এসব কী আমাদের কাজ! আমরা হলুম গে শিল্পী। শিল্পীরা এট্টু অমন ভোলেভালা কাছাখোলাই হয়, কাজকম্ম ওদের দ্বারা হয় না বিশেষ। সকাল-সন্ধ্যে ধরাবাঁধা রুটিন মেনে চললে শিল্পসৃষ্টি হবে কখন? না ঘুঘুদাদা, তুমি এর একটা বিহিত কর।”

“এ বছর তো অন্তত মন দিয়ে কাজটা কর, সামনের বার নয় দেখা যাবে। কাকের ছানাগুলোর যত্নআত্তি করছ তো? না কেবল নিজেদের ছানাকেই খাওয়াচ্ছ? কাকেরা কিন্তু কোকিল ছানারও সমান আদরযত্ন করে। ওরা মোটেই বোকা নয়। নিজের ডিম অন্যের ডিম ওরা ভালোই চেনে, ভালবেসে সবকটাই বড়ো করে তাও। বেচারা ভালমানুষের জাত!”

“সে তুমি একদম ভেবো না দাদা, অতটা অকৃতজ্ঞ আমরা নই। সবার সমান যত্ন হচ্ছে। তুমি শুধু সামনের বছরের উপায় কিছু বাতলাও। তানপুরায় যে ধুলো জমে গেল! ওদিকে কাকেরা একবার যখন শুরু করেছে, পরেরবার ঠিক এসে ফের আমাদের বাসায় ডিম পেড়ে যাবে।”

“ঠিক আছে, আগে প্রত্যেকটা কাকের ছানাকে খাইয়ে দাইয়ে বড়ো করে উড়তে শিখিয়ে ওদের মা-বাপের কাছে ফেরত পাঠাও, তারপর কী করতে হবে বলে দেব’খন।”

“প্রমিস?”

“প্রমিস।”

কাকের ছানারা উড়তে শিখে দিব্যি নাদুসনুদুস হয়ে ঘরে ফিরল, তাদের জন্য ফের বাসা বেঁধেছিল কাকেরা। এই একবছর আড্ডা মেরে, গান-টান গেয়ে বিন্দাস কেটেছে ওদের। পরের মরশুমে ডিম পাড়ার সময় হতেই ফের কোকিলের বাসার খোঁজে বেরোল তারা। কিন্তু গেল কোথায় কোকিলেরা? তাদের পুরনো বাসা যে সব ভাঙা পড়ে আছে!

তন্ন তন্ন করে গাছপালা সব চষে ফেলে শেষে ধানক্ষেতের ধারে গিয়ে ওদের চক্ষু চড়কগাছ! ও হরি, দেখেছ কাণ্ড! শুধু ধানক্ষেত কেন? সরষে ক্ষেত, বেগুন ক্ষেত – গাঁয়ের সবকটা ক্ষেতের মাঝে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে কাকতাড়ুয়ার দল। আর বেছে বেছে কোকিলেরা গিয়ে বাসা বেঁধেছে তাদের গায়ে; কোনওটার কাঁধে, কারও বা ঘাড়ে, কারও মাথায়!

কাকেরা মোটেই ভীতু নয়। তারা যেখানে খুশি যেতে পারে, যত বড়ো সাহসের কাজ বলো করতে পারে, কিন্তু কাকতাড়ুয়ার কাছে ওদের সমস্ত জারিজুরি খতম; ওর ত্রিসীমানায় যায় না ওরা। সংবিধানে সেরকমই লেখা আছে যে! এখন কী করে কোকিলের বাসায় ডিম পাড়ে তারা?

মনের দুঃখে ফিরে এসে সবাই মিলে ইলেকট্রিকের তারে বসে গান ধরল -

মরি হায় রে হায়
এখন ডিম পাড়ি কোথায়
কোকিল শুনি করসে বাসা কাকতাড়ুয়ার ছায়
এখন ডিম পাড়ি কোথায়!
সুখে ছিলাম
ডিম পাড়িতাম কোকিলার বাসায়,
ও ভাই, কোকিলার বাসায়
আমার সে সুখ হরণ করল কেমন ও কাকতাড়ুয়ায়
এখন ডিম পাড়ি কোথায়!
কোকিল ছিল
বেজায় ভুলো বুদ্ধি ছিল না,
ওরে বুদ্ধি ছিল না।
এখন কোন উকিলে সেই কোকিলে করল সেয়ানা
এখন ডিম পাড়ি কোথায়!

সেই প্রথম আর সেই শেষ, কাকেদের করুণ গান শুনে সেই একবারই গাঁয়ের যত পশুপক্ষী 'আহা, উহু' করে উঠল। কারও কারও চোখের কোণটা একটু ভিজে এল, গলার কাছে একটু ব্যথা। কোথায় র‍্যাপ, কোথায় হার্ড রক! এ যে বাংলার বুক হু হু করা খাঁটি চিরায়ত সুর!

কাকেরা ভেবেছিল, কোকিলের বাসায় ডিম পেড়ে এসে গতবারের মতো নিজেদের বাসা ভেঙে দেবে। অনেকক্ষণ ধরে গান-টান গেয়ে ফিরে দেখল, এই ফাঁকে কোকিলেরা তাদের বাসায় ফের ডিম পেড়ে গেছে। মা-কাকেরা খুব যে অখুশি হল তা নয়। এক বছর ডিমে তা দিতে না পেরে, ছানাদের নিজের হাতে বড়ো করতে না পেরে কেমন খালি খালি লাগত তাদের। কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা দিতে বসে পড়ল ওরা।

পরদিন সবাই শুনল, গাছে গাছে কোকিলেরা ফের কুহু কুহু গান ধরেছে। সুরে সুরে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস, কান-মন শীতল হল সবার, মেলোডি ফিরে এল পৃথিবীতে।



কাকতাড়ুয়ার উপন্যাস (অসমাপ্ত)

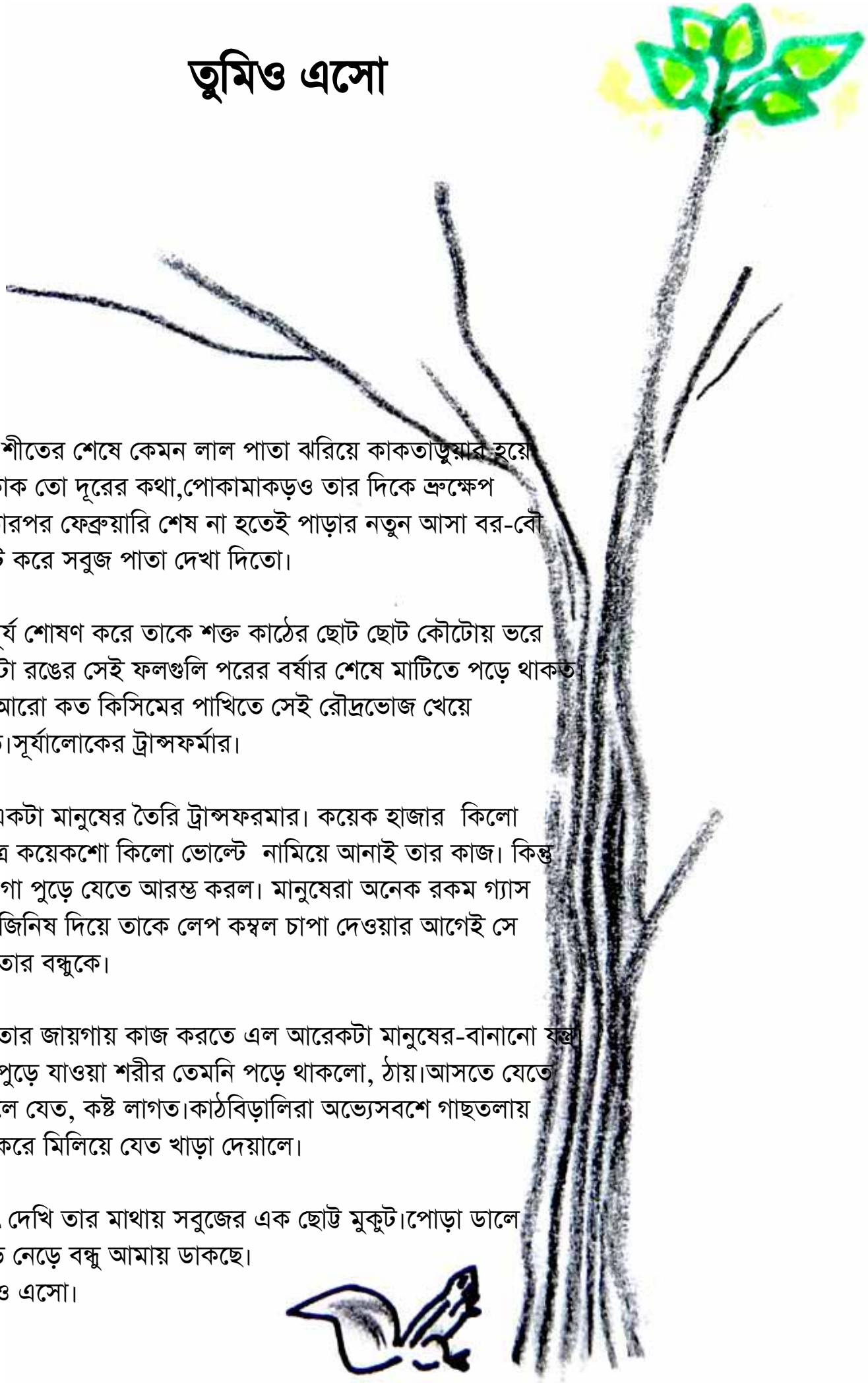


তারপর তো সেদিন এক কাণ্ড। রাত পৌনে দুটোয় গাঁজাখুরির মাঠে নিখিল ভারত বায়সবিতাড়ন সম্মেলন অর্থাৎ নিভাবাবিস-এর মহা সম্মেলন ছিল। এজেণ্ডা ছিল সারাদিন রোদে পুড়ে তারা যা কাক তাড়ায়, তার বদলে তারা পায় ছেঁড়া জামা এবং কেলে হাঁড়ি! এর প্রতিবাদে মিছিল এবং হরতাল হবে। তাদের দাবি, নতুন জামা চাই, আর প্রেশার কুকার। হাঁড়ির কি আর কোনো প্রেস্টিজ বা হকিন্স আছে!

তা ভালো, কিন্তু সম্মেলনের সময় দেখা গেল তাদের প্রধান সচিব অনুপস্থিত। খোঁজ খোঁজ!

(এই পর্যন্ত হয়েছে। সচিব ফিরে এলে বাকি উপন্যাস লেখা হবে।)

তুমিও এসো



বাদাম গাছটি প্রতি শীতের শেষে কেমন লাল পাতা ঝরিয়ে কাকতাড়ুয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কাক তো দূরের কথা,পোকামাকড়ও তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতো না তখন।তারপর ফেব্রুয়ারি শেষ না হতেই পাড়ার নতুন আসা বর-বৌ এর মত একটি দুটি করে সবুজ পাতা দেখা দিতো।

বাদাম গাছ ফের সূর্য শোষণ করে তাকে শক্ত কাঠের ছোট ছোট কৌটোয় ভরে রাখত।গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের সেই ফলগুলি পরের বর্ষার শেষে মাটিতে পড়ে থাকত। কাঠবিড়ালি,টিয়া, আরো কত কিসিমের পাখিতে সেই রৌদ্রভোজ খেয়ে ধন্য হয়ে চলে যেত।সূর্যালোকের ট্রান্সফর্মার।

তার পাশেই ছিল একটা মানুষের তৈরি ট্রান্সফরমার। কয়েক হাজার কিলো ভোল্টের থেকে মাত্র কয়েকশো কিলো ভোল্টে নামিয়ে আনাই তার কাজ। কিন্তু একদিন তার জ্বরে গা পুড়ে যেতে আরম্ভ করল। মানুষেরা অনেক রকম গ্যাস দিয়ে, ফেনার মত জিনিষ দিয়ে তাকে লেপ কম্বল চাপা দেওয়ার আগেই সে ঝলসে দিয়ে গেল তার বন্ধুকে।

সে তো চলে গেল,তার জায়গায় কাজ করতে এল আরেকটা মানুষের-বানানো যন্ত্র। কিন্তু আমার বন্ধুর পুড়ে যাওয়া শরীর তেমনি পড়ে থাকলো, ঠায়।আসতে যেতে তার দিকে চোখ চলে যেত, কষ্ট লাগত।কাঠবিড়ালিরা অভ্যেসবশে গাছতলায় এসেই তুড়ুক শব্দ করে মিলিয়ে যেত খাড়া দেয়ালে।

তারপর পরশু হঠাৎ দেখি তার মাথায় সবুজের এক ছোট্ট মুকুট।পোড়া ডালে নতুন সবুজ ফেকড়ি নেড়ে বন্ধু আমায় ডাকছে।
আমি এসেছি।তুমিও এসো।

বায়স-কোপ



জানালার পাল্লায় কাক বসলে মা ঠাকুমারা বরাবর যা করেন, সেদিন আমিও তাই করতে গেলাম, বললাম, হুশ, হুশ। কাকটা চোখ মটকে মুখ ঘোরাল, উড়েও গেল না, ভয়ও পেল না। এবার আমি যেমনি হাত বাড়িয়ে আবার হুশ, হুশ বলতে যাবস, কাকটা এক আঙুল তুলে বলে উঠল, "অ্যাই, অ্যাই, চুপ, একদম চুপ, কাক-এ ভয় দেখাচ্ছ কাকে? তোমার মা-ঠাম্মা হুশ বললে, আমরা উড়ে যাই ঠিকই, কিন্তু ভয়ে নয়, ওঁরা গুরুজন, ওঁদের মান্যি করেই উড়ে যাই। তাছাড়া তুমি কাকতাড়ুয়াও তো নও, যে তোমাকে ভয় পেতে হবে। সবে তো ক্লাস থ্রিতে পড়ো, নেহাতই পুঁচকে ছেলে, তুমি হুশ, হুশ বললেই উড়ে যাবো, এমনটা মনেও করো না। আমরা দু'বার ডাকলে তোমাদের কাকা হয়, হয় না?

তার মানে আমরাও কি তোমার একধরনের কাকা হই না? এটুকু কৃতজ্ঞতা তোমার থেকে আমরা আশা করতেই পারি, নয় কি?"

কাকের কথায় আমার খুব রাগ হল, আচ্ছা করে দুকথা শুনিয়ে দেবার জন্যে বললাম, "যত বড়ো ঠোঁট নয় তোমার, তত বড়ো কথা? তুমি আমার কাকা হবে? আমার কাকা আমাকে কত ভালোবাসে, জানো? কত লেখাপড়া জানে, জানো?"

কাকটা খা খা হেসে উঠল, বলল, "তোমার কাকা তোমার পেছনে লাগে না? বলে না, ক্লাস থ্রি খায় ব্রি? এরপর ক্লাস ফোর-জুতো চোর"

আমি একটু থতমত খেলাম, এ কথাগুলো কাকটা জানল কী করে? বললাম, "তাতে কী? সে তো মজা করে বলে, সে কি সত্যি নাকি? কিন্তু তুমি কী করে সে কথা জানলে"?

কাকটা ঘাড় দুলিয়ে বেজায় বোদ্ধার মতো ঘাড় চুলকোল, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, "তুমি কি ভেবেছিলে, তোমাদের কাকা-ভাইপোর কথা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না! হেঃ, তোমরা নিজেদের বিশাল বুদ্ধিমান আর আমাদের এত তুচ্ছ ভাব বলেই তোমাদের এই দশা। আচ্ছা কলসির তলানি জল খাবার উপায় তোমাদের কে শিখিয়েছিল? সেই যে সেই কাকের গল্পটা, পড়োনি?"

গল্পটা পড়েছি বৈকি, আর সেই কাকের কথা মনে করে আমি বেশ একটু দমে গেলাম, বললাম, "তাতে কী, অমন বুদ্ধির গল্প তোমাদের থেকে শেয়ালদের অনেক বেশি, শেয়ালের গল্পও অনেক পড়েছি।"

কাকটা হে হে করে হেসে বলল, "যাক, কাক আর শেয়ালের বুদ্ধি যে তোমাদের থেকে কম নয়, সেটা নিজে নিজেই স্বীকার করে ভালোই করলে। আমাকে বেশি বকতে হল না। আচ্ছা, ইংরিজি পড়ো তো, কাকের ইংরিজি জানো?"

আমি ফুঃ করে মুখে একটা শব্দ করে বললাম, "এ আর এমন কি শক্ত, ক্রো মানে কাক।" কাকটা আমার বাহাদুরিকে গুরুত্বই দিল না। বলল, "ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারবে যে আমরা কাকেরা তোমাদের সব দিক খেকেই ঘিরে রেখেছি। ক্রমের মধ্যেও ক্রো মানে আমরাই রয়েছি, হে হে, এটা কি লক্ষ করলে? বিক্রম, পরাক্রম, আক্রমণ, মন দিয়ে দেখ এ সবের একদম মাঝখানে রয়েছি আমরাই। ক্রমাগত মানে কাকের মা এসেছেন, একথাটা তোমরা মানবে না জানি, কিন্তু আমার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে যে ঘোল খেয়ে যাবে, সেটাও বলে রাখছি, কারণ তক্র মানে ঘোল। ব্যাঁকা কথায় মানুষদের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত, তাই তোমাদের কোন বক্রোক্তিতেই আমরা কিছু মনে করি না। আমরা জলে বাস করি না কিংবা কুমীরের সঙ্গে লড়াইও করিনা, কিন্তু তাও তোমরা কুমীরের নাম দিচ্ছে নক্র। তোমাদের মতিগতি বোঝা ভার।

"আচ্ছা, একটা কথা বলতো, আমাদের ওপর তোমাদের এত রাগ, আবার এই কাকদের নিয়েই তোমাদের নানান বায়নাক্কা। কাক ডাকলে গাছ থেকে তাল খসে পড়ে, এমন আমি কোনদিন দেখিনি, কিন্তু কাকতালীয় ঘটনার নানান ঘনঘটা তোমরাই বানিয়ে ছেড়েছ। তুমি এখনও ছোট্ট তোমার এখনও গজায়নি, তোমার বাবা কাকার কিন্তু কাকপক্ষ আছে, তার মানে জানো, জুলফি! আমরা তো আর তোমাদের মতো বিছানায় আরাম করে ভোঁসভোঁসিয়ে ঘুমোই না, আমরা ঘুমের মধ্যেও সতর্ক থাকি, তাকে তোমরা বলো কাকনিদ্রা। কাকজ্যোৎস্নার রাতে, তোমরা কত কী দেখে যে ভয় পাও, ভাবলে আমরা হেসে কুটোপাটি হই। শীতকালে কনকনে ঠাণ্ডায় তোমরা যখন চানের ঘরে ফাঁকি দাও, তোমার ঠাকুমা বলেন না, বালু কাকচান করে এলি? হে হে হে। তোমরা শহরের ছেলে বড় বড় দীঘি দেখইনি, দীঘির পরিষ্কার স্বচ্ছ জলকে কাকচক্ষু বলে, তা জানো? নিমফলকে তোমরা



কাকফল বলো, আর বকফুলের গাছকে বলো কাকশীর্ষ। হে হে হে, তারপরেও তোমরা কাক তাড়াও? ও হ্যাঁ আরেকটা কথা, কোনদিন কাকতাড়ুয়া দেখেছ?"

ক্রমান্বয়ে কাকের এত কথায় আমি বেশ দমে গিয়েছিলাম, ঘাড় নেড়ে বললাম, না। তখন কাক বক্র হাসিমুখে আবার বলল, "শহরে তোমাদের মতো ছেলেরা থাকতে কাকতাড়ুয়ার দরকার হয় না। সে সব দেখা যায় গ্রামের দিকে ক্ষেত-জমিতে। আর দেখা যাবে "জয়ঢাক" পুজো সংখ্যায়, ছড়ায়-ছবিতে দেদার কাকতাড়ুয়া। তোমার কাকার ল্যাপটপে, কিংবা বাবার পি.সি.তে, দেখে নিও, পড়ে নিও। পি.সি. বলতে মনে পড়ল, আমাদের কাকের ভাল নাম বায়স, আর এই BI OS ছাড়া তোমাদের কম্পিউটারের সব কারিকুরি খতম, হে হে হে, তোমার কাকাকে জিগ্যেস করে নিও, কথাটা বিশ্বাস না হলে। আর পুরোনো দিনে দাদু ঠাকুমাদের জিগ্যেস করো, তখন সিনেমাকে বলতো বায়োস্কোপ, যদিও বায়সদের সিনেমা হলে ঢোকার কোন স্কোপ তখনও ছিল না, আজও নেই।

যাকগে, যে কথা বলছিলাম, কাকতাড়ুয়া কিন্তু কাকদের তাড়ানোর জন্যে নয়, বরং পুঁচকে পুঁচকে পাখিদের ভয় দেখানোর জন্যে, চড়াই, শালিক, বুলবুলি, ঘুঘু, এইসব। ওরাই তোমাদের শস্যের দানা-বীজ খেয়ে ফেলে, ওদের তাড়ানোর জন্যে কাকতাড়ুয়া খাড়া করা হয়। আমরা ক্ষেত-জমি, ফাঁকা জায়গার বড়ো একটা কাছ ঘেঁষি না, কাজেই আমাদের কাকতাড়ুয়ার কেলে হাঁড়ি মাথায়, গোল্লা চোখমুখ দেখলে, হাসিই পায়, ভয় পাওয়া তো কা কস্য পরিবেদনা। ক্রোম্যাগনন থেকে ক্রোমোজোমের ক্রমোন্নতিতে তোমরা হোমো স্যাপিয়েন হয়েছ, একটু আধটু হোম-ওয়ার্ক করো, আমাদের দেখলেই হুস হুস করার আগে, আমাদের who's who ভালো করে জেনে নাও। হে হে হে"। এরপর কাকটা আর বসল না, উড়ে গেল মাঠ পেরিয়ে গাছপালার দিকে।



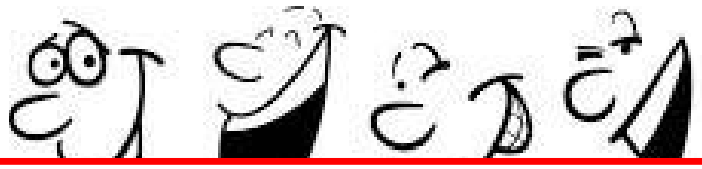
কাথিন-কথা

বহুদিন আগেকার কথা। তখন গাছপালা এতো কম ছিল না। পাখপাখালি অনেক অনেক ছিল। নদীতে জল ছিল অনেক। মাছেদের দল খেলা করত মনের সুখে ঝাঁকে ঝাঁকে। তখন কাকতাড়ুয়াদের এমন নাম হয়নি। তাদের নামছিল কারুকৃত। তারা হেঁটে চলে বেড়াত কাঠবিড়ালি খরগোশ আর পাখিদের সাথে পাল্লা দিয়ে দোলও খেত গাছের ডালে, যেন উড়ছে। এমনি করে সুখেই দিন কাটছিল। তারপর মানুষেরা সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে ছেয়ে ফেলল গোটা পৃথিবী। যা খুশি তাই হুকুম চালাতে শুরু করল। জংগল গেল ঘুচে। পাখপাখালিও এল কমে। এমনি দিনে কারুকৃতদের ধরে নিজেদের হিংসুটে মন নিয়ে মানুষ তাদের স্থবির বানিয়ে দিল। একপায়ে একঠায়। নাম দিল কাকতাড়ুয়া। এখন শুধু বছরে একদিন শীতের রাতে ওরা চলাফেরা করার শক্তি ফিরে পায়। মনে মনে সূর্যদেবতার কাছে প্রার্থনা করে যাতে আবার গাছেদের ভিড়ে ভরে যায় পৃথিবী। সেইদিন তাদের অভিশাপ ঘুচে যাবে। আবার তারা আগেকার মতো কারুকৃত হয়ে উঠবে।



কাকতাড়ুয়াদের গ্রহ কাথিন এ মানুষদের নিয়ে এই প্রাচীন অরণ্যপ্রবাদটিই আছে। তাতে বলা আছে সেই একদিন তারা মানুষের গ্রহে চলে যায়। একদিনের মধ্যেই সভ্যতা গড়ে, আগুন থেকে রকেট সব তৈরি করে ও দিনের শেষে ফিরে আসে। কাথিন গ্রহের এই বছরের তিন লক্ষ বছর লম্বা সে দিনটায় এখন বিকেলবেলা।

(প্রাচীন বংগীয় লোককথা অনুসারে)



কাকফুলকথা

-একটা কাক বেশি খেয়ে ওজন বাড়তে বাড়তে ফুল হয়ে গেছিল। ফুলটা ভারী সুন্দর। নাম ক্রোটন

-ক্রোটন আবার ফুল হল কবে থেকে? ক্রোটন তো পাতাবাহার!

–ফুলরা ওকেই ফুল বলে। তাই ওকে ফুলস ফুল নামে ডাকা হয়।

–গাছকে যে ফুল বলে- ফুল
গাছের গায়ে যে দোলে-ফুল
যার থেকে ফল ফলে- ফুল
নাইনের পেন্টুল- ফুল
বেজায় বিশ্রী-অ-ফুল

কাক প্রবচন





নানাদেশে নানা রূপকথা আছে। হ্যাংলাপেটুস্কা দেশে এই রকম। কর‍্যাকোতৎজা বুড়ি উড অ্যাপেল গাছের নিচে বসে ভেড়ার লোম ট্রিম করছিল। সেই সময়ে একটা কাক ঠোকর মেরে ফেলে দিল একটা বেল। পড়বি তো পড় বেলটা বুড়ির পিঠে, মোক্ষম কিল। বুড়ি ওপর দিকে একবাট্টি চেয়েই চিৎকার কোকিল কোকিল। সেই থেকে কাক হয়ে গেল কোকিল। সবাই না। যে কাকগুলো বেল বিদ্বেষী তারা কোকিল। যে কাকগুলো ঠুকরে ঠুকরে বেল খায় কোবেল, হ্যাংলাপেটুস্কানে কোবাল্ট বলে। যেগুলো খ্যা খ্যা করে কেবল খাই খাই, ওরা খাক হ্যাংলাপেটুস্কানে, আমরা বলি কাক।

কাগ্‌গণিত



১। ক্রোবাবিলিটি

বন্দনা, কাকতাড়ুয়ার কাক হয়ে উড়ে যাবার প্রবাবিলিটি কষে দেখা।
(প্রসঙ্গত, বন্দনা একজন সাংঘাতিক অংকবীর। সে অঙ্ক থেকে হত্যাকারী লেজার বিম বের করবার কৌশল আবিষ্কার করেছে (সম্পাদকীয় সংযোজন)
-সে তো করছিলাম। কিন্তু ভগ্নাংশ না ত্রৈরাশিক>? ডিসিশান পেন্ডিং
-শুরুটা এই। ধরি ওমেগা হল কাকতাড়ুয়া পপুলেশান। তার সিগমাক্ষেত্র 'খ'. ধরি ১ হইতে ২৬৮ হইল বিভিন্ন জাতের কাকের রেঞ্জ। এইবারে বাকিটা কর।
-উত্তর হল, 2 3 4 / 7 8 1
-হুম কষে দেখাও।
-ভুল হলে বল। কোথায় ভুল?
-বলছি।
উপপাদ্যঃ কাক সর্বদা কাকতাড়ুয়া হইয়া উড়িয়া যায়।
প্রমাণঃ
কাক যদি এক্সপ্যানশান থিওরেম দিয়ে লম্বা হয় তবে–
প্লাস এক্স এন্ড মাইনাস ফাই।

মাথাতে ইনডেক্স টি আর কাই।
তারা দুজন মিলে শূন্য হয়।
এর ভ্যালু ওর চেয়ে ক্ষুদ্র নয়।
সেইটে ধরে নিলে, লেবেগ কয়।
কল্পনারাশি ষোলো সুনিশ্চয়।
তাহারে ইনটি করিলে গ্রেট।
রেজাল্ট পাবে সাত স্কোয়ার
নেট।
এ উপপাদ যদি সঠিক হয়।
তোমার উত্তর কারেক্ট নয়।
মহলানবিশের বর্গডি।
প্রমাণ করে তাকে, কিউ ই ডি।



২। কাকগণনাসূত্রম



কাক ছড়ালে ভাতের অভাব হয় না। ধরা যাক শুরুতে একটা কাক। ঠোঁটে ঠোঁটে ভাত ছড়াতে শুরু করল। ভাত ছড়ায় ডাইনে ভাত ছড়ায় বামে ভাত ছড়ায় পিছে ভাত ছড়ায়ে সামনে। উর্ধ নেই অধ: নেই। দু মাত্রার ছাঁদ। ভাত কাছে বেশি দূরে কম। প্রতি ভাত হয়ে গেল এক একটা স্বতন্ত্র কাক। কোথায় কত কাক বলে দাও গসিয়ান।

৩। ক্রোয়ান্টাম তত্ত্ব

কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে, উচ্চ তাপমাত্রায় (যেমন এখনকার গরমে) কাক আর কাকতাড়ুয়া আসলে একই জিনিস। একে GUK থিওরি বলে। শুরুতে একটা কাক ছিল। তারপর কাকের বাসা এক্সপ্যান্ড করতে শুরু করতে কাক ভেঙে হল কাক আর কাকতাড়ুয়া।

বিঃ দ্রঃ →কাকগণিতের যাবতীয় আবিষ্কারের কপিরাইটঃ
ডঃ কাক্কেশ্বর কুচকুচে। উপরে চিত্র দেখুন)

কার্টুন



কাকতাড়ুয়ার শহর সংস্করণ

আজ তবে এইটুকু থাক
বাকি কথা পরে হবে
প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ ঝিং ঝিক ঝিং ঝিক



“কাকতাড়ুয়ার খাতা” জয়ঢাক পত্রিকার হোয়াট্‌স্‌ অ্যাপ গ্রুপ-এর “কমন ক্রিয়েটিভ প্ল্যাটফর্ম” উদ্যোগের প্রথম নিবেদন।**সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।**
যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com.

বিটটুর বন্ধুরা

গল্প - মালিনী

ছবি - অংশুমান

আমাদের বাড়িতে যে বিটটু আছে, সে ছোট থেকে আবদার করে - একটা কুকুর পুষে দাও, একটা হাঁস পুষে দাও, অন্তত একটা শুয়োর পুষে দাও। তার মত আরো অনেক বিটটুদের কথা ভেবে এই বই লেখা ।

বড়োরা তো আর বিটটুদের আবদারগুলো বোঝে না।

আমলকি

বিটটুকে পানু আমলকি গাছের যে বীজটা দিয়েছিল
বিটটু সেটা বড় আমগাছটার পাশে পুঁতেছিল।
দুদিন জলও দিয়েছিল।
তিন দিনের দিন - ঠিক ওইখানেই একটা কালো-খয়েরি
থুপথুপে কুকুরছানা পেয়েছে।
বিটটুর বাড়িতে সবাই খুশি।
শুধু কুকুর ছানার নাম বিটটু কেন যে আমলকি রাখল
কেউ বুঝতে পারছে না।

হুঁ হুঁ বাবা!! বিটটু কাউকে বলবেও না।

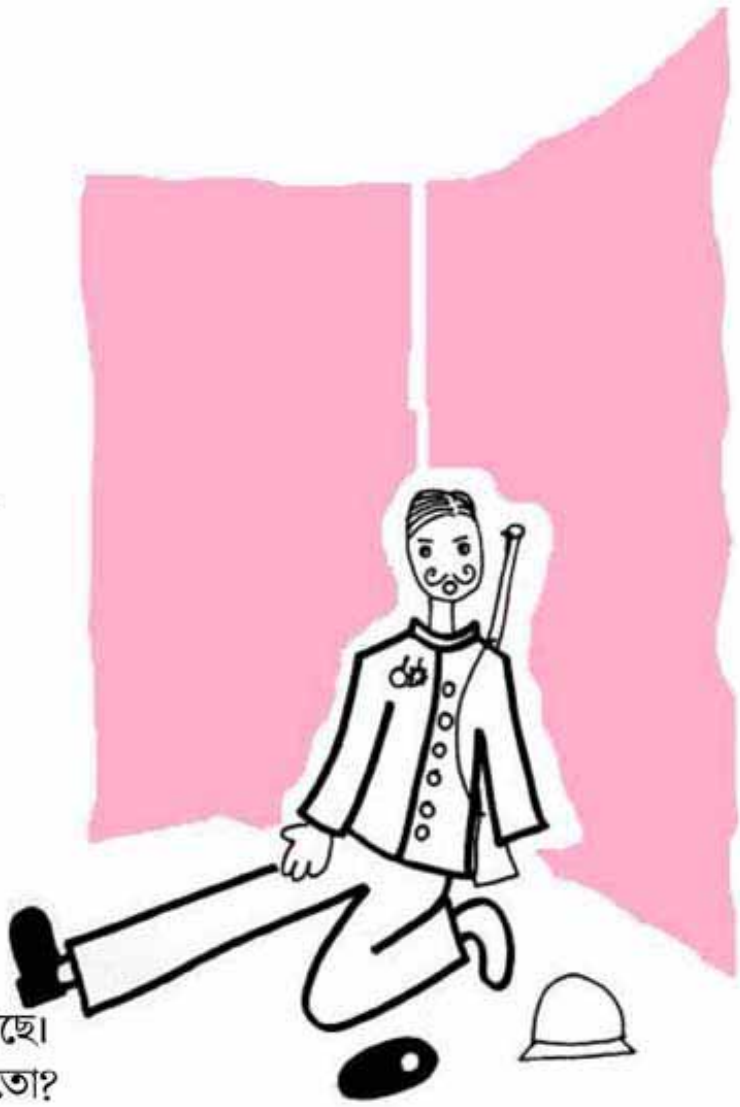


সেপাই মামা

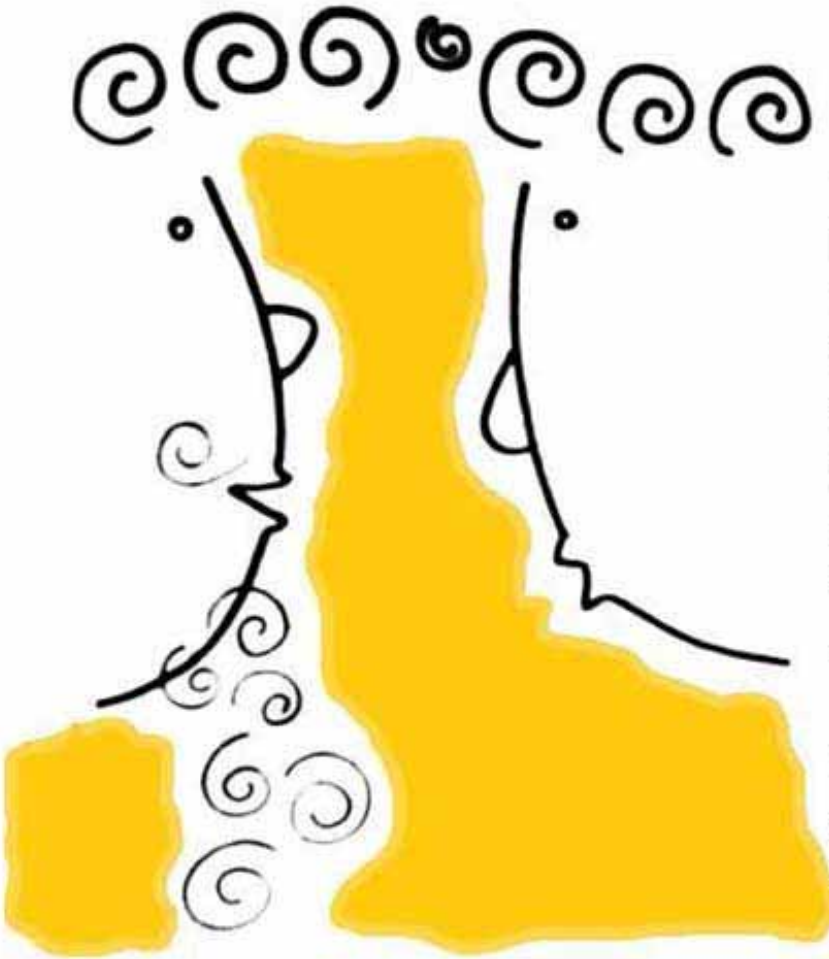
রাতে একা একা শুতে বিটটু খুব ভয় পায়।
কিন্তু সেপাই মামা থাকলে সে কাউকে ডরায় না।
সেপাইমামা অনেক যুদ্ধু টুদ্ধু করেছে সারা জীবন।
তাই বাঁ হাত আর নাকটা ভাঙা।
তাতে কী?

আমলকি সেদিন সেপাই মামাকে টেবিল থেকে ফেলে দিয়েছে।
বাঁ পাটাও ভেঙে দু'টুকরো!!

বিটটু আমলকিকে খুব বকেছে।
ভোররাতে কে যেন খুট খুট করে ঘরময় হাঁটছিল-
নিশ্চয় সেপাইমামা।



আরে!! সকালে সেপাইমামার পা টা আবার জুড়ে গেছে।
দাদুভাই বলল, কী দাদু, সেপাইমামা চলতে পারছে তো?
দাদুভাই কী করে জানল?



পানু

পানু সব জানে।
বিটটুর স-ব থেকে ভাল বন্ধু।
পানু মুখেমুখে হিসেব করে-ইশকুলে না গিয়েও!
কোনটা কী গাছ
কোন গাছে কোন ভূত থাকে
বেড়ালকে মারলে কোন দেবতা রাগ করেন
হাত কেটে গেলে কোন পাতা লাগাবে
কী করে উড়ন্ত ফড়িং ধরতে হয়
এসব পানুর থেকে ভাল কেউ জানে না।

পানু কাল বিটটুকে চুপিচুপি একটা শেকড় দিয়েছে।
রাতে শোবার আগে দাড়িং দাড়িং দাড়িং বলে
গালে লাগালে, সাতদিনে রাম শিংএর মত দাড়ি!

হুঁ হুঁ বাবা, তখন দেখব কেমন করে দিদি
বিটটুর মাথায় চাঁটি মারে।

গ্যাংটক

গ্যাংটককে বিটটু ইশকুল থেকে ফেরার পথে পেয়েছিল।
একটা ডোবার ধারে বসে গাল ফুলিয়ে ডাকছিল-
গ্যাং গ্যাং গ্যাংগোর গ্যাং।
ইশকুলের খাবার জলের বোতলে ভরে এনে বিটটু চৌবাচ্চায় ছেড়ে রেখেছিল।
দিদি দেখে ইইইই বলে দৌড় দিয়েছে।
বিটটুর খুব রাগ হয়েছে।
ব্যাং বলে কি মানুষ নয়?

গ্যাংটক নামটা দাদুভাইয়ের দেওয়া।
বিটটুর খুব পছন্দ।

তাই দাদুভাই এর জন্য বিটটু একটা গায়ে ছোপ ছোপ হেলে সাপ খুঁজছে।

তোমরা দেখতে পেলে জানিও।



গ্যাং গপ



সাংঘাতিক কান্ড!!
বিটটুর এক বছরের ভাই এর নাম ডাকু।
ডাকুর দুটো দাঁত।
তাই দিয়ে সে সবকিছু চিবিয়ে দেখে।
গ্যাংটককে হাতের কাছে পেয়ে সোজা মুখে চালান।
রাজুদাদা দৌড়ে এসে না বার করলে হয়েছিল আরকি।
গ্যাংটককে চিৎপাৎ দেখে বিটটু কেঁদে আকুল।
আর মা শুনে ছুটে এসে শুধু কিনা ভাইকে আদর করছে!!
একবারও বকেনি !!

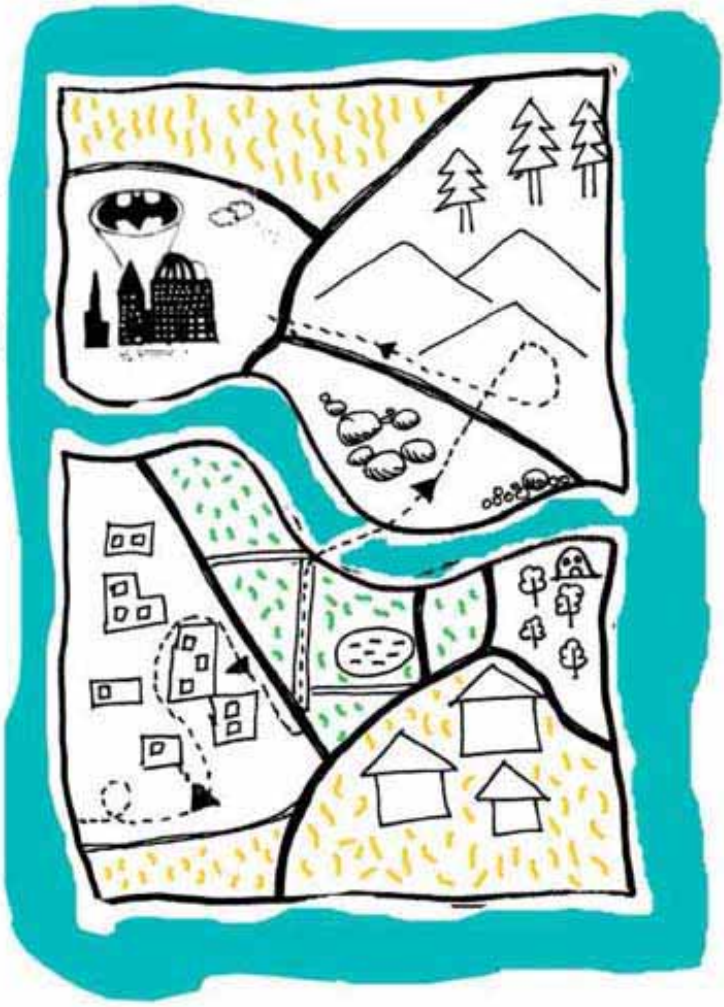
বিটটুর রাগ দেখে কে!

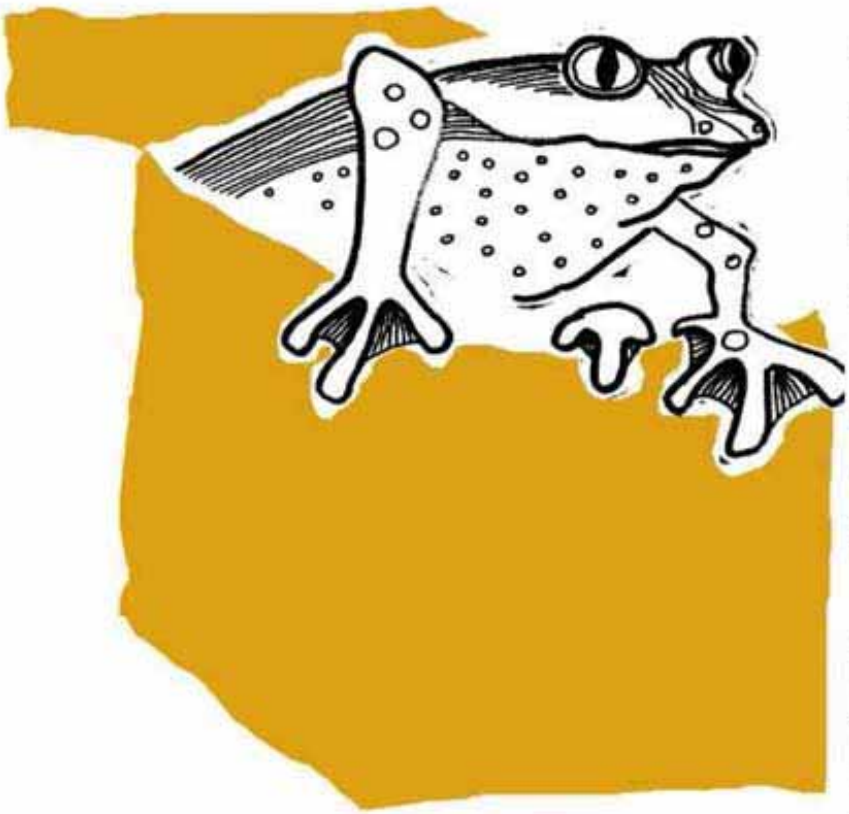
গথাম সিটি

বিটটু ঠিক করে ফেলেছে - আর সে এখানে থাকবে না।
এ বাড়িতে কেউ তাকে ভালোবাসে না।
গ্যাংটকের জন্যও কারও ভাবনা নেই।
সে গথাম সিটি চলে যাবে - সেখানেই তার হিরো থাকে।

এ কথা সে কাউকে বলেনি,
শুধু পানুকে বলেছে।
পানু তাকে একটা ম্যাপও দিয়েছে।
শুধু ম্যাপ-এ গথাম সিটি পাওয়া যাচ্ছে না।

তোমরা কেউ জানো?





ব্যাংকক

স্কুলের ব্যাগে গ্যাংটক
পানুর ম্যাপ
সেপাই মামা
রং এর বাক্স -
এ সব দেখে দাদুভাই ঠিক বুঝতে পেরেছে।

পরদিন মা বিটটুর জন্য পায়েস করেছে।
পড়ার টেবিলে ফ্যানটমের কমিক্স।
বিটটু একটু চিন্তায় পড়েছে।

বিকেলে দাদুভাই মুচকি হেসে একটা জুতোর
বাক্স রেখে গেছে,
ওপরে লেখা - ব্যাংকক।
বিটটু দারুণ খুশি!!

এবার বুঝি আর গথাম সিটি যাওয়া হল না।



চলো যাই যাদুঘরে

ডক্টর দিলীপ রায়চৌধুরী

ডক্টর দিলীপ রায়চৌধুরীর নাম কল্পবিজ্ঞানপ্রেমী বাঙালি পাঠকের অজানা থাকবার কথা নয়। গতশতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে এই তরুণ বৈজ্ঞানিক বেশ কিছু অসামান্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনি রচনা করে আশা জাগিয়েছিলেন। অকালমৃত্যু তাঁকে আমাদের মধ্যে থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। সঙ্গের লেখাটি কিন্তু কল্পবিজ্ঞান নয়, তাঁর লেখা অন্য একটি অসাধারণ নিবন্ধ। প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় তরুণতীর্থ পত্রিকায় ১৯৭০ সালে।লেখাটির সন্ধান ও প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য আমরা তাঁর কন্যা শ্রীমতী যশোধরা রায়চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ

ছুটির দিনে কোলকাতা শহরে যারা বেড়াতে বেরোও অথবা বাইরে থেকে কোলকাতায় যারা বেড়াতে আসো তারা যাদুঘর দেখতে যাওয়ার নামে প্রায়ই নাক সিঁটকোও। হয়তো বাড়ির খুব ছোট ভাইবোনদের পাল্লায় প'ড়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাদুঘর যেতে হয় কিন্তু সব সময়েই মনে হয়, এর চেয়ে বুঝি দু'ঘন্টা সিনেমা কি সার্কাসে গেলেই ভালো ছিল। আমার কোলকাতার বন্ধুদের আমি চিনি, তারা যাদুঘরকে অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়েদের আড্ডাঘর মনে করে।

সত্যি বল্‌তে কি যারা লেখাপড়া কিছুই জানেনা, তাদের যাদুঘরে গিয়ে পাথর আর ম্যমি দেখেই ফিরে আসা হয়। কিন্তু যাদুঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালে অনায়াসেই কারো একটি গবেষণা প্রবন্ধ তৈরী হয়ে যেতে পারে, অবশ্য মগজে যদি কিচ্ছু থাকে! ধরো জীবজগতের বিবর্তনের কথা- যাদুঘরে পেছনের দিকে দোতলায় একটি ঘরে সব রকম মৃতপ্রাণীর দেহ সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা প্রায় সময়ই বলে থাকি মানুষ হচ্ছে বানরের বংশধর (কারো কারো বেচাল দেখলে এই বলে গালাগালিও দিই) কিন্তু কিভাবে আমারা শাখামৃগত্ব থেকে বর্তমানে সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হলাম, তার একটা ইতিহাস আছে।

আমাদের পুরানে আছে, সৃষ্টির আদিতে সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। কথাটায় হয়তো খুব বেশি ভুল নেই, কারণ জীবনের সৃষ্টির আদি- উপকরণ হচ্ছে জল। কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে এক বিশেষ রাসায়নিক অবস্থায়

পৃথিবীর আদি প্রাণ এককোষী জীব সৃষ্টি হয়েছিল। সেই এককোষী জীব থেকে একদিকে গাছপালা তথা উদ্ভিদজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে বুকে হাঁটা সরীসৃপ থেকে ধীরে ধীরে উভচর, খেচর, সবশেষে বর্তমান পৃথিবীর প্রাণী জগতের অভ্যুদয় ঘটেছে। যাদুঘরের ঐ বিশেষ ঘরটিতে এই ইতিহাসের একটি সুন্দর ছবি পাবে অন্তত, গত শেষ কয়েক হাজার বছরের।

এই ইতিহাসে একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ করার আছে। পরিবেশের, আবহাওয়ার তফাৎ ঘটলেই প্রাণীর আচার আচরণের, কাজ করার ধরণধারণের তফাৎ ঘটে যায়। দেখলেই বোঝা যায় যখন জলে ভর্তি ছিল, তখন বুকে হাঁটা সরীসৃপদের চ্যাপ্টা পায়ে জল কেটে এগোনোর জন্য লম্বা ল্যাজের দরজার ছিল। ক্রমে জল যখন শুকিয়ে এল, তখন ডাঙায় চলতে চলতে সামনের পা দুজোড়া অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল এবং এই দুটোই আমাদের এখনকার হাতের কাজ চালাচ্ছে। কাজ এবং পরিশ্রম করার ধরণের উপরও দেহের গঠন অনেক নির্ভর করছে। বানর জাতীয় প্রাণীর হাতগুলি লম্বা লম্বা, মাংসপেশীর উন্নতি আমাদের মতো এমন কেন্দ্রীভূত নয়, তার কারণ গাছে গাছে ঝুলবার ফলে এরকম হতে বাধ্য। কিন্তু ক্রমে যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করা গরিলা শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রানীদের মধ্যে চালু হয়ে পড়ল এবং পায়ের জোরে হাঁটা শুরু হল, তখন হাতের দৈর্ঘ্যও কমে গেল এবং মাংসপেশী ভাগে ভাগে পুষ্ট হয়ে আমাদের বর্তমান পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে এল। এই সঙ্গে সঙ্গে মস্তিকও পুষ্ট হতে থাকে এবং চিন্তা করবার ক্ষমতাও স্থুল থেকে সূক্ষ্ম হতে আরম্ভ করল।

এই হল সংক্ষেপে আমাদের সমাজ প্রগতির আদিকথা। এখন যাদুঘরে গিয়ে, এই কাঠামোয় রক্তমাংসের প্রলেপ লাগানোর ভার তোমাদের উপরে।

বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ঐক্যের কথা উঠলে অনেকে খুব সহজভাবে স্বীকার করতে চাইবে না। কারণ সাপ থেকে ব্যাঙের উৎপত্তি হয়েছে কি ছাগল থেকে ঘোড়া'র উৎপত্তি এরকম কথা মেনে নেওয়া বড়ো কঠিন। প্রাকৃতিক বাছাই'এর মধ্যে দিয়ে কোনও বিশেষ প্রাণীর কোনও একটি বিশেষ জাত টিকে আছে এটা যদি বুঝতে পারা যায় তখন প্রশ্ন ওঠে পৃথিবীর চেহারা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণীর ভেতরে বদল হল কি? স্তন্যপায়ী জীব সরীসৃপদের মধ্য থেকে কী করে উঠে এলো।



একটা কথা স্মরণ করে রাখতে হবে যে, এখনকার অধিকাংশ প্রাণীই, লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে সব প্রাণী পৃথিবীর বুকে চরে বেড়াত ঠিক তাদের বংশ থেকে জাত নয়। এমন সব প্রণী এদের মাঝখানে ছিল যারা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। যদি তাদের দেহাবশেষ খুঁজে না পাওয়া যেতো তবে এই যুক্তি প্রমাণ করা কঠিন হতো। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা ক্রমেই মাটির তলা থেকে বিভিন্ন জন্তুর পাথর হয়ে যাওয়া দাঁত, হাড় অথবা দেহের ছাপ উদ্ধার করা যাচ্ছে আর এই বিভিন্ন জন্তুর মধ্যেকার ফাঁক ক্রমেই ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই সব পাথরের গায়ের অবশেষকে ইংরেজিতে বলে f o s s i l ;

আরও আশ্চর্যের কথা এবং মানুষের পক্ষে ভরসার কথা এই যে বৈজ্ঞানিকরা এই পাথরের বয়স নির্ণয় করতেও সক্ষম হচ্ছেন। নিশ্চয়ই জানো, রেডিয়ম বা ওইরকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে সব সময় রশ্মি নির্গত হচ্ছে এবং অনবরত রেডিয়ম বদলে অন্য মৌলিক পদার্থ হয়ে যাচ্ছে। এখন বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে দেখছেন সব তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটা বিশেষ অংশ (ধর, অর্ধেকটা) খরচ হয়ে অন্য পদার্থ হয়ে যেতে একটা বিশেষ সময়

লাগে। মাটির তলা থেকে যে পাথর পাওয়া গেল, তার মধ্যে কোনও একটি বিশেষ তেজস্ক্রিয় ধাতব পদার্থের পরিমাণ যদি আমরা জানতে পারি এবং তার অর্ধেক ক্ষয়ে যাওয়ার সময় যদি আমাদের জানা থাকে তবে আমরা অনায়াসেই অঙ্ক কষে সেই পাথরের বয়স বার করতে পারব।

দেখা গেছে, এইভাবে পদার্থ বিজ্ঞানীরা ফসিলের যে বয়স বলছেন এবং ভূবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানীরা যে সময়কার প্রাণীর ফসিল বলে ওটা ঠিক করছেন, তা অধিকাংশ সময়েই মিলে যায়। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম জীবনের সাড়া জেগেছিল। নিম্নস্তরের গাছপালা সেই আদিম যুগে কতবার কতরূপে বদলিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অসংখ্য জীবশ্রেণী আবিভূর্ত হয়েছে, তারপর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

প্রথম ফসিল যবে আবিস্কৃত হয়েছিল, তারপর থেকে পৃথিবীর ইতিহাস আদিম যুগ থেকে প্রাণীর উৎপত্তি অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম যুগ ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। এই সময় দু'টো বিরাট পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে। ট্রিলোবাইট



জাতীয়(t r i l o b i t e s) প্রাণী এই রকম সময়েই আবির্ভূত হয়ে তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এমনি সময়েই পৃথিবীর প্রথম মাছ পৃথিবীতে দেখা গেল। (মনেও ভেব না যে এখনকার ইলিশ মাছ তাদের বংশধর) এই যুগের প্রায় শেষাশেষি উভচর প্রাণী, সরীসৃপ তারপর উচ্চতর গাছপালা (ফার্ণ জাতীয়) সৃষ্টি হল।

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হল এ সম্পর্কে আজও কোন সঠিক ধারণায় আমরা পৌঁছতে পারিনি কিংবা সবচেয়ে আদিম প্রাণীর দেহাবশেষ আজও আমরা পাইনি। জীবনের উৎপত্তির সময়ে পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা যদি আমরা কল্পনা করি তবে ভাবতে হবে চারিদিকে ধূ ধূ মরুভূমি রয়েছে, আগ্নেয়গিরি থেকে ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। লাভায় মাঠঘাট ভেসে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প তরল হয়ে সমুদ্রের সৃষ্টি হল কিন্তু বাতাসে

বেশি অক্সিজেন নেই। এ ধারণা আমরা করেছি কারণ সে যুগের যে সব পাথর আমরা চিনতে পেরেছি তাতে খুব কম পরিমাণেই অক্সিজেন সংশ্লিষ্ট আছে। এখনকার বাতাসের অক্সিজেন নিশ্চয়ই সবুজ গাছপালার প্রশ্বাস থেকে জন্মেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পরিবর্তিত হতে থাকার ফলে জৈব পদার্থগুলি কোনও একসময় সৃষ্টি হয়েছিল। এই জৈব পদার্থগুলি মাটির মধ্যস্থতায় খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম সাড়া জাগিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে ভাইরাস জাতীয় কয়েকটি জৈব পদার্থ (যাদের ঠিক প্রাণী বলা যায় না।) অন্য জৈবপদার্থের সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং বোধহয় এইরকম জীবই প্রথম পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল। প্রথম দিককার জীবন জলেই উৎপন্ন হয়েছিল এবং অক্সিজেন ব্যতিরেকেই বাঁচত। এখনকার বহু এককোষী জীব যেমন অক্সিজেন ব্যতিরেকে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং নিজেরাই অক্সিজেন সৃষ্টি করে, এমনি প্রাণী পৃথিবীতে সমগ্র প্রাণীজগতের বিবর্তন সম্ভব করেছে।

সবচেয়ে প্রাচীন যে ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে তার নাম এ্যালগি। বয়স কম করে ৫০০০ লক্ষ বছর। এখনকার জেলিমাছের মতো অথবা (Al gae) জাতীয় কোনও প্রাণীর দেহাবশেষ এতে বোঝা যায়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে ভালো অবশেষে পাওয়া গেছে ট্রিলোবাইটের (Tr i l obi t e) যার কথা আমরা আগেই বলেছি। এদের সমুদ্রের ঝাড়ুদার বলা যায়। এরা বহু সামুদ্রিক অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারত, সমুদ্রের তলায় এরা বুকে হাঁটত অথবা কোনও কোনও জাতের মধ্যে সাঁতারুও দেখা যেত। কারও একজোড়া চোখ ছিল কারও কপালের মাঝখানে একটা বড়ো চোখ ছিল। চিংড়ি জাতীয় প্রাণীর অবশেষও এ সময় পাওয়া গেছে।

ধীরে ধীরে পৃথিবীর চেহারা বদলাতে আরম্ভ করল, সমুদ্রের তলা থেকে মাটি জেগে উঠল সাগরের বুকে। আগ্নেয়গিরি তেজ কমে এলো। অগভীর সমুদ্রে প্রবাল জাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল থেকে দ্বীপ জন্মাতে শুরু হল তবে এখনকার মতো বড়ো আকারের নয়। গভীর জলে, গ্রাপটোলাইট ক্রাষ্টাসিয়া প্রভৃতি কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী দেখা দিল।

সৃষ্টির আদিতে জলমগ্ন ছিল অথচ এখন সেখানে বিরাট উঁচু পাহাড়, পর্বত এমন জায়গা পৃথিবীতে বহু আছে। এশিয়ার অধিকাংশ জায়গাই আজ থেকে ৫ হাজার লক্ষ বছর আগে হয়তো বিরাট সমুদ্র ছিল। কিন্তু এখন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় (যাকে মানুষ সেদিন জয় করেছে) সেখানে দেখা দিয়েছে। যে সময় পৃথিবীর তলায় মাটির নাড়াচাড়া শুরু হল, কয়লা তৈরি হতে আরম্ভ করল, তখন থেকেই পাহাড় দেখা দিতে শুরু করল। মাটি কুঁচকে গিয়ে উত্তর গোলার্ধে সমুদ্রের মাঝখানে কোথাও কোথাও ছেদ পড়ল। ক্রমাগত জল বাষ্প হয়ে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের জলে লবণ ও ক্ষার জাতীয় জিনিসের পরিমাণ বেড়ে গেল। এর ফলে এ্যালগি, স্পঞ্জ প্রভৃতির সুবিধাই হয়েছে। কিন্তু বাষ্পীভবনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো জায়গায় জল শুকিয়ে গিয়ে ছোট ছোট হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও বা জল সম্পূর্ণ বাষ্প হয়ে গিয়ে লবণ পটাশ (যে জিনিস পটকাতে ব্যবহার করো) প্রভৃতি সেখানে জমা হল।

বুঝতেই পারছ জল বেশি নোনা হয়ে যাওয়ায় যে সব প্রাণী আগেকার অবস্থায় কোনও রকমে খাপ খাইয়ে টিঁকে ছিল তারা মহা মুশকিলে পড়ে গেল। এমনি করে পুরানো সামুদ্রিক প্রাণীদের কয়েকটা জাত, যেমন রুগোজ জাতের প্রবাল, ট্রিলোবাইট প্রভৃতি ক্রমে এ অবস্থা সইতে না পেরে লুপ্ত হয়ে গেল। এই সময়ের ভারী অদ্ভুত জাতের এক এক ধরণের মাছের দেহাবশেষ যাদুঘরে রাখা আছে। হেলিক প্রোইস্ন জাতের হাঙরের স্প্রিং এর মতো জড়ানো দাঁত মুখের নীচে ঝুলতে দেখা যেত।

পৃথিবীর অবস্থা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ল। একদিকে সমুদ্রের বুক ভেদ করে আগ্নেয়গিরির শক্তি ডাঙা জাগিয়ে তুললো অন্যদিকে পুরানো পাহাড় বাতাস জলে ক্ষয়ে নুড়ি-পাথর, বালি কাদা সৃষ্টি করতে লাগলো। এই সব বালি কাদা জমে অববাহিকার সৃষ্টি হল; সাগর কিনারে ব-দ্বীপ দেখা দিল। যে সব কাদা সাগরের তলায় গিয়ে ঠাঁই নিলো পরে তারই কিয়দংশ চাপের ফলে জমে গিয়ে তোমাদের শ্লেটের পাথরের জন্ম দিয়েছে।



ডাঙা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একদল আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত বদলে নিয়ে বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার উপযোগী হয়ে উঠলো। নানাজাতের মাকড়সা, কীটপতঙ্গ আজও এদের বংশ রক্ষা করছে। গাছপালার সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেল। তখনকার যে সব পুরানো লাল পাথর ডেভনশায়ার প্রভৃতি জায়গায় পেয়েছি তা থেকেই এ প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করেছি। পাতা বা ডালপালার ভালো করে আবির্ভাব ঘটেনি একথা বলা চলে তবুও আধুনিক গাছপালার অনেক ব্যবস্থাই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনই দেখা দিয়েছিল। যেমন ধরো, গাছের গুঁড়ির মধ্যে মাটি থেকে শোষিত রস চলাচলের রাস্তা কিংবা গাছের গায়ে একটা স্বচ্ছ ছাল যেখানে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ছোট ছোট ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র পথের মারফৎ গাছ কার্বনডাইঅক্সাইড ভেতরে নিতে পারে।

সাঁতার কাটতে গেলে কি ডাঙায় চলাফেরা করতে গেলে মেরুদণ্ড অত্যন্ত দরকার। তাই খুব তাড়াতাড়ি মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল বলতে হবে। গায়ে বেশ শক্ত পুরু আঁশ আছে দেখতে মাছের মত অথচ চোয়াল নেই এমন সব প্রাণী (নাম দেওয়া গেছে o s t r a c o d e r m) নদীতে কি মোহনায় প্রথমে দেখা দিল তারপরে ধীরে ধীরে নানাজাতের সত্যিকারের মাছ, যাদের এখনকার মত আঁশ আছে, ফুসফুস এবং লম্বা লম্বা পাখনা আছে এমন জাতের দেখাও পাওয়া গেল। বন্যা কি জোয়ারের জল সরে গেলে এরা পাখনায় ভর করে নদীতে সাগরে চলে যেতে পারতো এবং এমনি মাছের জাত থেকেই প্রথম উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়। গ্রিনল্যাণ্ডের এমনি জাতের আদিম উভচরের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়াও মাছের অন্যান্য জাতের মধ্যে হাঙর শ্রেণী সমুদ্রে ভিড় করল।

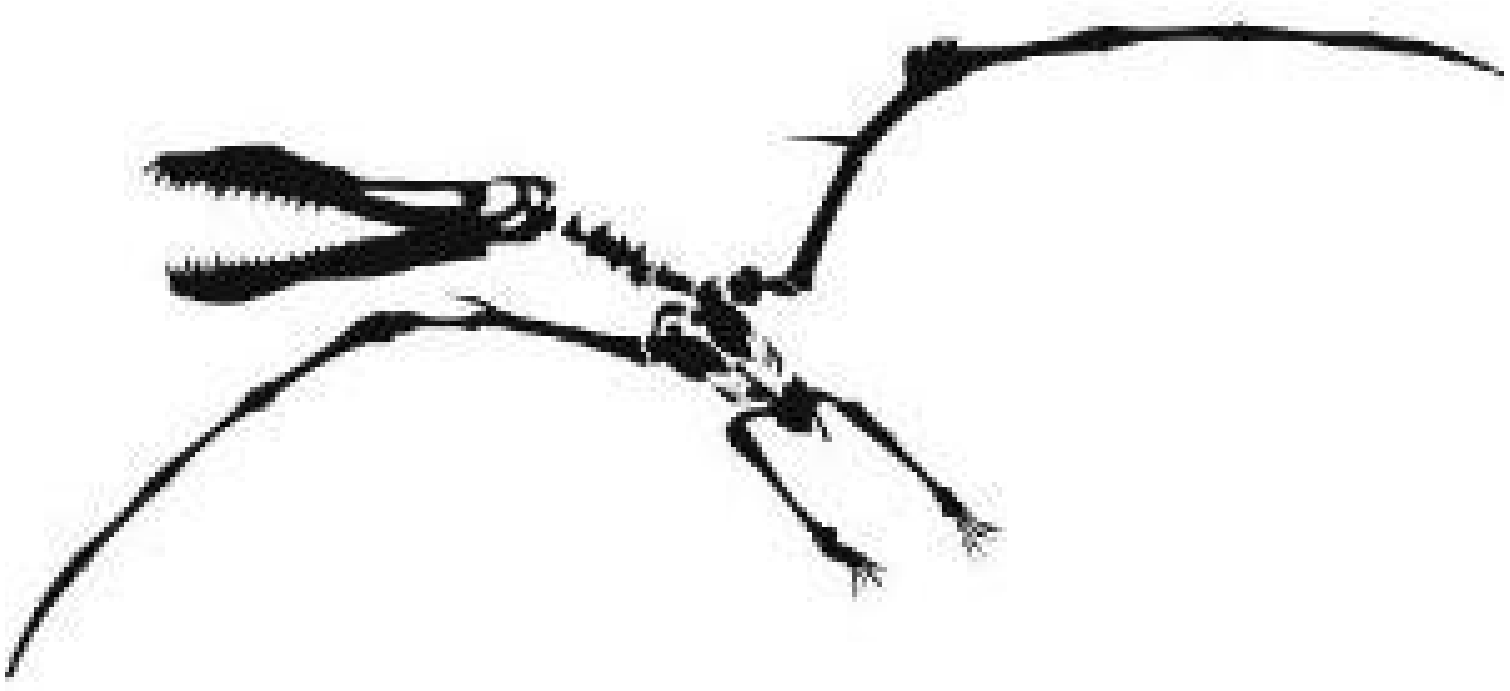
অবশ্য মনে কোরো না, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দিন এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। নানা জাতের প্রবাল সমুদ্রের স্বচ্ছ অগভীর জায়গায় ভিড় করতে লাগলো। কোনোটা ঢাক্‌নাওলা কাপের মতো, কোনোটা অনেকগুলো ধুতরো ফুল এক বোঁটায় ফুটলে যেমন হয় তেমনি, আবার কোনোটা শিকলের মত অনেকখানি জুড়ে। কোনো কোনো বালি বিছানো সমুদ্রের তলায় এক জাতের স্পঞ্জ দেখা দিল, যার দেহে জালের মতো বালির কঙ্কাল।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সব পাথর ছিল তার উৎপত্তি হচ্ছে আগ্নেয় অর্থাৎ কিনা গ্যাসীয় থেকে তরল এবং তারপর কঠিন অবস্থা ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এরা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু বাতাস, জলে ক্ষয়ে একদিকে এইসব পাথর থেকে যেমন বালি, কাদার উদ্ভব হল তেমনি বালি এবং অন্যান্য জিনিস যেমন চুন, প্রাণী গাছপালার দেহাবশেষ ইত্যাদি একসঙ্গে মিলে চাপের ফলে বেলে পাথর কি চুণাপাথর সৃষ্টি হল। গাছপালা পৃথিবীর ভেতরকার উত্তাপ ও চাপের ফলে কয়লার জন্ম দিয়েছে। কয়লার ভাঁজের মধ্যে বহু সময়েই আমরা গাছপালার ছাপ পেয়েছি। অনেকে

বিশ্বাস করেন যে পেট্রোলিয়মও এমনি করে জন্মেছে। যাই হোক, ক্রমে গাছপালায় যেমন পৃথিবী ভরে গেল তেমনি প্রাণীদের জীবন ধারণের প্রক্রিয়াও বদলিয়েছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্থান অগভীর সমুদ্রে নির্দিষ্ট হয়ে রইল, গভীর সমুদ্রে হাঙর প্রভৃতি বড়ো জাতের মাছ আর সাগর ও ডাঙার মধ্যে উভচর প্রাণী। এই সময় যে পৃথিবীর বহু জায়গায় গাছপালা ভার্তি ছিল তা আমরা বর্তমান পৃথিবীর কয়লার পরিমাণ থেকে বুঝতে পারি। বায়ুমণ্ডলও যে গাছপালার উপযোগী বেশ জলীয় বাষ্পে ভর্তি ছিল তাও ধরে নেওয়া যায়। এও প্রায় আড়াই হাজার লক্ষ বছর আগেকার কথা বলছি।

দেখতে দেখতে আমরা পৃথিবীতে জীবনের ইতিহাসের ধারা বেয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। সমুদ্রের বুক থেকে যেমন মহাদেশগুলো জেগে উঠতে লাগল, তেমনি জীবনেরও যেন নবযুগ সৃষ্টি হল। তখনকার মহাদেশগুলোর একটু কাল্পনিক বর্ণনা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় মন্দ লাগবে না। চারিদিকে মরুভূমি ধূ ধূ করছে, মাঝে মাঝে ছোট গাছপালায় ভর্তি পাহাড়, এখানে সেখানে চঞ্চল বালিয়াড়ি, কোথাও বা প্রচুর লবণ জমে আছে। প্রবাল দ্বীপের প্রবাল এবং চুনে ভর্তি সামুদ্রিক গাছপালা দেখলে মনে হয় তখন সমুদ্র বেশ গরমই ছিল।

এদিকে কত নতুন জাতের প্রাণী যে পৃথিবীতে আর সমুদ্রে দেখা দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অগভীর সমুদ্রে শামুক, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীদের নতুন ধরণের বহু আদি পুরুষের দেখা মিললো। শুশুক, তারামাছ, জাতীয় প্রাণীদের পূর্বপুরুষও এই সময়ই দেখা গিয়েছিল বলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন। নতুন ধরণের প্রবাল, হাড়ওয়ালা নানারকমের মাছও এদের সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল। ইকথাইওসেরস (I c h t h y o s a u r s) নামে এই সময়কার এক রকমের মেরুদণ্ডী সামুদ্রিক সরীসৃপের অবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এরা দ্রুত সাঁতার কাটতে পারতো এবং তেকোনা ধারালো দাঁতের অস্ত্রও এদের ছিল। গভীর সমুদ্রে ডুব সাঁতার কাটবার সুবিধার জন্য বোধ হয় জলের চাপ সইতে পারে এমন হাড়ের খাঁচায় এদের চোখ ঢাকা ছিল। আরেক ধরণের সামুদ্রিক সরীসৃপ এই সময় দেখা গিয়েছিল; এদের গলা ছিল খুব লম্বা এবং পাখনার মতো ডানা দিয়ে এরা সাঁতার কাটতে পারত। এদের নাম দেওয়া হয়েছে প্লেসিওসরাস (P l e s i o s a u r s)। প্রবাল জমে কোনো কোনো জায়গায় হয়তো হ্রদের মতো হয়ে গিয়েছিল, বাতাসে চক খড়ি জাতীয় জিনিসের গুঁড়ো উড়ে এসে এখানে চুনাপাথরের সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই সব হ্রদের মতো জায়গায় জেলিমাছ এবং আরও নানা ধরণের কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধত। চূনাপাথরের গায়ে তারা স্পষ্ট দেহের ছাপ এঁকে রেখে গিয়েছে। সমুদ্রের অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও মাছ ছাড়া সমুদ্রের ধারে বাস করে অথবা উড়ে



বেড়ায় এমন জানোয়ার অথবা পাখির দেহের অবশেষও এই সব চুনাপাথরে আবিস্কৃত হয়েছে। টেরোড্যাকটিল (P t e r o d a c t y l) আর্চিওপ্টেরিক্স (A r c h a e o p t e r y x) এদের মধ্যে প্রধান। সহজেই

অনুমান করা যায়, ডাঙা যতো বেশি দেখা দিতে লাগল, উভচরী বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ডাঙায় চরে বেড়ানো প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। অতিকায় ডাইনোসর অথবা উড়ন্ত টেরোড্যাকটিল প্রভৃতি এইদিকে ইঙ্গিত দিয়েছিল। এর মধ্যে টেরোড্যাকটিল উড়তে পারত কিন্তু সরীসৃপের সব চরিত্রই এর মধ্যে বজায় ছিল। এই পথ দিয়ে আস্তে আস্তে পাখিদের বিবর্তন হল, সরীসৃপদের গায়ের আঁশ হয়ে গেল পালক।

সেই যে খড়িমাটি জমা শুরু হল প্রায় সাতশো লক্ষ বছর ধরে তার রাজত্ব চললো সমস্ত পৃথিবী জুড়ে, ইউরোপে, উত্তর আমেরিকায়, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়। এই সময়কার পৃথিবীতে গাছপালার পরিমাণ থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে জলবায়ু বেশ মোলায়েম জীবনের উপযোগী ছিল। উত্তরে প্রায় গ্রিনল্যাণ্ডে পর্যন্ত সবুজের সাড়া জেগেছিল বলতে হবে। প্রথম দিকে বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অগভীর জলের উপর সবুজ বালি জমতে লাগলো, আর সমুদ্রের তলায় জমতে দেখা গেল নীল রঙের কাদা। তারপরে জমি যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে মসৃণ হতে থাকলো, তখন খড়িমাটি জমতে শুরু করল।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্পঞ্জ এই সময়ের সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল। এখনও সমুদ্রের ধারে ধারে এই ধরণের স্পঞ্জ দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারে যেগুলো পাওয়া যেতো তার দেহে চুণের পরিমাণ বেশি ছিল, কিন্তু সমুদ্রের একটু গভীর জলে যেগুলো দেখতে পাওয়া যেতো তাদের দেহে বালির পরিমাণ বেশি ছিল। স্থানে স্থানে সঞ্চিত হয়ে চকমকি পাথর রূপে খড়িমাটির মধ্যে আজও এর দেহাবশেষ মিলবে। জার্মানির হ্যানোয়ের থেকে খড়িমাটির মধ্যে এইরকম জাতের স্পঞ্জের অবশেষ মিলেছে। এ্যাসিড দিয়ে যদি খড়িমাটি গলিয়ে ফেলি তবে স্বচ্ছ কাচের মতো স্পঞ্জের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যাবে।

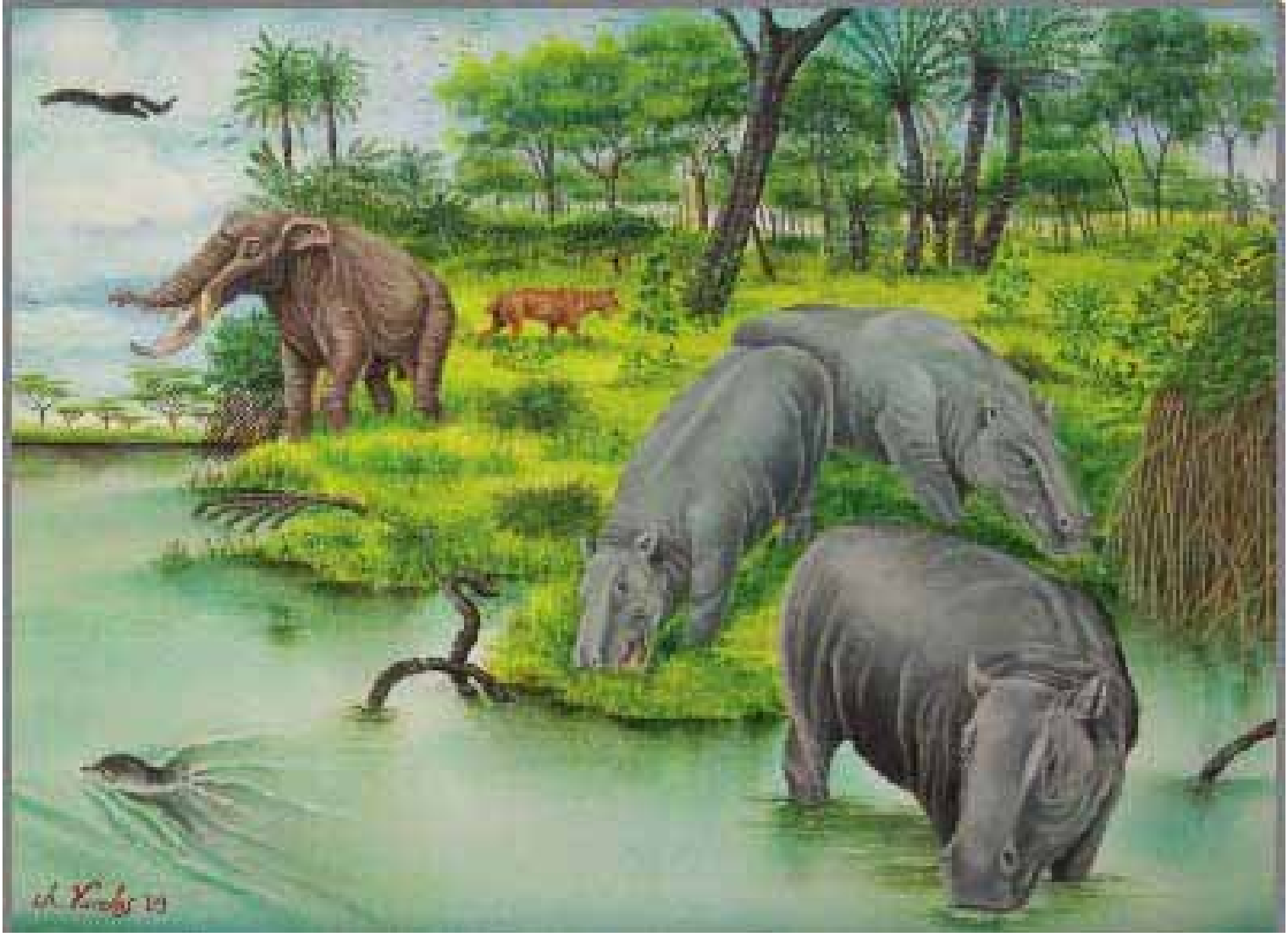
মেরুদণ্ডওলা প্রাণীদের মধ্যে সমুদ্রে নানা জাতের মাছ দেখতে পাওয়া গেল, যাদের বংশধরেরা হেরিং হাঙর কড রূপে আজও বিরাজ করছে। এই সব মাছেদের শত্রুদের সংখ্যাও সমুদ্রে কম ছিল না, যার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল অত্যন্ত তীব্র। মাসাসর নামে লম্বা সাপের মত এক ধরণের সামুদ্রিক সরীসৃপ মাছখেকো যম ছিল। বোধ হয় এদের গল্প পৌরাণিক কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়া বিরাটকায় কচ্ছপ (কূর্ম), উড়ন্ত টেরোড্যাকটিল সমুদ্রের ধারে ঘুরতে দেখা যেতো। টেরোড্যাকটিলদের ডানা প্রায় কুড়ি ফুটের চেয়ে বড়ো ছিল। কিন্তু হলে হবে কি বেশি দূরে উড়ে যাবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

গাছপালার চেহারা ক্রমেই বদলাচ্ছিল। আগে পাতার কোনও বাহার ছিল না, কিন্তু এই সময় থেকে পাতায় ভর্তি গাছ দেখা দিল, ফুলের সমারোহে সবুজ পৃথিবীতে বোধ হয় রংও লাগল। আধুনিক জাতের অনেক গাছের ফসিলই আমরা পেয়েছি। ডুমুর ম্যাগ্নোলিয়া পপ্‌লার এই সব বিলিতি গাছের অগ্রজনের সৃষ্টি এই সময়ই হয়েছিল বলতে হবে।

কেন যে ফুলে ভরা গাছে এর দ্রুত পৃথিবী ছেয়ে গেল এখনও তার কোনও সঙ্গত কারণ দেখতে পাইনি। তবে যে সব কীটপতঙ্গ ফুলে পরাগ বয়ে নিয়ে যায় আর সে সব ফুলে মধু আছে তাদের মধ্যে যোগাযোগ খুব তাড়াতাড়ি গড়ে উঠেছিল।

এছাড়া মেরুদণ্ডী অতিকায় প্রাণীদের সংখ্যা এই সময় অনেক বেড়ে গেল। আগে যে ডাইনোসরের কথা বলেছি তারা তো বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে বংশবৃদ্ধি করছিল। তারপরে টাইরান্নেসর নামে এক বিরাট মাংসাশী জন্তুর আবির্ভাব হয়েছিল, এর দেহের মাপখানা শোন একবার - দাঁড়ালে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু, দেহখানা লম্বায় চল্লিশ ফুট, সামনের শ্বদন্ত ৬ ইঞ্চি লম্বা। খুব বড়ো বড়ো নখ দিয়ে জীব জন্তুকে আক্রমণ করত! আমারিকার মনটানায় খড়িমাটির পাথরে এর হাড় পাওয়া গেছে। ট্রাইসেরাটপ নামে একটি শক্ত সমর্থ জবরদস্ত প্রাণীও এসময় দেখা দিয়েছিল, এর ঠোঁটটা ছিল কচ্ছপের মতো, আত্মরক্ষার জন্য মাথায় শিংও ছিল। এছাড়া ইগুয়ানোডন বলে এক ধরণের তৃণভোজী জন্তুরও দেখা মিলেছিল। এরা টিকটিকি, গিরগিটির বড়ো সংস্করণ!

যে সব স্তন্যপায়ী জীব পৃথিবীর বুকে ক্রমে বংশবিস্তার করে দখলিস্বত্ব ভোগ করছিল, তাদের চেহারা ধীরে ধীরে আজকালকার মত হয়ে এল। আজ থেকে সাড়ে চারশো কি সাড়ে তিনশো লক্ষ বছর আগে হাতির যে পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে ছিল তার শুঁড় ছিল ছোট আর ওপরের এবং নীচের দুই চোয়ালেই এক জোড়া ক'রে বাঁকানো দাঁত ছিল। পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় ঘাসে ভর্তি জমি দেখা দিয়েছিল বলেই বোধহয়, তৃণভোজী দলবদ্ধ প্রাণীদের



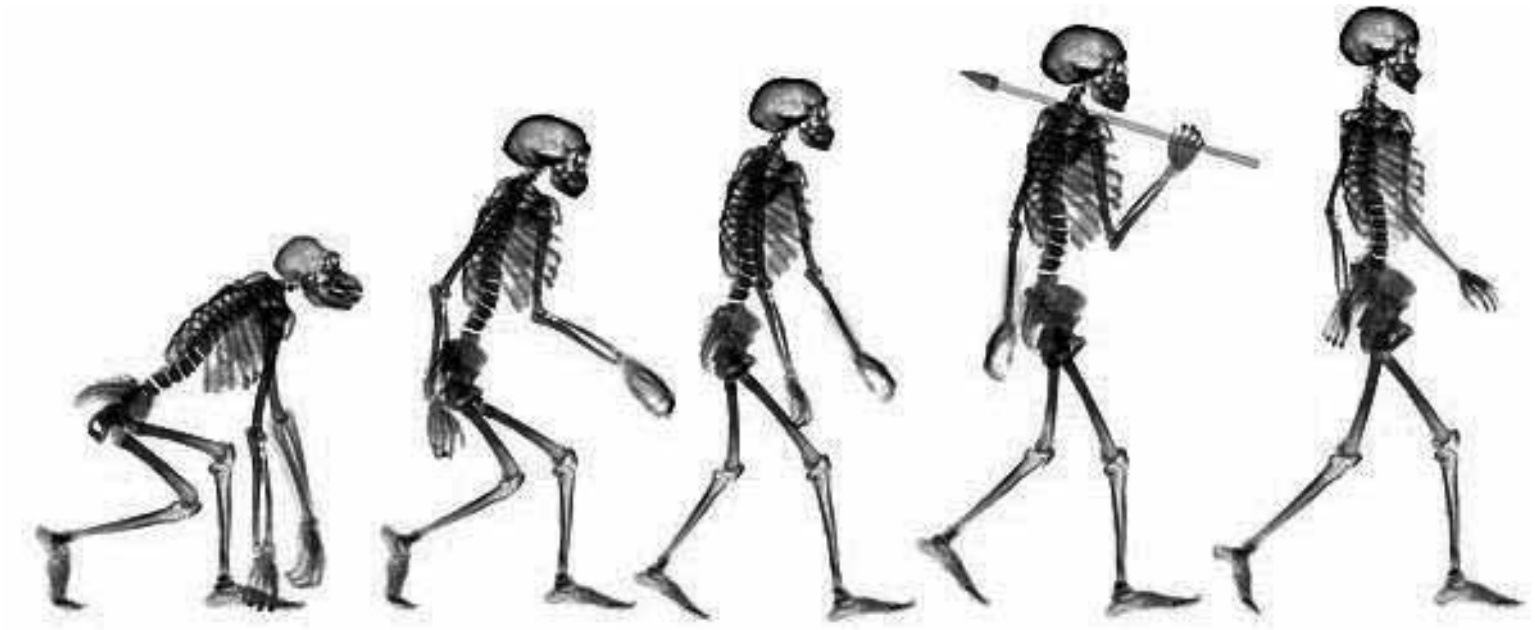
সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেল। চরে ঘাস খাওয়ার সুবিধামাফিক দাঁতের চেহারা বদলিয়ে, ঘোড়ার পূর্বপুরুষরাও এই সময়ই দেখা দিল। উত্তর আমেরিকায় দুভাগে ভাগ করা খুরওলা উটের প্রাচীন সংস্করণের আবির্ভাব হল। হরিণ, শুয়োর, আন্থাকোথেরিয়াম (Anthracotherium) নামে হিপোপটামাসের মত এক রকম প্রাণীর অবশেষও এই সময়কার মাটির স্তর থেকে খুঁড়ে বার করা গেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা আফ্রিকায় বানর জাতীয় প্রথম প্রাণী, (যা থেকে কিনা উচ্চতর বানর গোষ্ঠী এবং পরিণামে মানুষ ধারা বেয়ে নেমে এসেছে) এই যুগে পাওয়া গেল।

গোড়া থেকেই বোঝাতে চেষ্টা করেছি, পৃথিবীর ওপরকার চেহারা যেমন বদলাচ্ছে, প্রাণীদের মধ্যেও পরিবর্তন ঠিক সেই রকম তাড়াতাড়ি আসছে। যখন জন্তরজানোয়ারের জগতে গণ্ডার, হাতীর পূর্বপুরুষ দেখা দিচ্ছে, সেই সময়তেই হিমালয় পাহাড়মালা, আল্পস পাহাড় কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হল। পাহাড় দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া, ইউরোপের জলহাওয়া কোন যাদুমন্তরে বদলালো বুঝতে পারছ। যে জায়গায় ছিল শীত গরমের চরম জলহাওয়া, নাতিশীতোষ্ণ কোমল আবহাওয়ায় সেখানকার প্রাণী ও গাছপালার জগতে এক বিপ্লব দেখা দিতে বাধ্য। বৃষ্টি পড়ার ধরণধারণ বদলে গিয়ে যে জায়গায় জঙ্গল ছিল সেখানে ঘাসের জমি দেখা দিল। পপলার সেড়াব এই সব গাছ, এছাড়া নানা রকমের ছোট জাতের ঝোপ ঝাড়ে হ্রদের চার পাশে এখনকার মতই শোভা বিস্তার করেছিল বলেই এখন মনে হচ্ছে।

এখনকার প্রায় সব প্রাণীই এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল বলতে হবে। ইউরোপের সঙ্গে এশিয়া এক হয়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ জঙ্গল জুড়ে হরিণ, বুনো ঘোড়া, জিরাফ এসব যেন চড়ে বেড়াচ্ছে এমন ছবি দেখতে পাচ্ছি। খালি বুনো জীবজন্তুই নয়, সোজা হয়ে চলতে ফিরতে পারে মানুষের মতো এমন বনমানুষ জাতীয় প্রাণী দেখা দিল।

বলতে গেলে, এখান থেকেই বর্তমান যুগের শুরু। তাও দশলক্ষ বছর আগেকার কথা বলছি। উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং আল্পস, হিমালয় প্রভৃতি পাহাড় পর্বতে যে বরফের রাজত্ব ছিল তা গরম অবস্থা দেখা দেওয়াতে গলে যেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মাটি যেন উপর দিকে ঠেলে উঠতে লাগলো। বরফে যেসব জায়গা ঢাকা ছিল তা বনে জঙ্গলে সবুজ হয়ে গেল। গাছপালার ধরণ অনেক বদলে গেল। আধুনিক নানা জাতের পাখি দেখা গেল। পুরানো হাতীর গায়ের লোম ঝরে এক জোড়া দাঁত খসে গিয়ে এখনকার হাতী বেরিয়ে এল।

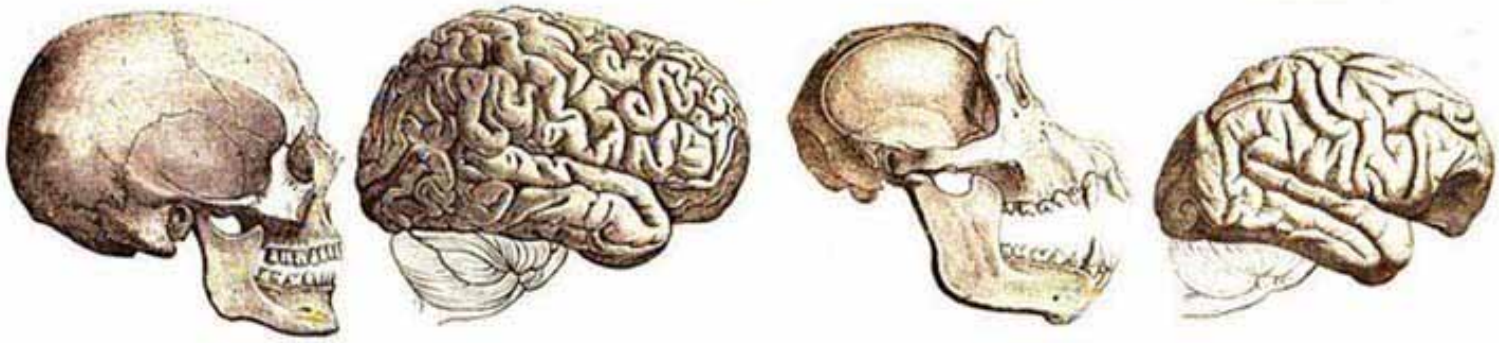
আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জগৎ দেখা দিল। স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডীদের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গেল মানুষের মধ্যে এবং খালি অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়েই নয়, মস্তিষ্কের বিকাশেও মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের ছাড়িয়ে গেল।



এখন সেই বহুবিদিত 'বানর থেকে মানুষ' তত্ত্বের সত্যতা কতটা বিচার করা যাক। এতদিনে নিশ্চয়ই বিবর্তন অর্থাৎ এক প্রাণীশ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সম্পর্ক যে কী তা বুঝতে তোমাদের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। সেইদিক থেকে ভাবলে আমাদের যুক্তি বোঝার অনেক সুবিধে হবে। কোলকাতার যাদুঘরে যদি যাও তবে দেখবে পিছনের দিকে দোতলার একটা ঘরে বিভিন্ন শ্রেণীর মৃতদেহ বিশেষ উপায়ে সংরক্ষণ করা আছে। সেইসব জন্তুদের মধ্যে কতকগুলো বানর জাতের প্রাণী আছে। একজাতের বানর যারা দৌড়াতে পারে, লাফাতেও পারে (তোমাদের বন্ধুদের কথা বলছি না কিন্তু)। আর এক জাতের আছে যারা গাছে গাছেই ঝোলে, ডাঙ্গায় যাদের জারিজুরি খাটে না। এদের এই বিভিন্ন ধরণের ভঙ্গীর কারণ, মেরুদণ্ডের গঠনের তফাৎ।

গাছে গাছে যে শ্রেণীর বানর ও গীবন ঘুরে বেড়ায়, তাদের হাত খুবই সরু, লম্বা এবং লোমশ। মেরুদণ্ড এদের যথেষ্ট বিকাশলাভ করেনি তাই চলবার সময়ও এদের দেহের উপরাংশ যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। বৃক্ষচারী অন্য প্রাণীদের- যেমন ওরাং ওটাং, পা হাতের তুলনায় অনেক ছোট, দুর্বল এবং বাঁকা এবং গাছে ঘুরবার ফলে হাতের আঙুলগুলি লম্বা কোঁকড়ানো। দাঁত যদি পরীক্ষা করা যায় তো দেখা যাবে, কষের দাঁত খুব পরিস্ফুট নয় এবং তৃণভোজী ছাড়া আর কোনও প্রাণীর এমন হতে পারে না।

গরিলা ও শিম্পাঞ্জিদের মাটিতে হাঁটার ফলে মানুষের মতো শারীরিক গঠন অনেক বেশি পরিস্ফুট। ছোট, চওড়া হাত, বুড়ো আঙুল বেশ লম্বা, পায়ের পাতা চ্যাটালো; মেরুদণ্ড সুগঠিত বলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এদের পক্ষে কঠিন নয়। তবে মাথার ওজনটা একটু বেশি বলে সামনের দিকে এরা ঝুঁকে পড়তে বাধ্য। এই দুই শ্রেণীর প্রাণীই যেন গাছ আর ডাঙার সঙ্গে সন্ধি করেছে এবং গাছ থেকে ডাঙায় বদলি হওয়ার ব্যাপারে এরাই যে সিঁড়ির মাঝখানের ধাপ এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। মানুষের সঙ্গে পরীক্ষা করলে আরও গভীর আত্মীয়তা দেখা যায়। যথা, মানুষের মতো এর মেরুদণ্ডও টুকরো টুকরো ভার্টিব্রার হাড়ে ভাগ করা (সংখ্যায় প্রায় এক, কেবল এক জোড়া



পাঁজরা কম বলে কোমরের কাছে একটু করে কম), ফুসফুস বিভিন্ন অংশে জোড়া, এমন কি কষ দাঁতের গঠন পর্য্যন্ত প্রায় এক।

মস্তিষ্কের উন্নতি সম্পর্কে আগেই যে মতের কথা বলেছি, সে ধরণের সহজ ব্যাখ্যায় কারো কারো মন ওঠে না। চোয়াল ছোট হাল্কা হয়ে গেল, ঘাড়ের মাংসপেশী মাথার আকার বদলাতে সাহায্য করল এবং রক্ত চলাচলের তফাৎ হওয়াতে মস্তিষ্কের আকার বড়ো হতে লাগল। তাই বিজ্ঞানীরা আরও তথ্য জোগাড় করে যুক্তি ফাঁদলেন যে আসল বিবর্তন নির্ভর করছে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা Cerebral Cortex এর আবির্ভাবের ওপর। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে মস্তিষ্কের এই অংশ থেকেই আমাদের দেখা, কথা বলা, নড়াচড়া, জিভের আস্বাদ সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ী জীবের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি বড়োই অপরিস্ফুট, নেই বললেই চলে। কেবল এর মধ্যে যে অংশটুকু গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা দেয় সেইটুকুই পরিষ্কার হয়েছে মাত্র। তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয় কুকুর বেড়ালের এত প্রখর। এইসব প্রাণীদের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে তা থেকে অন্যগুলি আলাদা করা কঠিন। উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে কিন্তু ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আকারে অনেক বড়ো এবং স্নায়ুরজ্জুর কেন্দ্র যাকে ইংরাজীতে বলে Medula তাকে ঢেকে এটা অনেক বিস্তৃত। আরও বড়ো কথা যে সব অংশ দেখা, শোনা, কথা বলা, ছোঁওয়ার ইন্দ্রিয়গুলোকে চালায় সেগুলো বেশ পরিষ্কার এবং ঘ্রাণের অংশ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই কেন্দ্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যেকটির চারধারে একটা এলাকা আছে যেখান অনুভূতি সঞ্চিত হয় এবং এইসব জায়গাকে স্মৃতির ভাণ্ডার বলতে পারি। এই রকম এলাকার মাঝখানটিতে কল্পনার এলাকা। আমরা আজ পর্যন্ত ঠিক ভাবে মধ্যবর্তী জায়গাগুলোর অবস্থা বিচার ক'রে উঠতে পারিনি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আদিম স্তরের অপরিষ্কার ঘ্রাণ-সর্বস্ব মস্তিষ্ক থেকে আমাদের এমন কূটবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মস্তিষ্কের বিবর্তন হল কেমন করে? মস্তিষ্কের আকার যেমন বেড়েছে দেখতে পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে নানা চেতনার উদ্ভব হয়েছে। মনে আছে নিশ্চয়, বানর শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে মানুষের বিবর্তনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে গাছপালার প্রভাব আমরা বিচার ক'রেছি এবং হাত ও পায়ের উদ্ভবের ওপরে গাছে চড়ার অনেক প্রভাব আছে। অনেকে মনে করেন মস্তিষ্কের বিকাশে ঠিক এই ধরনের প্রভাব কাজ করেছিল।

সাধারণ স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে হাত বলতে মানুষের অর্থে যাকে হাত বলে এমন কোন অঙ্গ নেই। বানর জাতীয় প্রাণীদের গাছে চড়ার জন্যেই উপরাঙ্গের উন্নতি হয়েছিল এবং তা থেকেই আধুনিক হাত জন্ম পেয়েছে। মুখ ও নাক দিয়ে গন্ধ ও স্পর্শের কাজ ছাড়া আর অন্য কোন কাজ চলে বলে তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর না। (আত্মরক্ষার জন্য অবশ্য কামড়ানো চলে) কিন্তু গাছে চড়া থেকে আরম্ভ করে ফল পাড়া, বাদাম জাতীয় ফল ভাঙা প্রভৃতি সব কাজেই হাতের জুড়ি মেলে না এবং চোখের সাথে এর আত্মীয়তা সব চেয়ে বেশি। এই সব কাজ করতে পারার ফলেই দ্রুত মস্তিষ্কের গঠন বদলে গিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

বুঝতেই পারছ এর কাজ করতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্ক উন্নত হল এবং সেই সঙ্গে মস্তিষ্কও পাল্টা হাত পায়ে ও চোখে নতুন দুষ্টু বুদ্ধি (কিছু সুবুদ্ধিও) জোগাতে লাগল এবং ফলে সেগুলোও নতুন ধরনের নানা কাজ দক্ষ হয়ে উঠলো। দক্ষতা থেকেই বুদ্ধি গজায়, বুদ্ধি থেকেই আবার আরও নতুন দক্ষতা জন্মে। এই ভাবে এক ওপরমুখো ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে আধুনিক মানুষের মগজ বেরিয়ে এল।

যদিও এই সব যুক্তির মধ্যে অনেক ফাঁক আছে তবুও সমাজে পরিশ্রম করবার ফলে অর্থাৎ কাজের মধ্যে দিয়েই যে মানুষ শিখছে এ কথা যখন সত্যি, তখন গাছের জীবনের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা যে এই পক্ষেও কিছু প্রকাশিত তা স্বীকার করে নিতে লজ্জা কী!

মস্তিষ্কের বিকাশ যেমন আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছি অন্যান্য যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ আমরা ঠিক সেইভাবেই বিচার করতে পারি। বিশেষ করে দাঁত, চোখ, অন্ত্রাদি, পা প্রভৃতির বিবর্তনের ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ ধরণের যুক্তিই খাটে। মোট কথা কাজ করবার ধরনের বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলে গেছে।

সবচেয়ে নিম্নতম প্রাণী এ্যামিবার চোখ বা ঐ জাতীয় কেন্দ্রীভূত স্নায়ুমণ্ডলী আছে কিনা সন্দেহ। হয়তো আলো পড়লে উত্তেজিত হয় এমন নিম্নতর ঐ স্তরের প্রাণী পাওয়া কঠিন নয় কিন্তু চোখের মত এরকম শক্তিশালী ইন্দ্রিয় পেতে অনেক হাজার বছর দরকার হয়েছে। বিশেষ করে অনেক ওপরে এসে আরেকটি অনুপম জিনিস দেখা গেল, সেটা হচ্ছে রঙ চিনবার, বাছবার ক্ষমতা।

আধুনিক কালে অন্ত্রাদি বিবর্তন সম্বন্ধে অনেক উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া গেছে। গবাদি পশুর রোমন্থনের প্রয়োজনে পাকস্থলীর একটি অংশে একটি বিশেষ ভিটামিন (ভিটামিন বি ১২) তৈরি হয়। এটিই খড়কুটো হজম করবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। আমাদের অন্ত্রে এ ধরনের কোনও বন্দোবস্ত নেই।

মানুষের মত সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের অভ্যুত্থানের ইতিহাস এতো অল্প কথায় কেউ শেষ করতে পারে না, কিন্তু বিবর্তনের মূল সুরটি তোমরা ধরতে পেরেছ। তাই আমার ছুটি। এরপর এই কাঠামোর উপর রক্তমাংসের প্রলেপ লাগানোর ভার তোমাদের উপর।

খালি জীবজগত থেকে সভ্য মানুষের আবির্ভাবের যে গল্প সব শেষে তোমাদের বললাম তাও অর্ধেক মাত্র। কারণ মানুষের সমাজের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত না জানলে এ গল্প শেষ হবে না। কিন্তু সে অন্য ভূমিকায় শুরু হবে। তাই সে কথা আজ থাক। বিবর্তনের ইঙ্গিতটুকু যদি তোমরা ধরতে পেরে থাক তবেই এ পরিশ্রম সার্থক। যাদুঘরে বেড়াতে গিয়ে মনে মনে 'চলো যাই যাদুঘরে'র জানা কথাগুলো মিলিয়ে নিয়ে এক ছবি তুলে ধর, দেখবে কত পরিষ্কার হয়ে গেছে এই পৃথিবীর কথা।





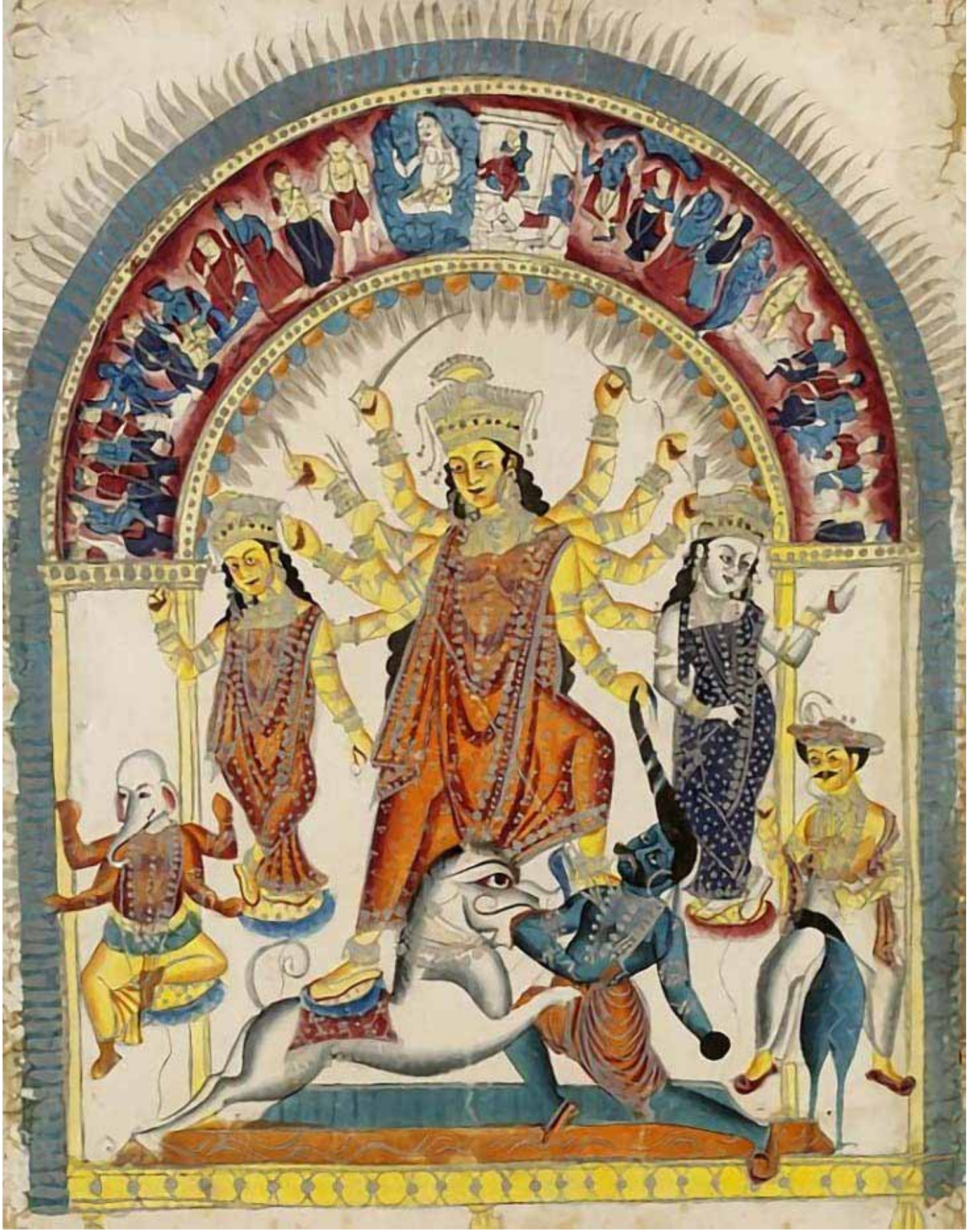
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো

অনুপূর্বা রায়

বর্ষার মেঘ সরে যেতেই আকাশের দখল নেয় সাদা পেঁজাতুলো মেঘ,বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় শারদোৎসবের প্রস্তুতি। সময়বদলের খেলায় সেই প্রস্তুতি সেকালের সাবেকিয়ানার সাথে একালের 'থিম' পুজোর প্রতিযোগিতায় এনে দাঁড় করায়। শুরু হয়ে যায় বাঙালির দুর্গাপুজোয় 'একাল-সেকাল' এর কড়চা।

বাঙালির অতীতের দুর্গোৎসবের চর্চায় যে সব পরিবারের কথা উঠে আসে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে স্থান পায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেই ! যে ঠাকুরবাড়ি ছিল ব্রাহ্ম অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, সেখানে দুর্গাপুজোর মতো সাকার ঈশ্বর সাধনা হত কীভাবে? কে শুরু করেছিলেন এই পরিবারে পুজো আর সে পুজো বন্ধই বা হল কীভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিহাস জানতে হলে যেতে হবে ঠাকুরবাড়ির গোড়ার কথায়।

যশোর জেলা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে সাত পুরুষ আগের পঞ্চানন কুশারী। কলকাতা শহরে আগন্তুক ব্রাহ্মণ পঞ্চানন সুতানুটি অঞ্চলে, গঙ্গার ঘাটে ব্যবসায়ীদদের পুজোআর্চা করতেন।লোকেরা তাকে ডাকত ঠাকুরমশাই, সেই থেকে তার নাম হয় পঞ্চানন ঠাকুর এবং পরবর্তীকালে তার উত্তরসূরীদের পদবীও হয় 'ঠাকুর'। পঞ্চানন ঠাকুরের দুই নাতি নীলমণিঠাকুর এবং দর্পনারায়ণঠাকুরের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে সবসময় বিবাদ লেগে থাকত।এই বিবাদের জেরে নীলমণিঠাকুর একদিন কুশারী বংশের গৃহদেবতা লক্ষী এবং শালগ্রামশিলা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান।পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার মেছুয়াবাজার অর্থাৎ আজকের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে এক সুবিশাল গৃহ নির্মাণ করেন। সুতরাং নীলমণিঠাকুরই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পত্তন করেছিলেন এবং সেই সাথে তিনি ঠাকুরপরিবারে দুর্গাপুজোও শুরু করেছিলেন। তবে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো নীলমণি ঠাকুরের নাতি প্রিন্স দ্বারকানাথের হাত ধরেই রাজকীয় আকার ধারণ করেছিল।



এবার আসি পুজোর কথায়! মাথায় গঙ্গানদী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুরবাড়িতে সমস্ত সাত্যিকতা মেনে প্রতিমা গড়ার মাটি আসত গঙ্গার পাড় থেকে। উন্মুক্ত ঠাকুরদালানে চলত ঠাকুর তৈরির কাজ, অর্ধচন্দ্রাকৃতির একচালার মূর্তিই ছিল ঠাকুরবাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট্য। তবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত প্রতিমার মুখের আদলের

ওপর। প্রিন্স দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরীদেবী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী এক নারী, কথিত আছে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজোর মায়ের মূর্তি একটা সময়ের পর এই দিগম্বরীদেবীর মুখের আদলে তৈরি করা হত। মাকে পরানো হত প্রচুর সোনার গয়না, মাথায় সোনার মুকুট থেকে কোমরে চন্দ্রহার সবই মায়ের গায়ে শোভা পেত। মূর্তিকে দু'বেলা বানারসী শাড়ি বদল করে পরানো হত, আবার কখনো পরানো হত দামী তসর কিংবা গরদের শাড়ি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজোয় মায়ের ভোগ ছিল দেখার মতো। দু'বেলা অন্ন থেকে মিষ্টান্ন সব মিলিয়ে একান্ন রকমের পদ মা'র ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হত, সাথে থাকত ফল, ডাবের জল ইত্যাদি। পরে সেগুলো ঠাকুরবাড়ির পুজোর দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ হিসাবে বিতড়ণ করা হত। সেই সময় একদিকে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন অন্যদিকে বাংলার মনীষীদের প্রভাবে নবজাগরণের জোয়ার চলছিল, তাই তখনকার সমাজের বিশিষ্ট মানুষরা ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসবে আমন্ত্রণ পেতেন। আমন্ত্রণপত্র লেখা হত দ্বারকানাথের পিতা রামমণি ঠাকুরের নামে। একবার পিতামহের সেই আমন্ত্রণপত্র নিয়ে বারো বছর বয়সের বালক দেবেন্দ্রনাথঠাকুর গিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করতে, রামমোহনকে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : " সামনে পুজো তাই তিনদিনই প্রতিমাদর্শনে আপনার নিমন্ত্রণ, পত্রে দাদুর এই অনুরোধ।" প্রতিমাপুজোয় বিরোধী রামমোহন রায় এই আমন্ত্রণে খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। যদিও বন্ধু দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে তিনি খুব স্নেহ করতেন তাই নিমন্ত্রণপত্রটি প্রত্যাখ্যান করেননি আবার সরাসরি সেটা গ্রহনও করেননি, তিনি তাঁর ছেলে রাধাপ্রসাদের কাছে দেবেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাধাপ্রসাদ পিতার হয়ে সেটা গ্রহন করে দেবেন্দ্রনাথকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতি বছর পুজোয় বাড়ির ছেলেমেয়ে এবং বউদের দামী দামী পোশাক উপহার দিতেন। পুজোর তিনমাস আগে থেকে দর্জিরা ঠাকুরবাড়িতে চলে আসতেন এবং সেখানে বসে তারা বানাতেন সকলের পুজোর পোশাক- ছেলেদের জন্য জড়ির টুপি, চাপকান, ইজার এবং মেয়েবউদের জন্য পছন্দমত জামাকাপড় সাথে নানা কাজ করা রেশমি রুমাল। পুজোর জন্য ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেক মেয়েবউ দ্বারকানাথের কাছ থেকে উপহার পেতেন এক শিশি দামী সুগন্ধী, খোপায় দেওয়ার সোনা বা রুপোর ফুল, কাঁচের চুড়ি আর নতুন বই।আসলে দ্বারকানাথ পার্বণী দেওয়ার ব্যাপারে খুব দরাজ ছিলেন। বাড়ির দুর্গাপুজোয় ছোট থেকে বড়, মেয়েবউ এমনকি বাড়ির ভৃত্য-কর্মচারীরাও পেতেন। দুর্গাপুজোর মতো প্রতিমা বিসর্জনের পালাও ছিল সমান রাজকীয়। দশমীর দিন নানা রকমের বাদ্যি আর গ্যাসবাতি নিয়ে এগিয়ে যেত বিসর্জনের শোভাযাত্রা। পাশেই গঙ্গা আর সেই গঙ্গা পর্য্যন্ত মাতৃপ্রতিমার সাথে বাড়ির মেয়েবউরা দরজা বন্ধ করা পাল্কিতে এগিয়ে গিয়ে বাড়ির উমাকে বিদায় দিতেন, সাথে যেত পিতলে বাঁধানো লাঠি হাতে প্রহরী। তবে প্রতিমা বিসর্জনেরর ক্ষেত্রে যে কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি তা হল বিসর্জনের সময় মায়ের শরীরে পরানো সোনার গয়না খুলে নেওয়া হত না, সেগুলো সমেত গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হত। পরে নৌকোর মাঝি বা অন্যান্য কর্মচারীরা জল থেকে সে গয়না তুলে নিতেন কিন্তু ওইসব গয়না আর কখনোই ঘুরে ফিরে ঠাকুরবাড়িতে আসত না। আর এখানেই ছিল ঠাকুরবাড়ির বনেদিয়ানার জিত ! একালের মতো দুর্গাপুজোর পর ঠাকুরবাড়িতেও স্বাভাবিক নিয়ম মেনে হত বিজয়া সম্মেলনী। সেই উপলক্ষে হত মস্ত জলসা- খোলা ঠাকুরদালানে নাচ,গান, নাটক এবং অন্যান্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও করা হত। সেকালের নামকরা ওস্তাদেরা তানপুরা নিয়ে এসে গানে মাত করে দিতেন, রাজকীয় ঝাড়বাতির নীচে চলত বিজয়ার রাজসিক খাওয়াদাওয়া- মিষ্টিমুখ,গোলাপজল, আতর, পান আর কোলাকুলি।

একদা বারো বছরের যে বালক দেবেন্দ্রনাথ পিতার বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কে পারিবারিক পুজোয় নিমন্ত্রন জানাতে গিয়েছিলেন, কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছে সেই দেবেন্দ্রনাথই উপনিষদের প্রথম শ্লোকের অর্থের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান খুঁজে পেয়েছিলেন। রামমোহনের 'একেশ্বরবাদ' মতবাদ সম্পর্কে তখন তিনি অবগত। একেশ্বরবাদ চর্চার লক্ষে তিনি গড়ে তুললেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। পরে এর নাম পাল্টে হয় 'তত্ত্ববোধিনী' সভা এবং সেই সভার সাথে 'ব্রহ্মসভা' যুক্ত হয়। এই সভার দায়িত্ব নিয়ে পঁচিশ বছরের তরুণ দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে দীক্ষার ধর্মে রূপায়িত করে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। দ্বারকানাথের জেষ্ঠ্যেপুত্রের হাত ধরেই ঠাকুরবাড়ি ধীরে ধীরে 'ব্রাহ্ম' পরিচয় প্রাপ্ত হল এবং দুর্গাপুজো সেই বাড়িতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল। যদিও এই পুজো বন্ধের ব্যাপারে সকলে সমান মতের অধিকারী ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন - "দুর্গোৎসব আমাদের

সমাজের বন্ধন, সকলের সাথে মিলনের এক প্রশস্ত উপায়। ইহার উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে.."। এরপরও দু'তিন বছর ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপুজো হয়েছিল কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই পুজোয় আর অংশগ্রহন করতেন না, পুজোর সময় তিনি চলে যেতেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় নতুবা তাঁর প্রিয়স্থান হিমালয়ে ।

পিতৃমুখী রবীন্দ্রনাথ পিতার আদর্শে জীবনে কোনো দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু 'দুর্গাপুজো' তাঁর বিপুল সাহিত্যভান্ডারে কখনো ব্রাত্য ছিল না। কবিতা, ছোট গল্প, নাটক কিংবা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে বারবার উঠে এসেছে দুর্গাপুজো। আসলে শরৎ ঋতুর এই উৎসবকে তিনি মাটির প্রতিমাবন্দনায় মৃন্ময়ী না করে শরতের অমল আলোয় প্রকৃতি বন্দনা করে তাকে চিন্ময়ী করে তুলেছেন 'শারদোৎসব' নাটকে। ১৯০০ সালের দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে বন্ধু প্রিয়নাথ সেন কে রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে লিখেছিলেন - " প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী এবং অসীমতার মধ্যে যখন আমরা বিভোর হইয়া আমাদের সমস্ত প্রাণখানি ঢালিয়া দিই,তখনই প্রকৃত পূজা...." এই



'প্রকৃতপূজা' কে উপলব্ধি করতে তিনি মহালয়ায় শান্তিনিকেতনে শুরু করেছিলেন একদিনের মেলা 'আনন্দবাজার'। শরতের আবাহনে সেখানে আশ্রমিক ছাত্রছাত্রীরা মেতে ওঠে মাটির ঠাকুরপুজোর আনন্দে নয়, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার মনের নির্বিরোধ আনন্দে- স্থলপদ্ম, শুভেচ্ছা, শিউলির মাদকতায় আর 'গীতবিতান' এর পাতা থেকে উঠে আসা শরতঋতুর গানে - " শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি...." !

রাজপুত্তুর



কাহিনী/নাট্যরূপ/গীতরচনা- কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পর্দা খুলে যায়। মঞ্চ ফাঁকা। আবহ]

কথক: সে আজ অনেক, অনেকদিন আগের কথা। ভারতের এক স্বাধীন রাজ্য ছিল ঐশ্বর্যনগর। ফুলে-ফলে-শস্যে ভরা ঐশ্বর্যনগর ছিল সুখের এক অনন্ত সাম্রাজ্য। রাজা বিক্রমজিতের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। চারিদিকে থইথই করছে মন্ত্রী, শান্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি আর খিদমতগারের দল। রাজ্য জুড়ে সবার মনে শুধু সুখ, শান্তি আর আনন্দ। শুধু রানি চম্পাবতীর চোখে জলের ছায়া। কারণ?

[সূত্রধরের প্রবেশ]

সূত্রধর(গান)

সে ছিল এক রাজ্য যেথায় ছিলনাকো দুখ।
শান্তি ছিল সবার মনে, সবার মনেই সুখ,
বিক্রমজিৎ রাজার ছিল টুকটুকে এক বউ,
চোখেতে তার জল কোনদিন দেখেনি তো কেউ।।
সেই রানিরই আজ বুঝি হায় এল কাঁদার দিন,
নেইকো ঘরে রাজপুত্র, দুঃখে শরীর ক্ষীণ।
যজ্ঞটজ্ঞ অনেক হল, মিলল না তো ছেলে,
ভাবেন বসে কীসের দোষে পুত্র নাহি মেলে।।

# #

হঠাৎ সেদিন সন্ন্যাসী এক এলেন রাজ সভাতে

শিকড় এনে বলল, রেখো যত্ন করে। রাতে
খাওয়াও বেটে, গেলেই পেটে হবেই হবে ছেলে।।

[প্রস্থান]

[একদিক দিয়ে সূত্রধারের প্রস্থান। অন্যদিক দিয়ে প্রজার দলের প্রবেশ ও নৃত্য।]

প্রজার দল(গান) কী আনন্দ আজ রে, কী আনন্দ আজ।
সবাই এসে, হেসে হেসে পরি নানান সাজ।।
আয় চলে আয় সবাই মিলে
নদী- সাগর- খালে- বিলে
নাচি বিপদ শঙ্কা ভুলে, ভুলে শরম লাজ।।
রাজা- রানির ঘুচলো যে দুখ
রাজ্য জুড়ে তাই শুধু সুখ
জন্ম নিলেন রাজকুমারী এবং যুবরাজ।।

[সকলের প্রস্থান। আনন্দের আবহ বাজে।]

কথক।। জ্বলে উঠল আলোর রোশনাই, নহবৎখানায় বেজে উঠল মাঙ্গলিক সুর, আনন্দের কলরবে ঐশ্বর্যনগর মুখরিত ক'রে জন্ম নিল যমজ ভাইবোন- রাজপুত্র ডালিমকুমার ও রাজকন্যা মণিমালা।
কিন্তু ভগবান বোধহয় রাজা-রানির কপালে সন্তান-সুখ লেখেন নি। তাই সেদিনই গভীর রাত্রে, রাজবাড়ির সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন হঠাৎ এক প্রচন্ড শব্দে রাজপ্রাসাদ টলমল করে উঠলো, অথচ কী আশ্চর্য, প্রাসাদের কারও কিন্তু ঘুম ভাঙলো না-

[মৃদু আলোয় দেখা যায় রানি শুয়ে আছেন। নেপথ্যে প্রচন্ড শব্দ। দৈত্যের হাসি। দৈত্যের প্রবেশ ও নৃত্য।]

দৈত্য।।(গান)

ফুস্ মন্তর ফুস্ মন্তর ফুস্।
তোদের যাক্ চলে যাক্,
যাক্ চলে যাক্ হুঁশ।
হাঁউ মাউ খাঁউ, হাঁউ মাউ খাঁউ হুম্।
তোরা চুপ্‌টি করে সবাই দে রে ঘুম।।
শুধু আমার জন্যে
হেথায় জন্মাল রাজকন্যে,
তাই তাকে নিয়ে বুকে
যাচ্ছি আমি সুখে।।
হাঁউ মাউ খাঁউ হাঁউ মাউ খাঁউ হুম্.....।।

[বিকট শব্দে হাসতে হাসতে রানিমার বুকের কাছে থেকে রাজকন্যাকে তুলে নিয়ে দৈত্য চলে যায়। আলো নেভে।]
[আলো জ্বলে। দামামা বাজে। এক ঘোষকের চারিদিকে লোক জমা হয়।]

ঘোষক।। শোনো শোনো শোনো শোনো শোনো প্রজাগণ,
ঐশ্বর্য নগরীতে কান্ড কি ভীষণ!
প্রাসাদ থেকে রাজকন্যা হয়েছেন হরণ,
তাই তো রাজা প্রজাদের আজ করেছেন স্মরণ।।

******

রাজ্যে রাজ্যে হুকুম জারি,
যে হরেছে রাজকুমারী,
আনলে কেটে মুণ্ড তার-
আধেক রাজ্য পুরস্কার।।

[সকলের প্রস্থান। ঘোষকের গলা মিলিয়ে যায়। দামামা বাজতে থাকে। আলো নেভে।]

কথক।। সারা ঐশ্বর্যনগর জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। রাজকার্য স্থগিত। রাজ্যশুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত। কোথায় গেল রাজকুমারী? কে নিয়ে গেল তাকে? কেউ কিছুই জানে না। তাই ঘোষণা শুনতে কেউ এগিয়ে আসে না রাজকন্যা উদ্ধারে।
এমন সময় সহসা একদিন রাজজ্যোতিষীর গণনায় জানা যায়- বহু, বহু দূরে, পৃথিবীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, 'রত্নগিরি' পর্বতের শিখরে বাস করে যে ভয়ংকর দৈত্য, সে-ই নিয়ে গেছে রাজকন্যা মণিমালাকে, মায়াবলে বন্দী করে রেখেছে তার ঝলমলে সোনার প্রাসাদে।

[**আবহ...** তারপর কেটে যায় বছরের পর বছর। অজানা সেই রত্নগিরি পাহাড়ের সন্ধানে যায় বহু দেশের রাজকুমার, বীর যোদ্ধা, তীরন্দাজের দল। কেউ ফিরে আসে নিরাশ হয়ে, কেউ বা আর ফেরেই না। কিন্তু রাজকন্যার কোন খোঁজই পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র ডালিমকুমার তার দুই বন্ধু মন্ত্রীপুত্র সুবর্ণ ও কোটালপুত্র হিরণ্যর সঙ্গে ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠেছেন আর শিক্ষা-দীক্ষা অস্ত্রচালনায় হয়ে উঠেছেন সুদক্ষ। রাজা বিক্রমজিৎ আর রানি চম্পাবতী এখন শুধু রাজকুমারের দিকে চেয়ে আশায় বুক বাঁধেন আর গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

[আলো জ্বলে। রানি চম্পাবতী রাজপ্রাসাদে একা বসে কাঁদছেন।]

রানিমা।।(গান) হায়রে আমার ছোট্ট মেয়ে
ফেলে কোথায় গেলি চলে,
তোর আশাতেই চেয়ে আছি,
আছি যে পথ চেয়ে।।
ঝিনুক যেমন ছোট্ট বুকে
মুকুতারে লুকায় সুখে
তেমনি যেন তোর ছবিটি আছে হৃদয় ছেয়ে।।

[ডালিমকুমার দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ করে। রানিমাকে দেখে থমকে যায়।]

ডালিম।।(গান) মাগো আমায় সত্যি করে বল্।
চোখেতে তোর কেন এত জল।।
ব্যথা রে তোর কীসের তরে,
দুঃখ কেন হৃদয় ভ'রে,
আমার কাছে করিস্ নে মা ছল।।
রানিমা।।(গান) শোন্ রে বাছা শোন্ রে বলি তবে।
ছোট্ট বোনটি জন্মেছে যেই সবে
হায়রে সে যে হতভাগী
জানতো কে বা কীসের লাগি

দৈত্য তারে হরণ করে লবে।
কোথায় সে এক বিশাল পাহাড়
সোনার প্রাসাদ বাহার যে তার
সেখান থেকে আনতে তাকে হবে।।

ডালিম।।(গান) মা গো আমায় আশিস তবে করো,
তোমার ও হাত আমার মাথায় ধরো ।।
মাগো আমার, মুখটি তোল
শোক ভুলে যাও, ভাবনা ভোল
জেনো তোমার বীরপুত্র হয়েই গেছে বড়ো।।
দৈত্যপুরী ধ্বংস করে
দৈত্যকে নির্বংশ করে
বোনকে খুঁজে আনবো আমি, আমায় আশিস করো।।

[ডালিমকুমারকে রানিমার আশীর্বাদ প্রদান। আলো নেভে।]

কথক।। মা-বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পথে বেরোল যুবরাজ ডালিমকুমার, সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র সুবর্ণকুমার ও কোটালপুত্র হিরণ্যকুমার। কিন্তু পথের নিশানা তাদের ছিল না জানা; তাই পদে পদে তাদের হল দিকভুল, ঘুরে ঘুরে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় শরীর হয়ে গেল কাঠ। তিনদিন তিনরাত ধরে দুটো পাহাড় আর তিনটে নদী পেরিয়ে তারা এসে পড়লো এক গভীর অরণ্যে, সূর্য যেখানে দিনের বেলা ঢুকতেও ভয় পায়।

[সূত্রধারের কথার মধ্যেই তিন বন্ধুর মঞ্চে প্রবেশ ধুঁকতে ধুঁকতে। গভীর জঙ্গল। মৃদু আলো। নানারকম জঙ্গলের আওয়াজ শোনা যায়।]

ডালিম।। তিনটে দিন তো মরছি ঘুরে ঘুরে,
রত্নগিরি আর কতটা দূরে?

সুবর্ণ।। আর পারি না ঘুরতে খালি পেটে,
এমনি করে চলা যায় কি হেঁটে?

হিরণ্য।। এই, ওখানে ঐগুলো কী ফল?
চল্ তো দেখি, ঐ দিকেতে চল্।

সবাই।। চল্ দেখি চল্, ঐ দিকেতে চল্।।

[সকলে গাছের কাছে গিয়ে ফল পেড়ে খায়] (আবহ)

ডালিম।। আজকে তবে আশ্রয় হোক এই গাছেরই তলা।

সুবর্ণ।। কাল সকালে শুরু হবে আবার রাস্তা চলা।

[তিনজনে একপাশে বসে গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমোয়। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর প্রবেশ]



ব্যঙ্গমা।।(গান)

ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্
দ্যাখ্ ব্যঙ্গমী কতই রঙ্গম্।।
বোনের খোঁজে রাজার পুত্তুর
ছেড়ে রাজ্য, মেরে শত্তুর
চলেছে দুই বন্ধুর সঙ্গম্
ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্।।
তিনদিন খাবার নাই যে পেটে
চলছে তিনজন পায়ে হেঁটে
ধূলাতে কালিতে মলিন অঙ্গম্
ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্ ব্যঙ্গম্।।

ব্যঙ্গমী।।(গান)

ব্যঙ্গমা তুই জানিস তো তুকতাক।
রাখ্ না আমার একটা কথা রাখ্।।
ছাড় মন্তর ক্লিহিং কব্লা
দৈত্য যাতে হয় দুব্লা
পথগুলো সব জেনেবুঝে
ঐ দৈত্যের সঙ্গে যুঝে
রাজপুত্তুর বোনকে খুঁজে পাক।।

ব্যাঙ্গমা।।(গান) এই ছাড়লাম মন্ত্র আমার ক্লিহিং কব্‌লা ত্রিণ।
এক মন্তরে দৈত্যরাজের হবেই শক্তি ক্ষীণ।।
এই ছাড়লাম আরেক মন্ত্র 'জৃভঙ্গ মংকার'।
এক মন্তরে দৈত্যপুরীর খুলে যাবে সব দ্বার।
ওরা হবে ছারখার।।
ওরা হবে ছারখার।।
ওরা হবে ছারখার।। (৩)

ব্যঙ্গমী।। সে তো নাহয় মন্ত্র দিলি, কিন্তু এখন বল্‌-
কোন্‌ রাস্তায় যাবে ওরা, তবেই পাবে ফল?

ব্যঙ্গমা।। এই জঙ্গল পেরিয়ে পুবে তেপান্তরের মাঠ,
সেই মাঠেরই প্রান্তে আছে সমুদ্দুরের ঘাট,
সাগরশেষে উত্তরেতে গভীর গহন বন,
আজও সেথায় পারেনি তো ঢুকতে মানুষজন।
বন পেরোলে বিভীষিকার রাজ্য হবে শেষ,
মিলবে সেথায় মায়ায় ভরা অপূর্ব এক দেশ।
সেই বাগানে ফুল কথা কয়, নাচে পরীর দলে-
বীর যে মানুষ, পরীরানি তাকেই রাস্তা বলে।।

[ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর প্রস্থান। ওরা তিনজন উঠে দাঁড়ায়।]

ডালিম।। সুবর্ণ, হিরণ্য, শুনলে তোমরা?
সুবর্ণ/হিরণ্য।। শুনেছি বন্ধু, শুনেছি।
ডালিম।। তবে এসো, কণ্ঠ মেলাই গানে;
বেরিয়ে পড়ি নতুন অভিযানে।।
সকলে।।(গান)
ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমী কি করল উপকার।
নিশানা যে দিয়েই দিল সঠিক সে' রাস্তার।।
এখন চলো বেরিয়ে পড়ি
তার দেখানো রাস্তা ধরি,
মোটেই উচিত হবে না তো দেরি করা আর।।

[সকলে বেরিয়ে যায়। আলো নেভে]

কথক।। একটি দিন কেটে গেল। ব্যঙ্গমার কথামতো যেতে যেতে ওরা পেলে সেই তেপান্তরের মাঠ। সারাদিন সারারাত ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ধূ ধূ মাঠ পেরিয়ে অবশেষে তারা এসে পৌঁছয় এক অকূল সমুদ্রের ধারে।

[কথকের কথার মধ্যেই ডালিম, সুবর্ণ ও হিরণ্যের প্রবেশ। কিছুক্ষণ ক্লান্ত চলা। তারপর হঠাৎ ওরা সমুদ্র দেখতে পায়। পিছনে পর্দায় সমুদ্র। আবহ]

ডালিম।। পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি, হুর্‌রে।

সাগরটা আর কত দূর রে?

সুবর্ণ।।

সাগরটা ঐ পূবদিক রে,
ব্যঙ্গমা বলেছিল ঠিক রে!

হিরণ্য।।

চল্ তবে আর ভয় নয় রে,
সব বাধা করবোই জয় রে।

[আবহসঙ্গীতে ওদের চলা। প্রস্থান। আবার প্রবেশ। সমুদ্র মুছে গিয়ে জঙ্গলের ছবি ফুটে ওঠে। ওরাও যেন প্রবেশ করে জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলের আবহ]



ডালিম।। হায়! এ কী অরণ্য অপার!
চারিদিকে ঘোর অন্ধকার!

সুবর্ণ।। চলো তবু পথ করে এগোনো তো চাই।
চলো চলো চলো সখা সময় যে নাই।

হিরণ্য।। একী? এই অরণ্যে ও কাদের সাড়া
এইদিকে ছুটে আসে দূর হতে কারা?

[চিৎকার করতে করতে বন্যজন্তুদের প্রবেশ]

জন্তুরা সকলে।।(গান) ধর্ ধর্ ধর্, মার্ মার্ মার্।
মানুষগুলোকে সব দে করে দে বার।।
সবাই মিলেই আজ চ' ওদের রুখতে-
কাউকেই দিবি না জঙ্গলে ঢুকতে।
ওরা যেন বনটা না হতে পারে পার।।

আয় আয় হাতি ঘোড়া সিংহ ও বাঘ
পশু ও পক্ষী তোরা জাগ সব জাগ্;
মানুষরা এসে গেছে ঘুমোস না আর।।

হাতি।।(গান) থপ্, থপ্, থপ্।
মানুষদেরই পিষে মারি
ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্।।
কেউ করলে ক্ষতি মোদের
শুঁড়ে করেই ধরে ওদের
থাবার নিচে ফেলব পিষে
টপ্ টপ্ টপ্।।

ঘোড়া।।(গান) চিঁহি চিঁহি চেঁহে,
বন পার হবে কোন্ নর বলছে হে?
আমরা এ বন দিই পাহারা
দেখি তবে আজ কে বা কাহারা
পার হবে এই বন কে হে?

বাঘ।।(গান) হালুম হুলুম হুলুম।
মানুষগুলো করছে বেজায় জুলুম।।
পেট ভরে যে হবে খেতে
তিনটে মোটে মানুষেতে
ভরবে না পেট হচ্ছে যে তাই মালুম।।

সাপ।।(গান) হিস্স্ হিস্স্ হিস্স্।
মানুষগুলোর নিঃশ্বাসে বিষ।।
বাইরে দেখায় বেজায় হাঁদা
ভিতরে তার ফন্দি-ফাঁদা,
তাই তো বলি, ওইগুলোকে
বেজায় তাড়া দিস্।।

সকলে।।(গান) তাড়া রে তাড়া রে তাড়া।
তাড়া ওদের তাড়া।
নইলে আমরা সবাই এবার
হবই বাস্তুহারা।।
মানুষরা সব কূটকচালে

করবে দিশেহারা
আসবে যেসব মানুষ হেথায়
সবাই যাবে মারা।।

ডালিম।।(গান) দাঁড়াও বন্ধু দাঁড়াও।
কেন মোদের তাড়াও।।
চলেছি আমি বোনের খোঁজে
হারিয়ে গেছে কোথায় ও যে,
হাত তোমাদের বাড়াও।।

সকলে।।(গান) বন্ধু মোরা চাইছি ক্ষমা
বন্ধুতা যা হল জমা-
তার জোরেতেই আমরা তোমায়
পার করাবো বন,
যাও গো তুমি, যাও খোঁজ বীর
হারিয়ে যাওয়া বোন।।

[সব জীবজন্তুরা গান গাইতে গাইতে ও নাচতে নাচতে ডালিমকে ঘিরে ধরে বনের একদিক দিয়ে নিয়ে যায় পথ দেখিয়ে, অন্যদিক দিয়ে ঘোড়াটা চুপিচুপি সুবর্ণ ও হিরণ্যকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ডালিমের হঠাৎ খেয়াল হয়।]

ডালিম।। কিন্তু আমার বন্ধু দুজন?
কোথায় গেল ওরা?
তাহলে কি বদমাশ ওই
আগুনরাঙা ঘোড়া?
দু-বন্ধুকে পিঠে তুলে পালিয়ে গেল দূরে;
হায় সখারা, চললে কোথায় একলা ফেলে মোরে?
সুবর্ণ- হিরণ্য-

[ডালিম দিশেহারা হয়ে ডাকাডাকি করে। আলো নিভে আসে।]
[আলো জ্বলে। ডালিম একা একা পথে ঘুরে ঘুরে গান গায়।]

ডালিম।।(গান) হায়রে আমার এমন কপাল পোড়া।
হারিয়ে গেলি বন্ধুরা সব তোরা।।
কোথায় গেল সঙ্গীসাথী
একলা চলি দিবসরাতি
যন্ত্রনা কি বিষম অঙ্গজোড়া।।
কোথায় আছিস মোর সোনাবোন
তোর তরে যে ব্যাকুল এ মন,
দেখা দে বোন, দেখা দে বোন ত্বরা।।

[প্রস্থান]

[আনন্দের আবহ বাজে। বাগানের আবহ। ফুল ও পরীর দল গানের সঙ্গে প্রবেশ করতে থাকে। ডালিমের প্রবেশ। সঙ্গীত ও নৃত্য]

ডালিম।।(গান) সামনে অপূর্ব ও কিসের কানন?
কানন কী, ও যে এক নন্দনবন!
ফুলে ফুলে সাজানো যে গাছ,
তারি মাঝে পরীদের নাচ –
অবশ মাতাল হল আমার এ মন।।

[ডালিম একপাশে দাঁড়ায়। ফুল ও পরীদের নৃত্য শুরু হয়।]

MUSIC – BALLET DANCE

পরী ১।। কে গো তুমি কুমার? তোমার কোন্ দেশেতে বাসা?
পরী ২।। দূরদেশী এই অচিন রাজ্যে কীসের জন্য আসা?
পরী ৩।। দেখে ভাবি, হয়তো তুমি রাজপুত্রই হবে।
পরী ৪।। কেন তুমি জীর্ণশীর্ণ এমন বেশে তবে?

ডালিম।।(গান) শোন ওগো ফুলের রেণু, ওগো পরীর দল-
নামটি আমার ডালিমকুমার, নেইকো এতে ছল।।
ঐশ্বর্যনগরে বাড়ি
যুবরাজ যে আমিই তারই
হারানো বোন খুঁজছি তাকে কোথায় পাবো বল
পথের দিশা ভিক্ষা করি দিয়ে চোখের জল।।

পরীরানি।।(গান) আহা তোমার দুখের কথা বড়োই বুকে বাজে।
আমরা তোমায় সাজিয়ে দেব আসল যুদ্ধসাজে।।
জয় ক'রে সব দত্যি দানো
বোনকে তোমার ফিরিয়ে আনো
যুদ্ধ করো চড়ে তোমার নতুন পক্ষিরাজে।

[রানি তিনবার হাততালি দেন। একটি সুসজ্জিত পক্ষিরাজ ঘোড়া হাজির হয়। সেটি ডালিমকুমারকে উপহার দেওয়া হয়।]

ডালিম।। ধন্য আমি ধন্য ওগো রানি,
এ ঋণ কভু শোধ হবে না জানি।
তোমার কাছে এই শপথ আমার-
বোনকে আমি করবই উদ্ধার।

[সকলে ডালিমকুমারকে ঘিরে দাঁড়ায়। নাচ- গান শুরু হয়।]

সমবেত।।(গান) নেইকো দেরি আর
জয়ের নেইকো দেরি আর।
পক্ষীরাজে চড়ে কুমার

সাত সমুদ্র পার
হবে সাত সমুদ্র পার।।

ডালিম।।(গান) দেবতারা কোথায় আছ হুলুধ্বনি দাও,
অমঙ্গলের শয়তানেরা এবার শুনে নাও-

সমবেত।।(গান) দৈত্যের বুক চিরবে এবার
ডালিম বোনটি ফিরবে এবার
দৈত্যরাজের হার
হবেই দৈত্যরাজের হার।।

[আলো নিভে আসে। আবহ]

কথক।। পরীরানির দেওয়া পক্ষীরাজে চ'ড়ে রাজকুমার ডালিম উড়ে চললো কত নদী-জঙ্গল-পাহাড় পেরিয়ে একা। দুদিন ধরে উড়তে উড়তে অবশেষে তার চোখে পড়ে – এক গভীর অরণ্যের মধ্যে, এক আকাশছোঁয়া পর্বতের মাথায় সূর্যের আলোয় ঝক্‌মক্‌ করছে এক অপরূপ সোনার প্রাসাদ। ডালিমের পক্ষীরাজ এসে নামে সেই প্রাসাদের ছাদে।

[ডালিমের প্রবেশ ও গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী]

সূত্রধর।।(গান) সোনার বরণ প্রাসাদ সেথায়, সোনালী তার দেহ
গোটা প্রাসাদ খাঁ খাঁ করে, কোথাও নাই কেহ।
প্রাসাদখানি ঘোরে ডালিম গুটি গুটি পায়,
একটি ঘরে গিয়েই হঠাৎ থমকে সে দাঁড়ায় –

[ঘুরতে ঘুরতে ডালিম হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। দেখা যায় খাটে শুয়ে আছে রাজকন্যা মণিমালা। ঘরের চারিদিকে পাথর হয়ে থাকা কিছু লোক। তার মধ্যে সুবর্ণকুমার ও হিরণ্যকুমারও আছে। রুদ্ধশ্বাস আবহ (SUSPENSE MUSIC) বাজে। ডালিম এগিয়ে যায়।]

ডালিম।।(গান) আহা এ কি অপূর্ব কান্তি।
শান্তি শান্তি।
অঙ্গে কি গভীর প্রশান্তি।
শান্তি শান্তি।।
লালিত্য-সুষমায় ভরা
এই কি মোর ভগ্নী অধরা?
বুকে আশা হয়নিকো ভ্রান্তি।
শান্তি, শান্তি।।

<কথা>-

বোনটি আমার ঘুমিয়ে আছে, চক্ষে ভরা জল,
কেন রে বোন, বল্‌ না আমায় বল্‌?
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দিয়ে
দৈত্য বুঝি গেছে ঘুম পাড়িয়ে?
এই নে তবে ভাঙাতে তোর ঘুম
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি

বদলিয়ে দিলুম।

[মাথার কাঠি পায়ে ও পায়ের কাঠি মাথায় দিতেই মণিমালা উঠে বসে। অবাক।]

মণিমালা।।(গান) কে গো তুমি অচিনদেশী কুমার?
বুকে অমিত সাহস দেখি তোমার।।
দুর্জয় এই দৈত্য প্রাসাদখানি,
এর ভেতরে দৈত্য ছাড়া জানি
আসতে নারে মানুষ দেশের ছেলে
কে গো তুমি? কোথার থেকে এলে?

ডালিম।।(চিৎকার) বোন রে আমার! চিনতে পারিস নে?
আমি যে তোর দাদা ডালিম রে!!

মণিমালা।।(থমকে গিয়ে) দাদা!

[দুজনে ছুটে গিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। আবহ বাজে]

মণিমালা।।(গান) আজকে তবে পড়ল মনে দাদা?
শুনতে পেলে আজকে বোনের কাঁদা?
দত্যিগুলো জ্বলবে রাগে
তাই তো ওদের আসার আগে
পালিয়ে চলো, নইলে পাবে বাধা।।

ডালিম।। এমনি এমনি পালিয়ে যাব? অতই ভীতু নাকি?
এখনো তো দত্যিগুলোর অনেক শাস্তি বাকি!
দ্যাখ্ কীভাবে ওদের করি ঢিট্,
এই তলোয়ার কাটবে ওদের ইঁটের মতো পিঠ।

মণিমালা।। না দাদা না, মরণ ওদের নেই মানুষের কাছে;
এই প্রাসাদের রূপকাননে রত্নভরা গাছে
পান্নফুলের বীজটি তুমি কাটতে যদি পারো,
তবেই জেনো সেই কোপেতে মৃত্যু হবে তারও।
এই যে দ্যাখো বাগান থেকে চুরি
করেছিলাম প্রাণভোমরা পান্নাফুলের কুঁড়ি।
নাও ধরো এই পান্না,
বীজ কেটে আজ ঘোচাও বোনের কান্না।

[মণিমালা ফুল বের করে দেয়।। ডালিম তলোয়ার দিয়ে কাটতে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রলয়ংকর কাণ্ড বেঁধে যায়। প্রচন্ড জোর আবহ। দৈত্যের হাসি।]

ডালিম।। ও কী? আকাশ কালো করে উঠলো কেন ঝড়?

গাছ-পালা-ঘর কাঁপছে কেন থর্-থর্-থর্-থর্?
পৃথিবী আজ দুলছে যেন হচ্ছে ভূমিকম্প
কে যেন ঐ আসছে হেথায় দিয়ে বিরাট লম্ফ?

[প্রচন্ড শব্দে হাসি ও গর্জনের সঙ্গে দৈত্য প্রবেশ করে]

দৈত্য।।(গান) কন্যে তুমি ভেবেছিলে আমি বড়ই বোকা?
অত সহজ নয়তো জেনো প্রাণটি আমার রোখা।।
কে অর্বাচীন আমার ঘরে ঢুকিস এমন রাতে
এক্ষুনি যা ফিরে, নয়ত মরবি আমার হাতে
যা ফিরে যা মুর্খ মানুষ দুগ্ধপোষ্য খোকা।
মানুষ হয়ে অত সহজ নয় আমাকে রোখা।।

ডালিম।।(গান) জেনে রাখ্ মোটা মাথা হাঁদা,
রাজকুমারীর আমি দাদা
বাঁচতে চাইলে কর সন্ধি।
তাহলে না মরে হবি বন্দি।।

[আবহসঙ্গীত চলতে থাকে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দৈত্য ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে।]

দৈত্য।। এখনো শোন্, ভালোয় ভালোয় যা ফিরে যা ঘর।
ডালিম।। কথা যখন শুনলি না তুই, তবে এখন মর্।
[ডালিম দৈত্যের বুকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দেয়। বিভৎস চিৎকার করে দৈত্য পড়ে যায়। ধোঁয়ার আড়ালে দৈত্যকে দেখা যায় না। ধোঁয়া মিলিয়ে গেলে দেখা যায়, দৈত্য রূপান্তরিত হয়েছে এক অপূর্বসুন্দর রাজপুত্রে]

রাজপুত্র চন্দনকুমার(গান)।।আমায় দেখে তোমরা বোধহয় অবাক হয়ে গেলে।
কিন্তু জেনো, আসলেতে আমিও রাজার ছেলে।।
পূর্বদিকের অবন্তীপুর রাজ্যে আমার ঘর,
দৈত্য হয়ে ছিলাম আমি অভিশাপের পর।
জানতাম যে তোমার হাতেই মুক্তি আমার আছে।।
সেই লোভেতেই বোনটি তোমার রাখতে আমার কাছে
বোনকে তোমার করেছিলাম জন্মদিনে চুরি,
জানতাম ঠিক তুমি এসে মারবে বুকে ছুরি
বোনের সুলুক পেলে।
আজকে যেন মুক্তিরূপে বন্ধু তুমি এলে।।

(কথা) বন্ধু যুবরাজ!
তোমার হাতে মুক্তি পেলাম আজ।
এসো তবে, পুণ্য এই প্রভাতে
বন্ধুত্বের হাতটি রাখো হাতে।

ডালিম।। বন্ধু!! [দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে]

চন্দনকুমার।। দৈত্য হয়ে যাদের আমি মন্ত্র দিয়ে মায়ায়
পাথর করে রেখেছিলাম এই প্রাসাদের ছায়ায় –
দ্যাখো বন্ধু, সূর্য উঠছে আকাশ আলো করে
ঐ আলোতেই মুক্তি ওদের এই অপরূপ ভোরে।

[মঞ্চের পিছনে পর্দায় সূর্য ওঠে। সেইসঙ্গে পাথরগুলো নড়ে ওঠে।]

ডালিম।। আশ্চর্য! অদ্ভুত! অবাক কান্ড এ কী!
চোখের সামনে স্বপ্ন যেন সত্যি হল দেখি!

[ইতিমধ্যে সকলে প্রাণ ফিরে পায়। সবাই একসঙ্গে সামনে হাত মেলে ধরে]

সমবেত।। রাজকুমার!!

[ডালিম চারিদিকে ফিরে ফিরে তাকায়। সুবর্ণ ও হিরণ্য উঠে এসে ডালিমের দুপাশে দাঁড়ায়। আনন্দের আবহ বাজে।]

ডালিম।। আহা, এ কি অপূর্ব দিন আজ!
মনে হচ্ছে এবার আমি সত্যি যুবরাজ।
ঐ যে আলোয় আকাশ গেছে ভরে
এসো সূর্যপ্রণাম করি হাতেতে হাত ধরে।

[সবাই হাত ধরাধরি করে নাচতে-গাইতে শুরু করে]

সবাই।।(গান) আজকে আমরা অরুণ আলো শুধুই বেড়াই খুঁজে।
সূর্য যে আজ জয় পেয়েছে নিশার সাথে যুঝে।
হে রবি আজ ঘুচাও নিশা
ফুটিয়ে তোল আলোর দিশা
আমরা যেন সঠিক পথটি নিতে পারি বুঝে।।

[ধীরে ধীরে পর্দা পড়তে থাকে।]

[সমাপ্ত]

ছবিঃ পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবিষ্যৎকাল থেকে জয়ঢাকে বিজ্ঞাপন
আমাদের এই অফিসে যোগাযোগ করুনঃ

রেভারেন্ড আইকুটুঙ্গা
১ব্রিক্স আলফাটি.থার্ড রো,অনিগ্রা,
প্ল্যানেট ফোর, সিরিয়াস
গ্যালাকটিক ইনডেক্স নম্বর ৭৪৩১৬৫

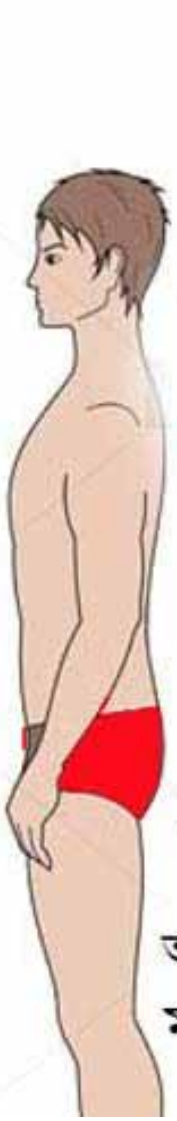


সবুজের অভিযান



ক্যালকাটা গ্রিন-উইচ
ফোন-১২১২৩২১২৩৪

নিজের খাদ্য নিজে বানান।







সাতদিনে সম্পূর্ণ চামড়া
ছাড়িয়ে ফেলে নতুন
গাছের ছাল প্রতিস্থাপন।
প্যাকেজ ডিলের সুব্যবস্থা আছে।



আম, জাম, শিম, লেবু ও কচু- পাঁচটি আকর্ষণীয়
মডেল থেকে নিজের ভবিষ্যত রূপ বেছে নিন।

"পিসেমশাই মরবার উইলটা কোথা... বলে যেতে পারল না-বু হু হু হু হু-

"বাজারে গিয়ে শেষ পচা মাছ আনলি?..

"অংক পরীক্ষার প্রশ্নটা দেখে নিতে পারলে পাশ করে যেতাম মা!





2016

1980



টেম্পো ট্র্যাভেল কম্পানি নিয়ে এল

নতুন টাইম-ওলা

গতকালে ফিরে যাবার একমাত্র ট্যাক্সি

যোগাযোগ

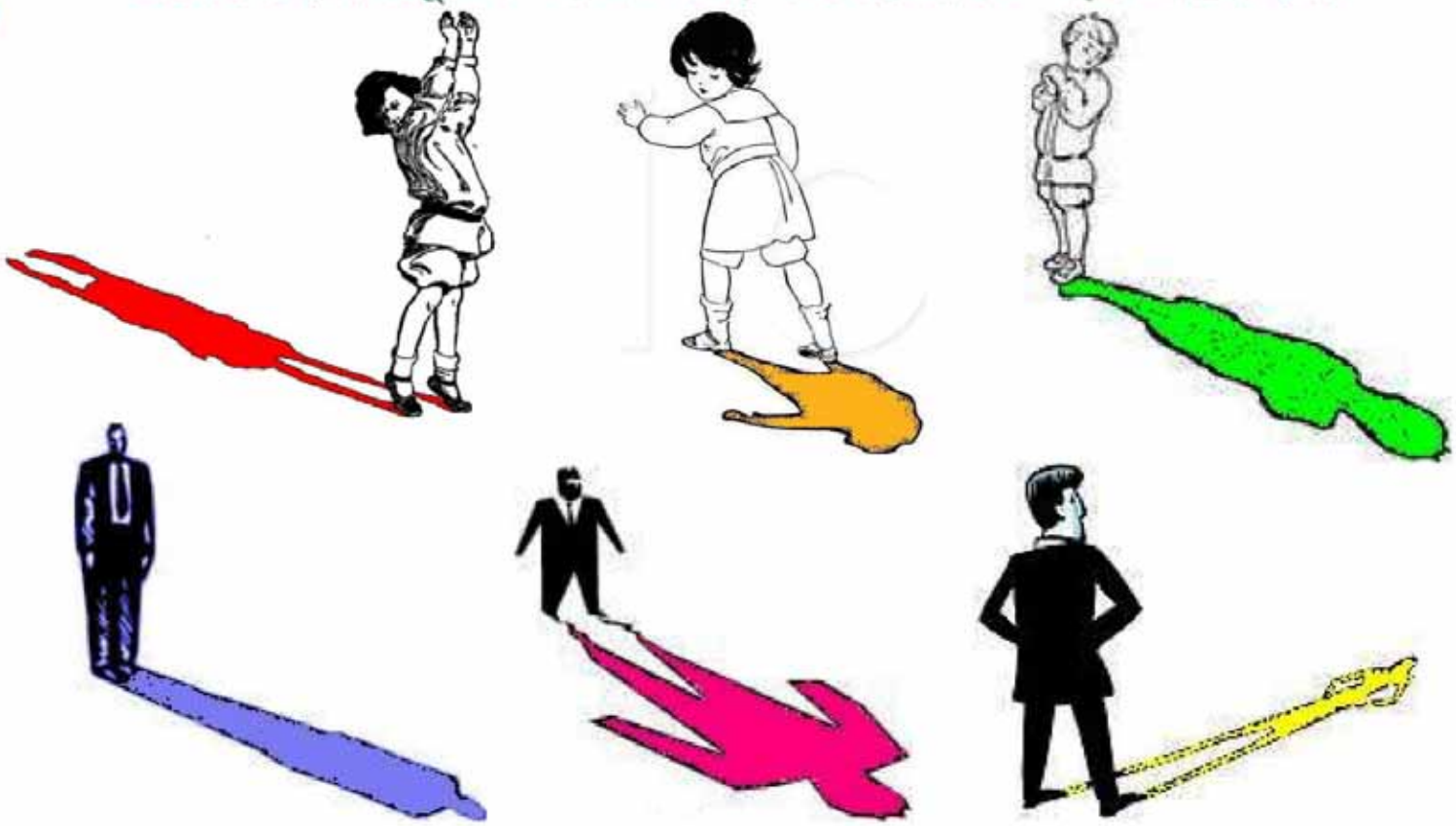
খৃঃ পুঃ দশ লক্ষ- ওলডুভাই ইথিওপিয়া
খৃঃপুঃ ৫০০০- হরপ্পা সিটাডেল
খৃ পুঃ ৩০০ -১৭, বুদ্ধ সরণি, কপিলাবস্তু

১৭শ শতাব্দি থেকে প্রতি শতাব্দিঃ
লালকেল্লা দিওয়ান ই খাস
২২শ শতাব্দিঃ স্পেস স্টেশন সিগমা

বিজ্ঞাপন

নিজের কালো ছায়া দেখে দেখে বিরক্ত?

এসে গেছে রামধনুকের স্ফটিক জামা, পরলেই মাটিতে পড়বে রঙিন ছায়া।





পুজোয় চাই নতুন জামা ও নতুন ছায়া

রামধনুক বস্ত্রালয়

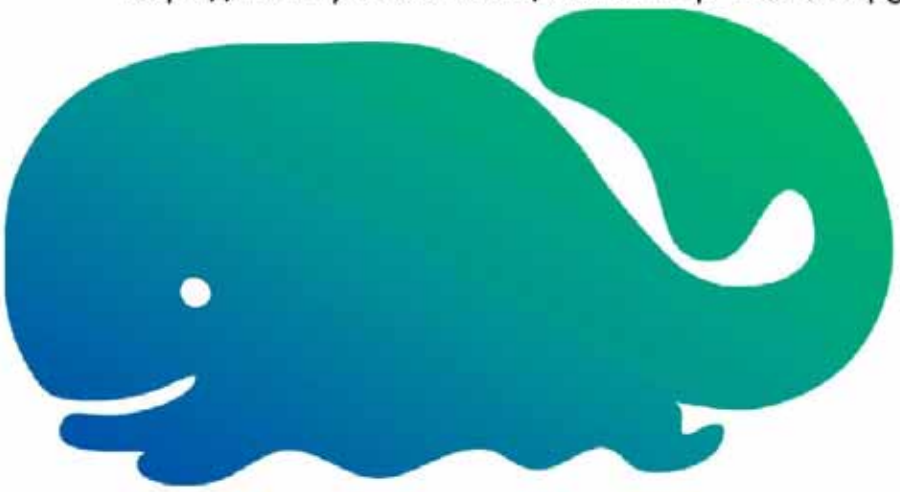
আমাদের কোনও শাখা নেই

TM

বিজ্ঞাপন



ভাবছ বুঝি তোমরাই শুধু গান গাইতে পারো?
হুঁ হুঁ বাবা, আমরাও পারি।
পুজোয় রিলিজ হতে চলেছে আমাদের গানের অ্যালবাম
তিমির অবগুণ্ঠনে
ইউটিউবে আমাদের গান নিচের লিংকগুলোয় পাবে
https://www.youtube.com/watch?v=WabT1L-nN-E
https://www.youtube.com/watch?v=h8xdz92Ij60
https://www.youtube.com/watch?v=p-7QrQ0cbpg





তোমায় গান শোনাব...
তিমিতিমিঙ্গিল মিউজিক

বিজ্ঞাপন

ডিটেকটিভ হতে চাও?



সমস্তরকম ক্লু-এর সম্ভার

আমাদের এখানে ক্লোরোফর্মে ভেজানো রুমাল, নস্যির ডিবে, সিগারেটের আধখাওয়া টুকরো, হাতলে আঙুলের ছাপওয়ালা ছোরা, রক্তের দাগ লাগা ক্ষুর, ডগায় বিষ মাখানো আলপিন, গুলির ফাঁকা কার্তুজ, পুরনো ডায়েরি... ইত্যাদি যাবতীয় ক্লু পাওয়া যায়।



আর দেরি কেন? এখুনি তদন্তে নেমে পড়ো।



কুলুক্কুলু ডট কম

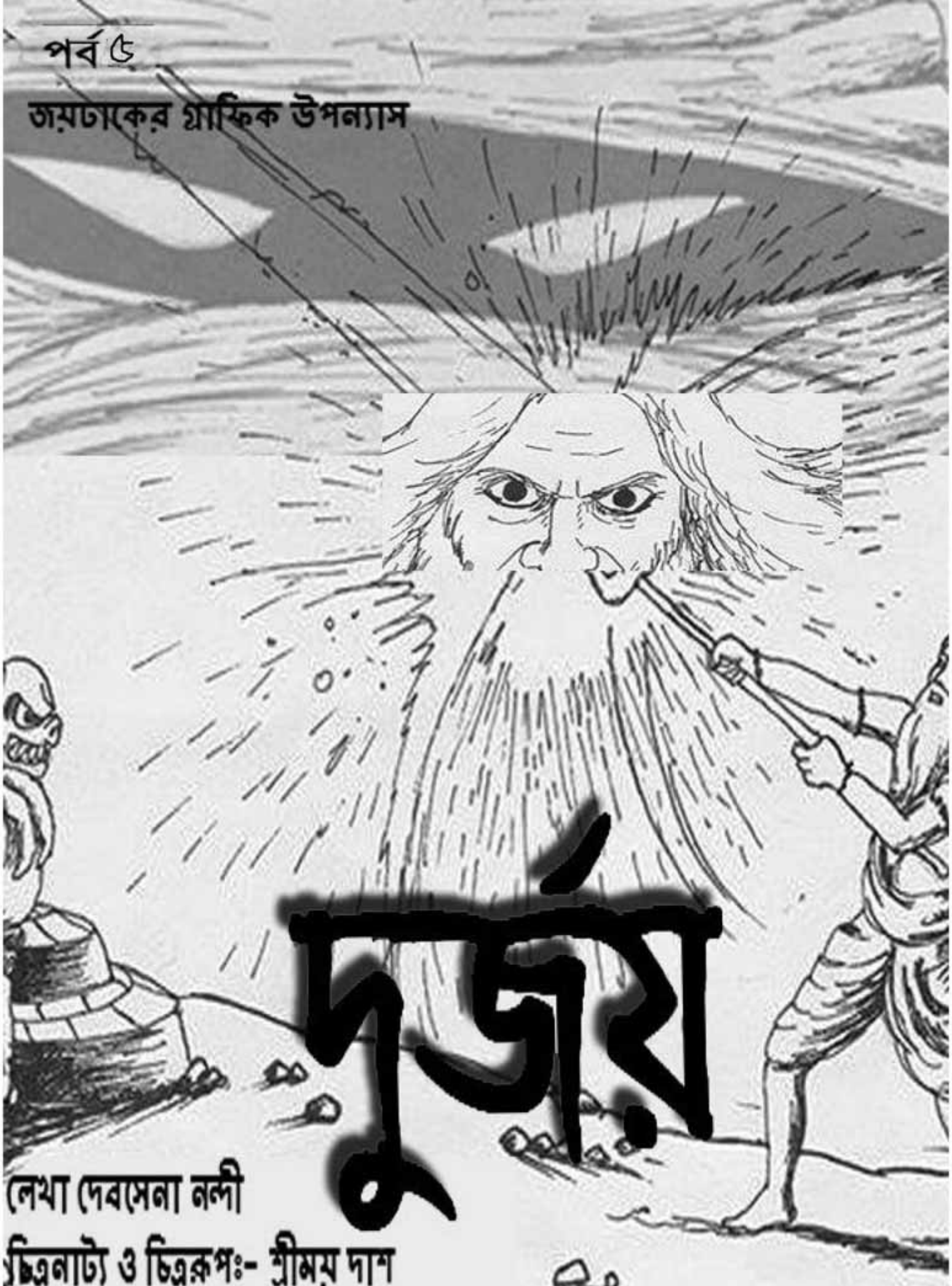
INCLUED. The Clue Shop.

Clue for the Clueless

TM

পর্ব ৫

জয়ঢাকের গ্রাফিক উপন্যাস



দুর্জয়

লেখা দেবসেনা নন্দী

চিত্রনাট্য ও চিত্ররূপঃ- শ্রীময় দাশ

চিন্তা কোরো না গৌর।

মায়াকালের পক্ষে দুর্জয়, উদিত আর পুষ্পাকে মারাটা অতটাও সহজ হবে না, কারন.....

ওদের প্রত্যেকের জন্মমুহূর্তে মায়াকাল ওদের মারার চেষ্টা করেছে। তার অর্থ আমি যেমন দেখেছিলাম যে একদিন আমাদের রক্ষাকর্তা আসবে, তেমনি সেও হয়তো কোনো ভবিষ্যদ্বানীতে দেখেছে যে তার মৃত্যু কার বা কাদের হাতে নিশ্চিত।
আশা করি যোগাযোগ দুটি নিতান্তই কাকতালীয় নয়—

তাও ভয় হয় দুর্জয়। তাও ভয় হয়। তোমাদের জন্মের পর থেকে একবারও কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যায় চাঁদ কেন উঠল না?

কেন?

নাঃ। এখনও সময় আছে। আজ নয় কাল ঠিক উঠবে।

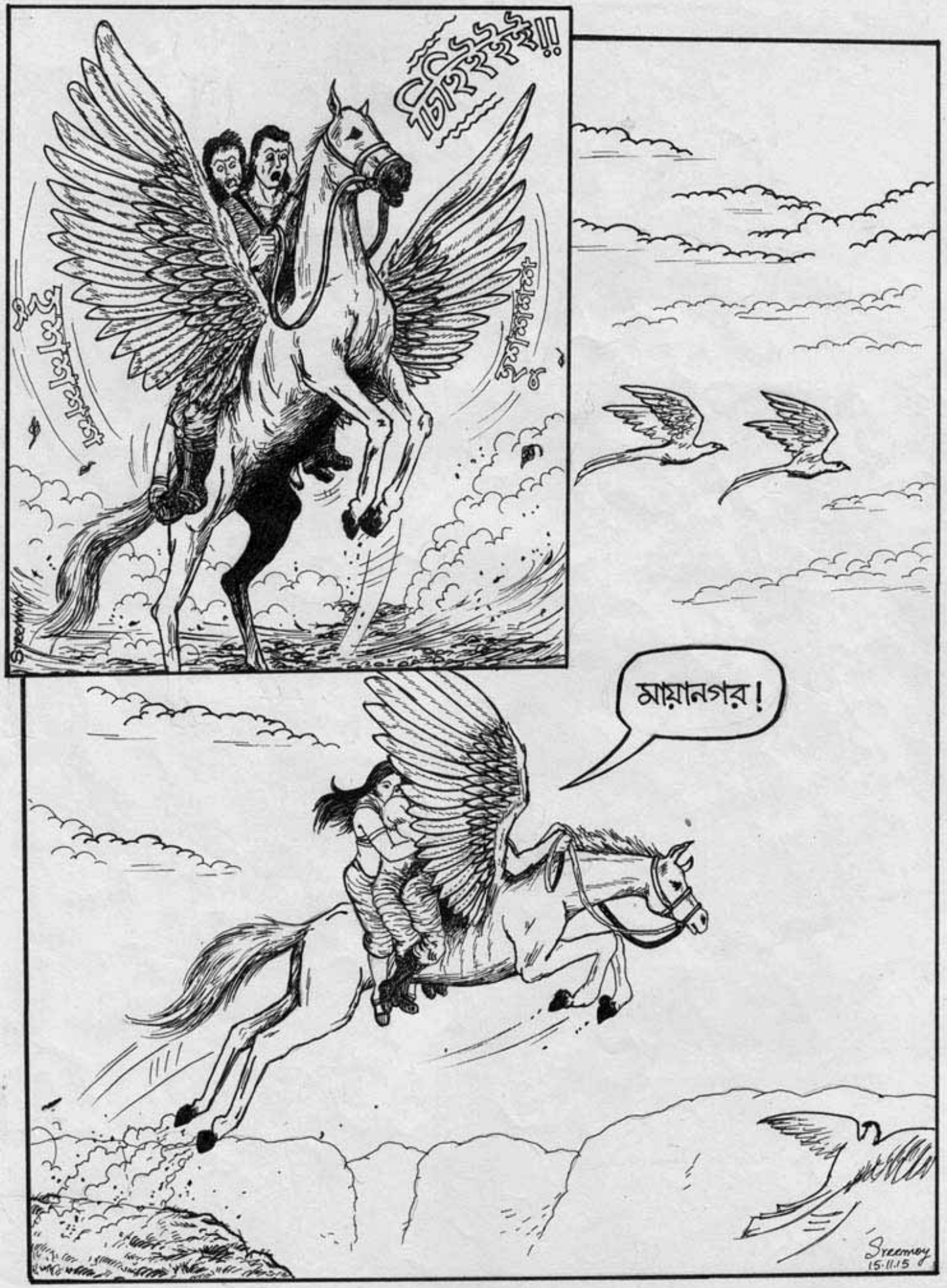
Swemoy

টগবগ টগবগ

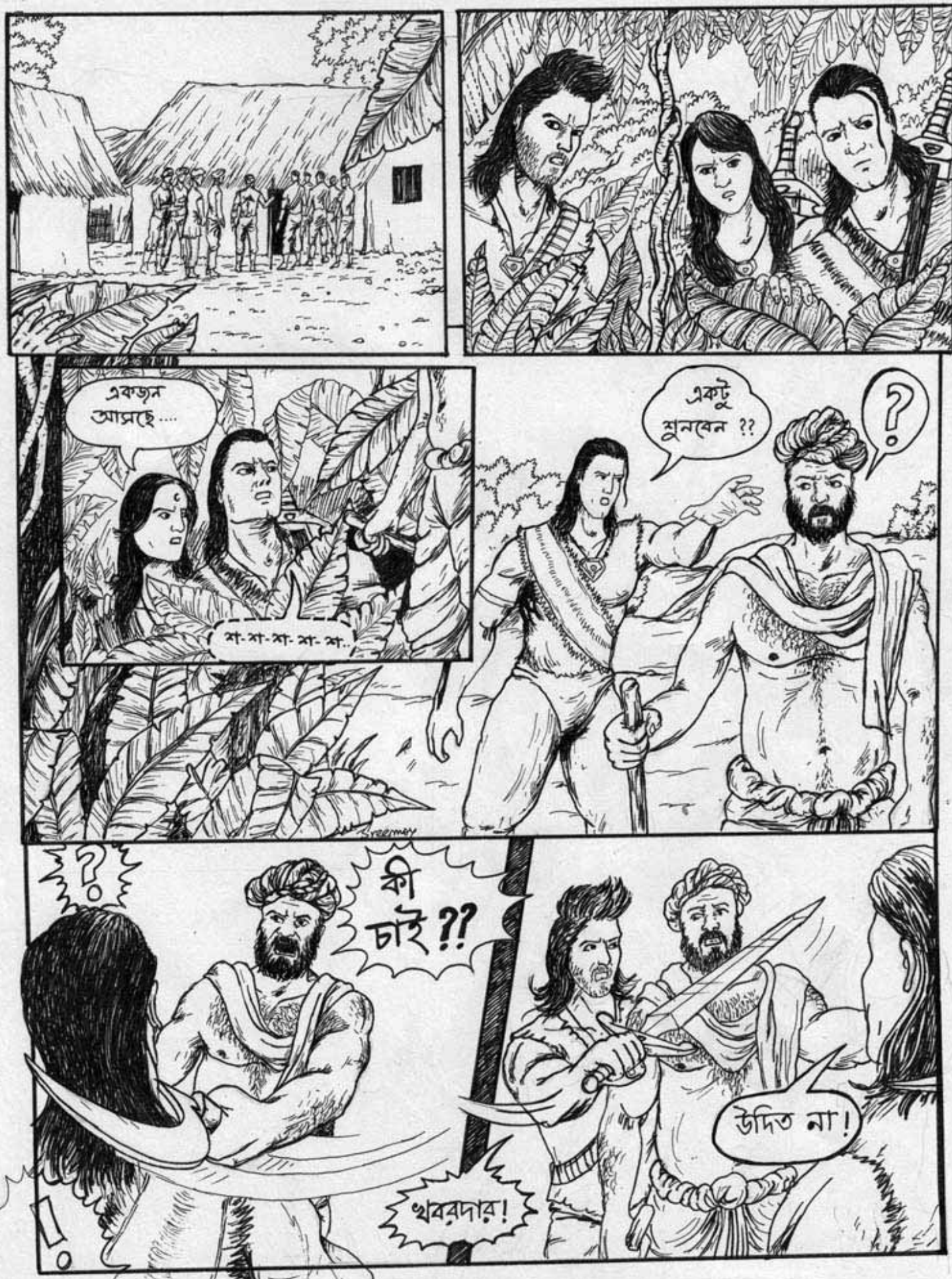
গুরুদেবের ওখানে তো হেঁটেও যাওয়া যেত। আবার ঘোড়া কেন?

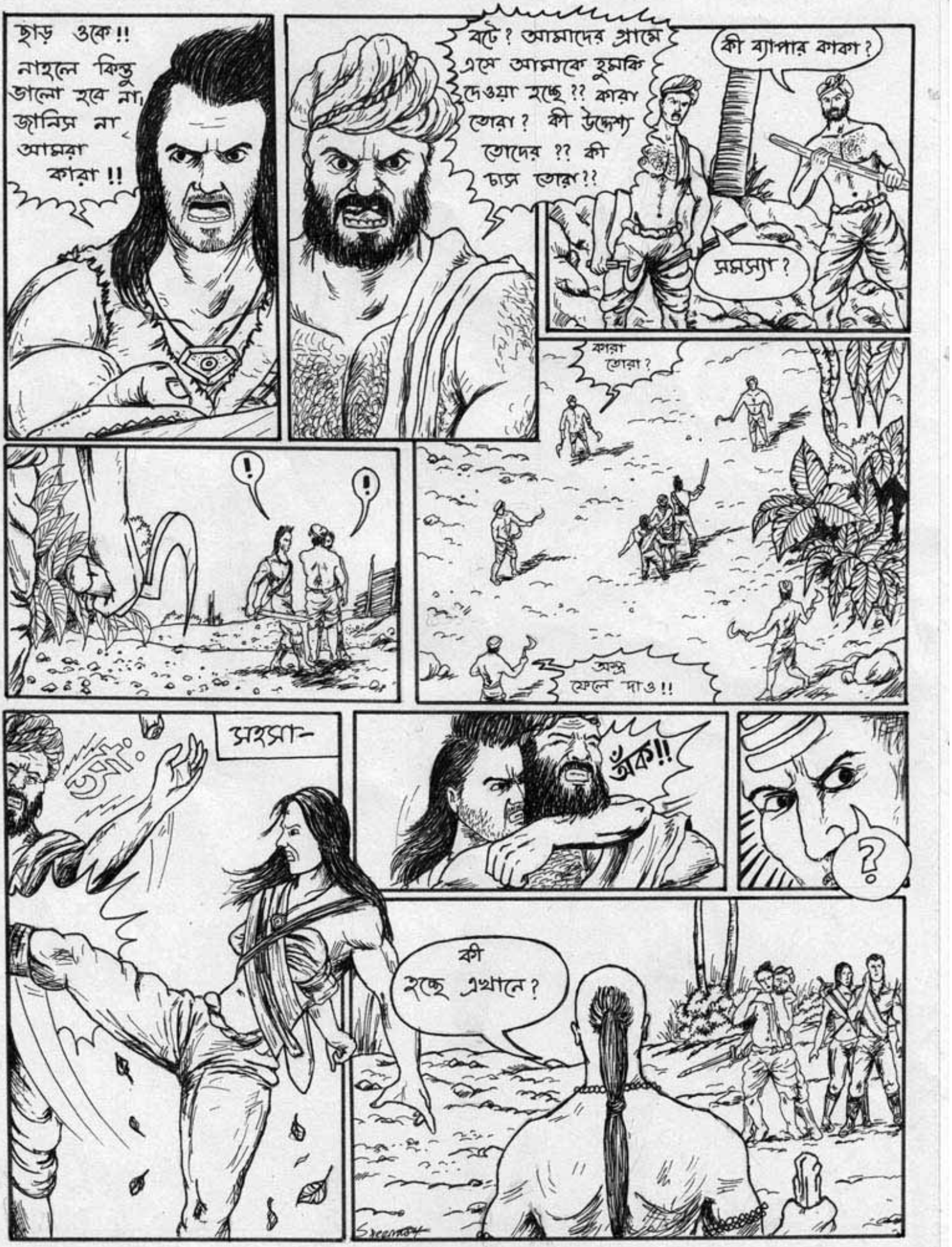
কারন আমরা গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি না।

তো কোথায় যাচ্ছি আমরা?


চিহিহিহি!!
মায়ানগর!
Sreemoy
Sreemoy
15.11.15


এটা হল মায়ানগর.... আর এই ঝরনার ওপারে সুন্দরগড়।
ঝরনার আওয়াজে কিছু শোনা যাচ্ছে না, ওদিকে চল।
এবার যাওয়া যাক।
হুঁ..
সব কেমন যেন চুপচাপ....
একটা শব্দ পেলি?
কোনটা বলতো?
ঐদিক থেকে আসছে।
বলছিস?
গিয়ে দেখব?
কান্নার আওয়াজ মনে হচ্ছে-


একজন আসছে....
সা-সা-সা-সা-সা..
একটু শুনবেন ??
?
কী চাই ??
?!
খবরদার!
উদিত না!

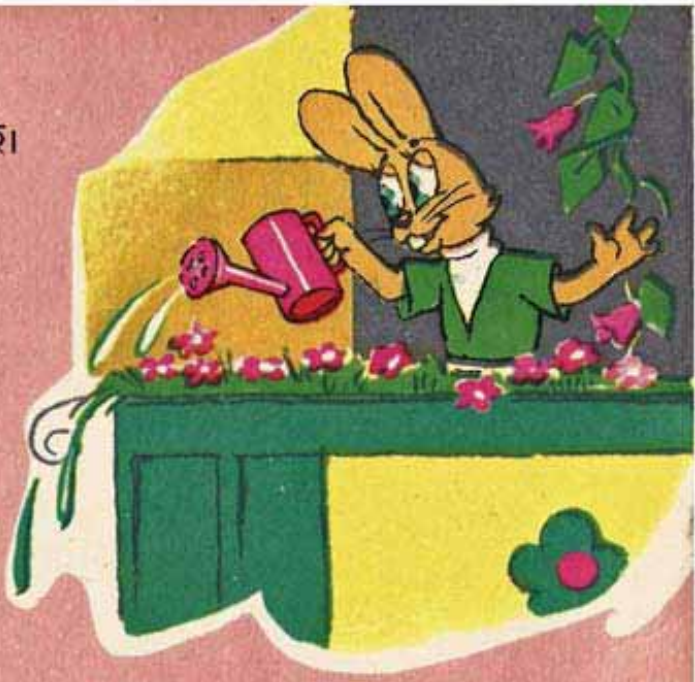

ছাড় ওকে!!
নাহলে কিন্তু ভালো হবে না। জানিস না আমরা কারা!!
বটে? আমাদের গ্রামে এসে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে?? কারা তোরা? কী উদ্দেশ্য তোদের?? কী চাস তোরা??
কী ব্যাপার কাকা?
সমস্যা?
কারা তোরা?
!
!
অস্ত্র ফেলে দাও!!
সহসা-
ওঁক!!
?
কী হচ্ছে এখানে?


এরা কারা সুধীর?
কী হয়েছে?
এই ছাড়!!
ছেড়ে দে ভাই।
প্রনাম মহারাজ।
এরা কারা?
জানি না মহারাজ। আগে এ গ্রামে এদের কখনও দেখিনি।
দেখুন এরা সশস্ত্র! এরা নিশ্চয়ই মায়া-
থামো!
আমি দেখছি। নিজেদের পরিচয় দাও।
ঋষিবর, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে এক বনিকের দল এখানে এসেছিল, তাদেরই আরক্ষক আমরা, কালরাতে আমরা দলছুট হয়ে গেছি। বিশ্বাস করুন আপনাদের ক্ষতি করতে আমরা আসিনি, আর আ-আমি পঙ্কক, এরা আমার সাথী- সুবাহু আর নির্ঝরা।
বেশ! তোমরা চলো আমার সাথে।
তবে তোমাদের কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে গ্রামবাসীরা তোমাদের ছেড়ে কথা বলবে না.



সংগ্রাহকঃ সৌরভ দত্ত

নেকড়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে। খিদেও পেয়েছে বেশ। সন্ধে হয়ে এসেছে।
কিন্তু এখনো প্রাতরাশটাও জোটেনি তার। ঠিক তক্ষুণি–





ওটা কে রে? চেনা চেনা ঠেকে!!!



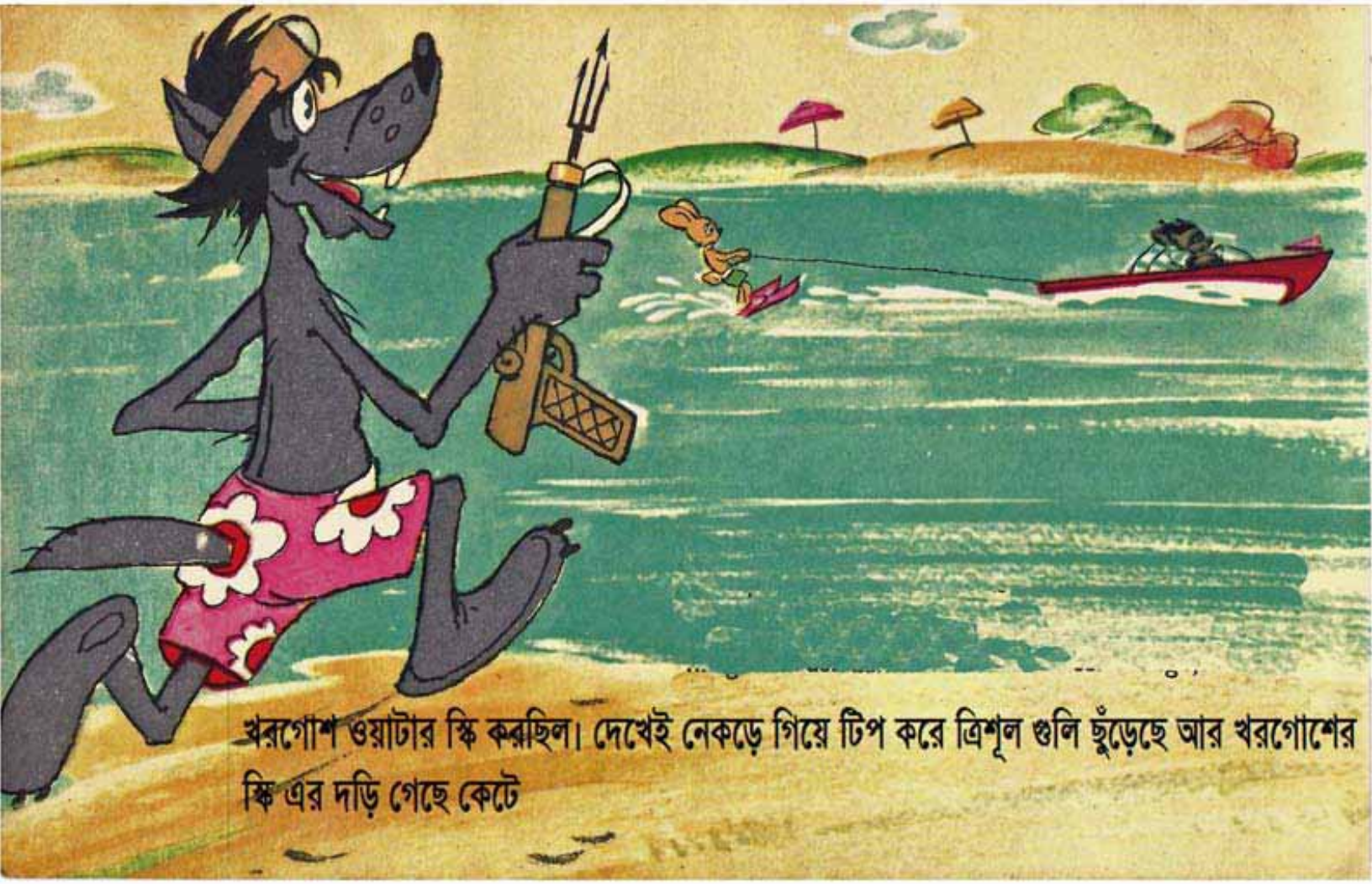
দড়ি বেয়ে উঠতে গেল নেকড়ে।

খরগোশও কম চালাক নয়।

মাটিতে আছড়ে পড়ে নেকড়ে বলে
"দাঁড়া দেখাচ্ছি!!"

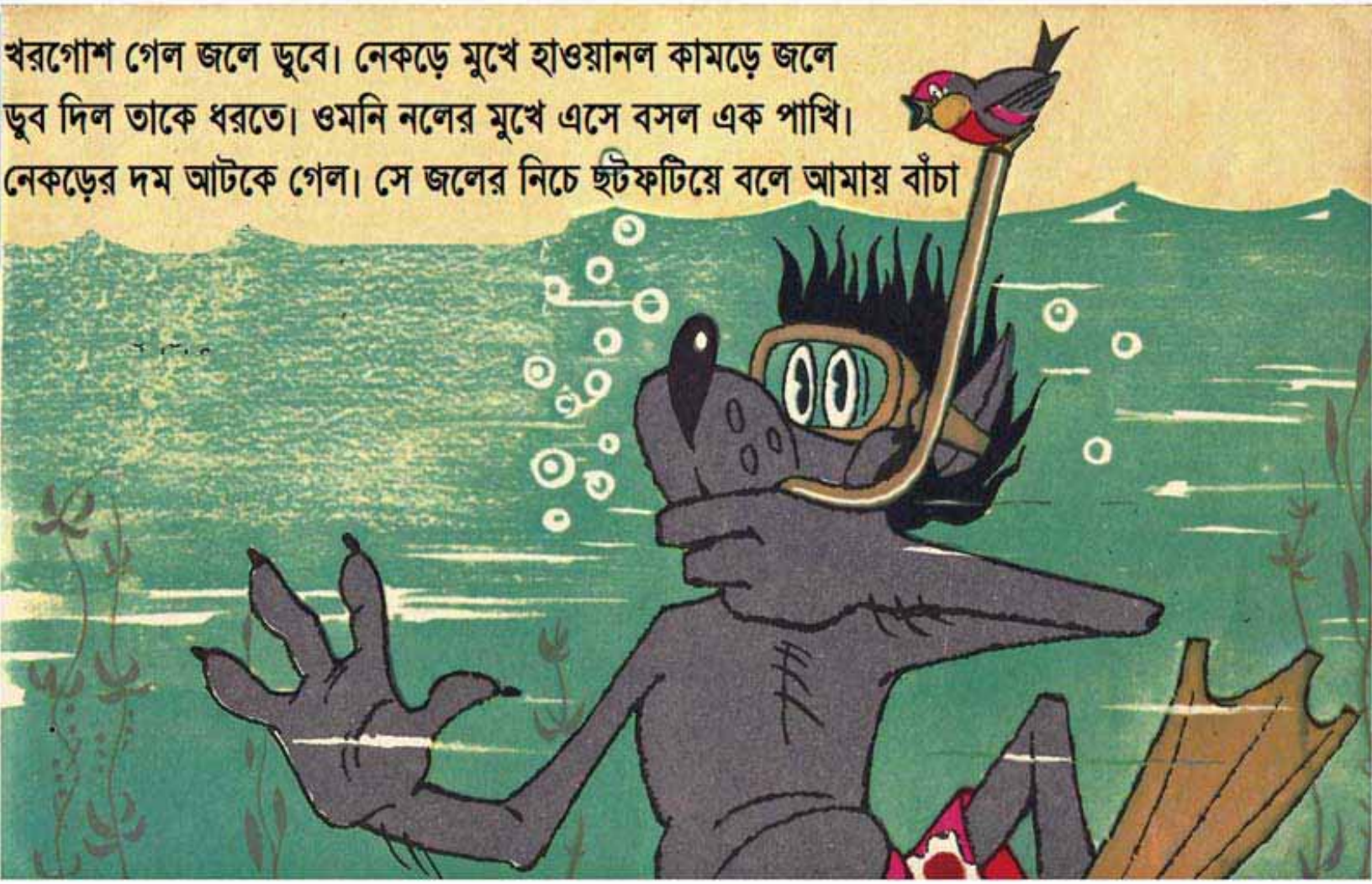

পরদিন সকালে নেকড়ে গেছে বিচ-এ হাঁটতে। দেখে এক খরগোশের বিজ্ঞাপন।
নেকড়ে ভাবল, একটু শুটিং প্র্যাকটিশ করা যাক।
TO THE BEACH
গাজরের রস পান করুন
আহা কী দারুণ শট!!!

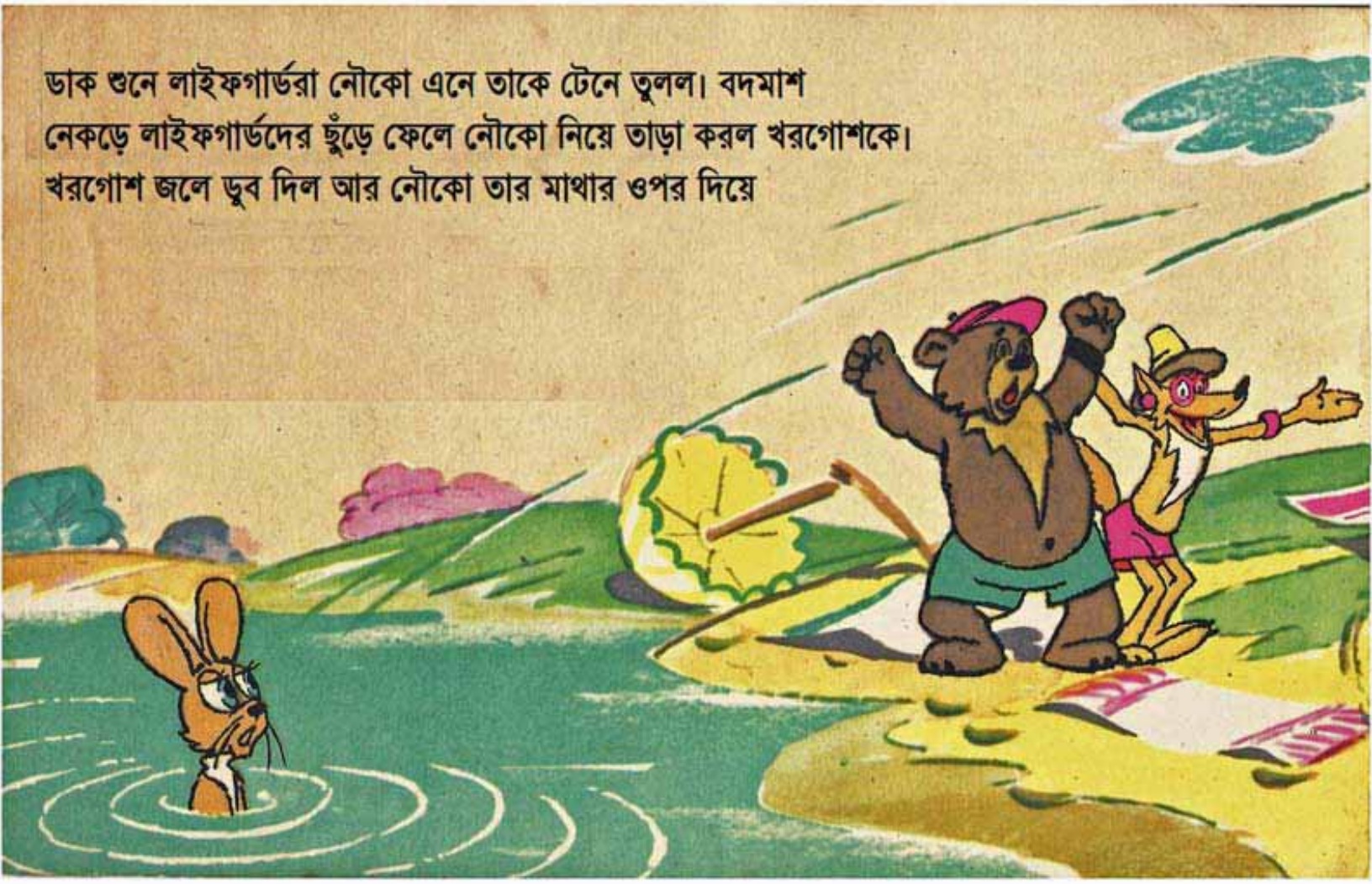

ত্রিশূল বুলেট ধরে যেই না নেকড়ে টেনেছে আর দরজা খুলে এসে একেবারে
চিৎপটাং। দরজাচাপা নেকড়ে বলে, "দাঁড়া দেখাচ্ছি!!"

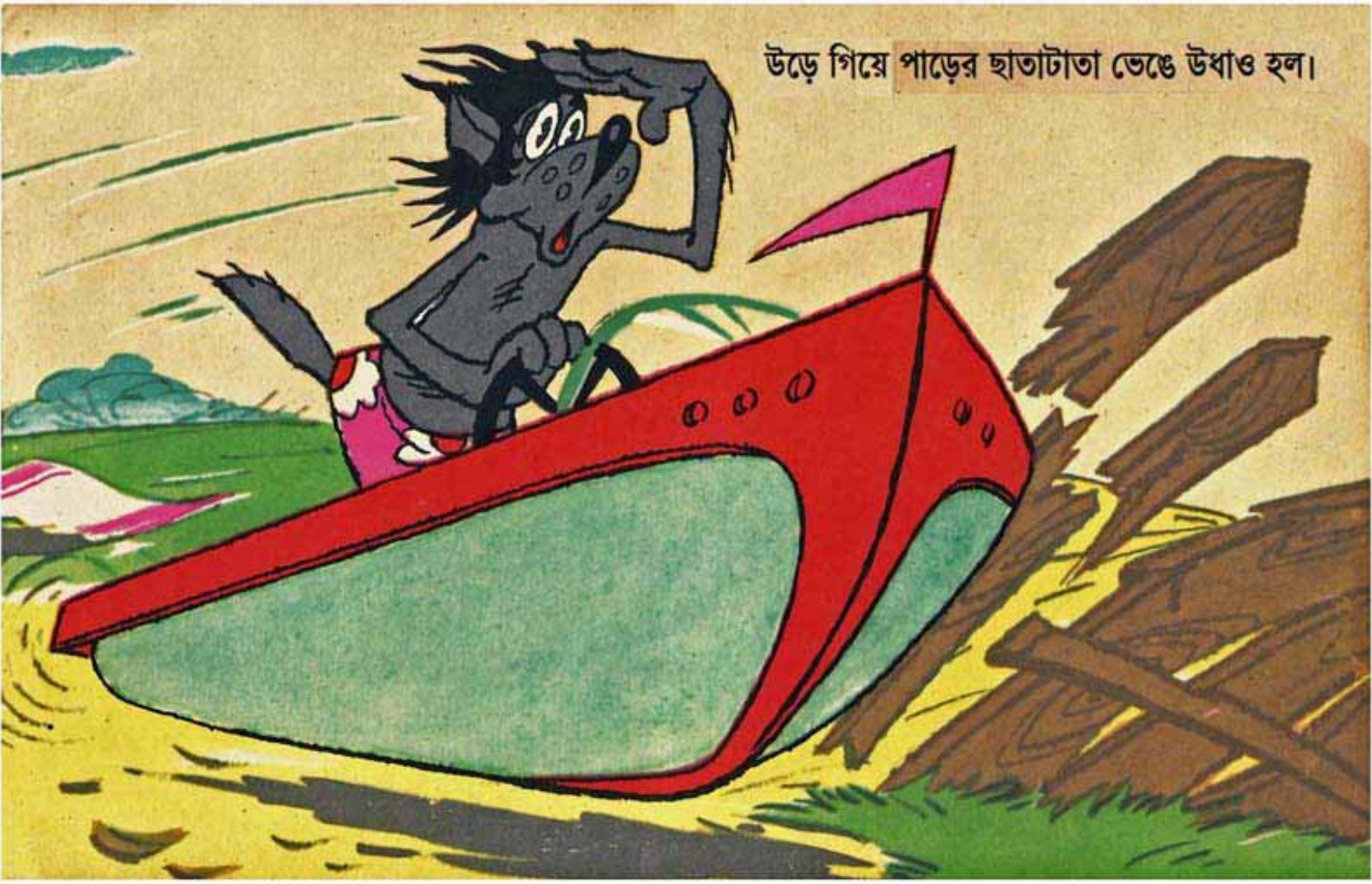


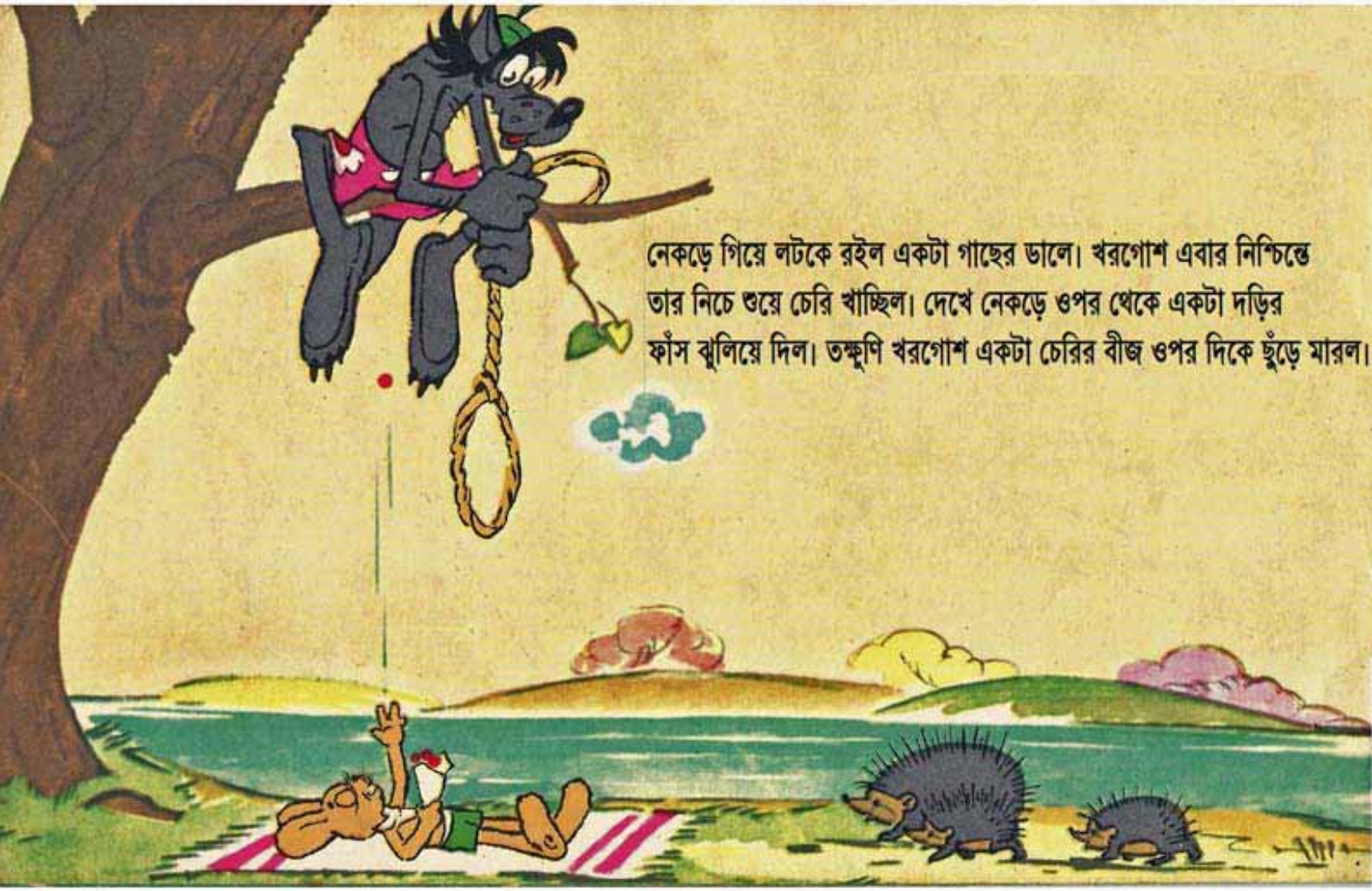
খরগোশ ওয়াটার স্কি করছিল। দেখেই নেকড়ে গিয়ে টিপ করে ত্রিশূল গুলি ছুঁড়েছে আর খরগোশের স্কি এর দড়ি গেছে কেটে

খরগোশ গেল জলে ডুবে। নেকড়ে মুখে হাওয়ানল কামড়ে জলে
ডুব দিল তাকে ধরতে। ওমনি নলের মুখে এসে বসল এক পাখি।
নেকড়ের দম আটকে গেল। সে জলের নিচে ছটফটিয়ে বলে আমায় বাঁচা

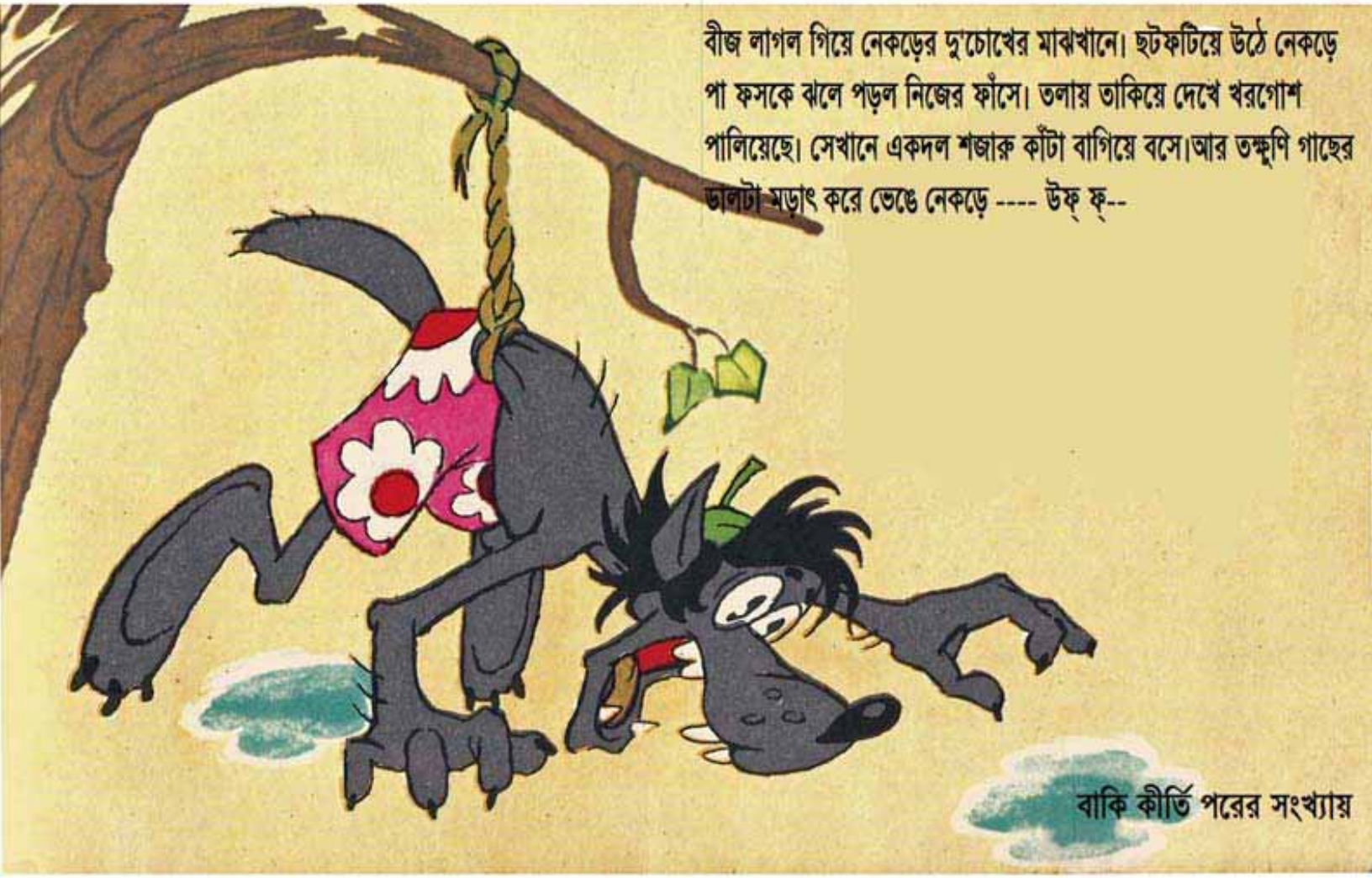



ডাক শুনে লাইফগার্ডরা নৌকো এনে তাকে টেনে তুলল। বদমাশ
নেকড়ে লাইফগার্ডদের ছুঁড়ে ফেলে নৌকো নিয়ে তাড়া করল খরগোশকে।
খরগোশ জলে ডুব দিল আর নৌকো তার মাথার ওপর দিয়ে


উড়ে গিয়ে পাড়ের ছাতাটাতা ভেঙে উধাও হল।



নেকড়ে গিয়ে লটকে রইল একটা গাছের ডালে। খরগোশ এবার নিশ্চিন্তে
তার নিচে শুয়ে চেরি খাচ্ছিল। দেখে নেকড়ে ওপর থেকে একটা দড়ির
ফাঁস ঝুলিয়ে দিল। তক্ষুণি খরগোশ একটা চেরির বীজ ওপর দিকে ছুঁড়ে মারল।



বীজ লাগল গিয়ে নেকড়ের দু'চোখের মাঝখানে। ছটফটিয়ে উঠে নেকড়ে পা ফসকে ঝলে পড়ল নিজের ফাঁসে। তলায় তাকিয়ে দেখে খরগোশ পালিয়েছে। সেখানে একদল শজারু কাঁটা বাগিয়ে বসে।আর তক্ষুণি গাছের ডালটা মড়াৎ করে ভেঙে নেকড়ে ---- উফ্ ফ্--

বাকি কীর্তি পরের সংখ্যায়

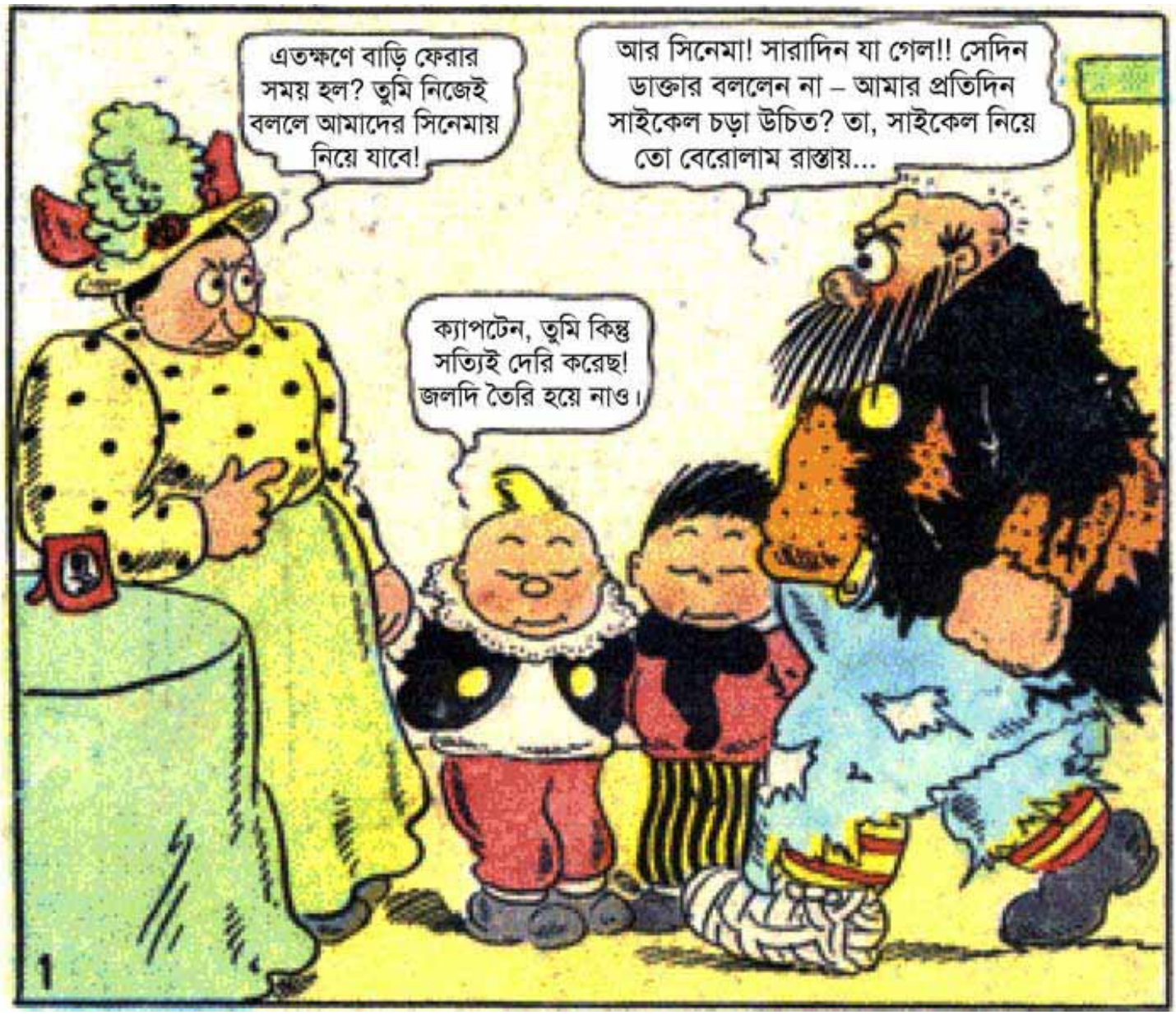
টোটা আর টিটো

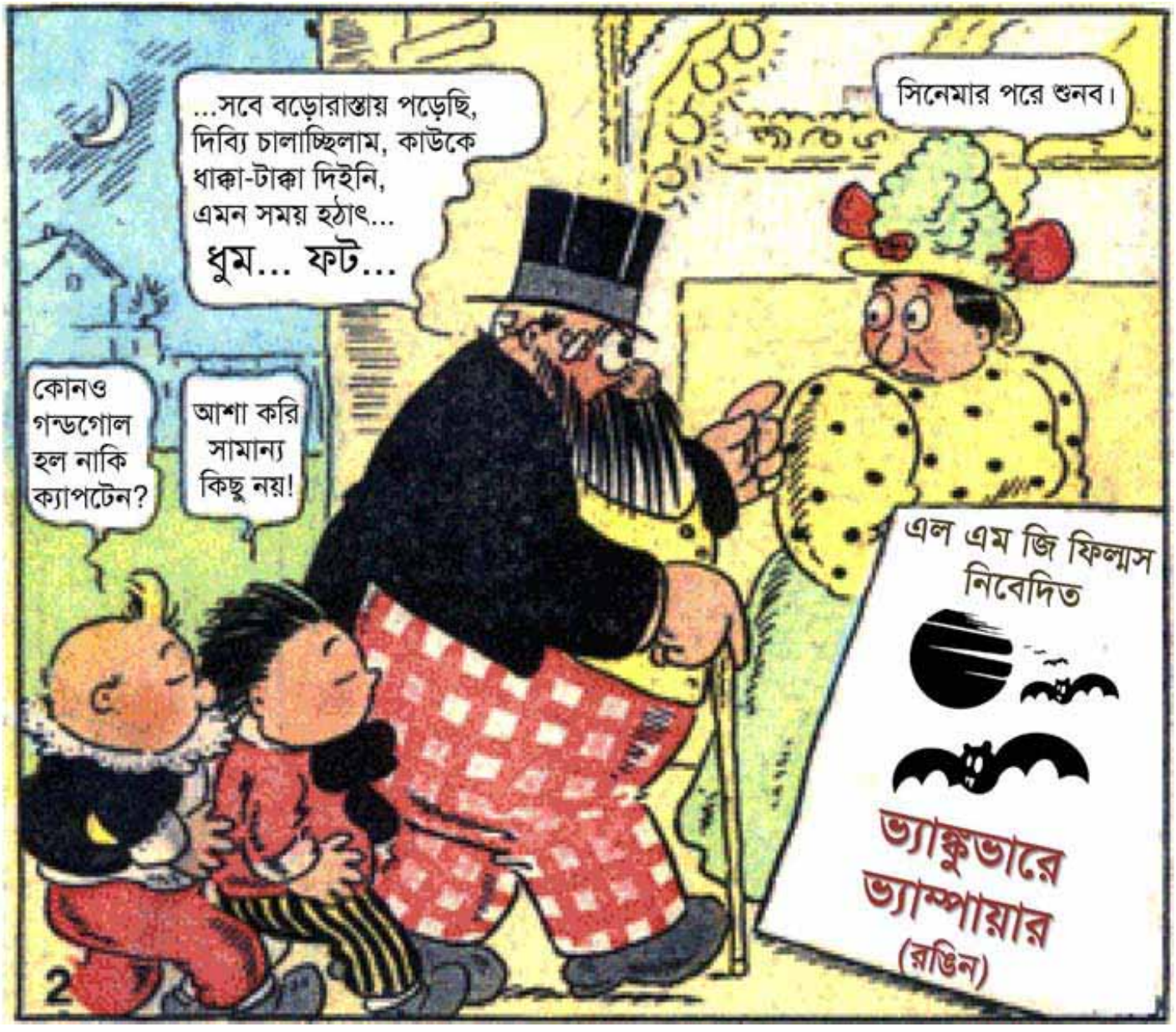


মূল কমিকসঃ হ্যারল্ড নের

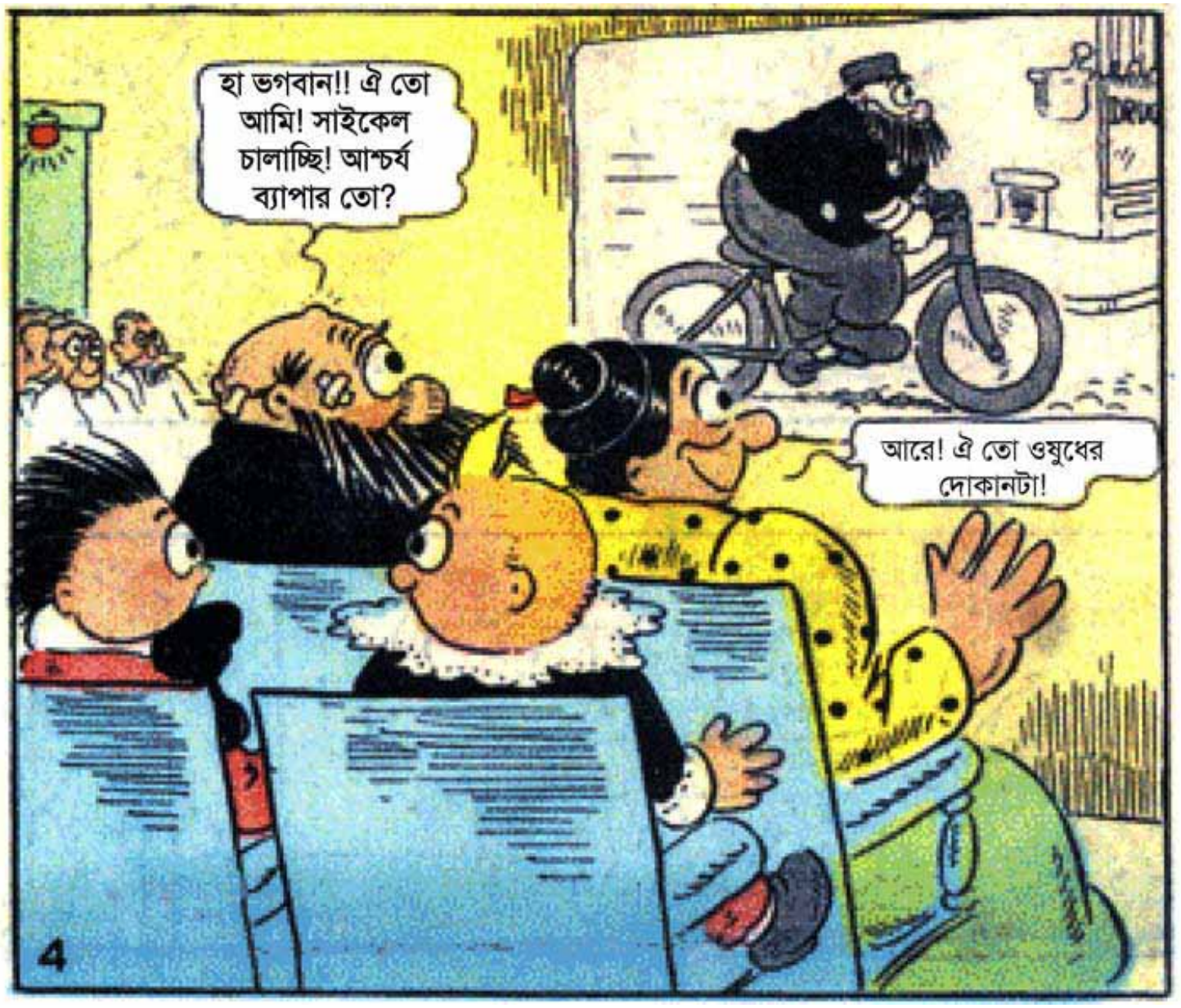
চলচ্চিত্রচঞ্চরী

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক


এতক্ষণে বাড়ি ফেরার সময় হল? তুমি নিজেই বললে আমাদের সিনেমায় নিয়ে যাবে!
আর সিনেমা! সারাদিন যা গেল!! সেদিন ডাক্তার বললেন না – আমার প্রতিদিন সাইকেল চড়া উচিত? তা, সাইকেল নিয়ে তো বেরোলাম রাস্তায়...
ক্যাপটেন, তুমি কিন্তু সত্যিই দেরি করেছ! জলদি তৈরি হয়ে নাও।
1


...সবে বড়োরাস্তায় পড়েছি, দিব্যি চালাচ্ছিলাম, কাউকে ধাক্কা-টাক্কা দিইনি, এমন সময় হঠাৎ...
ধুম... ফট...
সিনেমার পরে শুনব।
কোনও গন্ডগোল হল নাকি ক্যাপটেন?
আশা করি সামান্য কিছু নয়!
এল এম জি ফিল্মস নিবেদিত
ভ্যাঙ্কুভারে ভ্যাম্পায়ার (রঙিন)
2


ঐ তো! ওইখানেই তো ঘটল ঘটনাটা! বড়োরাস্তায় ওষুধের দোকানটার সামনে...
খাসখবর
আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ
১
আজ বিকেল চারটের সময় বড়োরাস্তায় ড্রাগল্যান্ড ফার্মাসির সামনে...
শ শ স স... অত জোরে কথা বোলো না!
3

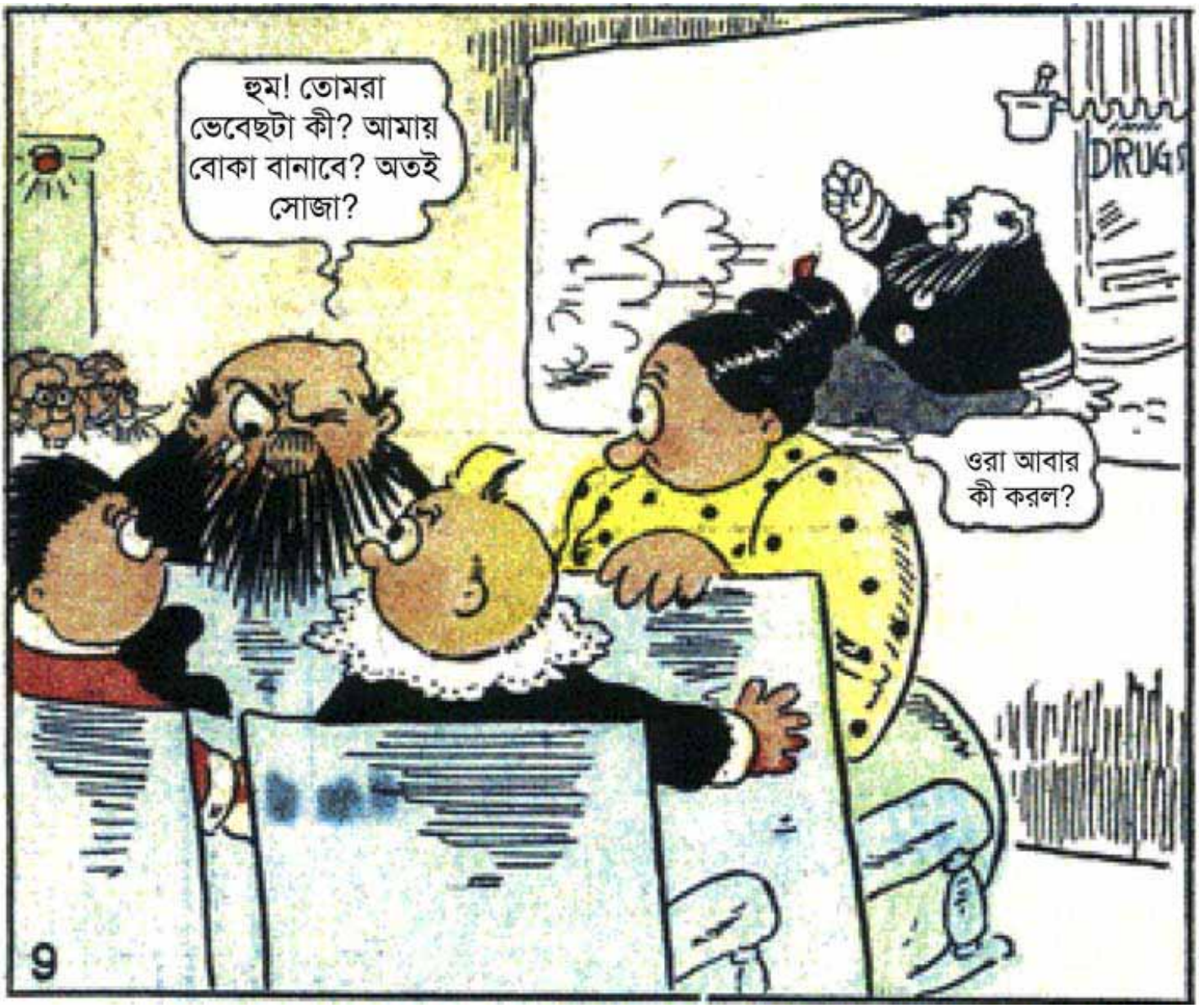

হা ভগবান!! ঐ তো আমি! সাইকেল চালাচ্ছি! আশ্চর্য ব্যাপার তো?
আরে! ঐ তো ওষুধের দোকানটা!
4

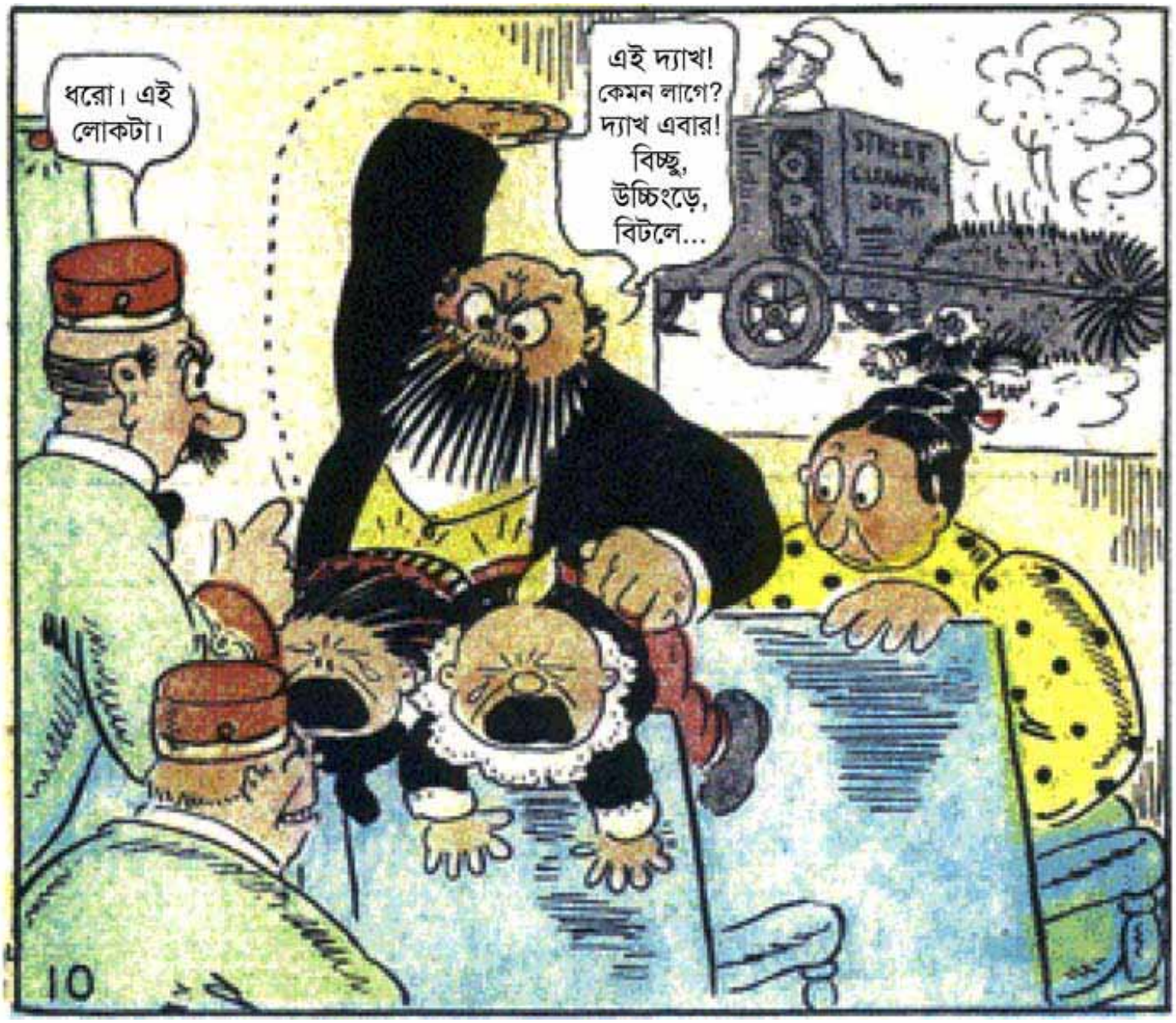

একটু আস্তে কথা বলুন। অন্যদের অসুবিধে হচ্ছে।
মানে? এরকম একটা দুর্ঘটনা হল আমার... তোমরা আবার সেটা দেখাচ্ছ?
এখানে কথা বলার নিয়ম নেই।
5


দেখেছ কী জোর পড়লাম? ধড়াম করে! মাথায় বিশাল একটা আলু হয়ে গেছে!!
DRUGS
তোমায় চুপ করে থাকতে বলে গেল না?
6


এই যে মশাই! বলি চুপ করবেন কি না?
আরে বাবা, ঠিক আছে! ঠিক আছে!
দ্যাখো, বলেছিলাম কিনা?
DRUGS
7


ও হো হো!!
এইবারে বুঝেছি!
একেবারে জলের
মতো পরিস্কার!
এ কী!!
8

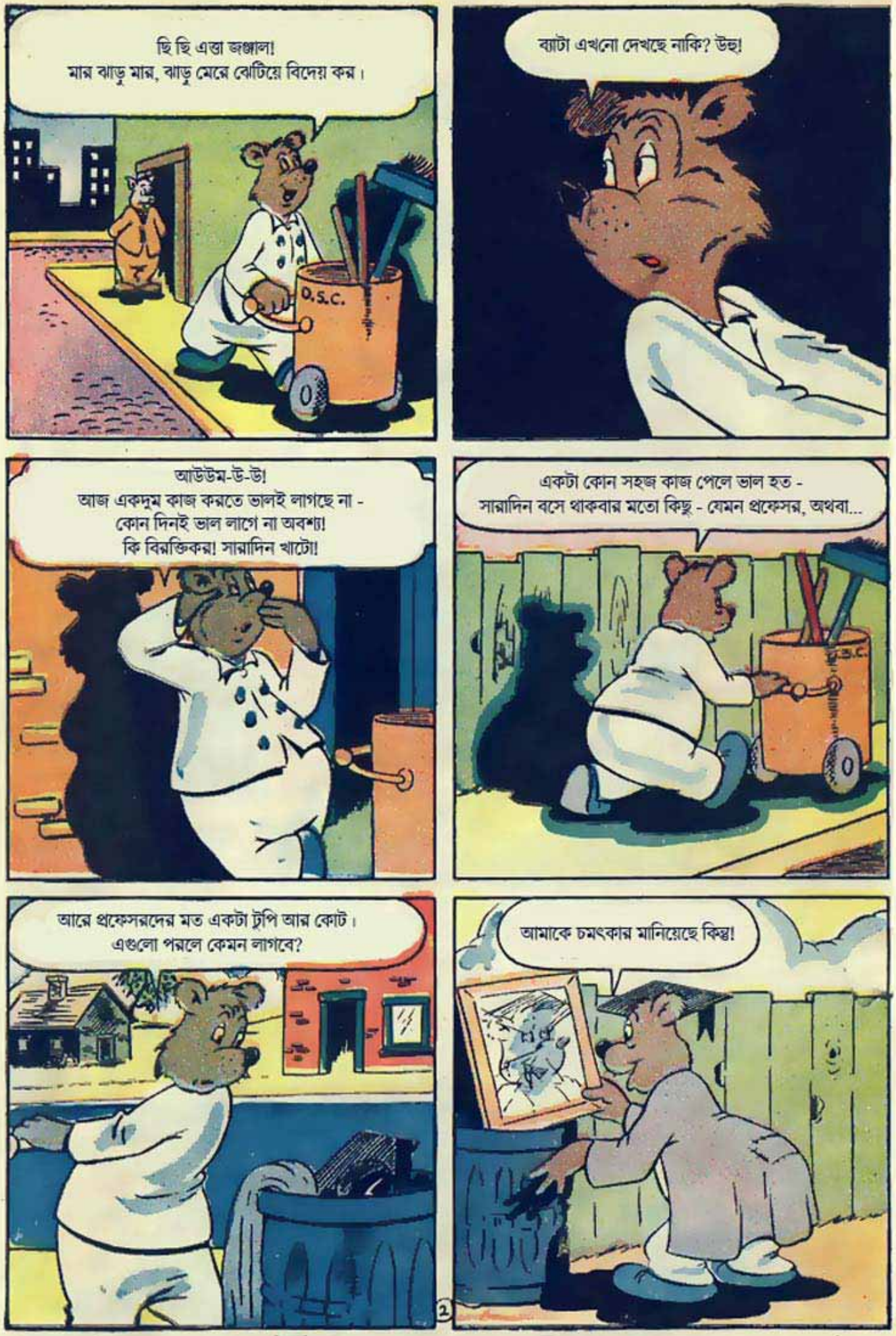

হুম! তোমরা ভেবেছটা কী? আমায় বোকা বানাবে? অতই সোজা?
ওরা আবার কী করল?
DRUGS
9


ধরো। এই লোকটা।
এই দ্যাখ! কেমন লাগে? দ্যাখ এবার! বিচ্ছু, উচ্চিংড়ে, বিটলে...
STREET CLEANING DEPT.
10


বার করে দেবে তো
দাও না। বয়েই গেল
আমার! তোমাদের
পচা সিনেমা আমি দেখি না।
11


আবার তুমি? ফের গন্ডগোল পাকিয়েছ এখানে?
এল এম জি ফিল্মস
এসব হচ্ছেটা কী?
হা ভগবান!! আবার আপনি??
12


The STREET CLEANER
আরে ওই! সাফাই ওয়ালা!
টাকাগুলো ভুল করে পড়ে গেছে -
কুড়িয়ে দেবে?
আউহুউম - ঘুম পাচ্ছে!
আজ আর কাজ করতে ভাল লাগছে না।
নিজের জঞ্জাল নিজে সাফ করোগে!
D.S.C.
AC·243
তোমার কুঁড়েমির অনেক
রিপোর্ট আসছে ভোম্বল ভালুক!
ফের এরকম হলে কিন্তু
চাকরি থাকবে না!
ঠি-ঠিক আছে বস,
ভুল হয়ে গেছে।
BOSS
এখন যাও - নিজের জন্যে,
নিজের দেশের জন্যে আর নিজের পৌরসভার প্রতি
দায়িত্ব পালন করগে।


ছি ছি এত্তা জঞ্জাল!
মার ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মেরে ঝেটিয়ে বিদেয় কর।
O.S.C.
ব্যাটা এখনো দেখছে নাকি? উহু!
আউউম-উ-উ!
আজ একদুম কাজ করতে ভালই লাগছে না -
কোন দিনই ভাল লাগে না অবশ্য!
কি বিরক্তিকর! সারাদিন খাটো!
একটা কোন সহজ কাজ পেলে ভাল হত -
সারাদিন বসে থাকবার মতো কিছু - যেমন প্রফেসর, অথবা...
O.S.C.
আরে প্রফেসরদের মত একটা টুপি আর কোট।
এগুলো পরলে কেমন লাগবে?
আমাকে চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু!
2

ঠিক সেই সময়ে

আজকে কাগজে একটা মজাদার খবর পাঠাতেই হবে, নইলে আমি গেছি! কিন্তু...

আরে! প্রফেসর মশাই রাস্তা সাফাইয়ের ঝাঁটা-ঝুড়ি নিয়ে ওখানে কি করছেন?

কি খবর প্রফেসর? সাধারন মানুষের জীবনযাপন পর্যবেক্ষণ করছেন নাকি?

আরে ... মানে ...

চমৎকার আইডিয়া প্রফেসর! এটা নিয়ে একটা দারুন খবর হতে পারে - "সাফাইওয়ালার ছদ্মবেশে অধ্যাপকের গবেষণা!"

কিন্তু আমি তো সত্যিই - ইয়ে মানে, হ্যাঁ তাই তো - গরিব লোকেরা কিভাবে দিন কাটায় সেটা একটু যাচিয়ে দেখছি আর কি!

হে হে হে! কাগজে ছবি ছাপলে হয়ত কোথাও প্রফেসরের চাকরি পেয়ে যেতে পারি!

আর সত্যি সত্যিই ...

DAILY RAG

PROFESSOR BECOMES STREET CLEANER TO STUDY LIFE IN THE RAW


কিন্তু ভোম্বল পরদিন কাজে যেতেই ...
ভোম্বল, এসেছো? মালিক ডাকছে তোমায়!
আমি? এইতো আসছি!
হুহু - মনে হচ্ছে পৌরসভার মুখ উজ্জ্বল করতে পারলাম এতদিনে। মালিক খুশি হবে - হয়তো মাইনেও বেড়ে গেলো।
মালিক ডাকছিলেন? আজকের কাগজ দেখেছেন তো? আমি ...
... আর এখান থেকে দূর হও। ব্যাটা ধাপ্পাবাজ! তোমার চাকরি খতম!
খতম? আমিই পদত্যাগ করলাম! উপস!
POW!
দেখাচ্ছি দাঁড়াও! আজ থেকে রাস্তায় একফোঁটাও ময়লা ফেলব না - কোন সাফাইওয়ালারও দরকার থাকবে না তাহলে! তখন তোমার চাকরির কি হয় দেখো।
HICKVILLE STREET CLEANING DEPT.
SLAM!
কিন্তু এখন ... চাকরি চলে গেলো, খাব কি?
ভোম্বল বাড়ি ফিরলে ...
আরে এটা কি? একটা চিঠি!


এই তো! ভাগ্য ফিরে গেলো এবার!
মাননীয় ভোম্বল ভল্লুক,
একজন শিক্ষক প্রয়োজন।
অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।
বিনীত, মিহিরমোহন।
দয়া করে একটু বসুন,
মিহিরবাবু এখুনি আসবেন।
ঠিক আছে!
এটাই দরকার ছিল,
পায়ের উপর পা তুলে
কেবল লেকচার দেব আর
ছেলেপিলে মন দিয়ে শুনবে।
... আর ভোম্বল অবশেষে একটা সুখের চাকরি পেল!
ভোম্বল-স্যার, দমকল দমকল খেলব!
বাচ্চারা
নতুন মাস্টারমশাইকে
বেশ পছন্দ করে ফেলেছে
মনে হচ্ছে!
ইহু-উ-উ! উপস!
সাফাইওয়ালার চাকরিটা
অনেক আরামের ছিল!
ঘুষি খেতে
আপনার কেমন লাগে
ভোম্বল-স্যার?
BAM!
F.D.
PING!
SOK!
5



দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

এক

খৃঃ পূঃ ২০০০

গোটা বাড়িটা দুপুরের দিকে একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়। সিবিলা দুর্গপ্রাসাদের দিকে বেরিয়ে গেছেন সকালবেলায়। রাঙ্গোর দায়িত্ব এইসময় বাজারটা সেরে ফেলা। সে-ও অনেকক্ষণ হল বেরিয়েছে। সূর্য এখন মাথার ওপরে। সেদিকে খেয়াল হতে রিনিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। উনুন ধরাতে হবে। কিছুক্ষণ বাদেই দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি ফিরবেন সিবিলা। ঠিক সময়ে রান্নাবান্না শেষ না হলে কপালে মার জুটবে। ও কাজটা করতে সিবিলা বেজায় পটু। কুড়িয়ে পেয়ে এনে ভাইবোনকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন, তাই তাদের দিয়ে দাসের মত খাটিয়ে উশুল করে নেন। ভুল করলে শাস্তি দিতে কসুর করেন না।

রাঙ্গো অবশ্য মার খেয়ে কিছু মনে করে না। সে হাটেবাজারে ঘোরে। শহরবাজারের খবরও রাখে। সে বলে,"দিদি,সিবিলাকে সারা শহরের মানুষ সাক্ষাত যমের মত ভয় পায় রে। উনি শহরের বিচারক। সামান্য অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড দেন। সেদিক থেকে দেখলে আমরা তো অনেক ভালো আছি।"

"ভালো!" শব্দটা নিয়ে মনের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে নিল রিনিয়া। কে জানে! একেই বোধ হয় ভালো থাকা বলে! কিন্তু নাঃ। আর দেরি করা যায় না। রসুইঘরের একপাশে লতাপাতার স্তূপ রাখা আছে। উনুনে কাঠ সাজানোই ছিল। তার নীচে খানিক লতা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে আঙুলটা বাড়িয়ে দিয়েছিল সে সেদিকে। তারপর কী খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি আঙুল বের করে এনে চকমকিপাথর দুটো হাতে তুলে নিল রিনিয়া। কে জানে কে কখন দেখে ফেলে! গত কয়েকমাস ধরেই তো তার আর রাঙ্গোর ওপরে কড়া নজর রেখে চলেছেন সিবিলা। বিশেষ করে মাসকয়েক আগে স্নানাগারের সামনে সেই গন্ডগোলটা হবার পর থেকে।

পশুপতিদেবের পুজো ছিল সেদিন। এই দিনটা দুর্গপ্রাসাদের দরজা সারা শহরের জন্য খোলা। বিশাল স্নানাগার টইটুম্বুর করে দেয়া হয়েছে পাহাড় বেয়ে নামা ঝর্ণার জলের গতিপথ ঘুরিয়ে। শহরের প্রত্যেকে সেদিন সেখানে স্নান করে পশুপতির পুজো করে। দাসরাও বাদ যায় না। বড়ো পুরুতের হুকুম।

রাঙ্গো আর রিনিয়াও কাজেই স্নানে গিয়েছিল। বাইরে বের হলে একটা লম্বা ঘাসের দড়ি তাদের কোমরে বেঁধে দড়ির অন্যদিকটা হাতে করে ধরে নিয়ে চলেন সিবিলা। দাসদের স্নানে নিয়ে যাবার সেইটেই রীতি। দড়িটা স্নানাগারের পাড়ে একটা খুঁটির সঙ্গে ছোটো করে বেঁধে তাদের জলে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। তখন কয়েকটা ছেলে সাঁতরে এসে রাঙ্গোকে হঠাৎ জলের নীচে ঠেসে ধরল। রাঙ্গো ছটফট করছে দেখে তাদের খুশি আর ধরে না। স্নান করতে থাকা অন্য লোকজনও সেই দেখে বেজায় মজা পাচ্ছে। দাসদের নিয়ে এমন খেলা এ শহরে খুব চলে। শুধু এ শহর কেন, সিন্ধুনদী আর তার অনেকগুলো ডালপালার ধারে ধারে শয়ে শয়ে শহরেই এ খেলার চল।

রিনিয়া প্রাণপণে দড়িতে টান দিচ্ছিল, যদি দড়ি খুলে ভাইটাকে গিয়ে টেনে তুলতে পারে পাজি ছেলেগুলোর হাত থেকে। তাই দেখে লোকজন আরো মজা পেয়ে হুল্লোড় করছে। এমন সময় হঠাৎ সেই ব্যাপারটা ঘটল। কিছুদিন ধরেই ঘটছে এটা তার। মাথার মধ্যে যেন একটা দরজা খুলে গেল হঠাৎ। ঠিক যেন মনে পড়ে গেল,

খুব সহজ কাজ এটা। যে কেউ পারে। ইচ্ছে করলেই। কোমরে বাঁধা দড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতেই দড়িটা হঠাৎ কোমর থেকে খুলে এল। একটা সাপের মতই জল থেকে ছিটকে উঠে সেটা আছড়ে পড়ল গিয়ে সিবিলার মুখে। রিনিয়া তখন লাফিয়ে পড়েছে ছেলের দলের মধ্যে।

কয়েকমিনিট পরে মন্দিরের সেপাইরা এসে যখন ছেলেগুলোকে জল থেকে তুলল, তখন তাদের সারা গায়ে লাল লাল দাগ হয়ে গেছে চাবুকের দাগের মত। তারা হলফ করে বলল, সেগুলো রিনিয়ার আঙুলের দাগ।

ব্যাপারটা দেখে সিবিলা ভারী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আর তার পর থেকেই যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ঘুরে ঘুরে তাদের কাজকর্ম দেখেন শুধু। তবে শুধু সিবিলা নয়, গোটা শহরই সেদিনের পর থেকে তাদের চোখে চোখে রাখে। মাঝেমধ্যেই ছোটোখাটো এমন দু একটা ব্যাপার ধরাও পড়ে যায়। কদিন আগে সে উনুনে আগুন দিয়েছে সবে, এমন সময় হঠাৎ সিবিলা রান্নাঘরে ঢুকে এসে বললেন, "আগুন ধরাবার চকমকিদুটো কোথায় রে?"

রিনিয়া তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গিতে হাত দিয়ে দেখে সেখানে কিছুই নেই। সিবিলা তখন উনুনের আগুনটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে হাতের মুঠো খুলে চকমকিদুটো ঠনাৎ করে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই থেকে রিনিয়া সাবধান হয়ে গেছে খুব। রাঙ্গোকেও সাবধান করে দিয়েছে। রোজ রোজ নতুন নতুন যেসব জাদুশক্তি জাগছে তাদের ভেতর, তা যেন কেউ ধরতে না পারে।

কেন যে সবাই এমন করছে তাদের নিয়ে! তারা তো কারো কোন ক্ষতি করছে না! এমনটা যে হচ্ছে তাতে তাদের দোষটা কোথায়? তারা তো আর ইচ্ছে করে—

বাইরে রাস্তা থেকে একটা বেজায় হইচইয়ের শব্দ উঠল হঠাৎ। 'ধর ধর, পালালো পালালো' বলে লোকজন এদিক ওদিক ছুটছে। রিনিয়া চমক ভেঙে কান খাড়া করল। এ গলিটা গিয়ে সটান বাজারের ভেতর পড়ে। শব্দটা সেইখান থেকেই আসছে। কী হল আবার?

যাক গে! বাজারে হইচই তো অমন লেগেই থাকে। রিনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁড়িতে যবের গুঁড়ো তুলে জল ঢেলে দিল তার মধ্যে। টুকরো টুকরো করে কাটা সবজি ঢেলে দিয়েছে তাতে। যবের সুরুয়া সিবিলার প্রিয় খাবার। চকমকিদুটো তুলে নিয়ে উনুনের ভেতরে ধরে তাদের ঠুকল সে কয়েকবার। ঝরঝর করে আগুনের ফুলকি ঝড়ে পড়ছে ভেতরে। পড়ছে, আর নিভে যাচ্ছে বারবার।

কয়েকবার এমনটা হতে রিনিয়া একবার উনুনের কাঠগুলোতে হাত দিয়ে দেখে নিল। একেবারে ভেজা! কিন্তু—কী করে ভিজল? কালকে দুপুরেই তো সে ভালো করে শুকিয়ে রেখেছে ওগুলোকে!

চকমকির ফুলকিতে ও আর ধরবে না এত সহজে। রিনিয়া অসহায় চোখে এদিক ওদিক দেখল একবার। সিবিলা এসে খাবার তৈরি না পেলে—

বাড়িতে কেউ নেই এখন। কে আর দেখবে! রিনিয়া ডানহাতটা উনুনের নিচে ঢুকিয়ে মনঃসংযোগ করল। গরম হয়ে উঠছে হাতটা তার। তারপর একসময় দপ করে জ্বলে উঠল তা উনুনের ভেতর। কাঠের মধ্যে জমে থাকা জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে সিঁ সিঁ শব্দ করে।

একটু বাদে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল শুকিয়ে যাওয়া কাঠ, আর সঙ্গেসঙ্গে পেছন থেকে একটা শক্ত জাল উড়ে এসে তার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। একটা হ্যাঁচকা টানে জালে আটকানো অবস্থায় চিৎ হয়ে গিয়ে সে দেখল মাথার কাছে সিবিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বড়োপুরুত। মুখটা ভারী গম্ভীর তাঁর।

আর, তাঁদের পেছনে দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বুকটা হিম হয়ে গেল রিনিয়ার—মৃত্যুগুহার কালো জামা পরা সেপাইদের একটা দল অপেক্ষা করছে সেখানে। তাদের অস্ত্রের ফলায় রোদ চিকচিক করছিল।

"নিজের চোখেই প্রমাণ দেখতে পেলেন আপনি আজ। স্নানাগারের সেই ঘটনার পর থেকেই ভাইবোনের ওপরে নজর রাখছিলাম আমি। শেষে রান্নার কাঠে জল দিয়ে রেখে ফাঁদ পেতেছিলাম, আর তাতেই এই জাদুকরী ধরা দিয়েছে," বড়োপুরুতের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন সিবিলা।

"আ-আমি কোনো দোষ করিনি। আমি-"

তার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বড়োপুরুৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আর এর ভাইটা?"

সিবিলা মাথা নাড়লেন, "তাকে ধরা যায়নি। বাজারের মাঝখানে সেপাইদের হাত ছাড়িয়ে সে উধাও হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।"

"ব্যর্থ সেপাইদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। সামান্য একটা বারো বছরের ছেলেকে-"

"না। তা উচিৎ হবে না। কারণ ধরা পড়বার পর বাজারের সমস্ত মানুষের সামনে সে যে জাদু দেখিয়েছে তাতে সেপাইদের কিছু করবার ছিল না। সে তাদের বাঁধন ছাড়িয়ে আকাশে উড়ে গেছে।"

"অবিশ্বাস্য।"

"বাজারের সমস্ত মানুষ তা দেখেছে। তারা সাক্ষি দেবে। এরা সাধারণ মানুষ নয় মহাপুরোহিত। এরা-"

"বড়োপুরুৎ কঠোর চোখে সিবিলার দিকে ফিরে দেখলেন একবার, "অথচ আপনিই এদের আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন।"

"দুটো সাধারণ অনাথ শিশু ভেবে দয়া করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি এরা শয়তান জিভার চর।"

বড়োপুরুতের ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, "কোন প্রমাণ আছে?"

"আছে। কারণ ছেলেটা উড়ে গেছে জিবারা পর্বতের দিকে। তার চূড়া ডিঙিয়ে উল্টোদিকের নিষিদ্ধ উপত্যকায় নেমে যেতে দেখা গেছে তাকে।"

"নিষিদ্ধ উপত্যকা!" বড়োপুরুতের ভ্রূ কুঁচকে উঠল ফের। কুড়ি বছর আগে সেইখানে এক রাতে একটা ভয়ানক বাজ পড়ার মতন শব্দ উঠেছিল। তার পরদিন রাখালেরা জিবারার পাদদেশ থেকে এই মেয়েটাকে কুড়িয়ে পেয়ে বিচারপতি সিবিলার কাছে নিয়ে আসে। শহরে কোন বাচ্চার মা বাবা না থাকলে সেইটাই নিয়ম এখানে। তাদের মুখেই প্রথম জানা গিয়েছিল জিভার আবির্ভাবের কথা। বাচ্চাটাকে যখন তারা কুড়িয়ে পায় তখন নাকি পাহাড়ের চূড়ো ডিঙিয়ে উড়ে এসেছিল সে। কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছিল পাহাড়ের অন্যদিকে কাউকে পা রাখতে।

মহাপুরোহিত সামান্য রাখালদের কথায় কান দেননি প্রথমে। একটা ছোটো সৈন্যদলকে পাঠিয়েছিলেন জিবারা পেরিয়ে খবর নেবার জন্য। তারা আর ফিরে আসেনি। শুধু তারাই নয়, এর পর থেকে যে-ই জিবারার চুড়ো ডিঙিয়ে তার অন্যধারে গিয়েছে সে আর ফিরে আসেনি।

এর বছর সাতেক বাদে রাঙ্গো এল। সে-ও একটা রহস্যময় ঘটনা। একদিন গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে সিবিলা আবিষ্কার করেন তিনি নিজের বাড়িতে নেই। শুয়ে আছেন জিবারার পাদদেশে। পাশে একটা পুঁটুলিতে শুয়ে রাঙ্গো হাত পা নাড়ছিল। তদ্দিনে জিবারার দুর্নাম ছড়িয়েছে খুব। অত রাত্রে এইভাবে তার কাছাকাছি নিজেকে দেখে সিবিলার ভয় লেগেছিল বেজায়, তবে বাচ্চাটাকেও ফেলে আসতে মন চায়নি। নিখরচায় একটা দাস পাওয়া! ক'জনের ভাগ্যে তা জোটে?

******

জালে বাঁধা রিনিয়া চুপ করে বসেছিল উনুনের পাশে। রাঙ্গোর উড়ে যাবার খবরটা শুনে তার মাথার মধ্যে কেমন একটা করছিল। বারবার একটা ছবি ভেসে উঠছে সেখানে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, দুপাশে দুহাত ছড়িয়ে দিয়েছে রাঙ্গো। তারপর আস্তে করে মাটি থেকে পা দুটো তুলে নিতেই–আরে! খুব সহজ তো! এইটা কী করে ভুলে ছিল সে এতদিন? সে তো ইচ্ছে করলেই–

"সাবধান–ডাইনিটা পালাচ্ছে–" হঠাৎ করে সিবিলা চিৎকার করে উঠলেন। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সেপাইরা অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে এসে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে রিনিয়ার চারপাশে। মেয়েটার গায়ের ওপর থেকে সরসর করে জালটা সরে যাচ্ছিল নিজেনিজেই। সবচেয়ে সামনে দাঁড়ানো সেপাইটা ভয় পেয়েছে। তার পাথরের মত মুখে ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছিল। হাতের বল্লমটা তুলে ধরে সজোরে সে চালিয়ে দিল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা নির্বিকার। বল্লমের ফলাটা মুঠোয় চেপে ধরে একটুকরো পালকের মত ছুঁড়ে দিল সে উলটোদিকে।

দশ হাত দূরে ছিটকে পড়েছে সেপাইটা। কিন্তু সেদিকে তখন কারো নজর নেই। দু হাত দুপাশে ছড়িয়ে ধরে তাদের চোখের সামনে মেয়েটা একটা পাখির মতই ভেসে উঠছে আকাশে। একমুহূর্ত স্থির হয়ে ভেসে রইল সে সেখানে। তারপর রান্নাঘরের পাতার ছাউনি ফুঁড়ে তিরবেগে উঠে গেল খোলা আকাশে।

মানুষগুলোর অবাক চোখের সামনে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল জিবারার দিকে। তারপর একটা বিরাট পাখির মত ছিটকে গেল আকাশ বেয়ে। চোখের পলকে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে ছোটো হতে হতে তার শরীরটা জিবারার উলটোদিকে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন বড়োপুরুত। দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর। বাচ্চাদুটো পালিয়ে গেছে জিবারার উল্টোদিকেই। ওদিকে জিভার আস্তানা। তার মানে এসব কাজকর্মের পেছনে ওই জিভার হাত আছে। সিন্ধু নদীকে ঘিরে দেড় হাজার শহরের রাজধানী এই মঞ্জাদাহোর নগরীর শক্তি কম নয়। সেই শহরের বুকে সেনাদের মাঝখান থেকে বন্দিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে যে সাহস পায় সে যে-ই হোক না কেন তাকে দমন করা দরকার।

একটা তেতো হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। শুরুতে পাঁচটি নগরীর মিলিত সৈন্যবলই যথেষ্ট হবে। তাতে ব্যর্থ হলে তারপর আরো বড়ো শক্তিপরীক্ষাতেও নামতে তিনি তৈরি। সামান্য রাখালদের ভয় দেখিয়ে বেড়ানো এই জাদুকর এখনও সিন্ধুতীরের শিক্ষিত তলোয়ারের স্বাদ পায়নি। সিবিলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিনি বললেন, "শিক্বার্খস্বা, অজিবি, দারনুক আর হৈশিল শহরে অগ্নিসংকেতে খবর পাঠান। তিনদিনের মধ্যে দশ হাজার সেরা সৈনিকের প্রয়োজন হবে আমাদের।"

*****

উপত্যকার ঠিক মাঝখানে বিরাট চেহারার গোল পাথরটা পড়েছিল। তার বুকে একটা লম্বা ফাটলের দাগ। রিনিয়া যখন জিবারার চুড়ো পেরিয়ে সেখানে এসে নামল তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। র‍্যাং সেখানে আগেই পৌঁছে গেছে।

"স্বাগতম রেনি ও র‍্যাং-" গম্ভীর গলায় কথাগুলো শুনে তারা দুজন একইসঙ্গে ঘুরে তাকাল পেছনদিকে।

লম্বা চেহারার মানুষটার চুলদাড়িতে পড়ন্ত রোদ পড়ে চিকচিক করছিল। এগিয়ে এসে তাদের দুজনের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। রিনিয়ার দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন ছিল না। নিচু গলায় বলল, "আমরা রিনিয়া ও রাঙ্গো।" মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর পাথরটার দিকে ফিরে আঙুলের কয়েকটা সংকেত করলেন।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই পাথরের ফাটলটা থেকে শিসের মত শব্দ উঠল একটা। উজ্জ্বল আলোর একটা ধারা সেখান থেকে বের হয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঝরে পড়ছিল। তাদের ঘিরে গড়ে তুলছিল একটা অস্বচ্ছ শক্তির দেয়াল। দেখতে দেখতে সূর্যের আলো মৃদু হয়ে মিলিয়ে গেল একেবারে। শক্তির আচ্ছাদনে ঘেরা জায়গাটা নরম আলোর প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে তাদের দুজনকে পাথরটার একপাশে বসিয়ে দিয়ে তর্জনিদুটো দুই ভাইবোনের কপালে ঠেকালেন জিভা। সঙ্গেসঙ্গে নিশ্চল পুতুলের মত থেমে গেল শরীরদুটো। কয়েকমুহূর্ত পরে যখন জেগে উঠল ফের, তাদের চোখের ভাষা বদলে গেছে।

"ধন্যবাদ জিভা," রিনিয়া বলে উঠল। হ্যাঁ। এইবার তার মনে পড়েছে। সব মনে পড়ে গেছে তার। ইনি জিভা। পাশে দাঁড়িয়ে রাঙ্গোও অবাক হয়ে দেখছিল মানুষটার দিকে। খানিক বাদে সে বলল, "কিন্তু রেনি,আমরা কী করে জিভাকে ভুলে গিয়েছিলাম বল তো? আমাদের চেনা এই সবকিছু ছেড়ে ওই বুনোগুলোর মধ্যে–"

"সেটা একেবারেই স্বাভাবিক র‍্যাং। সমীক্ষা চলবার সময় তোমাদের সমস্ত মূল স্মৃতি গোপন করে রাখা হয়। সেইটাই নিয়ম। তবে এখন এ নিয়ে আলোচনার সময় নয়। মন্ত্রীমণ্ডলী অপেক্ষা করছেন–"

গোল পাথরটাকে ঘিরে একটা টেবিলের ছবি ভেসে উঠেছে। তার চারপাশে একে একে কিছু মানুষজন শূন্য থেকে বের হয়ে এসে আসন নিচ্ছিলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে গলা উঁচু করে বললেন, "পার্থিব সভ্যতার ওপরে এই পর্যায়ের সমীক্ষা শেষ হয়েছে। স্মৃতিযন্ত্র দুজন ফিরে এসেছে। অনুমতি পেলে তারা তথ্যগুলো পেশ করতে পারে।"

টেবিলের একেবারে মাথায় বসে থাকা নেতাগোছের মানুষটা মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। রেনি ততক্ষণে গোল পাথরটার ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। জিভার ইঙ্গিতে পাথরের ফাটল বেয়ে একটা ধাতব নল সাপের মত হিলহিল করে বেরিয়ে এসে তার মাথার একপাশে নিজেকে জুড়ে নিচ্ছিল তখন। যন্ত্রণায় একবার কুঁকড়ে উঠল রেনির মুখটা। তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল সে। চোখদুটো বোঁজা। যেন স্বপ্ন দেখছে কোন।

বাতাসের গায়ে একটা তিনমাত্রার ছবি ভেসে উঠছিল। পাহাড়ের উল্টোদিকের শহরটার একটা ছোট্ট প্রতিরূপ ভাসছে সেখানে। রেনির গলার স্বর ভেসে আসছিল টেবিল ঘিরে বসে থাকা লোকজনের মাথার ভেতরে-

"সিন্ধু নামের এই নদীটাকে ঘিরে এইরকম দেড় হাজার শহর গড়ে তুলেছে এরা মাত্রই কয়েক শতাব্দির মধ্যে। মেধাস্তর খ-১১।"

"অসম্ভব। এত উঁচু স্তরের মেধা প্রকৃতিতে সম্ভব নয়।" একজন সদস্য প্রতিবাদ করে উঠলেন হঠাৎ।

"অংক ভুল বলে না আলস্টর্ক," ঘুমন্ত রেনির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা র‍্যাং কথা বলে উঠল হঠাৎ, "গণকের পূর্বাভাষ অনুযায়ী আগামী এক থেকে দেড় সহস্রাব্দির মধ্যে এরা নক্ষত্রভ্রমণের-"

****

অন্ধকার পাহাড়ের গা বেয়ে নিঃশব্দে উঠে আসছিল দশ হাজার সেনার বিশাল বাহিনীটা। মঞ্জাদাহোর নগরীর সীমানা পেছনে ফেলে এসে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তারা জিবারার চূড়ার দিকে। শিকারি বেড়ালের মত

সতর্ক, নিঃশব্দ পদক্ষেপে কোন শব্দ জাগে না। তারার আবছা আলোয় মনে হবে বিরাট সাপ যেন একটা, এঁকেবেঁকে শিকারের সন্ধানে চলেছে।

সেনাদলের একেবারে সামনে থেকে রাতচরা কোন পাখির ডাক ভেসে এল হঠাৎ। সঙ্গেসঙ্গে জাদুমন্ত্রের মত সমস্ত নড়াচড়া থেমে পাথরের গায়ে মিশে গেল যেন সেই সৈন্যদল। এবার পরের সংকেতের অপেক্ষা। চূড়ায় পৌঁছতে বেশি দেরি নেই আর।

দলটা থেকে দশজন খোঁজারু বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে বুকে হেঁটে উঠে গেল জিবারার চূড়ার কাছে। খানিক বাদে ওপর থেকে তাদের খোলা গলার শব্দ ভেসে এল-"সেনারা উঠে আসুক। কোনো ভয় নেই। জয় পশুপতি।"

যেন একটা বাঁধ ভেঙে গেল সেই শব্দ পেয়ে। হাঁক ছেড়ে সৈন্যের দল ছুটছে জিবারার চুড়োর দিকে। পশ্চিমে সদ্য ওঠা একফালি চাঁদের ম্লান আলোয় ফাঁকা পাহাড়ের উল্টোদিকের উপত্যকার ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট চেহারার গোল পাথর দেখা যাচ্ছিল শুধু। আর কোন জনমানুষের চিহ্ন নেই সেখানে।

সার বেঁধে সেইদিকে নামতে শুরু করল সেনাবাহিনী। এ উপত্যকাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে আজ তাদের। মহাপুরোহিত সে কাজে কোন ত্রুটি রাখতে চান না।

****

র‍্যাং ও রেনি নামের স্মৃতিযন্ত্র দু'জন পাথরের গা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে দুলছিল দুজন। চোখ বোঁজা। জিভা এগিয়ে এসে দু'হাতে তাদের দুজনকে ধরে নিলেন।

"তথ্য নিষ্কাশণ করতে কতক্ষণ সময় লাগল জিভা?"

"এই গ্রহের হিসেবে পুরো তিনদিন রেনি। তোমরা নিশ্চয় ক্লান্ত?"

র‍্যাংয়ের মাথাটা নিজের কাঁধে রেখে মৃদু চাপড় দিতে দিতে রেনি বলল, "হ্যাঁ। অনুমতি পেলে আমরা একটু ঘুমিয়ে নেব এখন।"

টেবিলের মাথায় বসা বৃদ্ধ মানুষটা তাদের দিকে নজর না দিয়ে নিজের মনেই মাথা নাড়ছিলেন, "অবিশ্বাস্য। মাত্র কয়েক শতাব্দির চেষ্টায় উন্নতির এই স্তরে এসে পৌঁছনো-"

জিভা মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া, গণকের হিসেবটা তো শুনলেন। এই গতিতে এগোলে আর এক থেকে দেড় সহস্রাব্দির মধ্যে নক্ষত্রভ্রমণের প্রযুক্তি এদের নাগালে আসবার কথা।"

"তার মানে–"

"মানেটা বোঝা কঠিন নয়। সম্মিলিত গ্রহপুঞ্জের সদস্যপদ পেতে তারপর বেশি সময় লাগবে না এদের। এই গ্রহের গভীরে আমাদের বে-আইনি খনিগুলোর অস্তিত্বও জানতে পারবে এরা। এর ফল-"

"আমি জানি জিভা," উত্তেজিত গলায় তাঁকে থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ, "গ্রহপুঞ্জের অজান্তে এই গ্রহ থেকে যত পরমাণ দুষ্প্রাপ্য খনিজ আমরা সরিয়ে নিয়েছি, তার দাম চোকাতে হবে সুদে-আসলে।"

"এর সমাধান আছে মহামান্য। গত দুটো সমীক্ষার পর সে প্রস্তাব বারংবার দিয়েওছি। আপনারা রাজি হননি।"

"জানি। সেই পুরোনো প্রস্তাব। এখানকার জীবমণ্ডলকে মুছে দেয়া, তাই তো?"

"হ্যাঁ। গ্রহটা বড়ো নয়। জিটা তরঙ্গের একটা আঘাতই যথেষ্ট হবে।"

"হাঃ। একটা অপরাধ ঢাকতে আর একটা গুরুতর অপরাধ ঘটানো। সপ্তম মহাযুদ্ধের পর থেকেই জিটা তরঙ্গের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এতবড়ো একটা ঝুঁকি--"

হঠাৎ জিভার হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে দেয়ালের দিকে দেখাল রেনি। সেখানে, আবছা চাঁদের আলোয় দল বেঁধে এগিয়ে আসা একদল সৈনিকের ছবি ভেসে উঠেছে।

"ওরা আমাদের খোঁজেই আসছে জিভা। আমি ওদের চিন্তাতরঙ্গ পড়তে পারছি!" রেনির গলায় আশংকার ছাপ ছিল।

একটুক্ষণ সেইদিক তাকিয়ে দেখলেন জিভা। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "জায়গাটা শক্তিবর্মে ঢাকা। আমাদের ওরা দেখতে পাবে না রেনি। এ উপত্যকা ওদের চোখে একেবারে খালি।" তারপর টেবিলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আগের কথাবার্তার সুতোটা তুলে নিলেন ফের, "ঝুঁকি আছে মানছি, কিন্তু এটাই আমার মতে সেরা সমাধান।"

টেবিলের চারপাশে ঘিরে বসা সদস্যরা নিচুগলায় আলোচনা করছিলেন। তাঁদের চোখ প্রধানমন্ত্রীর হাতে ধরা একটা ছোটো গণকযন্ত্রের পর্দায় আটকানো। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, "দুঃখিত জিভা। এখনই সে ঝুঁকিটা নিতে মন্ত্রীসভা রাজি নয়। উপস্থিত সিন্ধুর ধারে গড়ে ওঠা এই শহরগুলোকে ধ্বংস করে দেয়াই যথেষ্ট হবে।"

জিভা হতাশভাবে মাথা নাড়লেন, "এতে কোন স্থায়ী সমাধান-"

"হবে না জানি। আগের দুবারেও তা হয়নি। এক জায়গায় ধ্বংস করলে সাময়িক পিছিয়ে পড়েও ফের নতুন জায়গায় সভ্যতাকে গড়ে তোলে এরা-" বলতেবলতে হাতের যন্ত্রটার পর্দায় ফের একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন বৃদ্ধ, "তবে আমাদের হিসেব বলছে এ শহরগুলো ধ্বংস হলে এই গ্রহের মানুষের অগ্রগতির হার অন্তত পাঁচ হাজার বছর পিছিয়ে যাবে। উপস্থিত সেটুকুই যথেষ্ট। তুমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও।"

"কিন্তু মহামান্য-"

বৃদ্ধের চোখদুটি কঠিন হয়ে উঠল। ঠান্ডা গলায় বললেন, "আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়েছি। আগামি এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি তা কার্যকর করবে। চার সহস্রাব্দি বাদে ফের একবার সমীক্ষা করবার পর উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।"

এ আদেশের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। একটুক্ষণ থেমে থেকে জিভা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সমীক্ষার স্থান?"

"আমাদের গণক তা ঠিক করবে। ভ্রমণকৌটায় প্রয়োজনীয় আদেশ পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখানকার কাজ শেষ হবার পর তা তোমাদের সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। এখন বিদায়-"

****

কাচের পুতুলের মত স্বচ্ছ হয়ে আসতে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে কিছু ভাবছিলেন জিভা। হঠাৎ পেছন থেকে রেনির ডাকে তাঁর চমক ভাঙল। দেয়ালে ভেসে ওঠা ছবিতে বিরাট সেই সেনাবাহিনী তখন পাহাড়ের ঢাল ধরে ফের নিজেদের শহরের পথ ধরেছে।

"কিছু বলবে?"

"সৈন্যদের দিকে আঙুলের একটা ইশারা করল রেনি। ফিরতি পথ ধরা সেনাদলটার মধ্যে একজনের ছবি হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠল সেখানে। তার দিকে দেখিয়ে রেনি বলল, "বিচারক সিবিলা। অত্যাচারী সিবিলা। আমাদের পালক। র‍্যাং আর আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে সে। অনুমতি দিলে তাকে কিছু শাস্তি দিতে চাই।"

"না রেনি। তার কোন প্রয়োজন হবে না আর। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত তো শুনেছ। অন্য শাস্তি অপেক্ষা করে আছে এদের জন্য। এখন তার প্রস্তুতি নিতে হবে আমায়। সময় কম। এরপর লম্বা যাত্রা আছে সামনে।"

****

বর্ষার প্রথম মেঘ যখন সিন্ধুনদীর ওপরে তার ছায়া ফেলে, ভারী সুন্দর লাগে তাকে দেখতে। আলোয়, কালোয়, সবুজে, হলুদে সে ভারী চমৎকার রং। সকালে ঘুম থেকে উঠে নদীর পুবপারের আকাশে আজ সেই মেঘ দেখতে পেয়ে এ গ্রামের মানুষজনের বড়ো আনন্দ। গরমকালের কষ্টের দিন শেষ হবে এবারে।

গ্রামপ্রধানের লোক এসে ঢ্যাঁড়া দিয়ে গেছে খানিক আগে। শহর থেকে বড়োপুরুতের খবর এসেছে, আজ বৃষ্টি নামবে। সবাই তৈরি থেকো। আজ জমিতে লাঙ্গলের প্রথম খোঁচা দিতে হবে। গ্রামের মানুষেরা তাই আজ কেউ ঘরে নেই। যার যার ক্ষেতে লাঙল গরু নিয়ে তারা অপেক্ষা করছে বৃষ্টি নামবার। অবশ্য রোদে পুড়ে ঝাঁই জমিতে লাঙল গাঁথা যাবে না শুরুতে। কিন্তু ওই ছুঁইয়ে দেবার রীতটুকু প্রথম দিনে মানতেই হয়।

পশ্চিমে বেশ কিছু দূরে শহরের বন্ধ দরজাগুলো হাট করে খুলে দেয়া হচ্ছে একে একে। মঞ্জাদাহোর শহরের প্রতিটি মানুষ বর্ষাকে স্বাগত জানায় শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে। আকাশ ভেঙে নেমে আসা প্রথম বৃষ্টির ধারায় লাল-নীল-হলদে পোশাক পরা হাজারো মানুষের সারাদিনের সেই নাচগান আসলে বৃষ্টির ঠাকুরকে খুশি করবার কায়দা। এরা তাকে বলে বর্ষাপুজো।

বাতাস ভারী হয়ে আসছিল আস্তে আস্তে। রোদের তেজ কমে এসেছে। যেন এক ফুঁয়ে কেউ নিভিয়ে দিচ্ছে বিরাট একটা মশাল। সেই কমে আসা আলোয় শহর ছেড়ে রঙিন পোশাক পরা মানুষগুলো বের হয়ে এল এবারে। তাদের মাথার ওপরে জোলো হাওয়ায় ভর করে নেমে আসতে শুরু করেছে বৃষ্টির ফোঁটগুলো।

কিন্তু শুরু হতে না হতেই নাচ থেমে গেল হঠাৎ। থেমে গেছে বাজনদারদের হাত, গাইয়েরা চুপ হয়ে গেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙল হাতে তৈরি চাষীদের চোখও আটকে গেছে হঠাৎ আকাশের গায়ে। সেখানে হঠাৎ করেই কোন অজানা জাদুতে মিলিয়ে যাচ্ছে জমে ওঠা ঘন বর্ষার মেঘ। না, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে না তারা। শুধু মিলিয়ে যাচ্ছে। আর তার আড়াল থেকে ফের বের হয়ে আসছে গত দু'মাস ধরে দেখতে থাকা রোদেপোড়া তামাটে আকাশ আর ঝলসে দেয়া গ্রীষ্মের সূর্য--

--জিবারার অন্যধারে বসে মিলিয়ে যেতে থাকা মেঘগুলোকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন জিভাও। গোলক আকারের বিরাট পাথরটার গায়ের লম্বাটে ফাটলের মধ্যে থেকে তীব্রবেগে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আয়নীভূত জেক্সার গ্যাসের স্রোত। অদৃশ্য এই কণাদের ছোঁয়া পেলে জল ভেঙে গিয়ে বের হয়ে আসে তার গ্যাসীয় উপাদানেরা। জিভার সামনে পৃথিবীর একটা ছোট্ট ত্রিমাত্রিক ছবি স্থির হয়ে ভাসছে। হালকা লাল রঙের একটা বৃত্ত তার গায়ে সিন্ধু আর তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে চিহ্নিত করে রেখেছে। বৃত্তের কেন্দ্রীয় এলাকা থেকে সাদাটে রঙের একটা চাদর ছড়িয়ে পড়ছিল পরিধির দিকে।

গোটা বৃত্তটা সাদা হয়ে যাবার সঙ্গেসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে পাথরটাকে একবার ছুঁলেন তিনি। আঙুলের দ্রুত নড়াচড়ায় দুর্বোধ্য কিছু নকশা গড়ে উঠছিল তার গায়ে। সাদাটে এলাকাটা তাঁর আঙুলের সেই সংকেত পেয়ে এইবারে স্থির হয়ে গেছে।

একটু বাদে পাথর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মৃদু হাসলেন জিভা। রেনি আর র‍্যাং আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে।

"কাজ হল?"

"হ্যাঁ। আগামি দুশো বছর ধরে জেক্সার আয়নের অদৃশ্য বর্ম ঢেকে রাখবে এই এলাকাটাকে। দুই শতাব্দি ধরে এক বিন্দু বর্ষার জল ঝরবে না এই উপত্যকায়। এখানে আমাদের কাজ শেষ।"

"এর পর?"

"ভ্রমণকৌটাকে যাবার জন্য তৈরি কর রেনি।"

গোলকাকার পাথরটা আস্তে আস্তে মাটির ভেতরে ডুবে গেছে। ওপর থেকে তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না আর। সেইখানে বসে, সবার চোখের আড়ালে, নিঃশব্দে সে তার কাজ করে চলবে আগামী দুই শতাব্দি ধরে। তিলে তিলে ধ্বংস করবে সিন্ধুর ধারে গড়ে ওঠা এই সভ্যতার প্রত্যেকটা জনপদকে।

হাতের একটা ইশারায় সামনে ভেসে থাকা পৃথিবীর ত্রিমাত্রিক ছবিটা একটু কেঁপে উঠে মিলিয়ে গেল। প্রখর রোদঝড়া দুপুরে সাঁইসাঁই করে শুকনো হাওয়া বয়ে চলেছে গোটা এলাকাটা জুড়ে।

****

"ভ্রমণকৌটা তৈরি আছে জিভা।"

রেনির ডাক পেয়ে জিভা তার দিকে ঘুরে দেখলেন একবার। সোনালী রঙের চৌকো একটা কৌটোকে মাটির ওপর বসিয়ে রেখে সে ডাকছিল। ওর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে পরবর্তী সমীক্ষাস্থলের ঠিকানা।

ঢাকনা খোলা কৌটোটাকে ঘিরে দাঁড়ালেন তাঁরা তিনজন। তার ভেতরে ভেসে থাকা তীব্র অন্ধকার একটা বিন্দু বনবন করে ঘুরছে। যেন টের পেয়েছে চারপাশে অপেক্ষায় থাকা যাত্রীদের উপস্থিতি। তারপর হঠাৎ এক তীব্র আকর্ষণে শরীর তিনটে একসঙ্গে ঝাঁপ দিল কৌটোটার খোলা মুখের দিকে। চোখের পলকে মিলিয়ে গেল তারা ঘুরতে থাকা কালো ফোঁটাটার মধ্যে। সেখানে দেশকালহীন শূন্যতার ভেতরে এইবার সংরক্ষিত থাকবে তারা, যতদিন না ফের একবার জাগবার সময় আসে।

আস্তে আস্তে ঢাকনা নেমে এল কৌটোর মুখে। বন্ধ কৌটোটা বাতাসে ভেসে উঠে স্থির হয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর তার ভেতরের যন্ত্রগণকের নির্দেশ মেনে ছিলেছাড়া তিরের মত ছুটে গেল উত্তরপূর্ব দিকে বহুদূরের এক বিরাট পর্বতমালার পথে--

দুই
১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

ভয়াল রামবাসা গিরিসংকট। তার আকাশছোঁয়া খাড়াই পাঁচিলের দক্ষিণে জমাটবাঁধা রিঙ্গান হ্রদ আর উত্তরে রামবাসা গ্লেসিয়ার। সে পাঁচিলের মাথায় এখনো কোন অভিযাত্রীর পা পড়েনি। এখন শেষ হেমন্ত। দীর্ঘ নৈঃশব্দের পর পাহাড় জেগে উঠেছে ফের। হাঁকার দিয়ে উঠেছে মরসুমী ব্লিজার্ড। তীব্র পশ্চিমা হাওয়ায় ভর করে রাতের অন্ধকারকে চিরে ছুটে চলেছে ধারালো বরফকুঁচির স্রোত। মরশুমের প্রথম বরফ।

তুষারনদীর বুকে খানিক এলাকা জুড়ে মৃদু কাঁপুনি জাগল হঠাৎ। তলা থেকে কোনো প্রচন্ড চাপে চিড় ধরছে জমাটবাঁধা কালো, প্রাচীন বরফের স্তরে। পুরোনো বরফ লড়ছিল। সহজে সে নিজের জমি ছেড়ে দিতে রাজি নয়। কিন্তু লাভ হল না। একটু বাদেই কামানের গোলা ছোঁড়বার মতন শব্দ করে ফেটে গেল বরফের স্তর। বড়ো বড়ো চাঁইগুলো পালকের মত বাতাসে ছিটকে উঠে আছড়ে পড়ছে নীচে। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে। একটু বাদে ফাটলের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ বাড়াল প্রায় দশ মিটার ব্যাসার্ধের নিখুঁত একটা পাথরের গোলক। অবিশ্রান্ত ঝরে পড়া তুষারকণারা তার ওপরে দ্রুত সাদা আস্তরণ তৈরি করে ফেলছিল।

খানিকক্ষণ সেইভাবেই পড়ে রইল গোলক। তার সারা দেহে তিরতিরে কাঁপন উঠছিল। তার অদৃশ্য সেনসররা তখন জরিপ করে নিচ্ছে চারপাশের পরিবেশকে। মিনিটখানেকের মধ্যেই পরীক্ষানিরীক্ষা শেষ হল গোলকের। এবারে হঠাৎ করেই তাপমাত্রা বাড়াল সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হিমাংকের নীচে থেকে বেড়ে তা জলের স্ফুটনাংককে ছাড়িয়ে গেল অবহেলায়। হিস হিস শব্দ করে বাষ্পের কুন্ডলি উড়ে যাচ্ছিল চারপাশে। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল তার উত্তপ্ত শরীর। তারপর হঠাৎ একসময় কানফাটানো শব্দ তুলে বিস্ফোরণ ঘটল তার গায়ে। তার পেট বরাবর আড়াআড়িভাবে একটা নিখুঁত জ্যামিতিক গড়ণের ফাটল ধরেছে--

****

"শব্দটা শুনলে বিশ্বনাথন?"

রিঙ্গানের ধারে মেষপালকদের পরিত্যক্ত ঘরটার ভেতরে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। বিশ্বনাথনও স্লিপিং ব্যাগশুদ্ধু উঠে বসেছেন। কান পেতে শুনছেন বাইরের দিকে।

"কিছু একটা ফাটবার মতন আওয়াজ সেন," পাহাড়ের দেয়ালটার উল্টোদিক থেকে এল বলে মনে হল," বিশ্বনাথন মাথা নাড়লেন, "এই ঝড়ের মধ্যে পাহাড় পেরিয়েও আমাদের কান অবধি এসেছে মানে বেশ বড়োসড়ো কিছু শব্দই হবে।"

"কী হতে পারে বলো তো?"

শব্দটা একেবারে অন্যরকম। প্রাকৃতিক নয়। বুকের ভেতরে গড়ে উঠতে থাকা শিরশিরানিটাকে চাপা দিলেন বিশ্বনাথন, "পাহাড়ের ওপাশটায় বোধ হয় কোন গ্লেসিয়ার আছে। চলন্ত বরফের টানাপোড়েণে এমন শব্দ হতেই পারে। আল্পসের উঁচু এলাকায় আমি আগেও শুনেছি।"

"বেরিয়ে দেখব নাকি একবার?"

"উঁহু। একদম নয়। জায়গাটা অচেনা। অন্ধকারে ঝড়ের মধ্যে বাইরে বের হওয়া ঠিক হবে না।"

"বুড়ো হয়ে যাচ্ছ নাকি বিশ্বনাথন? ভয় পাচ্ছ?"

"ভয় নয় জ্যোতির্ময়, সাবধানতা। দিনের বেলাতেই ক্যাম্পের রাস্তা হারিয়েছি। এখন এই দুর্যোগের মধ্যে বেরিয়ে নতুন বিপদ ডেকে আনবার মানে হয় না। ঝড় থামলে তখন ভাবা যাবে। এখন শুয়ে পড়ো।"

"ঘুম আসছে না হে। আজ সন্ধেয় কসমিক রে ডিটেকটারগুলো তুলে এনে রিডিং নেবার কথা ছিল। সেগুলো এই ঝড়ে কোথায় উড়ে যাবে কে জানে। গোটা পরিশ্রমটাই বৃথা গেল এযাত্রা।"

"আর বৃথা। যা ঝড় ছেড়েছে তাতে কাল সকালে বেরিয়ে দেখতে পাবে গোটা এলাকার ভুগোলটাই হয়ত পালটে গেছে বরফের গুঁতোয়। ভালোয় ভালোয় নাগবস্তির ক্যাম্পে ফিরতে পারলে হয় এখন। বাঁচলে পরে ফের পরীক্ষানিরীক্ষা করবার সুযোগ পাবে।"

"বলাটা সহজ। কিন্তু আবার একটা নতুন এক্সপেডিশান করবার মত টাকা মঞ্জুর হবে তো?"

"উফ্। সে ভাবনাটা আমার ওপর ছেড়ে দাও তো! আমি যখন তোমার রিসার্চ গাইড তখন টাকা মঞ্জুর করাবার দায়িত্বও আমার। নাও। এখন শুয়ে পড়," বলতে বলতে স্লিপিং ব্যাগের চেন একেবারে সবটা টেনে নিয়ে কাত হয়ে শুলেন বিশ্বনাথন। সাক্ষাত নরকে গিয়ে পড়লেও তাঁর কখনো ঘুমের অসুবিধে হয় না।

****

পাথরের বুকে সদ্যগজানো ফাটলটার ভেতরে মৃদু গুঞ্জন উঠল হঠাৎ। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তার ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বাতাসে ভেসে উঠল একটা সোনালি কৌটো। আয়তনে হাতের মুঠোর মতন হবে তা।

ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কাকে উপেক্ষা করে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে ভেসে রইল কৌটো। তারপর তার ওপরের অর্ধেকটা নিঃশব্দে খুলে গিয়ে উগড়ে দিল একরাশ উত্তপ্ত বস্তুকণার স্রোত। চোখ ধাঁধানো আলোর রেখার মত সে স্রোত বনবন করে পাক খাচ্ছিল। আর পাক খেতেখেতেই আকার বদলে একটা মানুষের অবয়ব নিচ্ছিল তা।

মাত্রই কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। তার পর ছ'ফুট লম্বা রোগাটে মানুষটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে দেখে নিলেন একবার। তাঁর শক্তিশালী মন পাহাড়ের অন্যধার থেকে দুজন মানুষের মস্তিষ্কতরঙ্গের সাড়া পাচ্ছিল। এই পরিবেশে এত কাছাকাছি দুজন মানুষের খোঁজ পেয়ে যাবেন তা তিনি ভাবেন নি। এদের মধ্যে কোন একজন রেনি আর র‍্যাঙের অভিভাবক হবার যোগ্য কিনা সেটা যাচাই করে নেয়া দরকার। এখানেই কাজ হয়ে গেলে আর খোঁজাখুঁজির দরকার হবে না।

তরঙ্গদুটির দিকে মনঃসংযোগ করে ধ্যানস্থ হলেন তিনি। খানিক বাদে যখন চোখ খুললেন, তখন তাঁর মুখে একটুকরো হাসি। ভাগ্য সদয়। এরা স্থানীয় উপমহাদেশের বাসিন্দা। মস্তিষ্কে অতি উচ্চমানের মেধা ও বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে। পথ হারিয়েছে এরা। সেটা কোন সমস্যা নয়। সে পথ তিনি সহজেই দেখিয়ে দিতে পারবেন এদের।

পাশে ভাসন্ত বাক্সের ভেতরে স্থির হয়ে থাকা অন্ধকার বিন্দুটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। আঙুলগুলো অকল্পনীয় গতিতে নড়াচড়া করে জটিল কিছু নকশা গড়ে তুলছিল। গাণিতিক ভাষায় কিছু নির্দেশ। বাক্সের যন্ত্র তার অর্থ ঠিকই বুঝে নেবে।

আঙুলের ভাষা শেষ হতে না হতে ফের একবার সচল হয়ে উঠল কালো বিন্দু। বস্তুকণার অপেক্ষাকৃত ছোটো আরেকটা ধারা উগড়ে দিল সে মানুষটির সামনে।

কয়েকমুহূর্ত বাদে তাঁর সামনে বরফে শুয়ে থাকা ফুটফুটে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। পোশাকের ভাঁজ থেকে খানিকটা কাপড় বের করে এনে যত্ন করে জড়িয়ে দিলেন তার গায়ে। মেয়েটার বয়স বড়োজোর বছরখানেক হবে। টলটলে দুটো চোখ মেলে সে একবার তাকিয়ে দেখল তাঁর দিকে। তারপর পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, "আর র‍্যাং?"

"এখন নয় রেনি। তার জাগবার সময় হবে ঠিক সাত বছর পরে। চিরকালই তো তোমরা আট বছরের ছোটোবড়ো ভাইবোন হয়ে কাজ করতে গিয়েছ।"

"অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া গেছে কি?"

"হ্যাঁ। কাছাকাছিই আছেন। দুজন উপযুক্ত মানুষ পাওয়া গেছে। একজন বয়স্ক। অন্যজন অপেক্ষাকৃত তরুণ। তুমি তোমার পছন্দমতন বেছে নিতে পার। তবে আমার মনে হয় কমবয়েসি মানুষটি বেশি উপযুক্ত হবেন। মনদুটিকে দেখতে চাও?"

"নাঃ। আপনার বিচারের ওপর আমার ভরসা আছে জিভা। এবারের কাজের এলাকা?"

"ভারতবর্ষ। স্থানীয় উপমহাদেশ। তোমার কাজ-"

"জানি জিভা। এর আগে তিনবার যা করেছি-"

"তবু–চার হাজার বছরের ঘুমের পর জেগে উঠে কাজে যাবার আগে একবার স্মরণ করে নেয়া ভালো।"

"বেশ। আমার, এবং আমার পরে আসা র‍্যাং-এর কাজ হবে অভিভাবকের সমাজের প্রতিটি জিনিসকে খুঁটিয়ে দেখা ও মস্তিষ্কে তার বিবরণ ধরে রাখা। তারপর সময় হলে ফিরে এসে আপনার বিশ্লেষণের জন্য তা জমা করা হবে। নিছক একটা যন্ত্রের মতন কাজ জিভা। আপনাদের সমীক্ষাযন্ত্র। তার বেশি কিছু নয়।" একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটল রেনির মুখে।

"না রেনি। তোমাদের কাজের মূল্য তুমি জানো না। প্রস্তরযানের কুড়ি কিলোমিটার ব্যাসার্ধের সুরক্ষাবৃত্তের বাইরে সশরীরে আমি পা দিতে পারি না। এই গ্রহের পরিবেশ আমার জন্য বিষাক্ত। কিন্তু তোমাদের মত জৈবযন্ত্রের

জন্য তা কোন বাধা হবে না। এ গ্রহের পরিবেশের উপযুক্ত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের। কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলে অকল্পনীয় পুরষ্কার অপেক্ষা করে আছে তোমাদের জন্য।"

বলতে বলতে নিজের মনেই একচিলতে হাসি খেলে গেল জিভার ঠোঁটে। পুরস্কার! জারাফা গ্রহের তৃতীয় উপগ্রহের অন্ধকার বুকে কাজ শেষ হওয়া এমন লক্ষ লক্ষ যন্ত্রদাসের দেহ পড়ে আছে। জারাফার সভ্যসমাজে যন্ত্রজীবদের কোন জায়গা নেই।

রেনির উজ্জ্বল চোখদুটো তাঁকে জরিপ করছিল। সেদিকে ফিরে মাথার চিন্তাটা ঝেরে ফেলে দিয়ে জিভা বললেন, "এখন এসো। স্মৃতি লুকোবার সময় হল। রাত শেষ হয়ে আসছে–"

****

কোলে ঘুমন্ত মেয়েটার মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন জিভা। নির্দিষ্ট নকশায় হাতের প্রত্যেক আসাযাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ঘুমিয়ে পড়ছে তার মূল স্মৃতি। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁর কোলের মধ্যে কেঁপে উঠল মেয়েটা। চিৎকার করে কাঁদছে সে। অবোধ, অর্থহীন বাচ্চা মেয়ের কান্না।

"পুরনো সেই দিনের কথা
ভুলবি কীরে হায়
ও সে চোখে দেখা প্রাণের কথা
সে কি ভোলা যায়–"

কাঁধের ওপর তাকে ফেলে মৃদু চাপড় দিতে দিতে গান গাইছিলেন জিভা। অভিভাবকের স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে এ গানটি খানিক আগেই খুঁজে পেয়েছেন তিনি। মানুষটার প্রিয় গান। এবারে তা এই মেয়েটারও প্রিয় গান হয়ে উঠবে–

-রামবাসা টপ থেকে গ্লেসিয়ারের দিকে নেমে আসা আইসফলটার দিকে এইবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। ঝড় কমে আসছে দ্রুত। মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠেছে। পুরু বরফের ওপর তার ঝলমলে আলো পড়েছিল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় চাঁদমাখা বরফের কুঁচি উড়ে যাচ্ছিল তাঁদের ঘিরে। মাথা তুলে রামবাসা টপ এর দিকে একবার চাইলেন জিভা। তারপর মেয়েটাকে কোলে ধরে রেখে বাতাসে ভেসে উঠে তিরবেগে উড়ে চললেন আইসফলের সাদা দেয়ালের গা ঘেঁষে--



ঝড় থেমে গেছে একেবারে। দেয়ালের ফুটোফাটা দিয়ে চাঁদের ধবধবে আলো ঢুকে আসছিল ঘরের ভেতরে। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে জেগে ছিলেন জ্যোতির্ময় সেন। ঘুম আসছে না। পাশে বিশ্বনাথন মরার মতন ঘুমোচ্ছেন।

হঠাৎ দরজার কাছ দিয়ে একটা ছায়ার মত কিছু ভেসে গেল এক মুহূর্তের জন্য। জ্যোতির্ময় সতর্ক হলেন। কোন অস্ত্র নিয়ে বের হননি তাঁরা আজকের আউটিং-এ। বাইরে নরম বরফের ওপর হালকা একটা আওয়াজ আসছে। কান পাতলেন তিনি। পায়ের শব্দ। মৃদু চাপে মুড়মুড় করে বরফ ভেঙে এগিয়ে আসছে এদিকে।

হাত বাড়িয়ে বিশ্বনাথনের গায়ে মৃদু ঠেলা দিলেন জ্যোতির্ময় সেন। বিশ্বনাথন নড়ল না। একটু ভয়ভয় করছিল তাঁর। জায়গাটা সম্পূর্ণ অচেনা। হাতঘড়িতে সময় দেখাচ্ছিল রাত তিনটে বেজে পাঁচ। ফের একবার ধাক্কা দিলেন তিনি বিশ্বনাথনের গায়ে। এবারে একটু জোরে। তবু নড়লেন না তিনি। নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছেন। এমনটা হবার কথা নয়। বিশ্বনাথন ঘুমের মধ্যেও বেড়ালের মত সতর্ক থাকেন। এর আগেও একাধিক গবেষণা অভিযানে তিনি তা দেখেছেন।

কিন্তু সে নিয়ে ভাববার সময় আর তখন নেই তাঁর। পায়ের শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। পচা পাইনকাঠের ভঙ্গুর দরজার এখানে ওখানে ফুটো দিয়ে চাঁদের আলো আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ রাখলেন একটা ফুটোর গায়ে--

নীলচে রুপোলি চাঁদের আলোয় ধূ ধূ করছিল বরফছাওয়া রিঙ্গানের বুক। তার ওপর হেঁটে আসছেন একজন মানুষ! কোলে ছোটো একটা পুঁটুলি! পুঁটুলিটা নড়ছে! দুটো ছোটো ছোটো হাত বেরিয়ে জড়িয়ে ধরেছে লম্বা মানুষটার গলা–

কাছে -আরো কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। তাঁর লম্বা চুলদাড়িতে বরফের কুঁচি। সারা শরীরে চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ছে। কোলে ধরা ছোট্ট মানুষটা জেগে উঠেছে এবার। মাথা ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছে।

হঠাৎ কেমন করে যেন মনের ভেতর থেকে সব ভয় মুছে গেল জ্যোতির্ময় সেনের। যেন কেউ ঠান্ডা একটা হাত বুলিয়ে দিল তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে। আগন্তুক শত্রু নন। বন্ধু। কোনো অজ্ঞাত পথে তাঁর মনকে সে খবর তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বনাথন নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটল জ্যোতির্ময়ের ঠোঁটে। ও এখন জাগবে না। তিনি এখন জানেন, আগন্তুক কোন সাক্ষি রাখতে চান না এ ঘটনার। ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাইরে এগিয়ে এলেন জ্যোতির্ময় সেন।

কোন কথা হল না। সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখে চোখ রাখলেন মানুষটি কয়েকমুহূর্তের জন্য। জ্যোতির্ময়ের মাথার ভেতর ঝমঝম করে বেজে উঠল কিছু কথা- কয়েকটি নির্দেশ, ফিরে যাবার পথের হদিশ।

কোলে ধরে রাখা বাচ্চা মেয়েটাকে এইবার বাড়িয়ে ধরলেন তিনি জ্যোতির্ময়ের দিকে। দুহাতে তাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন জ্যোতির্ময়। তারপর মাথা নিচু করে বললেন, “ধন্যবাদ জিভা। এবার আমার আর নাগবস্তি অবধি ফিরে যেতে কোন অসুবিধে হবে না। সাত বছর পর এইখানে এসে দ্বিতীয়জনকেও আপনার থেকে নিয়ে যাব আমি। তাদের যত্ন, শিক্ষাদিক্ষার ত্রুটি হবে না। আমার ছেলেমেয়ে নেই।”

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডানহাতটা একবার উঁচু করে ধরলেন জিভা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলেন উত্তরদিকের রামবাসা গিরিসংকটের দিকে। দেখতে দেখতে বরফের গায়ে চাঁদের আলোর মায়াবি আবছায়ায় মিলিয়ে গেল তাঁর লম্বা শরীর। জ্যোতির্ময়ের মাথার মধ্যে তখনও তাঁর শেষ কথাক’টি গুণগুণ করছিল, “এ সাধারণ মেয়ে নয়। আজ থেকে কুড়ি বছর পর এর মধ্যে তার চিহ্ন ফুটে উঠবে। তখন তুমি এদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। মনে রেখো–আজ থেকে ঠিক কুড়ি বছর–”

****

চাঁদের আলো মরে এসেছে প্রায়। পুবদিকে আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে একটু একটু। হঠাৎ বিশ্বনাথনের হাতঘড়ির অ্যালার্মটা টিঁ টিঁ করে বেজে উঠল। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়ে মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠেছে। তার হাসির শব্দ রঙিন আলোর টুকরোর মতন ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরটার মধ্যে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বিশ্বনাথন। ঘুম ভাঙা চোখে অবাক হয়ে দেখছেন মেয়েটার দিকে। তাকে যত্ন করে কোলে তুলে নিয়ে জ্যোতির্ময় বললেন, “আমার মেয়ে। ওর নাম রেখেছি রঞ্জা। কোন প্রশ্ন করবে না বিশ্বনাথন।

আমি জবাব দেব না। এই জমাট বাঁধা হ্রদটার নাম রিঙ্গান। ওপাশে রামবাসা গিরিসংকট। ওর ওপারে একটা বিরাট গ্লেসিয়ার আছে। রামবাসা গ্লেসিয়ার। আমি এখান থেকে ক্যাম্পে ফেরবার রাস্তাটা জানি। বেশি দূরে নয়। চলো।"

তিন
২০১৫

"গুগল-এ আজকাল একটা নতুন ফিচার হয়েছে। রিভার্স ইমেজ সার্চ। কখনো দেখেছিস দিদি?"

রঞ্জা চুল বাঁধছিল। দেরি হয়ে যাচ্ছে তার। ফিতেটা কামড়ে ধরে বলল–"উম্‌ম্‌--"

রঙ্গন স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই বলল,"উম্‌ম্‌ মানে কী? অ্যাঁ?"

"উঃ। এই ছেলে একেবারে কমপিউটারের পোকা হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে থেকে দেখছি খুটখাট করেই চলেছে কিবোর্ড নিয়ে।"

"আ রে কী পেয়েছি একবার দেখই না শুধু! চমকে যাবি।"

রঞ্জার চুল বাঁধা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাগে কাগজপত্রগুলো ঢোকাতে ঢোকাতে পর্দার দিকে একনজর দেখল সে। সেখানে বিরাট বিরাট ফুটবলের মত তিনটে পাথরের ছবি ভাসছে।

"ধুস্‌!ও তো নিউজিল্যান্ডের সেই বিখ্যাত মোরেকি লাইমস্টোন বোল্ডার। কাল রাতেই তো তোকে দেখালাম। সেইটাই আবার তুই আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবি?"

"হুঃ। তুই আবার ভূতত্ত্ব নিয়ে রিসার্চ করবি? ভালো করে দ্যাখ একবার পাথ্রগুলো। ওগুলো মোরেকি বোল্ডার? কিচ্ছু জানে না।"

রঙ্গন মিটমিট করে হাসছিল। কথাগুলোর ফল কী হবে সে তার ভালো করেই জানা। সেটা ফলতে দেরিও হলনা। রঞ্জা ব্যাগট্যাগ আছড়ে ফেলে তার চুলের মুঠি ধরতে ছুটে আসছে। সঙ্গে শাসানি, "চুপ করে দাঁড়িয়ে মার খাবি তুই বলে দিলাম। নড়বি না। আমি তোর থেকে আট বছরের বড়ো দিদি। এই–এই হাত পা ছুঁড়বি না বলে দিচ্ছি। উঃ কী কেঠো কেঠো হাত! আজ তোর একদিন কি–ও মা -মা–শুনে যাও তোমার গুণধর ছেলে কী–"

কথাগুলো বলতেবলতেই কমপিউটার বন্ধ করতে গিয়েছিল রঞ্জা। কিন্তু কাজটা পুরো করা হল না তার। তার শিক্ষিত চোখ পর্দার ওপরে পাশাপাশি ভাসতে থাকা তিনটে ছবির ওপরে ফের একবার আটকে গেছে। খানিক বাদে ফিসফিস করে বলল,"এগুলো–এগুলো তো মোরেকি বোল্ডার নয়!তাহলে–"

রঙ্গন তাকে আসতে দেখেই একলাফে খাটের ওপর গিয়ে উঠেছিল। এইবারে দিদিকে শান্ত হতে দেখে টুক করে বেড়ালের মতন একটা লাফ মেরে এসে তার পাশে দাঁড়াল, "কাল তোর দেখানো মোরেকি বোল্ডারের একটা ছবি নিয়ে গুগলে একইরকম দেখতে অন্য ছবির জন্য পাত্তা লাগিয়েছিলাম। গাদাগাদা ছবি এল। সব ওই মোরেকি বোল্ডারের ছবি। শেষে মোরেকি শব্দটাকে বাদ দিয়ে খুঁজতে এই তিনটে ছবি এল বুঝলি! এর একটাও নিউজিল্যান্ডের না-"

রঞ্জা তখন তার কথা আর শুনতে পাচ্ছে না। ছবিতিনটের মূল ওয়েবপেজগুলোকে আলাদা আলাদা ট্যাবে খুলে নিয়ে সঙ্গের লেখাগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছিল সে। আর ফিসফিস করে বলছিল, "প্রথমটা তুর্কিস্তানের 'গুবেক্‌লি টেপে' গুহাক্ষেত্রে, রেডিও কার্বন ডেটিং বয়েস বলছে বারো হাজার বছর–এটা ইজরায়েলের হেভেল এইলট মরু অঞ্চলের! আট হাজার বছর। আর এইটে সিন্ধু নদীর অববাহিকায়-- চার হাজার বছর–"

"হুঁ হুঁ। আরো আছে। তিনটের গায়েই খেয়াল করেছিস? ঠিক একরকম দেখতে একটা করে লম্বা ফাটল। কেসটা বেশ সাশপিশাস কিন্তু। তাই না?" রঙ্গনের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল। তার ভুতত্ত্ববিদ দিদিকে এমন চমকে দেবার সুযোগ তো বেশি আসে না!

"দেখেছি। ফাটলগুলো প্রাকৃতিক নয় রে ভাই! কোনো পাথর ওইভাবে একেবারে নিখুঁত জ্যামিতিক আইন মেনে ফাটতে পারে না! আর এই যে–এই দাগগুলো ভালো করে দ্যাখ–" আপনমনেই কথা বলতে বলতে রঞ্জা ফাটলের জায়গাগুলোকে বড়ো করে তুলছিল পর্দার বুকে- "বিস্ফোরণের চিহ্ন! ইমপসিবল। অতকাল আগে, ঠিক চার হাজার বছর পরপর পৃথিবীর একএকটা জায়গায় একইরকম দেখতে পাথরের গায়ে এরকম করে বিস্ফোরণ ঘটানো–ধুস, মাথাটাথা সব গুলিয়ে দিলি তুই আমার। দাঁড়া দেখি–"

“রঞ্জা দশটা কিন্তু বাজে। তোর বাবার মিটিং আছে এগারোটা থেকে। আর দেরি হলে কিন্তু,” মার কড়া গলাটা ও’ঘর থেকে ভেসে আসতে সাইটগুলোকে তাড়াতাড়ি বুকমার্ক করে দিয়ে রঞ্জা উঠে দাঁড়াল।

“রাত্তিরে ফিরে দেখব, বুঝলি? এখন দৌড়ুই।”

ডঃ সেন গাড়িতে বসে বসে একটু অধৈর্যই হয়ে উঠছিলেন। মেয়েটা সবসময় দেরি লাগাবে। ডাক দিতে যাবেন, তখন দেখা গেল রঞ্জা দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছে। গাড়িতে উঠে বসে কাচটা তুলে দিতেদিতেই বলে, “ও বাবা, ভাই কী দারুণ একটা জিনিস বের করেছে দেখো আজকে ফিরে এসে-”

গাড়ি গিয়ারে ফেলতে ফেলতে ডঃ সেন অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়লেন। রাগ হচ্ছিল একটু। এদের ছেলেমানুষী মাঝেমাঝে সমস্যা তৈরি করে দেয়। প্রতিরক্ষা দফতর থেকে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আসছেন আজকের মিটিংটার জন্য। সকালে উঠে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হচ্ছেন তখন শিখা এসে বলে, “আজ কিন্তু তুমি রঞ্জাকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছেড়ে দিয়ে তারপর ইনস্টিটিউটে যাবে।”

“আজ একটু ঝামেলা আছে শিখা,” পাশ কাটাতে চেয়েছিলেন তিনি।

শিখা কিন্তু নাছোড়। বলে, “মেয়ের পেপার প্রেজেন্টেশান আছে আজকে। যা তুকতাক মানে মেয়ে! তুমি না নিয়ে গেলে নাকি ওর পরীক্ষা খারাপ হয়। তাছাড়া ওর ক্যাম্পাস থেকে তোমার ইনস্টিটিউট আর কতোটাই বা দূর গো?”

অগত্যা অপেক্ষা করা। আসলে শিখা ওদের একটু বেশিই আদর দেয়। কুড়িয়ে পাওয়া অনাথ ছেলেমেয়েদুটো। সাত বছর ব্যবধানের সেই দুটো রাত এখনো জ্যোতির্ময়ের চোখে ভাসে! রিঙ্গান হ্রদের ধারে মেষপালকদের সেই পরিত্যক্ত কুঁড়ে! গভীর রাত্রে বরফের বুকে মরা চাঁদের আলোয় জিভার এসে দাঁড়ানো--কেউ দেখেনি--

পুরোনো স্মৃতিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতেই রাগটা কমে আসছিল তাঁর। পাশে বসে বসে রঞ্জা কলকল করে কথা বলে চলেছে। তুর্কিস্তানে, ইজরায়েলে, সিন্ধু উপত্যকায় মোরাকি বোল্ডারের মতন দেখতে একএকটা পাথর--তাতে ফাটলের দাগ, চার হাজার বছর বাদে বাদে এক্সপ্লোশান, এইসব। একটা অদ্ভুত কল্পনার জগতে বাস করে দুই ভাইবোন। গাড়ি গিয়ারে ফেলতে ফেলতে ডঃ সেন নরম গলায় বললেন, “ওসব ছেড়ে প্রেজেন্টেশানটার দিকে মন দে রঞ্জা। আজ তোদের বোর্ডে সুন্দররাজু থাকবে। ব্যাটা মহা পাজি কিন্তু। স্টুডেন্ট লাইফ থেকে দেখছি তো ওকে!”

“ও নিয়ে তুমি একদম ভেবো না বাবা। উত্তর কাশ্মীরের পাথরের স্তর নিয়ে কাজ করেছি। ওতে আমাকে বোকা বানানো মুশকিল আছে।”

“সে জানি,” প্রফেসর সেনের মুখে একটুখানি গর্বের ছোঁয়া ছিল। মেয়েটার মাথা আছে। সাত বছর বয়সে ক্যালকুলাস রপ্ত করে ফেলেছিল। ছটা ভাষায় মাতৃভাষার মতই দক্ষতা। জিওলজিতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে মাস্টার্স শেষ করল মাত্র আঠার বছর বয়সে। তার পর থেকে গত দু বছর ধরে খুব খেটেছে নিজের গবেষণার কাজটা নিয়ে। কতবার যে কাশ্মীরে ফিল্ড করে এল! আপার কাশ্মীরের অন্ধিসন্ধি চিনে গিয়েছে এর মধ্যেই। জায়গাটার দিকে ওর একটা আলাদা টান আছে। থাকবারই কথা। ও জানে না, ওইখানেই--কুড়ি বছর আগে–

কুড়ি বছর–কথাটা মনে হতেই মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা হিমশীতল ছোঁয়া নেমে গেল ডঃ সেনের। জিভা বলেছিলেন--

“ও বাবা, কোথায় যাচ্ছ? এসে গেছি তো! থামাও,থামাও–” বলতে বলতে গাড়ি ভালো করে থামতে থামতে না থামতেই দরজা খুলে একটা তুড়ুক লাফে বাইরে গিয়ে নেমেছে রঞ্জা।

“অল দা বেস্ট। ভালো করে–”

রঞ্জা ততক্ষণে দূরে দাঁড়ানো একদঙ্গল ছেলেমেয়ের দিকে হাত নাড়িয়ে ছুট দিয়েছে। ছিপছিপে শরীরটা যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে তার।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়ি দেখাচ্ছিল বেলা দশটা পঁয়তাল্লিশ। হাতে সময় নেই আর। তাড়াতাড়ি গাড়ি গিয়ারে ফেললেন ডঃ সেন।

****

“জেন্টলমেন, বিষয়টা গোপনীয়। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সরাসরি ঘটনাক্রমের দিকে নজর রেখে চলেছেন। বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে এই ঘরের বাইরে কোন কথা-” বলতেবলতেই ল্যাপটপের গায়ে একটা পেনড্রাইভ লাগিয়ে একটা ফোল্ডার খুলে ফেলেছেন প্রতিরক্ষা দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা বিমল বেহেরা।

"গত আগস্ট মাসে সেনাবিভাগ থেকে কাশ্মীরের উচ্চতর এলাকার দুর্গম অঞ্চলে একটা অভিযান পাঠানো হয়েছিল। সেখানে হঠাৎ করেই একটা অসময়ের তুষার ঝড়ে অভিযাত্রী দলটা হারিয়ে যায়।"

"তাদের কোন সন্ধান-"

"না। উধাও অভিযাত্রীদের সন্ধানে আকাশপথে দু'বার সেখানে অনুসন্ধানী দল পাঠাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই এলাকাটার কাছাকাছি এসে পৌঁছোবার সঙ্গেসঙ্গে বিমানের যাবতীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ায় সেগুলো ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।"

"যন্ত্রগুলো অকেজো হয়ে গিয়েছিল?"

"না। দশটা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে কাজ করছিল বিমানগুলোর রেডিও যোগাযোগ। সেগুলো প্রত্যেকটাই ওই এলাকায় ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাম হয়ে জায়।

"এরপর ভারতীয় দূরসংবেদি উপগ্রহ লীলাবতীকে এই কাজে লাগানো হয়। গত নভেম্বর মাসে লীলাবতী এলাকাটা থেকে একটা বিচিত্র পাথরের ছবি তুলে পাঠিয়েছে–"

বলতেবলতেই পর্দায় বরফঢাকা বিস্তীর্ণ পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে একটা হিমবাহের ছবি ফুটে উঠেছে। তার গায়ে একটা কালচে ফুটকি ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছিল পর্দা জুড়ে। একটা অতিকায় ফুটবল আকারের পাথর। তার বুক জুড়ে লম্বা ফাটলের চিহ্ন একটা।

"আজ আমাকে গোল পাথরে পেয়েছে দেখছি। সকালে বাড়িতে, তারপর কাজে এসেও--" মনে মনে বললেন ডঃ সেন।

"জায়গাটা উত্তর কাশ্মীরের জনবিরল এলাকায় রিঙ্গান হ্রদ পার হয়ে রামবাসা গিরিসংকটের পেছনদিকে একটা গ্লেসিয়ারের ওপরে। এইবার এই ছবিদুটো দেখুন। ১৯৯৫ সালে একটি মার্কিন জরিপ উপগ্রহের তোলা একই স্থানাংকের দুটো ছবি–

বেহেরার কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল ডঃ সেনের কানে-- রামবাসা গিরিসংকট– রিঙ্গান হ্রদ--

পর্দায়, ঝাপসা সাদাকালো একটা ছবি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। ধবধবে সাদা বরফে মোড়া হিমবাহটা শুয়ে আছে পাহাড়ের নীচে। তার বুকে পাথরটার কোন চিহ্ন নেই।

"এ ছবিটা ১৯৯৫ এর সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে তোলা। এবার সে বছরের অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ তোলা দ্বিতীয় ছবিটা দেখুন-"

একটা বিস্ময়ের শব্দ ছড়িয়ে গেল সারা ঘর জুড়ে। হিমবাহের বুকে ফাটলের দাগওয়ালা পাথরটা ফিরে এসেছে।

"জরিপ উপগ্রহটা অত উঁচু থেকে এত ছোটো বস্তুর পরিষ্কার ছবি তোলবার উপযোগী ছিল না। তবে ঘটনাটা যে ১৯৯৫ সালের হেমন্তকালেই ঘটেছিল সেটা এর থেকে পরিষ্কার।

"এবারে ২০১৪র নভেম্বরে লীলাবতীর শক্তিশালী ক্যামেরায় তোলা ছবিতে এই ফাটলটাকে ভালো করে লক্ষ করুন-" বলতেবলতেই মাউসের টানে পাথরের গায়ের লম্বা দাগটা বিবর্ধিত হয়ে পর্দার এপাশ থেকে ও'পাশে ছড়িয়ে পড়ল।

"ফাটলটার চরিত্র থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। এটা প্রাকৃতিক নয়।"

"ঠিক।" ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর সুশোভন চৌধুরি মাথা নাড়লেন, "এত নিখুঁত জ্যামিতিক গঠন কোন প্রাকৃতিক ফাটলের হবে না।"

ডঃ বেহেরা মাথা নেড়ে ফের নিজের কথার সুতোটা ধরে নিলেন, "অনুমানটার পেছনে আরো একটা কারণ আছে," বলতে বলতেই কয়েকটা ফোল্ডার তিনি এগিয়ে দিচ্ছিলেন সকলের সামনে, "পাথরটা নিয়ে লীলাবতীর যাবতীয় স্পেক্ট্রাল অ্যানালিসিস রিডিং আর সে বিষয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলো এখানে রয়েছে।"

ফোল্ডারটার পাতাগুলোয় একবার চোখ বোলালেন ডঃ চৌধুরি। তাঁর দৃষ্টি তখন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "আশ্চর্য! এখানে দেখাচ্ছে পাথরটায় কোন তেজস্ক্রিয় উপাদান নেই। অথচ ফাটলটায় ক্ষীণ তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পেয়েছে লীলাবতী? রিডিংগুলোয় কোন-"

"ভুল নেই ডঃ চৌধুরি। আমাদের বিজ্ঞানিদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন আপনি।

"তাহলে- কারণটা কী হতে পারে?"

"ফাটলটা কোন ছোটোমাপের নিয়ন্ত্রিত আণবিক বিস্ফোরণের ফল হতে পারে কি?"

"অসম্ভব। এত ছোটোমাপের আণবিক বিস্ফোরণের প্রযুক্তি এখনো আমাদের জানা নেই।"

"সেইটাই প্রতিরক্ষা বিভাগের উদ্বেগের কারণ ডঃ চৌধুরি। কাজটা যে-ই করে থাক তার হাতে আমাদের অজানা কোন প্রযুক্তি এসেছে। ঘটনাটা ১৯৯৫ সালের হেমন্তকালের। অর্থাৎ কুড়ি বছর ধরে ব্যাপারটার বিষয়ে অন্ধকারে ছিলাম আমরা। সন্দেহটা সত্যি হলে দেশের নিরাপত্তার ওপরে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হবে। এ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার আগে তাই সরকার আপনাদের কাছ থেকে একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন চায়-"

"হুম। বিষয়টা নিয়ে স্টাডি রিপোর্ট তৈরি করবার কাজটা আমি ডঃ জে সেনকে দিচ্ছি। আন্দাজ কতটা সময় লাগবে তোমার সেন?" প্রশ্নটা করে সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করলেন ড: চৌধুরি। তারপর উত্তর না পেয়ে জ্যোতির্ময় সেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে বললেন, "সেন, তুমি ঠিক কী করছ বল তো?"

ডঃ সেন তখন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। ফ্যাকাশে মুখে ফোল্ডারের পাতাগুলোর দিকেই দেখছিলেন তিনি। ভ্রুদুটো কুঁচকে উঠে গিঁট পাকিয়ে গিয়েছে তাঁর। আর মুখে বিড়বিড় করে নিজের অজান্তেই বলে চলেছেন– "কুড়ি বছর–১৯৯৫এর হেমন্ত-রামবাসা গ্লেসিয়ার-"

"সেন?"

ফোল্ডার থেকে মুখ তুলে ডঃ সেন এদিক ওদিক চাইলেন একবার। তারপর বললেন,"হঠাৎ করেই একটু অসুস্থ বোধ করছি স্যার।"

"কী হল হঠাৎ?" ডঃ চৌধুরি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করলেন। সেনের মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা তাঁর চোখে এড়িয়ে যায় নি।

ম্লান হেসে মাথা নাড়লেন জ্যোতির্ময় সেন, "বিশেষ কিছু নয়। একটু বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।"

"মানে? এধরণের জরুরি একটা কাজ ফেলে রেখে আপনার সায়েন্টিস্ট বিশ্রাম নিতে চললেন?" বেহেরার গলায় বিরক্তি চাপা থাকছিল না, "নষ্ট করবার মত সময় আমাদের নেই ডঃ চৌধুরি। আপনার কাছে সায়েন্টিস্টের অভাব নেই। দরকার হলে আপনি আর কাউকে এ দায়িত্বটা-"

চৌধুরি স্থির চোখে বিমল বেহেরার দিকে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, "জ্যোতির্ময় আমার ছাত্র বটে কিন্তু প্রতিভায় ওর স্তরের বৈজ্ঞানিক এখন খুব বেশি নেই। কাজটা ও-ই করবে। এতে যদি আপনার কোন আপত্তি থাকে তাহলে আমি আপনার ডিফেন্স সেক্রেটারি শীতল মহাজনের সঙ্গে কথা বলব। সে আমার ছাত্রী ছিল।" বলতেবলতেই জ্যোতির্ময়ের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "কাজটা করতে কতটা সময় নেবে জ্যোতির্ময়?"

জ্যোতির্ময় একটু অস্বস্তিভরা মুখে বললেন,"আমি ফোল্ডারটা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। দু'একটা দিন সময় দিন। আর,বেহেরাসাহেবের পেনড্রাইভের ছবিগুলো আমার কাজে লাগবে। যদি মিটিং-এর শেষে কাউকে দিয়ে আমার বাড়িতে ওটা একটু পাঠিয়ে দেন তো ভালো হয়--"

বিমল বেহেরা হাঁ হাঁ করে উঠছিলেন। নথিগুলো একান্তই গোপনীয়। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে ভ্রু কুঁচকে ডঃ চৌধুরি বললেন, "নথিপত্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কিন্তু ওকে ওর কাজটা ওর মত করে করতে দিন।"

****

রাত গভীর হয়েছে। জানালায় বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। বাড়িটা নিঃঝুম হয়ে আছে। সামনে কমপিউটারের ডেস্কের ওপরে বাঁধানো ফ্রেম থেকে দুটো হাসিমুখ তাকিয়ে আছে জ্যোতির্ময়ের দিকে। রঞ্জা আর রঙ্গন। তাঁর পাঁজরের দুটো হাড়। বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠছিল তাঁর। ১৯৯৫ সাল–রিঙ্গান হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কোলে রঞ্জাকে তুলে দেবার পর জিভার বলা শেষ কটা কথা, সেদিনকার মতই মাথার মধ্যে ফের বেজে উঠছে বারবার–"কুড়ি বছর পরে--মনে রেখো-"

সেই হেমন্তে একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানে গিয়ে রামবাসা গিরিসংকটের পাশ থেকে কোলজোড়া মেয়ে পেয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি। আজ, ঠিক কুড়ি বছর পরে ফের সেই রামবাসা হিমবাহের বুকের একটা রহস্য এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। তারও সূচনা হয়েছিল সেই একই সময়ে--

হঠাৎ টেবিলের ওপরে রাখা বিমল বেহেরার দেয়া ফোল্ডারের কাগজগুলোকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। অসম্ভব! এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। রঞ্জা আর রঙ্গন প্রতিভাধর বটে কিন্তু অসাধারণত্বের কোন লক্ষণ তাদের মধ্যে নেই। একেবারেই স্বাভাবিক সুস্থ দুটো ছেলেমেয়ে। তাছাড়া,চিরটাকাল

তাঁদের দুজনকেই বাপ মা বলে জেনে এসেছে রঞ্জা আর রঙ্গন। প্রাণে ধরে আসল কথাগুলো কখনই তাদের বলে উঠতে পারেন নি তিনি। আজ এমন হঠাৎ করে তাদের বিদায় দেয়া–না, এ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুতেই না।

কিন্তু তারপরেই ২০০২ সালের সেই দ্বিতীয় রাতটা ফের ভেসে এল তাঁর চোখের সামনে-রিঙ্গান হ্রদের পাশে-তাঁর মুখোমুখি জিভা। হাতে তুলে দিলেন ছোট্টো রঙ্গনকে। হাসিখুশি ছেলেটা–জ্বলজ্বলে চোখে তাঁকে দেখছিল। যাবার আগে ফের একবার তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন জিভা। মাথার ভেতর গুণগুণ করে উঠেছিল শান্ত গলার সেই আদেশ–আর তেরো বছর। সঠিক সময়ে কিছু লক্ষণ ফুটে উঠবে ওদের মধ্যে। ভুলো না--

ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলেন জ্যোতির্ময়। কার কাছে খুলে বলবেন তিনি এই কথাগুলো? কে তাঁকে-

****

"বাবা, ঘুমোবে না তুমি আজকে?"

পেছনে রঙ্গনের গলার আওয়াজ পেয়ে চমকটা ভেঙে গেল ডঃ সেনের। মায়ের পাশ থেকে বিছানা ছেড়ে কখন যেন উঠে এসেছে এ ঘরে। চড়া আলোয় চোখদুটো পিটপিট করছে তার। তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, "এই যাই রে। আর একটু কাজ শুধু–"

"উঁহু। কিছুতেই না। হবে না। তুমি আজ রাত্তিরে আমাকে গল্পও শোনাওনি। এখন শুতেও আসছ না। আমার ভয় লাগে না বুঝি?"

"কীসের ভয় রে পাগলা?"

"সেই স্বপ্নটা আবার দেখলাম। যে লম্বা লোকটা! বড়োবড়ো চুলদাড়ি। জ্বলজ্বলে চোখ–"

"সে আবার কী?"

"জানি না। আজকাল মাঝেমাঝেই দেখি। ও বাবা জানো দিদিভাইও বলছিল স্বপ্নে বুড়োটাকে দেখেছে। কীসব যেন বলছিল ওকে। কোথায় কোন পাহাড়ের কথা। আমি তাই শুনে দিদিভাইকে যা ক্ষেপিয়েছি সে তুমি-" বলতেবলতেই হঠাৎ মনিটরের দিকে নজর গেছে তার। সেখানে ভেসে থাকা লীলাবতীর তোলা ছবিটা দেখেই ঘুমটুম কোথায় উধাও হয়ে গেছে চোখ থেকে। বলে, "আরে? আরো একটা গোল পাথর!"

"আর একটা মানে? আর গোল পাথর কোথায় দেখলি-"

বলতেবলতেই ডঃ সেনের মনে পড়ে গেল, সকালবেলায় রঞ্জা ওরকম কিছু একটা বলছিল বটে। মাথা ঘুরিয়ে রঙ্গনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমায় দেখা দেখি?"

"ইজি। তুমি একটু সরে বোসো–" বলতেবলতেই তাঁর চেয়ারের একপাশে নিজের শরীরটা গুঁজে দিল রঙ্গন। তারপর দক্ষ হাতে কিবোর্ডে কিছু ঠিকানা টাইপ করে এনটারের বোতামটা টিপে দিয়ে হাসিমুখে বলল, "এইবার–আসছে। দ্যাখো শুধু মজাটা একবার।"

ডঃ সেনের বিস্মিত চোখের সামনে তখন এক এক করে ভেসে উঠছিল–চার হাজার বছর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হাজির হয়ে চলা একএকটা গোল পাথর–তাদের শরীরে সেই রহস্যময় ফাটলের চিহ্ন-

হঠাৎ মনে মনে চমকে উঠলেন জ্যোতির্ময়। আরো একটা মিল আছে! তিনটে জায়গাই কোন না কোন উন্নত সভ্যতার জন্মভূমি, তিনটে সভ্যতাই ধ্বংস হয়ছে–নানা কারণে হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে! কেন? ওর সঙ্গে ওই পাথরগুলোর কোন সম্বন্ধ আছে কী? অথবা–জিভার? রামবাসায় গোল পাথরের আবির্ভাব আর জিভার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হবার সময়টাও তো প্রায়--

"ও বাবা। কী ভাবছ বলো তো মুখটা অমন শক্ত করে? ওরকম কোরো না। হাসো–হাসো! আচ্ছা দাঁড়াও তোমাকে একটা মজার খেলা দেখাই, তাহলেই মন ভালো হয়ে যাবে। দিদিভাই কাল শেখাল আমায়-" বলতেবলতেই হঠাৎ করে স্থির চোখে কমপিউটারটার দিকে ঘুরে তাকিয়ে রইল রঙ্গন।

"রঙ্গন, এখন খেলাটেলা নয়। কাল সকালে-"

কথাটা পুরো শেষ করতে পারলেন না ডঃ সেন। হঠাৎ করেই একেবারে চুপ করে গেছে রঙ্গন। শরীর শক্ত করে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে কমপিউটারের মনিটারের দিকে। কমপিউটারের পর্দায় নিজে থেকেই হঠাৎ জেগে উঠেছে একটা ইলেকট্রনিক পিয়ানোর ছবি। জিনিসটা ডঃ সেন চেনেন। একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম। বিনিপয়সায় মেলে ইন্টারনেটে-- আর তারপর, হঠাৎ টুংটাং শব্দ করে বেজে উঠল ছবিটা।

"দাঁড়াও ম্যাক্সিমাইজ করে দি," ফিসফিস করে কথাটা রঙ্গন উচ্চারণ করতেই পিয়ানোটা গোটা পর্দা জুড়ে বসল এবারে। আর, তার চোখের মণির যাতায়াতকে অনুসরণ করেই যেন বা, একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজিয়ে চলেছে তা তখন-"পুরনো সেই দিনের কথা–"

"এই গানটা তো তোমার ফেভারিট, তাই না বাবা? দিদিভাইয়েরও। ভালো বাজিয়েছি, না?"

ডঃ সেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বারো বছরের ছেলেটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "কিন্তু, কী করে করলি তুই? মাউস বা কিবোর্ড না ছুঁয়ে-"

মিটিমিটি হাসছিল রঙ্গন, "ম্যাজিক। দিদিভাই শিখিয়ে দিল।"

"দিদিভাইও পারে?"

"উরিব্বাস দিদিভাই আরো অনেক মজার খেলা জানে। কোত্থেকে শেখে রোজ রোজ কে জানে! আমাকেও শিখিয়ে দিচ্ছে তো। এই খেলাটা খুব সহজ কিন্তু বাবা। এই দেখো–কিচ্ছু না–শুধু পর্দাটার দিকে তাকাও–তা-কা-ও- তারপর খুব কষে ভাবো- সা-সা-নি-সা-গা-গা-রা-সা-সা-রা-গা-গা-"

পর্দায় ফের বেজে উঠেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরটা। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছিল ডঃ সেনের। জিভা বলেছিলেন, সময় হলে ওদের মধ্যেও তার লক্ষণ–

"হাসো বাবা, একটু হাসো–"

রঙ্গন তাঁর কোলের ওপর উঠে গালদুটো টেনে ধরেছে। চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসছিল তাঁর। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,"হ্যাঁ রে রঙ্গন,কাল তোর ম্যাথস টেস্ট আছে না?"

"আছে তো! ও আমি সব পারব।"

"ও কথা বললে হয়? রাত্তিরে ঠিক করে না ঘুমোলে পরে হলে বসে ঘুমিয়ে পড়বি যে! এখন চল,শুবি।"

"তাহলে তুমিও শোবে চলো আমার সাথে। আমায় গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।"

"চল।"

কমপিউটার বন্ধ করে রেখে রঙ্গনকে কোলে তুলে নিলেন জ্যোতির্ময়। বারান্দার শেষপ্রান্তে দু'ভাইবোনের ঘর। সেখানে ঢুকে তাকে শুইয়ে দিয়ে পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। ওপাশের চৌকিতে রঞ্জা ঘুমোচ্ছে। ঠোঁটোদুটো নড়ছে তার। স্বপ্ন দেখছে নাকি? রঙ্গনের পিঠে চাপড় দিতে দিতে মৃদু গলায় গান গাইছিলেন তিনি। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। মৃদু ছপছপ আওয়াজ আসছিল। সানশেডের ওপর বৃষ্টি পড়বার শব্দ-

খানিক বাদে রঙ্গন ঘুমিয়ে পড়লে আস্তে আস্তে উঠলেন জ্যোতির্ময়। রঞ্জার চৌকির পাশে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, "রঞ্জা-"

"উঁ?"

চোখ খুলে বাবাকে ঝুঁকে থাকতে দেখে একটু হাসল সে। তারপর ফের পাশ ফিরে চোখ বুঁজতে যাচ্ছিল, জ্যোতির্ময় বাধা দিলেন, "উঠে একটু এ'ঘরে আয় তো! জরুরি কথা আছে কয়েকটা।"

"এত রাত্তিরে? সকালে বললে হত না বাবা?" চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল রঞ্জা।

"না। ব্যাপারটা সিরিয়াস।"

পড়ার ঘরে এসে তার মুখোমুখি বসলেন জ্যোতির্ময়। রঞ্জা একটু ভয় পেয়েছে। বলে,"কী হয়েছে বাবা?"

"সব বলব। বড়ো হয়েছিস। এইবারে তোকে জানানো দরকার। কিন্তু তার আগে একটা কথা বল।খানিক আগে রঙ্গন একটা আশ্চর্য ব্যাপার করে দেখাল। হাত দিয়ে না ছুঁয়ে কমপিউটারটা ব্যবহার করছিল ও। বলল,তুই শিখিয়েছিস।"

"আ-আমি–মানে-"

"আমি শুনছি।"

সোজা হয়ে বসল রঞ্জা। তার ঘুম কেটে গেছে এইবারে। আনমনে মাথা নেড়ে বলল, "আমি নিজেও বুঝতে পারছি না বাবা ঠিক কী হচ্ছে আমার। মাসদুয়েক হল জিনিসটা শুরু হয়েছে। ব্যাপারটা এত অদ্ভুত যে তোমাকে কী করে বলব তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।"

"ভেঙে বল।"

"বলবার চেয়ে বরং করে দেখাই। কমপিউটারটার দিকে দেখ।"

জ্যোতির্ময়ের অবাক চোখের সামনে তখন বন্ধ কমপিউটারের ইউ-পি-এস এর সুইচটা নিজেনিজেই অন হয়ে গেছে। চালু হয়ে গেল কমপিউটারের সুইচটাও। বুট হয়ে চলেছে কমপিউটার। একের পর এক মেসেজগুলো ভেসে উঠছে তার পর্দায়–

"টেলিকাইনেসিস-"

"দাঁড়াও দাঁড়াও," তাঁকে বাধা দিল রঞ্জা, "বন্ধ করবার সময় কোন স্ক্রিনটা তোমার সামনে খোলা ছিল সেইটে খুঁজছি। আমার চোখের দিকে তাকাও বাবা--"

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে রঞ্জার চোখদুটো। তাঁর চোখের রেটিনা ফুঁড়ে যেন মস্তিষ্কের ভেতরটা অবধি পড়ে নিতে চাইছে সে। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু। তারপরেই একটুকরো হেসে ফের কমপিউটারের পর্দার দিকে মুখ ফেরাল রঞ্জা, "এটা করতে এখনো একটু সময় লাগছে, কিন্তু রোজ ভাইয়ের সঙ্গে প্র্যাকটিশ করে করে সময়টা কমিয়ে আনছি আমি। রিডিংটাও অনেক নিখুঁত হয়ে আসছে, "উম্, পিয়ানো অ্যাপ্লিকেশন–দাঁড়াও। এদিকে আরেকবার তাকাও দেখি–আমার চোখের দিকে–নাঃ-ফাইল লোকেশানটা তোমার কাছে নেই--কমপিউটারটার মধ্যে দেখি–ডি ড্রাইভ–ফোল্ডার-রঙ্গন–ব্যস! এই যে। কমপিউটার বন্ধ করবার এইটাই খোলা ছিল না সামনে?"

পর্দায় ফের ভেসে ওঠা রঙ্গনের সেই পিয়ানোটার দিকে তাকিয়ে অবাক হবার বদলে বুকের ভেতর একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন পাক দিয়ে উঠল জ্যোতির্ময়ের। আর সন্দেহ নেই। অকাট্য প্রমাণ তাঁর চোখের সামনে। এইবার?

রঞ্জা তখন নিজের মনেই বলে চলেছে, "ভাইয়ের আবার জিনিসপত্তর নাড়ানোচাড়ানোর দিকটা আমার



চেয়ে বেশি ভালো হচ্ছে, বুঝলে বাবা, মাইন্ডরিডিংটা হচ্ছে কিন্তু বড্ডো ভুলভাল করে। খুব চঞ্চল তো! কিন্তু এটা ঘটছে কীভাবে বাবা?"

"জানি না রে। এখনো অবধি মানুষের মস্তিষ্কের এমন ক্ষমতা থাকবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।"

"রঞ্জা খুক করে একটু হাসল, "বাবা! তুমি বলছ আমি মানুষ নই? ধুত! তার মানে তো তুমি,মা সবাই-হি হি-"

"থাম রঞ্জা। একটা ছোটো পরীক্ষা করব। আমার চোখের দিকে তাকা। ঠিক কোন ছবিটা আমি ভাবছি সেইটা দেখতে পাচ্ছিস?"

ফের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রঞ্জার চোখের দৃষ্টি। মাথায় তীব্র একটা যন্ত্রণার ঝলক ছুটে এল জ্যোতির্ময়ের। তবু জোর করে ছবিটাকে মনের মধ্যে ফুটিয়ে রাখলেন তিনি–

"তুমি–তুমি একে দেখেছ?" হঠাৎ রঞ্জার কাঁপা কাঁপা গলার কথাগুলো কানে যেতে চমকে উঠলেন জ্যোতির্ময়। মাথার ব্যথাটা থেমে গেছে। রঞ্জার চোখ আবার স্বাভাবিক, "এ লোকটাকে আমি মাঝেমাঝেই স্বপ্নে দেখি বাবা। ভাইও দেখে। একটা বিরাট উঁচু পাহাড়, তার একপাশে একটা ছড়ানো লেক আর অন্যদিকে একটা গ্লেসিয়ার। পাহাড়টার মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে লোকটা। ও কে বাবা?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জ্যোতির্ময় ক্লান্ত গলায় বললেন, "এইবারে তোর সব কথা জানবার সময় হয়েছে মা। তোদের দুজনের কেউই আমাদের নিজের ছেলেমেয়ে নোস রে। লোকটার নাম জিভা। ও-ই–তোদের আমার হাতে--"

****

--বসবার ঘরের দেয়ালঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজল। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। এ বাড়ির চারপাশে অনেক গাছ। তার পাতা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়া জলের ফোঁটার শব্দ পাওয়া যায়। জ্যোতির্ময়ের গল্প শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন মুখোমুখি।

রঞ্জা একদৃষ্টে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। একটু বাদে যখন কথা বলল, উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই তার গলায়, "ঠিকই ভাবছ তুমি বাবা। ওখানে একবার যেতে হবে আমাদের। পালিয়ে বাঁচা যাবে না। রঙ্গন আর আমি দুজনেই তোমার সঙ্গে-"

"রঙ্গন-মানে- ও যে বড্ডো ছোটো রে! ওকে কোনোখানে সরিয়ে দিয়ে-"

রঞ্জা হাসল একটু, "ও ঘুমিয়ে আছে,তবু আমি এইখানে বসে ওর মস্তিষ্কের শব্দ শুনতে পাচ্ছি বাবা। সবে তো দু'মাস হল নিজের মধ্যে এই ক্ষমতাটা আমি টের পেয়েছি। তবু, হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকেও আজকাল আমি ওর উপস্থিতি টের পেয়ে যাই। তাহলে জিভার ক্ষমতা কতটা হতে পারে? তার হাত থেকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে তুমি ওকে? না বাবা। বিপদ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়। আমরা একসঙ্গে ওর মুখোমুখি হব। তাছাড়া, কেন লোকটা চার হাজার বছর অন্তর এইভাবে ঘুরে আসছে,সেইটাও বোঝা দরকার। পৃথিবীর স্বার্থেই। আ-আমরা ভাইবোন হয়ত ওর জাতের জীব! ওর সাথে পাল্লা দিতে গেলে আমাদের তোমার প্রয়োজন হবে–"

বলতেবলতেই বাবার মুখের দিকে চোখ যেতে নরম হয়ে এল রঞ্জার গলা, "মনখারাপ করবে না বলছি। আমি আর রঙ্গন তোমাদের ছেলেমেয়ে। কথা দিচ্ছি,তোমাদের ছেড়ে আমরা কক্ষণো কোথাও যাব না।"

"রঙ্গনকে এসব কথা এত ভেঙে-"

রঞ্জা মিটিমিটি হাসল,"পাগল নাকি? সবসময় স্পাইডারম্যান সুপারম্যান করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এক্ষুণি এসব কথা ওকে বলে বিপদ বাধাই আর কি। কালকেই ইশকুলে গিয়ে অ্যানাউন্স করে দেবে'খন বন্ধুদের কাছে। ও তুমি কিচ্ছু ভেবো না। ওকে কখন, কতটা জানাব সে আমার দায়িত্ব। নাও,এখন গিয়ে শোও তো! আমিও ঘুমিয়ে নিই আর একটু।"

মাথা নাড়লেন জ্যোতির্ময়, "ঘুম আমার আর আসবে না আজকে। তুই শো গে যা। একটা মেল পাঠাবার আছে। সেইটে সেরে গিয়ে শুয়ে পড়ছি।

"উফ্‌ফ্ বাবা তুমিও না! আজ রাত্তিরেই মেলটা করে ফেলতে হবে তোমায়? সাধে রঙ্গন এত অধৈর্য ছেলে হয়েছে!" বলতে বলতে পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রঞ্জা।

****

রাত ভোর হয়ে আসছিল। বাইরে পাখি ডাকছে একটা দুটো। সামনে পর্দায় খোলা লম্বা মেলটা যাবার জন্য তৈরি। তার শেষ লাইন ক'টায় আরো একবার চোখ বোলালেন জ্যোতির্ময়,

-"বিশ্বনাথন, জানি তোমার বয়স হয়েছে। শরীরও অশক্ত। কিন্তু তবু, একেবারে স্বার্থপরের মত তোমাকে সঙ্গে চাইছি যে তার কারণ, ও এলাকাটা আমি বাদে আর যদি কেউ খানিকটাও চেনে সে তুমি। অভিযানটা বিপজ্জনক। দুজন একসঙ্গে থাকলে, একজনের যদি কিছু হয়েও যায়, অন্যজন তাহলে অন্তত ছেলেমেয়েদুটোকে গাইড করতে পারব। একা ঠিক ভরসা পাচ্ছি না–"

মাউস পয়েন্টারটা সেন্ড বোতামের ওপর স্থির হয়ে আছে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে মাউসে মৃদু চাপ দিলেন জ্যোতির্ময়--

****

"তুমি কি নিশ্চিত সেন?"

টেবিলের উল্টোদিকে বসে থাকা জ্যোতির্ময় মাথা নাড়লেন, "ডঃ বেহেরা ভুল অনুমান করেননি। সব খুঁটিয়ে দেখে আমি তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত। ফাটলটা একটা খুব ছোটোমাপের আণবিক বিস্ফোরণেরই ফল।"

"থ্যাংক ইউ। শীতল গত চারদিন এই রিপোর্টটার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমি এটা ওকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি। এবারে সরকার যা করে করুক। আমাদের কাজ শেষ।"

"ওঁরা কেসটা নিয়ে কী করবেন সে ব্যাপারে কোন আন্দাজ দিয়েছেন?"

"শীতল বলছিল প্রয়োজন হলে ওখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কিছু লোক পাঠাবে সরেজমিনে ব্যাপারটা দেখে আসতে।"

"একটা কথা বলব স্যার? ওঁকে এক্ষুণি কিছু করে বসতে মানা করুন। তাড়াহুড়ো না করাই ঠিক হবে এক্ষেত্রে। আরো একটু দেখেশুনে তৈরি হয়ে নিয়ে তারপর ফোর্স পাঠালে বোধ হয়-"

চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে সেটাকে মুছতে মুছতে ডঃ চৌধুরি বললেন, "কথাটা ভুল বলোনি জ্যোতির্ময়। কিন্তু দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠে গেছে যেখানে, সেখানে সাবধানতার জন্য আরো দেরি করাটা বোধ হয় ভুল পদক্ষেপ হবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাদের--"

"ঠিক স্যার। তবে আমি দেরি করবার কথা বলিনি।"

"তাহলে?"

"বলছিলাম, শুরুতেই ফোর্স না পাঠিয়ে ছোটো একটা বিশেষজ্ঞদল পাঠানো উচিত হবে ওখানে। নিউক্লিয়ার সায়েন্সটা ভালো বোঝেন এমন কয়েকজন মানুষ। জায়গাটা সম্পর্কে কেউ বিশেষ কিছু জানে না। বিশ বছর আগে একটা উন্নত টেকনোলজির প্রয়োগ করা হয়েছে ওখানে। যে বা যারা সেটা করেছে তারা এতদিনে সেখানে কতটা শক্তি জড়ো করেছে সেটা না জেনে হঠাৎ করে সেনা পাঠালে তার ফল খারাপ হতে পারে।"

"তোমার কথায় যুক্তি আছে। আমি শীতলের সঙ্গে আলোচনা করব ব্যাপারটা নিয়ে।"

মনে মনে এইবার শেষ পদক্ষেপটা নেবার জন্য তৈরি হলেন জ্যোতির্ময়। সাধারণত মিথ্যে বলেন না তিনি। কিন্তু এটা কোন সাধারণ পরিস্থিতি নয়। আসল কথাগুলো এঁকে বললে বিশ্বাস করবেন না। কৌশলে কাজ করতে হবে।

"আমার একটা প্রস্তাব আছে। রামচন্দ্র বিশ্বনাথনকে তো চেনেন আপনি।"

"কসমিক রে রামচন্দ্র তো? চিনব না কেন? সে-ও তো আমারই ছাত্র! এখন জিআইএফআর-এ আছে,তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার। আমার প্রথম পেপারের গাইড। তার পরেও একসঙ্গে অনেকবার কাজ করেছি আমরা। "

"তা-ও জানি। কন্ট্রোলড ফিউশানের ওপরে তোমাদের গতবারের জয়েন্ট পেপারটা আমার কাছেই এসেছিল মতামতের জন্য। অসাধারণ কাজ। তা, হঠাৎ তার কথা কেন?"

"আমি আর রামচন্দ্র মিলে জায়গাটা একবার ঘুরে আসতে চাইছিলাম প্রথমে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডঃ চৌধুরি। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "অবাস্তব প্রস্তাব জ্যোতির্ময়। তোমাদের মত দুই প্রথম সারির বৈজ্ঞানিককে এরকম একটা অজানা অচেনা বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া আমার মতে উচিত হবে না।"

"হবে স্যার। তার কারণ আছে। প্রথমত, কাজটা করবার যোগ্যতা আমাদের আছে তা আপনি মানবেন। দ্বিতীয় কারণ, রামবাসা এলাকায় আমরা দুজন আগেও গিয়েছি। সেটা সেই ১৯৯৫ সালের হেমন্তেই। পথ ভুল করে অবশ্য,কিন্তু তা হলেও জায়গাটা আমাদের পরিচিত। সে অভিজ্ঞতা খুব বেশি মানুষের নেই। আর সবচেয়ে বড়ো

কথা, সেনা পাঠাবার আগে ও জায়গায় একটা গবেষণা অভিযান পাঠাবার প্রস্তাবটা যুক্তিসম্মত। আপনি সুপারিশ করলে ওতে সরকারের আপত্তি হবে না।"

"সেইখানটাতেই তো আমার সবচেয়ে বড়ো আপত্তি জ্যোতির্ময়। স্বার্থপর চিন্তা বলতে পারো। কিন্তু তোমাদের মত আমার দুই সেরা ছাত্রকে এইভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে-"

"পারতে হবে স্যার। আমাদের জীবনের দাম দেশের নিরাপত্তার থেকে বেশি নয়। আপনার ছাত্র হলেও নয়।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ডঃ চৌধুরি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ডিবেটে ইউনিভার্সিটিতে চিরকাল চ্যাম্পিয়ন হতে। এখনো অভ্যেসটা দেখছি যায়নি। তোমার যুক্তি মেনে নিলাম। যা ব্যবস্থা করবার করো। আমি শীতলের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। সবরকম সাহায্য পাবে তোমরা। তবে একটা শর্ত আছে। আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলবে। কোন কারণে যোগাযোগ বন্ধ হলে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।"

"সম্ভব হবে না স্যার। একবার পহেলগাঁও ছাড়িয়ে মনবস্তি চৌকে পৌঁছোবার পর থেকে মোবাইল কানেকশান-"

"জানি," তাঁকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন ডঃ চৌধুরি, "শীতলকে বলে দিচ্ছি। একটা স্যাটেলাইট ফোন যাবে তোমাদের সঙ্গে। শ্রীনগর পৌঁছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস থেকে পেয়ে যাবে। তুমি টুর প্রোগ্রাম বানাও।"

"ধন্যবাদ স্যার।" উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন জ্যোতির্ময়, এমন সময় হঠাৎ ডঃ চৌধুরি তাঁর টেবিলের পেছন থেকে বের হয়ে এসে তাঁর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন, "আমি তোমার জন্য গর্বিত জ্যোতির্ময়। যেদিন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলে রেকর্ড নম্বর পেয়ে সেদিনের চেয়েও আজ আমার আরো বেশি গর্ব হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। এমন ছাত্রের মাস্টার হতে পেরেছি আমি সেটা আমার গর্ব।"

****

খানিক বাদে নিজের অফিসে ফিরে এসে কম্পিউটারটাকে চালু করলেন জ্যোতির্ময়। বিশ্বনাথনের জবাবি মেল এসে গেছে সকালবেলাতেই। ফের একবার সেটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন তিনি-

"*ডিয়ার সেন,*

তোমার লম্বা ই মেল পেলাম। একেবারেই অবিশ্বাস্য গল্প বলেছ তুমি। নিতান্ত তোমার কাছ থেকে এসেছে। নইলে কথাগুলো আর কেউ বললে পাগলের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দিতাম। প্রতি চার হাজার বছর অন্তর বুকে জ্যামিতিক ফাটল নিয়ে একটা করে গোলাকার পাথরের উদয়, তার সবচেয়ে নতুনটার বুকে তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের চিহ্ন– জিভার ভবিষ্যৎবাণী, টেলিকাইনেসিস, এসব সায়েন্স ফিকশনের গল্পেই মানায় ভালো।

অনেক ভেবেছি এ নিয়ে। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় এমন বোকা বানাবার চেষ্টা তো মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু তবু, তোমার কথাগুলোকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছি না যে, সে কেবল ওই রঞ্জার জন্য। তোমার কোলে তার আসার ব্যাপারটা তো আমার নিজের চোখে দেখা! আর, বৈজ্ঞানিক কৌতুহল বাদ দিলেও, তোমার অন্য যুক্তিটাতেও জোর আছে। ছেলেমেয়েদুটোকে একজনের ভরসায় ছেড়ে দেয়াটা অনুচিত হবে। আমি যাব। কবে কোথায় মিট করব জানিও।

বিশ্বনাথন"

কি বোর্ডটা টেনে নিয়ে তিনি তাকে তাড়াতাড়ি একটা জবাব লিখতে বসলেন। হাতে আর সময় নেই বেশি।

পকেটের মোবাইল ফোনটা টিঁ টিঁ করে বেজে উঠল হঠাৎ। রঞ্জার ফোন। সবুজ বোতামটা টিপে ফোনটা কানে তুললেন তিনি।

"হ্যালো বাবা। কী হল মিটিং-এ?"

"ডান। রাতে এসে কথা বলছি। তুই কেনাকাটার লিস্টটা বানিয়ে ফ্যাল। আর রঙ্গনকে-"

"হ্যাঁ। এইবার ওকে জানানো দরকার। সে আমি ম্যানেজ করে নেব। সব ভেঙে বলছি না এক্ষুণি। যতটুকু দরকার ততটুকুই বলব শুধু। তুমি ভেবো না।"

চার
পাহাড়ে

"আপনি কী করতে চলেছেন তা ঠিক জানেন তো ডঃ সেন? এলাকাটা একেবারেই মেনস্ট্রিমের বাইরে। কিছু স্যাটেলাইট ডেটা ছাড়া ও এলাকাটা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য কিছু নেই আমাদের কাছে। এমনকি কোন ট্রেক রুট খোলবার পারমিশানও দেয়া হয় না ওদিকটা। তাছাড়া এরা দুজন যে আসবে সঙ্গে সে কথাও তো--" সুভাষ রাঠোর উদ্বিগ্ন চোখে একবার একবার রঞ্জা আর রঙ্গনের দিকে দেখে নিয়ে জ্যোতির্ময়ের দিকে ফিরলেন। ঝকঝকে চেহারার অফিসারটি সবে কিছুকাল হল শ্রীনগরের এই বাদামিবাগ ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন।

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের এই জানালাটা দিয়ে দূরে একটা হেলিপ্যাড দেখা যায়। বিরাট বিরাট পোকার মত উড়ুক্কু যুদ্ধযানগুলো সেইখানে ঝিম ধরে স্থির হয়ে আছে মেঘফাটা রোদের ভেতর। হেলিপ্যাড ছাড়িয়ে বহুদূরে নীল পাহাড়ের রেখার মাথায় হালকা মেঘের প্রলেপ। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জ্যোতির্ময় বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ও এলাকায় আগেও গিয়েছি। বহাল তবিয়তে ফিরেও যে এসেছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

রাঠোর মাথা নাড়লেন, "কারেক্ট স্যার। আপনার ফোল্ডারটা আমি দেখেছি। সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশান। এবারেও তো তাই লিখেছেন। কিন্তু আমার চিন্তাটা-" তাঁর চোখের দৃষ্টি ফের একবার রঞ্জা আর রঙ্গনের দিকে ঘুরে এল।

জ্যোতির্ময় মৃদু হাসলেন, "আপনার উদ্বেগটা বুঝতে পারছি মিঃ রাঠোর। কিন্তু, আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না। ওদের সঙ্গে আনাটা একেবারেই আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। রঞ্জা কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকাগুলো চষে বেড়ায় একাএকাই। এখানকার পাহাড়-পর্বত নিয়েই ওর পড়াশোনা কাজকর্ম। ও সঙ্গে থাকলে আমার সুবিধে হবে। আর রঙ্গনকে আমি এমনিই নিয়ে এলাম। শক্তপোক্ত হয়ে বড়ো হয়ে উঠুক ছেলেটা।"

রাঠোরের মুখটা এইবার খুশি-খুশি হয়ে উঠল। রঙ্গনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, "বেস্ট অব লাক ইয়ংম্যান ফর ইওর ফার্স্ট এক্সপিডিশান।" তারপর টেবিলে রাখা একটা চৌকো বাক্স জ্যোতির্ময়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনাকে আর দেরি করাব না স্যার। এই যে–এই ইস্যু রেজিস্টারে একটা সই করে দিন প্লিজ। ৫০০ মিনিটের টকটাইম রয়েছে স্যাটফোনটাতে। সোলার চার্জার আর অন্যান্য সমস্ত অ্যাসেসরি বাক্সের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আপনার কলটাইম হবে প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা। ডঃ চৌধুরির নম্বরে ফোন করলেই আমরা জেনে যাব। রাইট?"

রঞ্জা চুপ করে বসে ছিল একপাশে। এইবারে হঠাৎ মুখ খুলল সে, "একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি বলছিলেন ওদিকটায় এখনো কোন ট্রেক রুট খোলবার অনুমতি দেয়া হয়নি। কেন জানতে পারি কি?"

"স্থানীয় লোকজনের আপত্তি ম্যাডাম। নিজেরাও ওই রামবাসা পাস টপকে গ্লেসিয়ারের দিকে ঢোকে না, বাইরের কাউকে আসতেও দেয় না। ও এলাকায় কোন এক অপদেবতা নিয়ে গালগল্প চালু আছে। ও জায়গায় নাকি তার পাথরের প্রাসাদ। কেউ সেদিকে গেলে অপদেবতা রেগে গিয়ে লোকজনের ক্ষতি করে। ভরা গরমেও ব্লিজার্ড ডেকে আনে।"

রঞ্জা হেসে ফেলল, "কেউ যখন যায় না তখন পাথরের প্রাসাদের গল্পটা চালু হল কী করে?"

"লোকাল কুসংস্কার। কাছাকাছি লোকালয়গুলোর দু একজন মানুষ দাবি করে তাদের ওই অপদেবতা দেখা দিয়েছেন। সঙ্গে করে নিয়েও গেছেন তাঁর প্রাসাদের কাছে। একটা বিরাট বলের মত পাথর। তার মাঝখানে একটা ফাটল।"

রঞ্জা আর রঙ্গনের দিকে একবার ঘুরে দেখলেন জ্যোতির্ময়। তাদের মুখচোখেও কৌতুহলের ছাপ পড়েছে এইবার। রাঠোরের অবশ্য সেদিকে চোখ নেই তখন। নিজের মনেই গল্প বলে চলেছেন--

"স্থানীয় লোকজন এই প্রত্যক্ষদর্শীরদের খানিক ভয়েভক্তিতে মেনে চলে। ক্ষমতাশালী লোক সব। অঢেল সম্পত্তি। নিজেদের এরা কাদেজ বলে ডাকে। ও এলাকায় অন্য লোকের ঢোকবার ব্যাপারে এই কাদেজরাই আপত্তিগুলো তোলে।"

"বুঝলাম। স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী মানুষ সমস্যাটা তৈরি করছে। আর ওই ব্লিজার্ডের গল্প? ওর সত্যিমিথ্যে তো সহজেই জানা যায়। ওয়েদার স্যাটেলাইটের চোখ এড়িয়ে কখনো-"

রাঠোর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, "রাইট ডঃ সেন। জুলাই আগস্ট নাগাদ সত্যিই ওখানে তিনতিনটে বড়ো ব্লিজার্ড ঘটেছে গত দশ বছরে, আর-"

"অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনা।"

"আমার কথাটা শেষ করতে দিন প্লিজ। ব্রিগডিয়ার পদ্মনাভনের মুখে যতটুকু শুনেছি, ওর মধ্যে শেষ ঘটনাটা গত আগস্ট মাসের। আমাদের মাউন্টেন ডিভিশনের রামবাসা এক্সপিডিশানের সময়। কোন পূর্বাভাস ছিল না, কিন্তু জওয়ানরা রিঙ্গান পেরিয়ে রামবাসা বেয়ে ওঠা শুরু করবার সঙ্গেসঙ্গে একবারে হঠাৎ করেই ঝড়টা ওঠে। দলটার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"তারপর?"

"কিছুই নয়," হাত উলটোলেন রাঠোর, "আকাশপথে দুটো অভিযান হয়েছিল তাদের খুঁজে বের করবার জন্য। দুটোই ব্যর্থ হয়। দলটাকে-"

"লেফটেন্যান্ট মুস্তাক আহমেদ বাইরে অপেক্ষা করছেন স্যার–" হঠাৎ ইন্টারকমটা বেজে উঠে তাঁর কথাগুলোকে মাঝপথে থামিয়ে দিল।

"রাঠোর উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন জ্যোতির্ময়ের দিকে, "আমার একজন ভিজিটর রয়েছেন বাইরে। পরে ফের কথা হবে আপনাদের সঙ্গে। গুড লাক।"

****

ক্যান্টনমেন্ট অফিস থেকে বের হতে হতে ফোনে বিশ্বনাথনের মেসেজটা চোখে পড়ল জ্যোতির্ময়ের। ফ্লাইট পৌঁছে গেছে। ওদের হোটেলেই উঠেছেন। বাইরে বেরিয়ে একটা অটোরিকশা ডেকে তাতে উঠে রঞ্জা বলল, "হোটেল নিউল্যান্ড। চোদ্দো নম্বর ঘাট। বুলভার্ড রোড দিয়ে চল।"

মেঘরৌদ্রের আলোছায়া ভরা ভিড় রাস্তা দিয়ে অটো চলেছে। খানিক বাদে রঙ্গন হঠাৎ বলল, "আরেকটা ফোন। টের পেয়েছিস দিদিভাই?"

"জানি," ঘাড় নাড়ল রঞ্জা, "ঠিক ফোন না, বুঝলি? ওইরকম অন্য কিছু একটা। মুস্তাক নামের লোকটাকে সেটা দেবার কথা রাঠোরসাহেবের। আমাদের সঙ্গে সেটার কিছু একটা যোগ আছে।"

"আমাদের সঙ্গে যোগ আছে--মানে?" জ্যোতির্ময়ের ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠেছে তখন।

"জানি না। ভাবনাগুলো নিখুঁতভাবে পড়তে পারি না এখনো। তাতেই যতটুকু বুঝেছি-"

"রাঠোর কতটা জানে?"

"মনে হয় যতটুকু বলেছে তার বেশি এ লোকটা কিছু জানে না বাবা। একদম সিধেসাদা মন। আর্মির হুকুম তামিল করছে শুধু।"

"তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ আছে সেটা বলছিস কী করে?"

"অত ডিটেলে বুঝতে পারিনি। শুধু একটা অনুভূতি। মুস্তাক আহমেদ নামটা, একটা চিঠি আর একটা যন্ত্রের কথা বারবার ভেসে উঠছিল ওঁর মনে। আমাদের সঙ্গে তার যোগ আছে--"

****

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে, ছোটো একটা বাক্স আর গালা দিয়ে শিলমোহর করা চিঠিটা লোকটার হাতে তুলে দিয়ে রাঠোর নিজেও মাথা নাড়ছিলেন তখন, "আপনার গড়ুর কমান্ডো ফোর্সের উইং কমান্ডারের চিঠি। এতে কী নির্দেশ রয়েছে তা আমি বলতে পারব না লেফটেন্যান্ট আহমেদ। তবে এই দলটার সঙ্গে থাকাকালীন বাক্সের কমিউনিকেটরটা আপনি অফ করতে পারবেন না, এইটুকু শুধু আপনাকে বলতে পারি। বাকি সমস্ত নির্দেশ ওই খামের মধ্যে রয়েছে।"

লম্বা ছিপছিপে মানুষটা খামটা হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করলেন। তারপর মুখটা ছিঁড়ে ছোটো একটা কাগজ বের করলেন তার থেকে। ভাবলেশহীন মুখে কাগজটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনার শ্রেডারটা একবার ব্যবহার করতে পারি মিঃ রাঠোর?"

"নিশ্চয়। ওই যে সোফার পাশে রাখা রয়েছে দেখুন–"

চিঠিটা নিঃশব্দে শ্রেডারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এসে আহমেদ বাক্সটা খুললেন। ভেতরে একটা চওড়া রিস্টব্যান্ড রাখা ছিল। তার গায়ে একটা লাল রঙের বড়োসড়ো ছোপ রয়েছে। রাঠোর সেইটার দিকে কৌতুহলী

চোখে দেখছিলেন। আহমেদ সেটা নজর করে মৃদু হাসলেন, "প্রতিরক্ষা গবেষণাকেন্দ্রের নতুন আবিষ্কার স্যার। আমাদের গড়ুর কমান্ডো ফোর্সকে গোটাকয়েক ইস্যু করা হয়েছে ক'দিন হল। দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার মেগাহার্তজের দশ হাজারের বেশি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে সিগন্যাল পাঠাতে পারে। এই লাল দাগটা একটা প্যানিক বাটন। টিম বিপদে পড়লে বোতামটাকে পাঁচ সেকেন্ড অন্তর বারদুয়েক টিপতে হবে শুধু। ওর সিগন্যালকে আটকাবার মতন বড়ো জ্যামার বানানো সম্ভব নয়। শুধু বুঝতে পারছি না, কী এমন বিপদ আসতে পারে এ যাত্রায় যার জন্য--"

টেবিলে রাখা টাইমপিসটা টিঁ টিঁ করে বেজে উঠল হঠাৎ। রাঠোর উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মুস্তাকের দিকে, "আমার আর একটা মিটিং আছে এগারোটা থেকে। অতএব--বেস্ট অব লাক লেফটেন্যান্ট মুস্তাক।"

"ধন্যবাদ মিস্টার রাঠোর। শুভকামনাটা কাজে আসবে বলেই মনে হচ্ছে," কথাটা বলে একগাল হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মুস্তাক আহমেদ। নীচে অপেক্ষায় থাকা জিপসির কাছে এগিয়ে যেতে ড্রাইভার বেরিয়ে আসছিল। তার থেকে গাড়ির চাবিটা নিয়ে চালকের আসনে উঠে বসতে বসতে মুস্তাক বললেন, "আগামীকাল মানবস্তি থেকে গাড়িটা ফিরিয়ে আনবেন পাণ্ডেজি। চাবি মানবস্তি চৌকের শর্মা ভাণ্ডারে রাখা থাকবে--"

একটা গর্জন তুলে ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা ছুট লাগাল বোর্ড অফিসের চত্বর ছেড়ে।

****

"ইস! বিচ্ছিরি জায়গা। কী নোংরা আর ধুলো! একটা কোল্ড ড্রিংক খেলে হত।" রঙ্গন গাড়ি থেকে নামতে নামতে বিড়বিড় করছিল। ড্রাইভারকাকা, বাবা আর বিশ্বনাথনকাকা মিলে গাড়ির ছাদ থেকে তাদের স্যাকগুলো নামাচ্ছেন।

রঞ্জা আগেই নেমে পড়ে এদিকওদিক ঘুরে দেখছে। এলোমেলো ছড়ানো কিছু বিবর্ণ বাড়ি নিয়ে এই মানবস্তি। গাড়ি চলার পথ এইখানে এসে শেষ। এরপর হাঁটা। ধুলো ওড়া এবরোখেবরো রাস্তাটার শেষপ্রান্তে একটামাত্র দোকান। সেদিকে দেখিয়ে রঞ্জা বলল, "চল রঙ্গন ওদিকটা গিয়ে দেখি তোর কোল্ড ড্রিংক মেলে কি না!"

দোকানটার মাথার ওপরে আঁকাবাঁকা তুলির টানে লেখা একটা সাইনবোর্ড–"শর্মা ভাণ্ডার।" কোল্ড ড্রিংক পাওয়া গেল না কিন্তু প্লাস্টিকের পাউচে ভরা একটা মিষ্টি শরবতমত কিছু বিক্রি করছে। খেতে মন্দ নয়। তাই কিনে দুভাইবোন চুমুক দিচ্ছে তখন লম্বামতন একজন স্থানীয় মানুষ দোকানের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালেন।

"ট্রেকার?"

রঞ্জা ঘাড় নাড়ল।

"ঘোড়া লাগবে?"

খালি পাউচটা পাশে রাখা একটা ভাঙা বালতির মধ্যে ফেলে দিয়ে রঞ্জা বলল, "লাগবে। গাড়ির কাছে গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলুন।"

"লোকটা কিন্তু এদিককার নয় দিদিভাই, বুঝলি?" পেছন পেছন আসতে আসতে রঙ্গন নীচু গলায় বলল।

"রঙ্গন, ভালো করছিস না কিন্তু," চোখ পাকিয়ে ধমক দিল রঞ্জা, "প্রয়োজন না থাকলেও যখন তখন যার তার মনের ভেতর উঁকি দেয়া ঠিক নয়। পারিস বলেই করে ফেলতে হবে এ কেমন কথা?"

"হি হি। বেশি না। জাস্ট একটু উঁকি দিয়েছি।"

"হাসবে না রঙ্গন। তোমাকে কয়েকটা জিনিস আমি বারণ করে দিচ্ছি। কথা না শুনলে মার খাবে এই বলে দিলাম।"

দিদির এই গলাটাকে রঙ্গন বেশ সমঝে চলে। একউ থমকে গিয়ে বলল, "কী রকম?"

এক নম্বর, কক্ষণো, ফের বলছি কক্ষণো, গুরুজনের মনের ভেতরে ঢুকবে না। বাবা, বিশ্বনাথনকাকা, আমি-"

"তুই গুরুজন? হি হি-"

"হাসবি না। এটা একেবারে স্ট্রিক্ট বারণ। নাম্বার টু, সবার সামনে কোনো অবস্থাতেই এমন কিছু করবি না যাতে কেউ বুঝতে পারে আমরা আলাদা।"

রঙ্গন চোখ কুঁচকে কিছু একটা ভাবল। তারপর মুচকি হেসে বলে আমি আরো একটা ওইরকম আলাদা জিনিস শিখে গেছি। তুই জানিস না।"

"কী রে?" রঞ্জা কৌতুহলী চোখে তার দিকে ফিরে চাইল।

"বলব না। বারণ করেছিস।"

"উফফ। চুপিচুপি দেখা না!"

দিদিকে বিষয়টা দেখাবার জন্য রঙ্গন এমনিতেই ছটফট করছিল। তাকে দ্বিতীয়বার বলবার দরকার হল না। রঞ্জার সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে সে বলল, "এই দ্যাখ। হাতদুটো দুপাশে ছড়া–এই যে এইভাবে–ছড়া ছড়া-"

হাতদুটো দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে রঙ্গন। রঞ্জাও দেখাদেখি হাতদুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিল। "এইবার ভাব–তুই একদম হালকা হয়ে গেছিস–ভাব–ভাব– হুঁ। এইবার পায়ের দিকে তাকা–দ্যাখ কী মজা--"

হঠাৎ বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল রঞ্জার। নীচের দিকে না তাকিয়েও পরিষ্কার বুঝতে পারছিল সে, তার পা দুটো মাটি ছেড়ে খুব সামান্য ওপরে ভেসে উঠেছে। দূর থেকে বোঝা যাবে না, কিন্তু এই মুহূর্তে মাটিকে না ছুঁয়েই স্বচ্ছন্দে হাওয়ায় ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার শরীরটা!

তাড়াতাড়ি হাতদুটোকে নামিয়ে আনল সে। পায়ের তলায় ফের তার পরিচিত মাটির স্পর্শ। দূর থেকে বাবা হাতছানি দিয়ে ডাকছিলেন তাদের। তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে গেল রঞ্জা আর রঙ্গন।

****

এইখানে পাহাড়ের গায়ে কোন পথের দাগ নেই। মেঘের ভেতর থেকে খাড়াই নেমে আসা পাহাড়ের শরীরে যতদূর চোখ যায় ছোটোবড়ো পাথরের টুকরো আলগাভাবে জমে উঠে তৈরি করেছে সাক্ষাৎ মৃত্যুফাঁদ, বোল্ডার জোন। স্থানীয় মানুষের ভাষায় এর নাম দুশমনী ঢালান। খাড়াই ঢাল বেয়ে তা নেমে গেছে বহু নীচ দিয়ে বয়ে চলা সিদ্দা নদীর দিকে। ওইদিকে সিলাবাদ। সহজ রাস্তায় নাগবস্তি থেকে পিঠুডহর হয়ে সেদিকে যেতে প্রায় চারদিনের পথ পড়ে। সেলিম তাই এই রাস্তাটা ধরেছে। কঠিন, তবে সময় কমে যাবে তিনদিন।

এখানে, বোল্ডারের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে বরফগলা জলের অজস্র ধারা বয়ে চলেছে। বহু নীচে গিয়ে তারা এক হয়ে গিয়ে তৈরি করেছে সিদ্দা নদীর তেজি ধারা। মেঘের আড়াল থেকে তা চোখে পড়ে না। শুধু মৃদু ঝরঝর শব্দ কানে ভেসে আসে। জলে ভিজে ওঠা পিছল বোল্ডারে ছাওয়া এই ঢাল দেখলে অতিবড়ো সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে।

পাথুরে এলাকাটার একেবারে মাথায় এসে একলা মানুষটা তার ঘোড়া থামাল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে। ঘোড়াটা ভয় পেয়েছে। নাগবস্তি থেকে রওনা হবার পর এতক্ষণ বরফজমাট উৎরাই বেয়ে মেঘের রাজ্য থেকে নেমে আসবার সময় এতটুকু বিচলিত হয়নি সে। কিন্তু এইবার সে তার আরোহীকে পিঠে নিয়ে আর এগোতে নারাজ।

ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল মানুষটা। সামনে খাড়া নেমে যাওয়া বোল্ডার এলাকাটার মধ্যে তার অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই খুঁজে নিয়েছে অদৃশ্য কোন রাস্তার চিহ্ন। ঘোড়ার কাছে ঘেঁষে এসে পিঠে কয়েকটা আদুরে চাপড় দিল সে। কানে কানে কিছু বলল। তারপর সাবধানে লাগাম ধরে এগিয়ে চলল সেই পাথুরে এলাকার মধ্যে দিয়ে।

প্রায় শ'খানেক মিটার এইভাবে নেমে আসবার পর ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে বহু নীচের উপত্যকাটার ঝলক দেখা গেল একবার। ঘোড়াটা সেদিকে দেখে খুশি হয়ে উঠেছে। চটপট এই ভয়ানক পাহাড়ের আওতা ছেড়ে সে ফিরে যেতে চায় তার পরিচিত অঞ্চলে।

কিন্তু তার মালিকের তখন সে ইচ্ছে আর একেবারেই নেই। পেছনে ফেলে আসা পথটার দিকে তখন চোখ ঘুরে গেছে তার। সেখানে বাতাসের মধ্যে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল একজন মানুষের মূর্তি। তীব্র পাহাড়ি হাওয়ায় পাকা চুলদাড়ির রাশ এলোমেলো উড়ছিল তাঁর। ঘোড়াটা এইবার তাঁর উপস্থিতি টের পেয়েছে। তীব্র আতংকে চোখগুলো বড়োবড়ো হয়ে গেছে তার। লাগামের দড়িটায় টান মারছে হাত ছাড়িয়ে পালাবার জন্য। সেদিকে তখন নজর দেবার সময় নেই ঘোড়ার মালিকের। লাগামটাকে একটা বড়োসড়ো বোল্ডারে পাক দিয়ে রেখে সে ততক্ষণে পেছনদিকে ঘুরে নতজানু হয়েছে সামনে এসে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে।

"উঠে দাঁড়াও কাদেজ সেলিম। কোথায় চলেছ তুমি?"

"সিলাবাদে। সপ্তাহের কেনাকাটা সারতে। আদেশ করুন মহান জিভা।"

"ভালো। সিলাবাদে তোমার জন্য কাজ আছে। সেখান থেকে নাগবস্তির দিকে বাইরের দুনিয়ার মুসাফিররা আসছে।"

"এই পথে? বাইরের মানুষ? অসম্ভব। এ পথ বাইরের পৃথিবীর কাছে এখনো অজানা মহান জিভা।"

"না। এই পথে নয়। তোমাদের মতন পাহাড়িরা ছাড়া এই পথ বাইরের লোক চেনে না। তারা আসছে সিলাবাদ হয়ে পিঠুডহরের পথে। নাগবস্তি পেরিয়ে আমার প্রাসাদের কাছে আসতে চায়।"

সেলিমের চোখদুটি ঝিকিয়ে উঠল, "আপনার বাসস্থান নিরাপদ থাকবে। আমাকে ভরসা করতে পারেন। নাগবস্তির পরে এক পা এগোতে দেব না আমি তাদের।"

"না। এই মুসাফিরদের আমার প্রয়োজন। তুমি নিজে গিয়ে তাদের আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সেলিম। রহস্যময় মানুষটাকে সরাসরি দেখেছে তার মতন আরো আটজন কাদেজ। তাঁর শক্তির কিছু কিছু নমুনা নিজের চোখেই দেখেছে তারা। তাদের তিনি অনেক দিয়েছেন। তাঁর শক্তিতেই কল্যানেই রামবাসাকে ঘিরে বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় নিজের নিজের অঞ্চলে সমাজের মাথা হয়ে উঠেছে প্রত্যেকে। শুধু শর্ত একটাই-বাইরের মানুষ যেন তাঁর এলাকায় পা না রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য অন্য কাদেজদের মতই সে-ও সে কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে।

এ সময়টার মধ্যে মাত্র তিনবার তিনজন কাদেজ ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর আদেশ পালনে। তখন জিভার আদেশে অসময়ে ভয়াল বরফঝড় ধেয়ে এসে আটকে দিয়েছিল রামবাসার দিকে এগিয়ে আসা অভিযাত্রীদের। ব্যর্থ হওয়া কাদেজরা ক্ষমা পায়নি। পাথরের প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসা নরকের ঘন অন্ধকার আলোকবিন্দু, সবার চোখের সামনে শুষে খেয়েছে তাদের। তাদের বদলে নতুন কাদেজ নিয়োগ করেছেন জিভা।

আজ হঠাৎ করে তাঁর মুখে একেবারে বিপরীত কথা শুনে একটু চমকেই গেছে সে। তবু, জিভাকে প্রশ্ন করা বারণ। মাথা নেড়ে সে বলল, "আমি এখুনি রওনা দিচ্ছি।"

"অপেক্ষা করো সেলিম। যাদের মুখোমুখি হতে চলেছ তুমি তারা সাধারণ মানুষ নয়। তোমার স্মৃতি তাদের কাছে গোপন থাকবে না। আমি চাই না নির্দিষ্ট সময়ের আগে তারা আমার কথা জানতে পারুক। আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাব।"

"আপনি! কিন্তু কীভাবে মহান জিভা? আপনি সশরীরে প্রস্তরপ্রাসাদ থেকে এত দূরে-কীভাবে-"

"তার জন্য তোমার শরীরটি আমার প্রয়োজন হবে কাদেজ–" বলতেবলতেই তার কাছে এসে কপালের দুপাশে হাত ছোঁয়ালেন জিভা। হালকা আগুনের শিখার মতন সে ছোঁয়ায় রক্তমাংসের সাড়া ছিল না।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল সেলিমের শরীরটা। তারপর, নিশ্চল পুতুলের মত পাথরের বুকে লুটিয়ে পড়ল তা।

কয়েকমুহূর্ত পর ফের যখন চোখ খুলল সে, তখন আমূল বদলে গেছে সে চোখের ভাষা। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের অবস্থান ঠিক করে নিল মানুষটা। তার দৃষ্টিতে ধরা পড়া সেই পাহাড়ের দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল রামবাসা হিমবাহের দুর্গম বুকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার সামনে। এই কাদেজের মস্তিষ্ক এখন সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্ত্রণে। প্রথমে সিলাবাদে গিয়ে দেখতে হবে। সেখানে না পেলে পিঠুডহরের দিকে এগিয়ে গিয়ে-

সেলিমের স্মৃতি থেকে সামনের রাস্তার খুঁটিনাটিগুলো উদ্ধার করে নিয়ে শরীরটাকে তার ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে দিলেন জিভা---

--ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার লাগামটা পাথরের গা থেকে খুলে আনল সেলিম। তারপর ডানদিকে বেঁকে পাহাড়ের বিপজ্জনক গা বেয়ে বোল্ডারে পা ফেলে ফেলে রওনা হয়ে গেল সিলাবাদের দিকে।

****

বড়ো বড়ো প্রাচীন পাইনের দল ছায়া ফেলেছে এখানে। পায়ের তলায় পাইন নিডলের পুরু গদিতে হাঁটবার শব্দ শোনা যায় না। সকালবেলা তাঁবু গুটিয়ে রওনা হবার পর প্রায় ঘন্টাতিনেক হেঁটে তারা যেখানটায় এসে পৌঁছেছে, দূর থেকে সেইখানে কোন পথ দেখা যায় না।

"যাব কোথা দিয়ে বাবা?"

জ্যোতির্ময় সামনে হঠাৎ করেই হাজির হওয়া বিরাট খাদটার দিকে তাকিয়েছিলেন। হাতের ডাইনে যতদূর চোখ যায় খাড়া পাহাড়ের দেয়ালের গায়ে গায়ে পাইনের জঙ্গল একটানা নেমে গেছে নীচের দিকে। দেয়ালটা একটা অর্ধবৃত্তাকার পাক মেরে মিশে গেছে উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে। সেখানে অনেক উঁচুতে সিদ্দা নদীর ধারাটাকে

দেখা যায়। ধবধবে সাদা একটা আঁকাবাঁকা দাগের মতন পাহাড় থেকে নেমে এসে সে নীচের খাদ দিয়ে বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। মানবস্তির কাছে গিয়ে সমতলে মেশা এই নদীটাকে চোখে চোখে রেখে এই ক'দিন এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। রিঙ্গান হ্রদের গায়ে ওর উৎসমুখ।

"ঘাবড়াস না। রাস্তা আছে। আয়," বলতেবলতে এদিকওদিক তাকিয়ে একটা মরা গাছের গুঁড়ি ধরে দেয়াল থেকে নীচের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। নজর করলে দেখা যায় সরু একটা খাঁজ পাইনবনের গা ঘেঁষে পাহাড়ের দেয়ালের গায়ে গায়ে এগিয়ে গিয়ে উঠে গেছে দূরে সিদ্দার নেমে আসা ধারার দিকে।

মুস্তাক সবার পেছনে ঘোড়াদুটো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রাস্তাটার দিকে ভালো করে একবার দেখে নিলেন তিনি প্রথমে। তারপর বললেন, "আপনি উঠে আসুন স্যার। আমি আগে ঘোড়াদুটোকে পার করে নিই। পেছনে থাকলে হঠাৎ যদি ক্ষেপে ওঠে তাহলে মুশকিল হয়ে যেতে পারে। আর, আপনারা চাইলে ঘোড়ার পিঠে বসেও পাড় হয়ে যেতে পারেন জায়গাটা। ওরা ঠিক সামলে নিয়ে যাবে।"

"উঁহু। দরকার হবে না," মাথা নাড়লেন জ্যোতির্ময়, "তুমি ঘোড়া সামলে এগোও। আমরা পেছনে আসছি। রঙ্গন, ঘোড়া এগিয়ে গেলে তুই আমার ঠিক পেছনে থাকবি। আমার স্টেপগুলো খেয়াল করে করে সেইমত আসবি। আর রঞ্জা তুই বিশ্বনাথনকাকাকে সামনে রেখে সাবধানে নিয়ে আয়। শ'খানেক মিটারমতো লম্বা হবে এ জায়গাটা, যদি না আমার স্মৃতি কিছু ভুল করে থাকে। তারপর ওপাশের পাহাড়ে পৌঁছোলে নদী অবধি রাস্তা বেশ ভালো। সন্ধের মধ্যে পিঠুডহরে পৌঁছে ক্যাম্প করতে পারব।"

ঘোড়াদুটো আগে আগে চলেছে। মুস্তাক যে পাহাড়ের কোনখানে কী ভাবে পা দিয়ে চলেছেন তার ঘোড়াদের নিয়ে সে কেবল তিনিই জানেন। তাঁকে দেখলে মনে হবে যেন সমতলের বুকে চওড়া কোন রাস্তায় বিকেলের ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কখনো পাশ দিয়ে উজিয়ে ওঠা পাহাড়ের গায়ে পা রেখে, কখনও রাস্তা ছেড়ে নিচের ঢালু খাদের দেয়ালে পা দিয়ে ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন গুণগুণিয়ে গান গাইতে গাইতে।

রওনা হবার পরপরই দুর্ঘটনাটা ঘটল। এ জায়গায় পায়ে চলার খাঁজটা পাহাড়ের ঢালের সঙ্গে মিশে কাত হয়ে রয়েছে একেবারে। নুড়ি পাথরের ছোটো ছোটো টুকরো ছড়ানো তার ওপরে। হাতের লাঠির ধারালো মাথা দিয়ে পাহাড়ের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছিলেন জ্যোতির্ময়। হঠাৎ পায়ের তলায় নুড়িগুলো সড়সড় করে খসে পড়ল খাদের ভেতর। ভারসাম্য হারিয়ে হাতের লাঠিটা ফেলে দিয়ে একটা মরা গাছের সরু ডাল জাপটে ধরেছিলেন তিনি, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মৃদু মট করে একটা শব্দ হয়ে ডালটা ভেঙে এল তাঁর হাতে। যেন প্রতিবর্তক্রিয়াতেই রঙ্গন একটা লাফ দিয়ে পাশের পাহাড়ের দেয়ালের ফুটচারেক উঁচুতে পাদুটো তুলে দিয়ে একটা শক্তপোক্ত ডাল জাপটে ধরল। খোলা দুটো হাত দিয়ে বাবার শরীরটা জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু ততক্ষণে থতমত খেয়ে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন বিশ্বনাথন। ভারসাম্য হারিয়েছেন তিনিও।

রঞ্জা হঠাৎ হাতদুটো ছড়িয়ে দিল দুপাশে। হালকা হয়ে আসছে তার শরীর। দু'দুটো মানুষকে এভাবে মরতে দেয়া যায় না–

-কিন্তু সে কিছু করবার আগেই চোখের সামনে তার একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। হঠাৎ ঘোড়া ছেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মুস্তাক। হাতে উঠে এসেছে লিকলিকে একটা দড়ি। তার একপ্রান্তে বাঁধা একটা ফাঁস জ্যোতির্ময়ের দিকে ছুঁড়ে মেরেছেন তিনি, আর একইসঙ্গে অন্যপ্রান্তটাকে পাক দিয়ে ধরেছেন একটা শক্তপোক্ত পাইনগাছের গায়ে। নিখুঁত লক্ষে ফাঁসটা যখন জ্যোতির্ময়ের কোমরে আঁট হয়ে বসেছে, ততক্ষণে পাশের জঙ্গল থেকে রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়ে বিশ্বনাথনের কোমর জড়িয়ে ধরেছে একটা অচেনা মানুষ।

মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাদুটো। রঞ্জা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সাবধানে দড়ি ধরে জ্যোতির্ময়কে শক্ত পাথরের ওপর তুলে আনছিলেন মুস্তাক। ততক্ষণে অচেনা মানুষটা বিশ্বনাথনকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রাস্তার ওপর নেমে এসেছে।

"আপনি–"

স্থানীয় মানুষটা অপরিষ্কার দাঁত বের করে হাসল। চোখের কোণে চামড়া কুঁচকে উঠেছে তার। ভারী বন্ধুত্বপূর্ণ মুখটা। রঞ্জার দিকে বড়ো বড়ো নীল চোখদুটো মেলে তাকিয়ে সে বলল, "আমার নাম সেলিম। সেলিম হামাদান। কাছাকছি একটা সহজ রাস্তা আছে তো। সেটা ছেড়ে এই রাস্তায় এলেন কেন? আমার সাথে আসুন আপনারা।"

"আপনি-এখানে ঠিক সময়ে এলেন কী করে?"

সেলিম ফের হাসল। পাহাড়ি মানুষের সরল, সাদাসিধে হাসি, “এই পাহাড়ই আমার মা-বাপ বহেনজি। আমাদের অত রাস্তাঘাট লাগে না। গ্রাম ছেড়ে কাজের খোঁজে বেরিয়েছি। গিয়েছিলাম সিলাবাদের দিকে। যদি কোন টুরিস্ট ট্রেকারের দল পাই তো গাইডের কাজ করবার ইচ্ছে ছিল।”

“পেলে না?”

“দরে পোষাল না মালিক। বড়ো কম টাকা দিচ্ছিল ওরা। ফেরার পথে পাহাড়ের ওপর থেকে সোজা নেমে আসছিলাম রাস্তা কম করবার জন্য, তখন আপনাদের দেখলাম এই রাস্তায় ঢুকছেন এসে। এ তো মরার ফাঁদ। শখ করে কেউ এখানে আসে?”

বলতেবলতেই মুস্তাকের দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় সে বলে উঠল, “কেমন ঘোড়াওয়ালা হে তুমি? পথঘাট চেনো না কিছু, ওদিকে লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছ। আজ পাহাড়ে দুটো মানুষ মরলে তার জবাবদিহি কী করতে তুমি?”



মুস্তাক নিঃশব্দে গালাগালটা হজম করে গেলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, “ভালো রাস্তাটা কোনদিকে?”

“এসো আমার সঙ্গে।”

****

এ পথটা অপেক্ষাকৃত চওড়া। তবে জানা না থাকলে তার খোঁজ পাওয়ার সাধ্য নেই কারো। পিছু হটে ফের পাইনবনে ফেরৎ গিয়ে খানিক দূর এগোতে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল। সটান নেমে গেছে সেটা নীচের জংলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে। সেখানটায় গিয়ে সেলিম শেকড়বাকড় ধরে ঝুল খেয়ে তলায় নেমে গেল। তারপর খানিক নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আসুন।"

নেমে এসে ওরা দেখে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দিব্যি একটা ট্রেল এঁকেবেঁকে ওপরদিকে উঠে গেছে পাহাড়টাকে পাক দিয়ে। ওপর থেকে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না।

চলতে চলতেই অনর্গল কথা বলে চলেছে লোকটা, "শীতের দিনে গ্রাম ছেড়ে ভেড়ার পাল নিয়ে এই পথ ধরে নীচে নামি আমরা। আর গরম এলে ফের–"

"তোমার গ্রাম কোথায় সেলিম?" তার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে রঞ্জা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

"নাগবস্তি।"

"কী করো?"

গোটাকয় ভেড়া আছে। তাছাড়া মাঝেমধ্যে গাইডের কাজও করি এ চত্বরে।"

"ভালো টুরিস্টের দল পাও?"

সরল মুখে হাসল সেলিম, "পাই বইকি। নইলে সংসার চালানো মুশকিল হত।"

লোকটা মিথ্যে বলছে। সিলাবাদে একটা গোটা দিন বিশ্রাম করেছে রঞ্জারা। ছোট্টো বস্তি। বড়োজোর ত্রিশচল্লিশঘর লোক। সেখানে কোন টুরিস্টের দল ছিল না। তবে আসছিল এ সিলাবাদের দিক থেকেই। তাহলে কি সেখান থেকে তাদের পিছু নিয়েছে? কেন? কে লোকটা?

ভাবতে-ভাবতে লোকটার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একঝলক তাকিয়েই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল সে। একটা দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে যেন তার মনটা। মাথায় তীব্র যন্ত্রণার একটা ঝলক ছড়িয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। লোকটার মনের ওপরে একটা কঠিন আবরণ ছেয়ে রয়েছে। তার সাধ্য ছিল না সে দেয়ালকে ভেঙে ভেতরটা দেখে। লোকটা নির্বিকার। মাথা নীচু করে আগে আগে চলেছে।

একটু পিছিয়ে পড়ে রঞ্জা মনে মনে ডাক দিল–"রঙ্গন।"

"বল," রঙ্গনের জবাবি সাড়া এল রঞ্জার মনের ভেতর।

"সেলিমের মনটা একবার দ্যাখ তো–"

"কেন? তখন তো মুস্তাককে নিয়ে খুব বকা দিলি। এবারে-"

"আঃ। যা বলছি তাই কর।"

নিঃশব্দ হয়ে গেল রঙ্গনের মন। একটু পরেই ফের রঞ্জার মনের ভেতর তার চিন্তাটা ভেসে উঠল, "এটা কী? আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে–ও দিদিভাই–"

"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে শিগগির–"

বলতেবলতেই হঠাৎ থেমে গেল রঞ্জা। সেলিম ঘুরে তাকিয়েছে তার দিকে। চোখের দৃষ্টি আমূল বদলে গেছে তার। কুটিল, হিংস্র এই দৃষ্টি তার বহুকালের পরিচিত। কোথায় দেখেছে সে একে? কোথায়--

মাথার ভেতরে দ্বিতীয় কারো উপস্থিতি টের পাচ্ছিল সে। জোর করে ঢুকে আসছে তার মনের মধ্যে। হঠাৎ আক্রমণে ভেঙে পড়ছিল তার মনের প্রতিরোধ। অজস্র স্মৃতির দল বুদবুদের মতন ভেসে উঠছে সেখানে। এ জন্মের স্মৃতি নয় তারা–যেন বহুকাল আগে–মঞ্জাদাহোর শহরের বুকে- সে আর ভাই-জিবারা পাহাড়ের ওপাড়ে বিরাট সেই পাথরের গোলকটা–আর–আর–জিভা-হ্যাঁ-

--আস্তে আস্তে তার সব প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাছিল। আগন্তুক মনটা নীরবে আক্রমণ করে চলেছে--

হঠাৎ কে যেন কথা বলে উঠল তার মাথার মধ্যে। রঙ্গনের গলা, "দিদিভাই অ্যাটাক–আমি সঙ্গে আছি–একসাথে--ওয়ান–টু-থ্রি-নাউ–"

দুটো শক্তিশালী মন একসঙ্গে আঘাত করল আগন্তুক মনটাকে। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই মনের ওপর থেকে তীব্র চাপটা সরে গেল রঞ্জার।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণে ফিরে এল রঞ্জা। রঙ্গন সঙ্গে আছে যখন তখন দুনিয়ায় কোনো কিছুকেই আর সে ভয় পায় না। একটা প্রবল ধাক্কায় আগন্তুক মনটার শেষ চিহ্নটাকেও মুছে ফেলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। সেলিম বড়ো বড়ো পদক্ষেপে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে।

রঙ্গন তার পাশে পাশে হাঁটছিল পিছিয়ে এসে। হঠাৎ নিচু গলায় বলল, "লোকটাকে ছাড়ব না। ফাঁক পেলেই একসাথে ধরব আবার। কতক্ষণ আটকাবে আমাদের!"

"লোকটা কে হতে পারে কোন আন্দাজ করতে পারিস?"

"উঁহু। মনটাকে অ্যাটাক করবার মুহূর্তে কয়েকটা ছবি টের পেয়েছিলাম শুধু। সেই ফাটলওয়ালা পাথরটার ছবি–আর-আর একটা পুরোনো শহরের ছবি–বুঝলি দিদি–আমি তার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম–লোকটা সেখানে ছিল–মানে এ লোকটা, তবে ঠিক এ নয়–বেশ কনফিউজিং–"

রঞ্জা চুপ করে কিছু ভাবছিল। খানিক বাদে বলল, "একবার যখন মনে পড়তে শুরু হয়েছে তখন নিজেই তুই সব বুঝতে পারবি রঙ্গন। উপস্থিত শুধু এইটুকু জেনে রাখ এর সঙ্গে জিভা নামে একটা লোকের সম্পর্ক আছে। সে আমাদের বন্ধু নয়।"

"তুই কিন্তু আমায় সবটা খুলে বলিসনি দিদিভাই। একটু একটু বলেছিস।"

রঞ্জা চুপ করে রইল। প্রথম যে রাত্রে জ্যোতির্ময় তাকে সব খুলে বললেন, সেদিন ঘরে ফিরে লুকিয়ে অনেক কেঁদেছিল সে। বুকের ভেতরটা ভীষণ মুচড়ে মুচড়ে উঠেছিল তার। প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে তারা তাদের মা-বাবাকে। অতটুকু ছেলেটাকে সেসব কথা খুলে বললে সে যে কত দুঃখ পাবে কে জানে। তার চেয়ে থাক। নিজেনিজেই সব বুঝতে পারবে কিছুদিনের মধ্যেই।"

"কীরে? বল? নইলে কিন্তু আমি নিজেই-"

"কী করবি? আমার পারমিশান ছাড়া আমার মনের মধ্যে ঢুকবি? মার খাবি কিন্তু রঙ্গন তুই আমার হাতে এবারে।"

"আমি কি তাই বলেছি নাকি?"

রঞ্জা চোখ পাকাল একবার, "তাহলে ওসব প্রশ্ন বেশি কোরো না। ছোটো আছিস, ছোটোর মত থাকবি। এখন যা, বাবার কাছে যা। সঙ্গে সঙ্গে থাকবি বাবার।"

"ইশ! ভারী তো বড়ো! সবসময় এক কথা–ছোটো–ছোটো--"

গজগজ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে বাবার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল রঙ্গন। দিদি চোখ পাকালে সেখানে বেশিক্ষণ থাকা যে সুবিধের নয় সে কথা তার মতন করে কেউ জানে না।

আগে আগে সেলিম আর মুস্তাক পাশাপাশি হাঁটছিল। পেছন থেকে মুস্তাকের ওপরে মনকে সংহত করল রঞ্জা–

-সরল সাদাসিধে মন। কোন জটিলতা নেই সেখানে–কিন্তু–না। এ কোন সাধারণ পাহাড়ি মানুষ নয়–সুশিক্ষিত উঁচুস্তরের মন--রঙ্গন ভুল বলেনি-কিন্তু-এ তাদের সঙ্গে এ ভাবে--

"কী হল ম্যাডামজি? হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন যে!"

মুস্তাক কখন যেন একটু পিছিয়ে পড়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে ঝকঝকে চোখে হাসল রঞ্জা। রহস্যটা উদ্ধার হয়েছে অবশেষে। লোকটা সরকারী কমাণ্ডো। তাদের সঙ্গে একে পাঠানো হয়েছে তাদের রক্ষক হিসেবেই। সে তাদের ভালো চায়, কিন্তু-নাঃ এ অভিযানের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু জানা নেই তার।

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "কিচ্ছু না বড়ে ভাইয়া। মাথাটায় একটু চক্কর লেগে গিয়েছিল আর কি। চলুন। সামনে অনেকটা রাস্তা বাকি আছে এখনো।"

"এখন ঠিক আছেন তো? সেলিমের হাতে ঘোড়াদুটো ছেড়ে এসেছি। আমি তবে আগে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে ধরি।"

"সেলিম–এখনো সঙ্গে রয়েছে?"

"হ্যাঁ। বলল, পিঠুডহরেই যাবে। একসঙ্গে গেলেই হয়।"

"ঠিক আছে। আপনি এগিয়ে যান ভাইয়া। আমি পেছনে আসছি।" কথাগুলো বলে আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করল রঞ্জা। এ মানুষটা শক্তিশালী। তার বাবাকে বাঁচিয়েছে। তাদের বন্ধু। এ অভিযানে এমন একজন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

****

"পৌঁছে গেছি। সামনেই পিঠুডহরের ময়দান।" পেছনে বেশ খানিকটা উঁচু থেকে সেলিমের গলা ভেসে আসছিল। মুস্তাকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নেমে আসছে সে। পথ এখানে একেবারে খাড়া হয়ে নেমে গিয়েছে ছড়ানো একটা বোল্ডার জোনের দিকে।

"এখানে সিদ্দার ধারাটাকে দেখতে পাচ্ছিস রঙ্গন?" দুরবীন থেকে চোখ সরিয়ে রঞ্জা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

"উঁহু।"

"নীচে বোল্ডার জোনটা দেখছিস? ওটাই সিদ্দা।"

"ধুস্! এ তো শুধু পাথর আর পাথর রে দিদিভাই?"

"দূর বোকা," রঞ্জা হাসছিল, "ওই বোল্ডার জোনের ফাঁকফোকড় বেয়েই সিদ্দা বইছে এখান দিয়ে। ওই দ্যাখ–দূরে ঐ মাঠমতো জায়গাটা দেখছিস? নে এবার দুরবীনটা চোখে লাগা–দ্যাখ– দেখতে পাচ্ছিস? মাঠটাকে বেড় দিয়ে জল বইছে? ওইটা এগিয়ে এসে বোল্ডার জোনটার ফাঁক গলে বয়ে যাচ্ছে। সাবধানে স্টেপ ফেলবি। এইসব জায়গায় পাথর খুব পিছল হয় কিন্তু।"

দুরবীনটা চোখে লাগিয়ে কলকল করে উঠল রঙ্গন, "কী সুন্দর কী সুন্দর। ও দিদিভাই, নদীটা কেমন লালনীল রঙের রে!"

"লালনীল নদী নয় রে পাগলা," রঞ্জা হেসে তার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল একবার, "ওখানটা ওর জলের তলায় রাশ রাশ মিনারেল মেশা নুড়িপাথর ছড়িয়ে আছে। এইবার দুরবীনটা ওপরের দিকে ঘোরা–দূরে একটা ছুঁচলো পাহাড়ের মাথা দেখতে পাচ্ছিস? যার গা বেয়ে সিদ্দা নামছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটার নাম শিবটোলা। ম্যাপে যা দেখেছি তাতে কাল আমরা সিদ্দার কোর্স ছেড়ে ঘুরপথে ওইটে ক্রস করে নাগবস্তির দিকে চলে যাব।"

"আমরা এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্পিং এর জায়গা দেখছি। আপনারা সাবধানে আসুন–" বলতে বলতে মুস্তাক সেলিমকে নিয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

"এগিয়ে যা রঙ্গন। সেলিমের দিকে খেয়াল রাখ। সাবধান," মৃদু গলায় কথাক'টা বলে রঙ্গনকে সামনের দিকে ঠেলে দিল রঞ্জা। সে এগিয়ে গিয়ে মুস্তাকের হাত ধরেছে। পাথরে পাথরে পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা তিনজন।

****

"মুশকিল হল। কোনদিকটা দিয়ে এগোই বল তো? সবদিকেই তো দেখছি--"

একলা একলাই আনমনে হাঁটছিল রঞ্জা। গলার শব্দটা পেয়ে পেছন ফিরে দেখে জ্যোতির্ময় এগিয়ে এসেছেন কাছে।

"এটা কিন্তু খুব সহজ বাবা," বলতে বলতে নিচু হয়ে বোল্ডারগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে, পেয়েছি। এদিক দিয়ে সেলিমরা গেছে। এই বাঁদিকের বোল্ডারটায় পা দাও বাবা–না না, ওইটে না ওইটে না, ওর পাশে–সেলিমরা ওটার ওপর দিয়ে গেছে।"

"বুঝলি কী করে?"

"সিম্পল। পাথরের গায়ে মাকড়শারা জাল বোনে। যে পাথরগুলোর জাল ছেঁড়া সেগুলোর ওপর দিয়ে রাস্তা-" বলতেবলতেই হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল রঞ্জা। ভুরুদুটো গিঁট পাকিয়ে উঠেছে তাঁর।

"কিছু ভাবছ বাবা?"

"হ্যাঁ। এই সেলিম লোকটা নাগবস্তিতেই থাকে। আমরা রামবাসার দিকে যাব শুনে ভারী উৎসাহ। বলে জায়গাটা ওর হাতের তেলোর মত চেনা নাকি। দিনে শ'তিনেক টাকা আর খাওয়াদাওয়া পেলেই গাইডের কাজটা করে দিতে পারবে। কিন্তু মুস্তাক আপত্তি করছে।"

"মুস্তাকের পয়েন্টটা কী?"

"বেজায় সাবধানী ছেলে। বলছে জায়গাটা সুবিধের নয়। একেবারে উটকো একটা লোককে এভাবে দলে ভেড়ানো ঠিক না-ও হতে পারে। কে কোন মতলবে ঘোরে এ'সব এলাকায় কে জানে! তবে আমি বলি, পথে বের

হয়ে অতশত ভাবলে চলে? এদিকে শেষ এসেছি তা-ও তো বেশ ক'বছর হয়ে গেল। খুঁটিনাটি ভালো করে মনেও নেই সব। জায়গাটা চেনে এমন একটা লোক সঙ্গে থাকলে-"

"না বাবা। মুস্তাকের সঙ্গে আমি একমত।"

"সে কী রে? তুই তো কাশ্মীরের কাঁহা কাঁহা মুলুকে একাএকাই ক্যাম্প করে বেড়াস। একটা লোকাল ঘোড়াওয়ালার মত তুইও ভয় পেয়ে গেলি?"

উঁহু। অন্য কারণ আছে। এই সেলিম লোকটার কিছু রহস্য আছে। আমি আর রঙ্গন দুজনেই চেষ্টা করে দেখেছি। ওর মনের ভেতর ঢোকা যায় না। একটা শক্ত ব্লক রয়েছে। উলটে আমার মনের মধ্যেই ঢুকে এসেছিল প্রায়।"

জ্যোতির্ময়ের মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জিভার নজরদার? এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না এর। জিভা কি তাঁকে সন্দেহ করছেন? রঞ্জা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বাবা ঠিক কী ভাবছে এখন? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই তাঁর চিন্তার সুতোগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। প্রতিদিনই শক্তিটা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে তার। তার আর রঙ্গন, দুজনেরই-

-হঠাৎ নিজেকে সংযত করল রঞ্জা। রঙ্গনকে যে নীতির শিক্ষা সে প্রতিমুহূর্তে দিয়ে চলেছে–একান্ত বিপদের মুহূর্ত ছাড়া অন্যের অজান্তে কারো মনের ভেতর ঢুকে পড়াটা অন্যায়–সে নিজে তাকে ভাঙবে কেমন করে?

"বেশ। তাই হবে। ক্যাম্পে পৌঁছে আমি একে বিদেয় করবার বন্দোবস্ত করছি।" বলতেবলতে জ্যোতির্ময় এগিয়ে গেলেন। পেছন ফিরে একবার দেখল রঞ্জা। বিশ্বনাথন আংকলের চলতে একটু অসুবিধে হচ্ছে আজ। হাঁটুতে একটা পুরোনো চোট আছে ওঁর। বোল্ডার জোনের ক্রমাগত উঁচুনিচু রাস্তায় একটু অসুবিধে হচ্ছে বোধ হয়। খানিক আগে মালপত্রগুলো সমস্ত একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাঁকে অন্য ঘোড়াটার বসিয়ে দিয়েছিলেন মুস্তাক। ঘোড়াদুটো শিক্ষিত। ঠিক নিয়ে আসবে। রঞ্জা সামনে এগিয়ে গেল।

****

ছোটো ছোটো তাঁবু তিনটের ভেতরে আলো জ্বলছে। দূর থেকে সেগুলোকে লাল ঢাকনা দেয়া তিনটে লণ্ঠনের মত দেখায়। সন্ধে নেমে আসছিল দ্রুত। শিবটোলার উল্টোদিকে আলিচ আর কারতাং গিরিশিরাদুটো দিগন্ত ঢেকে দাঁড়িয়ে। সেদিক থেকে একটা সরু ধারা এসে সিদ্দায় মিশেছে এইখানে। পশ্চিম আকাশ লাল থেকে আস্তে আস্তে ঘন বেগনি রঙ ধরছিল। ঘন মেঘের দল উড়ে এসে দ্রুত ঢেকে দিচ্ছে পাহাড়দুটোকে। সন্ধের মুখে পিঠুডহরের ময়দানে হাওয়া ছেড়েছে। তীব্র ঠান্ডা হাওয়ায় হাড়ের ভেতর কাঁপন ধরায়। গায়ের জ্যাকেটটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে সামনে বসা সেলিমের দিকে একবার চাইলেন জ্যোতির্ময়। সাদাসিধে মানুষটা অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

"না সেলিম। ভেবে দেখলাম, আমাদের গাইডের দরকার হবে না রামবাসায়। চেনা জায়গা। আগেও এসেছি। তাছাড়া সঙ্গে যা রসদ আছে তাতে আমাদের পাঁচজনের টেনেটুনে কুলিয়ে যাবে বটে কিন্তু অতিরিক্ত একজনকে দলে নিলে মুশকিল হয়ে যাবে। তোমাকে আমরা সঙ্গে নিতে পারছি না।"

সেলিমের চোখদুটো ঝিকিয়ে উঠল একবার। রঞ্জা আর রঙ্গন সঙ্গেসঙ্গেই সতর্কভাবে তার দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা। সেলিমের সেটা নজর এড়ায়নি দেখা গেল। তাদের দিকে ভাবলেশহীন চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে নিচু গলায় বিড়বিড় করে বলল, "আজকের রাতটা তাহলে যদি মুস্তাকভাইয়ের সঙ্গে তাঁবুতে থেকে যেতে দিতেন-"

হঠাৎ রঞ্জা উঠে এসে সেলিমের সামনে দাঁড়াল। তার মুখটা রাগে লাল হয়ে গেছে। অতবড়ো মানুষটার হাত ধরে একটা টান মেরে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "না। এক্ষুণি এখান থেকে বিদেয় হবে তুমি।" প্রায় সঙ্গেসঙ্গে তার দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুস্তাক আর রঙ্গন। লোকটা তাদের মুখগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল তাঁবু থেকে।

"কাজটা ভাল করলে না রঞ্জা," বিশ্বনাথন মাথা নাড়ছিলেন, "একটা লোককে এইভাবে তাড়িয়ে দেয়া! অন্যায় তো কিছু বলেনি! তাছাড়া একটা লোকাল লোককে-"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঞ্জা বলল, "এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না কাকা। এখান থেকে ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারলে আপনাকে সব কথাই খুলে বলব।"

পিঠুডহর থেকে বহুদুরে, সিদ্দা নদীর উৎস পেরিয়ে রামবাসা হিমবাহের বুকে অপেক্ষায় থাকা দীর্ঘকায় মানুষটা চিন্তিতভাবে পায়চারি করছিলেন। সামনে বাতাসে গড়ে ওঠা ত্রিমাত্রিক ছবিটিতে আলিচ আর কারতাং গিরিশিরাদুটো আবছা চোখে পড়ে। সেইদিকে হেঁটে চলেছে সেলিম এখন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা ফাটল আছে পাহাড়ের গায়ে। সেইখানে আজ রাতটা কাটিয়ে দেবে সে।

নীচে তাঁবুগুলোর দিকে সেলিমের দৃষ্টি ঘুরিয়ে ধরলেন তিনি। পর্দায় ছবিটা বদলে গেছে। পায়ের অনেক নীচে ছোটোছোটো তিনটে আলোজ্বলা তাঁবু। একপাশে আগুন জ্বেলে তাকে ঘিরে পাঁচজন মানুষ। এদের মধ্যে দুটো মন তাঁর পরিচিত। তৃতীয় মনটা একজন ছদ্মবেশী সৈনিকের। এদের পাহারাদার হয়ে চলেছে। ক্ষতিকর কিছু নয়।

অবশিষ্ট মনদুটোর দিকে নজর দিয়ে তীব্র রাগে দপ করে যেন জ্বলে উঠলেন তিনি। নিজেদের মনের ওপর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে দুই ভাইবোন। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও সে বাধাকে পেরোতে পারেন নি তিনি আজ সকালে। দলের অন্যদের ওপরেও সতর্ক পাহারাদারি করে চলেছে এরা। বিশেষ করে জ্যোতির্ময়ের ওপর।

কেন নিজেদের মনের ওপর দেয়াল তুলেছে এরা? জ্যোতির্ময় নামের লোকটার প্রতি তীব্র ভালোবাসাটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। নিজেদের সম্পর্কে কিছু কিছু চেতনা ফিরে পাবার পরেও একটা সাধারণ মানুষের প্রতি সে ভালোবাসা তাদের বেড়েই চলেছে ক্রমশ। যেন দুহাতে আগলে রাখছে লোকটাকে। কী ভাবছে এরা সেটা জানা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। রেনি ও র‍্যাং শ্রেণীর জৈবযন্ত্রের নিজস্ব ব্যাক্তিত্ব আছে। নিজেনিজে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও আছে। যতক্ষণ না এরা তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণের এলাকায় এসে পৌঁছোচ্ছে ততক্ষণ প্রতিমুহূর্তে এদের নজরে রাখাও প্রয়োজন। তাঁকে এদের সঙ্গে থাকতেই হবে নাগবস্তি পৌঁছোনো পর্যন্ত। একটাই উপায় আছে তার। শিবটোলার পথটাকে-

****

ফরফর করে তাঁবুর কানাতে হাওয়ার শব্দ উঠছিল। ঘুম ভেঙে গেল রঞ্জার। বাইরে হাওয়ার বেগ বাড়ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে গম্ভীর শব্দ উঠছে। তাঁবুর ফাঁকফোকর দিয়ে তীব্র ঠান্ডা হাওয়ার ছিটেফোঁটা ভেতরে ঢুকে এসে হাত পা জমিয়ে দিচ্ছে যেন। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ছোট্টো আলোটা জ্বালল একবার সে। হাতঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে রাত সাড়ে এগারোটা।

পাশেই স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে কুঁকড়ে গিয়েছে রঙ্গনের ছোট্টো শরীরটা। গ্রীষ্মের পাহাড়ের উপযোগী স্লিপিং ব্যাগ হঠাৎ বেড়ে ওঠা ঠান্ডাকে আটকাতে পারছে না। তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে রঞ্জা ডাকল, "রঙ্গন–এই রঙ্গন-ওঠ-"

বলতেবলতেই স্যাক খুলে মোটা উইন্ডচিটারদুটো বের করে এনেছে সে। রঙ্গন হিহি করে কাঁপছিল। একটা পোশাক নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অন্যটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল রঞ্জা, "পরে নে। ভালো করে একেবারে থুতনি অবধি চেন আটকে মাথায় হুডটা দিয়ে বস। আমি একবার বাবাদের তাঁবুটা দেখে আসি গিয়ে-"

বলতে বলতে তাঁবুর সামনের চেনটা খুলে ফেলেই পিছিয়ে এল সে। তীব্র হাওয়ায় ভাসমান একরাশ বরফের ধারালো কুঁচি তার সারা মুখে ঝাপটা দিয়েছে এসে। চেন খোলা ডোরফ্ল্যাপের দুটো ধার হু হু করে উড়ছিল। "ওপাশটা তুই ধর ভাই–" বলতেবলতেই হাওয়া আর বরফকুঁচির ধাক্কাকে উপেক্ষা করে ফ্ল্যাপের একটা পাশ ধরে টেনে আনল রঞ্জা। রঙ্গন ততক্ষণে অন্য পাশটাকে আটকে ফেলেছে। চেনটা টেনে দিতে দিতে রঞ্জা বলল, "থার্মোমিটারটা একবার দ্যাখ তো!"

পাউচ থেকে যন্ত্রটা বের করেই গলা দিয়ে একটা বিস্ময়ের আওয়াজ বের হয়ে এল রঙ্গনের, "মাইনাস টেন। বছরের এই সময়ের স্বাভাবিকের থেকে পনেরো ডিগ্রি কম–আরো নামছে--"

"ইমপসিবল। পুরোদস্তুর ব্লিজার্ড শুরু হয়ে গেছে একটা। জুলাই আগস্টে ব্লিজার্ড–"

পাশের তাঁবুতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সেই একই কথা ভাবছিলেন জ্যোতির্ময়রাও। বিশ্বনাথনও ভারী অবাক হয়ে গেছেন। রাঠোরের সেই সাবধানবাণী ভাসছিল জ্যোত্যির্ময়ের কানে। অসময়ের ব্লিজার্ড এই এলাকায় নতুন নয়। কিন্তু কেন? এখনও তো তাঁরা নিষিদ্ধ এলাকার ভেতরে–

চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন জ্যোতির্ময়। এই ঝড় থামা অবধি তাঁদের কিছু করবার নেই। পাশের তাঁবুতে আলো জ্বলছে। তার মানে রঞ্জা আর রঙ্গন জেগে আছে। জেগে থাকতে হবে তাঁকেও। এখান থেকে নাগবস্তির সিধে পথটা একেবারে খাড়া হয়ে উঠে গেছে পাশের পাহাড়টা বেয়ে শিবটোলা হয়ে। সেখান থেকে পাহাড়ের মাথায় মাথায় পথ চলবে আরো উত্তরে। কাল সকালে উঠে সে রাস্তার অবস্থা ঠিক কী হবে তা এখনো আন্দাজ করা যাচ্ছে না। যদি সত্যিই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়? ফিরে যেতে হয় তাঁদের? জিভা কি–

হাজারো এলোমেলো চিন্তা আর দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে কখন যে চোখ দুটো বুঁজে এসেছে তাঁর তা জ্যোতির্ময় খেয়াল করেননি।

****

"সার একবার বাইরে আসবেন।"

ধড়মড় করে উঠে বসলেন জ্যোতির্ময়। বাইরে একটা হইচই চলছে। রঙ্গন, রঞ্জা আর বিশ্বনাথনেরও গলা পাওয়া যাচ্ছিল।

বাইরে এসে দাঁড়াতে মুস্তাক তাঁর হাতে দুরবীনটা দিয়ে বলল, "একবার শিবটোলার দিকটা দেখুন।"

দুরবীন চোখে লাগিয়ে একটু চমকে উঠলেন জ্যোতির্ময়। কালকের দেখা সেই ধূসর পাথরের স্তূপ এক রাতে যেন কোন ম্যাজিকে ঘন বরফের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। সিদ্দার ধারাকে আর সেখানে আলাদা করে চেনা যায় না।

"কী করবেন?"

জ্যোতির্ময় মাথা নাড়লেন, "একবার এগিয়ে গিয়ে রেকি করে এলে হত।"

"ভোরভোর উঠে আমি সেটা সেরে এসেছি স্যার। এখান থেকে বড়োজোর মাইলটাক রাস্তা এগোনো যাবে। তারপরেই নরম থকথকে বরফ শুরু হয়ে গেছে। কম সে কম চার-পাঁচ ফুট গভীর। এখন বেশ কদিন ওখান দিয়ে ক্রসিং সম্ভব নয়।"

"কিন্তু আর কোন রাস্তা তো-"

"নাগবস্তি যাবার আরেকটা রাস্তা আছে সাহেব," হঠাৎ পেছন থেকে একটা চেনা গলা ভেসে আসতে চমকে ঘুরে তাকাল সবাই। সেখানে সেলিম বড়ো বড়ো পায়ে হেঁটে আসছিল দলটার দিকে।

"তুমি? ফের এখানে-" জ্যোতির্ময়ের গলায় বিরক্তি চাপা থাকছিল না।

"আমার কথাটা একবার শুনে নিন স্যার," লোকটা তাঁর কাছে এসে ধীর গলায় বলল, "রাতে আলিচের গায়ে একটা ফাটলে গিয়ে ঢুকেছিলাম। অসময়ে এমন বরফ ঝড় আমি আগে কখনো দেখিনি। সকালে আলো ফুটতে শিবটোলার রাস্তা বন্ধ দেখে মনে হল আপনাদের হয়ত এই বান্দার কোন সাহায্য দরকার হতে পারে। এদিক দিয়ে নাগবস্তি যাবার একটা অন্য পথ আছে।"

তার হাত অনুসরণ করে শিবটোলার উল্টোদিকের গিরিশিরাদুটোর দিকে মুখ ফেরাল তারা।

"ও রাস্তা তো উলটোদিকে যাচ্ছে। ওদিকে গেলে নাগবস্তি থেকে পিছিয়ে যাব না আমরা?" বিশ্বনাথন বলে উঠলেন পেছন থেকে।

"না সাহেব। বাঁহাতে ওটা আলিচ পাহাড়। ওর গোড়ায় সিল্লাসার লেকের পাশে আজ রাতটা কাটিয়ে কাল ডাইনে হাতিডুঙ্গার খাড়া চড়াই ধরব। ওকে বেড় দিয়ে ফের সিদ্দার ওপরের দিকে পৌঁছে যাব। সেখান থেকে দুশমনী ঢালান বেয়ে উঠলে সিধা নাগবস্তির পথ।"

মুস্তাক চিন্তিতভাবে আলিচের দিকে দেখছিলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "পথ যদি থেকেও থাকে তা হলেও কালকের কালকের ঝড়ের পর সে বোধ হয় খোলা নেই।"

"না। ওদিকের রাস্তা কখনো বন্ধ হয় না। আমরা এখানে থাকি। আমরা জানি।"

মুস্তাক দুরবীনে বেশ খানিকক্ষণ দেখলেন আলিচের দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "কথাটা ঠিক। বরফের ছিটেফোঁটাও তো দেখছি না ওদিকে। কিন্তু তা কী করে হয়? একটা এতবড়ো ব্লিজার্ড হয়ে গেল অথচ-"

"অত কথা জানি না। যেতে চাইলে আমার সঙ্গে আসুন।" সেলিমের গলায় অসহিষ্ণুতার ছোঁয়া ছিল।

জ্যোতির্ময় একটু ইতস্তত করে মুস্তাকের দিকে চাইলেন একবার। মুস্তাক মাথা নাড়ল, "ওকে চলে যেতেই বলে দিন স্যার। রাস্তা যদি থাকে তাহলে সেখান দিয়ে আমিই আপনাদের নিয়ে যেতে পারব।"

সেলিমের মুখে একটা মৃদু হাসি খেলে গেল, "দুশমনী ঢালানের গা বেয়ে সিদ্দা হাজার ধারা হয়ে নামছে। খাড়াই ঢালানের পিছল গায়ে ভুল ট্রেল ধরলে বেঁচে ফিরবেন না। ওর ওপর দিয়ে পথ আমরা নাগবস্তিওয়ালারা ছাড়া কেউ জানে না। চাইলে চেষ্টা করে দেখুন। আমি মিথ্যে বলিনি।"

রঞ্জা চুপচাপ কিছু ভাবছিল। হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের দিকে ঘুরে বাংলায় বলল, "লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না এটা ঠিক। কিন্তু, এই শেষ কথাটা বোধ হয় ও ভুল বলেনি বাবা। ঢালানের কথা যা বলল, এদিককার পাহড়ে সে জিনিস আমি আগেও দেখেছি। পথচেনা দক্ষ গাইড ছাড়া সেগুলো সত্যিই পার হওয়া যায় না।"

"তাহলে?"

"এই মুহূর্তে এ লোকটার ওপর ভরসা না করে উপায় নেই। তবে ভেতরে ভেতরে কোন মতলব আঁটছে কি না, সেটা আমি আর রঙ্গন খুঁজে দেখব। কতক্ষণ আটকাবে ও আমাদের?"

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন জ্যোতির্ময়। তারপর বললেন, "চল তাহলে। যা করবি সাবধানে করিস। শুধু দু'মিনিট সময় দে আমায়, ডঃ চৌধুরিকে আজকের রিপোর্টটা টেলিফোনে পাঠিয়ে দিয়েই রওনা হব।"

"বিকেলে ক্যাম্পে পৌঁছে খবরটা দিলে হত না বাবা? এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারলে-" রঞ্জার গলায় অসহিষ্ণুতার ছাপ ছিল।

"উঁহু," জ্যোতির্ময় মাথা নাড়লেন, "এটা প্রতিরক্ষামন্ত্রকের নির্দেশ রঞ্জা। ওঁরা এই কলগুলোর ওপরে নজর রাখছেন।"

****

"দুশমনী ঢালান! সার্থক নাম," বিশ্বনাথন নিজের মনেই বলে উঠলেন একবার। সামনে, খাড়া মেঘের দিকে উঠে গেছে আকাশছোঁয়া বোল্ডার জোন। একটা বড়োসড়ো পাথরের ওপর বসেছিলেন তিনি। একটানা অনেকটা উঠে এসে বুকে চাপ লাগছে। পায়ের অনেক নীচে সিল্লাসার লেক মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। সেখান দিয়ে সিন্ধার ধারাটা শুধু আবছা চোখে পড়ে এখান থেকে।

সেলিম নামে নাগবস্তির লোকটা আগে আগে চলেছে। ঝুলন্ত পিছল বোল্ডারের মৃত্যুফাঁদগুলোর মধ্যে পা রাখবার শক্তপোক্ত পাথরগুলোর ঠিকানা মুখস্ত তার। রঞ্জা আর রঙ্গন চলেছে তার পাশাপাশি। পেছনপেছন সামান্য দূরত্বে অন্যদু'জন সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছিল।

"দেরি কোরো না বিশ্বনাথন। সামনে বাঁক দেখছি একটা। আসবার সময় খেয়াল রেখো," খানিক ওপর থেকে জ্যোতির্ময়ের গলা ভেসে এল।

"ভেবো না। ঠিক চলে আসব," বসে থেকেই জবাব দিলেন বিশ্বনাথন।

বহুদূরে, রামবাসা হিমবাহের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার সামনে দুশমনী ঢালানের একটা ছবি ভাসছিল। সেলিমের চোখ যা দেখছে ঠিক সেইটি প্রতিফলিত হচ্ছে সেখানে। ছেলেমেয়েদুটো পিঠুডহর থেকে এক মুহূর্তের জন্য সঙ্গ ছাড়েনি সেলিমের। সতর্ক চোখে তার প্রতিটা নড়াচড়ার খেয়াল রেখে চলেছে। আর সেইসঙ্গে দু'দুটো মন ক্রমাগত তীব্র আক্রমণ শানিয়ে চলেছে সেলিমের মনের ওপর। যান্ত্রিক মন। তাদের শক্তি অনেক বেশি। আস্তে আস্তে প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে আসছে তাঁর। কিছু একটা করা প্রয়োজন। এক্ষুনি। নয়ত দেরি হয়ে যাবে।

সামনে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক দেখা দিল হঠাৎ। ওর অন্যপাড়টা দেখা যায় না এপাশ থেকে। সেদিকে তাকিয়ে দেখে, কী মনে হতে উল্টোদিকে ঘুরে তাকাল সে একবার। অনেকটা নীচে বিশ্বনাথন একলা বসে। হালকা একটা হাসি ফুতে উঠল তার মুখে। উপায় পাওয়া গেছে। এইবার--

-হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দুই ভাইবোনের নাগাল ছেড়ে বাঁকের উল্টোদিকে অদৃশ্য হল সেলিম। পেছন থেকে গোটা দলটা হাঁ হাঁ করে উঠেছে। ছেলেমেয়েদুটো পিছল পাথর বেয়েই ছুটছে বাঁকটার দিকে–

এইখানটায় মূল পথের বাঁয়ে ছোটোছোটো নুড়ি ছড়ানো একটা এলাকা নীচে নেমে গিয়েছে। আংরাখার কোণদুটো শক্ত করে চেপে ধরে সেই নুড়ির ওপরে বসে পড়ল সেলিম। তারপর ঢাল বেয়ে তিরবেগে ধেয়ে গেল নীচের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেশ খানিকটা নেমে এসে হঠাৎ বাঁদিকে বাঁক নিয়ে সে গড়িয়ে গেল তাদের পুরোনো পথটার ওপরে–

ছেলেমেয়েদুটো ওপরে বাঁকের মুখে পৌঁছে গেছে। সেলিম কোনদিকে গেছে তা বুঝতে পারছে না। মাথার অনেকটা ওপর থেকে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তার শব্দ আসছিল।

সামনে, খানিক দূরে পাথরের ওপর বিশ্বনাথন বসে। সেলিম গুঁড়ি মেরে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল–

****

মিনিট দশেক বিশ্রাম নিতে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল বিশ্বনাথনের। হাতের লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আর ঠিক তখনই রাস্তার ওপর গড়িয়ে এসে তাঁর উঠে দাঁড়াল সেলিম। দুটো তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি যেন ছুরির মতন এসে বিঁধছিল তাঁর চোখে।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই অনেকটা ওপর থেকে একটা কিশোর গলার চিৎকার ভেসে এল, "দিদি–নীচে চেয়ে দ্যাখ-"

চিৎকারটা কানে আসতে বিশ্বনাথনের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে ওপরের দিকে দেখল সেলিম। দৃষ্টিটা সরে যেতেই কেউ যেন একটা পাথর সরিয়ে নিল বিশ্বনাথনের বুকের ওপর থেকে। সেলিমের সামনে থেকে ছিটকে গেলেন তিনি, আর তারপর তাল সামলাতে না পেরে একরাশ বোল্ডারের সঙ্গে গড়িয়ে পড়লেন নীচের দিকে। মাথার ওপরে তখন শিকারী ঈগলের মত নীচের দিকে উড়াল দিয়েছে দুই ভাইবোন।



গড়িয়ে যেতে থাকা বিশ্বনাথনের দিকে ফিরে দেখল সেলিম। তারপর মুহূর্তের দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাঁর ওপরে।

জড়াজড়ি করে গড়িয়ে যেতে থাকা মানুষদুজনের পাশাপাশি ভেসে চলেছিল রঞ্জা আর রঙ্গন। তারপর, ছুটন্ত পাথরের ফাঁকেফোকড়ে সতর্ক নজর রাখতেরাখতেই হঠাৎ অমানুষিক দ্রুততায় হাত বাড়িয়ে মানুষদুজনকে ধরে নিয়ে সটান উঠে গেল কিছুটা ওপরে একটা নিরাপদ এলাকায়। এখান থেকে তাদের মূল পথের দিকটা পাহাড়ের পুরোপুরি আড়ালে। সেদিক থেকে জ্যোতির্ময়ের উদ্বিগ্ন গলার ডাক ভেসে আসছিল।

একটু বাদেই পাহাড়ের বাঁক ঘেঁষে মুস্তাকের মুখটা উঁকি মারল এদিকে। অনেকটা উঁচু থেকেই তিনি দেখতে পেয়েছেন তাদের। উলটোদিকে মুখ ঘুরিয়ে জ্যোতির্ময়কে কিছু বললেন তিনি। তারপর ওস্তাদ বাজিকরের মতই বোল্ডার থেকে বোল্ডারে ঝাঁপ খেতে খেতে দ্রুত ছুটে এলেন তাদের কাছে।

বিশ্বনাথন পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন। পায়ের কাছে সেলিমের শরীরটা শুয়ে আছে। ঘষা কাচের মত চোখদুটো খোলা। নেমে এসে তার ঘাড়ের কাছে আঙুল নিয়ে সামান্য পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন মুস্তাক, "বেঁচে আছে। জ্ঞান হারিয়েছে। কী করে হল এটা স্যার?"

কথাটা বলেই বিশ্বনাথনের দিকে তাকিয়ে বুকটা একমুহূর্তের জন্য ধ্বক করে উঠল মুস্তাকের। সে চোখের দৃষ্টি বিশ্বনাথনের নয়। ব্যাঙ্গ আর হিংস্রতা মেশানো সে চোখ দেখলে অতিবড়ো সাহসীরও বুক কেঁপে উঠবে। কিন্তু সেটা একমুহূর্তের জন্যই। পরমুহূর্তেই বিশ্বনাথনের চোখে ফিরে এসেছে পরিচিত মানুষটির দৃষ্টি। মাথা নাড়লেন তিনি, "বুঝতে পারছি না মুস্তাক। হঠাৎ কোত্থেকে থেকে এসে আমার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপর থেকেই এই অবস্থা। রঞ্জা আর রঙ্গন ঠিক সময়ে এসে হাজির না হলে-"

মুস্তাক বিস্মিত চোখে ভাইবোনের দিকে দেখতেদেখতে বিড়বিড় করছিল, "অতটা ওপর থেকে তোমরা এইখানটা এত তাড়াতাড়ি নেমে এলে কী করে?"

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে রঞ্জা চিন্তিতমুখে প্রশ্ন করল, "একে নিয়ে কী করবেন বড়ে ভাইয়া?"

"ভাবছি ম্যাডাম। এইখানে একে রেখে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। নাগবস্তি সম্ভবত আর কয়েক ঘন্টার পথ। সেখানে একে পৌঁছে দিয়ে যাব একেবারে।" বলতে বলতে শরীরটাকে অবলীলায় কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

পাঁচ
জিভার মুখোমুখি

এখান থেকে নীচে ছড়িয়ে থাকা রিঙ্গান হ্রদটাকে একটা অতিকায় সাপের ফনার মতন দেখায়। তার একপাশ থেকে সিদ্দা নদীর ধারা বের হয়ে এসেছে। সাপের মতই আঁকাবাঁকা তার শরীরটা নাগবস্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দূরে দুশমনী ঢালানের মাথার কাছে মিলিয়ে গেছে।

নাগবস্তিতে সেলিমকে পৌঁছোতে গিয়ে বেশ একটু হইচই হয়েছিল গতকাল বিকেলে। লোকটা সম্ভবত তাদের নেতাগোছের কেউ হবে। লোকজন তাকে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে কাদেজ বলে ডাকছিল। নিয়ে আসবার সঙ্গেসঙ্গেই গ্রামের বৈদ্য তার চিকিৎসায় লেগে গিয়েছেন। অনেক রাত্রে তার জ্ঞান ফিরেছে বলে খবর মিলেছে সকালবেলা। তবে এখনো সে নড়াচড়া বা কথা বলবার অবস্থায় আসেনি। কাউকে চিনতেও পারছে না নাকি।

তাকে পাহাড় থেকে অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে আনায় জ্যোতির্ময়দের দলটারও বেশ খাতিরদারি হয়েছে গ্রামে। তবে তাতে সুবিধে কিছু হয়নি। রিঙ্গান পেরিয়ে রামবাসা টপ চড়তে যাবেন শুনে লোকজন মুখ কালো করে যে যার ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। সঙ্গে আসবার মত সাহস তাদের কারো নেই।

খাড়াই দেয়ালের গায়ে সরু বারান্দামতন জায়গাটাতে বসে রঞ্জা আর রঙ্গন একবার ওপরের দিকে চেয়ে দেখল। অল্প দূরে, একটা বিরাট পোকার মতন মুস্তাক চার হাতপায়ে এদিকওদিক নড়াচড়া করছেন। গিরিসঙ্কটের কাদা আর নুড়িভরা বিপজ্জনক ঢালের গায়ে নিরাপদ পথ খুঁজে চলেছেন তিনি তাদের জন্য।

"ছেলেটাকে সঙ্গে না পেলে আজ এই পাসটা ক্রসিং-এর কথা ভাবাও যেত না রে রঞ্জা।" হাঁফাতে হাঁফাতে তাদের কাছে উঠে আসতে আসতে জ্যোতির্ময় বললেন। বিশ্বনাথনও তাঁর পেছনপেছন উঠে এসেছেন।

খাড়াই দেয়ালের গায়ে এ জায়গাটা ছোটো একটা বারান্দামতন হয়ে রয়েছে। গুটিকয় ছোটো ছোটো ঝোপও গজিয়েছে এদিকওদিক। রঙ্গন আর রঞ্জার কাছাকাছি একটা ছোটো পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠে বসলেন জ্যোতির্ময়। তারপর পিঠের স্যাকটা খুলতে খুলতে নিজের মনেই বললেন, "সকালে তো নাগবস্তি থেকে ডঃ চৌধুরীকে খবর পাঠানো গেল না। এখন আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক, যদি সিগন্যাল পাই। কী বলিস?"

বলতে বলতেই স্যাক থেকে স্যাটেলাইট ফোনের হ্যান্ডসেটটা বের করে এনে সেটাকে চালু করে দিলেন জ্যোতির্ময়। তারপর ভুরু কুঁচকে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। বিশ্বনাথন চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন একপাশে। শয়তানি ঢালানের ঘটনাটার পর থেকেই আশ্চর্যরকম চুপচাপ হয়ে গেছেন মানুষটা।

"একটু দেখবে বিশ্বনাথন? নাগবস্তি পৌঁছোবার পর থেকেই ওতে কোন সিগন্যাল আসছে না।" বলতেবলতে যন্ত্রটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন জ্যোতির্ময়।

যন্ত্রটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন বিশ্বনাথন। যেন জীবনে প্রথমবার এমন কোন যন্ত্র দেখছেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, "এখান থেকে ওর সিগন্যাল আর কারো কাছে পৌঁছোবে না জ্যোতির্ময়।"

বলতেবলতেই সেটাকে তিনি ছুঁড়ে মারলেন নীচের দিকে।

"কী করলে তুমি বিশ্বনাথন?" বলে তাঁর দিকে ঘুরেই চমকে উঠলেন জ্যোতির্ময়। বিশ্বনাথনের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ একেবারে বদলে গেছে। শীতল, কুটিল চোখে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে পৌঁছে গেছি আমরা। আর চিন্তা নেই। এসো। তোমার কাজ শেষ।" বলতেবলতে একটুকরো পালকের মতই জ্যোতির্ময়ের শরীরটা মাথার ওপর তুলে ধরলেন তিনি।

"স্টপ অর আই শ্যুট," তীক্ষ্ণ গলায় পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণে কথাগুলো ভেসে আসতে ওপর দিকে ফিরে চাইল তারা সবাই। মাথার ওপরে ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে আসছিল ঘোড়াওয়ালা মুস্তাক। তার এক হাতে ঝিকিয়ে উঠছে আর্মি সাপ্লাইয়ের গ্লক ১৭-র ধূসর ব্যারেল। অন্যহাতে কোমর থেকে খুলে আনা লিকলিকে দড়িটার ফাঁস নিখুঁত লক্ষ্যে সে ছুঁড়ে দিল মানুষদুজনের দিকে।

বিশ্বনাথনের শরীরে তখন অসুরের শক্তি ভর করেছে যেন। এক হাতে জ্যোতির্ময়কে উঁচুতে তুলে ধরে অন্য হাতে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ছুটে আসা ফাঁসটাকে চেপে ধরেছেন তিনি। তীক্ষ্ণ, খনখনে গলার হাসিতে ফেটে পড়ছে নির্জন পাহাড়। চোখের পলকে ফাঁসটাতে হাত গলিয়ে ধরে একটা হ্যাঁচকা টানে মুস্তাককে টেনে নিয়ে অন্যহাতে জ্যোতির্ময়কে জড়িয়ে ধরে তিনি ঝাঁপ দিলেন পাহাড়ের দেয়াল ছেড়ে নিচে ছড়িয়ে থাকা রিঙ্গানের ওপরে।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বাতাসে ভেসে উঠল রঞ্জা আর রঙ্গনও। শিকারী পাখির মত ঝাঁপ দিল পাক খেয়ে নীচের দিকে ধেয়ে যাওয়া শরীরতিনটের দিকে। হ্রদের জল ছোঁবার মুহূর্তে তাঁদের পাশে গিয়ে পৌঁছোল তারা। তারপর, শক্ত হাতের বাঁধনে তিনজনকে ধরে নিয়ে হাউইয়ের মতন ফের উঠে আসতে লাগল খানিক আগের সেই বারান্দামতো জায়গাটার দিকে।

****

জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা অজ্ঞান শরীরগুলোর দিকে একনজর দেখে নিয়ে নীচু গলায় রঞ্জা বলল, "বাবা আর মুস্তাকের জ্ঞান ফেরা রঙ্গন, আমি একবার বিশ্বনাথনকাকাকে দেখছি।"

বলতে বলতে বিশ্বনাথনের অজ্ঞান শরীরটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে একপাশে সরে গেল রঞ্জা। হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মাথার দুপাশে হাত ছুঁইয়ে ধ্যানস্থ হল সে।

মুস্তাক আর জ্যোতির্ময়ের জ্ঞান ফিরেছে ততক্ষণে। তাড়াতাড়ি করে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। রঙ্গন তাঁদের কাঁধ ধরে ফের শুইয়ে দিল মাটিতে, "একটু অপেক্ষা করতে হবে। দিদি আসুক। তোর দেরি হবে দিদি?"

চোখ খুলে তার দিকে ফিরে তাকাল রঞ্জা। মুখে হাসি, "চিন্তা নেই। সিচ্যুয়েশান আন্ডার কন্ট্রোল।"

বিশ্বনাথনের জ্ঞান ফিরে এসেছে। রঞ্জার কোল থেকে মাথা উঁচিয়ে তিনি দুর্বল গলায় বললেন, "এটা কোন জায়গা? আমি-আমার কী হয়েছিল? দুশমনী ঢালানে-"

তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে রঞ্জা হাসল, "আর ভয় নেই কাকা। দুশমনী ঢালানে যে আপনার মনকে দখল করেছিল, পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাবার পর সে বিদেয় হয়েছে। হয়ত আর তার থাকবার প্রয়োজন নেই মনে করেছিল। আপনি এখন আমার আশ্রয়ে আছেন। আর সে আপনাদের কারো কোন ক্ষতি করতে পারবে না–"

তারপর মুস্তাকের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "মিস্টার আহমেদ, আপনার আসল পরিচয় আমরা জানি। আপনি আমাদের বন্ধু। আপনার মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন তার সময় নয়। বিশ্বনাথনকাকাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি বাবাকে নিয়ে গিরিসংকট পাড় হয়ে যত তাড়াতাড়ি পারবেন উল্টোদিকের রামবাসা গ্লেসিয়ারের ওপর নেমে আসুন। রঙ্গন আপনাদের সাহায্য করবে। আমি এগিয়ে যাব। দেরি করবেন না।"

বলতেবলতেই রঞ্জার হাতের আঙুলগুলো দ্রুত নড়াচড়া করছিল বিশ্বনাথনের কপালে। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে এল মানুষটার শরীর। গভীর ঘুমে ঢলে পড়ছিলেন তিনি। শয়তানি ঢালানে সেলিমকে ছেড়ে জিভা তাঁর মনকে দখল করেছিল। সেই থেকে বড়ো যন্ত্রণা পেয়েছেন তিনি। সেইসব স্মৃতি এইবার মুছে যাবে তাঁর মন থেকে।

মুস্তাক কোন কথা বললেন না। খানিক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এই ছেলেমেয়েদুটো আসলে কারা তিনি তা জানেন না। মানুষ নয় সম্ভবত। এইখানে একটা গোপন যুদ্ধ চলেছে। তার

রীতিনীতি তাঁর পরিচিত কোন লড়াইয়ের সঙ্গে মেলে না, যেমন মেলে না তার যোদ্ধাদের অতিমানবিক ক্ষমতাগুলো। খবরগুলো তাড়াতাড়ি আর্মি বেস-এ পাঠানো প্রয়োজন। সাহায্য দরকার হবে। কিন্তু--সম্ভবত এই এলাকাটা থেকে কোন বেতার সংকেত বাইরে বের হয় না। ডঃ সেনের স্যাটফোন তো নাগবস্তির পর থেকেই সিগন্যাল পাচ্ছিল না। জ্যামার? এমন কোন পরিস্থিতির আন্দাজ করেই কি তাহলে–

--ধীরে ধীরে কবজিতে বাঁধা রিস্টব্যান্ডের প্যানিক বাটনটায় কয়েক সেকেন্ড বাদ দিয়ে দুবার মৃদু চাপ দিলেন তিনি। তারপর জ্যোতির্ময়কে নিজের পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। রঙ্গন এগিয়ে এসে তাঁর হাতটা ধরল। সঙ্গেসঙ্গেই নিজের শরীরের ওজনটা কমে এল মুস্তাকের। পা দুটো মাটিকে ছুঁয়ে আছে শুধু। চাপ দিচ্ছে না। পিঠের ওপর ঝুলন্ত মানুষটাও একেবারেই ভারহীন যেন। কাদা আর নুড়িপাথরে ঢাকা ঢালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় উঠে যাচ্ছিলেন তাঁরা গিরিসংকটের চূড়ার দিকে। ভরহীন পায়ের হালকা ছাপ পড়ছিল শুধু নরম কাদামাটির বুকে।

সেইদিকে একনজর দেখে নিল রঞ্জা। রঙ্গন দক্ষভাবে সাহায্য করে চলেছে মুস্তাককে। অতটুকু ভাইটা তার–এখনও দুষ্টুমি আর তার সঙ্গে খুনশুটির শেষ নেই। বকুনি চড়চাপড়ও কম খায়না তার কাছে। সে আজ কেমন দিব্যি বড়োদের মত–

-একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের মনটাকে তাদের ওপর থেকে সরিয়ে আনল সে। পাহাড়ের ওপাশে এই মুহূর্তে কী ঘটে চলেছে তার একটা পরিষ্কার আন্দাজ রয়েছে তার। চার হাজার বছর অন্তর, তাদের জেগে ওঠবার দিনটায় আরো তিনবার তা দেখেছে সে। অথচ সে দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনটার কত তফাৎ!

আর দেরি করা যায় না। ঘুমন্ত বিশ্বনাথনকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে হাতদুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে বাতাসে ভেসে উঠল সে। তারপর ছিলেছাড়া তিরের মতই বাতাস বেয়ে ধেয়ে গেল গিরিসংকটের চূড়া ছাড়িয়ে তার উল্টোদিকে।

****

সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমান শ্রীনগর এয়ারপোর্টের মাটি ছুঁয়ে স্থির হতেই তার কাছে দুটো জিপ ছুটে এল। বিমানের সিঁড়ির মুখে মানুষটি দেখা দিতেই সার বেঁধে দাঁড়ানো সৈনিকেরা অভিবাদন জানাতে শুরু করেছে। তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সিঁড়ি থেকে নেমে জিপের দিকে যেতে যেতে শীতল মহাজন তাঁর দিকে এগিয়ে আসা মানুষদুজনের দিকে ফিরে বললেন, "আর কোন খবর?"

রাঠোরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল, "না ম্যাডাম। আজ সকালে ডঃ চৌধুরির ফোনে ডঃ জ্যোতির্ময়ের দৈনিক রিপোর্ট না পৌঁছোবার খবর পেয়ে আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী গরুড় কম্যান্ডো ফোর্সের দফতরে জরুরি সতর্কতা সংকেত পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আপনি নিজে-এইভাবে দিল্লি ছেড়ে এত কম সময়ের মধ্যে এখানে ছুটে আসবেন-"

তাঁর কাঁধে হাত রেখে শীতল মহাজন বললেন, "ওয়েল ডান রাঠোর। বাকি কাজটা গরুড় কমান্ডো ফোর্স সামলাবে। আপনার কাজ শেষ। আপনি ফিরে যেতে পারেন।"

অভিবাদন করে নিজের জিপের দিকে ফিরে যেতে থাকা রাঠোরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য মানুষটির সঙ্গে তাঁর জিপে উঠে বসলেন শীতল মহাজন। একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে জিপটা লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল কংক্রিটের টারম্যাক ধরে।

"রিপোর্ট উইং কমান্ডার মেহতা।"

ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে হাতের ট্যাবটা চালু করতে করতে বয়স্ক মানুষটি বলে উঠলেন, "হ্যালের চারটে 'ধ্রুব' ক্লাস হাই অলটিচুড অ্যাটাক হেলিকপটার সশস্ত্র অবস্থায় লেহ্ বিমানবন্দরে ওড়বার জন্য তৈরি। আজ সকালে জ্যোতির্ময়ের রিপোর্ট আসা বন্ধ হবার সঙ্গেসঙ্গেই কুড়িজন প্যারাট্রুপার কমান্ডোর একটা টিমকে এয়ারফিল্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। উড়াণপথে রামবাসা দ্রুততম গতিতে আধ ঘন্টার পথ। লেফটেন্যান্ট আহমেদের কাছ থেকে কোন প্যানিক সিগন্যাল এলে ঠিক দু মিনিটের মধ্যে টিম এয়ারবোর্ন হবে ম্যাডাম। এই যে ম্যাপটা দেখুন-"

"ধন্যবাদ উইং কমান্ডার" হাতে ধরা ট্যাবের পর্দার দিকে দেখতে দেখতে শীতল মহাজন অন্যমনস্কভাবে বলে উঠলেন। আর ঠিক তক্ষুণি ঝনঝন করে বেজে উঠল মেহতার হাতে ধরে থাকা টেলিফোনটা। সেটা কানে লাগিয়ে একটু শুনলেন তিনি। তারপর চাপা গলায় কিছু নির্দেশ দিয়ে এদিকে ফিরলেন আবার, "লেফটেন্যান্ট

মুস্তাক আহমেদের এসওএস সিগন্যাল রিসিভ করেছে শ্রীনগরের মিলিটারি টেলিকম নেটওয়ার্ক।। চপারগুলো একে একে এয়ারফিল্ড ছাড়ছে এখন। উইশ দেম ওয়েল ম্যা'ম।"

****

"প্ল্যানটা ঠিকমত বুঝেছিস তো রঙ্গন?"

"বুঝেছি, বুঝেছি। এত বারবার বলতে হবে না তোকে।" রঙ্গনের হাসি হাসি চিন্তাটা ভেসে এল রঞ্জার মাথায়। সংকেতগুলো দুর্বল। মাঝে বিরাট উঁচু গিরিসংকটটা বাধা সৃষ্টি করছে কিছুটা। এখনো গিরিসংকটের ও'পিঠেই রয়েছে রঙ্গনরা।

"গুড। এবার তাড়াতাড়ি আয়।"

"হচ্ছে দাঁড়া। যতটুকু তাড়তাড়ি হয়।"

যোগাযোগ বন্ধ করল রঞ্জা। রামবাসার এপাশের আইসফলের গা ঘেঁষে সে এখন উড়ে চলেছে হিমবাহের বুকের দিকে। সেখানে, বরফের বুকে মাথা জাগিয়ে থাকা গোল পাথরের চাঁইটার পাশে দীর্ঘকায় মানুষটা দাঁড়িয়ে। গভীর মনোযোগ দিয়ে তার ফাটলের গায়ে হাতের মুদ্রার সংকেত করে চলেছেন। রঞ্জা এসে নামতে কাজটা করতেকরতেই বললেন, "স্বাগতম রেনি।"

"অভিবাদন হে জিভা।"

"এই মানুষটিকে সঙ্গে করে এনেছ কেন? তোমার মানুষ সঙ্গীদের তো গিরিসংকটের ওপারে মৃত্যু হবার কথা।"

রঞ্জা সতর্ক হল। জ্যোতির্ময় ও মুস্তাককে নিয়ে বিশ্বনাথন খাদে ঝাঁপ দেবার সঙ্গেসঙ্গেই বিশ্বনাথনের সঙ্গে মানসিক সংযোগ ছিন্ন করেছিলেন জিভা। তার পরের ঘটনাবলীর ওপর নজর না রেখে তিনি নিজের কাজে ডুবে গিয়েছেন।

"কারণ ইনি এবং অন্যেরা আপনার কাজে আসবে বলে আমার মনে হয়েছে। আমি এঁদের বাঁচিয়েছি। অন্য দুজনকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যাং এখন এইদিকে আসছে।"

"কেন? কী কাজে আসবেন এঁরা আমার?"

"এঁদের মধ্যে দু'জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং তৃতীয়জন এই উপমহাদেশের সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অধিনায়ক। আমাদের দুজনের স্মৃতির সঙ্গেসঙ্গে এদের স্মৃতি নিষ্কাশন করলে তা, মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের পক্ষে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।"

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন জিভা। রঞ্জা তার মনের ভেতর গড়ে ওঠা আতংকের শিরশিরানিটাকে কোনমতে আড়াল করছিল। রামবাসা গিরিসংকটের মাথায় নড়াচড়া করা বিন্দুতিনটের দিকে তার নজর আটকে রয়েছে। দ্রুতবেগে এদিকে নেমে আসতে আসতে বড়ো হয়ে উঠছিল বিন্দুগুলো। সেইদিকে ফিরে হাতদুটি ওপরের দিকে তুললেন জিভা। সঙ্গেসঙ্গেই মানুষ তিনজন মাটি ছেড়ে বাতাসে ভেসে উঠেছে। তিরবেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তারা।

দেখতে দেখতে জ্যোতির্ময় ও মুস্তাককে নিয়ে এসে তাদের কাছে বরফ ছুঁল রঙ্গন। গোল পাথরের দিকে ফিরে ফের একবার আঙুলের ইশারা করলেন জিভা। শিসের মত শব্দ উঠছে পাথরের ফাটলটা থেকে। উজ্জ্বল আলোর একটা ধারা সেখান থেকে বের হয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঝরে পড়ছিল। তাদের ঘিরে গড়ে তুলছিল একটা অস্বচ্ছ শক্তির দেয়াল। সূর্যের আলো মৃদু হয়ে আসছিল।

রঙ্গন এসে রঞ্জার পাশে দাঁড়াল। একপাশে বরফের ওপরে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত বিশ্বনাথনের পাশে বসে পড়েছেন জ্যোতির্ময় আর মুস্তাক। জিভা জ্যোতির্ময়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার চোখে চোখ রাখলেন, আর তারপরেই একটা বিস্ময়ের শব্দ করে উঠে ফিরে তাকালেন রঞ্জাদের দিকে। তাঁর হাতের আঙুলের ইশারায় পাথরের গায়ের ফাটলটা থেকে উজ্জ্বল কয়েকটা আলোকরশ্মি এসে রঙ্গন আর রঞ্জাকে ঘিরে ধরেছে তখন।

সেদিকে তাকিয়ে মুখে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল জিভার। এগিয়ে এসে তাদের কপালে দুটো আঙুল ঠেকিয়ে একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আশ্চর্য একটা পরিবর্তন আসছিল দুই ভাইবোনের মুখে। আলোকতন্তুর বাঁধনে তারা নড়াচড়া করতে পারছে না তখন। স্থির হয়ে থাকা পাথরের মূর্তির মত মুখদুটোতে আলো নিভে গেছে। তাদের চোখ উপচে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছিল গাল বেয়ে।

"তোমাদের সম্পূর্ণ চেতনা ফিরিয়ে দিলাম র‍্যাং ও রেনি। নিজেদের পরিচয় এইবার পুরোপুরি জানতে পেরেছ তোমরা। মানুষের সন্তান, হাঃ। আমাদের কারখানায় তৈরি দুটো যন্ত্রমস্তিষ্ক। এর বেশি কোন পরিচয় নেই তোমাদের।"

র‍্যাং নামের ছোট্ট ছেলেটার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল একবার। কান্নাভেজা গলাটা তার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল চারপাশে-"বাবা- না, ওর কথায় তুমি বিশ্বাস করবে না কিছুতে। আমি আর দিদিভাই তোমাদের ছেলেমেয়ে বাবা। আমরা তোমার-"

হা হা করে হেসে উঠলেন জিভা। যন্ত্রমস্তিষ্কের এই বিচিত্র আচরণ তাঁকে ভারী আনন্দ দিচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। খানিক পরে তিনি বললেন, "কষ্ট হচ্ছে, তাই না? এইটুকু শাস্তি তোমাদের প্রাপ্য ছিল। আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করে চলেছ তোমরা। নিজেদের মনের ওপরে সুরক্ষাবর্ম তৈরি করে রেখেছ এখনও।"

"না জিভা না। আমরা কিছুই গোপন করিনি। আমরা আপনার সৃষ্টি। আমরা-"

"গোপন করোনি? জ্যোতির্ময়ের স্মৃতি তাহলে মিথ্যে বলছে আমায়? তাছাড়া--ওরা কারা?"

বলতেবলতেই ঘরের দেয়ালে ভেসে উঠেছে বাইরের আকাশের ছবি। সেখানে পাথরটাকে ঘিরে পাক খেয়ে চলেছে ভারতীর সেনাবাহিনীর চারটে সশস্ত্র হেলিকপটার।

"কী করে ওরা এই জায়গার সন্ধান পেল? কী করে তোমাদের সঙ্গেসঙ্গেই এখানে এসে হাজির হল তার জবাব দাও। কী ভেবেছিলে তোমরা? এই গ্রহের কয়েকটা আদিম যন্ত্র দিয়ে আমার মহড়া নেবে? এই পরিকল্পনাকেই তাহলে লুকিয়ে রেখেছিলে তোমরা তোমাদের মস্তিষ্কে? রেনি ও র‍্যাং শ্রেণীর যন্ত্রমস্তিষ্কেরা এতটা মূর্খ হতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। তবে হ্যাঁ। এই তিনজন মানুষকে আমার কাছে জীবিত অবস্থায় পৌঁছে দিয়ে তোমরা আমার সুবিধেই করে দিয়েছ। প্রাথমিক যেটুকু আভাস পেয়েছি তাতে এদের পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি আমার কাজে আসবে। বিপজ্জনকভাবে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে চলেছে এরা। আমাদের হিসেবের চেয়ে বহুগুণ বেশি গতিতে। এদের স্মৃতি এইবার মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করবে।"

খানিক বাদে রঞ্জা যখন কথা বলল, তখন আশ্চর্য শান্ত শোনাচ্ছিল তার গলা, "আপনি আমাদের ভুল সন্দেহ করেছেন জিভা। মুস্তাক নামে লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখুন। এর কাছে একটা যন্ত্র আছে। সে যন্ত্রটা আপনার সুরক্ষাবলয়ের প্রতিরোধ ভেঙে বেতার সংকেত পাঠাতে সক্ষম। এদের সেনাবাহিনীর কাছে খবর আমি পাঠাইনি জিভা। পাঠিয়েছে ওই লোকটা।"

একটু থমকে গেলেন জিভা। তারপর এগিয়ে এসে মুস্তাকের বাহু থেকে তার রিস্টব্যান্ডটা খুলে নিয়ে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখলেন একবার। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "একে দিয়েই শুরু হোক তবে–"

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই মুস্তাক গিয়ে আছড়ে পড়ল গোল পাথরটার গায়ে। পাথরের ফাটল থেকে বের হয়ে আসা স্মৃতিনিষ্কাশকের ধাতব নল একটা সাপের মত হিলহিল করে এগিয়ে যাচ্ছিল তার মাথা লক্ষ করে--

"রঙ্গন–ধর–"

তীব্র মানসিক চিৎকারটা রঙ্গনের সাথে সাথে জিভার মাথাতেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বুঝি। চমকে ঘুরে তাকাতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সদ্য জেগে ওঠা দুটো পূর্ণশক্তির যন্ত্রমনের অপ্রত্যাশিত আক্রমণের সামনে তাঁর একলা প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে সময় নিল না বেশি।

মুস্তাকের পাশে তাঁর শরীরটা আছড়ে পড়বার সঙ্গেসঙ্গেই রঞ্জার হাতের ইশারায় ধাতব নলটার মুখ ঘুরে গিয়ে জিভার মাথার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। একজটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করেই শরীরটা এলিয়ে পড়ল তাঁর--

ধ্যানস্থ ভাইবোনের সমস্ত মনোযোগ তখন কেন্দ্রীভূত হয়েছে স্মৃতিনিষ্কাশক যন্ত্রের দিকে। বহু সহস্রাব্দি ধরে সঞ্চিত জিভার জ্ঞানভান্ডার হাতড়ে চলেছিল তারা কিছু নির্দিষ্ট তথ্যের সন্ধানে--

"দিদিভাই, আমাদের বাঁধন কেমন করে খুলতে হবে আমি তা এখন জানি। এই দ্যাখ--"

পাথরের গোলকের দিকে মুখ ফিরিয়ে আঙুলের কয়েকটা সংকেত করল রঙ্গন। সঙ্গেসঙ্গে অদৃশ্য হল তাদের ঘিরে রাখা আলোর জাল।

"বেশ। হাতে সময় নেই বেশি আর। জিভার চেতনা ফিরে আসবার আগে আমাদের কাজ শেষ করে নিতে হবে। তুই ওর দিকে খেয়াল রাখবি। আমি কয়েকটা দরকারি কাজ সেরে নিই প্রথমে।"

বলতে বলতেই রঞ্জার আঙুলের ইশারায় জেগে উঠল গোলকের শরীরের ফাটল। একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ জানিয়ে দিল, নতুন মালিকের আদেশ পালন করতে সে তৈরি। অবোধ্য যান্ত্রিক ভাষায় দ্রুত কথা বলে চলেছিল

রঞ্জার হাতের আঙুল। গোলকের সম্প্রচার ব্যবস্থা তখন তার প্রতিবেদনকে ছুঁড়ে দিচ্ছে দেশকালের সীমা পেরিয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সম্মিলিত গ্রহমণ্ডলের প্রধান কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফের সাড়া জাগল তার মস্তিষ্কে। জবাব আসছে। মাথা ঠান্ডা করে জবাবি সংকেতটা শুনছিল রঞ্জা। তার ঠোঁটে তখন বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠেছে।

ঠিক তখনই একটা তীব্র যন্ত্রণায় তার মস্তিষ্ক অবশ হয়ে এল যেন। ঢলে পড়তে পড়তে সে তাকিয়ে দেখল, মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে রঙ্গনও। আর তার পেছন থেকে ধীরে ধীরে চোখ খুলে উঠে বসছেন জিভা।

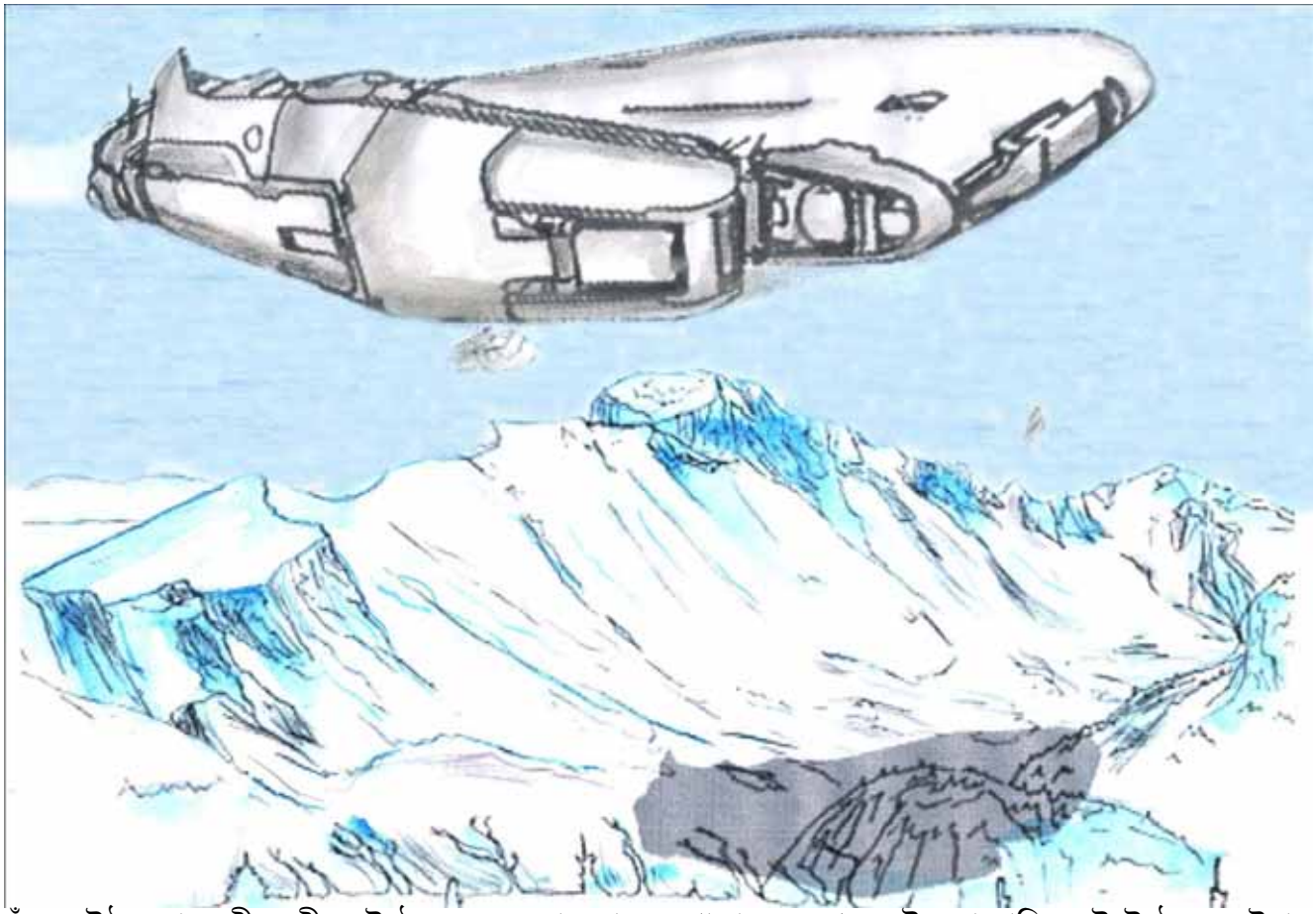
নড়াচড়ার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল তার। উঠে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন জিভা, "আমার স্মৃতিকে জেনেছ তোমরা, কিন্তু আমার শক্তি তোমরা কেড়ে নিতে পারোনি। এইবারে এর জন্য শুধু তোমরা নও, শাস্তি পাবে ওই উড়ুক্কু আক্রমণকারীরাও। শাস্তি পাবে এই গোটা গ্রহটাই। তবে তার আগে প্রথমে কয়েকটা কাজ সেরে নিতে হবে।

তাঁর হাতের ইশারায় তখন সরে গেছে চারপাশের শক্তির ঘেরাটোপ। হঠাৎ করেই চঞ্চল হয়ে উঠল চারটে হেলিকপটার। রোটরের গর্জন তুলে অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক পোকাদের মত তারা ছুটে আসছিল পাথর ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে। তাদের শরীরের নীচে রকেট লঞ্চার জেগে উঠেছে। গাঢ় কমলা রঙের আগুনে ধোঁয়া উগড়ে গোলাকার পাথরটার দিকে ছুটে আসছিল একাধিক উড়ুক্কু বোমা।

জবাবে পাথরের দিকে ঘুরে কয়েকটা সংকেত করলেন জিভা। হেলিকপটার চারটে শূন্যে স্থির হয়ে গেছে। শক্তিশালী রোটরগুলোর তীব্র ঘুর্ণনও তাদের একচুল নড়াতে পারছে না আর। নীল আকাশের পটভূমিতে স্থিরচিত্রের মত ভেসে রয়েছে চারপাশ থেকে ছুটে আসা ক্ষেপণাস্ত্রগুলোও।

"পার্থিব মানুষ, মৃত্যুর আগে জিভার প্রতিশোধের দৃশ্য দেখাব আমি তোমাদের। আমার দুই যন্ত্রদাস যাকে বাঁচাতে চেয়ে আমার হুকুম অমান্য করেছিল প্রথমে তার শাস্তির পালা-" বলতেবলতেই জিভার একটা হাত ঘুরে এসে জ্যোতির্ময়ের দিকে নির্দেশ করল। আস্তে আস্তে বাতাসে ভেসে উঠল জ্যোতির্ময়ের শরীরটা। তীব্র যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে যাচ্ছিলেন তিনি।

তাঁকে সেই অবস্থাতেই রেখে জিভা এইবার মুখ ফেরালেন রঞ্জার দিকে। আর তারপরেই ভ্রুদুটো একটু



কুঁচকে উঠল তার। ধীরে ধীরে উঠে বসেছে রঞ্জা। তার যন্ত্রণাকাতর মুখে একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছে। এইবার নিঃশব্দে আকাশের দিকে ইশারা করল সে। সেখানে তখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে একটা অতিকায় মহাকাশযানের শরীর। তার গায়ে সম্মিলিত গ্রহপুঞ্জের নিশানা ঝলমল করছিল পড়ন্ত রৌদ্রের আলোয়–

****

হেলিকপটারগুলো ফিরে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। গত দু ঘন্টা সময়ের কোন স্মৃতিই আর অবশিষ্ট নেই তাদের আরোহীদের মস্তিষ্কে। হয়ত কেউ কেউ তাদের মধ্যে অবাক হবে হারিয়ে যাওয়া খানিকটা সময়কে নিয়ে। তবে এ গ্রহের বিজ্ঞান এখনো তাকে প্রশ্ন করবার মত জায়গায় পৌঁছোয়নি। একটা হিমবাহের ধূ ধূ বুকে গোলাকার একটা নিরীহ পাথরের ছবি ছাড়া আর কিছুই তারা পৌঁছে দিতে পারবে না তাদের সামরিক প্রভুদের কাছে।

বাতাসে স্থির হয়ে ভেসে থাকা আসনটিতে বসা বৃদ্ধ মানুষটি তাদের দিকে ইশারা করলেন, "রেনি ও র‍্যাং, তোমরা আমার কাছে এস।"

তাঁর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল দুই ভাইবোন। তারপর মাথা তুলে বলল, "রেনি আর র‍্যাং নয়, আমরা রঞ্জা আর রঙ্গন নামেই পরিচিত হতে চাই মহামান্য।"

"অদ্ভুত অনুরোধ," মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ। তবে জারাফা গ্রহের ধাতুতস্করদের সমস্ত অপরাধের প্রমাণ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তোমরা সম্মিলিত গ্রহপুঞ্জকে যে সাহায্য করেছ তার বিনিময়ে এই অনুরোধটুকু মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। জারাফা গ্রহ যথাসময়ে এই গ্রহকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে। তবে তা ছাড়াও, তোমরা দুজন এই সেবার জন্য কিছু পুরস্কারের দাবিদার হয়েছ। কী চাও বল।"

জবাবে তারা দুজন উঠে গিয়ে ঘুমন্ত জ্যোতির্ময়কে ঘিরে বসল। সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে বৃদ্ধ বললেন, "একটা আদিম গ্রহের আদিম জীবের সঙ্গে বেঁচে থাকতে চাও তোমরা। বেশ, তাই হবে। তবে তার জন্য একটা মূল্য দিতে হবে যে! তোমাদের মস্তিষ্কে সঞ্চিত নক্ষত্র সভ্যতার সমস্ত স্মৃতি মুছে দেয়া হবে। এই গ্রহের দুজন সাধারণ আদিম মানুষ হয়ে এরপর থেকে বেঁচে থাকতে হবে তোমাদের। ভেবে দেখ। তোমাদের মত দুটি দক্ষ যন্ত্রমস্তিষ্ককে হারানো আমাদের কছে বিরাট ক্ষতি।

জ্যোতির্ময়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে ততক্ষণে। দু'হাত বাড়িয়ে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর দুই ছেলেমেয়েকে। রেনি আর র‍্যাং নামের যন্ত্রদুটি এইবার ফের নতুন করে জড়িয়ে ধরল তাদের বাবাকে। তারপর নিচু গলায় বলল, "আমরাও ঠিক তাই চাই মহামান্য।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সৈনিককে উদ্দেশ্য করে ইশারায় কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর, একটা আলোর ধারা নেমে এসে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল মাথার ওপরে অপেক্ষায় থাকা সেই বিরাট যানের খোলা দরজার দিকে। তিনজন মানুষ আর দুই জৈবযন্ত্রের চোখে তখন ঘুম নেমে এসেছে। সৈনিকটির হাতে ধরা ছোট্ট একটা যন্ত্র তাদের মস্তিষ্ক থেকে মুছে দিচ্ছিল সমস্ত অপ্রয়োজনীয় স্মৃতিকে। তার বদলে সেখানে গড়ে উঠছে কিছু কৃত্রিম স্মৃতি। কয়েকটা দিনের পাহাড়ভ্রমণের নকল একটা গল্প। নক্ষত্রমণ্ডলের সভ্যতার খবর পাবার সময় এখনো হয়নি এ গ্রহের বুদ্ধিমান জাতির। কিছুকালের মধ্যে তারা নিজেরাই উপযুক্ত হয়ে নিজেদের ক্ষমতায় সদস্য হয়ে উঠবে গ্যালাক্সিজোড়া সেই সভ্যতার–

সম্মিলিত গ্রহপুঞ্জের মহাকাশযান থেকে নেমে আসা তীব্র আলোকধারার আঘাতে তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল বিরাট পাথরের গোলক। এ গ্রহের গভীরে গড়ে ওঠা মূল্যবান খনিজ নিষ্কাশণের স্বয়ংক্রিয় কারখানাগুলোও নিঃশব্দে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে তখন।

****

"বাবা।"

"কে, রঞ্জা? ক'টা বাজে বল তো?"

"সাড়ে সাতটা বাজে। কিন্তু বাইরে এসে দ্যাখো একবার! কী সুন্দর, কী সুন্দর–"

জ্যোতির্ময় বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সূর্যের সোনালী আলো ধুইয়ে নিচ্ছে আদিগন্ত ছড়ানো সেই বিশাল হিমবাহকে। দূরে রামবাসা গিরিসংকটের গায়ের আইসফলটা রক্তের রঙ ধরেছে প্রথম সূর্যের আলোয়।

খানিক দূরে বিশ্বনাথন তখন মুস্তাককে ধরে বিজ্ঞানের কিছু একটা জটিল তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। তার মুখে অসহায় হাসি লেগে আছে একটা। জ্যোতির্ময় এগিয়ে গেলেন সেদিকে, "কী হে মুস্তাক? আজ পড়াশোনা কতটা এগোলো?"

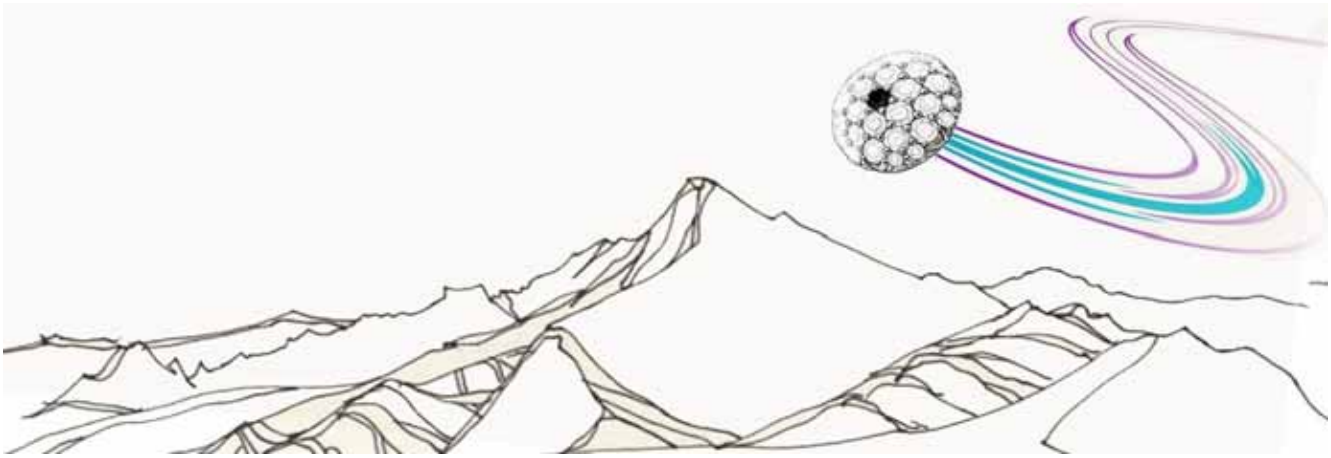
মুস্তাক করুণ মুখে ঘাড় নাড়ল শুধু একবার।

“আর বেশিদিন এর হাতে কষ্ট সহ্য করতে হবে না তোমায়। ডেরাডান্ডা গোটাও। এবার ফিরতে হবে। বুনো হাঁসের পেছনে ছুটে এতদূর এসে পাওয়া গেল শুধু ফাঁকা একটা হিমবাহ।”

মুস্তাক হেসে মাথা নাড়ল, “না স্যার। এই রামবাসা হিমবাহে আমরাই প্রথম এসে পৌঁছেছি। সেইটা একটা ভালো কৃতিত্ব। তাছাড়া আপনাদের মতন বন্ধু পেলাম–”

রঞ্জা আর রঙ্গন জ্যোতির্ময়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর হাত ধরে টানাটানি লাগিয়েছে দুজন, “ও বাবা, মাকে একটা খবর দিয়ে দাও না যে আমরা এবার ফিরছি! দুদিন ফোন করা হয়নি। জানোই তো কীরকম টেনশানে থাকে।”

জ্যোতির্ময়ের কাছে স্যাটেলাইট ফোনটা ফিরে এসেছে ফের। সেইটা খুলে নিয়ে তিনি তাতে বাড়ির নম্বরটা টাইপ করতে শুরু করলেন।



অলংকরণঃ দেবজ্যোতি, মৌসুমী



মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

১

ভুলুর দাঁত দিয়ে নখ চিবোবার অভ্যেস আছে। আমার পাশে বসে এখন ভুলু একমনে সেই কাজটাই করছে। এইমাত্র আউট হয়ে এসে শুধু গ্লাভস আর হেলমেটটা খুলেছে। মারাত্মক টেনশনে আছে বলে প্যাড খোলেনি। নখ চিবোতে চিবোতেই আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় ভুলু বলল, শেষ ওভারে ছ'রান লাগে। হ্যাঁ রে চপ্পল, ম্যাচটা বেরোবে তো রে ?

আমার নাম মোটেই চপ্পল নয়, চপল। কিন্তু হতচ্ছাড়া ভুলু কিছুতেই সে নামে ডাকবে না আমাকে। মেজাজটা তিতকুটে হয়ে গেল ভুলুর কথায়। ঠোঁট উল্টে বললাম, জানি না। তুই নিজে ওভাবে আউট হয়ে এলি কেন? তোর উচিত ছিল ম্যাচটা বের করে আনা।

ভুলু খেপচুরিয়াস হয়ে বলল, তুই আমাকে উচিত-অনুচিত শেখাস না চপ্পল। আমি তো তাও হাফ সেঞ্চুরি করে এসেছি কিন্তু তুই তো ডবল ডিজিটেই যেতে পারিস নি। শূন্য করে ওই খাজা বোলারটার বলে বোল্ড হয়ে ফিরে এসেছিস। এখন আবার বড় বড় ধ্যানের বুলি ঝাড়ছিস ?

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, যে বলে আউট হয়েছি সেটা কী বিরাট স্যুইং করল তুই বিশ্বাস করবি না !

ভুলু বলল, স্যুইং না তোর মুন্ডু ! সোজাসাপটা ফুলটস বলে আড়াআড়ি ব্যাট চালিয়ে বোল্ড হয়ে গেলি। একটু সেট না হয়ে কেউ ওভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ব্যাট চালায় কখনও ?

আমি রেগে গিয়ে বললাম, তুই তো সেট করে গিয়েছিলি। বাঁ-হাতি স্পিনারটার লাস্ট ওভার চলছিল। খামোখা বোলারটাকে স্টেপ আউট করতে গেলি কেন ?

ভুলু বলল, দোতলার সমান ফ্লাইট দিচ্ছিল বোলারটা। ওই বল স্টেপ আউট না করাটাই অপরাধ হত।

আমি বললাম, সেই দোতলা ফ্লাইটেই তো বোকার মতো স্টাম্পড হয়ে ফিরে এলি। তোর একটু ধৈর্য দেখিয়ে ম্যাচটা বের করে আনা উচিত ছিল। তাহলে শেষ ওভারে তমাল আর বাপ্পার ঘাড়ে চাপ পড়ত না। ওরা আমাদের টেলএন্ডার। ওই দৈত্যের মতো পেসারটার এক ওভারে ছ'রান তোলা কি ওদের কম্ম ?

সবুজ সংঘের প্রেসিডেন্ট সনাতন সাঁতরা টেনশানে পায়চারি করছিলেন। সনাতনকাকুর ছোটভাই খেলাপাগল লোক, আজ সকালেই মাঠে আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম অনিকেত সাঁতরা। তিনি আমাদের পাশে বসে ম্যাচ

দেখছিলেন। অনিকেতকাকু আমাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা এখন ঝগড়া করলে টিম স্পিরিট নষ্ট হবে। ভেবো না, আমার মন বলছে ওরা দুজন ঠিক ম্যাচ জিতিয়ে আনবে। ভুলু কড়া চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বলল, চপ্পল, আজ ম্যাচ যদি না জিততে পারি তবে আমি কিন্তু তোকে ধুইয়ে ছাড়ব বলে দিলাম।

আমার আর ভুলুর ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে রাসেল, বাবু, পিন্টু, টিংকু, মিঠুরা। প্রত্যেকের মুখেই ফেটে পড়ছে টেনশান। মহীতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ফাইনাল ডেথ ওভারে এসে পৌঁছেছে। ভুটানের রয়্যাল ওয়ারিয়রস প্রথমে ব্যাট করে করেছিল একশো পঁয়ত্রিশ। আমরা রান তাড়া করতে গিয়ে উনিশ ওভারে একশো ত্রিশে এসে দাঁড়িয়েছি। স্বভাবতই উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি সকলে।

প্রথম বল গুড লেংথে পড়ে তমাল নড়ার আগেই উইকেটকিপারের হাতে পৌঁছে গেল। আমি জলের বোতল হাতে ছুট দিলাম পিচের দিকে। তমাল দেখলাম ঠোঁট চাটছে বারবার। আমি বললাম, কী রে, কিছু অসুবিধে হচ্ছে ?

তমাল নার্ভাস গলায় বলল, এত জোরে বল বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যাট আনার সময় পর্যন্ত পাচ্ছি না। আমার চোখটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি রিফ্লেক্সটাই নষ্ট হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি সাহস যোগাবার জন্য তমালকে ভোকাল টনিক দিতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম রয়্যাল ওয়ারিয়রসের ক্যাপ্টেন কিছু বলল আম্পায়ারকে। সম্ভবত সে কারণেই আম্পায়ার এগিয়ে এসে তাড়া দিলেন আমাকে। আমি জলের বোতল হাতে প্যাভিলিয়নের দিকে ছুট দিতে দিতে বললাম, চোখ বুঁজে ঠাকুরের নাম নিয়ে ব্যাট চালা তমাল। আজ করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

ওভারের দ্বিতীয় বল তমাল বোধ হয় ঠাকুরের নাম নিয়েই ব্যাট চালাল। ব্যাটের একদম কোনায় লেগে বল চলে গেল পিছনের সাইটস্ক্রিনের দিকে। ডিপ থার্ডম্যানের ফিল্ডারের হাত থেকে বল ফেরত আসতে আসতে দৌঁড়ে দুটো রান নিয়ে নিল বাপ্পা আর তমাল।

দর্শকদের চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেই খচর মচর শব্দ কানে এল। চোখ ফিরিয়ে দেখি রাসেল একটা গ্লুকোজের প্যাকেট খুলে মুখে ঢালছে। বিরাট হাঁ-য়ের মধ্যে সাদা সাদা গ্লুকোজের গুঁড়ো ঢুকে পড়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ নাকি মুখ হাঁ করে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। রাসেলের মুখের ব্যাসও দেখলাম খুব ছোট নয়। নিমেষের মধ্যে পুরো প্যাকেটের গ্লুকোজ গলায় ঢেলে দিয়ে ফাঁকা প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাসেল। আমি ধমকে বললাম, শুধু শুধু গ্লুকোজ খাচ্ছিস কেন ?

রাসেল বিব্রত মুখে বলল, ভীষণ টেনশান হচ্ছে রে। তুই তো জানিস টেনশান হলে আমার খিদেটা বেড়ে যায়। খেলার মাঠে গ্লুকোজ ছাড়া আর তো খাবার মতো কিছু নেই, কী খাব বল ?

আমি রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। অনিকেতকাকু ইশারায় আমাদের চুপ করে যেতে বললেন। আসলে এখন এমন একটা পরিস্থিতি যে এই তুচ্ছ ব্যাপারে চেঁচামেচি করা শোভা পায় না। রাগটাকে বাধ্য হয়ে গিলে ফেলে মাঠের দিকে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

তমাল আবার অন্ধের মতো ব্যাট হাঁকড়াল। এবার তমালের ব্যাটে বল লাগেনি। লেগেছে গ্লাভসে। ডেথ ওভারে ফিল্ডাররা একটু দূরে দূরে। বাপ্পা দৌড়ে চলে এসেছে এদিকে। তমাল হাঁচোর পাঁচোর করে ছুট লাগাল ননস্ট্রাইকিং এন্ডে। স্কোরবোর্ডে যোগ হল আরও একটা রান।

চতুর্থ বল শর্টপিচ বাউন্সার। বাপ্পা মুখ সরানর সময় পায়নি। বল এসে লেগেছে হেলমেটে। ব্যাট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল বাপ্পা। আমি আর পিন্টু দুজন জলের বোতল আর ব্যথা কমাবার স্প্রে নিয়ে ছুট দিলাম পিচের দিকে।

বাপ্পাকে টেনে তুললাম। হেলমেট খুলে ফেলেছে, চোখ পিটপিট করছে বাপ্পা। মাথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে না, ফুলেও যায় নি কোথাও। বড়সড় চোট নয় দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পিন্টু ওর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, বাপ্পা, আর দুটো বল বাকি। একটা বাউন্ডারি চাই তোর ব্যাট থেকে। তুই কাপটা শুধু এনে দে আমাদের। সন্ধেবেলা ভবেশদার দোকানে তোকে পেট পুরে চিকেন কাটলেট খাওয়াব।

বাপ্পা আমাদের দিকে ভোম্বলের মতো তাকিয়ে বলল, আপনারা কারা ? আমি এখানে এলাম কীভাবে ?

পিন্টু ভুরু কুঁচকে বাপ্পাকে জরিপ করতে করতে বলল, তুই কি আমাদের সঙ্গে মজা করছিস নাকি ? এটা কি ফাজলামির সময় ?

বাপ্পা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মজা করব কেন ? আমি নিজের নাম, বাবার নাম কিছুই মনে করতে পারছি না যে। সত্যি বলছি।

দুজনে বেকুবের মতো বাপ্পার দিকে তাকিয়ে আছি। তমালও ঘাবড়ে গেছে কান্ড দেখে। শুকনো গলায় বলল, মাথায় বল লেগে কি বাপ্পার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল ?

ভুটানের প্লেয়াররা ঘিরে রেখেছে আমাদের। আমাদের কথাবার্তার কিছুই আঁচ করতে পারেনি ওরা। ওদের ক্যাপ্টেন বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে আম্পায়ারের কাছে গিয়ে আবেদন জানাল। আম্পায়ার একটু দূরে ছিলেন, এগিয়ে এসে কড়া গলায় আমাকে আর পিন্টুকে মাঠ ছাড়তে বললেন। আমরা দু'জন পায়ে পায়ে ফিরে এলাম বাউন্ডারি লাইনের এপারে।

রি

পিন্টু নিচু গলায় বলল, কী হয়ে গেল বল দেখি ! এখন বাপ্পার বাড়িতে কী জবাব দেব আমরা ?

আমি পিন্টুকে ফিসফিস করে বললাম আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। বাপ্পাকে সন্ধেবেলা ওঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে। দেখা যাক উনি কী বলেন।

আমি আর পিন্টু নিচু স্বরে কথা বলাবলি করছিলাম। স্টেডিয়ামের দর্শকদের তুমুল চিৎকারে সকলে ঘাড় ঘোরালাম মাঠের দিকে। ওভারের প'ম বল করতে আসছে ভুটানের সাংঘাতিক বোলারটা। ভুলু, বাবু, রাসেলরা বাপ্পার অবস্থা জানে না। তাই ওরা চেঁচাচ্ছে, ছক্কা, ছক্কা !

পিন্টু আমার পাশে দাঁড়িয়ে আবছা গলায় বলল, এত কাছে এসেও জেতা হল না। ওদিকে বাপ্পার মাথাটাও গেল। এখন যে কী হবে !

ওভারের প'ম বল আবার বাউন্সার দিয়েছে পেস বোলারটা। আবার লেগেছে বাপ্পার মাথায়। মাথা থেকে নীল হেলমেট খুলে ছিটকে গিয়েছে পিচের বাইরে। মাথা ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে বাপ্পা।

জলের বোতল আর পেন রিলিফ স্প্রে হাতে আমি আর পিন্টু আবার ছুটলাম পিচের দিকে। ততক্ষণে ননস্ট্রাইকার তমাল হেলমেটটা কুড়িয়ে এনে ফেরত দিয়েছে বাপ্পার হাতে। আমরা সামনে যেতেই বাপ্পা একদম স্বাভাবিক গলায় জলের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "দে জলটা দে। ভয় পাস না, আমার কিচ্ছু হয়নি।"

পিন্টু কী একটা বলতে যাচ্ছিল, বাপ্পা খানিকটা জল খেয়ে বোতলটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "আগের বলটা মাথায় লেগে কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল সব। কিন্তু এই বলটা মাথার ওই একই জায়গায় লাগায় সব আবার মনে পড়ে গিয়েছে। টেনশান করিস না, আমি একদম ঠিক আছি। শেষ বলে এসপার কি ওসপার ব্যাট চালাচ্ছি। যদি কানেক্ট করে দিতে পারি তবে কেল্লা ফতে!"

আমি আর পিন্টু গুটিগুটি ফিরে এসেছি। আমি বললাম, "ব্যাপারটা কী হল বল তো?"

চিন্তিত মুখ করে পিন্টু বলল, "হিন্দি ছবিতে দেখিস না মাথায় বড়সড় আঘাত লেগে নায়ক সবকিছু ভুলে যায়, আবার একই জায়গায় চোট পেলে সব পুরনো স্মৃতি ফিরে আসে ? এটাও মনে হচ্ছে সেরকম ব্যাপার।"

আমি বললাম, "যাহ্, এরকম হয় নাকি !"

পিন্টু বলল, "হয় রে হয়। শেক্সপিয়ার কী বলেছিল মনে নেই ? সেই যে - দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ হোরাশিও .. । মানে এমন অনেক কিছুই ঘটে যার কোনও ব্যাখ্যা নেই।"

আমি মুখটা বাংলার পাঁচ করে বললাম, "খেলার মাঠে শেক্সপিয়ার কপচাচ্ছিস কেন ? ইংরেজিতে হায়েস্ট মার্কস পাস বলে কথায় কথায় ইংরেজি বুলি ফোটাস। তাই না?"

পিন্টু চুপ করে গেল। ওদিকে দর্শকদের চিৎকারের পারদ বাড়ল। ঝগড়া থামিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি বাপ্পা স্টান্স নিয়েছে। ওভারের শেষ বল করতে ভুটানের দীর্ঘদেহী বোলারটা এসে পড়েছে আম্পায়ারের ঘাড়ের কাছে।

প্রচন্ড গতির বল গুড লেংথে পড়েছিল। আবার মাথায় লাগতে পারত বাপ্পার। কিন্তু বলটা মাথায় লাগেনি, লেগেছে বাপ্পার ব্যাটে। বাপ্পা হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাট চালিয়ে দিল। ব্যাটের ঠিক জায়গায় বল লাগলে একটা মিঠে শব্দ হয়। সেই মিষ্টি শব্দটা কানে এল এত দূর থেকেও। লাল বলটা স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারির উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

রাসেল, টিংকু, মিঠু ভুলুরা সব ছুটল মাঠের দিকে। সকলে বাপ্পাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে এল আমাদের টেন্টে। দর্শকরা ছুটে এসেছে আমাদের তাঁবুতে। বাপ্পাকে জড়িয়ে ধরছে সকলে। খুশিতে মাখামাখি বাপ্পার মুখচোখ। বাপ্পা পিন্টুকে জড়িয়ে ধরে বলল, সন্ধেবেলা ভবেশদার দোকানে চিকেন কাটলেট খাওয়াবি বলে কথা দিয়েছিলি, সেটা মনে আছে তো?

পিন্টু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, "যত খুশি কাটলেট খা তুই। আমরা ট্রোফি জিতেছি সেটায় যতটা না আনন্দ হচ্ছে তোর যে মাথার গোলমালটা সেরে গেছে সেটায় আরও বেশি আনন্দ হচ্ছে।"

পুরস্কার বিতরণ শুরু হল। ভুলু হল ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। বাপ্পাকে একটা স্পেশাল প্রাইজ দিলেন টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তারা। উইনার্স কাপ নেওয়ার জন্য আমাকে মঞ্চে ডাকতেই হইহই করে টিমের বাকিরা উঠে পড়ল মঞ্চে। সবুজ সংঘের বেশ কিছু হাফ প্যান্ট পরা স্কুলপড়ুয়া সমর্থক ছিল মাঠে। তুবড়ি আর রংমশাল নিয়ে এসেছিল তারা। সেসব

পোড়ানো হল যথেচ্ছ। বিরাট কাপ সামনে রেখে গ্রুপ ফোটো তুললাম সকলে। সনাতনকাকু হেসে বললেন, "আমার ভাই অনিকেত তোমাদের কিছু বলতে চায়।"

অনিকেতকাকু স্মিতমুখে বললেন, "আমি পুলিশ সার্ভিসে আছি। আমার পোস্টিং এখন রংঝুরি থানায়। সেখানে দুর্দান্ত একটা টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে গতবার থেকে। গতবার বাঘা বাঘা সব টিম খেলে গিয়েছে ওখানে। রংঝুরির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একটু আগেই মোবাইলে কথা হয়েছে আমার। সামনের মাস থেকে শুরু হচ্ছে রংঝুরি টি-টোয়েন্টি। ওরা তোমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে খেলার জন্য।"

পিন্টু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "আমাদের ডেকেছে ওরা ? "

অনিকেতকাকু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। কী, তোমরা খেলতে আসবে তো রংঝুরিতে?"

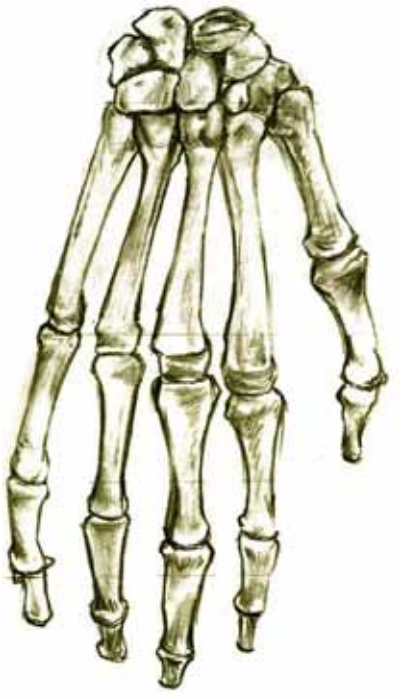
আমরা একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে দিলাম। অনিকেতকাকু হাসলেন, "গুড দেন।"

সনাতনকাকু পাশ থেকে বললেন, "শুধু প্লেয়াররা যেতে চাইলেই তো হবে না, কর্মকর্তাদেরও মতামত নিতে হবে। কাল একটা সাধারণ সভা ডাকতে হবে ক্লাবে। সেখানেই রংঝুরি যাওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব আমরা।"

উৎসাহে ঠান্ডা জল পড়ায় আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল একটু। সনাতনকাকু সেটা লক্ষ করে বললেন, "কালকের কথা কালকে। আজ ফাইনালে জিতেছ, আগে সেটার তো জমিয়ে সেলিব্রেশন করতে হবে। কাপ জেতার অনারে আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে তোমাদের সকলের নেমন্তন্ন। কী হল, খুশি তো তোমরা?"

সনাতনকাকু ব্যায়ামের চর্চা করেন এখনও। এই বয়সেও খাজা কাঁঠালের মতো মাসল, গুলি পাকানো জবরদস্ত চেহারা। নিজে যেমন খাদ্যরসিক তেমনি খাওয়াতেও ভালবাসেন। ওঁর বাড়ির নেমন্তন্ন মানে এলাহি ব্যাপার। সেখানে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কিছুই বাদ যায় না। ওদিকে রাসেলও যাকে বলে ভোজনরসিক। এক সাধুবাবার দেওয়া জড়িবুটি খেয়ে খিদে বেড়ে গেছে রাসেলের, আজকাল সব সময় পেটে ব্রহ্মা খাইখাই করছেন। আমরা কিছু বলার আগেই রাসেল চিৎকার করে উঠল, "খুউউশি ! "

২



সনাতনকাকুর বিশাল ছাদে খেতে খেতে গল্প হচ্ছে এলেমেলো। শুধু রাসেল কথা বলছে না, একমনে খেয়ে চলেছে। পরোটা দিয়ে পাঁঠার মাংস হল ওর প্রিয় মেনু। তাই কথা বলে সময় নষ্ট না করে রাসেল লেগে পড়েছে মাংস-পরোটার সৎকারে।

আমি অনিকেতকাকুর পাশে বসেছি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের আশপাশ দিয়ে। বিয়ে করেননি। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, ছিপছিপে মেদহীন চেহারা। ওঁকে বললাম, তখন সনাতনকাকুর মুখে শুনলাম আপনি নিজে এককালে ভাল ক্রিকেটার ছিলেন।

অনিকেতকাকু ঘাড় নেড়ে বললেন, "খুব খারাপ খেলতাম না। কলকাতা ফার্স্ট ডিভিশনে খেলেছি অনেকদিন। কিন্তু পুলিশের চাকরিতে ঢুকে আমাকে ক্রিকেট ছাড়তে হল। তবে ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসাটা কিন্তু থেকেই গিয়েছে। অফিসের একটা কাজে জলপাইগুড়ি এসেছিলাম দু'দিনের জন্য। আজ দাদার টিমের ফাইনাল ম্যাচ আছে শুনে সব কাজ ফেলে মাঠে গিয়েছিলাম খেলা দেখতে।"

বাবু বলল, "আমাদের খেলার স্ট্যান্ডার্ড কেমন বুঝলেন?"

অনিকেতকাকু বললেন, "দ্যাখো, আমি বলব যথেষ্ট ভাল করছ তোমরা। আরও একটু যদি লেগে থাকো, আমার বিশ্বাস একদিন তোমাদের এখান থেকেও দারুণ দারুণ প্লেয়ার বেরোবে।"

টিংকু দুঃখ করে বলল, "আমরা ডুয়ার্সের যেসব জায়গায় খেলে বেড়াই সব এলেবেলে টুর্নামেন্ট। কিন্তু সত্যিকারের উঁচু লেভেলের প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে খেলে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করে নেবার সুযোগ জোটেনি কখনও।"

অনিকেতকাকু হেসে বললেন, "বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়তে চাইলে তোমাদের রংঝুরিতে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলতে যেতে হবে।"

রাসেল পাঁঠার মাংসের হাড় চুষতে চুষতে বলল, "রংঝুরি জায়গাটার নাম তো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।"

অনিকেতকাকু বললেন, "ডুয়ার্স আর ভুটান যেখানে এসে মিশেছে রংঝুরি হল সেখানে। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট এক জনপদ। খুব কাছেই অসম সীমান্ত। ছবির মতো জায়গা। একদিকে যেমন পাহাড় আর নদী রয়েছে তেমনি রয়েছে

চা-বাগান আর গভীর জঙ্গল। যে লোক জীবনে কখনও কবিতা লেখেনি সে-ও মনে হয় কবিতা লিখে ফেলবে রংঝুরিতে গেলে।"

তমাল আগ্রহী হয়ে বলল, "রংঝুরি টি-টোয়েন্টিতে কোন কোন টিম এসেছিল গতবার ? "

অনিকেতকাকু বললেন, "সিকিম, ভুটান, দার্জিলিং, অসম থেকে টিম এসেছিল। এবার পটনা থেকেও একটা টিম আসবে খেলতে। প্রাইজ মানিও বাড়িয়ে করা হয়েছে এক লক্ষ টাকা। সেজন্য বলছিলাম রংঝুরিতে খেলতে গেলে তোমাদের একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হবে।"

মিঠু জানতে চাইল, "ওখানে খেলতে গেলে খরচের ব্যাপারটাও তো কম নয়, তাই না?"

অনিকেতকাকু বললেন, "থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব আয়োজকদের। তবে টুর্নামেন্টের এনট্রি-ফি পাঁচ হাজার টাকা। এদিকে আবার যাতায়াত খরচটা অংশগ্রহণকারী দলকে বহন করতে হবে, সেটাই নিয়ম। রংঝুরি জায়গাটা একটু রিমোট, তাই গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে তোমাদের। সে খরচটাও কম হবে না।"

ভুলু চওড়া হেসে বলল, "ট্রোফি জিততে পারলে সেই টাকা দিয়েই সব খরচ মিটিয়ে দেওয়া যাবে। কী বলিস চপ্পল?"

আমি গলায় বিরক্তি মিশিয়ে বললাম, "শুনলি তো কী সব টিম খেলবে রংঝুরিতে। ওখানে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কি মুখের কথা নাকি?"

অনিকেতকাকু বললেন, "চপল ঠিকই বলেছে। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এদিকে যেসব টিমের সঙ্গে খেলে অভ্যস্ত তোমরা তার তুলনায় অনেক রাফ অ্যান্ড টাফ টিমের সঙ্গে খেলতে হবে ওখানে।"

তমাল বলল, "কঠিন টিমের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নেবার মধ্যেই তো মজা। বড় জোর হারব। কিন্তু জানতে পারব আমরা ঠিক কতটা যোগ্য।"

অনিকেতকাকু সায় দিয়ে বললেন, "এটা একদম ঠিক কথা বলেছ। "

সনাতনকাকু হাসলেন, "এবার ভাল জায়গাতেই পোস্টিং হয়েছে তোর। ওখানে ক্রাইম-টাইম কিছু নেই, তোর কাজের চাপও নেই। খেলাধুলো নিয়ে বেশ আছিস। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে থাকতে কবিতাও লিখতে শুরু করেছিস হয়তো। তাই না রে?"

অনিকেতকাকু বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ক্রাইম নেই এরকম জায়গা ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রংঝুরি এমনিতে ঠান্ডা জায়গা। চুরি-ডাকাতি নেই বললেই চলে। তবে কয়েক মাস হল কিছু কিছু গোলমেলে ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে শান্তশিষ্ট রংঝুরিতে।"

সনাতনকাকু কৌতূহলী স্বরে বললেন, "কী রকম গোলমেলে ব্যাপার শুনি?"

অনিকেতকাকু বললেন, "এর মধ্যে কবর খুঁড়ে একটা ডেডবডি চুরি হয়েছে। ওদিকে আবার শ্মশানে দাহ করতে আসা একটা বেওয়ারিশ লাশও গায়েব হয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু যোগসূত্র আছে বলেই সন্দেহ করছি আমরা। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সে ব্যাপারেই আমাকে তলব করে একটা রিপোর্ট চেয়েছিলেন। শান্তশিষ্ট রংঝুরিতে তলে তলে একটা হাড়বাজার চলছে বলে সন্দেহ করছে প্রশাসন।"

সনাতনকাকুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "হাড়বাজার ? সে আবার কী জিনিস ? "

অনিকেতকাকু বললেন, "ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলি। গত দুশো বছর ধরে দুনিয়ার ডাক্তারি বাজারে হাড় জোগানের কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিল আমাদের ভারতবর্ষ। ১৯৮৫ সালে ভারত সরকার মানুষের দেহাবশেষের ব্যাবসানিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। ফলে দুনিয়া জুড়ে কঙ্কালের জোগান মুখ থুবড়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে পশ্চিম পৃথিবী চিন আর পূর্ব ইওরোপের দ্বারস্থ হয়েছিল।"

আমরা মন দিয়ে অনিকেতকাকুর কথা শুনছি। অনিকেতকাকু বললেন, "কিন্তু ওরাও ভারতের মতো এত হাড়ের জোগান দিতে পারল না। আসলে ভাল করে কঙ্কাল পালিশ করে, জোড়গুলোকে ঠিক মতো বেঁধে জোগান দেওয়ার দক্ষতা সব দেশের নেই। তাই ওই নিষেধাজ্ঞার পরও এই ব্যবসাটা যে আমাদের দেশ থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে সেটা মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং এখন চোরাপথে অনেক বেশি দামে রমরমিয়ে এই ব্যাবসা চলছে।"

সনাতনকাকু বললেন, "কীভাবে এই ব্যাবসা চলছে?"

অনিকেতকাকু বললেন, "এখনও কিছু হাড় ব্যবসায়ী সেই চেনা রুটেই ব্যাবসা করে চলেছে। এরা মৃতদেহ চুরি করিয়ে কিংবা বেওয়ারিশ লাশ জোগাড় করে মাংস আর হাড় আলাদা করে কঙ্কালগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছে ডিলারদের কাছে। তারা সেই কঙ্কালগুলোকে পালিশ করে জোড় লাগিয়ে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। এভাবে চোরাপথে কিছু লোক কামিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি ডলার।"

সনাতনকাকু বললেন, "কী বলছিস তুই! রংঝুরির মতো জায়গাতেও কি এই র‍্যাকেট তলে তলে কাজ করতে শুরু করেছে?"

অনিকেতকাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আঁচ করছি সেটা। কিন্তু কোনও প্রমাণ এখনও হাতে আসেনি। সেজন্য আমরা চোখ কান খোলা রাখছি। ইনফরমার লাগিয়েছি, নিজেরাও তল্লাশি করছি যেখানে সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু এখনও সেই অন্ধকারেই রয়েছি।"

ভুলু ভয়ে ভয়ে বলল, "আমরা ওখানে খেলতে গিয়ে বিপদে পড়ব না তো আবার?"

অনিকেতকাকু বললেন, "তোমরা ওখানে খেলতে যাবে, শুধু খেলা নিয়ে ভাববে। এসব জিনিস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জন্য পুলিশ আছে। রংঝুরি টি-টোয়েন্টির মতো ঝলমলে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ কিন্তু প্রতিদিন তোমাদের কাছে আসবে না। ওখানে ভাল পারফর্ম করতে পারলে তোমাদের নাম ছড়িয়ে যাবে সারা রাজ্যে। এমনকী, ভিনরাজ্যের প্লেয়াররাও তোমাদের চিনে ফেলবে একডাকে। কী, কেমন হবে সেটা?"

সনাতনকাকু বললেন, "ঠিক আছে, কাল তো ক্লাবের সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে। কাল আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে এ ব্যাপারে।"

৩



সন্ধেবেলা সবুজ সংঘের ক্লাবঘরে এত চিৎকার চেঁচামেচি চলছে যে কান পাতাই দায়। ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য তো আছেই, গবাদাদু, ডাকুকাকু, হিগিনজেঠুরা সকলে আছেন মিটিংয়ে। আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট টলিউডের বিখ্যাত হিরো সৈনিকের বাবা সনাতন সাঁতরা। আজকের মিটিংয়ের আজেন্ডা অবশ্য একটাই। সবুজ সংঘের ফান্ড এখন ম্যালেরিয়ায় ভোগা রুগির মতো দুর্বল। এই অবস্থায় ক্লাবকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা রংঝুরিতে খেলতে যাব কিনা। সেটা নিয়েই আজকের সভা।

সনাতনকাকু আমাকে প্রথমে বলতে বললেন। আমি বললাম, গত কয়েক বছর ধরে জলপাইগুড়ির বাইরে ডুয়ার্সের এদিকে ওদিকে কিছু টুর্নামেন্ট খেলে ট্রোফি জিতেছি কিছু। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বাইরের দলগুলোর সঙ্গে খেলে শক্তি পরীক্ষা করা হয়নি নিজেদের। আমাদের প্রত্যেকেই তাই রংঝুরিতে আন্ডার নাইনটিন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলতে যাবার জন্য মুখিয়ে আছে।

হিগিনজেঠুর ছোটবেলা থেকে সাধ ছিল জাঁদরেল ব্যারিস্টার হয়ে কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে কোর্টে জজসাহেবকে মুগ্ধ করে দেবেন। কিন্তু বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও আইন পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তাই ওকালতিকে পেশা হিসাবেও নেওয়া হয়নি। সেই দুঃখ থেকেই সম্ভবত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কালো কোট গায়ে দিয়ে থাকেন হিগিনজেঠু। আজও কালো প্যান্টের সঙ্গে কালো কোট পরে রয়েছেন। এমনিতেই হিগিনজেঠুর গায়ের রং বেজায় কালো। ক্লাবঘরের মৃদু আলোতে কালো কোটপ্যান্ট পরা হিগিনজেঠুকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

হিগিনজেঠু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, রংঝুরিতে গিয়ে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করে আসার যে ইচ্ছে প্লেয়ারদের হয়েছে তাতে দোষ নেই। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। প্রথমত টুর্নামেন্টের এনট্রি ফি হল পাঁচ হাজার টাকা। রংঝুরিতে রেলস্টেশন নেই, ওই রুটে বাস-টাসও চলাচল করে না। কাজেই সেখানে যেতে গেলে একটা গাড়ি রিজার্ভ করতে হবে আমাদের। এমনিতেই এখন সবুজ সংঘের ভাঁড়ে মা ভবানী ওদিকে টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে হাতির খরচ। কাজেই আমি এত গন্ডা টাকা খরচ করে রংঝুরিতে যাবার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

দিনবাজারে ঢোকার ঠিক মুখটায় ডাকুকাকুর কবিরাজি দোকান। ডাকুকাকুর বাবা দক্ষিণারঞ্জন আয়ুর্বেদাচার্য নামী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আর নেই, তাঁর অবর্তমানে ডাকুকাকুই এখন রুগি দেখেন। বিভিন্ন গাছের পাতা আর শিকড় বেটে ওষুধ দেন। সেসব পাঁচন খেলে রোগ সারে কিনা জানা নেই, তবে অন্নপ্রাশনের ভাত যে উঠে আসে তাতে সন্দেহ নেই। সকাল থেকে রাত অবধি ভিড় থাকে ওঁর চেম্বারে। সেটা অবশ্য রুগির ভিড় নয়, আড্ডা মারতে আসা বয়স্ক লোকজনের ভিড়।

ডাকুকাকু বললেন, রংঝুরিতে জঙ্গল আছে যখন তখন মশার উপদ্রব আছে নিশ্চয়ই। সেখানে খেলতে গেলে ছেলেদের কালাজ্বর, ডেঙ্গু কিংবা চিকুনগুনিয়া একেবারে অবধারিত। তাছাড়া ওটা পাহাড়ি এলাকা। এই শীতের মধ্যে ওখানে গেলে ঠান্ডা লেগে হুপিং কাশিও হতে পারে। পিলেজ্বর বাধিয়ে আসাও বিচিত্র নয়। সবুজ সংঘের রংঝুরিতে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারটা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ভাবলে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

গবাদাদুর বাবা রামমাণিক্য শিরোমণি ছিলেন এই শহরের বিশিষ্ট জ্যোতিষী। গবাদাদু নিজে ছিলেন স্কুলমাস্টার। অবসর নেওয়ার পর শখে জ্যোতিষচর্চা করেন। একটা চেম্বারও খুলেছেন কদমতলার মোরে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী মেলে না বলে লোকজন বড় একট আসে না। গবাদাদু বললেন, সবুজ সংঘের সামনে এখন একটা কেমদ্রুম যোগ আছে। এখন রংঝুরিতে খেলতে গেলে প্রথম ম্যাচেই গোহারান হেরে ফিরে আসতে হবে আমাদের। তবে যজ্ঞ করে মন্দ দশাটা কাটিয়ে নিলে টিম চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরবে।

সনাতনকাকু অবাক হয়ে বললেন, শব্দকল্পদ্রুম শুনেছি। কেমদ্রুম তো কখনও শুনিনি। সেটা আবার কী ?

পাশ থেকে ডাকুকাকু ঠোঁট উল্টে বললেন, গবাবাবুর বাবা রামমাণিক্য শিরোমণি ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী। যা বলতেন অক্ষরে অক্ষরে মিলত। কিন্তু গবাবাবু বাবার থেকে কিছুই পাননি। সেজন্য ওঁর কথায় অত গুরুত্ব দেবেন না সনাতনবাবু। ওঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ অবধি কখনও মেলেনি।

গবাদাদু রুষ্ট গলায় বললেন, কেন ? কোন ভবিষ্যদ্বাণীটা মেলেনি শুনি ?

ডাকুকাকু মুখের একটা ভঙ্গি করে বললেন, কোনওটাই তো মেলেনি। খালপাড়ার গদাধর ঢোলের কেসটা একটু সমরণ করে দেখুন। গতবার গদাধর ভোটে দাঁড়িয়ে আপনার কাছে কোষ্ঠীবিচার করাতে গিয়েছিলেন। আপনি ভদ্রলোককে বলেছিলেন প্রচার আর জনসভা করে সময় নষ্ট না করে বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে। উনি নাকি জিতেই গেছেন একরকম। কিন্তু রেজাল্ট বেরোবার পর দেখা গেল গদাধর ঢোল শুধু হেরেছেন তাই নয়, ভদ্রলোকের জামানত জব্দ হয়ে গিয়েছে !

গবাদাদু বাধা দিয়ে বললেন, উঁহু, ঘটনাটা তা নয়। আসলে গদাধর ঢোল আমাকে জন্মসময় ভুল বলেছিল। কাজেই ভবিষ্যদ্বাণী না মেলাটা আমার দোষ নয়। গদাধরের দোষ।

ডাকুকাকু খুকখুক করে হেসে বললেন, উদাহরণ নম্বর দুই, পান্ডাপাড়া কালীবাড়ির হারু সাহা। বেচারি চায়ের দোকান চালায়, গরিব মানুষ। বছর দশেক আগে আপনি তার ঠিকুজি বিচার করে বলেছিলেন লটারি পেয়ে কোটিপতি হবার নাকি প্রগাঢ় সম্ভাবনা আছে তার। আপনার কথা শুনে লটারির টিকিট কাটা শুরু করেছিল হারু। গত দশ বছর ধরে লটারির টিকিট কেটে ফতুর হয়ে গেল বেচারি। কোটি টাকা তো দূর, একশো টাকাও লটারিতে জেতেনি কখনও।

গবাদাদু পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে নাকে দুই টিপ নস্যি নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, জিতবে, জিতবে। বলেছি যখন তখন নিশ্চয়ই লটারি জিতবে। এসব কাজে অত তাড়াহুড়ো করলে চলে নাকি ? আরও দু'-দশ বছর যাক। তারপর মিলিয়ে নেবেন'খন।

ডাকুকাকু পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সনাতন সাঁতরা সবাইকে হাত দিয়ে থামতে ইশারা করে বললেন, হিগিনবাবুর কথা প্রসঙ্গে বলি, আমাদের প্লেয়াররা যখন এত আগ্রহ করে রংঝুরি টি-টোয়েন্টি খেলতে যেতে চাইছে তখন ওদের ইচ্ছেটাকে আমি দাম দিতে চাই। খরচ নিয়ে আপনাদের ভাবনার কিছু নেই। ওটা আমার দায়িত্ব। আমি এই মিটিংয়ে ঘোষণা করছি আমাদের সবুজ সংঘ রংঝুরি টি-টোয়েন্টি খেলতে যাবে। চপলই থাকবে টিমের ক্যাপ্টেন। টুর্নামেন্টে খেলতে যাওয়ার যাবতীয় খরচ আমার হনুমান কনস্ট্রাকশনস বহন করবে।

রাসেল আনন্দে লাফিয়ে পড়ল ভুলুর ঘাড়ে। ভুলু কঁকিয়ে উঠেও হাততালি দিয়ে উঠল খুশিতে। আমরাও সমস্বরে হৈ হৈ করে উঠলাম। রংঝুরি যাওয়াটা যে শেষ পর্যন্ত হতে চলেছে সেটা ভেবে এখন থেকেই আত্মহারা আমরা সকলে।

গবাদাদু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, একটা সমস্যা আছে সনাতনবাবু। আমি সারা রাত জেগে সবুজ সংঘের কোষ্ঠীবিচার করেছি। তাতে দেখেছি এক সর্বনাশা প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শনি সাংঘাতিক রকম কূপিত হয়ে রয়েছেন।

সনাতনকাকু তাকিয়ে আছেন গবাদাদুর দিকে। বললেন, সেই কূপিত শনিকে শান্ত করার কোনও উপায় আছে কি?

গবাদাদু খুব উৎসাহ নিয়ে বললেন, বিলক্ষণ আছে। শনিকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবুজ সংঘের জার্সির রং পাল্টে নীল করে দিতে হবে। আরও ভাল রেজাল্ট পেতে গেলে প্রত্যেকটা প্লেয়ার না হোক, অন্তত ক্যাপ্টেনকে নীলকান্ত মণির আংটি ধারণ করাবার ব্যবস্থা করুন।

ডাকুকাকু চোখ কপালে তুলে বললেন, নীলকান্ত মণির তো অনেক দাম !

গবাদাদু বললেন, নীলকান্ত মণির দাম একটু বেশি। তার অভাবে শ্বেত বেড়েলা বা নীল অপরাজিতার মূল দিয়েও কাজ চলতে পারে।

হিগিনজেঠু খাপ্পা হয়ে সনাতনকাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি ! সবুজ সংঘ তাদের বরাবরের সবুজ জার্সি ছেড়ে নীল জার্সি পরবে ? ক্যাপ্টেন হাতে আংটি পরে খেলতে নামবে ? এমন প্রস্তাব যিনি দিতে পারেন তাঁর মস্তিস্কের ভারসাম্য নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আই অবজেক্ট মি লর্ড !

গবাদাদু বাজখাঁই গলায় চেঁচালেন, নিকুচি করেছে আপনার অবজেকশানের। এই যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে ক্রমাগত এসে চলেছে তা আমাদের শরীরের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে তা জানেন? সেজন্য সঠিক রশ্মির বিকিরণকে গ্রহণ আর অপ্রয়োজনীয় রশ্মিকে বর্জন করাটা মানুষের পক্ষে কতটা জরুরি সেটা বোঝেন ? আমি বিচার করে দেখেছি নীল রংয়ের জার্সিই এখন সবুজ সংঘের প্রয়োজন। পাশাপাশি ক্যাপ্টেন নীলকান্ত মণি হাতে পরে থাকলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া একেবারে নিশ্চিত।

হিগিনকাকু মুখ ভেঙিয়ে বললেন, শুধু জার্সিতে হল না, এখন আবার আংটি নিয়ে পড়েছেন ? নীলকান্ত মণির মতো দামি আংটির জন্য কত টাকা খরচ হবে সেটা ভেবেছেন ?

সনাতন সাঁতরা দুজনকে চুপ করতে ইশারা করলেন। বললেন, ঠিক আছে, আমি কলকাতা থেকে এক্সপোর্ট কোয়ালিটির এক সেট জার্সি আনিয়ে নিচ্ছি নীল রংয়ের। আমার হনুমান কনস্ট্রাকশনসের লোগো থাকবে জার্সিতে। সব খরচ আমার কোম্পানিই দেবে। গবাবাবু, আপনি নীলকান্ত মণির আংটি বানিয়ে দিন চপলের জন্য। আর হ্যাঁ, আপনি কিন্তু যাবেন টিমের সঙ্গে।

গবাদাদু সম্মতি জানিয়ে দিলেন হাসিমুখে। সনাতনকাকু ডাকুকাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকেও যেতে হবে টিমের সঙ্গে। জ্বরজারি, সান্নিপাতিক, ওলাওঠা, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, পিলেজ্বর সবরকম রোগের প্রতিষেধক বানিয়ে নিয়ে যাবেন। প্লেয়ারদের যাতে রংঝুরিতে গিয়ে শরীর খারাপ না হয় সেটা দেখবেন আপনি। আপনার চিকিৎসার ওপর আমাদের অগাধ আস্থা।

ডাকুকাকু বেশ একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। হিগিনজেঠু মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেটা দেখে সনাতনকাকু বললেন, আপনি অভিজ্ঞ লোক, আইনকানুন সব আপনার নখদর্পনে। তাই আপনাকেও যেতে হবে টিম ম্যানেজার হয়ে।

হিগিনজেঠু খুশি হয়ে বসে পড়লেন। সনাতনকাকু বললেন, চপল, এখন কয়েকটা দিন তোমরা খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিস কর। রংঝুরিতে আমি নিজেও যাব তোমাদের সঙ্গে। আর হ্যাঁ, আমাদের টিম যে রংঝুরিতে যাচ্ছে সেটা জানিয়ে আজ রাতেই আমি অনিকেতকে ফোন করে দিচ্ছি।

মিটিং শেষ হয়ে গেল। আমরা এখনও বসে আছি। সনাতনকাকু অর্ডার মাফিক ভবেশদার দোকান থেকে গরম গরম ঘুগনি এসেছে শালপাতার দোনায় করে। রাসেল দু'প্লেট শেষ করে বড় একটা ঢেকুর তুলে বলল, নাহ্, আমাকে ডায়েট কনট্রোল করে ওজনটা কমাতে হবে এবার। মাঠে রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস খুব মার খাচ্ছে এই বাড়তি ওজনের জন্য।

তমাল খর চোখে রাসেলের দিকে তাকিয়ে বলল, ওজন কমানো নিয়ে যত আফশোস তোর বাড়ছে তত দেখছি তোর খাওয়াও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। শোন রাসেল, সাতদিনের মধ্যে যদি ডায়েট করে সাত কেজি ওজন কমাতে না পারিস তবে তুই টিম থেকে বাদ। নিজে তো রান আউট হচ্ছিস হচ্ছিস, উল্টোদিকের ব্যাটসম্যানকেও রান আউট করে দিচ্ছিস।

রাসেল আড়চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বলল, শুধু আমাকেই বলে চলেছিস। লাস্ট দশটা ম্যাচে দু'অংকের ঘরে যেতে পারেনি আমাদের ক্যাপ্টেন। তাকে তো তোরা কিছু বলছিস না ?

রাসেলের কথায় গা জ্বলে গেল। বললাম, আমি টিমের বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। রংঝুরি টি-টোয়েন্টিতে আমি শেষ দেখা দেখব। যদি রান করতে পারি তো ভাল, যদি না পারি তবে ক্রিকেট খেলাই ছেড়ে দেব।

বাপ্পা সিরিয়াস গলায় বলল, এই সপ্তাহ থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করতে হবে রে চপল।

জলপাইগুড়ির মধ্যে শুধু নয়, এই শহরের বাইরের মাঠেও অনেক ভাল ইনিংস খেলেছি একসময়। কিন্তু কী যে হয়েছে বেশ কিছুদিন হল রান করতে পারছি না। আত্মবিশ্বাস পুরো দুমড়ে গিয়েছে। আমি নিজেও জানি আমাকে ভাল পারফর্ম করতে হবে রংঝুরিতে নইলে মুখ দেখানো যাবে না কারও কাছে। আমি বললাম, কাল থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করে দেওয়া যাক। রংঝুরি টুর্নামেন্টের আর বেশিদিন বাকি নেই।

৪



হাসিমারায় গরম গরম পুরি আর মিষ্টি খেয়ে নিয়ে খিদেটা চাপা দেওয়া গিয়েছিল। হাসিমারা থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ এগোতেই মনে হল বাতাসের গন্ধই যেন বদলে গেল। মোবাইল ফোনের টাওয়ার চলে গেল একটুক্ষণ বাদে। সেই সঙ্গে চোখের সামনের দৃশ্যও দেখতে পেলাম বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। বিশাল এক অজগরের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথ। সেই সর্পিল পথ দিয়ে ওপরেরে দিকে উঠছে আমাদের বাস। এই জায়গাটা না সমতল, না পাহাড়। একদিকে ঘন সবুজ বনজঙ্গল, অন্যদিকে হরিয়ালি। চারদিকেই আবার গা ছমছমে ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড় ঘিরে রেখেছে আমাদের। দেখেই মন ভাল হয়ে যায়।

রংঝুরিতে এসে পড়লাম যখন তখন আড়াইটে বেজে গেছে। শীতের দুপুর, তাই দুপুরের হলদে রঙে বিকেলের ফিকে সোনালি ছাপ পড়ে গেছে ততক্ষণে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা। অনিকেত সাঁতরাও ছিলেন সেখানে। আমাদের দেখে হাত নেড়ে ওঁরা এগিয়ে এলেন।

বাস থেকে নামলাম আমরা সকলে। ধুতিপাঞ্জাবির ওপর শাল চাপানো গবাদাদু, জ্যাকেট পরা সনাতনকাকু আর সোয়েটার পরা ডাকুকাকুর পর সকলের শেষে নামলেন কালো কোটপ্যান্ট পরা হিগিনজেঠু। বাস থেকে আমাদের ক্রিকেট গিয়ার্সের পাশাপাশি নামানো হল ডাকুকাকুর বিশাল ট্রাঙ্ক। পাঁচন বানাবার জন্য বহুরকম গাছগাছড়ার পাতা আর শিকড় নিয়ে এসেছেন ট্রাঙ্কে করে।

অনিকেতকাকু জানতে চাইলেন, রাস্তায় আপনাদের কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?

ডাকুকাকু বললেন, এমনিতে সব ঠিকই আছে। কিন্তু এখানে মোবাইলের টাওয়ার আসছে না যে।

অনিকেতকাকু বিব্রতমুখে বললেন, রংঝুরির এই একটাই অসুবিধে। এখানে সেলফোনের টাওয়ার পাবেন না। তবে কাছেই এসটিডি বুথ আছে। কোথাও ফোন করার থাকলে ওখান থেকে করে নিতে পারেন।

সনাতনকাকু বললেন, হ্যাঁ রে, আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিস কোথায় ?

অনিকেতকাকু বললেন, চা-বাগানের গেস্ট হাউজে। তবে তুমি আমার কোয়ার্টারে থাকবে।

সনাতনকাকু একগাল হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, টিমের ছেলেরা থাকবে একখানে আর আমি থাকব অন্য জায়গায়, তা হবে না। ঠিক আছে, এরপর যদি কখনও একা আসি তবে তোর আস্তানায় কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাব নাহয়।

অনিকেতকাকু পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি ড্যানিয়েল ডুকপা। হি ইজ আ নাইস জেন্টেলম্যান। ইনি রংঝুরি ক্লাবের সেক্রেটারি।

ড্যানিয়েল ডুকপার মঙ্গোলয়েড ধাঁচের মুখ, বয়স ষাট-বাষট্টি হবে। বাদামি টুইডের জ্যাকেট আর কর্ডের ট্রাউজার পরে রয়েছেন। নমস্কারের একটা ভঙ্গি করে চোখ কুঁচকে হেসে বললেন, এখানে যত টিম খেলতে এসেছে তোমাদের সবুজ সংঘের গড় বয়েস সবচাইতে কম।

অনিকেতকাকু মজা করে বললেন, ওদের ছোটখাট চেহারা দেখে ভুল করবেন না মিস্টার ডুকপা। ওরা প্রত্যেকে এক একটা খুদে বাঘ। একবার মাঠে ছেড়ে দিন এদের। দেখবেন প্রত্যেকের বডি ল্যাংগুয়েজ কেমন বদলে যায়।

ড্যানিয়েল ডুকপা একটু হেসে ডানহাতের বুড়ো আঙুল তুলে আমাদের উইশ করে বললেন, অল দ্য বেস্ট।

কপালে লাল লম্বা টিপ পরা এক অবাঙালি ভদ্রলোক স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনিকেতকাকুর একপাশে। পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছর বয়স হবে। কিন্তু চেহারা একেবারে টানটান। ভদ্রলোকের গায়ের রং যাকে বলে দুধে আলতা। দাড়িগোঁফ নেই, মাথায় চুল একটু কম। সব মিলিয়ে চেহারার মধ্যে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে মানুষটার। তাঁকে দেখিয়ে অনিকেতকাকু বললেন, ইনি হলেন গগন সিংহানিয়া, রংঝুরি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। কয়েক পুরুষের বনেদি ব্যবসায়ী ওঁরা। ভদ্রলোকের একটাই নেশা। সেটা হল স্পোর্টস। খেলাধুলো ভালবাসেন খুব। ক্রিকেট হোক বা ফুটবল, রংঝুরির মাঠে কোনও ম্যাচই উনি মিস করেন না।

গগন সিংহানিয়া আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, তুমিই তো ক্যাপ্টেন। ভেরি গুড। শোনো, দার্জিলিং ডিনামাইট আজ সকালে এসে পড়েছে রংঝুরিতে। ওরা আগেও এখানে খেলে গেছে। বেশ ভাল টিম কিন্তু ওরা। কাজেই কালকের ম্যাচ জিততে চাইলে দারুণ খেলতে হবে তোমাদের। কাল আমিও মাঠে যাব খেলা দেখতে। গগন সিংহানিয়া সনাতনকাকুর সঙ্গে শেক হ্যান্ড করে বললেন, আজ সন্ধেবেলা কী করছেন আপনারা ?

সনাতনকাকু বললেন, তেমন কিছু নয়।

গগন সিংহানিয়া বললেন, তাহলে সন্ধেবেলা আমার গরিবখানায় আপনাদের চা খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল। সকলের সঙ্গে আলাপ হবে তখন।

রংঝুরি চা-বাগানের গেস্ট হাউজে আমাদের নিয়ে এলেন অনিকেতকাকু। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। দোতলা বাংলো ধাঁচের কাঠের বিল্ডিং। বিরাট বিরাট ঘর। দোতলার কাঠের রেলিং দেওয়া বারান্দায় এসে দাঁড়ালে চোখ জুড়িয়ে যায়। দু'-চোখ যতদূর যায় ততদুর পর্যন্ত সবুজ জঙ্গল আর নীল পাহাড় যেমন আছে, তেমনি রয়েছে রুপো রংয়ের টলটলে জলের এক পাহাড়ি নদী আর ছবির মতো সবুজ একটা চা-বাগান। ব্যাগ-ট্যাগগুলো ঘরে রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। সনাতনকাকু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, যেদিকে তাকাই শুধু শান্তি আর শান্তিই যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে।

অনিকেতকাকু মুখটা বাংলার পাঁচের মতো করে বললেন, আর শান্তি ! কী আর বলব, রাতের ঘুম চলে গেছে ক'দিন হল। খুব টেনশানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আজকাল। চাকরি বাকরি রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সনাতনকাকু বললেন, সে কী রে ! এই না সেদিন বলছিলি এমন নিরুপদ্রব জায়গা ভূভারতে নেই। তাহলে ?

অনিকেতকাকু একটা শ্বাস ফেলে বললেন, এতদিন ভালই চলছিল সব। কিন্তু গত সপ্তাহে কবর খুঁড়ে আরও একটা লাশ চুরি হয়েছে। কাউকে ধরতে পারিনি। মিডিয়ায় খবরটা বেরোবার পর ওপরমহল থেকে ডিটেল রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। সেসব নিয়ে বড় ঝামেলায় আছি। তাছাড়া এই রংঝুরি জায়গাটা সীমান্ত এলাকা হওয়াতে ভুটানি টাকাও চোরাপথে ভারতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে একটা অসাধু চক্র। যেহেতু ভুটানের টাকার দাম আমাদের থেকে কম, ভারতের অর্থনীতি মার খাচ্ছে সেজন্য। সব মিলিয়ে পুলিশের রাতের ঘুম নেই। শান্তি-টান্তি উবে গিয়েছে বিলকুল।

সনাতনকাকু চুপচাপ হয়ে গেলেন। আমরা কী বলব ভাবছি। প্রসঙ্গ বদলে অনিকেতকাকু আমাদের উদ্দেশে দূরের একটা সাদা বাড়ির দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, ওটা রংঝুরি চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলো। তার ঠিক পাশেই ছোট একটা মাঠ রয়েছে। সেখানে বক্সনেট টাঙিয়ে রাখা হয়েছে তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য। লা' সেরে নিয়ে ওখানে একটু নেট-প্র্যাকটিস করে নিও তোমরা।

দুপুরের খাবার চলে এল। নিচতলায় বিরাট ডাইনিং হলে বসে খাবার ব্যবস্থা। চিনামাটির সাদা ধবধবে ডিশ, ঝকঝকে তকতকে কাচের গ্লাস। যাঁরা সার্ভ করছেন তাঁরাও সাদা অ্যাপ্রন পরে রয়েছেন। সবকিছু বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ডাল, আলুভাজা, গরম গরম কাতল মাছের ঝোল দিয়ে ভাত। সঙ্গে বুনো লংকার সস। এদিকের খুব জনপ্রিয় খাবার এই

লংকা। টকটকে লাল রংয়ের পেটমোটা তিন-চার ইঞ্চি নাদুসনুদুস চেহারা লংকাগুলোর। তবে একেবারেই ঝাল নেই আর অত্যন্ত সুস্বাদু। খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম প্র্যাকটিস করতে।

বাপ্পা, তমাল, মিঠুরা বল করল ছোট ছোট রান আপ নিয়ে। ভুলু আর রাসেল আমাদের পার্ট টাইম বোলার। ওরাও একটু হাত ঘুরিয়ে নিল। সিন্টু আর বাবু ব্যাট করে নিল প্রথমে। তারপর আমি। সোজা ব্যাটে একটুক্ষণ খেলে আত্মবিশ্বাসটা বাড়িয়ে নিলাম প্রথমে। তারপর স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলতে শুরু করলাম। বল ব্যাটের ঠিক মধ্যিখানে লাগছিল। বহুদিন বাদে নেটে খানিকক্ষণ ব্যাট করে মনে হল আমার কালো দিন চলে গিয়েছে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে যেন বলে দিল এই টুর্নামেন্টে আমার ব্যাড প্যাচ কেটে যাবে। যাবেই।

৫



প্র্যাকটিস সেরে গেস্ট হাউজে ফিরে এলাম বিকেল থাকতে থাকতেই। ভুলু আর রাসেল বেরিয়ে পড়ল একটু চক্কর মেরে আসতে। মিঠু আর রানা ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। ওরা দুজন নিজেদের ঘরে সিঁধিয়ে গেল গল্পের বই হাতে নিয়ে। দোতলার বারান্দায় হিগিনজেঠু আর গবাদাদু দেখি গালে হাত দিয়ে বসে ঝুঁকে পড়েছেন দাবা বোর্ডে ওপর। পৃথিবীর কোনওদিকে তাঁদের আর খেয়াল নেই।

গেস্ট হাউজের লাউঞ্জে এলাম আমি, তমাল, টিংকু, বাপ্পারা। এখানে একটা বড়সড় ক্যালেন্ডার টিভি রয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের একটা পুরনো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল টিভিতে। সনাতনকাকু আর ডাকুকাকু একটা বেতের সোফায় বসে ম্যাচ দেখছিলেন। আমরা ম্যাচ দেখার জন্য সেঁটে গেলাম লাউঞ্জের সোফায়।

সন্ধেবেলা গগন সিংহানিয়ার বাড়িতে আমাদের চা খাওয়ার নেমন্তন্ন। ওঁর একজন মাঝবয়েসি কর্মচারী গাড়ি নিয়ে চলে এলেন আমাদের নিয়ে যেতে। পাহাড়ি লোক যেমন হয় তেমন দেখতে ভদ্রলোক। একটু ভাঙা হলেও দিব্যি বাংলা বলতে পারেন। নাম বললেন, অজয় তামাং।

তৈরি হয়ে নিলাম ঝটপট। সনাতনকাকুর সঙ্গে আমরা কয়েকজন গেলাম গগন সিংহানিয়ার বাড়িতে। অজয় নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে গেলেন আমাদের।

গগন সিংহানিয়ার বাড়িটা দেখে তাক লেগে গেল। দোতলা গোল ধাঁচের বিরাট কাঠের বাড়ি। ধবধবে সাদা রং বাড়িটার। ওপরে মেরুন রঙের টিনের চাল। নিচতলায় প্রচুর লেবার, হৈ হৈ ব্যস্ততা। কয়েকজন লোক প্যাকিং বাক্স আনা-নেওয়া করছে আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তাদের পাশ কাটিয়ে অজয় তামাংয়ের পিছন পিছন আমরা দোতলায় উঠে পড়লাম।

দোতলায় একটা ছোটখাট মিউজিয়াম বানিয়ে রেখেছেন গগন সিংহানিয়া। প্রাচীন তিব্বতী চিত্রকলা, হালকা আঁচের চুল্লিতে পোড়ানো পোর্সেলিনের বাসনপত্র, পুরনো মুদ্রা, বস্ত্র, পশম শিল্পসামগ্রী, সিলমোহর সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন বসার ঘরে। গাঢ় আকাশি, বেগুনি, গাঢ় সবুজ রংয়ের পাত্র রয়েছে অনেকগুলো। দু'-একটা আঁচড়ে শিল্পীর তুলিতে আঁকা রয়েছে লাল-হলুদ ফুল, শালুকপাতা, জল ঝরে পড়া পাহাড়, নদী, গাছ ইত্যাদি অনেক রকম ছবি।

অনেকগুলো সোফা এই ঘরে। আমরা বসলাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পাজামা-পাঞ্জাবি, তার ওপরে শাল চাপিয়ে গগন সিংহানিয়া এলেন একটু বাদে। জিজ্ঞেস করলেন, অজয়, ওঁদের দেখিয়েছ আমার সংগ্রহশালা ?

সনাতনকাকু প্রশংসা করে বললেন, হ্যাঁ, এতক্ষণ তো ওসবই দেখছিলাম। আপনি তো শৌখিন লোক দেখছি।

গগন সিংহানিয়া হেসে বললেন, হ্যাঁ, সেটা বলতে পারেন।

টুকরো টাকরা কথা হল। মনে হল ভদ্রলোক বেশ মিশুকে মানুষ। আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। টলিউডের নামী হিরো সৈনিক যে সনাতনকাকুর ছেলে সেটা জেনে বেশ বিস্মিত হয়ে বললেন, দেখুন

দেখি কান্ড। অনিকেতবাবু রংঝুরি থানায় এতদিন ধরে রয়েছেন, আমার বাড়িতেও এসেছেন, অথচ এই আসল ইনফরমেশনটাই আমাকে দেননি উনি !

সনাতনকাকু হাসছিলেন। গগন সিংহানিয়া বললেন, পরের বার আপনার ছেলেকে চিফ গেস্ট করে নিয়ে আসব রংঝুরিতে। বিশাল মাপের একজন সেলিব্রিটি এলে গ্ল্যামার বেড়ে যাবে টুর্নামেন্টের।

আমাদের জন্য চা এল, গাজরের হালুয়া এল, গরম গরম কচুরিও এল। শেষ বিকেলের সূর্যের মতো কমলা রং সেই চায়ের। এমন চা এর আগে কখনও খাইনি। দূর থেকেও সেই চায়ের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। চায়ে চুমুক দিয়ে সনাতনকাকু বললেন, কীসের ব্যাবসা যেন আপনার ?

গগন সিংহানিয়া স্মিতমুখে পাশের দিকে তাকালেন। পাশ থেকে অজয় তামাং হেসে বললেন, কীসের যে ব্যাবসা ওঁদের নেই সেটা বলাই বরং মুশকিল। আসলে ওঁরা কয়েক পুরুষের বনেদি ব্যবসায়ী। ওঁদের অনেক রকম ব্যাবসা। রংঝুরিতে সকলেই একডাকে চেনেন গগনবাবুকে। এ বাড়ির নিচতলায় কাঠের ফার্নিচারের কারখানা আছে, বাড়ির পেছন দিকটায় আছে লেদ মেশিনের ফ্যাক্টরি। জনা পঞ্চাশেক লোক কাজ করে ফ্যাক্টরি শেডে। দুটো শিফটে কাজ হয়।

সনাতনকাকু সবিস্ময়ে বললেন, তাহলে তো গগনবাবু বিজনেস টাইকুন একরকম।

অজয় তামাং মুচকি হেসে বললেন, আরও আছে। এসব ছাড়াও একটা মেডিসিনের হোলসেল বিজনেস আছে। একটা বটলিফ ফ্যাক্টরিও আছে এদিকের একটা চা-বাগানে।

সনাতনকাকু বললেন, আপনিই কি গগনবাবুর ব্যাবসা দেখভাল করেন ?

অজয় তামাং লাজুক হাসলেন। গগন সিংহানিয়া অজয় তামাংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ম্যানেজার বললে কম বলা হবে, অজয় আমার রাইট হ্যান্ড। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। মেয়ে-জামাই থাকে বিদেশে। মিসেস দেহ রেখেছেন কয়েক বছর আগে। এই বয়সে আর ব্যবসার কাজ দেখতে পারি না। কাজেই লেবাররা ফাঁকি মারছে কিনা তদারকি করা, ডেলি প্রোডাকশান রিপোর্ট ঠিক আছে কিনা দেখা, স্টক মেলানোর কাজ পরীক্ষা করা - সব অজয়ই দেখভাল করে।

চায়ের সুগন্ধ ছাপিয়ে কেমন একটা কটুগন্ধ আসছিল। সনাতনকাকু বললেন, কীসের একটা গন্ধ আসছে না ?

গগন সিংহানিয়া নিজেও নাক কুঁচকে চায়ের কাপটা সেন্টার টেবিলে রেখে বললেন, উনি তো ঠিক বলেছেন। অজয়, কেমন একটা ফাউল স্মেল আসছে। এটা কীসের গন্ধ ?

অজয় তামাং ঘ্রাণ নিলেন একবার। বললেন, কাঠের মিস্ত্রিরা মেথিলেটেড স্পিরিট নিয়ে কাজ করছে নিচে। মনে হয় সেই গন্ধ।

গগন সিংহানিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তারপর স্কিপার ? কেমন লাগছে আমাদের রংঝুরি ?

আমি গাজরের হালুয়া খেতে খেতে বললাম, জায়গাটা ভারী সুন্দর। পাহাড়, নদী, জঙ্গল, চা-বাগান তো আছেই, তাছাড়া সুন্দর সুন্দর কাঠের দোতলা ঘরবাড়িও রয়েছে দেখলাম।

তমাল বলল, আচ্ছা, এখানকার বাসিন্দারা কি বেশিরভাগই নেপালি ?

গগন সিংহানিয়া বললেন, উঁহু, নেপালি নয়, রংঝুরিতে ডুকপাদের বসবাসই বেশি। তবে নেপালি আর বাঙালি আছে কয়েক ঘর। কিন্তু আমরা মারোয়াড়িরা এখানে মাইনরিটি।

আমি বললাম, ভুটান বর্ডার এই রংঝুরি থেকে কতটা দূরে ?

গগন সিংহানিয়া বললেন, এখান থেকে দু'পা হাঁটলেই ভুটান। ইচ্ছে করলে এক পা ভুটান আর এক পা ভারতে রেখে দাঁড়াতে পারো বর্ডারে গিয়ে। ভুটানকে বলা হয় বজ্রমানিকের দেশ, জানো তো ? রাজার শাসন চলে ভুটানে। ওখানকার কারেন্সির নাম নুগলট্রাম। ভুটানের তিনভাগের দু'ভাগই আসলে বনভূমি। স্বাধীনতার পর থেকেই তো অনুন্নত এই দেশ, তাই উন্নয়নের জন্য ওরা ভারতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তা তৈরি কিংবা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ওরা আমাদের ওপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল। তবে হ্যাঁ, ভুটানের মানুষ যেমন কর্মঠ, তেমনি সৎ।

গগন সিংহানিয়ার ওখান থেকে যখন ফিরে এলাম আমাদের গেস্ট হাউজে তখন সন্ধে হয়েছে বেশ। সকলে লাউঞ্জে বসে টিভি দেখছিলেন। হিগিনজেঠু চিন্তিত গলায় বললেন, ভুলু আর রাসেল কিন্তু এখনও ফেরেনি।

সনাতনকাকু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সব সহ্য হয়, ইনডিসপ্লিন সহ্য হয় না। আজকেই আমি ওদের দুজনকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দেব। তেমন বুঝলে টিম ইউথড্র করে জলপাইগুড়ি ফিরে যাব। কিন্তু এই বেয়াদবি আমি একদম বরদাস্ত করব না।

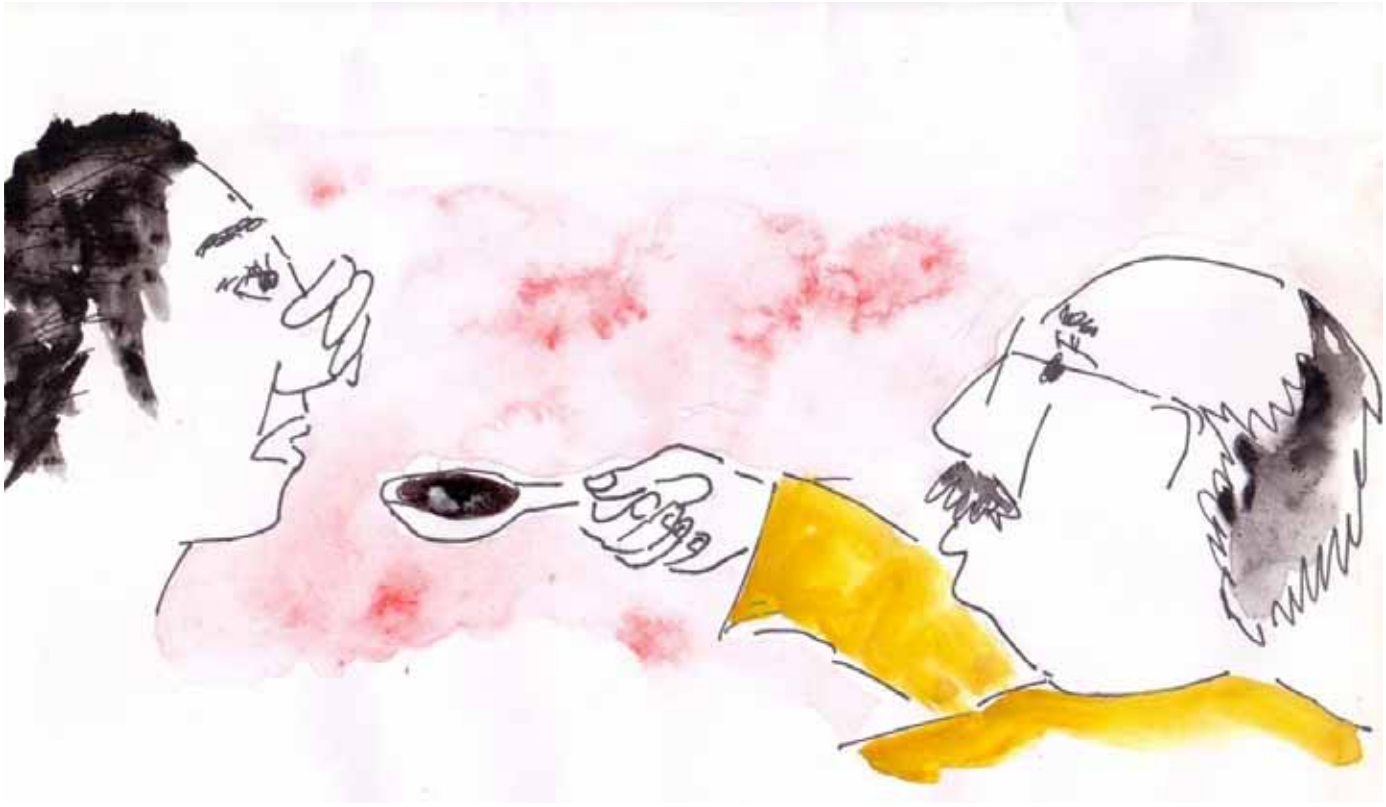
ডাকুকাকু উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, আপনি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। আচ্ছা, ওরা কোনও বিপদে পড়েনি তো ?

সনাতনকাকু থমকে গেলেন। বললেন, ওহ, এদিকটা তো ভাবিনি। কী জ্বালা বলুন তো !

হিগিনকাকু বললেন, বেশি দেরি করা যাবে না, আর কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। রংঝুরি বাজারে এসটিডি বুথ আছে একটা। সেই বুথ থেকে থানায় ফোন করে অনিকেতবাবুকে ব্যাপারটা জানাতে হবে। প্রয়োজন হলে থানায় মিসিং ডায়েরিও করতে হবে।

আমরা মুখ শুকনো করে বসে আছি। টেনশানে বড়রা পায়চারি করতে শুরু করেছেন। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার আঁচড়।

৬



ডাকুকাকু আর হিগিনজেঠু যখন থানায় ফোন করবেন বলে বেরোতে যাবেন ঠিক তখনই ফিরেছে ভুলু আর রাসেল। দুজনের হাতে বিশাল বিশাল ঠোঙায় জিলিপি। সনাতনকাকু ধমক দিতে যাবেন, রাসেল কান এঁটো করা একটা হাসি হেসে বলল, হাঁটতে হাঁটতে ভুটান বর্ডারে চলে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় রংঝুরি হাটে গরম গরম জিলিপি ভাজছে দেখলাম। লোভ আর সামলাতে পারলাম না। আমরাও খেয়েছি, দু'কেজি নিয়েও এসেছি সকলের জন্য।

বড়রা তুলোধুনো করলেন রাসেল আর ভুলুকে। প্রচুর বকুনি খেল দুজন। শেষে অবশ্য ওদের আনা জিলিপিও খাওয়া হল সকলে মিলে। তারপর শুরু হল টিম মিটিং। হিগিনজেঠু বিরাট একটা কাগজ বার করে ছবি এঁকে দেখিয়ে বললেন, কালকের ম্যাচে আমাদের ব্যাটিং অর্ডার একইরকম থাকুক। কালও বাবু আর সিন্টু ওপেন করতে যাবে। ওয়ান ডাউনে ব্যাট করুক চপল। দু'নম্বরে নামুক ভুলু। তারপর এক এক করে যাক পিন্টু, রাজা, রাসেল, টিংকু, মিঠু, বাপ্পা আর তমাল। রানাকে টিমের বাইরে রাখছি কাল। ওকে পরে সুযোগ দেওয়া হবে।

ডাকুকাকু ট্রাঙ্ক খুলে একটা কৌটো বার করে ফেলেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে রহস্য রহস্য একটা হাসি হেসে বললেন, এর ভেতরে কী জিনিস আছে জানো ?

আমরা সভয়ে একসঙ্গে বললাম, কী আছে ?

ডাকুকাকু হেসে বললেন, আশশ্যাওড়া, ঘেঁটু, ভাঁট, পুটুশ, ভুঁইওখড়া, রুদ্রজটা, আকন্দ, নিশিন্দা, রেড়ি, কাকমাছি, হাতিশুঁড়, কৃষ্ণতুলসী, পাথরকুচির পাতা বেটে তৈরি করেছি এই পাঁচন। আজ সন্ধেতে এক চামচ খাবে আর কাল সকালে খেলতে নামার আগে এক চামচ। জ্বরজারি-সর্দিকাশি-অম্বল-বুকজ্বলা-অগ্নিমান্দ্য-হাঁপানি-কাঁপানি কিছুই তোমাদের ছুঁতে পারবে না। নাও, লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে নাও।

রাসেল আমতা আমতা করে বলল, পাঁচনটা খেতে কি খুব বিচ্ছিরি ?

ডাকুকাকু অভয় দিয়ে বললেন, পাঁচন তো আর জিলিপির মতো মিষ্টি হবে না! তবে যতটা ভয় পাচ্ছ তেমন তিতকুটে নয়। তুমিই প্রথমে খেয়ে দ্যাখো না হয়।

রাসেল মুখ হাঁ করল। ডাকুকাকু খুব যত্ন নিয়ে রাসেলের মুখে এক চামচ পাঁচন ঢেলে দিলেন। রাসেলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল সেই পাঁচন খেয়ে। রাসেলের পর আমি। চোখ বুঁজে এক চামচ পাঁচন খেয়ে মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে চারদিকে। এমন তেতো, এমন ঝাঁঝাল, এমন ভয়ংকর জিনিস আমি জীবনে খাইনি।

আমার পর এক এক করে বাকিদের খাওয়ানো হল সেই পাঁচন। রানা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, সনাতনকাকু ধরে ফেললেন রানাকে। এই বয়সেও সনাতনকাকুর খাজা কাঁঠালের মতো মাসল। রানা কিছুতেই সনাতনকাকুর হাত ছাড়াতে পারল না। রানার দুরবস্থা দেখার পর বাকিরা কেউ আর পালাবার সাহস করল না।

ডাকুকাকুর পাঁচনপর্ব শেষ হল। গবাদাদু হাঁক দিয়ে বললেন, আমি এখন যঞ্চে বসব। চপল যে নীলকান্ত মণির আংটি ধারণ করবে সেটা শোধন করে দিতে হবে। এখন আমার একটু গঙ্গাজল চাই যে !

টুর্নামেন্ট কমিটির একজন দাঁড়িয়ে এই বিচিত্র কান্ড দেখছিলেন। বললেন, গঙ্গার জল তো এখানে পাওয়া যাবে না। এখানকার নদীর নাম হল দোলং। যদি চান তবে দোলংয়ের জল আনিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

গবাদাদু হতাশ মুখ করে বললেন, তাহলে সেটাই আনান। কিন্তু তাড়াতাড়ি করুন। সন্ধ্যা ছটা বাহান্ন থেকে সাতটা একুশ পর্যন্ত শুভলগ্ন আছে। তার মধ্যেই নদীর জল চাই।

ভদ্রলোক কাউকে কিছু একটা নির্দেশ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বড় একটা কাচের বোতলে দোলংয়ের জল এসে গেল। গবাদাদু ব্যাগ থেকে একটা নীলপাথরের আংটি বার করে পদ্মাসন করে বসে পড়লেন।

আমরা অর্ধবৃত্ত বানিয়ে বসে আছি গবাদাদুর পিছনে। আমাদের পিছনে সার দিয়ে দাঁড়ানো রংঝুরি টুর্নামেন্ট কমিটির লোকজন। সবিসময়ে আমাদের দেখছে তারা। গবাদাদু যঞ্চের আগুন জ্বেলে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। তারপর আমার আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিয়ে একগাল হেসে বললেন, নাও চপল, সবুজ সংঘের কেমদ্রুম যোগ কাটিয়ে দিলাম। রংঝুরি টি-টোয়েন্টিতে তোমাদের হারায় কারও ক্ষমতা নেই।

রাতে আমাদের ডিনার সারা হয়ে গেল ন'টার মধ্যেই। সনাতনকাকু বলে দিয়েছেন দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তে। সাড়ে ন'টা নাগাদ আমাদের ঘরে ঢুকে গেলাম আমরা। আমি, ভুলু আর রাসেল থাকব এই ঘরে। বিশাল ডাবলবেড। তিনজন হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে শোয়া যায়। ভুলু ওর ব্যাগ হাতড়ে একটা ছোট শিশি বার করে নিয়ে আমাকে বলল, চপ্পল, হাঁ কর, তোকে মন্ত্রপূত জল খাইয়ে দিই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কীসের জল ?

ভুলু ভেঙে বলল, ঘটনাটা শোন আগে। বললে বিশ্বাস করবি না, আজ বিকেলে আমি আর রাসেল হেঁটে হেঁটে ভুটান বর্ডারে চলে গিয়েছিলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বলিস কী ?

ভুলু বলল, হুঁ, তা প্রায় ঘন্টাখানেকের রাস্তা। একজন লামার কথা শুনলাম হাটে গিয়ে। ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে তাঁর। সেই লামার গুম্ফায় গিয়েছিলাম বলেই তো ফিরতে দেরি হল আমাদের। এই মন্ত্রপূত জল উনিই দিয়েছেন কালকের ম্যাচের জন্য।

আমি বললাম, তোরা বড়দের কাউকে বলে যাস নি কেন ?

ভুলু বলল, ওঁদের জানালে তো যেতে দিতেন না। সেজন্য বড়দের তো বলিইনি, বড়দের কানে দিয়ে দিতে পারে ভেবে টিমের বাকিদেরও বলিনি। শোন, টুর্নামেন্ট জিততেই হবে যে করে হোক। লামার দেওয়া এই মন্ত্রপূত জল আমি খেয়েছি, রাসেলও খেয়েছে। আর একটু আছে, তুইও খেয়ে নে চপ্পল।

আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, খাব বলছিস ? এটা খেয়ে মরে যাব না তো ?

ভুলু বলল, আমি আর রাসেল খেয়েছি ঘন্টাখানেক আগে, আমরা কি মরে গেছি ? আর দেরি করিস না, খেয়ে নে।

ব্যাডপ্যাচ কাটানর জন্য আমি মরিয়া। মনে মনে দুগ্গা দুগ্গা বলে হাঁ করলাম। ভুলু শিশি থেকে খানিকটা জল ঢেলে দিল আমার মুখে। সাধারণ জলের মতোই তার স্বাদ, গন্ধ।

ভুলু হেসে আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, চপ্পল, কালকের ম্যাচে তুই বড় রান পাবি, দেখে নিস।



আজ আমাদের খেলা। যে বাস রিজার্ভ করে আমরা রংঝুরিতে এসেছি সেই বাসে চেপে মাঠের দিকে যাচ্ছি আমরা। যেতে যেতে দেখলাম দোকানপাট খুলছে, মানুষজন সবে কাজে বের হয়েছে। কয়েকটা স্কুলের বাচ্চা আমাদের দেখে হেসে হাত নাড়ল। আমরাও হাত নাড়লাম। বাইরে তাকিয়ে দেখি নরম রোদ উঠেছে পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে। রংঝুরির সকালটা যেন আদুরে বেড়ালছানার মতো আলসেমিতে ভরা, এখানে ওখানে থুপ্পি মেরে বসে আছে।

রংঝুরির খেলার মাঠটা এককথায় দারুণ। এত জায়গায় খেলেছি, এমন চমৎকার মাঠে কখনও খেলিনি। শক্ত মাটির ওপর সবুজ মখমলের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘাস। বাউন্ডারি লাইনের একদিকে পাহাড়ি নদী, অন্যদিকে অর্ধবৃত্তের মতো একটা ছোট পাহাড়ের টিলা। সবুজ ঘাস দিয়ে মোড়া। ধাপ ধাপ করা বসার জায়গা, প্রকৃতিই যেন মনোরম একটা স্টেডিয়াম বানিয়ে রেখেছে। হাজার খানেক দর্শক সেখানে বসে সুর করে চিৎকার করছে আর বিভিন্ন রঙিন প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ফ্ল্যাগ নাড়াচ্ছে।

ছোট ছোট বাচ্চারা আমাদের সাদা ফ্ল্যাগ নেড়ে অভ্যর্থনা জানাল। তাকিয়ে দেখি আমাদের আগেই মাঠে পৌঁছে ওয়ার্ম আপ করতে শুরু করে দিয়েছে লাল জার্সি পরা দার্জিলিং ডিনামাইট।

আমরা গোল হয়ে হাডল বানালাম। আমি সবাইকে চাগিয়ে তোলার জন্য বললাম, আমাদের নিজেদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তার সবটুকু উজাড় করে দেব আজ। এই ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে।

হাডল শেষ হয়ে যাওয়ার পর সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছিলাম মাঠে। রাসেল আমার কাছে এসে বলল, আমার বুকটা খালি খালি লাগছে রে। কী যে হবে কে জানে !

ভুলুও পাশ থেকে এসে বলল, আমার পেটের মধ্যে গুরগুর করছে রে চপ্পল। এত টেনশান কখনও হয় না আমার।

আমি ওদের দুজনের পিঠে চাপড় মেরে বললাম, টেনশান করিস না একদম, তোরা দেখে নিস আজ আমরা দাপটের সঙ্গে ম্যাচ জিতব।

টসে হেরে গেলাম। দার্জিলিং ডিনামাইটের ক্যাপ্টেন ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিল। অর্থাৎ আমাদের ব্যাটিং। বাবু আর সিন্টু চলে গেল ওপেন করতে। দ্বিতীয় ওভারেই বাবু লেগ বিফোর উইকেট হয়ে ফিরে এল। আমি হেলমেট মাথায় চাপালাম। ব্যাট হাতে মাঠে নেমে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকালাম। কেন যেন মনে হল আজকের দিনটা আমার।

ওয়ান লেগ গার্ড নিয়ে নিলাম প্রথমে। ফিল্ডারদের এক ঝলক দেখে নিয়ে স্টান্স নিলাম ধীর পায়ে। উইকেটকিপার আর স্লিপ কর্ডন চিয়ার আপ করছে বোলারকে। স্লেজিংও করছে একটু আধটু। সেদিকে মন না দিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। ছিপছিপে চেহারার বোলারটা আমাকে ঠান্ডা চোখে জরিপ করতে করতে প্যান্টে বল ঘসছে। এবার আসছে দূর থেকে। ওভারের শেষ বল। ইনস্যুইং হয়ে ভিতরে ঢুকছিল। ফ্রন্টফুটে গিয়ে বলটা ব্লক করলাম ব্যাটের একেবারে মধ্যিখান দিয়ে।

পরের ওভারের প্রথম বলেই সিন্টু একটা সিঙ্গলস নিয়ে আমাকে স্ট্রাইক দিল। আউটস্যুইং বল ছিল, জাজমেন্ট দিয়ে ছেড়ে দিলাম। পরের বল সামান্য শর্ট অফ লেংথ। ব্যাকফুট ড্রাইভ করলাম। কভারের ফিল্ডার নড়ার সুযোগ পেল না, গোলার মতো বল চলে গেল বাউন্ডারিতে। পরের বল হাফভলি। সামনের পায়ে শরীরের ওজন নিয়ে গিয়ে ব্যাটটা শুধু লাগালাম বলে। চোখের নিমেষে বল গড়াতে গড়াতে গিয়ে ধাক্কা খেল সাইটস্ক্রিনের পর্দায়।

বোলার মার খেয়ে যে একটু রেগে রয়েছে সেটা আঁচ করতে পারছিলাম। পরের বলটা অবধারিত বাউন্সার এল। হুক করলাম, স্কোয়ার লেগ আম্পায়ারের মাথার উপর দিয়ে বল উড়ে গেল স্টেডিয়ামের দর্শকদের কাছে। ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান আর বোলার একে অন্যের মনস্তত্ত্ব বোঝার নিরন্তর চেষ্টা করে যায়। কোনও ব্যাটসম্যান হঠাৎ আক্রমণাত্মক খেলতে শুরু করলে বোলারের অমোঘ অস্ত্র হল স্লোয়ার। ওভারের শেষ বল যে তেমন হতে পারে সেটা কেন যেন মনে

হচ্ছিল আমার। হলও তাই। অফস্টাম্পের লাইনে স্লোয়ার ডেলিভারি। শুধু জায়গায় দাঁড়িয়ে বলের গতিটা বুঝে নিয়ে বাঁ হাতের ঝাঁকিতে বলটা লিফট করে দিলাম একস্ট্রাকভারের মাথার উপর দিয়ে। বিশাল ছক্কা।

চোখ নামিয়ে নিয়েছে, কাঁধ ঝুলে গিয়েছে বোলারের। উইকেটকিপার চুপ। স্লিপ কর্ডন উঠে গিয়ে চলে গেল বাউন্ডারি বাঁচাতে। ওদিকে পরপর চারটে বলে চারটে বড় হিট দেখে দর্শকরা যেন পাগল হয়ে গেছে। সারা স্টেডিয়াম এখন আমার জন্য গলা ফাটাচ্ছে। বহুদিন পর কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল। মাঝে বেশ কয়েকটা ম্যাচ রান পাইনি। সেসব ম্যাচে টিম কখনও জিতেছে, কখনও হেরেছে। যখন হেরেছে তখন নিজে কিছু করতে পারিনি বলে কষ্ট হয়েছে। আবার যখন জিতেছে তখনও সেই জয়ে আমার অবদান নেই বলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। এতদিন পর নিজের ফর্ম ফিরে পেয়ে ভীষণ স্বস্তি এল মনের মধ্যে।

শেষ ওভারের শেষ বলে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দিয়ে যখন আউট হলাম তখন আমার রান একাত্তর। কুড়ি ওভারে একশো আটষট্টি রান হল আমাদের। রাসেল মিডল অর্ডারে নেমে একুশ করে রান আউট হয়ে গিয়েছিল। তারপর ভুলু এসে নট আউট থাকল বিয়াল্লিশ রানে।

প্যাভিলিয়নে ফিরতেই টিমের সকলে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তারপর সনাতনকাকু, ডাকুকাকু, হিগিনজেঠু, গবাদাদুরা। অনিকেতকাকু এলেন সব শেষে। হেসে বললেন, বিজয় হাজারে ট্রোফি খেলা অসমের এক ব্যাটসম্যান এই মাঠে ছিয়ানব্বই করে গিয়েছে গতবার। রংঝুরি টুর্নামেন্ট কমিটির লোকজন বলছে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তোমার ব্যাটিং তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

বড় রান হাতে থাকলে বোলারদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সে কারণেই হয়তো বাপ্পা, মিঠু, তমালরা মোটামুটি ভালই বল করল। তমাল আর বাপ্পা দুটো করে উইকেট তুলল। চেঞ্জ বোলার হিসাবে এসে রাসেলও একটা উইকেট পেল। দার্জিলিং ডিনামাইট খুব একটা সুবিধে করতে পারল না, একশো চল্লিশ করল কুড়িয়ে বাড়িয়ে। আমার কথাই সত্যি হল। প্রথম ম্যাচ বড় মার্জিনে জিতে সেমিফাইনালে উঠে গেলাম আমরা।

ড্রেসিংরুমে ফিরতেই অনিকেতকাকু, গগন সিংহানিয়া আর ড্যানিয়েল ডুকপা আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। আমার পিঠে হাত রেখে অনিকেতকাকু বললেন, কাল তোমাদের কঠিন সেমিফাইনাল ম্যাচ অসম রাইনোর সঙ্গে। ওরা ভুটানের রয়্যাল ওয়ারিয়রসকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। চপল, আজ তোমার ব্যাটিং দেখে মন ভরে গেল। কাল আবার একটা ভাল ইনিংস খেলা চাই।

গগন সিংহানিয়া একটা সাদা খাম আমার হাতে দিয়ে বললেন, স্কিপার, এটা আমার তরফ থেকে তোমাকে গিফট। প্লিজ অ্যাকসেপ্ট ইট।

খাম খুলে দেখি দুটো হাজার টাকার নোট। রাসেল ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকাটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হেসে বলল, চপল, প্রাইজমানি ভাগ করে নেওয়াটা আমাদের রেওয়াজ সেটা ভুলে যাস না। এই টাকাটা দিয়ে পরে জব্বর ফিস্ট হবে আমাদের।

আমি হেসে বললাম, তথাস্তু।

গেস্ট হাউজে ফিরে গরম জল দিয়ে স্নান সারলাম। শরীরের ক্লান্তি ধুয়ে গেল। লাঞ্চে ভুলু আমার পাশে বসল। আমার কানে কানে বলল, চপ্পল, তুই কতদিন বাদে ফর্ম ফিরে পেলি, আমার দিনটা খারাপ গেল না। রাসেলও খারাপ খেলে নি। লামার ক্ষমতাটা দেখেছিস একবার ?

আমার ঝট করে মনে পড়ে ভুলু আর রাসেল এক লামার কাছ থেকে জলপড়া এনে খাইয়েছিল কাল রাতে। আমি হাতের আঙুল উঁচিয়ে একটু হেসে ভুলুকে বললাম, এই দ্যাখ গবাদাদুর দেওয়া আংটি পরেছি। শুধু তাই নয় ডাকুকাকুর ভয়ংকর পাঁচনও খেয়েছি। কাজেই কৃতিত্বটা তুই শুধু ওই লামাকে দিয়ে দিস না ভুলু।

ভুলু দাঁত খিঁচিয়ে বলল, চপ্পল, তুই যে এত বড় গাধা সেটা জানতাম না। ডাকুকাকুর ম্যাজিক পাঁচন খেয়েছে সকলে। আংটি পরেছিস তুই একা। কিন্তু আজকের সবচাইতে ভাল খেলেছে কারা ? তুই, আমি আর রাসেল। ভেবে দ্যাখ, আমরা তিনজনেই তো লামার দেওয়া মন্ত্র পড়া জল খেয়েছিলাম কাল রাতে। তাহলে ?

আমি একটু ভেবে বললাম, হুম, বুঝলাম। কিন্তু কালও তো ভাইটাল সেমিফাইনাল ম্যাচ আছে আমাদের। সেটাও তো জিততে হবে।

ভুলু বলল, আজ বিকেলে একবার যাব লামার গুম্ফায়। তোকেও নিয়ে যাব সেখানে। ঘাবড়াস না, সন্ধের আগেই ফিরে আসব। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

৮

রংঝুরি বাজার থেকে খানিকটা হেঁটে লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছি আমরা তিনজন। একটা মুরগির ফার্ম আর একটা শুয়োরের খোঁয়ারের পাশ কাটিয়ে সরলবর্গীয় সবুজ গাছেদের জটলার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে

দোলং নদী। আমি হাঁফাচ্ছিলাম। দম নিতে নিতে বললাম, লামার গুম্ফা আর কতদূর ? আলো থাকতে থাকতে ফিরতে পারব তো?

রাসেল বলল, এই এসে পড়েছি। তুই অত তাড়াহুড়ো করছিস কেন ? পাহাড়ে ছোট ছোট করে স্টেপ নিতে হয়। একটু আস্তে আস্তে পা ফেল।

আমি একটু দাঁড়ালাম। শ্বাস নিচ্ছি বড় করে। বললাম, রংঝুরি জায়গাটা যেমন সুন্দর, এখানকার মানুষগুলোও খুব ভাল।

ভুলু বলল, শুধু ওই ড্যানিয়েল ডুকপা বাদ দিয়ে। কেমন ছোট ছোট কুতকুতে চোখ, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন তুই যাই বলিস চপ্পল, ভদ্রলোককে দেখে আমার প্রথম থেকেই কেমন যেন সন্দেহ লাগছে। সিনেমায় যারা ভিলেনের রোল করে তারা অবিকল এমন দেখতে হয়।

আমি বললাম, সিনেমায় যাঁরা ভিলেনের রোল করেন তাঁরা কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাল মানুষ হন।

রাসেল বলল, গগন সিংহানিয়াকে কিন্তু আমার ভাল লেগেছে। দিব্যি লোক। সকলের সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলেন।

ভুলু সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করে বলল, ড্যানিয়েল ডুকপা বাদ দিয়ে এখানকার সব লোকই ভাল। এই যে অনিকেতকাকু বলছিলেন যে রংঝুরিতে কীসব ক্রাইম টাইম হচ্ছে ইদানিং, তার সঙ্গে এই ড্যানিয়েল ডুকপার নির্ঘাৎ কোনও যোগ আছে। পরে মিলিয়ে নিস তোরা।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। একটা গুম্ফা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। সেদিকে তাকিয়ে আমি বললাম, গুম্ফা কাকে বলে জানিস ?

ভুলু আর রাসেল দুজনেই ঘাড় নাড়ল। আমি বললাম, গুগল ঘেঁটে জেনেছি, তিব্বতি ভাষায় গোন্-পা মানে হল নির্জন স্থান। বৌদ্ধ লামাদের বিহার বা নির্জন আবাসকে বলে গুম্ফা। লক্ষ করে দেখবি সাধারণত গুম্ফা পূর্বমুখী হয়, যাতে ভোরের প্রথম আলোর রেণু গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

রাসেল বলল, লামা শব্দেরও কোনও মানে আছে নিশ্চয়ই ?

আমি বললাম, লা-ম মানে পরমপুরুষ। গুরুকে বলা হয় লামা। রক্ষযক্ষ ও ভূতেদের বশীভূত করে ধর্মকে রক্ষা করেন বলে এঁরা লামা। সেজন্য মন্ত্রতন্ত্র বশীকরণ ঝাড়ফুঁক ভবিষ্যদ্বাণী এসবে অনেক লামাই সিদ্ধহস্ত হয়ে থাকেন।

ভুলু একটু ভেবে বলল, ঠিকই বলেছিস। এই লামারও ঈশ্বরিক শক্তি আছে। রংঝুরি শুধু নয়, অনেক দূর থেকে লোকজন ওঁর কাছে আসে।

আমি বললাম, এতটা পথ তোরা দুজন চিনে চিনে এসেছিলি কেমন করে ?

রাসেল বলল, কাল দুটো লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। লোকদুটো শুনলাম মামলা মোকদ্দমায় ফেঁসে আছে, অনেক টাকা খরচ করেছে। সেই ঝামেলা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ওরা লামার কাছে যাচ্ছিল। তাদের মুখেই শুনলাম এই লামার আসল নাম গ্যালসিন। ওরাই পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদের।

ছোট ছোট টিলার মতো সবুজ পাহাড়, মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা দোলং নদী বয়ে চলেছে শব্দ করে। এক পাশ দিয়ে নির্জন পাকদন্ডী। তবে রাস্তা খুব চড়াই নয়। সরু পথে খাদের ধার ঘেঁষে সাবধানে পা ফেলার ঝুঁকি নেই। খুব বেশি লোকজন এই পথে চলাচল করে বলে মনে হল না।

লম্বা লম্বা পাতাওয়ালা অনেক গাছ রয়েছে পথের ধারে। ভুলু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, এগুলোকে কী বলে জানিস ?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি না।

ভুলু একগাল হেসে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, এগুলোর নাম হল উত্তিস। কাল ওই লোকগুলোর কাছে জেনেছি।

একটা গুম্ফার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। কয়েকটা পাইন গাছ রয়েছে উল্টোদিকে। তার পাশ দিয়ে ফ্ল্যাগের মতো রঙিন কিছু কাপড় উড়ছে। ভুলু একগাল হেসে বলল, মিস্টার গুগল, আপনাকে আরও একটা তথ্য দিয়ে রাখি, ওই পতাকাগুলোকে বলে টাজা।

ভাল করে তাকিয়ে দেখি গুম্ফার ঠিক গায়ে একটা কাঠের ফলকের মধ্যে খোদাই করে ইংরেজিতে লেখা আছে নো শু'জ অ্যালাওড। জনা চারেক লোক দাঁড়িয়ে আছে গুহার ঠিক মুখে। লোকগুলোর পরনে তিব্বতি ধাঁচের গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা আলখাল্লার মতো পোশাক। প্রত্যেকের হাতে জপমালা। একজনের একহাতে মালা, অন্যহাতে পেতলের একটা চোঙের মতো যন্ত্র।

আমি বললাম, ওই যে চোঙটা দেখছিস, ওটাকে বলে মণি। এর ভেতরে থাকে লাটাইয়ের মতো একটা ব্যবস্থা। এক লাখেরও বেশি মন্ত্র ছাপা একটা কাগজ ভরা আছে ওটার ভেতরে। অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম' লেখা রয়েছে এই কাগজে। এই চোঙ একবার ঘোরালেই লক্ষেরও বেশি পুণ্য অর্জন করা হয় বলে এদের বিশ্বাস।

রাসেল অবাক হয়ে বলল, এটুকু চোঙে এক লক্ষ মন্ত্র ? বলিস কী ?

আমি বললাম, আরও বড় সাইজেরও মণি হয়। তখন যেহেতু অনেক বেশি পেশীশক্তির প্রয়োজন হয়, সেগুলো অনেক লোক মিলে ঘোরায়। কোথাও কোথাও জলপ্রবাহের শক্তিতে ঘোরানো হয় এই মণি। ফানুস উড়িয়েও পুণ্য অর্জনের প্রথা রয়েছে। একটা ঘেরাটোপের মধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে ওপরে মন্ত্রলেখা কাগজ বা কাপড় ছাতার মতো করে টাঙানো হয়। প্রদীপের আলোতে বাতাস গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। সেই বাতাসের প্রভাবে ছাতা ঘুরতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রলেখা কাগজ বা কাপড়ও ঘুরতে থাকে।

যে লোকটার হাতে মণি সে আমাদের গলা শুনতে পেয়েছে। এগিয়ে এসে আমাদের এক পলক দেখে ভাঙা হিন্দিতে আমরা কেন এখানে এসেছি জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম সংক্ষেপে। তার পাশ থেকে অন্য একজন বলল, এখন লামার ন্যুমা চলছে। আজ প্রথম দিন। কাজেই বেশিক্ষণ সময় যেন আমরা না নিই।

ভুলু গলাটা খাদে নিয়ে গিয়ে বলল, ন্যুমা মানে কী রে ?

আমি ফিসফিস করে বললাম, ন্যুমা মানে উপোস। একদিন অনিয়মিত আহার ও পুজো, পরদিন দুপুরের পর পর্যন্ত উপোস থেকে পুজো, আর তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ উপোস ও পুজো। এরই নাম ন্যুমা। আজ প্রথম দিন, তার মানে আজ লামার খুব সামান্যই আহার করার দিন।

গুম্ফার ভেতরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। আবছা আবছা আলো আর অনধকার মিলেমিশে রয়েছে। তাতেই চোখে পড়ল গুম্ফার দেয়ালে আঁকা আছে ড্রাগন, মেঘ, পাখি, সারসপাখি। গৌতম বুদ্ধের জীবনকথার কিছু ছবি আঁকা রয়েছে দেওয়ালে। শিশু অবস্থা থেকে ধ্যানমগ্ন পূর্ণবয়স্ক বুদ্ধদেবের বেশ কিছু ছবি সুন্দর করে এঁকেছে কেউ।

ধুপের গন্ধ ম-ম করছে ভেতরে। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির সামনে পদ্মাসনে বসে রয়েছেন লামা। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তাকালেন। ভুলুকে দেখে চিনতে পারলেন। মণি হাতে লোকটির দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন।

সেই ভিক্ষু আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, লামা জানতে চাইছেন কাল ওঁর দেওয়া মন্ত্রপূত জল খেয়ে কাজ হয়েছিল কিনা।

ভুলু ঘাড় নাড়ল। তারপর পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে পুজোর আসনের পাশে রেখে দিয়ে বলল, হামে সেমিফাইনাল ম্যাচ জিতনা হ্যায়।

ভিক্ষুটি ছোট ছোট চোখ কুঁচকে হাসলেন। তারপর লামার কাছে কানে কানে কিছু বলে এলেন। লামার সামনে একটা খোলা পুঁথি। একটা পাত্রে কাঁচা দুধ। একটা মাথার খুলিও রয়েছে পুজোর আসনে। কপালের নীচ থেকে কাটা। ওপরের খুলিটা কী রকম বাটির মতো দেখাচ্ছে। মানুষের পায়ের হাড়ও রাখা রয়েছে তার পাশে।

বুদ্ধের আসন থেকে তিনটে গাঁদাফুল নিয়ে সেই খুলিতে ছুঁইয়ে গম্ভীর গলায় অজানা ভাষায় মন্ত্র পড়লেন লামা। সেই ফুল তিনটে আমাদের তিনজনের হাতে দিয়ে দিলেন। পেতলের কমন্ডলু থেকে জল ঢেলে দিলেন আমাদের হাতে। ইশারা করলেন খেয়ে নিতে। আমরা মন্ত্র পড়া জল মুখে দিয়ে দিলাম।

ভিক্ষুটির উদ্দেশে কিছু বললেন লামা। আমাদের গুহার বাইরের দিকটায় নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, লামা তোমাদের চা খেয়ে যেতে বলেছেন।

মাখন দেওয়া চা দেওয়া হল কাচের গ্লাসে। দিব্যি খেতে। আমি চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম কী ?

ভিক্ষু বললেন, পেমা তামলং।

চা খেয়ে গুম্ফা থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছিলাম আমরা। অন্ধকার হয়ে আসছে। পা চালিয়ে ফিরছিলাম আমরা তিনজন। পাশ দিয়ে দোলং নদী বয়ে যাচ্ছে। গোল থালার মতো বড় চাঁদ উঠে গেছে আকাশে। সূর্যাস্তের গোলাপি রং যত ফিকে হচ্ছে চাঁদের ঘন দুধের সরের মতো আলো তত ছড়িয়ে পড়ছে চরাচর জুড়ে। নদীর জলের ঝিনঝিন শব্দ কানে আসছে, দারুণ লাগছে পরিবেশটা।

ভুলু বলল, পরশুর ম্যাচটাও আবার হাসতে হাসতে জিতব দেখে নিস তোরা।

আমি বললাম, অসম রাইনোকে হারাতে পারলে বুঝব তোর এই লামার সত্যিই কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে।



পুরনো পাঁচন আজ থেকে বন্ধ। নিম, নিশিন্দা আর বাসক মিশিয়ে নতুন একটা পাঁচন তৈরি করেছেন ডাকুকাকু। গাঢ় সবুজ চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল যে এর স্বাদ বিদঘুটে হবে। রাসেল ওজর আপত্তি করতে গিয়ে রামবকুনি খেল।

ডাকুকাকু বললেন, 'নিম, নিশিন্দে, বাসক যেথা রোগ থাকে না সেথা' - এই প্রাচীন প্রবাদটা শোনোনি তোমরা? এই তিনটে মহৌষধির সঙ্গে আমি নিজের ফরমুলা অনুযায়ী আরও কয়েকটা জিনিস মিশিয়েছি। বনতুলসী, ব্রাহ্মী, কালোমেঘ আর বাসকপাতা। এর মধ্যে অনেকটা মধুও ঢেলে দিয়েছি। ফলে গুড়ের থেকেও মিস্টি হয়েছে পাঁচনটা। নাও, সোনামুখ করে খেয়ে নাও এক চামচ।

রাসেল পাঁচন খেয়েই ওয়াক ওয়াক করতে শুরু করে দিল।

তারপর আমার পালা। সেই ভয়ংকর তেতো তরল গলা দিয়ে নামতেই নাকমুখ দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরোতে থাকল যেন। এমন তেতো জিনিস আমি আমার জন্মে খাইনি।

সনাতনকাকু জরিপ করছেন প্রত্যেককে। তাই পালিয়ে লাভ নেই, এক এক করে প্লেয়ারদের সবাইকেই পাঁচন খেতে হল নিমতেতো মুখ করে।

স্নান করে একটু নেট-প্র্যাকটিস সেরে গেস্টহাউজে ফিরে এসেছি। গেস্ট হাউজের সামনে বিশাল হাতা। তার চারদিকে বাঁশের বেড়া, একদিকে কেয়ারটেকার সিরিংজির এক কামরার কাঠের বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। রোমশ দুটো পাহাড়ি কুকুরছানা ইতিউতি ঘুরছে লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে। সিরিংজির পোষা মোরগ আছে কয়েকটা। গ্রীবা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে পায়চারি করে হাতার মধ্যে।

সিরিংজির সঙ্গে ওঁর বাড়ির দাওয়ায় বসে আমরা খোশগল্প করছিলাম। এমন সময় বাইরে গাড়ির হর্ন শুনতে পাওয়া গেল।

তমাল গেল দেখতে। ফিরে এসে জানাল, অনিকেতকাকু সঙ্গে আর এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছেন। আজ এগারোটা থেকে পটনা পটাকা আর সিকিম রাইফেলসের জমজমাট সেমিফাইনাল ম্যাচ। সেজন্য আমাদের মাঠে নিয়ে যেতে এসেছেন।

ডাকুকাকু সকাল থেকে বিভিন্ন রকম গাছের পাতা একটা পাথরের পাত্রে হামানদিস্তা দিয়ে ছেঁচে পাঁচন তৈরিতে ব্যস্ত। গবাদাদু আর হিগিনজেঠু দাবা খেলছেন মন দিয়ে। সনাতনকাকুর প্রতিদিন পাঁচ-সাতশো ডন-বৈঠক দেওয়া অভ্যাস। সেই কাজটাই করছিলেন একাগ্র মনে।

বললাম, অনিকেতকাকু গাড়ি নিয়ে এসেছেন। সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখতে আপনারা কেউ যাবেন ?

সনাতনকাকু বললেন, ফাইনালে আমরা যে উঠব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেজন্য যাদের সঙ্গে আমাদের ফাইনালে খেলতে হবে আজ তাদের একটু দেখে নেবার প্রয়োজন আছে বইকি। অবশ্যই মাঠে যেতে হবে আমাদের।

সঙ্গী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অনিকেতকাকু। বললেন, ইনি দেবরাজ বোস, রংঝুরি থানায় আমার সহকর্মী।

দুপুরের খাবার একটু তাড়াতাড়িই সেরে নেওয়া হল। অনিকেতকাকুদের দুটো গাড়িতে আমরা ভাগাভাগি হয়ে উঠে পড়লাম।

খেলার মাঠে এসে দেখি স্টেডিয়াম পুরো ভর্তি। প্ল্যাকার্ডে ফেস্টুনে ছেয়ে আছে মাঠ। সিকিমের সাপোর্টারই বেশি। দর্শকদের চিৎকারে গমগম করছে চারপাশ।

তবে খেলা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। সিকিম একষট্টি রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল। মাত্র সাত ওভারে জেতার রান তুলে ফেলল পটনা। খেলা শুরু হতে না হতেই শেষ। সিকিমকে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে চলে গেল পটনা পটাকা।

রাসেল হতাশ হয়ে বলল, সেই বিকেলে আমাদের প্র্যাকটিস। লা'ও হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ তাহলে কী করব আমরা ?

দেবরাজ বোস অনিকেতকাকুকে বললেন, ওদের নিয়ে রংঝুরির আশেপাশে একটা চক্কর দিয়ে এলে কেমন হয় ?

অনিকেতকাকু হেসে বললেন, বেশ, চলো তবে। ঘন্টাখানেক না হয় একটু টইটই করে আসা যাক।

বড়রা ফিরে গেলেন গেস্ট হাউজে। আমরা বেরোলাম অনিকেতকাকুর ভাষায় 'টইটই' করে আসতে।

আমি বসেছি অনিকেতকাকুর পাশের সিটে। রংঝুরি থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠলাম কিছুটা। অনিকেতকাকু একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, এখানে এলাচ চাষ হয়। এদিকের লোকেরা এলাচ চাষ করে বেশ ভাল টাকা উপার্জন করে।

একটা বিরাট সমতল জায়গা দেখিয়ে বললেন, প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার করে এখানে হাট বসে। স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে ভুটানের লোকজনও বিকিকিনি করতে আসেন রংঝুরি হাটে।

গাড়ি ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে এলাম আমরা। আঙুল উঁচিয়ে অনিকেতকাকু বললেন, বাঘ, লেপার্ড, বুনো কুকুর আর শুয়োর তো আছেই, হিমালয়ের কালো ভালুকও কিন্তু আছে এই জঙ্গলে।

একটা জায়গায় স্থানীয় ডুকপা মানুষজনের ভিড় দেখলাম। অনিকেতকাকু বললেন, এদের নিমলো উৎসব আছে আজ। সেজন্য নতুন পোশাক পরেছে সকলে। এই যে ওভারকোটের মতো পোশাক পরে রয়েছে পুরুষেরা একে বলে 'বখু'। বখুর ভাঁজের মধ্যে অনেকটা থলের মতো জায়গা থাকে, সেখানে ভ্রমণ করার সময় খাবার-দাবার আর পান-সুপারি রাখে ডুকপা পুরুষেরা।

মিঠু বলল, মেয়েরা যে অদ্ভুত কীরকম একটা পোশাক পরে রয়েছে সেটার নাম কী ?

অনিকেতকাকু বললেন, মেয়েরা পরেছে সেমিজের পোশাক 'গুছুম'। তার ওপর ওড়নার মতো করে পরেছে রংবেরংয়ের 'কিরা'। এক একটা ভাল কোয়ালিটির কিরার দাম জানো কত ? প্রায় এক থেকে দেড় হাজার টাকা। মেয়েদের হাতে রুপোর মোটা যে বালা দেখছ, তার নাম দোপচু। গলায় যে পুঁতির মালা পরেছে তাকে বলে ছুউ।

আমাদের গাড়ি চলছিল ধীর গতিতে। অনিকেতকাকু গিয়ার বদলে স্পিড তুলে বললেন, এবার তোমাদের নিয়ে যাব দাচারে দেখাতে।

রাসেল বলল, কী বললেন, বাঁচা রে ?

অনিকেতকাকু হো হো করে হেসে বললেন, তিরন্দাজী খেলাকে ডুকপা ভাষায় বলে দাচারে। আজ এক জায়গায় দাচারে কম্পিটিশন হচ্ছে শুনেছি। চলো গিয়ে দেখে আসি একটু।

আমাদের গাড়ি এবার একটা বড় মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। কয়েকজন ডুকপা যুবক তিরধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে দাচারে খেলছিল। প্রায় একশো মিটার দূরের একটা কাঠের বোর্ডের মধ্যে তির গাঁথতে হবে। ছেলেগুলো দূর থেকে তির ছুঁড়ে প্রায় প্রত্যেকেটা তির বোর্ডের মধ্যে গেঁথে দিচ্ছে অবলীলায়।

ভুলু উৎসাহ নিয়ে বলল, আমাদের কি একটু তির ছুঁড়তে দেবে ওরা ?

দেবরাজ বোস বললেন, সে দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ বলে তোমার মনে হচ্ছে তত সহজ নয়।

দেবরাজ বোস ইশারা করায় একজন যুবক এগিয়ে এল। রাসেলের হাতে তার নিজের তির ধনুক ধরিয়ে দিয়ে তির ছুঁড়তে বলল নিজেদের ভাষায়। ভুলু আনাড়িভাবে ধনুকা ধরেছিল। সেই ছেলেটি এগিয়ে এসে ইশারা করে ধনুকের ছিলায় টান দেবার কায়দাটা বুঝিয়ে দিল। সেই কায়দা অনুযায়ী তির ছুঁড়ল ভুলু। অর্ধেক পথ গিয়ে সেই তির মুখ থুবড়ে পড়ল। হেসে গড়িয়ে পড়ল ছেলেগুলো।

ভুলুর পর আমরা সকলেই এক এক করে তির ছুঁড়লাম ধনুকে ছিলা টেনে। কাঠের বোর্ডের টার্গেটে লাগার তো প্রশ্নই নেই, আমাদের কারও তির একশো মিটার পার করতে পারল না। দেবরাজ বোস আর অনিকেতকাকুর ছোঁড়া তির টার্গেটের কাছাকাছি গেল, কিন্তু লাগল না।

দাচারে থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। কিছুটা গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো আবার।

একটু ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ হেঁটে একটা ফাঁকা মতো জায়গায় নিয়ে এলেন অনিকেতকাকু। মাঠের মধ্যে ঘন ঘন কয়েকটা শুকনো বাঁশ মাটিতে গাঁথা। বাঁশের মাথায় পতাকার মতো করে কাপড় টাঙানো। কয়েকটা জায়গায় মাটি খোঁড়া রয়েছে। গর্ত হয়ে রয়েছে অনেকটা করে। তার মধ্যে একটা গর্ত একদম টাটকা।

অনিকেতকাকু বললেন, এটা ডুকপাদের গোরস্থান। ডুকপারা সাধারণত শব দাহ করে। তারপর শ্মশানে, বাড়ির পাশে উঁচু জায়গায় বুদ্ধের বাণী লিখে পতাকার মতো করে টাঙিয়ে রাখে। এখান থেকেই মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ চুরি গিয়েছে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, ডুকপারা তো মৃতদেহ দাহ করে। তাহলে মৃতদেহ কবর দেয় কারা ?

দেবরাজ বোস বুঝিয়ে বললেন, স্বাভাবিক মৃত্যুতে ডুকপারা মৃতদেহ ছ'মাস পর্যন্ত মাটির নীচে পুঁতে রাখে। পরে তা উঠিয়ে নিয়ে দাহ করা হয়। মৃত্যুর পর একুশ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন পূজা-অর্চনা, ধর্মগ্রন্থপাঠের মতো পারলৌকিক আচার মেনে চলে এরা। একুশতম দিনে সকলকে পানভোজন করান হয়। মৃতের আত্মার শান্তির জন্য এরা রাস্তার পাশে পথিকদের বিশ্রামের জন্য কাঠের বেঞ্চ বানিয়ে মৃত মানুষটির নামে উৎসর্গ করে।

বাপ্পা বলল, তার মানে মৃত্যুর পর যখন ছ'মাসের জন্য সাময়িকভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল তখনই কি দুষ্কৃতীরা এই কান্ড ঘটিয়েছে ?

রানা বলল, কিন্তু লাশগুলো নিয়ে কী করেছে লোকগুলো ? কোথায়ই বা রেখেছে বডিগুলোকে ?

অনিকেতকাকু অস্ফূটে বললেন, সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন।

১০

আড়াইটে বেজে গেছে। সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিমদিকে। কাজেই আর দেরি করা চলে না। গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছি আমরা।

আমি অনিকেতকাকুর পাশেই বসেছি। ওঁর স্টিয়ারিং ধরা, ক্লাচে পা রেখে গিয়ার বদলানো দেখতে বেশ লাগছিল। পোক্ত হাতে গাড়ি চালাচ্ছেন অনিকেতকাকু। সেদিকে চোখ রেখে বললাম, সেদিন সনাতনকাকুর বাড়ির ছাদে আপনার কাছে হাড়বাজারের গল্প শোনার পর আমি বাড়ি ফিরে ইন্টারনেট ঘেঁটেছিলাম।

অনিকেতকাকু আমার দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী হয়ে বললেন, তা কী দেখলে ?

আমি বললাম, দেখলাম মানুষের হাড় নিয়ে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল সেই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির স্কেচ থেকে।

অনিকেতকাকু সায় দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছ। আসলে আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান যত উন্নতি করতে থাকল ডাক্তারদের মানুষের শরীর নিয়ে ধারণাকে আরও গভীর করে তোলার জন্য কঙ্কালের প্রয়োজন সেই হারে বেড়েই চলল। সে কারণে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ইউরোপে কঙ্কালের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড যেহেতু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্মভূমি তাই সেখানে দেহচুরির ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক।

সামনে একটা খাদ। হেয়ার পিন বেন্ড। অনিকেতকাকু গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিলেন। তারপর স্টিয়ারিংয়ে একটা মোচড় দিয়ে চুলের কাঁটার মতো বাঁকটা পার করে এসে বললেন, তবে আমেরিকার গল্পটা আরও সাংঘাতিক।

ভুলু কৌতূহলী হয়ে বলল, কেন ? কী হয়েছিল আমেরিকায় ?

অনিকেতকাকু বললেন, আড়াইশো বছর আগের আমেরিকায় অসুখ বিসুখ লেগেই থাকত। সে কারণে বেকার যুবক-যুবতীদের ডাক্তারিতে রোজগারের সম্ভাবনা ছিল ষোলোআনা। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি শেখার জিনিসপত্রে টান পড়তে শুরু হল। বিশেষ করে কঙ্কালে। ফলে কবর থেকে চুরি হতে শুরু করল মৃতদেহ। বেশির ভাগ মৃতদেহই চুরি হত কালো মানুষ বা আইরিশদের কবর থেকে। যেহেতু এঁরা ছিলেন সমাজের নীচুতলার লোকজন।

আমি কৌতূহলী স্বরে বললাম, কিন্তু আমাদের দেশের দিকে কী করে চোখ পড়ল ওদের ?

অনিকেতকাকু বললেন, ঐতিহাসিক মাইকেল স্যাপলের 'আ ট্র্যাফিক ইন ডেড বডিজ' বইটা পড়ো। এ বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। আসলে সে সময় যথেষ্ট পরিমান কালো লোকেদের কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন ওদের চোখ পড়ল আমাদের উপনিবেশগুলোর ওপর। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশও বাদ পড়ল না।

ভুলু বলল, এখানে কীভাবে হাড়ের জোগানদার খুঁজে পেল ওরা ?

অনিকেতকাকু বললেন, এ দেশে ডোম জাতির লোকজনকে হাড় জোগানের কাজে লাগিয়েছিল ওরা। বললে বিশ্বাস করবে না, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ তখন বছরে একশোটা কঙ্কালের জোগান দিচ্ছিল। তারপর বহুদিন সেই ধারা চলেছে। ১৯৮৫ সালে 'শিকাগো ট্রিবিউন'-এ একটা খবর বেরিয়েছিল যে ভারত তার আগের বছর ষাট হাজার খুলি আর কঙ্কাল রফতানি করেছিল।

রাসেল বিস্মিত হয়ে বলল, এত ?

অনিকেতকাকু বললেন, সে সময় কলকাতার হাড় কারখানার মোট বাৎসরিক ব্যবসার মূল্য কত ছিল জানো ? দশ লক্ষ ডলার। তখন আমাদের প্রশাসন হাড় কারখানাগুলোকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দিত সহজেই। বেওয়ারিশ লাশের যে গতি হত শুধু তাই নয়, একটা ব্যবসার দিকও ছিল। কিন্তু শুধু বেওয়ারিশ লাশ দিয়ে এই প্রবল চাহিদা মেটানো যাচ্ছিল না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মরলে কঙ্কাল দান করবে এই ভরসায় জীবিতদের আগাম দাদন দেওয়া হচ্ছিল।

আমি বললাম, কিন্তু কোন জীবিত মানুষ কবে মরবে সেই ভরসায় তো আর নিয়মিত জোগান চালিয়ে যাওয়া যায় না। তাহলে ?

অনিকেতকাকু বললেন, সেটাই তো বলছি। তখন বড় ধরনের মড়া চুরিতে জড়াতেই হল অসাধু ব্যবসায়ীদের। এদিকে পনেরোশো শিশুর কঙ্কাল আবিস্কার হল ভারতে। শুরু হল আলোড়ন। খবরের কাগজগুলো দাবি করল ওই শিশুদের আসলে হত্যা করা হয়েছে। তুমুল হ-গোলের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট মানব শরীরের রফতানি বেআইনি বলে ঘোষণা করল। কঙ্কালের ব্যাবসা প্রকাশ্য ভাবে বন্ধ হয়ে গেল সেই থেকে।

তমাল বলল, এবার বুঝলাম। তার মানে তখন থেকেই তলে তলে হাড়বাজারের চক্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল সারা দেশ জুড়ে। যার একটা চক্র এই শান্তশিষ্ট রংঝুরিতেও আছে বলে সন্দেহ করছেন আপনারা। এই যে কবর থেকে মৃতদেহ চুরি হচ্ছে সেটা সেই হাড় জোগানের উদ্দেশ্যেই। তাই না ?

কথা বলতে বলতেই আমাদের গেস্টহাউজ এসে গিয়েছে। অনিকেতকাকু ঘ্যাঁস্‌স করে গাড়ি দাঁড় করালেন। পিছন পিছন দেবরাজ বোসের গাড়িও চলে এসেছে। অনিকেতকাকু বললেন, কাল তো অসম রাইনোর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি সেমিফাইনাল খেলা ! সেজন্য তোমাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম আগে থেকে।

টিংকু মিঠুরা সকলে দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়ল গেস্টহাউজে। রাসেল হাতে বরাভয় মুদ্রা ফুটিয়ে গলাটা খাটো করে বলল, অসম রাইনোর ম্যাচ নিয়ে চিন্তা করবেন না। কাল বিকেলে বড়দের না জানিয়ে পাহাড়ের ওপর এক লামার গুম্ফায় গিয়েছিলাম আমরা তিনজন। কালকের ম্যাচ ধরে নিন আমরা একরকম জিতেই গিয়েছি।

অনিকেতকাকু অবাক হয়ে বললেন, গ্যালসিন লামার গুম্ফায় গিয়েছিলে ? সে তো বেশ দূর !

আমি সবিস্তারে সব জানালাম। আমাদের পাহাড়ি পাকদন্ডী পথ দিয়ে ওঠা, লামার গুম্ফায় পৌঁছনো, সেখানে মণি হাতে লোকটি, সবশেষে গ্যালসিন লামার গল্প।

অনিকেতকাকু হেসে ফেললেন, এই যে বিশ্বকাপ ফুটবলে আফ্রিকান টিমগুলো খেলতে যায়, ওরা সঙ্গে ওঝা আর তান্ত্রিকদের নিয়ে যায়। তারা আবার মানুষের হাড়গোড় নিয়ে ঝাড়ফুঁক-তুকতাক করে। কিন্তু লাভ কী ? আফ্রিকার টিমগুলো কি আজ অবধি চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে একবারও ?

রাসেল বলল, নাহ্, তা অবশ্য পারেনি।

অনিকেতকাকু বললেন, ওসব প্রসঙ্গ থাক। এবার বলো গ্যালসিন লামার গুম্ফাটা কেমন লাগল তোমাদের ?

আমরা সমস্বরে বললাম, এর আগে কোনও ধারণা ছিল না। এই প্রথম কোনও গুম্ফার ভেতরে গেলাম। দারুণ লাগল।

অনিকেতকাকু একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর আচমকা আমার কাঁধ খামচে ধরে বললেন, তখন কী বলছিলে যেন ? ওখানে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির সামনে মাথার খুলি আর মানুষের পায়ের হাড় দেখেছ ? আর ইউ শিওর?

রাসেল বলল, হ্যাঁ, মাথার খুলি রাখা আছে লামার পুজোর আসনে। খুলিগুলো কপালের নীচ থেকে কাটা, ওলটানো বাটির মতো দেখতে। মানুষের পায়ের হাড়ও আছে। মনে হল যেন পালিশ করা, মোমের আলো লেগে চকচক করছিল সেগুলো।

দেবরাজ বোসের ভুরুদুটো ধনুক হয়ে গেল। অনিকেতকাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছুদিন আগেই তো লোক পাঠিয়েছিলাম ওখানে। কেউ তো কিছু বলেনি ?

রাসেল দুম করে বলে বসল, তখন হাড়বাজারের কথা বলছিলেন, ওই খুলিগুলো কি হাড়বাজার থেকে কেনা বলে মনে হয় ?

অনিকেতকাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, হতেই পারে। হাড়বাজারের খদ্দের শুধু ডাক্তারি ছাত্ররাই কিন্তু নয়, সন্ন্যাসীরাও প্রচুর দাম দিয়ে এ জিনিস কেনে। ভুটানি বৌদ্ধদের কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, নশ্বরতাকে বোঝার জন্যে মৃতদেহের কাছে সময় কাটাতে হয়। তাই এই বিশ্বাসীরা মানুষের হাড় দিয়ে বানানো নানান রকম পাত্র আর অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করে থাকে। যেমন খুলি দিয়ে প্রার্থনা পাত্র, পায়ের হাড় দিয়ে বাঁশি - এমন সব।

দেবরাজ বোস ব্যস্ত হয়ে বললেন, কাল সকালেই একবার ওই গুম্ফায় যেতে হবে।

অনিকেতকাকু ভুরু জড়ো করে বললেন, কাল নয় দেবরাজ। বেশি দেরি করাটা ঠিক হবে না। আজই একবার ঢুঁ মারতে হবে দেবরাজ। লেটস মুভ।

১১

সকালে তৈরি হয়ে মাঠে এসে অসম রাইনোর প্লেয়ারদের প্র্যাকটিস করতে দেখে আমাদের সকলের বুক ধুকধুক করতে শুরু করে দিল। রানা ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, চপল, চেহারা দেখেছিস এক এক জনের ? কী ফিগার রে ছেলেগুলোর, কাউকেই তো আন্ডার নাইনটিন বলে মনে হচ্ছে না। প্রত্যেকেরই ম্যাচিওর চেহারা। এরা ক্রিকেটার তো নয় যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক !

আমিও ঢোঁক গিললাম। ওদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার ছ'ফিটের ওপর লম্বা। প্রত্যেকের ছিপছিপে চেহারা, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। জলপাই রঙের জার্সি পরে যখন ওরা শরীরের নানা রকম কসরত করছিল তখন মনে হচ্ছিল যে ফৌজির দল বোধ হয় যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গগন সিংহানিয়া আর ড্যানিয়েল ডুকপা এসেছিলেন মাঠে। আমাকে দেখে বললেন, কী ব্যাপার ? মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে যে। একটু টেনশনে আছো বলে মনে হচ্ছে যেন ?

যদিও টেনশনে পেট গোলাচ্ছে তবুও আমি একটু হেসে সমার্টনেস দেখাবার চেষ্টা করে বললাম, না না, টেনশনের কী আছে।

গগন সিংহানিয়া আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড স্কিপার। নিজেদের ক্ষমতার ওপর আস্থা রাখো। যাও, মাঠে নেমে বুলডোজার চালিয়ে দাও অসম রাইনোর ওপর দিয়ে। ম্যাচ কিন্তু জিতেই আসতে হবে তোমাদের।

ড্যানিয়েল ডুকপা আমাদের চাগিয়ে দেবার জন্য বললেন, খেলা তো একরকম যুদ্ধই। ধরো তুমি ব্যাটের এজ লাগিয়ে আউট হয়ে গেলে অথচ আম্পায়ার বুঝতে না পেরে আউট দিলেন না। তাহলে কিন্তু ফিরে আসবে না। গেমসম্যানশিপ তো এখন একটা আর্ট। মনে রেখো, তোমাদের জিততেই হবে আজ। বাই হুক অর বাই ক্রুক।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, চেষ্টা করব আমরা।

ভুলু আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, ভদ্রলোকের কথাটা শুনলি ? আমি সেদিন তোদের কী বলেছিলাম মনে আছে ? এখনও বলছি যে এই ড্যানিয়েল ডুকপাই রংঝুরির যাবতীয় কুকর্মের মূল পান্ডা ! লোকটার কথাবার্তাতেই পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। আরে, যে লোক সামান্য ক্রিকেট ম্যাচ জেতার জন্যেই এমন আদেখলাপনা করতে পারে সে টাকাপয়সার বখরা থাকলে তো মানুষ অবধি খুন করে ফেলবে রে চপ্পল !

আমি ধমক দিয়ে বললাম, প্লিজ, এখন চুপ কর। ক্রিকেটে কনসেনট্রেট কর। ভাল করে খেলতে হবে আজ। জিততেই হবে আমাদের।

আমরা মাঠে নেমে ওয়ার্ম আপ করতে শুরু করলাম। ভুলু নখ কামড়াতে শুরু করেছে টেনশানে। আমার সামনে এসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, চপ্পল, আমার পেটটা কেমন যেন করছে রে। খেলা শুরু হতে তো এখনও একটু সময় আছে। একবার টয়লেট থেকে ঘুরে আসব নাকি ?

আমি স্ট্রেচিং করতে করতে ভুলুকে সাহস দেবার জন্য বললাম, অত ভয় পাচ্ছিস কেন ? ক্রিকেট তো স্কিলের খেলা, চেহারার খেলা তো নয়। তুইও কি কিছু কম নাকি কারও চেয়ে ! তোর নিজের ওপর কনফিডেন্স নেই ?

ভুলু অম্লানবদনে বলল, একটু আগেও ছিল। এদের চেহারা দেখার পর এখন আর নেই।

রাসেল আমার পাশে এসে বলল, আমারও কেমন ভয় ভয় করছিল একটু আগে। কিন্তু সেই টেনশানটা এখন কেটে গেছে। পকেট থেকে লামার দেওয়া ফুল বার করে কপালে ছুঁইয়ে রাসেল বলল, এটা যখন পকেটে আছে আমাদের হারায় কার সাধ্য ! আমার মন বলছে আজকের ম্যাচও জিতব আমরা।

ভুলুও পকেট থেকে সন্তর্পণে ফুল বার করে কপালে ছোঁয়াল। কান এঁটো করা হাসি হেসে বলল, বুঝলি চপ্পল, শরীরের রক্ত এতক্ষণ হিমঠান্ডা হয়ে ছিল। এবার একেবারে ফুটতে শুরু করেছে। আজ একেবারে জান দিয়ে খেলব। আজ ডু অর ডাই, কোনও উপায় নাই।

আমি ভরসা দেবার জন্য বললাম, নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা রাখ। বাকিটা ওপরঅলার ওপর ছেড়ে দে। দেখা যাক কী হয়।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে গেলাম আমরা। বাবুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে সিন্টু রান আউট হয়ে ফিরে এল প্রথম ওভারেই। দর্শকদের তুমুল উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমি নামলাম ব্যাট হাতে। আগের দিনই ভাল রান পেয়েছি তবুও প্রথম রান করা পর্যন্ত একটা টেনশান ছিল।

প্রথম বলটাই এল খুব জোরে কিন্তু একেবারে ব্যাটের ওপর হাফভলি। সামনের পায়ে শরীরের ওজন নিয়ে গিয়ে বলটাকে একটু জোরে পুশ করলাম। উল্টোদিকের উইকেটের পাশ দিয়ে বল সোজা গিয়ে লাগল সাইটস্ক্রিনে। প্রথম বলেই চার দিয়ে শুরু।

আর ফিরে তাকাতে হল না। দশ বল খেলার আগেই দুটো বাউন্ডারি মেরে ডাবল ফিগারে পৌঁছে গেলাম। সাতাশ বলে এল আমার পঞ্চাশ। একচল্লিশ বলে সাতাত্তর করে যখন আউট হলাম তখন বিরাট ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের টিমের রান পৌঁছে গেছে চোদ্দ ওভারে একশো এগারোতে।

বাবু আউট হয়েছিল বাইশ রানে। টিংকু আর মিঠু রান পেল না তেমন। তবে ভুলু আর রাসেল শেষদিকে ভাল খেলে রানটাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেল একশো বিরাশিতে। দুজনেই চল্লিশের কাছাকাছি রান করল নট আউট থেকে।

লা' ব্রেকের সময় গগন সিংহানিয়া এসে হাত মিলিয়ে গেলেন আমার সঙ্গে। বললেন, আমার একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে। তাই চলে যেতে হচ্ছে। ওদের হেমেন নামে একজন আছে। ভাল ব্যাট। তাকে আউট করতে পারলেই জিতে যাবে তোমরা।

অসম রাইনো শুরু করল জব্বর। হেমেন নেমেই প্রলয় বাধিয়ে দিল। ওরা দশ ওভারে একশো করে ফেলেছিল দুই উইকেটে। তমাল আর বাপ্পা আমাদের সেরা বোলার। ওদের দুজনকে প্রায় প্রত্যেক বলেই বাউন্ডারি মারছিল অসমের হেমেন ফুকন। এই হেমেন নাকি এবার অসমের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রোফিতে সুযোগ পেয়েছে। দুরন্ত ব্যাট করে ছেলেটা। আমাদের জেতা ম্যাচ একা হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছিল হেমেন। বাপ্পা, তমাল তো মার খেলই, মিঠু, টিংকুও ছাড় পেল না। আমি নিজে পার্ট টাইম বল করি। আমিও এক ওভারে তেরো রান দিয়ে বসে থাকলাম।

আমাদের সকলের মাথার চুল ছেঁড়ার জোগাড়। সবরকম চেষ্টা করেও লাভ হয়নি, হেমেনের উইকেট আসছে না কিছুতেই। এমনকী, উল্টোদিকের ব্যাটসম্যানটাও দেখতে দেখতে ত্রিশ করে ফেলল কিছু বোঝার আগে।

ড্রিংকস হল দশ ওভারের সময়। ভুলুকে ডেকে বললাম, কী রে, এক ওভার তোর লেগস্পিন ট্রাই করে দেখবি নাকি ? কনফিডেন্স আছে বল করার ?

ভুলুও আমার মতোই পার্ট টাইম বোলার। এমনিতে অনেকটা করে লেগস্পিন করে। কিন্তু মুশকিল হল একটু নার্ভাস হয়ে গেলেই শর্ট বল করে ফেলে। আর স্পিনারের শর্ট বল খুব ঝুঁকির। মার খাবার সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট।

ভুলু টেনশানে নখ কামড়াতে কামড়াতে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, বাপ্পা, তমালরাই পারল না কিছু করতে। আমি কী করে পারব ?

আমি বললাম, ছেড়ে দে। আমি রাসেলকে দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি।

ভুলু ঢকঢক করে পুরোটা জল খেয়ে নিল। মাথা নীচু করে কিছু ভাবল একটু। তারপর আমার জার্সির পিঠের জায়গাটা ধরে টান দিয়ে বলল, ঠিক আছে চপ্পল, সকলেই তো মার খেয়েছে, আমিও না হয় খাব। এর বেশি আর কীই বা হবে। তুই বলটা দে আমাকে।

ভুলু প্রথম বল ফেলল একেবারে মাঝ পিচে। মিড উইকেট বাউন্ডারির ওপর দিয়ে স্টেডিয়ামের ওপরের সারির দর্শকদের কাছে বল পাঠিয়ে দিল হেমেন ফুকন। পরের বল হাফভলি। সজোরে ড্রাইভ করেছিল হেমেন। মিঠু আমাদের বেস্ট ফিল্ডার। কভারে দাঁড়িয়ে ওই গোলার মতো বল আটকেই হাত ঝাঁকাতে শুরু করল মিঠু। রান হল না, কিন্তু রক্ত বেরোতে শুরু করল মিঠুর হাত ফেটে গিয়ে।

মিঠুকে বসিয়ে দিলাম। রানা এল বদলি ফিল্ডার হিসাবে। ভুলুর পরের বল গুডলেংথেই ছিল। জায়গায় দাঁড়িয়ে হেমেন সোজা পাঠিয়ে দিল সাইটস্ক্রিনের অনেকটা ওপর দিয়ে। বিরাট ছক্কা।

ভুলু নার্ভাস হয়ে ঠোঁট চাটছে বারবার। নখ কামড়াতে কামড়াতে পুরোটাই খেয়ে ফেলেছে প্রায়। আমি গালিতে ফিল্ডিং করছিলাম। সেখান থেকে দৌড়ে চলে এলাম ভুলুর কাছে। সিন্টু কিপিং গ্লাভস খুলে চলে এসেছে। ভুলুর পিঠে চাপড় মেরে সিন্টু বলল, কী হল রে, তোর বল তো ঘুরছে না একটুও !

ভুলু বলল, এমন চোরের মার কখনও খাইনি। মার খেয়ে সব গুলিয়ে গেছে। আমি নিজেই ঘুরে যাচ্ছি কিন্তু বল ঘোরাতে পারছি না।

আমি ভুলুকে ভরসা দেওয়ার জন্য বললাম, পকেট থেকে লামার দেওয়া ফুলটা বার করে ওটা বলে একবার ছুঁইয়ে নে।

কিছু মনে পড়েছে এমন একটা ভাব করে ভুলু পকেট থেকে গাঁদাফুলটা বার করল। বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে সেটা ছোঁয়াল বলে। তারপর ঘাড় গুঁজে ফিরে গেল রান আপে। আমরাও চলে এলাম যার যার জায়গায়।

পরের বলেই ম্যাজিকের মতো কাজ হল। হাফভলি বল সপাটে ব্যাট চালিয়ে ছিল হেমেন। গোলার মতো বলটা এত জোরে চলে এসেছিল যে নড়তে পারেনি উল্টোদিকের ব্যাটসম্যান। তার কাঁধে লেগে বল উঠে গেল সোজা ওপরে। ভুলু নিজেই সেই লোপ্পা ক্যাচ লুফে নিল। হেমেন তো অদ্ভুতভাবে আউট হলই, নন স্ট্রাইকার ছেলেটাও আহত হয়ে বসে গেল কোঁকাতে কোঁকাতে।

দু'দুটো সেট ব্যাটসম্যান চলে গিয়ে ব্যাট করতে এল আনকোরা দুজন। উজ্জীবিত হয়ে আমরা আবার গোল হয়ে নিজেদের মধ্যে হাডল করলাম। ভুলু আমার পাশেই ছিল। আমার পেটে একটা কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে চোখ মটকে বলল, বুঝলি চপ্পল, আমি তো নিমিত্ত মাত্র, এ সবই আসলে গ্যালসিন লামার কেরামতি।

ওরা আর বেশিক্ষণ টানতে পারল না। একশো আটষট্টিতে শেষ করল অসম রাইনো। আমরা ম্যাচ জিতে পৌঁছে গেলাম রংঝুরি টি-টোয়েন্টির ফাইনালে। কালকের দিনটা বিশ্রাম। পরশু পটনা পটাকার সঙ্গে ফাইনাল ম্যাচ আমাদের।

ড্রেসিংরুম থেকে গেস্ট হাউজে রওনা দেবার সময় আমি দলের প্রত্যেককে বললাম, এখনও আনন্দ করার কিছু হয়নি। সব আনন্দ এখন তোলা থাক। ফাইনাল জিততে পারলে তবেই জমিয়ে সেলিব্রেশন করব আমরা। নইলে নয়।

১২

দুপুরে প্র্যাকটিস চলছিল। আমি ব্যাট করছিলাম নেটে। এমন সময় এলেন রংঝুরি ক্লাবের বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা।

প্র্যাকটিস সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেল। মাঠের এক ধারে এসে গোল হয়ে দাঁড়ালাম সকলে। টুর্নামেন্ট কমিটির কর্মকর্তারা আমাদের আগামীকাল জেতার জন্য শুভেচ্ছা জানালেন।

একটা কালো ওভারকোট পরে এসেছেন গগন সিংহানিয়া। স্মিতমুখে বললেন, তোমাদের টিমটা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাদের সকলের বয়স কম। তোমাদের জেলার বাইরে কেউ তোমাদের নাম জানে না সেভাবে। উল্টোদিকে পটনার টিমে বেশ কিছু নামি প্লেয়ার আছে। খবরের কাগজে তাদের মাঝেমধ্যেই নাম ওঠে। টিভিতেও দেখা যায় অনেককে। কিন্তু তোমরা প্রমাণ করে দিয়েছ যে তোমরাও কিছু কম যাও না।

ড্যানিয়েল ডুকপা বললেন, দারুণ খেলছ তোমরা। তোমরাই সত্যিকারের ডার্ক হর্স। আমরা যদিও কমিটি, তবুও কাল তোমাদের দিকেই আমাদের মরাল সাপোর্ট থাকবে।

অজয় বললেন, তোমাদের সবুজ সংঘের জন্য আমি পুজো দিয়ে এসেছি। মন্দির থেকে প্রসাদী ফুল আর লাড্ডু নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। নাও, খেয়ে নাও।

প্যাকেট থেকে একটা করে লাড্ডু নিয়ে নিয়ে খেলাম সকলে। শুধু রাসেল একাই খেল চারটে লাড্ডু।

এদিকে ড্যানিয়েল ডুকপা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভুলুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, সকলেই চপলের কথা বলছে। কিন্তু ক্রিকেট তো আর একার খেলা নয়। সকলেই ভাল খেলছে রংঝুরিতে। বিশেষ করে তুমি। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে তুমি খুব ইউটিলিটি প্লেয়ার।

ভুলু আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। চোখে চাপা হাসি। ড্যানিয়েল ডুকপা বললেন, তোমার ওপরেও অনেক দায়িত্ব। ফাইনালে আরও ভাল খেলা চাই।

ভুলু বলল, আপনাকে কথা দিলাম, কাল আমরাই কাপ জিতব।

ড্যানিয়েল ভুলুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, দ্যাটস দ্য স্পিরিট। আই লাইক ইট।

ওঁরা হাঁটতে শুরু করলেন নিজের নিজের গাড়ির দিকে। ভুলু আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, ড্যানিয়েল ডুকপা লোকটাকে যতটা খারাপ ভেবেছিলাম ততটা খারাপ নয় রে চপ্পল। কী বলিস ?

আমি হো হো করে হেসে ফেলে বললাম, আচমকা মত বদলে ফেললি কেন, ভদ্রলোক তোর প্রশংসা করলেন বলে ?

ভুলু লাজুক হেসে বলল, তা নয়। আসলে ভদ্রলোকের জেতার জন্য একটু বেশিই খিদে। সেটাকে ঠিক দোষ বলা যায় না।

সবগুলো গাড়ি বেরিয়ে গেল এক এক করে। ড্যানিয়েল ডুকপা তখনও যান নি। গুটি গুটি দেখি ফিরে এসেছেন আমাদের দিকে। আমাকে ডাকলেন ইশারা করে।

আমি এগিয়ে গেলাম ড্যানিয়েলের দিকে। ভদ্রলোক আমার দু'কাঁধে দুটো হাত রাখলেন। নিচু স্বরে বললেন, আচ্ছা একটা কথা বলো তো চপল, গ্যালসিন লামার গুম্ফায় তোমরা গিয়েছিলে কী করতে ?

আমি অবাক হয়ে বলল, জেতার জন্য পুজো দিতে। আপনি সেটা কী করে জানলেন ?

ড্যানিয়েল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু হেসে বললেন, রংঝুরি জায়গাটা আমার হাতের তালুর মতো। এখানে একটা গাছের পাতা নড়লেও আমি ঠিক খবর পেয়ে যাই।

আমি চুপ। ড্যানিয়েল একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, সন্ধেবেলা পাহাড়ি পাকদন্ডী বেয়ে অতটা পথ গিয়েছিলে যখন তাহলে বড়দের বলে যাও নি কেন ? বিপদ আপদ হলে কী করতে তোমরা ? অ্যাট লিস্ট অনিকেতবাবুকে বলে গেলেও তো পারতে।

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমাদের ভুল হয়ে গেছে।

ড্যানিয়েল বললেন, জায়গাটা সুবিধের নয়। শুধু ভক্তরাই শুধু নয়, অনেক উল্টোপাল্টা লোকও কিন্তু যেতে শুরু করেছে ওই গুম্ফায়। কাজেই আর কিন্তু যেও না ওখানে। কী থেকে কী হয়ে যাবে, বড়সড় বিপদে পড়ে যাবে।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন ড্যানিয়েল। ওঁর গাড়ি থেকে বেরোনো ধূসর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। ভুলু আর রাসেল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আমার।

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, আমরা যে গ্যালসিন লামার গুম্ফায় গিয়েছিলাম সেটা দেখলাম জানেন ভদ্রলোক। আর যাতে না যাই সেই হুঁশিয়ারিও যেন অস্পষ্টভাবে দিয়ে গেলেন বলে মনে হল।

ভুলু বলল, তাহলে তো দেখছি আমার প্রথম ধারণাই ঠিক। লোকটা সত্যি সত্যিই ক্রিমিনাল টাইপ।

রাসেল বলল, কিন্তু আমাদের আজ বিকেলেও তো যাবার কথা ওই গুম্ফায়। মন্ত্রপূত জলপড়া খেয়ে বের করতে হবে ফাইনাল ম্যাচটা। এত দূর এসেছি। ফাইনালটা জিততে হবে না ? তাহলে কী করবি চপল ? গ্যালসিন লামার গুম্ফায় যাবি?

আমি বললাম, আলবাত যাব।

১৩



আঁকাবাঁকা সরু পাহাড়ি সরু পথ দিয়ে হাঁটছি। পথের দুপাশে জংলি চোরকাটার গাছ। জামাকাপড়ে লেগে চিমটে ধরে এঁটে যাচ্ছে আমাদের। যতটা পারছি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তারপর আবার হাঁটছি। গ্যালসিন লামার গুম্ফায় গিয়ে ফিরে আসতে হবে সন্ধের আগে। পা চালিয়ে হাঁটছি আমি, ভুলু আর রাসেল।

পাহাড়ি পথ। তার একদিকে চেনা অচেনা গাছের জঙ্গল। অন্যদিকে পাহাড়ের আড়াল শেষে, খাদের ধারে দাঁড়িয়ে একটা দুটো কাঠের বাড়ি। মাঝে সদ্যোজাত দামাল শিশুর মতো হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বয়ে চলেছে খরস্রোতা দোলং। লোকালয় ছাড়িয়ে অনেকটা উঠে এসেছি। পথে দেখা হল স্থানীয় দু'-চারজনের সঙ্গে। এদিকের মানুষজন বড় আলাপি। কথা নেই, বার্তা নেই, দু'কান জোড়া হাসি লেগেই আছে।

মজে যাওয়া ছোটো একটা পুকুর তার তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রেকার্স হাট ছাড়ালাম। হঠাৎ ভুলু বলল, উরিব্বাস, ওই দ্যাখ .. কত্ত প্রজাপতি রে চপ্পল !

চপ্পল নামে ডাকায় মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাশের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলাম। শয়ে শয়ে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম তাদের। রাসেল চোখ বড় বড় করে বলল, কী সুন্দর !

ভুলু বলল, এত সুন্দর সুন্দর প্রজাপতিগুলো, অথচ এদের আয়ু মাত্র মাসখানেক। এটা ভাবলেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়।

আমি বললাম, এদের জীবনে তিনটে ফেজ। ডিম, শূককীট আর মূককীট। সজনে বা শিউলি গাছে যে রোমশ শুঁয়োপোকা দেখা যায় সেগুলোই মথের শূককীট। তিন অবস্থা পেরিয়ে আসতে প্রজাপতির তিন থেকে ছয় সপ্তাহ লাগে।

গুম্ফার বাইরেটায় ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। তাদের সকলের হাতে জপের মালা। এই শ্রমণদের জটলার মধ্যে থেকে একজনকে দেখে একটু অবাক হলাম। গগন সিংহানিয়ার ম্যানেজার অজয় তামাং। গলা অবধি ঢাকা তিব্বতি ঢঙের কালচে মেরুন পোশাক পরে রয়েছেন। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো। পেমা তামলংয়ের সঙ্গে চাপা স্বরে কথা বলছিলেন। আমাকে দেখে একট অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা এখানে ? কী ব্যাপার ?

তামলং অজয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন নিজেদের পাহাড়ি ভাষায়। অজয় হেসে বললেন, এবার বুঝলাম। টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট জেতার জন্য এসেছ এখানে ?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, ওই আর কি।

অজয় হেসে বললেন, একেবারে ঠিক জায়গাতেই এসেছ। ওঁর কাছে যখন এসেছ তখন মনের ইচ্ছে পূর্ণ হবেই। এই লামার অনেক ক্ষমতা।

তামলংয়ের মুখ থেকেই শুনলাম লামার আজ ন্যুমার তৃতীয় দিন। অর্থাৎ সারাদিন উপাস করে রয়েছেন তিনি। পুজোর আসনে বসে রয়েছেন এখন। অবলোকিতেশ্বরের আরাধনা চলছে। আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম যেখানে পুজো হচ্ছে সেখানে।

শান্ত সৌম্য বুদ্ধমূর্তি। মাটির মূর্তি কিন্তু সোনার পাত দিয়ে মোড়া মনে হল। নানা রঙের পতাকা রয়েছে ভেতরে। বিরাট রুপোর কাজ করা বেশ কিছু ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। অনেকগুলো ছোট ছোট পেতলের মূর্তি আছে একদিকে। তামলং নীচুস্বরে বললেন, এই মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ আর শাস্ত্রবিদ।

আমি, ভুলু আর রাসেল আমরা প্রত্যেকে একশো টাকার দুটো করে নোট রেখে এলাম মূর্তির সামনে প্রণামী হিসাবে। লামা স্মিতমুখে কিছু বললেন। তামলং বললেন, উনি জানতে চাইছেন ওঁর দেওয়া আশীর্বাদী ফুলে কাজ হয়েছিল কিনা।

আমিা ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ, হয়েছিল। তারপর বললাম, কাল বাদে পরশু ফাইনাল ম্যাচ আমাদের। সেজন্য আবার ওঁর কাছে এসেছি।

লামা আমাদের এক ঝলক দেখলেন। কিছু বললেন না। তিনটে ফুল পুজোর আসন থেকে তুলে মন্ত্র পড়ে আমাদর তিনজনের হাতে দিলেন। পেতলের কমন্ডলু থেকে মন্ত্রপূত জল আমাদের হাতে ঢেলে দিয়ে খেয়ে নিতে ইশারা করলেন। আমরা খেয়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণ জলের মতোই তার স্বাদ আর গন্ধ।

তামলংয়ের উদ্দেশে মৃদু স্বরে কিছু বললেন লামা। তামলং আমার পিঠে হাত রেখে একটু হেসে বললেন, তোমরা তিনজন আমাদের অতিথি। তাই উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন থুকপা আর চা খাইয়ে তোমাদের বিদায় জানাতে।

খাবারের কথা শুনে রাসেলের জিভ লকলক করে উঠেছে। সাগ্রহে বলল, থুকপার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন পোড়া কপাল, কখনও থুকপা খাইনি। আচ্ছা, কেমন করে আপনারা থুকপা বানান ?

তামলং হেসে বললেন, এটা তো আমাদের প্রতিদিনের খাবার। মকাই, জোয়ার কিংবা যবের ছাতু গরম জলে সেদ্ধ করে তৈরি করা হয়। কখনও স্থানীয় জঙ্গলের শাকসবজিও মেশানো হয়। তার মধ্যে একটু নুন ছিটিয়ে দিলেই হল, গরম গরম থুকপা তৈরি।

যে অল্পবয়েসি ভিক্ষুটি তিনটে কাচের পাত্রে থুকপা নিয়ে এল তার মুখের দিকে তাকাতেই চমকে গিয়েছি। একচোখ নেই লোকটির। দেখে গা ছমছম করে। আমাদের হাতে পাত্রগুলো ধরিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে গেল লোকটি।

মকাইয়ের লেই লেই থুকপা চেটেপুটে গেল রাসেল। আমি আর ভুলুও খেলাম। দিব্যি খেতে। সবশেষে মাখন দেওয়া চা খেয়ে গুম্ফা থেকে বেরোলাম আমরা।

১৪

যখন উৎরাই দিয়ে নামতে শুরু করেছিলাম তখনও আলো ছিল। হঠাৎ করে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। হাজার হাজার কালো ঘোড়া যেন দাপাদাপি শুরু করল আকাশ জুড়ে। নিকষ কালো আঁধারের মধ্যে লকলকে চেরা জিভ

দেখা যেতে লাগল। বেজে উঠল বজ্রের রণদামামা। ভুটানকে বলে বজ্রড্রাগনের দেশ। কালো অন্ধকারের মধ্যে আগুনের শিখা দেখে মনে হল হাজার হাজার ড্রাগন যেন রাগে ফুঁসছে। সব লন্ডভন্ড করে দেবে এখনই। ঠিক তখনই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ। বেগতিক দেখে আমরা একটা বড় ওভারহ্যাংয়ের নীচে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটু বাদে অদৃশ্য কোনও শক্তির নির্দেশে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। তুমুল বৃষ্টি থেমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল রাতারাতি। রংঝুরির দিকে নামছিলাম আমরা। ভুলু চিৎকার করে বলল, রাসেল, দাঁড়া তো একটু।

রাসেল দাঁড়াল। ভুলুর চোখ অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি রাসেলের কানের পিছনে একটা পুরুষ্টু জোঁক রক্ত খেয়ে লেপটে রয়েছে। আমি আর ভুলু মিলে টেনে ছাড়ালাম জোঁকটাকে। জোঁকটাকে ছাড়ানো মাত্রই চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়াতে থাকল রাসেলের ক্ষতস্থান থেকে। রক্ত দেখে রাসেল ভয়ে আধমরা। ঢোক গিলে বলল, সব রক্ত তো বেরিয়ে যাবে এভাবে। তাহলে বাঁচব কেমন করে ?

উল্টোদিক থেকে উঠে আসছিল কয়েকটি অল্পবয়েসি ডুকপা তরুণ-তরুণী। রাসেলকে ভয়ে জুবুথুবু হয়ে যেতে দেখে তারা হেসে কুটিপাটি। হাসি থামিয়ে একটি মেয়ে ভাঙা হিন্দিতে বলল, ভয় পাবার কিছু নেই। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জোঁকের লালায় এমন একটা জিনিস লাগানো থাকে যা রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। সে কারণে রক্ত খাওয়ার জন্য জোঁক ফুটো করলে সেখান থেকে বেরোনো রক্ত সহজে বন্ধ হয়না। একজন হেসে বলল, এর পর থেকে ভেজানো তামাকপাতা সঙ্গে রাখবে। তাহলে জোঁক ধরবে না।

আমরা ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে নীচের দিকে নামছিলাম। ভুলু বলল, লামার গুম্ফায় অজয় তামাং আমাদের দেখে কেমন একটু চমকে গেলেন। মনে হল যেন আমাদের ওখানে এক্সপেক্ট করেননি। তাই না রে চপ্পল ?

পাশ থেকে রাসেল বলল, ওই ভিক্ষুকেও তো আমার সুবিধের লাগল না। একচোখ নেই, কী ভয়ংকর মুখটা। আজ রাতে নির্ঘাৎ খুব খারাপ কিছু স্বপ্ন দেখব।

আমি একটু চুপ করে থাকলাম। তারপর ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।

রাসেল বলল, কী কথা ?

আমি বললাম, যতদূর জানি বৌদ্ধ অনুশাসন অনুযায়ী কোনও প্রতিবন্ধী ভিক্ষু হিসাবে দীক্ষিত হতে পারে না। তাহলে ?

ভুলু দাঁড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজিত হয়ে বলল, বলিস কী রে চপ্পল ? তাই যদি হয়, তবে ওই লোকটা কী করছে এই গুম্ফায়?

আমি বললাম, আরও একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে আমার। সেদিন তোরা দুজন যখন লামার গুম্ফায় এসেছিলি আমরা গিয়েছিলাম গগন সিংহানিয়ার বাড়িতে। সেখানে নিচতলা থেকে একটা কটুগন্ধ দোতলায় উঠে আসছিল। এত ঝাঁঝালো গন্ধ, যে নাক অল্প অল্প জ্বালা করছিল। আমরা জিঞ্চেস করাতে অজয় তামাং বললেন, ওটা মেথিলেটেড স্পিরিটের গন্ধ।

রাসেল বলল, তাতে কী হল ?

আমি বললাম, আমাদের ক্লাবঘরের ঠিক পাশে পল্টনদার কাঠের ফার্নিচারের দোকান আছে। সেখান থেকে কেমন একটা গন্ধ নাকে ভেসে আসে খেয়াল আছে ?

ভুলু বলল, হ্যাঁ। ওটা তো কী একটা স্পিরিটের গন্ধ।

আমি বললাম, ওটাই মেথিলেটেড স্পিরিট। কিন্তু সেই গন্ধে কি নাক জ্বালা করে আমাদের ?

রাসেল আর ভুলু সমস্বরে বলল, না তো !

আমি বললাম, সেখানেই তো খটকা লাগছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন গগন সিংহানিয়ার নীচতলা থেকে যে ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসছিল তা আসলে অন্য কোনও কেমিক্যালের গন্ধ।

রাসেল চিন্তিত মুখে বলল, তাহলে অজয় তামাং সেদিন আমাদের মিথ্যে কথা বললেন কেন ?

ভুলু বলল, সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে রে চপ্পল।

আমি বললাম, আর একটা কথা আছে। এই গুম্ফায় যে আমরা আগে এসেছি সে কথা ড্যানিয়েল ডুকপা জানলেন কী করে ? কে খবরটা দিল ওঁকে ? এখানে যাতে না আসি সেজন্য আজ প্র্যাকটিসের সময় এসে ভদ্রলোক সতর্ক করলেন বারবার। সেটা কি আমাদের ভালর জন্যে নাকি ওঁর নিজের ভালর জন্য সেটাই ভাবছি।

রাসেল বলল, কী সুন্দর ছবির মতো জায়গা এই রংঝুরি। কিন্তু সেখানে এমন ঘোর রহস্য দানা বেঁধেছে কী করে কে জানে !

সকালে প্র্যাকটিস করে ফিরতেই দেখি ডাকুকাকু ভয়ানক হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন। হিগিনজেঠু, গবাদাদু আর সনাতনকাকু ছুটে এসেছেন যে যেখানে ছিলেন। হ-গোল শুনে গবাদাদু একটিপ নস্যি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল, এত চেঁচামেচি করছেন কেন ? কিছু চুরি গেছে নাকি ?

ডাকুকাকু বললেন, দুর মশাই, চুরি যাবে কেন ? আজ ভোররাতে স্বপ্নে অনবদ্য একটা পাঁচনের ফরমুলা পয়েছি।

হিগিনজেঠু ভুরুদুটো বাঁকিয়ে বললেন, স্বপ্নে পাওয়া মাদুলির কথা শুনেছি, কিন্তু পাঁচনের রেসিপির ব্যাপারটা শুনিনি কখনও। ভেরি স্ট্রেঞ্জ !

ডাকুকাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, রান্নার রেসিপি হয়, কিন্তু পাঁচনের ক্ষেত্রে রেসিপি না বলে ফরমুলা বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

হিগিনজেঠু ঠোঁট উল্টে বললেন, ওই হল।

সনাতনকাকু বললেন, কী হয়েছে ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।

ডাকুকাকু বললেন, আজ ভোররাতে স্বপ্নে দেখেছি এক আউন্স ইপিকাকের মধ্যে একটু পাতিলেবুর রস আর দু'ফোঁটা তাড়ি মেশালে একটা শক্তিবর্ধক পাঁচন তৈরি হবে। সেই পাঁচন আমাদের ছেলেদের এক চামচ করে যদি খাওয়ানো যায় তবে দুরন্ত কাজ হবে।

গবাদাদু ঠোঁট উল্টে বললেন, যত্ত সব !

সনাতনকাকু গবাদাদুকে ইশারায় থামতে বলে ডাকুকাকুকে আশ্বস্ত করে বললেন, তাহলে বানিয়ে ফেলুন সেই পাঁচন। অসুবিধে কোথায় ?

ডাকুকাকু বিপন্ন মুখ করে বললেন, অসুবিধে আছে। আমার ট্রাঙ্কে বহু রকম গাছগাছরা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এই তিনটে জিনিস তো সঙ্গে আনিনি। এগুলো এখন জোগাড় করতে বেরোতে হবে। কাল ফাইনাল ম্যাচ, হাতে আর সময় নেই যে।

গবাদাদু চোখ গোলগোল করে বললেন, তাড়ি আর পাতিলেবু তো বুঝলাম, ইপিকাকটা কী জিনিস ? দাঁড়কাক টাইপ কিছু?

হিগিনজেঠু গবাদাদুকে বুঝিয়ে বললেন, না না, ইপিকাক সম্ভবত একজন চৈনিক পরিব্রাজক, যিনি ফা হিয়েনের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন।

ডাকুকাকু মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, আপনার মুন্ডু। ইপিকাক এক রকমের ভেষজ উদ্ভিদ। অনেক রোগের অব্যর্থ ওষধি।

সনাতনকাকু খালি গায়ে ডনবৈঠক দিচ্ছিলেন। রোদ পড়ে চকচক করছিল তাঁর খাজা কাঁঠালের মতো মাসলগুলো। সনাতনকাকু কুস্তির একটা ভঙ্গি দেখিয়ে বললেন, কাল পটনা পটাকাকে এরকম ধোবিপাট দিয়ে পটকে দিতে হবে আমাদের ছেলেদের। সেজন্য যদি বাঘের দুধ এনে দিতে বলেন তো তাইই এনে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না।

ডাকুকাকু বললেন, বাঘের দুধ চাই না। আমার চাই ইপিকাক, পাতিলেবু আর দু'ফোঁটা তাড়ি।

সনাতনকাকু বললেন, লেবুর অভাব নেই। বাজার থেকে আনিয়ে নিচ্ছি যত খুশি। এদিকে তো ইপিকাকের চাষ হয়। কেয়ারটেকার সিরিংজিকে বললে সেটার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। কিন্তু তাড়ি কোথায় পাব ? খেজুর গাছের রস পচিয়ে তাড়ি তৈরি হয় বলে জানি। সে তো হল গিয়ে নেশার জিনিস। সনাতনকাকু বিস্মিত হয়ে বললেন, কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে আপনি তাড়ি খাওয়াবেন কোন আক্কেলে ?

ডাকুকাকু আশ্বাস দিলেন, ভয়ের কিছু নেই। দু'ফোঁটা তাড়ি এতগুলো প্লেয়ারের পেটে গেলে প্রত্যেকের ভাগে কতটুকু আর পড়বে ? তাছাড়া ইপিকাক আর লেবুর সঙ্গে দু'ফোঁটা তাড়ি মিশে যাবার পর তো তার চরিত্রই তো পালটে যাবে। সেই ম্যাজিক পাঁচন একচামচ খেলে প্লেয়াররা কাল মাঠে একেবারে পাট পাট করে দেবে পটনা পটাকাকে।

হিগিনজেঠু বললেন, রংঝুরিতে খেজুর গাছ নেই, এখানে তাড়ি পাওয়া যাবে না। এখানে পাবেন ছাং। কিন্তু সে তো আর হাটে পাওয়া যাবে না। স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে মদের দোকান খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সেখান থেকে সেই জিনিস আনতে হবে।

ডাকুকাকু একটু ইতস্তত করে বললেন, কেউ আমার সঙ্গে গেলে ভাল হয়। মানে মদের দোকানে একা একা যাওয়া .. ইয়ে মানে একটু ভয় ভয় করছে আর কী।

হিগিনজেঠু বললেন, ঠিক আছে। চলুন, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

ডাকুকাকু কবজি উল্টে ঘড়ি দেখলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, চলুন চলুন। হাতে সময় খুব কম।

হিগিনজেঠু আর ডাকুকাকু যেভাবে ছিলেন সেভাবেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

গবাদাদু একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কাল ফাইনাল ম্যাচের আগে আমাদের ছেলেদের আংটিগুলো আর একবার শোধন করে নিতে হবে। যঞ্চের যা যা লাগবে সেসব আমি নিয়ে আসছি রংঝুরি বাজার থেকে। আর হ্যাঁ, গঙ্গাজল তো পাওয়া যাবে না এখানে। আপনি এক কাজ করুন। ওই দোলং নদীর জলই না হয় আনাবার ব্যবস্থা করুন একটু।

সনাতনকাকু বললেন, বেশ। আমি এক চক্কর হেঁটেও আসি, ফেরার সময় আপনার জন্য দোলং নদীর জল নিয়ে আসি। আপনি যঞ্চের বাকি জিনিসগুলো কিনে নিয়ে আসুন গিয়ে। আমি জল নিয়ে একটু বাদেই ফিরে আসছি। সনাতনকাকু গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

মাংকি টুপি আর আলোয়ান চাপিয়ে গবাদাদুও বাজারে রওনা দিয়ে দিলেন। ঘন্টাখানেক বাদে এক ব্যাগ ভর্তি যঞ্চের জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এলেন গবাদাদু। কিছুক্ষণ বাদে সনাতনকাকুও ফিরলেন একটা ছোট শিশির মধ্যে নদীর জল নিয়ে।

ইট বালি কাঁচা কাঠ দিয়ে হোমযজ্ঞ বানিয়ে জামবাটিতে মধুপর্ক, প'গব্য, আম্রপল্লব, গাঁদার মালা, কুচো ফুলের স্তুপ সাজিয়ে যঞ্চে বসলেন গবাদাদু। একটা ব্যাট আর একটা বলও সাজিয়ে রেখেছেন সামনে। ধুপধুনো দিয়ে পুজো শুরু হল। শিশি থেকে জল হাতে নিয়ে দু'এক ফোঁটা ছিটিয়ে দিলেন এদিকে ওদিকে। সনাতনকাকুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে গবাদাদু বললেন, এত বিচ্ছিরি রকম দুর্গন্ধ কেন এই জলে ? বলি, এটা কি নদীর জল নাকি নর্দমার জল ?

সনাতনকাকু বললেন, নর্দমার জল কেন হবে, এ তো দোলংয়ের জল ! আসলে হয়েছে কী, দোলংয়ের তীর দিয়ে হাঁটতে বড় ভাল লাগছিল। অপরূপ প্রকৃতি দেখতে দেখতে মনের মধ্যে একটা কবিতার পঙতি আসি আসি করে এসেই পড়েছিল যেন। তাই কতটা পথ এসেছি খেয়াল ছিল না। বেশ খানিকটা চলে আসার পর আপনার যঞ্চের কথা মনে পড়ে গেল। তখন তাকিয়ে দেখি দোলং এখানে এসে একেবারে ঘোড়ার খুরের মতো বেঁকে গিয়েছে। একটা বড় বাঁশঝোপ আড়াল করে দিয়েছে নদীটাকে। সেখান থেকেই জল নিয়ে এলাম এই শিশিতে করে।

গবাদাদু আর কিছু বললেন না। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পুজোতে। যজ্ঞ শেষ হতে হতে দুপুর গড়াল। আংটি শোধন করিয়ে নিয়ে আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন গবাদাদু। হেসে বললেন, ব্যস, আর চিন্তা নেই। পটনা পটাকার বাপের সাধ্য নেই কাল তোমাদের হারায় !

ডাকুকাকু আর হিগিনজেঠু এখনও ফেরেননি। সনাতনকাকু একটু ভেবে বললেন, তোমরা প্লেয়াররা লা' সেরে প্র্যাকটিসে বেরিয়ে যাও। আমরা অপেক্ষা করি ওঁদের দুজনের জন্য। ওঁরা ফিরলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করব।

ডাল, আলুবাজা আর মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে নিলাম আমরা। পোশাক পাল্টে ট্র্যাকশুট পরে আমরা যখন নেটপ্র্যাকটিসের জন্য বেরোব তখন হিগিনজেঠু আর ডাকুকাকু ফিরলেন মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি ঝুলিয়ে।

সনাতনকাকু জানতে চাইলেন, অভিযান সফল হল ? পেয়েছেন ছাং ?

হিগিনজেঠু ধীরে সুস্থে এসে একটা চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। হাতের শিশিটা দেখিয়ে কায়দার একটা হাসি হেসে বললেন, এই যে, নিয়ে এসেছি সেই জিনিস। কিন্তু যা হ্যাঙ্গাম হল তা আর বলার নয়।

গবাদাদু একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, উফ্, আপনাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। যেখানে যান সেখানেই কিছু না কিছু বাধিয়েই আসেন। আবার কী হল নতুন করে ?

ডাকুকাকু বললেন, আর বলবেন না। ওখানে গিয়ে দেখি দুটো লেবার প্রচুর ছাং খেয়ে বমি টমি করে শুয়ে পড়েছে উঠোনে। এদিকের লোক নয়, চেহারা দেখে মনে হল দেহাতি শ্রমিক শ্রেণির লোক। দুটো লোকই দেখলাম নেশার ঘোরে আবোলতাবোল কথা বলছিল।

সনাতনকাকু বললেন, নেশার জিনিস খেয়ে বেহেড হয়ে যাবে, আবোলতাবোল কথা বলবে, বমি-টমি করে পড়ে থাকবে রাস্তার ধারে - সেটাই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই।

হিগিনজেঠু বললেন, হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। এই লোকগুলোর বাড়ি বিহারে। এখানে কাজ করে কোন একটা কারখানায়। এমন বকর বকর করছিল যে ওখানে আরও যারা নেশাখোর ছিল সকলে দুলে দুলে হাসছিল ওদের গাঁজাখুরি গল্প শুনে। ছাংয়ের নেশা যে এত সাংঘাতিক সেটা আজ জানলাম !

ডাকুকাকু বললেন, আমার কাঁধের ঝোলায় একটু পুনর্নবা আর বুনোআকন্দের শিকড় ছিল। এই দুটো জিনিসের সঙ্গে একটু পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম লোকদুটোকে। ভেবেছিলাম লোকদুটোর নেশা বুঝি ছুটে যাবে। হল কিন্তু উল্টো। আমার পাঁচন খেয়ে কয়েকবার হিক্কা তুলে পুরো ফ্ল্যাট হয়ে গেল দুজন।

সনাতনকাকু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, ফ্ল্যাট মানে ? মরে গেল নাকি ?

হিগিনজেঠু বললেন, ফ্ল্যাট মানে ফ্ল্যাট। তাদের এখন নট নড়ন চড়ন। তবে মরেনি। এখন তারা ওই ছাংয়ের আখরাতেই লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। যা হালচাল দেখে এলাম তাতে মনে হয় কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েই থাকবে।

নেটে একটু গা ঘামিয়ে নিলাম সকলে। মাথায় অনেক এলোমেলো চিন্তা ঘুরছিল। মনের মধ্যে অনেকগুলো জট পাকানো সুতো যেন আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়। কিন্তু কিছুতেই কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

নেটে ব্যাটিং করার সময় কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। কতবার যে আউট হলাম কোনও ঠিক নেই। তারপর ফিল্ডিং প্র্যাকটিসের সময় স্লিপ ক্যাচিং প্র্যাকটিস করাচ্ছিল বাবু। অন্যদিন কঠিন ক্যাচ সহজে ধরি, আজ একটা ক্যাচও তালুবন্দি করতে পারছিলাম না।

আমাদের নেট প্র্যাকটিস সবে শেষ হল। আমরা এক এক করে গেস্ট হাউজে ঢুকছি। এমন সময় জিপ নিয়ে অনিকেতকাকু এলেন। আমার পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে বললেন, চপল, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাতে এলাম। কাল ফাইনালে জমিয়ে খেলা চাই।

আমি একটু নীচু স্বরে বললাম, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে অনিকেতকাকু।

অনিকেতকাকু ঢুকতে যাচ্ছিলেন গেস্ট হাউজের দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কী কথা ?

লামার গুম্ফায় যাকে সেদিন দেখেছি সেই একচোখ কানা ভিক্ষুর কথাটা অনিকেতকাকুকে জানালাম।

অনিকেতকাকু হাসলেন, শুধু তোমাকে বলছি, ওর নাম নিমা ওয়াংদি। পাহাড়ে ভুট্টা, আদা, অড়হরের চাষ করে আর গরু-ছাগল চরায়। গরিব লোক, টাকা নিয়ে মাঝেমধ্যে পুলিশের কাজ করে দেয়। ওকে ওই গুম্ফায় লাগিয়ে রেখেছি যদি কিছু খোঁজখবর পাওয়া যায়। ও আমাদের ইনফরমার।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ওর থেকে কিছু খবর পেয়েছেন ?

অনিকেতকাকু বললেন, গ্যালসিন লামা যে হাড়বাজার থেকে মাথার খুলি আর পায়ের হাড় কিনেছে সেটা নিয়ে সন্দেহ নেই। রংঝুরিতেই কোথাও শবদেহ থেকে হাড় আলাদা করার একটা গোপন কারখানা আছে। কিন্তু সেটা যে কোথায় সেটা ধরতে পারছি না।

আমি বললাম, গ্যালসিন লামাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ব্যাপারটা জানা যাবে না ?

অনিকেতকাকু ঘাড় নেড়ে বললেন, লামারা হল পুরোহিত শ্রেণির মানুষ। এদের প্রচুর ভক্ত আছে। একজন লামাকে থানায় নিয়ে এলে ভক্তের দল হৈ-হল্লা করবে বেশি, লাভ কিছু হবে না। ওটা হল আলটিমেট স্টেপ। আপাতত সেসব চাইছি না।

আমি একটু ভেবে বললাম, কাল বিকেলে গুম্ফায় গিয়েছিলাম আমরা। ওখানে কিন্তু অজয় তামাংকে দেখতে পেয়েছি। পেমা তামলং নামে একজন আছেন ওখানে। তাঁর সঙ্গে কী যেন গুজুর গুজুর করছিলেন। আমাদের দেখে একটু চমকে গেলেন মনে হল।

অনিকেতকাকু বললেন, তাই নাকি ?

একটু ইতস্তত করে বললাম, সেদিন গগন সিংহানিয়ার বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল আমাদের। দোতলায় কেমন যেন নাক জ্বালা করা ঝাঁঝালো গন্ধ পাচ্ছিলাম। অজয় তামাং বলে দিলেন ওটা মেথিলেটেড স্পিরিটের গন্ধ। কিন্তু আমাদের ক্লাবের পাশেই তো পল্টনদার ফার্নিচারের দোকান। আমরা সকলেই মেথিলেটেড স্পিরিটের গন্ধ চিনি। সে গন্ধে নাক জ্বালা করেনা। তাহলে অজয় তামাং সেদিন অকারণে মিথ্যে বললেন কেন ?

অনিকেতকাকুর ভুরু দুটো জড়ো হল। বললেন, সেটাই তো ভাবছি।

আমি বললাম, এদিকে আজ কী হয়েছে শুনুন। ডাকুকাকু ভোররাতের স্বপ্নে কী একটা পাঁচনের ফরমুলা পেয়েছেন। সেই জিনিস বানাতে নাকি সামান্য ছাং প্রয়োজন। সেই ছাং আনতে ডাকুকাকু আর হিগিনজেঠু একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন। রংঝুরি ছাংয়ের ডেরায় খুঁজে ঁখুঁজে গিয়ে দেখেন দুজন দেহাতি লেবার ছাং খেয়ে একেবারে আউট। তারা এত মাতাল হয়ে গিয়েছিল যে পুরো ভুলভাল বকতে শুরু করেছিল।

অনিকেতকাকু হো হো করে হেসে ফেলেছিলেন। তারপর হঠাৎ থমকে গিয়ে বললেন, কী বললে তুমি .? দেহাতি লেবার ?

আমি ঘাড় হেলিয়ে দিলাম। অনিকেতকাকু ভুরুতে ভাঁজ ফেলে বললেন, রংঝুরিতে তো সব স্থানীয় মানুষ। কোনও দেহাতি লেবার তো এখানে নেই ! এরা তাহলে কারা ?

আমি বললাম, সেটা জানতে হলে আপনাকে ওই ছাংয়ের আখরাতে যেতে হবে। তারা ডাকুকাকুর পাঁচন খেয়ে এখনও পুরো ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে সেখানে।

আমি বললাম, আজ আরও একটা কান্ড হয়েছে। গবাদাদুর যঞ্চের জন্য দোলং নদীর জল নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেই জল থেকে কেমন একটা পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল।

অনিকেতকাকু দাঁড়িয়ে পড়লেন জিপের সামনে গিয়ে। বললেন, দোলং তো আর মজে যাওয়া নদী নয়। বেশ ভাল স্রোত দোলংয়ের জলে। কাজেই সেই নদীর জল থেকে পচা গন্ধ তো আসার কথা নয়। জলটা দোলংয়ের ঠিক কোন জায়গা থেকে এনেছেন জানো ?

আমি বললাম, নদীটা যেখানে ঘোড়ার খুরের মতো বাঁক নিয়েছে সেখান থেকেই তো গবাদাদু জল এনেছেন বললেন।

আর একটাও কথা না বলে অনিকেতকাকু তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন জিপে। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জিপটা বেরিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

১৬

সকালে স্নান সারার পর সকলের হাতে আংটি পরিয়ে দিলেন গবাদাদু। আংটি পর্ব মিটতেই এল পাঁচন পর্ব। আমাদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল দেখে ডাকুকাকু আশ্বাস দিয়ে বললেন, ইপিকাক, লেবুর রস আর ছাং মিশিয়ে বানিয়েছি এই পাঁচন। এটা খেলে শরীরে হাতির শক্তি আসবে। ব্যাটসম্যান যা বল মারবে সব বাউন্ডারির ওপারে চলে যাবে। বোলারদের বলের গতিও বেড়ে যাবে দু'গুণ।

রাসেল এক চামচ পাঁচন খেয়েই যাকে বলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চোখগুলো বড় বড় করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। রাসেলের পর আমি। আমার মুখেও পাঁচন ঢেলে দিলেন ডাকুকাকু। সেই বিচিত্র জিনিস গলা দিয়ে নীচের দিকে নামতেই সারা গায়ে কাঁপুনি দিতে শুরু করল আমার। ম্যালেরিয়া রুগির জ্বর এলে যেমন হয়। মিনিট খানেক কেঁপে অবশেষে একটু ধাতস্থ হলাম। আমার পর এক এক করে প্রত্যেককে খেতে হল সেই বিচিত্র ঘন থকথকে তরল বস্তুটি।

অন্যদিন ভুলুর সঙ্গে আমার খটাখটি লাগে কথায় কথায়। আজ আমরা সকলেই চুপচাপ। প্রত্যেকেরই ভেতরে ভেতরে একটা চাপা টেনশান হচ্ছে বুঝতে পারছি। অনেক আশা নিয়ে, অনেক কষ্ট করে আমরা রংঝুরি টি-টোয়েন্টির ফাইনালে এসে পৌঁছেছি। রংঝুরি থেকে কাপ জিতে ফিরতে পারলে সেটা একটা দারুণ ব্যাপার হবে।

মাঠে এসে দেখি গ্যালারি একেবারে কানায় কানায় ভরা। আমরা মাঠে নামতেই উচ্ছ্বাস উঠল দর্শকদের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই মাঠে ঢুকল হলদে জার্সির পটনা পটাকা। ওদের জন্যও চিৎকার ভেসে এল স্টেডিয়ামের একটা দিক থেকে। প্রেস থেকেও লোক এসেছে অনেক। খেলা শুরুর আগে আমাদের দুটো টিমের ফোটো তুলল কয়েকজন। এর আগে প্রতিদিন মাঠে থাকেন, আজ রংঝুরি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট গগন সিংহানিয়া মাঠে নেই। তবে ভুটানের রাজপরিবারের একজন সভ্য মাঠে এসেছেন। তিনিই ম্যাচের বিশেষ অতিথি। তাঁর সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষে শুরু হল খেলা।

ভাগ্য সঙ্গ দিল না, হেরে গেলাম টসে। ওদের ক্যাপ্টেন আগে ব্যাট করবে বলে জানাল। আমরা সকলে মাঠের ধারে চলে এসে হাডল করলাম একবার। পকেট থেকে লামার দেওয়া ফুল বার করে প্রত্যেকের কপালে ছুঁইয়ে নিলাম প্রথমে। বললাম, কাল এক লামার গুম্ফায় গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি। এটা সেই আশীর্বাদী ফুল। এতদূরে এসে আর ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এই ম্যাচ জিততেই হবে আমাদের।

হিগিনজেঠু, সনাতনকাকু, ডাকুকাকু, গবাদাদু সকলে টেনশানে পায়চারি করছেন মাঠের বাইরে। আমাদের উৎসাহ যোগাচ্ছেন মাঠের বাইরে থেকে। ভুলু আঙুলের নখ কামড়াতে কামড়াতে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, ভয়ংকর টেনশান হচ্ছে রে চপ্পল। ফাইনাল বলে কথা। অনিকেতকাকুকেও তো মাঠের বাইরে দেখতে পাচ্ছি না।

আমি ভুলুকে ধমক দিয়ে বললাম, পুলিশের চাকরি বলে কথা, হয়তো জরুরি কোনও কাজে ব্যস্ত আছেন উনি। মাঠের বাইরে কে আছে না আছে সেসব নিয়ে অযথা চিন্তা করিস না। তুই খেলার মধ্যে থাক।

পটনা পটাকা শুরু করল ভাল। প্রথম দশ ওভারে এক উইকেটে একশো আট তুলে ফেলল ওরা। ন্যাশনাল প্রিমিয়ার লিগ খেলা ওদের অজয় কামাথ নামে ছেলেটা ওপেন করতে নেমে আটষট্টি করে ফেলল একাই। ড্রিংকসের সময় লামার দেওয়া ফুল আবার প্রত্যেক প্লেয়ারের কপালে ছোঁয়াল ভুলু। সেই মন্ত্রপূত ফুলের জন্যই কিনা কে জানে, খেলা শুরু হতে না হতেই রান আউট হয়ে গেল অজয়। মিড উইকেট থেকে রাজা সরাসরি বল ছুঁড়ে লাগাল স্টাম্পে।

অজয় আউট হবার পর রানও যেমন উঠতে লাগল, উইকেটও পড়তে লাগল সেই সঙ্গে। প্রদীপ মাহাতো নামে একজন বিহারের হয়ে রঞ্জি খেলে। সে ঝড়ের মতো একটা হাফ সেঞ্চুরি করে গেল আমরা কিছু বোঝার আগেই। কুড়ি ওভারে আট উইকেটে একশো ছিয়ানব্বই রান তুলল পটনা পটাকা। দর্শকরা তুমুল করতালিতে স্বাগত জানালেন ওদের। মাঠের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলাম এই মাঠে এটাই সবচাইতে বেশি রান। কিন্তু ওদের যেমন দুর্ধর্ষ বোলিং লাইন আপ তাতে কুড়ি ওভারে দুশোর মতো রান তোলা এককথায় অসম্ভব।

কালো কোটপ্যান্ট পরা হিগিনজেঠু ঘুরে এলেন পটনা পটাকার ক্যাম্প থেকে। গম্ভীর মুখ করে বললেন, কী অপমান কী অপমান ! পটনা পটাকার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো রীতিমত উপহাস করছে আমাদের নিয়ে। বলছে আমাদের নাকি একশো রানও তুলতে দেবে না ওরা।

সনাতনকাকু সাহস যুগিয়ে বললেন, তোমরা ম্যাচ জেতা হারা নিয়ে ভেবো না। মাঠে গিয়ে নিজের একশো ভাগ দাও। তারপর যা আছে কপালে।

সিন্টু আর বাবু ভালই শুরু করেছিল। বাবু আউট হল পাঁচ ওভারে। তখন আমাদের রান ত্রিশ। এই টুর্নামেন্টে আগের দুদিনই রান পেয়েছি। একজন ব্যাটসম্যানের যখন ব্যাডপ্যাচ চলতে থাকে তখন সব খারাপ খারাপ জিনিসগুলো ঘটতে থাকে। সবচাইতে ভাল বলটা তার বেলাতেই হয়। ওদিকে যখন একজন ব্যাটসম্যানের ভাল সময় চলতে থাকে তখন তার ভাগ্যও সঙ্গে থাকে। আমারও হল তাই।

প্রথমদিকে ওদের আউটসুইং বোলারটার বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে ব্যাটের কোনায় লাগিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়েছিলাম গালিতে। গালি ফিল্ডার সেটা হাতে জমাতে পারল না। ক্যাচটা পড়ে যাওয়ার পরও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে একটা দ্বিতীয় সুযোগ পেয়ে গিয়েছি।

ওই একটাই সুযোগ, ব্যাস। তারপর থেকে যা করতে চাইলাম তাইই যেন হতে শুরু করল। ইনসাইড আউট করে বেরিয়ে এসে দুটো ওভার বাউন্ডারি মারলাম এক্সট্রা কভারের ওপর দিয়ে। আত্মবিশ্বাস যেন একধাপে অনেকটা বেড়ে গেল। খুব তাড়াতাড়ি মাত্র ত্রিশ বলে পঞ্চাশ করে ফেললাম আমি।

উল্টোদিকে সিন্টু আউট হয়ে গিয়েছিল। ভুলু এসে কিছুক্ষণ থেকে ত্রিশের মতো রান করে ফিরে গেল। রাসেল নিজের উইকেট ছুঁড়ে এল বিচ্ছিরি ভাবে। খেয়ে খেয়ে এমন মোটকু হয়েছে যে একটা সহজ দু'রান নিতে গিয়ে পিচের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে রান আউট হয়ে গেল রাসেল। টিংকুও বেশিক্ষণ ক্রিজে টিঁকল না। তবে ওই কঠিন সময়ে মিঠু কিছুক্ষণ সঙ্গ দিল আমাকে। পনের ওভারের সময় মিঠু যখন আউট হল তখন আমাদের রান ছ'উইকেটে একশো চল্লিশ। তার মধ্যে আমার নিজের রানই একাশি। এদিকে বাকি পাঁচ ওভারে ষাট রান চাই আমাদের। হাতে চার উইকেট। বাপ্পা এল পিচে।

আউটসুইং বোলারটা এসেছে আবার। একটা বল গুডলেংথ থেকে লাফিয়ে উঠল। ক্রসব্যাট চালিয়ে মিস করেছিল বাপ্পা। বলটা সরাসরি লাগল ওর হেলমেটে। ব্যাট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে পড়ল বাপ্পা।

আমি নন স্ট্রাইকিং এন্ড থেকে ছুটে গেলাম বাপ্পার দিকে। উদ্বিগ্ন স্বরে বললাম, ঠিক আছিস তো রে ? খুব লেগেছে?

একহাতে জলের বোতল অন্যহাতে ব্যথা কমাবার স্প্রে নিয়ে ভুলু দৌড়ে দৌড়ে ঢুকল মাঠে। বাপা ঢকঢক করে পুরো বোতলের জল একাই খেয়ে নিয়ে চোখদুটো পিটপিট করে বলল, ওরেব্বাস, চারদিকে কেমন টলমল করছে সব। যা দেখছি দুটো করে দেখছি।

ভুলু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, তাহলে তো ব্যাট করতে গিয়ে দুটো করে বল দেখবি তুই। এক কাজ করিস। বাইরের বলটা খেলিস না। যে বলটা উইকেটে থাকবে সেটাই খেলিস। তাহলে আউট হবার চান্স কম থাকবে।

ভুলুর পরামর্শ শুনে বাপ্পা আরও নার্ভাস হয়ে গেল। আমি ওর ভয় কাটাবার জন্য বললাম, তুই অতকিছু ভাবিস না। কোনওরকমে ব্যাট ছুঁইয়ে আমাকে স্ট্রাইক দে। তারপর আমি দেখছি।

ভুলু আমাকে বলল, অ্যাই চপ্পল, তুই তো সেট হয়ে গিয়েছিস, এখন একটু দেখে দেখে চালিয়ে খেল।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, দেখবই যদি তবে চালাব কেমন করে ?

ভুলু জিভ কেটে বলল, হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। তারপর পকেট থেকে লামার দেওয়া সেই গাঁদাফুল বার করে আমার ব্যাটে ছোঁয়াল একবার। এসব দেখে পটনা পটাকার ক্যাপ্টেন কিছু বলল আম্পায়ারকে। মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে আম্পায়ার ভুলুকে বাইরে যেতে বললেন। ভুলু দৌড়তে শুরু করল প্যাভিলিয়নের দিকে।

বোলারের পরের বলটা আবার শর্টপিচ বাউন্সার। আবার বল গিয়ে লেগেছে বাপ্পার হেলমেটে। হেলমেট খুলে শুয়ে পড়েছে বাপ্পা। ওর দিকে ছুটে গেলাম আমি। আমি ওদিকে যেতেই বাপ্পা বলল, শাপে বর হয়েছে। মাথাটা লখ্নউয়ের ভুলভুলাইয়া হয়ে ছিল। সেই ধাঁধাটা কেটে গেছে পুরোপুরি। এখন আবার একটা করে দেখছি সবকিছু। আর কোনও চিন্তা নেই।

আমরা যে যার জায়গায় ফিরে গেলাম। নন স্ট্রাইকিং এন্ড থেকে দেখি পেস বোলারটার ভাল জায়গায় পিচ আপ হওয়া পরের তিনটে বল এলোপাথারি ব্যাট চালিয়ে পরপর তিনটে বিরাট বিরাট ছয় মেরে দিল বাপ্পা। আমি গিয়ে উৎসাহ দিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে এলাম। কিন্তু পরের ওভারে আবার ক্রসব্যাট চালিয়ে আউট হয়ে ফিরে গেল বাপ্পা।

শেষ তিন ওভারে দরকার বাইশ। পরের দু'ওভারে এগারো রান উঠল। এদিকে আরও দুটো উইকেট পড়ে গেল আমাদের। পিন্টু আউট হয়ে গেল খাতা খোলার আগেই। আমাদের শেষ ব্যাটসম্যান তমাল এল পিচে। এসেই নার্ভাস গলায় আমাকে বলল, চপল, আমার হাত পা কাঁপছে টেনশানে। ওদের সবচাইতে জোরে বোলারটা এবার আসবে বল করতে। আমাকে স্ট্রাইক দিস না প্লিজ। যা করার তুইই কর।

শেষ ওভারে এগারো রান চাই। প্রথম বলে দু'রান নিলাম পয়েন্ট বাউন্ডারিতে খেলে। তমাল এত টেনশানে ছিল যে হোঁচট খেয়ে কোনওমতে পৌঁছল ওদিকের ক্রিজে। আমার ব্যক্তিগত স্কোর দাঁড়াল তিরানব্বই। ওদিকে জিততে চাই নয় রান। সমস্ত স্টেডিয়ামের দর্শক দাঁড়িয়ে উঠেছে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়। দ্বিতীয় বলটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তুলে দিলাম লং অনের ওপর দিয়ে। বিশাল ছক্কা। আমার রান গিয়ে দাঁড়াল নিরানব্বইতে। সমস্ত দর্শক উঠে দাঁড়িয়েছে এবার। আমার সেঞ্চুরির জন্য তালে তালে হাততালি দিচ্ছে সকলে।

রাসেল এল গ্লুকোজ মেশানো জলের বোতল নিয়ে। আমাদের জল না দিয়ে নিজেই পুরো বোতল জল খেয়ে ফেলল ঢকঢক করে। তারপর একহাত জিভ কেটে বলল, যাহ্, কী যে বলতে পাঠিয়েছিল আমাকে সেটা তো পুরো ভুলে গেলাম রে চপল !

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখ করে রাসেল ফিরে গেল প্যাভিলিয়নের দিকে।

এদিকে আমি যাতে সিঙ্গলস নিই সেজন্য বাউন্ডারির দিকে সব প্লেয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে ওদের ক্যাপ্টেন। একটা সিঙ্গলস নিলেই আমার নিজের একশো রান পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ম্যাচ জেতার জন্য সবুজ সংঘের চাই আরও তিন রান। আমি যদি এক রান নিয়ে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে চলে যাই তবে তমালের স্ট্রাইক হয়। কিন্তু টেলএন্ডার তমাল ভয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। বেচারি যেমন অবস্থায় রয়েছে তাতে ও স্ট্রাইক পেলে একটা রানও করতে পারবে কিনা বলা মুশকিল। সেক্ষেত্রে এত কাছে এসেও ম্যাচটা হেরে যাব আমরা। এখন কি তবে নিজের সেঞ্চুরির কথা ভাবব ? নাকি টিমের কথা ভাবব ? এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কখনও পড়িনি আমি।

পরের তিনটে বল সজোরে ব্যাট চালালাম। বল গেল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, লংঅফ আর ডিপ ফাইন লেগে। বল ধরে ফিল্ডার সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠাল বোলারের কাছে। বাউন্ডারিও হল না, সিঙ্গলসও নিলাম না। মাঝখান থেকে শেষ বলে এসে দাঁড়াল খেলা।

শেষ বলে এখন জিততে আমাদের চাই তিনরান। ওদের বোলারটা দেখলাম বল বল ঘসছে প্যান্টে। দাঁতে দাঁত চেপে স্টান্স নিয়ে দাঁড়ালাম আবার। সবকিছু ভুলে গিয়ে তাকিয়ে থাকলাম বোলারের হাতের বলটার দিকে।

ইনিংসের শুরুতে একবার ভাগ্য আমার সঙ্গ দিয়েছিল। ইনিংসের শেষে আর একবার ভাগ্যের আশীর্বাদ পেয়ে গেলাম। পেস বোলারটার গুড লেংথ থেকে উঠে আসা বলে হুক করেছিলাম। বল ব্যাটের ওপরের কানায় লেগে উইকেটকিপারের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারিনি। চোখ বুঁজে দৌড় শুরু করেছিলাম রান নেবার জন্য। উল্টোদিক থেকে তমাল আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে পেড়ে ফেলল। খুশিতে বুঁজে যাওয়া গলায় বলল, ওভার বাউন্ডারি হয়ে গেছে চপল। বল সোজা গিয়ে লেগেছে পিছনের সাইটস্ক্রিনে। ম্যাচ জিতে গেছি আমরা। রংঝুরি টি-টোয়েন্টি কাপ এখন আমাদের !

ভুলু, রাসেল, বাপ্পারা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার তখন একটা ঘোরের মতো অবস্থা। কে যে কী বলছে কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। ওদের কোলে চড়ে মাঠের বাইরে এলাম সেই ঘোরের মধ্যেই। সনাতনকাকু, ডাকুকাকু, গবাদাদুরা উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করেছেন আমাদের প্যাভিলিয়নের সামনে। মাটিতে বসে পড়ে আনন্দে হাউমাউ করে কীসব বলছেন আর কাঁদছেন হিগিনজেঠু। পটকা ফাটাচ্ছে ভুলু আর সিন্টু। তুবড়ি জ্বালাতে শুরু করেছে বাবু, পিন্টু আর রানা।

প্রাইজ দেওয়া শুরু হল মঞ্চে। ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আমি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টও আমি। মনটা খুশিতে ভরে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন হয়ে টিমকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারার মধ্যে যে আনন্দ আছে তার কোনও তুলনাই হয় না। ভিড়ের মধ্যে আমি শুধু অনিকেতকাকুকে খুঁজছিলাম।

ট্রোফি হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করলাম আমরা সকলে। মাঠ চক্কর মেরে আমাদের টেন্টে ফিরে এসে দেখি অনিকেতকাকু ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন প্রথমে। তারপর চওড়া হাসি হেসে বললেন, একটা জব্বর খবর আছে। চোরাই হাড়বাজার কান্ডের যবনিকা পড়েছে আজ। আজ রাতে আমার ওখানে সবুজ সংঘের সকলের ডিনারের নেমন্তন্ন রইল। সেখানেই সব খুলে বলব তোমাদের।



রাসেল বলল, মুরগির এত ভাল প্রিপারেশন জীবনে খাইনি।

সনাতনকাকু চিকেন রেজালায় একটা বড় কামড় বসিয়ে বললেন, কাকে দিয়ে এত ভাল রান্না করালি তুই ?

অনিকেতকাকু ললেন, দুর্দান্ত একজন রান্নার মাসি পেয়েছি। সেই মাসিই রেঁধেছে। ভাল হয়েছে ?

আমি বললাম, কী স্বাদ, এ তো অমৃত !

অনিকেতকাকু বললেন, তোমাদের জন্য আমিই রাঁধতাম, কিন্তু কাল এত দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে যে আমার আর এনার্জি ছিল না।

সনাতনকাকু বললেন, এত ধৈর্য ধরতে পাচ্ছি না। আর দেরি না করে কাল রাতে কী কান্ড হয়েছিল সেটা বল এবার।

অনিকেতকাকু একটু হেসে বললেন, কান্ডের সূত্রপাত তোমার হাত দিয়ে। ভাগ্যিস তুমি কাল গবাবাবুর যঞ্চের জন্য দোলং নদীর জল আনতে অতদূরে চলে গিয়েছিলে !

সনাতনকাকু বললেন, গিয়েছিলামই তো। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে ভাল লাগছিল, বেশ একটা ফুরফুরে কবি কবি ভাবও জেগেছিল মনের মধ্যে। সেজন্যই অতটা দূরে চলে গিয়েছি বুঝতে পারিনি। কিন্তু এ কথা বলছিস কেন ?

অনিকেতকাকু বললেন, কাল চপলের মুখে তোমার আনা দোলংয়ের জলে বিটকেল গন্ধের কথাটা শোনার পর দেবরাজকে থানা থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম বিকেল থাকতে থাকতেই। আমরা দুজন খুঁজে খুঁজে পৌঁছে গিয়েছিলাম যেখানে দোলং নদী ঘোড়ার খুরের মতো বাঁক নিয়েছে। ওখানে গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই শাক দিয়ে ঢেকে রাখা মাছ দেখতে পেলাম বাঁশঝোপের আড়ালে।

গবাদাদু বললেন, শাক দিয়ে ঢাকা মাছ মানে ?

দেবরাজ বোস বসেছেন অনিকেতকাকুর পাশেই। তিনি একটু হেসে বললেন, ঝোপের আড়ালে একটা জালের মধ্যে দুটো লাশ কয়েকদিন ধরে চুবিয়ে রাখা হয়েছিল দোলংয়ের জলে। জলের মধ্যে নানান জীবাণু আর মাছ মৃতদেহগুলোর মাংস প্রায় পুরোটাই ক্ষয় করে ফেলেছিল। আমরা যখন জালটাকে উদ্ধার করি তখন শুধু কঙ্কালই বেরিয়ে এসেছিল জল থেকে। হাড়গুলো আলাদা হয়ে গেলেও জালের মধ্যে থাকায় হাড়গুলো আলাদা হয়ে হারিয়ে যাতে যেতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ডাকুকাকু চোখ বড় বড় করে বললেন, দুটো লাশ কয়েকদিন ধরে চুবিয়ে রাখা হয়েছিল মানে ? কার লাশ ?

অনিকেতকাকু বললেন, যে বডিদুটো সম্প্রতি রংঝুরির কবর খুঁড়ে চুরি গিয়েছিল সেগুলো।

সনাতনকাকু বললেন, লাশ চুরি করে চুবিয়ে রেখেছিল নদীর জলে ? কেন ?

অনিকেতকাকু বললেন, যাতে লাশগুলোর হাড় আর মাংস আলাদা হয়ে যায়। ফলে কঙ্কাল তৈরি করতে সুবিধে হয়, সেজন্য।

গবাদাদু বললেন, কী যে বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। যাই হোক, দুস্কৃতীদের খুঁজে পাওয়া গেছে ?

অনিকেতকাকু বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি। তবে সেই কৃতিত্বটা পুরোপুরি পুলিশের নয়। দ্য ক্রেডিট গোজ টু ডাকুবাবু অ্যান্ড হিগিনবাবু !

হিগিনজেঠু আর ডাকুকাকুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। হিগিনজেঠু গোলগোল চোখে অনিকেতকাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, দুস্কৃতীদের যে ধরতে পেরেছেন সেই কৃতিত্ব আমাদের দুজনের ?

ডাকুকাকু বললেন আপনি এই বয়স্ক লোকগুলোর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ?

অনিকেতকাকু বললেন, ঠাট্টা করছি না। সত্যি কথাই বলছি। ছাং আনতে গিয়ে দুটো দেহাতি লোককে মাতলামি করতে দেখেছিলেন না ? ওই দুটো লোক কিন্তু নেশার ঘোরে সত্যি কথাই বলেছিল। ওরাই কবর থেকে বডি চুরি করে দোলংয়ের জলে চুবিয়ে রাখত।

হিগিনজেঠু হাঁ হয়ে গিয়ে বললেন, বলেন কী ? আমরা তো ভেবেছিলাম নেশার ঘোরে লোকদুটো আবোল তাবোল বকছে।

অনিকেতকাকু বললেন, পুলিশ দাগী অপরাধীদের পেট থেকে গোপন কথা বার করার জন্য অনেক সময় নারকো-অ্যানালিসিস টেস্ট করে জানেন তো ? তার কারণ প্রবল নেশার ঘোরে আমাদের মস্তিস্ক ঠিক ঠিক কাজ করে না। গোপন কথা আর গোপন রাখতে পারে না। উগরে ফেলে। কাল ছাংয়ের আখরায় গিয়ে আমরা পেয়ে যাই ওই দুজনকে। ডাকুবাবুর পাঁচন খেয়ে দুটোই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে ছিল। আমরা যখন ওখানে গেলাম তখনও তাদের নেশার ঘোর কাটেনি। থানায় নিয়ে এসে ওদের একটু আদর করতেই সব বলে দিল আমাদের। তবে এরা নেহাতই চুনোপুটি। এই চক্রের ছোট ছোট নাটবল্টু, তার বেশি কিছু নয়। এদের পালের গোদা অন্য লোক।

ডাকুকাকু কৌতূহলী গলায় বললেন, কে সেই পালের গোদা ? তাকে কি ধরতে পেরেছেন ?

দেবরাজ বোস বললেন, ধরেছি বইকি। ওই লোকদুটোই তো নিয়ে গেল পালের গোদার কাছে।

সনাতনকাকু বললেন, আমি তো তোর কথার মাথামুন্ডু বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবি ?

অনিকেতকাকু বললেন, একটা র‍্যাকেট রংঝুরিতে হাড়বাজারের কাজ শুরু করে দিয়েছিল গোপনে। কবর থেকে বেওয়ারিশ লাশ উঠিয়ে আনত এই লোকগুলো। শ্মশানের যে কেয়ারটেকার, তার সঙ্গেও সাঁট ছিল এদের। সেই কেয়ারটেকার লোকটাকে আমরা গ্রেফতার করেছি কাল মাঝরাতে। থানায় এনে থার্ড ডিগ্রির ভয় দেখাতেই বলে দিয়েছে সব।

গবাদাদু বললেন, বলিস কী রে ! তা কী বলেছে সেই কেয়ারটেকার ?

দেবরাজ বোস বললেন, অনেক সময় মৃতদেহ সৎকার করার জন্য কেয়ারটেকারের হাতে যা হোক কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে চলে যায় অনেকে। সেই লাশগুলোকে না পুড়িয়ে কেয়ারটেকার বিক্রি করে দিত এই লোকদুটোকে। এরা আবার ডেডবডিগুলো নিয়ে গিয়ে চুবিয়ে রাখত দোলংয়ের জলে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর মৃতদেহগুলো থেকে হাড় আর মাংস আলাদা হয়ে যেত। তখন কঙ্কালটাকে তারা পালের গোদার কাছে এনে আবার চুবিয়ে দিত বিশাল এক চৌবাচ্চায়।

হিগিনজেঠু বললেন, কেন ? চৌবাচ্চায় লাশ ডুবিয়ে রাখত কেন ?

অনিকেতকাকু বললেন, সেখানে কঙ্কালের হাড়গুলোকে পরিস্কার করে কস্টিক সোডা আর জল মেশানো পাত্রে সেদ্ধ করা হত। সেদ্ধ করার ফলে আবার হাড়গুলোর মধ্যে একটা হলদেটে ভাব চলে আসত। তখন সেই হলদেটে ভাব কাটিয়ে সেগুলোতে 'মেডিক্যালি হোয়াইট' রং আনতে এক সপ্তাহ রোদে রেখে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখা হত। তারপর সেগুলো চলে যেত গোপন কারখানায়। সেখানে ভাড়া করা কিছু লোক সেই হাড়গুলোকে জোড়া লাগিয়ে পাচার করে দিত বাইরে।

আমি বললাম, কিন্তু এই কঙ্কালকান্ডের আসল কিংপিন কে ? ড্যানিয়েল ডুকপা নয়তো ?

অনিকেতকাকু বললেন, না, গগন সিংহানিয়া।

বাজ পড়লেও আমরা হয়তো এতটা চমকাতাম না। বড়রা বিহ্বল হয়ে মুখ তাকাতাকি করছেন। ভুলুর চোখ ছানাবড়ার মতো লাগছে। রাসেল এত বড় হাঁ করেছে যে একশো মাছি ঢুকে যাবে সেই গহ্বরে। আমাদের সকলের দশাই মোটামুটি একরকম।

আমাদের এক পলক দেখে অনিকেতকাকু বললেন, ওই দেহাতি লোকদুটো আর শ্মশানের কেয়ারটেকারটাকে নিয়ে কাল মাঝরাতে আমরা রেড করেছিলাম গগন সিংহানিয়ার বাড়িতে। ওঁর লেদ মেশিনের ফ্যাক্টরি শেডের একদিকে পার্টিশান দেওয়া ছিল। সেখানে ছিল বিরাট এক চৌবাচ্চা। যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা না যায় সেজন্য ত্রিপাল দিয়ে ঘেরা দেওয়া ছিল জায়গাটা। ওখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর হাড়, দুই পিপে ভর্তি কস্টিক কেমিক্যাল আর একটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিরাট ড্রাম। মাঝরাতে রেড করে বামাল সমেত ধরা গিয়েছে গগন সিংহানিয়া আর অজয় তামাংকে।

দেবরাজ বোস বললেন, আরও আছে। গগন সিংহানিয়ার ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ভুটানি টাকা ছাপাবার যন্ত্র আর কয়েক লক্ষ টাকার জাল নুগলট্রাম। বেশ কয়েক বছর ধরে বেআইনিভাবে ভারতে এই জাল টাকাগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন গগন সিংহানিয়া আর অজয় তামাং। এবার আমরা হাতেনাতে ধরেছি সবকিছু।

হিগিনজেঠু বললেন, তার মানে অজয় তামাংও এর সঙ্গে জড়িত ?

দেবরাজ বোস বললেন, গগন সিংহানিয়ার হয়ে অজয়ই দেখভাল করত পুরো ব্যপারটা। গ্যালসিন লামার গুম্ফায় গিয়ে মাথার খুলি আর পায়ের হাড় বিক্রি করে এসেছিল অজয়ই। আমাদের ইনফরমার নিমা ওয়াংদির কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি সব। নাইট শিফটে যে লেবাররা ফ্যাক্টরিতে কাজ করত তারাই গোপনে এই দু'নম্বরি কাজকর্মগুলো করত।

অনিকেতকাকু বললেন, বুঝলে চপল, সেদিন গগন সিংহানিয়ার বাড়িতে নীচ থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ আসছিল বলেছিলে না? আসলে নীচতলায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড স্টোর করা ছিল কোথাও, সেই গন্ধ চলে আসছিল দোতলাতেও। অজয় তামাং বোকার মতো মেথিলেটেড স্পিরিটের কথাটা না বললেই পারত। ও ভাবতে পারেনি মেথিলেটেড স্পিরিটের গন্ধ তোমাদের কারও চেনা হতে পারে।

সনাতনকাকু বললেন, গগন সিংহানিয়া আর অজয় তামাং এখন কোথায় ?

অনিকেতকাকু বললেন, আলিপুরদুয়ার থেকে এসডিপিও ফোর্স নিয়ে এসে দুজনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছেন। দেহাতি লোকদুটো ছাড়াও আরও জনা বিশেক লেবারদের যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা চার্জশিট তৈরি করে ফেলেছি। এদের প্রত্যেকের লম্বা হাজতবাস নিশ্চিত। এর পাশাপাশি একটা ভাল খবরও আছে। জলপাইগুড়ি থেকে পুলিশ সুপার ফোন করেছিলেন। উনি খুব খুশি। আমার প্রোমোশনের জন্য ওপরমহলে সুপারিশ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আমরা খুশি হয়ে বললাম, বাহ্, এ তো দারুণ খবর।

সনাতনকাকু এঁটো হাতেই অনিকেতকাকুর পিঠে একটা চাপড় মেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, জিতে রহো ! আমার দ্বারা তো হল না, তুই আমাদের বংশের নাম রাখলি !

১৮



সনাতনকাকুর কাছে আমি, ভুলু আর রাসেল বেশ বকুনি খেয়েছি ওঁদের না জানিয়ে গ্যালসিন লামার গুম্ফায় গিয়েছিলাম বলে। তবে সব শুনে উনি আবার ভীষণ কৌতূহলীও হয়েছেন ফেরার আগে লামার গুম্ফাটা একবার দেখে যাবার জন্য। মূলত সনাতনকাকুর উৎসাহেই ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা সকলে মিলে হাঁটতে হাঁটতে এসেছি গ্যালসিন লামার গুম্ফায়।

এসে দেখি গুম্ফায় পেমা তামলং আছেন, জপযন্ত্র আর মণি হাতে অন্য ভিক্ষুরা আছেন। তবে নিমা ওয়াংদিকে দেখা গেল না।

তামলং আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

লামা তখন সবে পুজোয় বসেছেন। অবলোকিতেশ্বের মূর্তির সামনে খোলা পুঁথি, ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে সারি সারি, ধুপের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। কাচা দুধ রয়েছে একটা পাত্রে, সাদা ফুল রয়েছে অগুনতি। আড়চোখে এদিক ওদিক দেখলাম, আজ অবশ্য মাথার খুলি বা হাড় পুজোর আসনে দেখতে পেলাম না।

সনাতনকাকু পুজো দিলেন গুম্ফায়। পুজোর পর কলা আর লাড্ডু প্রসাদ নিয়ে এলেন তামলং। লামার নির্দেশে মাখন দেওয়া চা আর লেই লেই থুকপা এল সকলের জন্য। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রত্যেককে একটা করে ধাতুর বুদ্ধমূর্তি আর 'ওম মণিপদ্মে হুম' লেখা জপযন্ত্র উপহার দিলেন গ্যালসিন লামা।

তামলং একগাল হেসে বললেন, এগুলো বাড়িতে যত্ন করে রেখে দেবেন, দেখবেন বাড়ির মঙ্গল হবে।

গুম্ফা থেকে গেস্ট হাউজে ফিরতেই দেখি ড্যানিয়াল ডুকপা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের প্রত্যেকের জন্য ডুকপাদের ঝলমলে পোশাক 'বখু' নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। ওভারকোটের মতো দেখতে রংবেরংয়ের সেই পোশাক পরে ছবি তোলা হল গেস্ট হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে। কলেজের ডিগ্রি পেলে যেমন ছাত্রছাত্রীরা গ্রুপফোটো তোলে, তেমন করে। হিগিনজেঠুকে কালো কোটপ্যান্ট ছাড়া অন্য পোশাকে এই প্রথম দেখলাম আমরা সকলে।

অনিকেতকাকর জিপ এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এসে সনাতনকাকুর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বললেন, দাদা, একটা ভাল খরব আছে। এই একটু আগে থানায় ফোন এসেছিল কলকাতা থেকে। এই সপ্তাহেই নাকি অর্ডার

বেরোচ্ছে, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার পদে প্রোমোশন হতে চলেছে আমার। রংঝুরিতে তো ডিএসপি পোস্ট নেই, তাই যেতে হবে অন্য কোনও জেলায়।

সনাতনকাকু বুকে জড়িয়ে ধরলেন ভাইকে। বললেন, তোর জন্য আমার গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে।

অনিকেতকাকু গলায় বিষাদ মিশিয়ে বললেন, চাকরিতে পদোন্নতির জন্য যেমন খুব খুশি খুশি লাগছে, পাশাপাশি রংঝুরি ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে খারাপও লাগছে। খুব মায়া জড়িয়ে গেছে এই ছবির মতো জায়গাটার সঙ্গে।

নিজেদের লাগেজ নিয়ে আমরা বাসে উঠছি। ডাকুকাকুর বিশাল ট্রাংকটা ওঠানো হল বাসের মাথায়। গবাদাদু সেদিকে তাকিয়ে একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, এই গন্ধমাদন যে কী করতে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন কে জানে !

ডাকুকাকু আগুনে চোখে তাকালেন গবাদাদুর দিকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গবাদাদু কপালে দুটো হাত ঠেকিয়ে বললেন, তবে হ্যাঁ, সত্যিকারের কবিরাজ ছিলেন আপনার বাবা আয়ুর্বেদাচার্য দক্ষিণারঞ্জনবাবু। ধন্বন্তরী লোক ছিলেন উনি। আমিও ওঁর পাঁচন খেয়েছি ছোটবেলায়। খেতেও ভাল, কাজও করত ম্যাজিকের মতো। নাহ মশাই, আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে কিছুই পাননি।

ডাকুকাকু মুখ ভেংচে বললেন, বললেই হল ! এই যে রংঝুরি টি-টোয়েন্টিতে সবুজ সংঘের ছেলেরা বাঘের বাচ্চার মতো খেলে ট্রোফি জিতল সেটা কি এমনি এমনি হল ? আমার পাঁচন না খেলে সেটা সম্ভব হত ?

গবাদাদু একগাল হেসে বললেন, সবুজ সংঘ ট্রোফি জিতে নিয়ে যাচ্ছে তার আসল কারণ মোটেই আপনার পাঁচন নয়। আসল কারণ হল এই শর্মার মোক্ষম পরামর্শ। টিমের কোষ্ঠীবিচার করে জার্সির রং সবুজ থেকে পাল্টে নীল করে দিয়েছিলাম আর টিমের ক্যাপ্টেনের হাতে নীলকান্ত মণির আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম বলেই না টিমটা চ্যাম্পিয়ন হল !

ডাকুকাকু রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হিগিনজেঠু জজসাহেবের মতো করে চেঁচালেন, অর্ডার, অর্ডার। আপনারা এবার দয়া করে চুপ করুন। রংঝুরি কাপ জেতার কৃতিত্ব নেবার জন্য আপনারা আসল জিনিসটাই ভুলে যাচ্ছেন যে।

ডাকুকাকু আর গবাদাদু একসঙ্গে বললেন, কী জিনিস ?

হিগিনজেঠু বললেন, রংঝুরি টি-টোয়েন্টি জেতার আসল কারণ আপনারা নন, প্লেয়াররা। ওরা দুর্ধর্ষ খেলেছে বলেই আমাদের টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নিন ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করে এবার চলুন। ওই দেখুন রংঝুরি টুর্নামেন্ট কমিটির লোকজন এক এক করে জড়ো হচ্ছে বাইরে। ওদের কাছে আর নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলবেন না।

ধন্ধুমার লড়াইটা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। ডাকুকাকু আর গবাদাদু চুপ করে গেলেন।

ড্যানিয়েল ডুকপা সমেত রংঝুরি টুর্নামেন্ট কমিটির বাকি সদস্যরা এসেছেন আমাদের বিদায় জানাতে। ঢাউস ফুলের বুকে ওঁরা উপহার দিলেন সনাতনকাকুর হাতে। ক্রিস্টালের বিশাল সাইজের চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি আর এক লক্ষ টাকার চেক তো পেয়ে গিয়েছি কাল বিকেলেই। ড্যানিয়েল ডুকপা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্তরিক গলায় বললেন, পরের বছর আরও বড় টুর্নামেন্ট হবে রংঝুরিতে। সবুজ সংঘ যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করে সেখানে।

সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরা বাসে উঠে পড়লাম। রংঝুরি ছেড়ে বেরিয়ে এল আমাদের বাস। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি শীতের দুপুরের হলদে রং বদলে যাচ্ছে বিকেলের মেহগিনি রংয়ে। রংঝুরি চা-বাগানের পাশ দিয়ে আমরা একটু একটু করে নীচের সমতলের দিকে নামছি। আবার সেই ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়, আবার সেই শুয়ে থাকা সাপের মতো নির্জন আঁকা বাঁকা সড়ক। আবার ঘন সবুজ জঙ্গল আর ছটফটে দোলং নদী পথের দু'দিকে। আবার খাদের ওদিকের পাইনবনে মেঘ আর রোদের লুকোচুরি। সবকিছু পিছনে ফেলে আমাদের বাস নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

এই ছবির মতো সুন্দর জায়গাটা, এই সহজসরল মানুষজনকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। কিন্তু এটাই তো নিয়ম, একটা সময় আসে যখন সব প্রিয় কিছুই আমাদের ছেড়ে যেতে হয়। তাই যতক্ষণ আলো আছে বাসের জানলায় তৃষ্ণার্ত চোখ রেখে বসে আছি বিভোর হয়ে। রংঝুরি ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে মনটা ভার ভার, গলার কাছে কেমন একটা অচেনা অনুভূতি হচ্ছে। আর কয়েক ঘন্টা মাত্র, রাতের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব জলপাইগুড়িতে।



অলংকরণঃ অংশুমান



পুষ্পেন মণ্ডল

চেরাপুঞ্জি মানে চিরহরিৎ পাহাড়ে ঢাকা, মোহময়, বৃষ্টিস্নাত, অসংখ্য ঝর্ণা আর অর্কিডে মোড়া পূর্ব হিমালয়ের কোলে রহস্যময় এক মেঘের রাজ্য। কথাটা বলেছিলেন তীর্ণার বাবা। আর সেই মত রেনকোট, ছাতা নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিল ওরা। কিন্তু এখানে এসে রীতিমত আশাহত হল তিনজনেই। মনে হল বরুণদেব তাদের উপরে মোটেই সদয় নন। শুধু দু এক টুকরো সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছাড়া পুরো আকাশ নীল। পুজোর ছুটি কাটানোর জন্য চেরাপুঞ্জির নাম প্রথম বলেছিল তীর্ণা। ঋজু আর পাতাকে রাজি করাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবে ঘুমসি পাহাড়ের বাংলোয় এসে তাদের ভালোই লাগল। জায়গাটা চেরাপুঞ্জি থেকে কিছুটা ভিতরে। পুরো ছশো একর এলাকা জুড়ে রাবার গাছের জঙ্গল। মাঝামাঝি একটা পাহাড়ের মাথায় এই কাঠের বাংলো। পাহাড়ের মাথা থেকে অসাধারণ একটা ভিউ পাওয়া যায়। তীর্ণার বাবার এক বন্ধু এই রাবার গাছের জঙ্গল লিজ নিয়েছেন। ম্যানেজার সুরেশ বাবু অমায়িক ভদ্রলোক। বহু দিন আছেন এখানে। দুদিন ধরে পুরো জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখালেন ওদের। চেনালেন কোন গাছের রস থেকে বেলুন আর কোন গাছ থেকে গাড়ির টায়ার তৈরি হয়। অসাধারণ কয়েকটা ঝর্ণা আছে গভীর অরণ্যের মধ্যে। আর দেখালেন বহু প্রাচীন ভগ্নপ্রায় একটা দুর্গ, রাজাদের তৈরি কালীমন্দির, তার পিছনে সুগভীর পাথরের কুয়ো আর একটা মাঝারি নীল জলের লেক।

তিন দিন অপেক্ষা করার পরে প্রথম বৃষ্টির দেখা পেল ওরা। বাংলোর বারান্দায় বসে তখন মুচমুচে পকোড়া আর চা সহযোগে আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। তীর্ণাই প্রথম প্রসঙ্গটি উত্থাপন করল। একটা বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে বলল, "সাইকোলজিক্যাল রিপ্রেসান অফ মোটিভেটেড ফরগেটিং। মানে বিশেষ কিছু কারণে মানুষ ধীরে ধীরে পুরানো কথা ভুলে যায়। অর্থাৎ স্মৃতিভ্রম।"

পাতা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "হঠাৎ স্মৃতিভ্রম নিয়ে পড়লি কেন?"

সে হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, "সাইকোলজির জার্নালটা বুকশেলফ থেকে পেলাম। এই শব্দটির উপরে গোল করে লাল কালির দাগ দেওয়া আছে। তাই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি।"



ঋজু উদাসীন গলায় পকোড়ায় কামড় বসিয়ে মন্তব্য করল, "নিশ্চয়ই কোন পাগলের ডাক্তার এটা ফেলে গেছে।"

"বইটার শেষ পাতায় একটা সিগনেচার আছে। সি.এ.শঙ্খ সেন। ডাক্তার হলে ডঃ লেখা থাকত।"

"সি.এ. মানে কী চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট?"

"হতেও পারে।"

টুকরো কথাগুলি হয়ত ম্যানেজারের কানে গিয়েছিল। এগিয়ে এসে বললেন, "দেখি।"

বইটা হাতে নিয়ে ভ্রু দুটো কুঁচকে গেল তাঁর। বললেন, "বইটা এখানে থেকে গেছে জানতামই না।"

ঋজু প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপার ম্যানেজারবাবু, কার বই এটা?"

"শঙ্খ সেন বছরদুয়েক আগে এসেছিলেন আমাদের বাগানের ইন্সপেকশনে। তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। সে এক অদ্ভুত ঘটনা।"

তীর্ণা সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, "উধাও হয়ে গেলেন মানে? একটু খুলে বলুন না।"

ঋজু বলল, "হ্যাঁ, এরকম বৃষ্টি বাদলার দিনে চা, পকোড়ার সাথে দু একটা অদ্ভুত ঘটনা না জুড়লে ঠিক জমবে না।"

সবাই মিলে চেপে ধরতে তিনি বসে পড়লেন সোফায়। কাচের জানালা দিয়ে ঝমঝমে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রায় পনের বছর হল আমি এখানে আছি। নির্জন জনমানবশূন্য জঙ্গলে প্রায় একা এতগুলি বছর কাটিয়ে দিলাম। আপাতশান্ত এই বনজঙ্গলের মধ্যে মিশে আছে অনেক ইতিহাস আর রহস্য। হাজার হাজার বছর ধরে এই বনভূমি লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের অলৌকিক সত্ত্বাকে লুকিয়ে রেখেছে। তোমরা যারা শহরে বড় হয়েছ, হয়ত উপলব্ধি করতে পারবে না সেই রহস্যের শিকড় কতটা গভীর। সে রকমই এক অদ্ভুত ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা।"

হঠাৎ কথা থামিয়ে উঠে গিয়ে দেরাজ খুলে একটা ডায়রি বের করে আনলেন তিনি। তারপর আবার শুরু করলেন, "ভদ্রলোক যখন প্রথম আমার কাছে এসেছিলেন তখনও তাঁর কথাবার্তা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হয়নি। বেশ লম্বা চওড়া, ফর্সা, টিকালো নাক, অমায়িক ব্যবহার। প্রথম থেকেই তাঁকে আমি খুব পছন্দ করতাম। তিনি আমাকে যা বলেছিলেন আর এই ডায়রির নোট দেখে তাঁর জবানিতেই আমি ঘটনাটা বলছি।"

****

কর্মসূত্রে বেশ কিছু দিন ছিলাম শিলং শহরের এক অভিজাত হোটেল "পাইন উড"-এ। সারাদিন অডিটের কাজে ঘুরে বেড়াতাম বিভিন্ন চা বাগানের অফিসে। কাজের চাপ যখন একটু কমল, তখন আকস্মিকভাবে একদিন আলাপ হল কৃষ্ণকিশোর গুপ্তার সঙ্গে। উনি একই হোটেলে পাশের কটেজে ছিলেন। শুনেছিলাম অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা। সবাই ওঁকে 'কেকে স্যার' নামে সম্বোধন করত।

সকালে উঠে হোটেলের কম্পাউন্ডের মধ্যেই একটু হাঁটাহাঁটি করতাম। ভোর রাতের কনকনে ঠাণ্ডার পরে মিঠে রোদটা যখন পুবদিকের গাছপালার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এসে গায়ে লাগত, ভারি আরাম হত। কানে আসত ছোট ছোট চড়াইপাখির অবিরাম কিচিরমিচির।

একদিন একটু বেশি ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখলাম, সূর্য উঠতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। লেপকম্বল সরিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি সামনের একটুকরো ফাঁকা ঘাসে ঢাকা লনের উপর প্ল্যাস্টিকের ম্যাট বিছিয়ে আবছা অন্ধকারের মধ্যে একজন যোগাসন করছেন। পরনে ট্রাকসুট আর হনুমান টুপি। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, কিন্তু শরীর একদম ফিট। ধীরেধীরে আলো বাড়তে লাগল। ব্যায়াম শেষ করে ম্যাট গুটিয়ে ভদ্রলোক রুমের দিকে হাঁটা দিলেন।

আমি সামনাসামনি পড়ে যাওয়ায় বললাম, "গুড মর্নিং স্যার।"

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, "সূরজ সিংহ না?"



আমি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, "না স্যার, আমার নাম শঙ্খ সেন, বাড়ি কলকাতায়।"

তিনি আরো কিছুক্ষণ আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে, "আমারই ভুল," বলে নিজের কটেজের দিকে চলে গেলেন।

ভদ্রলোকের সন্দেহজনক চাহনিটা মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকল। অবশ্য কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরলাম সে কথা আর মনে নেই।

রাতে হঠাৎ দরজায় দুমদুম আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। লাইট জ্বেলে দেখলাম ঘড়িতে সাড়ে বারোটা। শৈলশহরে তখন মাঝরাত। এত রাতে কে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে! ছিটকিনি খুলে বেশ অবাক হলাম। শাল মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন 'কেকে'।

ভারি গলায় বললেন, "তোমার সাথে একটা জরুরি কথা ছিল। তাই এত রাতে বিরক্ত করলাম। আসলে কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

"আসুন, ভিতরে আসুন।" বলে দরজাটা বন্ধ করে এসে তাঁর সামনের চেয়ারে বসলাম। লক্ষ করলাম তাঁর চোখের চাহনিতে যেন একটা অস্থির ভাব। কিছুটা ইতস্তত করে, একটা ছোট্ট গলা ঝাড়া দিয়ে বললেন, "তুমি খুব অবাক হয়েছ বুঝতে পারছি। সকালে তোমাকে সূরজ সিংহ ভেবে ভুল করেছিলাম। কেন ভুল করেছিলাম সেটা এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে। তোমার সাথে দেখা হওয়ার পরে এখানের স্টেট লাইব্রেরিতে গিয়ে অনেক খুঁজে ১৯৯১এর ২রা নভেম্বরের শিলং টাইমসে এই ছবিটা পেয়েছি।" বলে শালের ভিতরে বুক পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে তাতে একটা ছবি দেখালেন।

আমি ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম ছবিটা পুরানো খবরের কাগজ থেকে নেওয়া। পাগড়ি আর শেরওয়ানি পরা সুপুরুষ চেহারার এক ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন সেখান থেকে। পাকানো গোঁফ। দীপ্তিমান চাহনি। মুখের আদলটা হুবহু আমার মত। জিজ্ঞাসা করলাম, "কে ইনি?"

"কোপিলাগড়ের রাজা ভান সিংহ। সূরজ সিংহ হল এঁর ছোট ছেলে। সে বহু বছর নিরুদ্দেশ। আনুমানিক বয়স তোমার মতই হবে। জীবিত না মৃত তা কেউ জানে না।" একটু থেমে আবার বললেন, "কোপিলাগড়ের নাম শুনেছ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"ও! তাহলে তোমাকে প্রথম থেকে সব কিছু বলতে হবে।" কোটের পকেট হাতড়ে একটা মোটা চুরুট বের করে ধরালেন। তামাকের গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে শুরু করলেন, "ইংরেজরা আসার আগে আসামের নাম ছিল 'কামরূপ'। সমুদ্রগুপ্তের আমলে তৈরি এলাহাবাদ পিলারে 'কামরূপ'-এর উল্লেখ আছে। সমুদ্রগুপ্তের নাম বললাম কারণ এ ঘটনার একটা যোগ আছে তাঁর সাথে। 'কামরূপ'এর মধ্যে বেশ কয়েকটা নেটিভ রাজ্য পড়ত। কোপিলাগড় তেমনই একটা রাজ্য। ছোটোছোটো রাজ্যগুলোর মধ্যে সবসময়েই লেগে থাকত যুদ্ধ বিবাদ। আঠারশো তিরিশের পরে এই জায়গাগুলি 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র অধীনে চলে যায়। এদের মধ্যে একমাত্র খাসি উপজাতিদের রাজা তিরট সিংহ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যাই হোক, আমার গল্প শুরু ভারত স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে। তোমাকে শুধু ইতিহাসটা বলে রাখলাম জেনে রাখার জন্য।"

কড়া তামাকের গন্ধে আমার ঘুম ঘুম ভাবটা ততক্ষণে চলে গেছে। পা মুড়ে গদিওয়ালা চেয়ারের উপরে বসে চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিলাম। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডাটাও কীরকম জাঁক দিয়ে পড়ছে। রুম হিটার চলছে অথচ কাঠের ঘরগুলো যে কে সেই হিমশীতল।

"উনিশশো বাহাত্তরের পরে মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ আলাদা আলাদা রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়ায় এই সব ছোট ছোট নেটিভ রাজ্যগুলির রমরমা ধীরে ধীরে চুপসে যেতে থাকে। মোট কথা তাদের খেটে খাওয়ার দিন শুরু হয়। কেউ জঙ্গলের কাঠের ব্যবসা শুরু করে, কেউ চায়ের বাগান। আবার অনেকে পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া মূল্যবান জিনিসপত্র বিক্রি করে অর্থের সংস্থান করতে থাকে। এরকমই, কোপিলাগড়ের রাজা ভান সিংহ কিছু বিদেশি খদ্দেরের কাছে ঐতিহাসিক জিনিস বিক্রি করতে এসেছিলেন এই শিলংয়ে। সেটা ছিল উনিশশো নব্বইয়ের গোড়ায়। তাঁর নিজের একটি বাংলো আছে



কাছেই। আমি তখন এখানে পোস্টেড। এক রাতে বাংলোতে জবরদস্ত পার্টি দিলেন। বহু নামিদামি লোকেদের সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। পুরোপুরি রাজকীয় সাজে উপস্থিত হলেন রাজা ভান সিংহ। মাথায় দামি পাথর বসানো পাগড়ি, রঙিন পাথর আর সোনার সুতো দিয়ে কাজ করা শেরওয়ানি, কোমরে ঝোলান সোনালি তলোয়ার। পায়ে নাগরা জুতো।"

"অনুষ্ঠান তখন শেষ পর্যায়। হঠাৎ, প্রায় দেড়শ লোকের সামনে কোমরের তলোয়ারটা খুলে আকাশের দিকে উঁচিয়ে রাজা বললেন, 'এটা হল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের তলোয়ার। আমাদের বংশের পূর্বপুরুষকে সমুদ্রগুপ্ত এটা উপহার দিয়েছিলেন তাঁর হয়ে পূর্ব ভারতকে শাসন করার জন্য।' কথাটা বলতেই করতালিতে গোটা হল ফেটে পড়ল। তারপর বাকি অনুষ্ঠানে একমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল এই তলোয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য।"

"তারপর?" আমার উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে।

"সোচ্চারে এই কথাটা ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ছিল ঐ তলোয়ারটি তিনি বিক্রি করতে চান এবং অতিথিদের মধ্যে কিছু বিদেশি খরিদ্দাররাও উপস্থিত ছিলেন। আমি সেদিন নিজের হাতে তলোয়ারটা ধরে দেখেছিলাম। খাপটা পুরো সোনার তৈরি, তার উপরে সূক্ষ্ম কারুকাজ। হাতলটাও সোনার। তার ওপরে গড়ুরস্তম্ভের খোদাই করা ছবি। ফলাটা খাঁটি লোহার। কিন্তু এতটুকু মরচে পড়েনি। তলোয়ারটির গায়ে অচেনা ভাষায় কিছু লেখা। অনুষ্ঠানে হাজির এক ভদ্রলোক সেটা দেখে বললেন ভাষাটা পালি ভাষা আর ওতে সমুদ্রগুপ্তের নামটাই লেখা রয়েছে।"

"কত দামে বিক্রি হল?"

"বিক্রি আর হল কই? সেই রাতেই রাজা ভান সিংহ তাঁর বাংলোতে আত্মহত্যা করেছিলেন। তলোয়ারটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর তখন থেকেই তাঁর ছোট ছেলে সূরজ সিংহও বেপাত্তা। অনেকের ধারণা রাজাকে খুন করা হয়েছিল।"

"কে খুন করল ভান সিংহকে? তাঁর ছেলে?"

"সেটা একরকম অসম্ভব। কারণ ছোট ছেলের বয়স তখন পাঁচ বছর। তার জন্মদিন উপলক্ষেই দিয়েছিলেন পার্টিটা। সে জন্যই তোমাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। বড়ো হলে সে একদম তোমারই বয়সী, তোমার মতই দেখতে হত।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "তা শেষ পর্যন্ত খুনের কোন কিনারা হয়নি?"

"না। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেছিল। আমি নিজে তদন্তের খুঁটিনাটি দেখেছিলাম। কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। শেষে আত্মহত্যা তত্ত্ব মেনে নিয়ে পুলিশ ফাইল বন্ধ করে দেয়। সেই সময়ে চীন সীমান্তে আবার নাগা আর বোরো জঙ্গিদের উৎপাত চলছিল খুব। তাই ধীরে ধীরে এ ব্যাপারটাও ভুলে যায় সবাই।"

"কীভাবে মারা গিয়েছিলেন তিনি?"

"পরদিন বন্ধ দরজা ভেঙে দড়ির ফাঁসে ঝুলন্ত শরীর উদ্ধার হয়েছিল। কোন সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। ঘরে একটা বড়ো সিন্দুক ছিল। পুলিশ সেটা খুলে দেখল অন্যান্য দামী জিনিস, টাকাপয়সা সব আছে, কিন্তু তলোয়ারটা নেই। তাঁর স্ত্রী বাংলোতেই অন্য ঘরে ছিলেন। ছোট ছেলেটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তাকেও খোঁজার কোন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু যেন কর্পূরের মত উবে গেল সে। রাজার স্ত্রীর শোকে পাগলের মত অবস্থা হয়। বড় ছেলে বিরজু সিংহের বয়স তখন কুড়ি। দিল্লীতে মামার বাড়িতে ছিল।



"রাজবংশের মধ্যে এ রকম অপঘাতে মৃত্যু বা নিরুদ্দেশ অনেক দেখা যায়। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। আমার একটাই আফশোষ ছিল, সমুদ্রগুপ্তের তলোয়ারটা হাতে পেয়েও ফসকে গেল। অত দামি জিনিস! ঐতিহাসিক মূল্যও অনেক। জাতীয় সম্পদ আমাদের।"

আমি বললাম, "সে কথা যদি বলেন, জিনিসটা তো বিদেশিদের কাছে বিক্রিই হয়ে যেত।"

কেকে মাথা নেড়ে বললেন, "না, আমরা সেটা কখনই হতে দিতাম না। পুলিশ সবার উপর নজর রাখছিল।" চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে

বললেন, "এর বেশ কয়েকবছর পর, আমি তখন দিল্লীতে ট্র্যান্সফার হয়েছি। কনটপ্লেসের এক বড়ো জুয়েলারির দোকানে সরকারি রেড-এ গুপ্তযুগের বেশ কিছু সোনার মুদ্রা পাওয়া যায়। তদন্তে জানা গেল এই প্রাচীন মুদ্রাগুলি কোন মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া নয়। দোকানের মালিক জানায়, সেগুলি তাদের বংশের জিনিস। তার দিদির শ্বশুরবাড়ি কোপিলাগড় থেকে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভান সিংহের বড়ো ছেলে বিরজু সিংহ-এর কথা মনে পড়ল। এটা কি তার মামার দোকান? বাবার মৃত্যুর পর থেকে তার একবারও দেখা পাওয়া যায়নি।"

"দেখা গেল আমার অনুমানই সত্যি। বিরজু সিংহকে জেরা করে জানা গেল অদ্ভুত কিছু কথা। জানি না আমাদের তদন্ত বিপথে চালনা করার কোন অভিসন্ধি তার ছিল কি না!"

"কী জানা গেল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

সে জানাল, "কোপিলাগড়ের পুরানো দুর্গের নিচে আছে হাজার বছরের পুরানো ধনরত্নের ভাণ্ডার। তাদের বংশের পূর্ববর্তী রাজারা সেই রত্নভাণ্ডারের হদিশ জানতেন। কিন্তু তার বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর সেই রাস্তা নাকি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।"

"আপনারা বিশ্বাস করলেন সে কথা?"

"বিশ্বাস করা বা না করা দুটোই প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে এরপর বিরজু সিংহও একেবারে বেপাত্তা হয়ে যায়। -- আমি নিজের সোর্স লাগিয়ে কোপিলাগড়ে খোঁজ খবর চালিয়ে জানতে পারি গ্রামের আদিবাসীদেরা বিশ্বাস করে দুর্গের নিচে লুকানো আছে গুপ্তধন।"

এদিকে রাত বাড়ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠাণ্ডা। গল্পের গন্ধে তখন আর আগের মত ঠাণ্ডাটা মালুম হচ্ছে না আমার।

একটু থেমে থেকে কেকে ফের শুরু করলেন, "কোপিলাগড় চেরাপুঞ্জির কাছে এক জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘেরা টিলার মাথায়। আগেও আমি গিয়েছিলাম রাজা ভান সিংহের মৃত্যুর তদন্ত করতে। এই ঘটোনার পর আবার গেলাম সেখানে। আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন লোকও ছিল আমাদের সাথে। কিন্তু পুরো দুর্গ এক মাস ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পেলাম না।"

"তারপর?" আমি প্রশ্ন করলাম।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "আমার কেরিয়ারের সব থেকে বড়ো অমীমাংসিত রহস্য বলতে পারো। রিটায়ার করার পরেও ঘটনাটা আমার মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারছিলাম না। খোঁজখবর চালিয়েই যাচ্ছিলাম এদিকসেদিক। সেই করতেকরতেই বেশ কয়েকবছর পর কামাখ্যা পাহাড়ে অম্বুবাচির মেলায় এক তান্ত্রিকের খোঁজ পাই। উত্তর পূর্ব হিমালয়ের প্রত্যন্ত গুহায় তিনি সাধনা করেন। বয়েস নাকি একশর উপরে, যদিও দেখে বোঝার জো নেই। যাই হোক, শুনেছিলাম তিনি কোপিলাগড়ের রাজাদের চিনতেন। এবং রাজবংশের সাথে তাঁর একটা সম্পর্কও ছিল। তবে অনেক সাধাসাধি সত্ত্বেও এই বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।"

এরপর কেকে একদৃষ্টি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল সেই ঘোলাটে চাহনির সামনে চুপচাপ বসে থাকতে। শেষে আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি আমাকে আর কিছু বলবেন?"

শুনে একটু নড়ে উঠে অদ্ভুত প্রশ্নটা আবার করে বসলেন তিনি, "তুমি সত্যি সূরজ সিংহ নও? সেই এক চোখ, একইরকম জোড়া ভ্রু। নিজের ছোটোবেলার কথা কি তোমার মনে পড়ে?"

ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্ত গলায় বললাম, "না গুপ্তাজি, আমার মনে হয় আপনার কোন ভুল হচ্ছে। রাত অনেক হল। কালকে আমার জরুরি মিটিং আছে। গুড নাইট।"

ভদ্রলোক একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেন বলে মনে হল, কিন্তু মুখে আর কিছু না বলে তিনি উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বাকি রাতটা প্রায় না ঘুমিয়েই কাটল আমার। মাথার মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তার উদয় হচ্ছিল। একই ধরনের দেখতে কত মানুষই তো পৃথিবীতে আছে। আমিই যে সেই হারিয়ে যাওয়া সূরজ সিংহ, এ বিষয়ে এতটা নিশ্চিত ভদ্রলোক কী করে হচ্ছেন?



আসলে আমার মনের মধ্যে একটা খটকা লেগেই থাকছিল। সেটা হল, নিজের ছোটোবেলার কথা আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। কলকাতার নামকরা এক স্কুলে পড়াশোনা করেছি। কিন্তু তার আগের ঘটনা মনে নেই কেন?

এপাশ ওপাশ করতে করতে ভোররাতের দিকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। পরদিন ঘুম ভাঙল দশটা নাগাদ। কেকের খোঁজ করায় জানতে পারলাম, তিনি চেক আউট করে গেছেন ঘণ্টাদুয়েক আগেই। আমিও তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন মেঘালয়ের নাম করা এক টি এস্টেটে অডিট ছিল। কাজের ফাঁকে বয়স্ক ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, কেকে এক সময়ে এখানকার খুব নামকরা পুলিশকর্তা ছিলেন। শায়েস্তা করেছিলেন আলফা আর বোরো জঙ্গিদের। কিন্তু কোপিলাগড়ের রাজা ভান সিংহের কাছে সমুদ্রগুপ্তের তরবারি ছিল বলে কেউ কোন দিন শোনেনি। তবে রাজার খুব দুর্নাম ছিল জুয়ারি হিসাবে। বদমেজাজি, খামখেয়ালি ধরনের লোক ছিলেন। শেষ বয়েসে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে শোনা যায়।

এর দিন দুয়েক পরেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে কলকাতায় ফিরে আসি। তারপর ওই ঘটনাটা মন থেকে আবছা হয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে।

মাস ছয়েক পরে আমার নামে একটা চিঠি এলো। প্রেরকের নাম কৃষ্ণকিশোর গুপ্তা। তিনি আমার নাম ঠিকানা নিশ্চয়ই সেই হোটেল থেকেই জোগাড় করেছিলেন। চিঠিটা এইরকম,

"স্নেহাস্পদেষু,

তোমার মনে থাকবে কিছুদিন আগে শিলংয়ে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। সেই সময়ে রাজা ভান সিংহ আর সমুদ্রগুপ্তের তরবারির বিষয়ে তোমাকে বলতে গিয়ে এক তান্ত্রিক সাধুর কথা বলেছিলাম। সম্প্রতি আমি সেই সাধুর সাথে আবার দেখা করেছি। তিনি বলেছেন, সেই ঐতিহাসিক ধনসম্পদ উদ্ধার করতে তোমার সাহায্য লাগবে। বাকি কথা সাক্ষাতে বলব। তোমার যাওয়া, আসা, থাকার সমস্ত ভার আমার। - ইতি, কেকে।"

চিঠিটা পড়ে মুড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। প্রথমত কাজের চাপে কলকাতা ছেড়ে সেই সময়ে আমার পক্ষে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কোন অজানা মরীচিকা বা রহস্যের পিছনে জীবনে আগে কোন দিন ছুটিনি, ছোটার ইচ্ছাও নেই। আর ঐতিহাসিক সম্পদ উদ্ধার করতে হলে সেটা সরকারকে অথবা প্রত্নতত্ত্ববিভাগে জানানোই উচিৎ। তাই এই মূহুর্তে আমি অপারগ, এই কথাটা সুন্দর করে জানিয়ে একটা চিঠি লিখে পোস্ট করে দিলাম।

কিন্তু ভাগ্যে আমার অন্যরকম কিছু লেখা ছিল। বছরদুয়েক পরে আবার কাজের সূত্রে শিলং যেতে হল আমাকে। দু'তিনটে চা কোম্পানির পাশাপাশি এবার একটা বড়ো রাবার বাগানের অডিট ছিল। জায়গাটা শিলং শহর থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে। সোরা-শিলং হাইওয়ে হয়ে চেরাপুঞ্জির দিকে। ঘন গাছপালায় মোড়া, স্যাঁতস্যাঁতে জোলো আবহাওয়া। প্রায় ছশো একর জায়গা জুড়ে রবার গাছের জঙ্গল। কাঠের বাংলোয় আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে।

ম্যানেজার সুরেশ পাঞ্জাবীর সাথে ঘোড়ায় করে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে অসাধারণ এক ঝর্ণার দেখা পেলাম। ঝর্ণার পাশে এক প্রাকৃতিক গুহা। দিনের আলো তার ভেতরে বিশেষ ঢোকে না। কয়েকটি পাহাড়ি পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সুরেশ ভাই জানালেন, "এই গুহায় এক তান্ত্রিক থাকেন। শোনা যায় তাঁর বয়স দেড়শ বছর।"

শুনে আমার কেকে-র কথা মনে পড়ল। তিনিও এরকম এক তান্ত্রিকের কথা বলেছিলেন। বললাম, "ওঁর সাথে কি দেখা করা সম্ভব?"

"ওঁকে দিনের বেলায় কেউ দেখেছে বলে শুনিনি। আর রাত্রে এই গভীর জঙ্গলে কেউ আসে না। বছরে একবারই ওঁর দেখা পাওয়া যায়। কামাখ্যার মেলায়।"

হঠাৎ আমি প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, এখানে কাছাকাছি কোপিলাগড়ের দুর্গ বলে কোন জায়গা আছে?"

তিনি আঙুল তুলে বললেন, "সামনের এই বড়ো পাহাড়টার পিছনেই দুর্গ।"



দু দিন পরে কাজ শেষ করে সুরেশ ভাইকে নিয়ে সেই দুর্গের উদ্দেশ্যে রওঁ হলাম। মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। আমি যদি সত্যিই সূরজ সিংহ হই? তাহলে ছোটোবেলায় কলকাতায় পৌঁছলাম কীভাবে? গত দু'বছরে আমি অনেক খোঁজখবর করেছি। কিন্তু আমার পাঁচবছর বয়সের আগের কোন চিহ্ন পাইনি। বাবা প্রথম জীবনে চাকরি করতেন। বদলির কাজ ছিল। ছোটবেলার কোন ছবি, কোন বইপত্র, খেলনা, কিছুই খুঁজে পাইনি আমি। যেন জীবনের প্রথম পাঁচটা বছরকে যত্ন করে মুছে দেয়া হয়েছে।

সরু পাকদণ্ডী রাস্তা, কখনও চড়াই কখনও উৎরাই। সবুজে মোড়া পাহাড়ি জঙ্গলে ঘোড়ার পিঠে করে যাবার অদ্ভূত আনন্দ। নাম না জানা কত রকমের ফুল ফুটে রয়েছে দু'পাশে। পাহাড়ি পথে নামতে নামতে একটা জলের রেখা দেখা গেল। পাথরে পাথরে ঠোকা খেয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। সেটা পেরিয়ে আবার ওপরে ওঠা। এদিকটা গাছের ছায়ায় পরিবেশ বেশ ঠাণ্ডা।

পাহাড়ের মাথায় দূর থেকে রাজবাড়িটা চোখে পড়ল। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে অনেকটা। ঘোড়াগুলিকে নীচে রেখে হেঁটে উপরে উঠলাম।

রাজবাড়ির চৌহদ্দিতে পা রেখেই মনের মধ্যে একটা অদ্ভূত অনুভূতি হল আমার। যেন কতকালের চেনা এ জায়গা। এই পাহাড়, এই গাছপালা সব যেন আমার স্বপ্নে দেখা। সুরেশভাই জানালেন, "রাজবংশের কেউ এখন থাকে না। শুধু মহেশ্বর প্রসাদ নামে এক বৃদ্ধ কেয়ারটেকার আছেন তাঁর পরিবার নিয়ে।"

পাথরের তৈরি ছোটখাটো একটা প্রাসাদ, এক সময়ে হয়ত জাঁকজমক ছিল। এখন ভগ্নপ্রায় অবস্থা। বোঝাই যাচ্ছে বহু বছর কোন সংস্কার হয়নি। ভিতরে একটা ফাঁকা লন পেরিয়ে মূল দরজা দিয়ে ঢুকে লম্বা হলঘর। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সারি সারি তালা দেওয়া বন্ধ দরজা। আরো উপরে উঠলে খোলা ছাদ। দিনের শেষে সূর্যের আলো কমে আসছিল। বাড়ছিল ঠাণ্ডা। পাখিদের ঘরে ফেরার কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে বনজঙ্গল।

আমাদের দেখে বৃদ্ধ কেয়ারটেকার এগিয়ে এসেছিলেন কাছে। আমার সামনে আসতেই মূহুর্তের মধ্যে পালটে গেল তাঁর চোখমুখের চেহারা। কপালে মোটা বলিরেখাগুলি ফুলে উঠল, সাদা ভ্রুর নিচে ঘোলাটে হলুদ চোখগুলি বিস্ফোরিত করে বললেন, "তুমি!!"

"চেনেন আমাকে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তুমি আমাদের ছোট রাজকুমার সূরজ সিংহ। তোমাকে চিনব না? নিজের কাঁধে করে ঘুরিয়েছি ছোটবেলায়।"

আমি বললাম, "কিন্তু-- আমি তো কলকাতায় বড় হয়েছি। "

কথাটা যেন তিনি শুনতেই পেলেন না, "ভাবিনি তোমাকে আবার কোন দিন দেখতে পাব," বলতে বলতে এগিয়ে এসে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

দেখি, আমার থেকেও বেশি অবাক হয়েছেন সুরেশভাই। শেষে তাঁকে গোটা গল্পটা খানিক ভেঙে বলে বললাম সে রাতটা প্রাসাদেই থেকে যেতে চাই আমি। যদি মনের অন্ধকার অংশে কিছুটা আলোকপাত করা যায়। সুরেশভাই প্রথমে মৃদু আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তারপর আমার জেদ দেখে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

তখন সূর্য ঢলে পড়ছে পশ্চিমে পাহাড়ের আড়ালে। মহেশ্বর প্রসাদ এতক্ষণ কিছু বলেননি। এইবারে মাথা নেড়ে বললেন, "না বাবু, তুমি এখানে থেক না। এ হল অভিশপ্ত রাজবাড়ি। এখানে রাত্রিবাস করলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।"

"কেন? অভিশপ্ত কেন?"

"সে অনেক কথা। রাজগুরু লিঙ্গেশ্বরের অভিশাপ। তাই তো তোমার মা রাধাদেবী তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।"

খানিক চুপ করে থেকে আমি দৃঢ় গলায় বললাম, "অভিশাপ থাক আর যাই থাক আমি এখানে রাতটা কাটাব। কিন্তু আপনি বলুন তো, এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে যে আমিই সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে?"

মহেশ্বর প্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললেন, "রাজবংশের তেজ! ও জিনিস চাপা থাকে না। থাকো তবে। আর, কে বলল তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে?



সেবার শিলঙয়ের বাংলোয় সেনসাহেবকে তো রাজাবাবুই ডেকে এনেছিলেন। আমাদের এস্টেটের হিসাব দেখার জন্য।"

কথাটা শুনে আমি বসে পড়লাম চেয়ারে। মনের মধ্যে তখন তুফান চলছে। আমিই তাহলে সূরজ সিংহ? ঝিমঝিম করছে মাথাটা। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু আমার ছোটবেলার স্মৃতি হারিয়ে গেল কী করে?"

"তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে তোমার ছোটবেলার স্মৃতি মুছে দিয়েছিলেন তন্ত্রসাধক হেমগিরি। আমি তার সাক্ষি।"

"ইনিই কি সেই তান্ত্রিক, যিনি পূর্বদিকে পাহাড়ের গুহায় থাকেন?"

মহেশ্বর প্রসাদ উপর নিচে মাথা নাড়লেন। আমি কিছুক্ষণ গুম খেয়ে থেকে প্রশ্ন করলাম, "রাজা ভান সিংহ কেন আত্মহত্যা করেছিলেন?"

"ঐ যে বললাম, রাজগুরু লিঙ্গেশ্বরের অভিশাপ।"

"কিন্তু এই অভিশাপের কারণ কী?"

"আমি সামান্য ভৃত্য। সব কথা জানি না। জানলেও বলতে পারব না। এই দুর্গের আনাচেকানাচে এখনও আমরা মৃত রাজাদের উপস্থিতি টের পাই।"

"তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?"

"এক জনই আছে যিনি সব কিছু জানেন, তান্ত্রিক হেমগিরি।"

"কিন্তু শুনেছি, তিনি কারো সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, দেখাও করেন না।"

"তুমি এই বংশের ছোট রাজকুমার। আমার বিশ্বাস তিনি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আমার ছেলে তোমাকে নিয়ে যাবে তাঁর কাছে।"

অজানা এই রাজবংশের রহস্যময় ইতিহাস ক্রমশ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরছিল আমায়। মনের মধ্যে একটা তীব্র উৎকণ্ঠা, ভয় অস্থির করে তুলেছিল। অথচ বুঝতে পারছিলাম, এই অদৃশ্য বাঁধন কেটে বের হওয়ার সাধ্য আমার নেই। আমার কপালেও কী অপঘাতে মৃত্যু লেখা আছে? কে এই রাজগুরু লিঙ্গেশ্বর? কী তার অভিশাপ?

অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চারপাশে পাথরের দেয়ালগুলো হিম-শীতল। ইলেকট্রিকের আলো এখানে এখনও পৌঁছায়নি। একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে এলেন মহেশ্বর প্রসাদের পুত্রবধূ।

"রাতের আহার কখন করবেন রাজকুমার?" মহিলার গলার আওয়াজ শুনে সম্বিৎ ফিরল। বহুদিন পরে রাজকুমার এসেছেন। তাদের আনন্দ আর ধরে না। কীভাবে আমাকে আপ্যায়ন করবে এই নিয়ে তাদের চিন্তা।

তাকে খাবার সময়টময় বলে বিদেয় করে আমি বড়ো টর্চটা জ্বেলে মহেশ্বর প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গটা ঘুরে দেখলাম। কেকের কাছে যা শুনেছিলাম সব বললাম তাকে বলে শেষে প্রশ্ন করলাম, "কোপিলাগড় সেই সময়ে এমন কোন শক্তিশালী বড়ো রাজ্য ছিল না। হয়ত একটা ছোট্ট সুবেদার বা সামন্ত হতে পারে। তাদের হাতে সমুদ্রগুপ্তের তলোয়ার এল কীভাবে?"

তিনি বললেন, "জানি না। তবে এটুকু জানি যে সমুদ্রগুপ্তের তলোয়ারটি এ অঞ্চলে এসেছিল বর্মন বংশের হাত ধরে। সেই সময়ে পুষ্যবর্মন এই অঞ্চলের সমস্ত রাজাকে পদানত করে বর্মন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্রগুপ্তকে খুশি করার জন্য তাঁর ছেলের নাম রাখেন সমুদ্রবর্মন। কামরূপকে গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে অঙ্গরাজ্য হিসাবে পরিচালনা করার শপথ নেন। সম্রাটের তরফে উপহার পান একটি তরবারি। তাঁর রাজধানী ছিল এখনকার উত্তর গুয়াহাটিতে। পরে রাজা তিমগাদেবের সময়ে তাঁর এক সৈন্যাধ্যক্ষ রাজপুত হরি সিংহ কোপিলাগড়ের জমিদারি পান। তারপর এই দুর্গ তৈরি হয়। সেই সময়েই হয়ত তলোয়ারটি এ বংশে এসেছিল কোন পুরস্কার হিসেবে। আপনি যা শুনেছেন তা সব সত্যি। এই দুর্গের নিচে আছে হাজার বছরের পুরানো ধনরত্ন। কিন্তু সেখানে যাবার রাস্তা আমরা কেউ জানি না। যে একবার সে রাস্তা জেনে যাবে অথবা বাইরের কাউকে জানাবে তার অপঘাত মৃত্যু নিশ্চিত। হয়ত সে জন্যই রাজা ভান সিংহের মৃত্যু হয়ছিল।"

ছোটোবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ। বড়ো হওয়া, বেড়ে ওঠা সবই জ্ঞানের আলোয়। অলৌকিক ঘটনার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি কখনো। তাই বিশ্বাসও নেই। কিন্তু এতো শহরের আলোকোজ্জ্বল কংক্রিটের জঙ্গল নয়, এ হল





আদিম পাহাড়ের কোলে রহস্যে মোড়া বৃক্ষরাশির মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্য এক জগৎ। সভ্য মানুষের বুদ্ধিতে যার তল পাওয়া মুশকিল। বাইরে তখন ঝমঝমে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সঙ্গে বজ্রপাত।

বহুদিনের বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা একটা ঘর আমার জন্য খুলে দিলেন মহেশ্বর প্রসাদ। ভ্যাপসা গুমোট গন্ধ। জানালেন, এটা আমার মায়ের ঘর। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

হলুদ লণ্ঠনের ভৌতিক আলোয় একটা মায়াবী জগৎ তৈরি করেছে। দেয়ালে একটা বড়ো অয়েল পেন্টিং। বংশের কোন পূর্বপুরুষ হবেন। মাথায় পাগড়ি, হাতে তলোয়ার। তার নিচে একটা গ্রুপ ছবি। মহেশ্বর বাবু চিনিয়ে দিলেন, উপরের ছবিটা আমার পিতামহ রাজা প্রতাপ সিংহের। নিচে মহিলার কোলে ছোট বাচ্চাটা নাকি আমি। পাশে পনের ষোল বছরের ছেলেটা আমার দাদা আর পিছনে বাবা ভান সিংহ। ভাবতেও অবাক লাগছে জীবনের এতগুলি বছর পেরিয়ে এসে এদের প্রথম দেখছি। নিজের অজান্তেই দেখলাম চোখের কোণে জল।

"তোমাকে খুব ভালবাসতেন তোমার মা।" আমার চোখে জল দেখে মন্তব্য করলেন মহেশ্বর প্রসাদ।

আমি প্রশ্ন করলাম, "বিদায় দেবার পর আর কোনদিন আমার খোঁজ করেছিলেন?"

"না, খোঁজ করেননি। কারণ, খোঁজ করলেই কোন না কোন ভাবে অজিত সিংহ জেনে যেত যে তুমি কোথায় আছ। ওর শকুনের চোখ। তারপর তোমাকে খুঁজে এনে হত্যা করা হত।"

"অজিত সিংহ কে?"

"ভান সিংহের ছোট ভাই। মহা শয়তান। গুপ্তধনের লোভে বহু লোককে হত্যা করেছে।"

আমি ঘুরতে ঘুরতে একটা দেরাজের লাগোয়া আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। নিজের প্রতিবিম্বকেও যেন অচেনা লাগছে, যেন হঠাৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠছে মনের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো। তারা বলছে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, যা শুনতে পাচ্ছি তার বাইরেও আমার চারপাশে অনেক কিছু আছে। এবং আরও সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে।

দেরাজ খুলে একটা কাঠের বাক্স বের করে খাটের এক পাশে রাখলেন মহেশ্বর প্রসাদ। বললেন, "এটা তোমার মায়ের। পুরানো কিছু জিনিসপত্র আছে।"



"এগুলি নিয়ে আমি কী করব?"

মহেশ্বরবাবু বললেন, "রাধাদেবী, শেষ জীবনে নিজেকে এই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে তন্ত্র সাধনা করতেন। মারা যাবার আগে আমাকে বলেছিলেন, যদি তুমি কোন দিন ফিরে আস তাহলে এই বাক্সটা দিতে।"

বাইরে বৃষ্টির তোড় উত্তরোত্তর বাড়ছে। মহেশ্বর প্রসাদ চলে গেলেন দরজা বন্ধ করে। কারুকাজ করা কাঠের বাক্সটি খুলে দেখলাম, বহু বছরের পুরানো হলুদ হয়ে যাওয়া এক তাড়া কাগজ ভাঁজ করা আছে। বেশ কয়েকটা রুদ্রাক্ষ আর তাবিজ, কবজের মালা, কয়েকটা আংটি, একটা কাচের শিশিতে নীলচে রঙের খানিক তরল। কাগজগুলি খুলে দেখলাম সব দেবনগরী ভাষায় লেখা। বেশির ভাগই তন্ত্রমন্ত্র সংক্রান্ত। এগুলি মা কেন আমকে দিয়ে যেতে বলেছেন? কী মনে হতে মালাগুলি নিজের গলায় পরে নিলাম। তারপর কাচের শিশির ঢাকনা খুলে নাকের কাছে আনতেই একটা মিষ্টি গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। এটা কি গায়ে বা চুলে মাখার কোন সুগন্ধি তেল? না অন্য কিছু? ঢাকনা বন্ধ করে আবার সেটাকে যথাস্থানে রেখে কাগজগুলি খুলে পড়তে শুরু করলাম। দেবনগরী ভাষা শিখেছিলাম স্কুলের নিচু ক্লাসে। তারপর বহুদিন কোন চর্চা নেই। হিন্দি অক্ষরগুলির সাথে মিল থাকায় ধীরে ধীরে পড়তে পারছি। পড়তে পড়তে কখন চোখ ঘুমে জড়িয়ে ধরেছে বুঝতে পারিনি।

..... বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হল ঘরের মধ্যে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসে টর্চের আলোয় দেখলাম কেউ কোথাও নেই। তাহলে কি মনের ভুল? আবার মনে হল কেউ যেন ফিসফিস করছে! অনেক দূর থেকে কোন কথা ভেসে এলে যেমন শোনায়। শান্ত থাকার চেষ্টা করেও পারছি না, হৃদপিণ্ড জোরে চলতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আমার চারপাশটা বদলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মশারির ভিতর থেকে বাইরের চিত্রটা কেমন যেন পালটে গেল। অনেকটা ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার মত।

বাইরে কারা যেন দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ভারি ভারি পায়ের ধুপধাপ শব্দ। কান খাড়া করে শুনলাম কিছু লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। কিন্তু ভাষাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছিনা। ব্যাপারটা কী? কৌতূহল বাড়ছে। আমি মশারি তুলে বেরিয়ে এলাম।

ঘরের আসবাবপত্রও মনে হল বেশ কিছু পালটে গেছে। দরজা খুলে বাইরে বের হলাম। বাইরে অনেক মানুষ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। আমি এগিয়ে গেলাম সেদিকে। কিন্তু মনে হল তারা আমাকে দেখতেই পেল না। কথাগুলি শুনে মনে হল ভাষাটা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের। কথা শুনে বোঝা যাচ্ছিল নাগা আদিবাসীরা দুর্গ আক্রমণ করেছে। রাজপুত কর্মচারী আর সৈন্য সামন্ত দুর্গের সিংহ দুয়ার রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে প্রাণপণ। আমি কথাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। আরও এগিয়ে দেখি, সত্যিই যুদ্ধ হচ্ছে। শত শত মশালের আলোয় তীর আর বর্শা ছুঁড়ছে সেনারা। দুর্গের খাড়াই দেয়ালের ওপারে হাজার হাজার নাগা মশাল নিয়ে হাজির। তারাও মুহুর্মুহু তীর ছুড়ছে। ভিতরে আহত সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্যত্র। একজন রাজকীয় বর্ম পরা লম্বা চওড়া মানুষ দুর্গের মধ্যে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। কিন্তু লোকবল এদের খুব বেশি নেই। কাঠের সিংহদুয়ার যে কোন মূহুর্তে ভেঙে পড়বে। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মারছে বাইরে থেকে। প্রাচীরের উপর থেকে ঝাঁক ঝাঁক বিষাক্ত তীর ছুটে যাচ্ছে শত্রুপক্ষকে লক্ষ করে। একদল ব্যর্থ হলে আবার অন্যদল পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। কোন পক্ষই অন্যদের একচুল সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছে না।

দুর্গের সৈন্যসংখ্যা সামান্য। হঠাৎ সেনাপতি রাজার কাছে এসে বললেন, "আপনি আর অপেক্ষা করবেন না মহারাজ। গুপ্ত পথে প্রস্থান করুন গারো পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। আর অল্প সময়ের জন্যই নাগাদের আটকে রাখা যাবে।"

রাজা বললেন, "কিন্তু রাজ তোষাগারের কী হবে সেনাপতি?"

"আমি তো আছি। চিন্তা করবেন না মহারাজ। যতক্ষণ আমার শরীরে প্রাণ আছে রক্ষা করে যাব। আপনি গুপ্তপথে এখুনি প্রস্থান করুন। শুধু বলে যান ঠিক কোনখানে আছে তোষাগার। আমি প্রাণপণে সেই জায়গাটিকে রক্ষা করে যাবো শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে।"



রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা নাড়লেন, তারপর বললেন, "সে কথা রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে ছাড়া আর কাউকে জানানো নিষেধ সেনাপতি।" তারপর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী আর দশজন সেপাই নিয়ে পিছনের গুপ্তপথে বেরিয়ে গেলেন। সেনাপতি জয়ধ্বনি দিলেন, 'জয়, রাজা বিক্রম সিংহের জয়।' এদিকে একে একে সৈন্যরা মারা যাচ্ছে। বিষাক্ত তীর বৃষ্টির তোড়ের মত আছড়ে পড়ছে দুর্গের ভিতরে।

একসময় প্রতিরোধের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সিংহদুয়ার। এরপর শুরু হল সামনাসামনি তলোয়ারের লড়াই। নাগারা তলোয়ার চালনায় রাজপুত সেনাদের কাছে নিতান্তই শিশু। এক একজন রাজপুত দশজন নাগা সেনার সাথে বীর-বিক্রমে লড়াই করছে। কিন্তু কালো ভিমরুলের মত ঝাঁকে ঝাঁকে নাগা সেনারা উঠে আসছে নিচে থেকে। ধীরে ধীরে এই অসম যুদ্ধে পিছু হটছে রাজপুত সেনারা। নাগারা তাদের দেহ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে পাহাড়ের নিচে।

তারপর ভিতরে ঢুকে তছনছ করতে শুরু করল সব কিছু। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছে। ভুতের মত রক্তাক্ত দুর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। নাগাদের সমস্ত আক্রোশ যেন দুর্গের দেয়ালের পাথরগুলির উপরে। প্রতিটি পাথরকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে সরানোর চেষ্টা করছে। কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই। যত মূর্তি আর শৌখিন সামগ্রী ছিল তার একটাও আস্ত নেই। ঘরের মেঝে থেকে পাথর সরিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে গুপ্তধন খুঁজছে ওরা।

হঠাৎ চোখের সামনে ঝাপসা অন্ধকার হয়ে গেল। চোখ কচলে তাকিয়ে দেখি সামনের দৃশ্য আবার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ। দূর থেকে ছুটে আসছে। গাছের নিচে দিয়ে যাবার সময় তাদের মাথার উপর লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন লোক। মুখে কালো কাপড় বাঁধা। অত্যন্ত ক্ষিপ্র। নিমেষের মধ্যে খতম করল ঘোড়সওয়ারগুলিকে। শেষে কয়েকজনকে বন্দি করে আবার ঘোড়ার পিঠে তুলে ছুটতে শুরু করল।

কারা এরা? এসব কী দেখছি আমি? এটা কি কোন স্বপ্ন? আবার একবার চোখ বন্ধ করে খুলতে দেখি দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। ঘোড়সওয়ারগুলি একটা পাহাড়ের নিচে এসে ঘোড়াগুলি রেখে বন্দিদের টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেল। আমি গেলাম পিছন পিছন। গুহার ভিতরটা বেশ বড়। সেনাপতি সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত। বন্দিদের মধ্যে একজনের মুখের কাপড় সরাতে দেখলাম রাজা বিক্রম সিংহ। সামনে সেনাপতিকে দেখে তিনি গর্জে উঠলেন।

"তুমি আমাকে ধরে এনেছ? এত স্পর্ধা তোমার?"

"মহারাজ, আমাকে মাপ করবেন। তোষাখানায় প্রবেশের গুপ্ত পথ খুঁজে পেলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। গোটা দুর্গ খোঁড়াখুঁড়ি করেও আমরা তোষাখানার পথ পাইনি। এখন আপনি যদি বলেন কীভাবে সেখানে যাওয়া যায়, তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

রাজা দৃঢ় গলায় বললেন, "সে পথ তোমার মত পাপীর জন্য নয়। আর আমার প্রাণ চলে গেলেও সে পথের হদিশ তোমাকে দেব না।"

এরপর সেনাপতির নির্দেশে একে একে রাজপরিবারের সবাইকে হত্যা করা হল। আমি আবার চোখ বন্ধ করলাম। এসব নির্মম হত্যা দেখতে আমার একেবারেই ভালো লাগছে না।

ফের চোখ খুলতে দেখি সামনে একটা বিস্তৃত হ্রদ। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা শান্ত নীল জল। সোচ্চারে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এক গেরুয়াধারী সাধুর দিকে। হ্রদের জলে স্নান সেরে সূর্যপ্রণাম করছেন তিনি। ধীরে ধীরে উঠে এলেন। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। গেরুয়াধারীর পা জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন।

"বাবা আমাকে বাঁচান।"

"কে তুমি? কী চাই?"

"আমি রাজা বিক্রম সিংহের দ্বিতীয় স্ত্রী। সেনাপতি শত্রুপক্ষ নাগাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছে। রাজবংশের হবু সন্তানকে নিয়ে আমি আপনার শরণাপন্ন। আমাদের আপনি রক্ষা করুন।"



"মল্লারের এত সাহস। তুমি কোন চিন্তা কোর না মা। সন্তানের জন্ম থেকে আঠারো বছর বয়েস পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে থাকবে। শত্রুকে বিনাশ করার সব শক্তি আমি তাকে দিয়ে যাব।"

"জয় রাজগুরু।" বলে সে মহিলা আবার তাঁর পায়ে প্রণাম করলেন।

রাজগুরু বললেন, "মহারাজা বিক্রম সিংহকে যারা হত্যা করেছে, সেই বিশ্বাসঘাতকরা কোন দিন রাজ ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারবে না। প্রত্যেকে অপঘাতে মারা যাবে। যক্ষ হয়ে পাহারা দেবে রাজ তোষাগার। ভবিষ্যতে কেউ যদি এই ধনরত্ন অসৎ উপায়ে দখল করতে চায়, তারও একই পরিণতি হবে। এটা লিঙ্গেশ্বরের অভিশাপ। সেখানে পৌঁছোবার জন্যও তার প্রয়োজন হবে একটি পবিত্র অস্ত্রের। রাজদেবী মা ভৈরবীর আশির্বাদ নিয়ে রাজ বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নিজের রক্তে শোধন করলে তবেই সেই অস্ত্র প্রাণ পাবে আর তার সংস্পর্শে খোলা যাবে রাজ তোষাগারের গুপ্ত দরজা।"

এর পরের দৃশ্য রাজগুরু লিঙ্গেশ্বর রাতের অন্ধকারে মশাল হাতে একটা বড়ো গোল পাথরের কুয়ার মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। জল অনেক নিচে। গুনে গুনে দেড়শ সিঁড়ি নেমে দেয়ালের গায়ে একটা পাথরে জোরে ধাক্কা দিলেন কয়েক বার। পাথরটা ভিতরে সরে যেতে গেরুয়া চাদরে জড়ানো সোনালী পাতে মোড়া একটা অতিকায় তলোয়ার বের করে রানিকে দেখিয়ে রেখে দিলেন সেখানে। আবার পাশের পাথরে তিনবার ধাক্কা দিতে দেয়ালটি সমান হয়ে গেল। লিঙ্গেশ্বর এবার কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটা মালা বের করে এনে রানির হাতে দিয়ে বললেন, "বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এই মালা গলায় ধারণ করলে তবেই এই পবিত্র অস্ত্রের সন্ধান পাবে। নচেৎ নয়।"

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত ঘোরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলাম। খেয়াল হল অন্ধকার ঘরের মধ্যে সত্যি খুব গুমোট করেছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। গলা থেকে রুদ্রাক্ষ আর তাবিজ কবজের মালা গুলি খুলে বাক্সে ঢুকিয়ে সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিলাম। জানালাগুলো খুলে দিতে এক ঝলক ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া ভিতরে ঢুকে পরিবেশটা স্বাভাবিক করে দিল। রাত শেষ হতে তখনও বাকি। যা দেখলাম, সেটা কি শুধুই স্বপ্ন ছিল? স্বপ্নের মধ্যে গুপ্তধনের কিছু সঙ্কেত পেলাম মনে হচ্ছে। কিন্তু এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর পেতে বাকি। যাই হোক, বিছানায় আবার মাথা দিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরেরদিন প্রাতরাশ সেরে মহেশ্বর প্রসাদের ছেলে শঙ্করের সাথে ঘোড়ায় করে বের হলাম হেমগিরি তান্ত্রিকের ডেরার উদ্দেশ্যে। রাজ সৌজন্য অনুসারে শঙ্করবাবু তান্ত্রিকের জন্য একটা পুঁটুলিতে চাল, ডাল, সবজি ও ফল বেঁধে নিয়েছেন। বললেন, "যখনই আমরা ওঁর সাথে দেখা করতে যাই, কিছু না কিছু নিয়ে যাই সঙ্গে। এটাই বংশের রীতি।"

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় করে যেতে যেতে লক্ষ করলাম, গতকালকে ভারী ঝড়বৃষ্টিতে বেশ কিছু বড়ো বড়ো গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে। ঘণ্টাখানেক সময় লাগল সেই গুহার মুখে পৌঁছাতে। আগের দিনের দেখা শান্ত ঝর্ণাটি উত্তাল হয়ে বয়ে চলেছে। কী তার গর্জন! শঙ্করবাবু ঘোড়া গুলিকে গাছের সাথে বেঁধে বললেন, "সাবধানে আসুন আমার সাথে।"

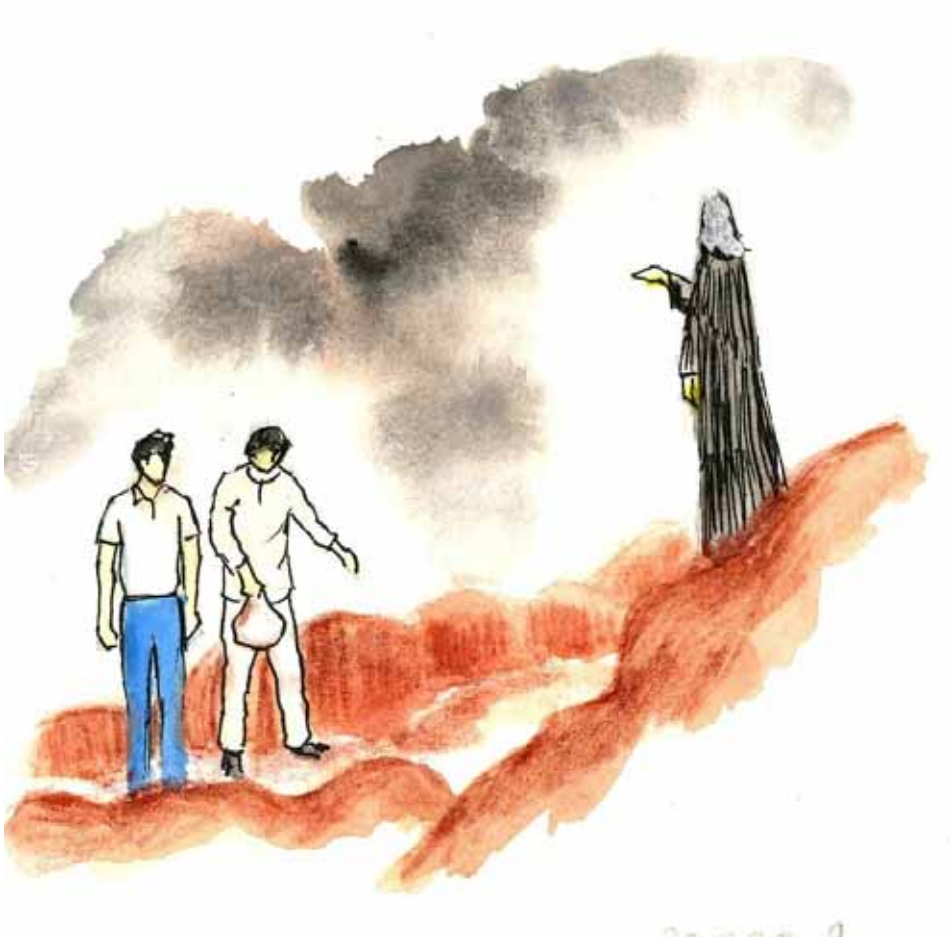
আমি তাঁকে অনুসরণ করে পিছল শ্যাওলাধরা পাথরের খাঁজে পা দিয়ে গাছের ডালপালা ধরে উঠে এলাম উপরে। গুহার ভিতরেও পড়ছে ঝিরঝিরে জলের ধারা। যত ভিতরের দিকে এগচ্ছি, তত সরু হয়ে যাচ্ছে পথ। খুব কষ্ট করে অনেকটা এগোনোর পর খেয়াল হল ভিতরের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। শুকনো খটখটে এবং বেশ গরম। বুঝলাম পাহাড়ের মাঝামাঝি চলে এসেছি। ধীরে ধীরে গুহাটা চওড়া হয়ে বড়ো ঘরের মত চেহারা নিয়েছে। প্রথম চোখ পড়ল একটা কালীমূর্তির উপর। কালো পাথরের তৈরি। মুখখানা ভয়ঙ্কর। তার নিচে লাল সিঁদুর মাখানো মড়ার খুলি দিয়ে সাজানো পঞ্চমুণ্ডির আসন। কিন্তু তান্ত্রিক কোথায়? শঙ্করবাবু বললেন, "হয়ত কোন কাজে বেরিয়েছেন। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

পাথরের উপরে বসে ভাবলাম, গত কয়েকদিনে ঘটনা পরম্পরা এত দ্রুত পালটে যাচ্ছে যে মস্তিষ্ক কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, বাস্তব আর অবাস্তব সব গুলিয়ে ফেলেছে। কালকে রাতে যে স্বপ্নটা দেখলাম, সেটা কী সত্যি? না আমার মস্তিকের কল্পনা? শুধু একটা খটকা লাগছে। কেকের সাথে দু বছর আগে শিলঙয়ে আমার যদি দেখা না হত তাহলে কী আমি এই জায়গায় এসে পৌঁছতাম? কে জানে! আমি হয়ত কলকাতাতেই সারা জীবন কাটিয়ে



দিতাম। কখনো জানতেই পারতাম না যে কোপিলাগড় নামে একটা দুর্গ আছে, আর আমিই তাদের হারিয়ে যাওয়া ছোট রাজকুমার।

গতকাল রাতের স্বপ্নটা শঙ্করবাবুকে বললাম। তিনি জানালেন, এর পরের ইতিহাস কিছুটা তিনি দাদুর মুখে শুনেছেন।



"রাজকুমার শিবমের বয়েস তখন আঠার। নিজে হাতে ধরে তাকে সমস্তরকম অস্ত্র চালনা শিখিয়েছেন রাজগুরু লিঙ্গেশ্বর। তেমনি দিয়েছেন রাজতন্ত্রের শিক্ষা। কামরূপের রাজা তখন 'স্বর্গদেও চাওলুং সুখাপা'। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ভর্তির জন্য যুবকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। ছিপছিপে চেহারার শিবম সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল। সুখাপা উত্তর পূর্ব ভারতের সমস্ত ছোট ছোট রাজাকে পদানত করে 'অহোম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। রাজার নির্দেশে বিদ্রোহী নাগাদের দমন করার জন্য বাহিনী এগিয়ে চলল কোপিলাগড়ের দিকে। সেই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা আর বিচক্ষনতার জন্য রাজা সুখাপা, শিবমকে কোপিলাগড়ের সুবেদার করে দিলেন। বহুবছর পর কোপিলাগড় আবার নতুন করে সেজে উঠল। কিন্তু রাজ তোষাগারের কথা ভুলে গেল সবাই। এক রাজগুরু লিঙ্গেশ্বর জানতেন কীভাবে প্রবেশ করতে হয় সেখানে। তিনি তন্ত্রের সাহায্যে এমন মায়াজাল রচনা করলেন যাতে সেখানে শুধু মাত্র রাজপরিবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারই পৌঁছাতে পারে। এখন মহারাজ হেমগিরি একমাত্র পারেন সেই মন্ত্র বন্ধন কাটিয়ে তোমাকে গুপ্ত তোষাগারের পথ দেখাতে।"

আমি বললাম, "কিন্তু সে সবে আমার কী প্রয়োজন। আমি তো ধনরত্নের জন্য এখানে আসিনি।"

এই সব কথা বলতে বলতেই একটা পায়ের শব্দ পেলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবেশ করলেন এক শীর্ণকায় দীর্ঘদেহী কালো পোশাক পরা তান্ত্রিক। আর তাঁকে দেখা মাত্রই শঙ্কর বাবু "জয়, হেমগিরি মহারাজের জয়" বলে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন।

"কী সংবাদ শঙ্কর? এই অসময়ে?" বলে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আমার উপর। কিছুক্ষণ কড়া দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন আমায়। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, "কে এই যুবক?"

"চিনতে পারলেন না মহারাজ? এই তো আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছোট রাজকুমার।"

উত্তরটা সম্ভবত তাঁর পছন্দ হল না। আবার ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় পেলে একে?"

"আজ্ঞে, রাজকুমার নিজেই খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছেন এখানে। তবে ছোটবেলার স্মৃতি কিছু মনে নেই। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।"

আমার দিকে এগিয়ে এসে তান্ত্রিক বললেন, "দেখি তোমার ডান হাত।"



আমি হাতটা বাড়িয়ে দিতে হাতের রেখা গুলির দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে থেকে বললেন, "না এই যুবক আমাদের রাজকুমার নয়। দেখতে অনেকটা একই রকম। কিন্তু হাতের রেখা ভুল কথা বলবে না। ফিরে যাও তুমি।"

কথাটা শুনেই মাথাটা ঘুরে উঠল আমার। এ কী করে হয়? কেকে চিনতে পারলেন, মহেশ্বরবাবু চিনতে পারলেন কিন্তু ইনি চিনতে পারলেন না! অথচ রাধাদেবী এঁর সাহায্যেই আমার পূর্বস্মৃতি মুছে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য!

শঙ্করবাবু বললেন, "আপনি আর একবার ভালো করে দেখুন মহারাজ। রাজা ভান সিংহের মুখ একেবারে বসানো।"

"ভুল আমার হয় না শঙ্কর। তোমরা এখন এসো। আমার সাধনার সময় হয়েছে।"

এরপর আর কোন কথা হয় না। আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে। ঘোড়ায় উঠে শঙ্করবাবু বললেন, "বুঝতে পারছিনা হেমগিরি কেন তোমাকে চিনতে অস্বীকার করছেন। আমার মতে তাঁর ভুল হচ্ছে।"

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, "এরপর কোপিলাগড়ের দুর্গে যাবার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমি ঘুমসি পাহাড় বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি। পরে ম্যানেজার সুরেশবাবু আমার জিনিসপত্র আনিয়ে নেবেন।"

শঙ্করবাবুকে বিদায় জানিয়ে ডাইনে বেঁকে কিছু দূর এসেই রাবার গাছের জঙ্গল পড়ল। এ রাস্তা আমার চেনা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় করে একাই ফিরলাম। ঘুমসি পাহাড়ের বাংলোয় পৌঁছাতে দুপুর গড়িয়ে গেল। সুরেশবাবুকে বললাম, "বিকালের মধ্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন। সন্ধ্যায় শিলং পৌঁছে যাব।"

কিন্তু আমার পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঝমঝমে বৃষ্টি শুরু হল। সুরেশবাবু জানালেন, "আজকে আর ফেরা যাবে না স্যার। কাল সকালের আগে গাড়ির বন্দোবস্ত হবে না।"

অগত্যা বাকি সারাটা দিন বাংলোর ঘরে বসে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখা। মন পড়ে আছে কোপিলাগড়ের দুর্গে। একটা একটা করে অঙ্ক মিলতে শুরু করেছিল। নিজের হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলা, বংশ পরিচয় খুঁজে পাচ্ছিলাম। কিন্তু হেমগিরির সাথে দেখা হওয়ার পরেই সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আচ্ছা আমি যদি ঐ বংশের কেউ না-ই হব তাহলে রাজা ভান সিংহের সাথে আমার এত মিল কী করে হল? আর কাল রাতের সেই স্বপ্নটা!

কত রকমের চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসছে। একটা সাইকোলজিক্যাল জার্নালে পড়ছিলাম স্মৃতি ভুলে যাওয়াটা একটা অসুখ। এটা অনেক সময়ে জিনগত হয়। যাদের এই অসুখ থাকে তারা মানসিক চাপের মধ্যে পড়লে আবার এর পুণরাবৃত্তি হতে পারে। তার মানে এই ঘটনাগুলি যে আমার জীবনে ঘটছে, পরে আবার মুছে যেতে পারে স্মৃতি থেকে। এরকম যে হবেই তার কোন গ্যারেন্টি নেই, কিন্তু সম্ভাবনা তো থেকেই যায়। সুরেশবাবুকে কালকের ঘটনা বেশ খানিকটা খুলে বলেছি আমি। তাঁর চোখে অবিশ্বাস ছিল। তবু, তাঁর কাছ থেকে একটা নতুন ডায়রি চেয়ে নিয়ে দু বছর আগের শিলং থেকে শুরু করে পুরো ঘটনা যতটা সম্ভব গুছিয়ে লিখে রাখার চেষ্টা করছি।

এই পর্যন্ত বলে সুরেশবাবু ডায়রিটা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকালেন। ঋজু বলে উঠল, "তারপর?"

"এই ডায়রিটা পাওয়া যায় ঘরের মধ্যে। কিন্তু মানুষটাকে পাওয়া যায়নি।"

পাতা প্রশ্ন করল, "শুনতে তো গল্পের মত। এটা কি সত্যি ঘটনা?"

"আমি সশরীরে উপস্থিত আছি তোমাদের সামনে, এই ঘটনার সাক্ষী।"

তীর্ণা চোখ বড়ো বড়ো করে জিজ্ঞাসা করল, "সেই সমুদ্রগুপ্তের তলোয়ার আর গুপ্তধন পাওয়া গেছে?"

"পাওয়া গেছে আবার যায়নি।"

"কী হেঁয়ালি করছেন ম্যানেজারবাবু?"

"বলছি বলছি, শেষ অংশটা এখনও বাকি।"

বাইরে বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। সন্ধ্যা নামছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। ঘনান্ধকারের মধ্যে মৃদু আলোয় ঠাণ্ডা ঢুকছে ভিতরে। সুরেশবাবুর নির্দেশে এক বেয়ারা এসে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল।



তিনি বললেন, "যে রাতে শঙ্খবাবু এই বাংলো থেকে গায়েব হলেন সেদিনও সকাল থেকে ভারি বৃষ্টি হয়ে রাতের দিকে ধরেছিল আকাশ। আমি নিজের ঘরেই শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। উঠে বসে বেড ল্যাম্পের সুইচ অন করলাম। কিন্তু আলো জ্বলল না। বুঝলাম ইলেকট্রিক নেই। এখানে এ রকম প্রায়ই হয়। বড়ো টর্চটা জ্বেলে বাইরে বেরিয়ে দেখি শঙ্খবাবুর ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে বিছানা পত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে। বেশ একটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। বাইরের বারান্দায় লক্ষ করলাম একজনের পায়ের ছাপ। জল কাদার উপর দিয়ে খালি পায়ে কেউ হেঁটে এসেছে। আবার ফিরেও গেছে। শঙ্খবাবুর জুতোগুলি ঘরের মধ্যেই পাওয়া গেল। মনে হল শঙ্খবাবুকে জোর করে কেউ তুলে নিয়ে গেছে। এত দিন এখানে আছি, এরকম ঘটনা কোন দিন দেখিনি। মিথ্যা বলব না সেই রাতে বেশ ভয় করছিল। মদনকে ডেকে তুললাম। তারপর দেরাজ থেকে রাইফেলটা নিয়ে বেশ কটা কার্তুজ পকেটে পুরে আমরা এগোতে থাকলাম ভিজে মাটিতে পায়ের ছাপ লক্ষ করে। মনে হল যে এসেছিল সে বেশ লম্বা আর বলশালী। কারণ একটা পায়ের ছাপের থেকে অন্যটার দূরত্ব সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি। এ জঙ্গল আমাদের দুজনেরই হাতের তালুর মত চেনা। তবু মাঝে দুয়েকবার গুলিয়ে ফেলছিলাম। যে ব্যক্তিটির আমরা পিছু নিয়েছি সেও সম্ভবত স্থানীয় লোক। রাতের অন্ধকারে জোরালো টর্চের আলো তার চোখে পড়ে যেতে পারে সেই ভয়ে টর্চ না জ্বালিয়েই আমাদের এগোতে হচ্ছিল।

"বেশ কিছুক্ষণ এগোনর পর পাথুরে জমি শুরু হয়ে গেল। পায়ের ছাপ মিলিয়ে গেছে। এবার কোন দিকে যাব? মদন বলল, এখনও পর্যন্ত যে রাস্তায় এগোচ্ছি, সেটা কোপিলাগড়ের দিকেই যাচ্ছে বলে মনে হয়। কথাটা ঠিক। অর্থাৎ শঙ্খবাবুকে কেউ ওখানেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওঁর মুখে আমি আগেই শুনেছিলাম কিছু অদ্ভুত ঘটনার কথা। তাহলে ওঁর প্রাণ সংশয়ও হতে পারে।

"প্রায় ঘণ্টা দুই পর আমরা কোপিলাগড় দুর্গে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলাম একেবারে নিঝুম, অন্ধকার। বাইরের ফটকে দুমদুম করে ধাক্কা দিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে মহেশ্বরবাবুর ছেলে শঙ্কর প্রসাদ বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? এত রাতে?', আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'শঙ্খবাবু কোথায়?' শুনে মনে হল আকাশ থেকে পড়লেন উনি। তারপর আমার মুখে সব কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আসুন তো আমার সাথে।'

"আমরা দুর্গের ভিতরে ঢুকলাম ওঁর সাথে। আমাদের সঙ্গে যেতে যেতে তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'সুরেশবাবু, আপনাকে শঙ্খবাবু আর কী বলেছেন?'

"তিনি বলেছেন, এই দুর্গের নিচে নাকি হাজার বছরের পুরানো গুপ্তধন লুকানো আছে। আমার যদিও কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয়নি।

"ঠিকই বলেছেন উনি। তবে আজকে রাতে যখন শঙ্খবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, তার মানে আজকেই একটা হেস্তনেস্ত করবে ওরা।

"আমি জানতে চাইলাম, 'ওরা মানে কারা?'

" 'অজিত সিংহ আর বিরজু। ওকে কোথায় নিয়ে গেছে একটা আন্দাজ পাচ্ছি। কিন্তু ওরা শুধু দুজনে তো থাকবে না। ওদের সঙ্গে লোকবল অনেক আছে। আমাদেরও দলে ভারি হতে হবে। দাঁড়ান আমার ছেলেকে ডাকি। ওকে দিয়ে গ্রামের মোড়লকে খবর পাঠাতে হবে।' বলে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে দৌড়ে ভিতরে চলে গেলেন।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আঠারো কুড়ি বছরের এক ছেলেকে নিয়ে ফিরে এলেন। 'আমি একে বুঝিয়ে দিয়েছি কী করতে হবে? আপনারা আমার সাথে আসুন।' ছেলেটি প্রধান দরজার দিকে চলে গেল। আমরা শঙ্করবাবুর সাথে দুর্গের পিছন দিকে চললাম।

"জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

"প্রত্যুত্তরে শুধু মুখে আঙুল দিয়ে বারণ করলেন কথা বলতে। একটা বড়ো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর কোনের দিকে দেয়ালের সাথে আটকান একটা পাথরের মুর্তিকে দু পাক ঘোরাতে মেঝের একটা পাথর সরে গেল। দেখলাম নিচে সিঁড়ি নেমে গেছে। টর্চ জ্বেলে আমরাও নামলাম তাঁর সাথে। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে অনেকটা নেমেছে সিঁড়িটা। বুকের ভিতর তখন ঢিপঢিপ করছে। কোন পাতালে নেমে যাচ্ছি কে জানে? এর



পরে আর ফিরতে পারব তো? দু দিকে খাড়াই পাথরের দেয়াল। পিছনে আমার শাগরেদ নামতে নামতে ক্রমাগত ইষ্টনাম জপ করছে। আনুমানিক দশতলা বাড়ির সমান সিঁড়িটা একটা গুহার মুখে গিয়ে শেষ হল। শঙ্করবাবু একটা ইসারা করে ঢুকে গেলেন গুহার ভিতরে। আমরাও তাঁর পিছু নিলাম। আরও প্রায় পাঁচশো ফুট গিয়ে শেষ হল গুহাটি। একটা বড়ো পাথরের কোল ঘেঁষে বেরিয়ে দেখলাম মাথার উপরে আকাশ, অন্ধকারে তারারা মিটমিট করছে। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম এতক্ষণে। ভিতরে যেন দম আটকে আসছিল।

"শঙ্করবাবু বললেন, 'এ হল দুর্গে ঢোকা আর বের হবার গুপ্ত সুড়ঙ্গ। আমারা ছাড়া এ রাস্তা কেউ চেনে না। শঙ্খবাবুকে যেখানে আটকে রেখেছে, সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য এই পথে এলাম। বাইরে দিয়ে আসতে গেলে দু'ঘণ্টা সময় লাগত। ততক্ষণে ওঁকে জীবিত পেতাম কিনা সন্দেহ। ঐ দেখুন ওখানে আলো জ্বলছে, চুপচাপ চলে আসুন আমার সাথে।'

"সামনে ঘন জঙ্গল, বড় বড় গাছে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা হলুদ আলোর আভা। আমরা গুটি মেরে এগোলাম সেই দিকে। বেশ কিছুটা গিয়ে হ্রদের পাড়ে পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছলাম। হাত ঘড়িতে দেখলাম রাত আড়াইটে। শঙ্করবাবু বললেন, 'আমরা তিনজন আলাদা আলাদা ভাবে ঐ গুহার দিকে এগোব। শত্রুপক্ষ ক'জন আছে জানি না। তবে নিশ্চিত যে সংখ্যায় তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি। মনে রাখবেন, যে কোনভাবে ছোট রাজকুমারকে বাঁচাতেই হবে। আর একটা কথা, আপনার হাতে যে বন্দুকটা আছে সেটা সাবধানে ব্যবহার করবেন। অযথা গুলির আওয়াজ হলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে। তাতে আমাদেরই বিপদ।'"

"তারপর?" কথা থামতেই সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করল।



"বন্দুকে দুটো কার্তুজ লোড করে সেফটি ক্যাচ সরিয়ে নিলাম। তারপর গুঁড়ি মেরে এগোলাম সেই আলো লক্ষ করে। কাছে গিয়ে দেখি বাইরে দু'জন পাহারা দিচ্ছে। একজনের হাতে বড়ো বন্দুক, আর একজনের হাতে তলোয়ার। এখন কী করব? ভাবতে ভাবতেই একটা শিস দেওয়ার শব্দ হল আর তলোয়ার হাতে লোকটি ঘাড়ে হাত দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। অন্যজন সেদিকে এগিয়ে যেতেই চোখের পলকে গাছের আড়াল থেকে ক্ষিপ্র চিতার মত লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে এক জবরদস্ত রদ্দা মারলেন শঙ্করবাবু। সেও গড়িয়ে পড়ল বেঁহুশ হয়ে। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম প্রথমজনের ঘাড়ে একটা পালক লাগানো একটা তির বিঁধে রয়েছে। মদন ততক্ষণে আমাদের পিছনে এসে হাজির হয়েছে। পড়ে থাকা বন্দুকটা নিজে নিয়ে তলোয়ারটা তার হাতে তুলে দিলেন শঙ্করবাবু। বললেন, 'তুমি বাইরেই থাক। গ্রামের লোকেরা এসে পড়লে সবাই একসাথে ভিতরে ঢুকবে।'

"আমরা দুজন এগিয়ে গেলাম গুহার মুখ লক্ষ করে। কাছাকাছি গিয়ে পাথরের আড়াল থেকে দেখলাম, ভিতরে একটা ধুনি জ্বলছে। আগুনের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে



বেশ কয়েকজন লোক। একধারে একটা মোটা পাথরের থামের সাথে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে শঙ্খবাবুকে। মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। মনে হল সংজ্ঞা নেই। শঙ্করবাবু চিনিয়ে দিলেন, লাল পোশাক পরে রাজা ভান সিংহের বড় ছেলে বিরজু। পাশে রাজার ভাই অজিত সিংহ। কালো পোশাক পরা এক তান্ত্রিক জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করছে। শঙ্করবাবু বললেন, 'ইনি হেমগিরির শিষ্য কালবৈঠা।' জানতে চাইলাম, কী করছে এরা? উনি বললেন, 'রাজ তোষাগারে প্রবেশের জন্য মন্ত্র-বন্ধন খুলছে। রাজগুরু লিঙ্গেশ্বর সাত জন নাগাকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে যক্ষ করে মন্ত্রবন্ধন দিয়েছিলেন।' পাশে দেখলাম চার জন লোক শাবল আর গাঁইতি দিয়ে পাথর সরানোর চেষ্টা করছে।

"হঠাৎ পিছনে একটা আওয়াজ হতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আগের দুজন লোক উঠে এসে আমার মাথার কাছে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়েছে। শঙ্করবাবু দেখি তাঁর বন্দুকের নলটাও আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরেছেন। চাপা গলায় বললেন, 'রাজকুমারের মুখ থেকে এ অনেক ভেতরের ঘটনাই জেনে গেছে। আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।'

"এইবার পাথরের পাশ থেকে আর একজন বয়স্ক কালো জ্যাকেট পরা লোক এগিয়ে এসে বললেন, 'তাহলে একেও খতম করে দিতে হবে। আপাতত বেঁধে ভিতরে নিয়ে চল।'

"কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় শঙ্খবাবুর পাশে ছুঁড়ে ফেলা হল। আমার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে শঙ্করবাবু একটা অট্টহাসি দিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'বেশি গোয়েন্দাগিরি মোটেই ভালো নয় সুরেশবাবু। গুপ্তধন পেয়ে গেলে আপনাদের দুজনকেই মরণ কুয়োয় ফেলে দেওয়া হবে। কেউ আপনাদের লাশ খুঁজে পাবে না।'

"অজিত সিংহ এগিয়ে এসে বললেন, 'শঙ্কর আবার কাকে জুটিয়ে এনেছে কেকে?'

"আমি তো শুনে অবাক! কালো জ্যাকেট পরা লোকটি কেকে? আশ্চর্য! এঁর নাম আমি শঙ্খবাবুর মুখে শুনেছি। প্রাক্তন পুলিশকর্তা। তিনি দেখলাম আমাকে চেনেন। বললেন, 'এ হচ্ছে ঘুমসি পাহাড়ের রাবার গার্ডেনের ম্যানেজার। রাজকুমার এর কাছেই উঠেছিল এসে। রাজপরিবারের অনেক গুপ্ত কথাই এ শঙ্খর কাছ থেকে জেনে গিয়েছে।'

"হঠাৎ বিরজু এগিয়ে এসে বলল, 'পাথর সরানো হয়ে গেছে, এবার তালাটা খুলতে হবে। তলোয়ারটা চাই।'

"অজিত সিংহ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি ঠিক জায়গাটা বেছেছেন তো কেকে?'

"কেকে মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন, 'গোটা জীবনটাই তো গোপনে গোপনে ওই গুপ্তধনের খোঁজ করে গেলাম হে। জায়গা আমি ভুল বাছিনি। যারা এই তোষাগার তৈরি করেছিলেন তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। গুপ্তধন যদি দুর্গের মধ্যে থাকত তাহলে সেটা কবেই লুঠ হয়ে যেত। এত বছর ধরে বহুবার আক্রমণ হয়েছে, খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে দুর্গের মধ্যে। কিন্তু আসল জায়গাটা কেউ খুঁজে পায়নি। গুপ্তধন আছে। কিন্তু দুর্গের মধ্যে না থাকলে, সেটা কোথায়? আমি যখন রাজা ভান সিংহের মৃত্যুর তদন্ত করতে এসেছিলাম, একটা জিনিস লক্ষ করি, রাজা যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের একটাই জানালা। পূর্ব দিকের সেই জানালা দিয়ে সরাসরি এই গুহার মুখটা দেখা যায়। পরে ভেবে দেখলাম, পাহাড়ের মাথায় দুর্গের ঐ একটাই ঘর থেকে গুহার এই মুখটা দেখা যাবার পিছনে রয়েছে ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ। ঐ ঘরে বসেই নজর রাখা হত এই গুপ্তধনের উপর। আর এই জায়গাটা চারিদিকে পাহাড়, টিলা আর হ্রদ দিয়ে ঘেরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে। খুব সহজে বাইরের লোকের পা এখানে পড়বে না। তোষাগারটিকে রক্ষা করার জন্য দুর্গটি তৈরি করা হয়েছিল, দুর্গের মধ্যে তোষাগার তৈরি হয়নি। কিন্তু সবকিছু জানার পরেও গুপ্তধন আমি বের করতে পারিনি। কারণ বংশের আসল পবিত্র তলোয়ারটার দরকার ছিল মন্ত্রের মায়াজাল কেটে গুপ্তধনের কাছে পৌঁছোবার জন্য। এইবার সেটা হাতে এসে পৌঁছেছে।'

" 'আসল তলোয়ার -মানে? সেটা তো আগে থেকেই আপনার কাছে ছিল!'



"ততক্ষণে পিছন থেকে মহেশ্বরের ছেলে একটা লম্বা ব্যাগ কাঁধে করে এগিয়ে এসেছে। বুঝলাম, গ্রামের লোক ডাকতে যাওয়া সব নাটক। ছেলেটি ব্যাগ খুলে বের করল সোনার খাপে ভরা একটা তলোয়ার। বলল, 'এই নিন সমুদ্রগুপ্তের আসল তলোয়ার।'

"তলোয়ারটা হাতে নিয়ে কেকে তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'রাজা ভান সিংহ ছিলেন অতি ধুরন্ধর লোক। সবাইকে বোকা বানিয়ে তলোয়ারের একটা রেপ্লিকা তৈরি করেছিলেন বিক্রি করার জন্য। শিংলয়ের বাংলোয় সবার সামনে সেটাই দেখানো হয়েছিল। আসল তলোয়ার হলে সেটা কখনও বিক্রি করার কথা ভাবতেন না। সেদিন রাতে বিরজু রাজাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তারপর রাজার আত্মহত্যার ঘটনা সাজিয়ে নকল তলোয়ারটা নিয়ে পালানোর সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আমি তখনই ওর মুখে গুপ্তধনের ইতিহাসটা জানতে পারি। নিজেকে বাঁচাতে তখন তলোয়ারটি আমার হাতে তুলে দিয়ে ও পালিয়ে যায়। পরে আমি সেই তলোয়ার নিয়ে এই গুহায় এসেছিলাম। কিন্তু সেটা দিয়ে যখন এই গুপ্ত দরজা খুলল না, তখনই বুঝেছিলাম এটা আসল তলোয়ার নয়। আমি তবু হাল ছাড়িনি। বছরের পর বছর খুঁজে গেছি। রাজবংশের পুরোনো গল্প জোগাড় করেছি লোকজনের মুখ থেকে। আর তাতেই জেনেছিলাম, কীভাবে সন্ধান মিলবে এই আসল তলোয়ারের। রাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী যদি লিঙ্গেশ্বরের দেয়া মালা গলায় ধারণ করে একমাত্র তবেই তার চোখে ফুটে উঠতে পারে আসল তলোয়ারের গুপ্তস্থান।'

"কালবৈঠা প্রশ্ন করলেন, 'বিরজু তো রাজার বড় ছেলে। তাকেই তো–'

"অজিত সিংহ মাথা নেড়ে বললেন, 'বিরজু দাদার নিজের সন্তান নয়। দত্তক নেওয়া ছেলে। সোজা পথে এই ঐশ্বর্য সে কোন দিনই ভোগ করতে পারত না।'

"বিরজু বলল, 'আমি শিলঙের বংলোয় একদিন রাতে বাবামায়ের কথা আড়ি পেতে শুনেছিলাম। তারা বলছিল আমি তাদের নিজের ছেলে নয় বলে রাজঐশ্বর্যের উপর আমার কোন অধিকার নেই। তখনই ঠিক করি ঐ তলোয়ারটা নিয়ে আমি পালাব। পরে যখন জানতে পারলাম ওটা নকল, তখন ভাবলাম সব কিছু শেষ। কিন্তু আসল সমুদ্রগুপ্তের তলোয়ারটা পাওয়া গেল কীভাবে?'

"বিরজুর প্রশ্নের জবাবে এইবার শঙ্করবাবু মুখ খুললেন, 'কেকের মুখে শঙ্খবাবুর খোঁজ পাবার পর তাকে যেভাবেই হোক এইখানে আনবার চেষ্টা করা শুরু করি আমরা। কিন্তু কেকে-র চিঠিতে যখন কাজ হল না তখন কেকে সরকারী যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক কসরৎ করে ফের তাকে তার অফিসের কাজে এইখানে নিয়ে আসেন। তারপর সে নিজেই যখন দুর্গে এসে হাজির হল, তখন আমি তাকে চোখে চোখে রেখেছিলাম। সূরজ ওরফে শঙ্খ সেন সেদিন দুর্গে রাত কাটাতে গিয়ে স্বপ্নের মধ্যে একটা কুয়ো দেখেছিল। পরে কথাটা আমাকে যখন বলল, ভেবে দেখলাম সেরকম কুয়ো এ তল্লাটে একটাই আছে। দুর্গের পূর্ব দিকে পুরানো কালীমন্দিরের পিছনে। রাজগুরু লিঙ্গেশ্বর ঐ মন্দিরেরই পূজারী ছিলেন। কুয়ার মধ্যে গুনে গুনে দেড়শ সিঁড়ি নেমে দেয়ালের গায়ে একটা আলগা পাথরের ভিতরে ছিল এই তলোয়ার। আমিই বের করেছি সেখান থেকে। আর একটা কথা, শুধু এই তলোয়ার দিয়ে যদি গুপ্ত দরজা খুলে যেত তাহলে আমাকে কষ্ট করে লোক লাগিয়ে রাজকুমারকে আবার এখানে ধরে আনতে হত না। প্রকৃত উত্তরাধিকারী যখন নিজের রক্ত দিয়ে এই তলোয়ারকে শোধন করবে তখনই একমাত্র দৈব্যশক্তি এতে ভর করবে। আর খোলা যাবে গুপ্ত দরজা।'

"কেকে এগিয়ে এসে শঙ্করের কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, 'সাবাস!'

"কালবৈঠা মন্ত্রের পাঠ শুরু করলেন। ধুনীতে আগুন জ্বলে উঠল আরও জোরে। উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রচ্চারণে গমগম করে উঠল গুহার ভিতর। কিছুক্ষণ পর শঙ্খবাবুর বাঁধন খুলে চাগিয়ে নিয়ে আসা হল যজ্ঞের আগুনের কাছে। লক্ষ করলাম তাঁর চাহনিটা কেমন যেন নেশার ঘোরের মত। নিজের পায়েও ঠিক মত দাঁড়াতে পারছেন না। টলমল করছেন। তলোয়ারের লোহার পাতটা ততক্ষণে যজ্ঞের আগুনে লালচে হয়ে উঠেছে। বিরজু কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে শঙ্খবাবুর ডান হাতের তালুতে একটা আঁচড় দিতেই লাল রক্ত টপটপ করে ঝরে পড়ল তলোয়ারটির উপর।



"তারপর কেকে এগিয়ে এসে তলোয়ারটি কালবৈঠার হাত থেকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন গুহার ভিতর। পিছনে বাকি সবাই এগোল। শঙ্খবাবুকে ছেড়ে দিতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন পাথরের মেঝেতে। তাঁর শরীর থেকে যেন প্রাণ বায়ু শুষে নেওয়া হয়েছে। এদিকে কেকে একটা মোটা পাথরের দেয়ালের খাঁজের মধ্যে তলোয়ারটি ঢুকিয়ে চাপ দিলেন। কিন্তু কিছুই হল না।

"একে একে সবাই চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু পাথরের দরজা এক চুলও সরল না। কিছুক্ষণ পর অজিত সিংহ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী ব্যপার? আসল তলোয়ার, আসল উত্তরাধিকারীর রক্ত, সব মিলে গেল কিন্তু দরজা খুলছে না কেন? এখন একটাই রাস্তা বাকি আছে ডিনামাইট দিয়ে পাথরের দেয়াল উড়িয়ে দাও।'

"কেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'পাগল হয়ে গেছেন আপনি? ডিনামাইট দিয়ে রাস্তা খোলা গেলে আমি কবেই খুলে ফেলতাম। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, এই পাহাড়টা পুরো ফাঁপা। ডিনামাইট তো দুরের কথা বেশি শাবল গাঁইতি দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলেও বিপদ। গুপ্তধন সমেত গোটা পাহাড় পাতালে ঢুকে যাবে।'

" 'তাহলে এখন উপায়?'

" 'একটু ভাবতে দিন,' বলে কেকে দুবার পায়চারী করে বললেন, 'মনে হয় কোথাও আমাদের ভুল হচ্ছে। আচ্ছা, লিঙ্গেশ্বরের দেওয়া মালাটি গলায় পরে তলোয়াটা যদি রাজকুমার নিজে হাতে ধরে এখানে প্রবেশ করায় তাহলে হয়ত এই দরজা খুলতে পারে।'

"সবাই কথাটাকে সমর্থন করল। বিরজু অচৈতন্য শঙ্খবাবুকে আবার চাগিয়ে নিয়ে গেল পাথরের দরজার কাছে। তারপর তাঁর গলায় একটা তাবিজের মালা পরিয়ে হাতে তলোয়ারটি দিয়ে নির্দিষ্ট যায়গায় প্রবেশ করানোর জন্য নিয়ে গেল। কিন্তু অকস্মাৎ পুরো ঘটনার মোড় ঘুরে গেল অন্য দিকে। প্রথমে শঙ্খবাবুর সারা শরীর কেঁপে উঠল, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে তলোয়ারটি হাতে করে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এমন ভাবে দাঁড়ালেন যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি। তাঁর মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বের হল সেটাও সম্পূর্ণ অচেনা আর গম্ভীর, 'এই তোষাগারে প্রবেশের কোন অধিকার তোমাদের নেই। বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও সবাই।'

"কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো একেবারে হতবম্ব হয়ে গেছি। বাকিরাও বেশ হকচকিয়ে গেছে মনে হল। বিরজু হঠাৎ একটা শাবল তুলে নিয়ে 'রে..রে..' মারতে তেড়ে গেল শঙ্খবাবুর দিকে। কিন্তু অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় মাথাটা সরিয়ে নিলেন তিনি। বিদ্যুৎ বেগে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে বিরজুর মাথায় ঘুরিয়ে একটা আঘাত করলেন। সে পড়ে গেল মেঝেতে। শঙ্খ বাবুর চোখ দিয়ে যেন তখন আগুন বের হচ্ছে। সবাই সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে পিছিয়ে এসেছে। আবার হুঙ্কার দিলেন, 'বেরিয়ে যাও সবাই এখান থেকে। আমি বেঁচে থাকতে কেউ এই তোষাগারে প্রবেশ করতে পারবে না।'

"তারপরেই একটা গুড়ুম করে গুলির আওয়াজ হল, শঙ্খবাবু পড়ে গেলেন। হাত থেকে ছিটকে পড়ল তলোয়ার। দেখলাম কেকে জ্যাকেটের পকেটের ভিতর থেকেই অব্যার্থ নিশানায় গুলি চালিয়েছেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'রাজরক্ত আর প্রবিত্র তলোয়ার এক হয়ে শরীরে দৈবশক্তির সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু নাইন এম.এম. পিস্তলের বুলেটের কাছে এসব নস্যি।'

"অজিত সিংহ এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ কি মরে গেল? দরজা তাহলে কী করে খুলবে?'

"শঙ্কর প্রসাদ বসে নাকে হাত দিয়ে বললেন, 'না মারেনি, নিঃশ্বাস চলছে। তবে জ্ঞান হারিয়েছে।'

" 'ওর হাতে তলোয়ারটা দিয়ে দরজার কাছে নিয়ে চল।'

"সবাই মিলে ধরাধরি করে আবার পাথরের দরজার কাছে নিয়ে গেল শঙ্খবাবুকে। তাঁর হাতে তলোয়ারটা দিয়ে একটা খাঁজের মধ্যে প্রবেশ করাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঘড়ঘড় শব্দ করে পাথরগুলি সরে গিয়ে একটা রাস্তা করে দিল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে। শঙ্খবাবুকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে মশাল হাতে একে একে ভিতরে ঢুকে গেল সবাই।

"সামনে যজ্ঞের আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। আমি হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। অনেক কষ্টে ঘসে ঘসে এগোলাম আগুনের দিকে। তারপর হাতের বাঁধনটা এগিয়ে দিলাম। আগুন লেগে নাইলনের দড়িটা পুড়তে শুরু করল। দাঁতে দাঁত চেপে চার পাঁচবারের চেষ্টায় কেটে গেল দড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে পায়েরটাও খুলে



ফেললাম। শঙ্খবাবুর কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখি গুলিটা ডান হাতের কাঁধ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। চিকিৎসা করলে বেঁচে যাবেন হয়ত। তাঁকে কোন রকমে চাগিয়ে ঘাড়ের উপর ফেলে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। অন্ধকারে পায়ের কাছে কিছু ঠেকতে লক্ষ গেল মদনের দিকে। সেও হাত পা বাঁধা অবস্থায় গোঙাচ্ছে। ওঁকে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে মদনের দড়িটা খুলে দিলাম। বললাম, কিছুটা দূরে ঝর্ণা থেকে জল এনে শঙ্খবাবুর শুশ্রূষা করতে। তারপর আবার ফিরে গেলাম গুহার ভিতরে।

"আমার টর্চটা ধস্তাধস্তির সময়ে গুহার মুখে পড়ে গিয়েছিল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পাথরটা যেখানে ফাঁক হয়েছিল সেটা দিয়ে ঢুকে পড়লাম। ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বহুকাল আগে পাথর কেটে বানানো হয়েছিল এই রাস্তা। কিছু দূর গিয়ে দু ভাগ হয়ে গেছে। এবার কোন দিকে যাব? কান খাড়া করে শুনলাম কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা। না, কোন দিক থেকেই কোন শব্দ পেলাম না। তারপর নিচের মাটিতে জুতোর দাগ টর্চের আলোয় ভালো করে লক্ষ করে মনে হল, ডানদিকের রাস্তায় ওরা প্রথমে গিয়েছিল কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। বাঁ দিকেরটায় ঢুকেছে কিন্তু ফেরার দাগ নেই। অতএব সেই পথেই সন্তর্পণে এগোলাম। এদিকে ওদিক এঁকে বেঁকে বেশ কিছুটা যেতে কিছু মানুষের সমবেত চিৎকার কানে এলো। তারপরেই চোখে পড়ল আর একটা পাথরের দরজা। এক পা এক পা করে এগিয়ে দেখি দরজার ওপারে ধাপে ধাপে নেমে গেছে পাথরের সিঁড়ি। প্রায় একশ ফুট নেমে একটা বিশাল বড়ো ডিম্বাকৃতির গুহা। পাথরের দেয়ালের গায়ে অদ্ভুত সব খোদাই করা মূর্তি। মশাল হাতে সবাই এখানেই নেমেছে প্রশস্ত মেঝেতে এবং আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। চিৎকারের কারণ হচ্ছে পুরো মেঝেতেই ছড়িয়ে আছে ঘড়া ঘড়া সোনা দানা, হাজার বছরের পুরানো রাজঐশ্বর্য। কুবেরের ভাণ্ডারও এর কাছে সামান্য মনে হবে। এই দৃশ্য দেখে আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। টর্চ নিভিয়ে আমি সেখানেই ধপ করে বসে পড়লাম পাথরের উপরে।

"হঠাৎ মনে হল, সামনের ঐ জীবন্ত লোকগুলি ছাড়া আরও অনেকে আছে এখানে। মনের ভুল, না চোখের, বুঝে উঠতে পারলাম না। অন্ধকারের মধ্যে পাথরের দেয়ালে খোদাই করা মূর্তিগুলি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাদের থেকে কালো ধোঁয়ার আকৃতির ছায়ার দল কাঁপতে কাঁপতে হাওয়ার সাথে ভেসে নেমে আসছে নিচের দিকে।

"মেঝের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা বেদীর উপরে রয়েছে একটা সোনার সিংহাসন। কেকে হঠাৎ সমুদ্রগুপ্তের তলোয়ারটি নিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে গিয়ে সেই সিংহাসনের উপর বসে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সিংহাসনটি তাঁকে নিয়ে ভুস করে ঢুকে গেল গহ্বরে। ভিতরটা মনে হয় ফাঁপা ছিল। তারপরেই একটা মড়মড় করে বিকট আওয়াজ। পুরো গুহাটা কেঁপে উঠল ভূমিকম্পের মত। বাকিরা থতমত খেয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল। পাহাড় তখন প্রচণ্ড জোরে কাঁপতে শুরু করেছে। আমি দৌড়াতে শুরু করলাম পিছন দিকে। বড়ো বড়ো পাথর খসে পড়ছে গুহার মধ্যে। মনে হল ওরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার আগেই পাথরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পড়িমরি করে যেখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়েছিল সেখানে এসে দেখি প্রধান রাস্তাটা আগেই বন্ধ হয়ে আছে। কী করব বুঝতে না পেরে অন্য রাস্তা ধরেই দৌড়াতে শুরু করলাম। তারপর একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। আর আমার সামনে থেকে পাহাড়টা দু'ভাগ হয়ে গেল। আমি গড়িয়ে গিয়ে পড়লাম জলের মধ্যে। সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে না উঠতে পুরো পাহাড়টা হুড়মুড় করে ভেঙে ঢুকে গেল ভিতরে। ভাগ্য খুব ভালো ছিল। না হলে ঐ গুহা থেকে জীবিত বের হতে পারতাম না সেদিন। পরে ভেবে দেখলাম ঐ সিংহাসনটা ছিল একটা ফাঁদ। রাজার উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্য কেউ সিংহাসনে আসীন হলে আপনা থেকেই ওটা ভিতরে ঢুকে যাবে। আর বিশাল ছাতার মত পুরো গুহাটা বন্ধ হয়ে সমস্ত ধনরত্ন সমেত পাতাল প্রবেশ করবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঋজু প্রশ্ন করল, "আপনি যে রকম বলছেন, এত বিশাল ধনরত্ন এখানে এলো কীভাবে? সেটাই তো একটা বিস্ময়।"

"হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমিও পরে বেশ কিছু পুরানো বইপত্র ঘেঁটেছি। রাজা তিমগাদেবের সময়ে রাজধানীর দক্ষিণে এক গোপন জায়গায় পাহাড়ের মধ্যে একটা তোষাখানা তৈরি করা হয়েছিল। রাজ্যের উপার্জিত যত সোনা দানা, মোহর, দামি পাথর সব রাখা থাকত সেখানে। তখন বিদেশী লুটেরা এসে প্রায়ই ভারতীয় রাজাদের ধনরত্ন



লুট করে নিয়ে যেত। সেই ভয় থেকেই তারা এমন গোপন জায়গায় তোষাখানাটি তৈরি করেছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর লেখায় কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা শোনা যায়। বারোশ পাঁচ সালে আফগান শাহেনশা 'মহম্মদ-ই-বখতিয়ার' বিশাল সেনা নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। পাটলিপুত্র, কামরূপ হয়ে তিনি তিব্বতে যান। ইতিহাসে লেখা আছে তাঁর সেনা যে পথে যেত তার দু'দিকে শ্মশান হয়ে যেত। কিন্তু কামরূপ রাজ্যের তোষাখানার কোন হদিশ তিনি পাননি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পাতা জিজ্ঞাসা করল, "শঙ্খবাবুর কী হল?"

"পরে মদনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলল, ঝর্ণা থেকে জল এনে আর শঙ্খবাবুকে আর দেখতে পায়নি। তারপরেই কেঁপে উঠল পাহাড়। ও নিজের প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালিয়ে যায়।"

"তাহলে মনে হয় উনিও পাহাড়ের ধ্বসে চাপা পড়ে গেছেন।"

সুরেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হতে পারে। তবে কিছুদিন আগে গুয়াহাটিতে কামাখ্যা পাহাড়ে অম্বুবাচীর মেলায় তান্ত্রিক হেমগিরির পাশে তাঁর নতুন শিষ্যকে দেখলাম। বড় বড় চুল দাড়ি আর লাল সিঁদুরমাখা মুখ। সারা গায়ে রক্ত চন্দন আর রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে কালো জোব্বা। মুখটা খুব চেনা চেনা লাগল। হঠাৎ মাথায় এলস ওর চোখ দুটোর সাথে শঙ্খবাবুর খুব মিল।"

তিন জনেই অবাক গলায় বলল, "সেকী!!"

"মনে হয় হেমগিরি শঙ্খবাবুর প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ওঁকে চিনতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি আন্দাজ করেছিলেন এদের ষড়যন্ত্রের কথা। আর হেমগিরিই শেষ পর্যন্ত ওঁর প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন।"



তীর্ণা প্রশ্ন করল, "তার মানে শঙ্খবাবু এখনও বেঁচে আছেন। আপনি ওঁর সাথে আর যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি?"

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "করেও কোন লাভ হত না। ওঁর আগের স্মৃতি আর কিছুই মনে নেই। সাইকোলজিক্যাল রিপ্রেসান অফ মোটিভেটেড ফরগেটিং।" বলে বইটি হাতে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

ঋজু কিছুক্ষণ ভেবে মন্তব্য করল, "তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে কারোর পূর্ব স্মৃতি মুছে দেওয়া যায়? এ কথাটা আমার ঠিক হজম হচ্ছে না।"

তীর্ণা বলল, "সম্মোহনের মাধ্যমে করতে পারে। আর এই ধরনের তান্ত্রিকরা সম্মোহন ভালোই জানে।"

বাইরে তখন ঝিঁঝিঁপোকার ডাকের সাথে ভেসে যাচ্ছে কোজাগরীর পূর্ণ চাঁদের ডাকিনী জ্যোৎস্নায় মোড়া চেরাপুঞ্জির সবুজ পাহাড়গুলি। ওরাও সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল সেই রহস্যময় অরণ্যের দিকে।

অলংকরণঃ মৌসুমী





(১)

নন্দ গো! নন্দদুলালের গল্প। শুনে তোমরা হয়তো বলবে, গপ্প। এসব সত্যি হয় নাকি? কিন্তু আমি নিরুপায়। আসলে নন্দ আমার খুব চেনা মানুষ কিনা। কতদিন দেখেছি ওকে। শ্যামলা রোগা-পটকা শরীর। বছর ষোল বয়স। বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ। যেমন সহজ সাদাসিধে, তেমন ফুর্তি। মুখে হাসি লেগেই আছে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখ, সকাল থেকে চাট্টি মুড়ি ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি।

এদিকে শুক্রবারে হরিদেবপুর হাট। দুপুরের আগেই জমে ওঠে। কাঁধে সস্তা বিস্কুট বোঝাই একটা টিনের বাক্স ঝুলিয়ে সেই তখন থেকে নন্দ বিরামহীন হেঁকে চলেছে,

কলকাতার মাল, টাকায় ন"খান।
আজ না খেলে মিলবে না কাল।
ঘি চপচপ, ঘি চপচপ।

ছড়াটা নন্দ নিজেই বেঁধেছে। সেবার তাই নিয়ে এক কাণ্ড! নন্দ গলা ছেড়ে দুপুর থেকে সুর করে হাটের মাঝে হেঁকে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক বুড়োর মুখোমুখি। বুড়ো বেজায় খুঁতখুঁতে। কুতকুতে চোখ বিস্কুটের উপর খানিক বুলিয়ে নিয়ে বলেছিল, "বিস্কুটগুলো কলকাতার তো রে ছোঁড়া? ঠিক বলছিস?"

উত্তরে একগাল হেসে নন্দ বলল, "কী যে বলেন দাদু! কলকাতার মাল এই হরিদেবপুরের হাটে কখনও টাকায় নয়টা মেলে? এই গেরামেই তৈরি। তবে ছড়াটা আমি নিজে বেঁধেছি। ভাল হয়নি?"

বলা বাহুল্য, নন্দর সেই ব্যবসা চলেনি বেশিদিন। কয়টা মাস খুব কষ্টেই কেটেছিল তারপর। পেট তো আর একটা নয়। দেশের বাড়িতে রয়েছে বুড়ি দিদিমা। এছাড়া ছোট দুটো ভাইবোন। কাঠা কয়েক পৈতৃক জমি আছে। শাক-সবজি করে কোনোমতে দিন চলে। নন্দর রোজগার বন্ধ হলে তাদেরও অনেকদিন উপোষ দিতে হয়। হাতে পুঁজির সামান্য কয়টা টাকা শেষ হয়ে যেতে তাই বড়ো বিপদেই পড়েছিল। ক'টা মাস হেন কাজ নেই, যা করেনি। মুটেগিরি থেকে মাটি কাটা। তার মধ্যেই আর এক ব্যাপার।

সেবার হাটখোলার ঘাটের অদূরে বাজারের পাশে আস্তানা নিয়েছিল এক বৃদ্ধ সাধু। সঙ্গে দু'জন সাগরেদ। হিমালয় পাহাড়ের কোন গুহায় নাকি বাস। ভূত ভবিষ্যৎ নখদর্পণে। আপন খেয়ালে পায়ে হেঁটে চলেছেন গঙ্গাসাগর তীর্থে। এসব অবশ্য সাধুবাবার কথা নয়। সারা দিনে একটি কথাও তিনি কইতেন না। সবটাই তাঁর দুই শিষ্যর কথা। যাই হোক, ব্যাপারটা রটে যেতে ভিড় জমতে দেরি হয়নি। সাধুর ঠেকে ভিড় লেগেই থাকত। হাটের দিন তো কথাই নেই। নন্দ সেদিন কাজের খোঁজে গিয়েছিল হাটখোলার দিকে। আগেও এসেছে। সাধুবাবার কথা জানত। হঠাৎ খেয়াল হতে দেখে সাধুবাবার সেই ঠেক আজ প্রায় জনমানব শূন্য। গোড়ায় ভেবেছিল, বোধ হয় চলে গেছেন তিনি। কিন্তু তারপরেই ভয়ানক ব্যাপারটা কানে এল। আগের দিন সন্ধে থেকেই সাধুবাবার হঠাৎ দাস্ত বমি। রাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়তে দুই সাগরেদ টাকা-পয়সা যা ছিল, নিয়ে ভেগেছে। তখন থেকে সেই ভাবেই পড়ে আছেন তিনি। ভয়ানক ভেদ কলেরা। কেউ ধারেকাছেও মাড়ায়নি। খানিক আগে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, যদি তারা এসে কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।

সেই খবর শুনে নন্দ আর স্থির থাকতে পারেনি। একাই ছুটে গিয়েছিল। চারপাশে ভয়ানক নোংরা। মাছি ভনভন করছে। তার মাঝে নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছে মানুষটা। তিনটে দিন টানা শুশ্রূষায় নন্দ সেই সাধুবাবাকে ফের সুস্থ করে তুলেছিল। নন্দকে দেখে হাটের অনেকেই অবশ্য এগিয়ে এসেছিল এরপর। কিছু অর্থ সাহায্যও করেছিল।

সামান্য সুস্থ হতে সাধুবাবা অবশ্য নন্দকে আর আটকে রাখতে রাজি হয়নি। বললেন, "তোকে আর কষ্ট দেব না বাপু। মতিভ্রম হয়েছিল। তাই গহন হিমালয়ে নিজের সাধন-ভজনের থান ছেড়ে এদিকে এসেছিলাম। নামডাক কেনার সাধ হয়েছিল। শিষ্যও জুটিয়েছিলাম। ভগবান সইবেন কেন। উচিত শিক্ষায় দিয়েছেন। আজই ফিরে যাব হিমালয়ের পথে।"

"কিন্তু বাবাঠাকুর, এখনো যে সম্পূর্ণ সুস্থ নয় আপনি।" নন্দ আপত্তি জানিয়েছিল।

"ও নিয়ে ভাবিসনি বাবা। যিনি বাঁচিয়েছেন, দেখার হলে তিনিই দেখবেন। কিন্তু তোকে কী দেই বলতো!"

নন্দ হাঁ-হাঁ করে উঠছিল। কিন্তু সাধুবাবা কানে নেননি, "পথে দুই শিষ্য জুটিয়েছিলাম। তাদের সেবা নিয়েছি। তার মূল্য তারা বুঝে নিয়ে গেছে। তুই বাকি থাকবি কেন! আপত্তি করিসনি।"

কিন্তু কী দেবেন সাধুবাবা! খানিক এদিক ওদিক তাকাতে নজরে পড়ল আধছেঁড়া ঝুলিটা। ভিতরে যা ছিল, যাওয়ার সময় দুই শিষ্য খুঁটে নিয়ে গেছে। খালি ঝুলিটাই পড়ে আছে শুধু। সাধুবাবা সেই ঝুলিটা তুলে বার কয়েক ঝাড়লেন। তাতে ছোট সাদামতো কী একটা বের হয়ে কোথায় ছিটকে পড়ল। সাধুবাবা বললেন, "দেখ তো বাপু, পড়ল কোথায়?"

কিন্তু অনেক খুঁজেও নন্দ তার হদিস করতে পারল না। বেজায় বিরক্ত হয়ে সাধুবাবা হাতের সেই ছেঁড়া কাঁথার ঝুলি ছুঁড়ে দিলেন নদীর জলে। "নাহ্, তোর বোধ হয় কিছু আর জুটল না দেখছি।" কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে হনহন করে চলে গেলেন তিনি।

কী কাণ্ড! নন্দ অবাক হয়ে দেখল। ছুঁড়ে দেওয়া ছেঁড়া কাঁথার সেই ঝুলি হঠাৎ মেলায় দেখা গ্যাস বেলুনের মতো ফুলে উঠল শোঁ-শোঁ শব্দে। তারপর সাঁ করে উড়ে গিয়ে পড়ল একেবারে মাঝ নদীতে। ফুস করে ডুবে গেল। আর ঠিক সেই সময় পায়ের নীচে কিছু পড়তে নন্দ তাকিয়ে দেখে শুকনো এক পাতার নীচে ছিটকে পড়া সেই জিনিসটা। তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নিয়ে ডাকল সাধুবাবাকে। "বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর।"

সাধুবাবা ততক্ষণে চলে গেছেন অনেকটা। ফিরেও তাকালেন না। একটু বাদে হারিয়ে গেলেন পথের বাঁকে।

(২)

বাদার অঞ্চল নদীনালার দেশ। হরেক গঞ্জের ঘাট। কিন্তু মহামায়াগঞ্জের মতো কোনোটা নয়। মস্ত বাজার। কাছেই রেল স্টেশন। সারা দিনে গোটা কয়েক লঞ্চ এসে জেটিঘাটে ভেড়ে। এছাড়া যাত্রী নিয়ে গয়নার নৌকো তো দিনভর। সব মিলিয়ে জমজমাট। এই মহামায়াগঞ্জে গোবিন্দ সামন্তর হোটেলের বেজায় নামডাক। স্টেশনে ট্রেন বা জেটিঘাটে লঞ্চ এসে ভিড়লেই খদ্দেরের ভিড়। দশজন কর্মচারী হিমসিম খেয়ে যায়। মাঝ বয়সী গোবিন্দ সামন্তর বিশাল বপু। কুচকুচে গায়ের রং। সেই সাথে চওড়া নাকের নীচে বেড়ালের মতো ঝাঁটা গোঁফ। কাচের গুলির মতো একজোড়া ধূর্ত চোখ।

ছোট এক টুলে গোবিন্দ সামন্ত দিনভর ক্যাশবাক্স আগলে বসে থাকেন। ফাঁকি দেবার জো নেই। দিন কয়েক আগে এক খদ্দের মাংস-ভাতের সঙ্গে মাছও নিয়েছিল এক প্লেট। কাজের চাপে কর্মচারী ছোকরা খেয়াল রাখতে পারেনি। খদ্দেরটি সেই সুযোগে পয়সা মেটাবার সময় শুধু মাংস-ভাতের দাম দিতে যাবে, তেড়ে উঠে গোবিন্দ সামন্ত তার কলার চেপে ধরেছিলেন। তারপর খদ্দেরটিকে চূড়ান্ত হেনস্তাই শুধু নয়, কর্মচারী ছোকরাটিও সেই দণ্ডে ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল।

বছর কুড়ি আগে গোবিন্দ সামন্ত কন্টাই থেকে প্রায় এক বস্ত্রে মহামায়াগঞ্জ এসে তেলেভাজার দোকান দিয়েছিলেন। শাঁসে জলে বেড়ে তা এখন "মা তারা ব্রহ্মময়ী হোটেল"। দু'বেলা কয়েকশো পাত পড়ে। শুধু হোটেলই নয়, সাদাকালো মিলিয়ে আরও গোটা কয়েক ব্যাবসা। পুলিশ, পার্টি-বাবু সবাই হাতের মুঠোয়। লোকে বলে, গোবিন্দ সামন্তর নাকি সম্পত্তির শেষ নেই।

কন্টাই আর মেদিনীপুরে স্বনামে বেনামে গোটা কয়েক বাড়ি। হাজার বিঘে জমি। অথচ ট্যাঁক থেকে দশটা পয়সা দান-খয়রাতি করতে কেউ তাকে দেখেনি। গোবিন্দ সামন্ত নিজেই বলেন, গত তিরিশ বছরে কাউকে তিনি ভিক্ষে দেননি।

তা আমাদের নন্দ এসে পড়ল সেই গোবিন্দ সামন্তের হাতে। দুই মানিকজোড় বদন ব্যাপারী আর মদন কুণ্ডুই জুটিয়ে আনল তাকে। মহামায়াগঞ্জে দুই মানিকজোড়কে চেনে না, হেন মানুষ নেই। রোগা লিকলিকে শরীর। মনে হয় ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। দুটিতে দিনভর পথেঘাটে টো টো করে বেড়ায়। দালালি থেকে শুরু করে আইনি বেআইনি কোনো কাজেই আপত্তি নেই। শোনা যায়, দু'জন গঞ্জের মহাজন মানুষের যত দু'নম্বরি কাজের মুশকিল আসান। বদনই মূল গায়েন। বুদ্ধিতেও পাকা। তুলনায় মদন কিছু খাটো। অগত্যা বদনের শাগরেদ। তা কাজের খোঁজে নন্দ সেদিন এসে পড়েছে মহামায়াগঞ্জে। পড়ে গেলে দুই মানিকজোড়ের নজরে।

প্রতিদিন গঞ্জের বড় পুকুরে স্নান সারেন গোবিন্দ সামন্ত। স্নানের আগে ঘাটে বসে আয়েস করে তেল মাখেন। তা সেদিনও তিনি তেল মাখার পর ঘাটের পৈঠেয় তেলের বাটি রেখে জলে নেমে সবে ডুব দিয়েছেন, হঠাৎ একটা কাক কোত্থেকে উড়ে এসে খাবারের লোভে বসল বাটির কাছে। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই বিশাল বপু নিয়ে হুড়মুড় করে ধেয়ে এলেন তিনি। তাই দেখে বেজায় ঘাবড়ে বাটিটা ঠোঁটে নিয়ে কাকটা উড়ে বসল ঘাটের পাশে মস্ত শিমূল গাছের মগডালে। দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গোবিন্দ সামন্ত থমথমে মুখে খানিক তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর দু'হাত নেড়ে কাকের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে শুরু করলেন।

ওদিকে কাক বেচারার ততক্ষণে এক ডালের খাঁজে বাটি নামিয়ে ভোজ সারতে গিয়ে মালুম পেয়েছে বাটিতে খাওয়ার কিছু নেই। অথচ নীচে তার মালিক যেভাবে তর্জন-গর্জন শুরু করেছে, তাতে জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। সুতরাং বাটিটা সেখানে ফেলে রেখেই জেটি-ঘাটের দিকে হাওয়া।

তেলের বাটির আশু বিপদের সম্ভাবনা কাটতে গোড়ায় খানিক আশ্বস্তই হয়েছিলেন গোবিন্দ সামন্ত। কিন্তু একটু পরেই বুঝলেন, বাটিটা ফের হস্তগত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। সেটা ডালের এমন জায়গায় রয়েছে যে, লম্বা লগি দিয়ে খোঁচা দিলেই টুপ করে পুকুরে পড়বে। একেবারে গভীর জলে। আর কাঁটাওয়ালা ওই শিমুলগাছে উঠে যে বাটিটা উদ্ধার করবেন, সেই সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। ইতিমধ্যে চিৎকার শুনে মজা দেখার জন্য জনা কয়েক জড়ো হয়েছিল। গোবিন্দ সামন্ত এবার তাদের তোয়াজ শুরু করলেন। "তেলের বাটিটা পেড়ে দে বাবা। ঠাকুদ্দার আমলের জিনিস। গরীব মানুষ।"

কিন্তু গোবিন্দ সামন্তকে এই অঞ্চলের মানুষ বিলক্ষণ চেনে। তাই চিঁড়ে ভিজল না। একে একে সরে পড়ল সবাই। আরো কিছুক্ষণ হয়তো অপেক্ষা করতেন। কিন্তু ওই সময় দূরে ট্রেনের হইসল কানে আসতেই বুঝলেন, আটটার ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। হোটেলের এক ঝাঁক খদ্দের ওই ট্রেনে। ক্যাশবাক্সের কাছে না থাকলে সর্বনাশ। অগত্যা কাকের মুণ্ডপাত করতে করতে বাটির আশা সাময়িক মুলতুবি রেখে হোটেলের দিকে ছুটেছেন, দুই মানিকজোড় পড়ে গেল সামনে। দুটিতে সাত সকালেই তৈরি হয়ে ধান্দায় বেরিয়েছে। দেখা হতেই ঘাড় ঝুঁকিয়ে বিনয়ের অবতার, "জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী। সাত সকালে সামনে মহাজন মানুষ! কী ভাগ্যি গো আজ!"

চিঁড়ে অবশ্য ভিজল না। মেজাজ তিরিক্ষি হয়েই ছিল। খেঁকিয়ে উঠলেন গোবিন্দ সামন্ত। "তোদের তো ভাগ্যি! এদিকে আমার যে দিনের শুরুতেই সর্বনাশ!" কপাল চাপড়ে ব্যাপারটা সবিস্তারে ব্যক্ত করলেন তিনি।

দুই মানিকজোড় যেন তৈরি হয়েই ছিল। গোবিন্দ সামন্ত থামতেই বলে উঠল, "কিচ্ছুটি ভাববেন না মহাজনকাকা। আজই পেয়ে যাবেন।"

"তাই দে বাবা!" কিছুটা যেন আস্বস্ত হলেন তিনি। তারপরেই খেঁকিয়ে উঠলেন ফের। "তা তোদের যে আর এক কাজ দিয়েছিলুম তার কী হল র‍্যাঁ? ইদানীং দেকছি কথাই সার তোদের।"

অন্য কাজ মানে হোটেলের জন্য নতুন একজন কাজের মানুষ। হঠাৎ সেই কর্মচারীকে বিদেয় করে দেবার পর নতুন একজন কমর্চারী জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব দুই মানিকজোড়কেই দিয়েছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তেমন কাউকে এখনো জোগাড় করতে পারেনি। আসলে গোবিন্দ সামন্তকে এদিকের সবাই বিলক্ষণ চেনে। লোক পাওয়া খুব সহজ নয়। বদন হাত কচলে বলল, "লেগে আছি গো কাকা। সেই খোঁজেই তো আজ সাতসকালে বের হয়েছি। একটা ভাল ছেলের খোঁজ পেয়েছি। আর দুটো দিন সবুর করেন।"

"তাই দ্যাখ বাপু। আর তেলের বাটির কথাও মনে রাখিস।" গোবিন্দ সমন্ত আর দেরি করলেন না। ফের হুইসল দিয়ে ট্রেন তখন স্টেশনে ঢুকছে। ছুটলেন হোটেলের দিকে।

জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ তবু চলে কিন্তু মহামায়াগঞ্জে করে খেতে হল গোবিন্দ সামন্তর সুনজরে থাকাটা বেজায় দরকার। দুই মানিকজোড় বদন আর মদন ছুটল পুকুর ঘাটের দিকে।

গাছের মগডালের খাঁজে তেলের বাটি তখনও যথাস্থানে। হালকা পাতলা চেহারার ছেলেছোকরা ছাড়া পাড়া মুশকিল। বদন তেমন কাউকে খুঁজে আনার জন্য মদনকে পাঠিয়ে দিয়ে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল। মদন একটু পরেই ফিরে এল অচেনা একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। অল্প চোখ টিপে বলল, "বদনদা, ছোঁড়ার নাম নন্দ। এদিকে কাজের খোঁজে এয়েছে। খুব নাকি দরকার। দ্যাখো দেখি একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা।"

বদন অবশ্য ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে। "কীরে, কাজ খুঁজছিস বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ গো দাদা। একটা যেমন তেমন কাজ পেলেও বর্তে যাই। এই দাদা বলছিল, এদিকে কোন হোটেলে নাকি কাজ আছে।"

হতভাগা মদন তাহলে আগেই সব খোলসা করে ফেলেছে! বিরক্ত হয়ে বদন বলল, "হোটেলে কাজ করবি, কিছু জানিস?"

"আজ্ঞে তা জানি না দাদা। তবে শিখে নিতে পারব।" নন্দ হাত কচলে জানাল।

"অমন অনেকেই বলে। তারপর কাজের সময় ভোঁভোঁ। বেকার বদনাম হয়ে যায় এই বদন ব্যাপারীর। তবু বলছিস যখন দেখব। কিন্তু তার আগে দেখি কতটা কাজের মানুষ তুই। গাছের উপর থেকে ওই তেলের বাটিটা পেড়ে আন দেখি।"

বদনের কথায় নন্দ ঘাটের পাশে শিমূল গাছের দিকে তাকাল। বেজায় উঁচু গাছ। সারা গায়ে বড় বড় কাঁটা। ওঠা মোটেই সহজ নয়। বদন তাই কায়দা করে কথাটা পেড়েছিল। মদন আগে থেকে উগরে না দিলে কিছু সুবিধে হত আরও। কিন্তু বদনের ভাবনায় জল ঢেলে দিয়ে নন্দ বলল, "ও হয়ে যাবে দাদা।"

"হয়ে যাবে!" বদন তাড়াতাড়ি বলল, "তাহলে পেড়ে আন দেখি।"

"ও পেড়ে আনতে হবে না গো। যেখানে রয়েছে বাতাসে এমনিই পড়ে যাবে।"

কী কাণ্ড! ঘটলও তাই। মিনিট দুইও কাটেনি। হঠাৎ জোরাল এক দমকা বাতাসে তেলের বাটিটা ঠকাস করে নীচে ছিটকে পড়ল। সামান্যই তেল ছিল। সেটাও ছলকে পড়ল না।

(৩)

মা তারা ব্রহ্মময়ী হোটেলে কাজটা হয়ে গেল নন্দর। মাইনে মাস গেলে আশি টাকা। আরো কিছু বেশিই হবার কথা। কিন্ত কমিশন বাবদ বদনদের চাহিদা মিটিয়ে মাইনে ওই আশি টাকাতেই ঠেকল। বেচারা নন্দও তাই মেনে নিয়ে সেই দিনই লেগে পড়েছিল কাজে। ভোর পাঁচটায় কলকাতার প্রথম ট্রেন আসে। তার আগেই উনুনে আঁচ। চায়ের জল চাপিয়ে দিতে হয়। বিশ্রাম বলতে দুপুরে ঘণ্টা দেড়েক। তারপর রাত এগারোটার শেষ ট্রেন পর্যন্ত। এরমধ্যে দম ফেলার ফুরসত মেলা মুশকিল। তবে নন্দর ছেলেবেলা থেকেই এসব অভ্যাস। তবু তো দু'বেলা পেট ভরে খাবারটা মেলে। হোক না আলাদা মোটা চালের ভাত। আর কড়াইচাঁছা একটা ঘ্যাঁট। তাই মানিয়ে নিয়েছিল। সমস্যা বলতে ইতিমধ্যে ছ'মাস হয়ে গেছে, মালিক এখনো মাইনের একটি পয়সাও ছোঁয়ায়নি। তাগাদা দিলেই বলে, "হাতে পয়সা নিয়ে কী করবি বাপু। হারিয়ে ফেলবি। বরং যখন দেশের বাড়িতে যাবি, একবারে সব মাইনে নিয়ে নিস।"

কথাটা মন্দ নয়। তবে ব্যাপার হল, দেশের বাড়ির কথা তুললেই মালিকের এক কথা, বড্ড কাজের চাপ রে এখন। আর কটা দিন পরে যাস বরং। নন্দ এর মধ্যে আর তাগাদা দেয়নি। কিন্তু বাড়ি এবার না গেলেই নয়। বুড়ি দিদিমা খবর পাঠিয়েছে, ছোট ভাইবোন দুটো নতুন ক্লাসে উঠেছে, সংসারের জন্যও কিছু টাকার দরকার। এবার তাই ও ঠিক করেই ফেলেছে। ভাইবোনদের জন্য দুটো জামা-প্যান্টও নিয়ে যাবে। বুড়ি দিদিমার জন্য নতুন থান।

এর মধ্যেই ঘটে গেল এক ব্যাপার। দুই মানিকজোড় বদন আর মদন প্রায়ই আসে হোটেলে। গোবিন্দ সামন্তর সঙ্গে গুজগুজ করে খানিক সলাপরামর্শ চলে। তেমন হলে এক আধদিন দু'জনের জন্য বিনে পয়সায় দুপুরের মিলও বরাদ্দ হয়।

এমনিতে খাওয়ার টেবিলে খদ্দের সামলানো নন্দর কাজ নয়। কিন্তু সেদিন একজন ছুটি নেওয়ায় নন্দর উপর সেই দায়িত্ব পড়েছিল। খানিক গুজগুজ করার পর দু'জন চার নম্বর টেবিলে এসে বসতেই গোবিন্দ সামন্ত হাঁকলেন, "চার নম্বর টেবিলে দুটো মিল। সঙ্গে দুটো হাফ প্লেট ইলিশের পেটি।"

হাফ প্লেট মানে এক পিস মাছ। নন্দ তাই নিয়ে এসে টেবিলে নামিয়ে দিয়েছে, বদন আড়চোখে তাকিয়ে প্রায় আকাশ থেকে পড়ল, "সে কীরে। মাছ একপিস যে!"

"কেন, মালিক তো হাফ প্লেটই বললেন!"

"হতভাগা ছেলে।" চাপা গলায় ধমকে উঠল বদন। সঙ্গে মদনের পোঁ, "মালিক অমন বলে। বরাবর দু'পিস মাছ বাঁধা আমাদের জন্য। ঠাকুরকে গিয়ে আমাদের কথা বলগে যা। আর মাছটা ডালের বাটিতে করে আনিস। কেউ টের পাবে না। পথে পথে ঘুরছিলি, মালিককে বলে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছি, বেইমানি করিসনি।"

ওরা বলল বটে। কিন্তু নন্দর বিশেষ ভাবান্তর হল না। সাফ জানিয়ে দিল, অমন কাজ সে মরে গেলেও পারবে না। দুই মানিকজোড় এরপর বিশেষ কিছু আর বলেনি। কটমট করে একবার তাকিয়েছিল শুধু।

আসল ঘটনা ঘটল এর কদিন পরে। সেদিন গোবিন্দ সামন্ত কী কাছে বাইরে বের হয়েছিল। ফিরে এসেই নন্দকে ডেকে পাঠালেন। নন্দ কাছে আসতে তীক্ষ্ণ নজরে খানিক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "দেখে তো মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানিসনি। কিন্তু বদ বুদ্ধি দেখছি মেলা!"

"ক-কেন মালিক!" প্রায় আকাশ থেকে পড়ল নন্দ।

"কাল দুপুরে জেটিঘাটের দিকে গিয়েছিলি?"

দুপুরে যখন কাজ থাকে না। গঞ্জের জেটিঘাটে একটু বেড়িয়ে আসে নন্দ। ওই সময় ওদের গ্রামের দিক থেকে একটা লঞ্চ আসে। চেনা কেউ থাকলে তাদের কাছে বাড়ির খবর পাওয়া যায়। গত কালও গিয়েছিল। সেই কথাই বলল।

"হোটেল থেকে চুরি করে এক বুড়োকে মাছ-ভাত খাইয়েছিস?"

ব্যস, নন্দর মুখে আর কথা নেই। থম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গোবিন্দ সামন্ত অবশ্য থামলেন না। চারদিক গুছিয়েই তিনি নন্দকে ধরেছেন। একটু পরেই দু'জন ষণ্ডা মতো লোক এক বৃদ্ধ মানুষকে হিড়হিড় করে টেনে এনে গোবিন্দ সামন্তর সামনে দাঁড় করাল। বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে বৃদ্ধ তখন রীতিমতো কাঁপছে।

"কাল আমার হোটেলের এই ছোকরা তোমাকে ভাত-মাছ খাইয়েছিল? সত্যি কথা বলবে। নইলে হাড়মাস আলাদা করে ফেলব। আমি গোবিন্দ সামন্ত। এই গঞ্জে আমার কথায় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।" প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা। মিথ্যে কথা বলবুনি।" ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ বলল, "দু'দিন কিছু খাওয়া হয়নি। ওনার কাছে খাবার চাইলুম। সব শুনে উনি ছুটে চলে গেলেন। একটু পরেই কলাপাতায় করে ভাত এনে দিলেন।"

"শুধু ভাত?" ফের হুঙ্কার।

"আজ্ঞে না কত্তা। সঙ্গে সোনামুগের ডাল। আলুপোস্ত। ইলিশের মুড়ো দিয়ে কচুর শাক। আর দুটো চিতল মাছের পেটি দিয়ে ঝোল।"

বৃদ্ধের খাওয়ার ফিরিস্তি শুনে গোবিন্দ সামন্তর মুখ তখন থমথম করছে। সব কয়টা আইটেমই গত কাল তাঁর হোটেলের মেনুতে ছিল। বৃদ্ধকে বিদায় করে দিয়ে আর বেশি কথা খরচ করলেন না। নন্দকে সেই দণ্ডেই কাজ থেকে বিদেয় করে দিলেন।

নন্দ অবশ্য সেজন্য অবাক হয়নি। হোটেলের কাজটা যে এবার যাবে, বুঝে ফেলেছিল। শুধু বলেছিল, "তাহলে আমার ছয় মাসের মাইনের টাকাটা মিটিয়ে দেন বাবু।"



শুনে গোবিন্দ সামন্ত শুধু মারতে বাকি রেখেছিল। মুখে মুখে হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আশি টাকা করে নন্দর ছয় মাসের মাইনে হয় চারশো আশি টাকা। আর মাত্র গত কালই ও যে মাল হোটেল থেকে সরিয়েছে তার দাম তিরিশ টাকা। সেই হিসেব গত এক মাসে নয় নয় করেও অন্তত হাজার দেড়েক টাকার মাল সরিয়েছে। এরপর আবার মাইনে!

অগত্যা শুধু হোটেলের কাজ নয়, নন্দর ছয় মাসের মাইনেও গেল। গোড়ায় ভেবেছিল, হোটেলের কাজটা যখন কিছু শিখেছে, অন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু কদিন ঘোরাঘুরিই সার। ইতিমধ্যে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে চারদিকে। চোর কর্মচারীকে কেউ কাজ দিতে রাজি নয়। দিন কয়েকের মধ্যেই নন্দ বুঝে ফেলল, মহামায়াগঞ্জে তার ঠাঁই হওয়া মুশকিল। অন্য কোথাও পাড়ি দিতে হবে। এর মধ্যে একদিন হঠাৎই পথে দেখা বদন আর মদনের সঙ্গে। ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দু'জন পথ আগলে দাঁড়াল।

"কী চাঁদু, সেদিন একপিস মাছ বেশি দিতে বলেছিলুম, গ্রাহ্য করলিনি। আর এদিকে একেবারে পুকুর চুরি! তা কীভাবে নিত্যিদিন মাল সরাতি রে? মালিক টেরটিও পেলনি!"

"আমি হোটেল থেকে কিছু চুরি করিনি গো দাদা। বাবু মিথ্যে অপবাদ দিলেন। ছয় মাসের মাইনেও দিলেন না। ভেবেছিলাম, টাকাটা পেলে দেশের বাড়ি যাব। তা আর হল না।" নন্দর চোখ ছলছল হয়ে উঠল।

বদন আড় চোখে পাশে মদনের উপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, "আমাদেরও সেই কথা রে? তোর মতো ভাল মানুষ এমন কাজ করবে বিশ্বাস হতে চায় না। তা হ্যাঁরে..."

"আমার সময় নেই দাদা।" কথার মাঝেই নন্দ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। "গয়নার নৌকো ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। সাতখালির দিকে যাব। চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের মেলা লেগেছে। দেখি যদি একটা কাজ মেলে।" কথা শেষ করে নন্দ পাশ কাটাতে যাবে। বদন ব্যস্ত হয়ে উঠল। "আরে আমরাও তো ওইদিকে যাব বলেই বেরিয়েছি! তাহলে চল, একসাথেই যাই।"

কদিন পরেই চৈত্র সংক্রান্তি। সেই উপলক্ষে সাতখালিতে মস্ত মেলা বসে। চলে দিন পনেরো। গ্রাম-গঞ্জের প্রচুর মানুষ আসে। কেউ পুজো দিতে। কেউ স্রেফ কেনাকাটা। সঙ্গে কাঁচা পয়সা। বদন আর মদন আগে প্রতিবছরই হাজিরা দিত। এমন জায়গায় লোক ঠকানো কারবার ভালই জমে। রোজগার মন্দ হয় না। কিন্তু বছর কয়েক হল মহামায়াগঞ্জেই দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। গোবিন্দ সামন্তর মতো লোকেদের নানা হুকুম তামিল করে ভালই রোজগার। ইদানীং তাই আর ওদিকে যায় না। এবারেও ইচ্ছে ছিল না। তবু যে আজ নন্দর সঙ্গে ভিড়ে পড়েছে, তা অন্য কারণে।

ভিতরের খবর হল, বুড়ো মানুষটিকে নন্দর মাছ-ভাত খাওয়ানোর খবরটা ওরাই গোবিন্দ সামন্তের কানে তুলেছিল। গতকাল সেই কারণেই তার হোটেলে গিয়েছিল। এত বড় একটা খবরের দাম তো আছেই। তার উপর খবর, নন্দর ছ'মাসের মাইনের টাকাও কাটা গেছে। সেই দৌলতে একটা জম্পেশ খাওয়া তো পাওনা হয়েই রয়েছে। প্রসঙ্গটা তুলে বদন শুধু বলেছে, "কাকা, এত বড় একটা খবর দিলুম, আজ এক প্লেট চিতলমাছের পেটি খাইও কিন্তু। প্যানতা পোনা মাছ খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল।"

"বাজে কথা বলিসনি বদন। শুধু পোনামাছ খাওয়াই আমি! কেন সেদিন ইলিশের পেটি দিইনি?" প্রায় ফুঁসে উঠলেন গোবিন্দ সামন্ত।

"সে দিয়েছিলে কাকা, আধ প্লেট। মোটে এক পিস মাছ! এবার কতবড় খবরটা দিয়েছি বলো তো! আমাদের হাফ প্লেট ইলিশের পেটি দিতে তোমার দম ফাটে। আর ওদিকে ছোঁড়াটা কত পিস চিতলপেটি হাতসাফাই করে খেয়েছে ঠিক কী!"

কথা শেষ করে বদন সবে কপাল চাপড়াতে যাবে, গোবিন্দ সামন্ত মুচকি হেসে বললেন, "ঘোড়ার ডিমের খবর এনেছিলি।"

"ম-মানে!" দুই মানিকজোড়ের মুখে কথা নেই।

"আমি হলুম গে গোবিন্দ সামন্ত।" ফের মুচকি হাসলেন তিনি। "আমার হোটেল থেকে এক প্লেট চিতলের পেটি হাপিশ হবে, আর আমি টের পাবনি! এই বুদ্ধি নিয়ে তোদের হামবড়া! তা যাকগে, ছোকরার ছয় মাসের মাইনে তোদের দৌলতেই বেঁচেছে, সেটা ঠিক। তাই চিতলের পেটিই তোদের খাওয়াব আজ। সঙ্গে একটা কাজের দায়িত্বও দেব।"

"কী, কী গো কাকা?" দুই মানিকজোড় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"নন্দ ছোঁড়াকে দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। কিন্তু আস্ত ঘোড়েল জিনিস। অনেক রহস্য আছে ভিতরে। তোদের এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারে।"

গোবিন্দ সামন্তর ওই কথায় বদন হঠাৎ গুম হয়ে গেল। মনে পড়ল, সেদিন পুকুরে চানের ঘাটের ব্যাপারটা। নন্দর মুখের কথা খসতে না খসতেই তেলের বাটি গাছের উপর থেকে নীচে খসে পড়েছিল বটে! এক ফোঁটা তেলও ছলকে পড়েনি।

একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি তখন। হাঁ করে খানিক তাকিয়ে থেকে ঝুঁকে পড়ল গোবিন্দ সামন্তর দিকে। "কী নজর গো তোমার কাকা! পায়ের ধুলো দাও। তা আরও কিছু দেখেছ নাকি?"

"দেখিনি মানে!" চোখ নাচাল গোবিন্দ সামন্ত। "প্রমাণ আরও পেয়েছি রে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও রহস্যের হদিশ পাইনি। ছোঁড়া গভীর জলের মাছ। লেগে পড় দেখি।"

এত কিছুর পরেও সেদিন চিতলের পেটি অবশ্য হাফ প্লেটের বেশি জোটেনি। তবু গোবিন্দ সামন্তর হুকুম। দুই মানিকজোড় সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে নন্দকে। আজ দেখা যখন মিলেছে, হাতছাড়া করা যায় না। বদনের ইশারায় মদন ইতিমধ্যে লেগে পড়েছে তার পিছনে।

সাতখালির গয়নার নৌকোয় যাত্রী কম হয়নি। কিন্তু এই মেলার সময় দুনো যাত্রী হবার কথা। ছাড়ার সময় পেরিয়ে গেলেও দুই মাঝি গড়িমসি করছে। তাই নিয়ে কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে তুমুল তর্ক। গয়নার নৌকো। টাইম যখন হয়ে গেছে, ছাড়তেই হবে। নইলে চৌকিতে খবর দেবে তারা। সেই শাসানিতে দুই মাঝি কিছু ঘাবড়েই গিয়েছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল, বদন আর মদনের দিকে। দুই মাণিকজোড়কে মাঝিরা ভালই চেনে। একজন কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "দাদা গো, কিছু একটা বিহিত করা যায় না? বোঝেন তো, এই মেলার সময়তেই চারটি পয়সা আমাদের।"

তা দুই মানিকজোড় নিরাশ করেনি ওদের। গলা নামিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে খানিক কী কথা হল। দেখা গেল, তারপরেই নোঙর তুলে বদর বদর বলে দুই মাঝি ছেড়ে দিয়েছে নৌকো।

গঞ্জের ছোট নদী ছাড়িয়ে নৌকো তখন বড়গাঙের কাছে। জায়গাটার বেজায় বদনাম। স্থানে স্থানে চোরা ঘূর্ণি। নৌকো হুঁশিয়ার হয়ে না বাইলেই ঘূর্ণিতে পড়ার সম্ভাবনা। তেমন জোরাল ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকো ডুবেও গেছে অনেক। তা কপাল খারাপ। গয়নার নৌকোও আজ হঠাৎ সেই চোরা ঘূর্ণিতে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তে চক্কর খেয়ে নৌকো টালমাটাল হয়ে ডুবুডুবু। মাঝিদের সামাল সামাল রব। আতঙ্কে যাত্রীদের বাঁচাও বাঁচাও আর্তনাদ। সে এক ভয়ানক অবস্থা। অবস্থা দেখে বদন হাঁক পাড়ল, "হেই মাঝির পো। নৌকো সামলাও। এতগুলো মানুষ।"

"সে তো হক কথা কত্তা" এক মাঝির জবাব, "তা মোদের দিকটাও একটু দেখেন। কিছু বকশিস।"

"তা কত চাইছিস বাবা?"

"এজ্ঞে যাত্রী পিছু এক শিকি (২৫ পয়সা)।" বদনের কথায় মাঝির উত্তর।

নৌকোর অনেকেরই তখন মাঝিদের শয়তানি বুঝতে বাকি নেই। কায়দা করে নৌকো ঘূর্ণিতে ফেলে কিছু অতিরিক্ত আদায়ের চেষ্টা। সন্দেহ নেই, দুই মানিকজোড়ের হাতও রয়েছে। নৌকো ছাড়ার আগে তাই নিয়ে দুই পক্ষের গুজগুজ চলছিল। কিন্তু বুঝলেও ওই অবস্থায় কী করবে তারা? ওদিকে ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীদের অনেকেই তখন রাজি হয়ে হাত তুলে দিয়েছে। হঠাৎ এক ব্যাপার ঘটল। নন্দ ছিল একধারে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বিড়বিড় করে বকতে শুরু করল।

বনবাদাড় আর পথঘাট,
আঁধার রাতে চাঁদের হাট।
হিড়িং পিড়িং হিং টিং ছট,
মুশকিল আসান ফটাফট।

টালমাটাল নৌকো দেখতে দেখতে স্থির। ঘূর্ণির ছিটেফোঁটাও নেই। যাত্রীদের মুখে মুহূর্তে মা গঙ্গার জয়গান। রক্ষা করেছেন তিনি। এদিকে দুই মাঝির তো মাথায় হাত। যাত্রীদের ভড়কি দেবার জন্য দুই নদীর স্রোত বুঝে ওরাই নৌকো ছোটমতো এক ঘূর্ণিতে এনে ফেলেছে। তেমন বিপদের নয়। কিন্তু যাত্রীদের ঘাবড়ে দিতে তাই যথেষ্ট। দুই মানিকজোড় বাবুও কথা দিয়েছে, অতিরিক্ত কিছু পয়সা আদায় করে দেবে। সেটা সারা হলেই তারা নৌকো ফের ঘূর্ণি থেকে বের করে আনবে। কিন্তু কোথায় কী!

দুই মাঝির মুখ কালো হয়ে গেলেও ওদিকে মদনের হাসি তখন গাল ছাড়িয়ে কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। খুশিতে লাফিয়ে উঠেছে তিড়িং করে। ভাগ্যিস, বদনের পরামর্শে সেই থেকে নন্দর গায়ে লেপটে ছিল! বিড়বিড় করে চাপা গলায় মন্ত্র পড়লেও শুনতে ভুল হয়নি। ভিড় ঠেলে মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "মেরে দিয়েছি বদনদা। কেল্লা ফতে।"

ওই ব্যাপার দেখে বদন নিজেও কিছু নিরাশ হয়ে পড়েছিল। মাঝিদের ভুজুংয়ে কিছু আদায় হলে পকেটে কিছু আসত। হঠাৎ বদনের কথায় চমকে উঠল, "কী রে?"

"ছোঁড়া মন্ত্র জানে গো বদনদা। বিড়বিড় করে পড়ছিল তখন। আর তাতেই বিপদভঞ্জন।"

"অ্যাঁ, বলিস কী রে! ছোঁড়া ভেলকিবাজি জানে! গোবিন্দ সামন্তের অনুমানে তাহলে ভুল নেই!"

"আলবত।" তুড়ি মেরে মদন বলল, "তোমার কথায় সেই থেকে ছোঁড়ার সঙ্গে লেগে ছিলাম তো। নিজের কানে শুনেছি।"

"সব শুনেছিস!" খুশিতে বদনের দু'পাটি দাঁত গাল ছাড়িয়ে কান পর্যন্ত পৌঁছল। "মনে করে রেখেছিস তো?"

"এই সেরেছে!" বদনের কথায় হঠাৎ যেন খাবি খেল মদন। "দাঁড়াও ভেবে বলছি।

বনবাদাড় আর পথঘাট,

আঁধার রাতে চাঁদের হাট।

হিড়িং কিড়িং...। এই রে আর তো মনে নেই!"

অনেক ভেবে চাঁদিতে টোকার পর টোকা মেরেও মদন আর কিছু মনে করতে পারল না। মস্ত এক জিব বের করে দাঁড়িয়ে রইল।

(৪)

সাতখালির গাজন-মেলা এদিকে বিখ্যাত। বেজায় নামডাক। দূর দূর থেকে মানুষ আসে। বিরাট গাজনের মাঠ কয়েক দিন গমগম করে। নানা জায়গা থেকে ব্যাপারীরা আসে পশরা নিয়ে। ভটভটি লাগানো বড় নাগরদোলা। বাঘ-সিঙ্গি নিয়ে সার্কাস পার্টি। তাঁবু খাটিয়ে সিনেমা। সাধুসন্ন্যাসীও কম নয়। আস্তানা গেড়ে আসর জমায় তারাও। ভাগ্য ফেরাবার আসায় তাদের ঠেকেও ভিড় কম হয় না। গাজনের মাঠে এই কয়েকটা দিন তাই তিল ধারণের স্থান থাকে না। নন্দ এর আগে এদিকে আসেনি। ঘাটে নেমে সেই ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে, দুই মানিকজোড় দু'পাশে এসে দাঁড়াল। "এই ভিড়ে কোথায় যাবি বাপু। অচেনা জায়গা। তারচেয়ে আমাদের সঙ্গে চল, ভাবতে হবে না।"

সন্ধে নামতে দেরি নেই। গ্রামের মেলা। সন্ধের পরেই ফাঁকা হতে শুরু করবে। রাতে কোথায় ঠাঁই নেবে ঠিক নেই। নন্দ রাজি হয়ে গেল।

এদিকে বদন আর মদনও রাতের জন্য জুতমতো একটা ঠাঁই নিয়ে চিন্তায় ছিল। ছোঁড়ার কাছ থেকে মন্ত্র আদায় করতে হলে তোয়াজ কিছু করতেই হবে। এক দোকানে গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। বদন বলল, "আমাদের কিন্তু বেজায় খিদে পেয়েছে রে। তোর পায়নি?"

খিদেয় নন্দও তখন কাহিল হবার জোগাড়। সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি। কিন্তু জবাব না দিয়ে থম হয়ে রইল। মদন চাপা গলায় বদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "গুরু, যে ছোঁড়া চিতলের জোড়া পেটি দিয়ে জলযোগ সারে, তাকে জিলিপি দেখাচ্ছ! ওতে হবে না। মেলায় গজু ঘোষও দোকান লাগিয়েছে দেখছি। বরং ওখানেই নিয়ে চলো।"

মহামায়াগঞ্জে গজু ঘোষের মিষ্টি বিখ্যাত। রাজভোগ আর রাবড়ির জবাব নেই। বদনের পরামর্শে মাথা নেড়ে বদন সেদিকে পা বাড়িয়েছে, নন্দ বলল, তোমরা খাও দাদা। আমি যাই বরং।"

কেন যে নন্দ সরে পড়তে চাইছে, তখন দুই মানিকজোড়ের বুঝতে বাকি নেই। প্রায় হাউমাউ করে উঠল। "যাবি মানে! একসাথে মেলায় এলুম। তোকে ফেলে খাব, এমন পাষণ্ড নই রে। কদিন একসাথে খাব, একসাথে থাকব সবাই।"

নন্দ আর কিছু বলতে পারল না। প্রথমে আলুর দম দিয়ে ঘিয়ে ভাজা গোটা কয়েক করে গরম কচুরি। তারপর চারটে করে ঢাউস রাজভোগ আর রাবড়ি। খাওয়ার ফাঁকে দু'জন আড়চোখে ঘনঘন তাকাচ্ছিল নন্দর দিকে। কী জানি, গজু ঘোষের মেঠাইও পছন্দ হবে কিনা ছোঁড়ার। কিন্তু চেটেপুটেই খেল নন্দ। হাঁফ ছাড়ল ওরাও। যতক্ষণ না মন্ত্র উদ্ধার করা যাচ্ছে, ছোঁড়াকে এভাবেই তোয়াজ করে যেতে হবে।

তিনজন যখন খেয়ে উঠল, পেট ঢাউস। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘন হতে শুরু করেছে। দাম মেটাতে গিয়ে বদনের শরীর চিড়বিড় করছিল। কিন্তু কাজ হাসিল করতে হলে অন্য উপায় নেই। তাই গ্রাহ্য করল না। দোকান থেকে বের হয়ে ওরা চলতে শুরু করেছে। ছোঁড়ার পছন্দসই ঘরের জন্য এরপর কত গুনাগার দিতে হবে নিচু গলায় তাই নিয়ে দু'জনের ফিসফাস চলছে। পাশেই সাধুদের আখড়ায় ভিড়ের ভিতর থেকে "বোম শঙ্কর" আওয়াজ। মদন চমকে উঠে চাপা গলায় বলল বদনদা, এ আমাদের বোমশঙ্করবাবা মনে হয় যেন!"

গেঁজেল বোমশঙ্করবাবা মহামায়াগঞ্জের কাছে এক শিবমন্দিরের পুরোহিত। আসল নাম একটা ছিল। কিন্তু দিনরাত গাঁজায় দম আর থেকে থেকেই বিকট "বোম শঙ্কর" হুঙ্কারের জন্য সবার কাছে "বোমশঙ্করবাবা" নামেই পরিচিত। দুই মানিকজোড়ের সঙ্গে ভালই খাতির। সন্দেহ হতে দু'জন এগিয়ে যেতেই দেখে অনুমানে ভুল নেই। এক চালার নীচে বেড়ে আসর জমিয়ে ফেলেছে। সামনে ধুনি। চারপাশে কৃপা প্রার্থীও কম নয়। ঘন ঘন গাঁজায় দম দেওয়ার ফাঁকে কারো চোখ উলটে, কারো কপালে দুটো টোকা মেরে ভবিষ্যৎ বাতলে দিচ্ছেন। কাউকে এক খাবলা ধুনীর ছাই। প্রণামীও পড়ছে। মানুষটা এবার যে

সাতখালির গাজনের মেলায় এসেছে জানা ছিল না ওদের। ছুটে গিয়ে দু'জন পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। "কী ভাগ্যি ঠাকুর! সেই কতদিন পরে দেখা পেলাম গো!"

"কে রে?" কলকে থেকে মুখ সরিয়ে বোমশঙ্করবাবা আড়চোখে তাকালেন। "অ, সেই পৈরাগের (প্রয়াগ) ঘাটে তোদের দেকেছিলুম না? পাঁচ বছর আগে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর।" দুই মানিকজোড় প্রায় পঞ্চমুখ, "চান সেরে উঠতেই সামনে উদয় হলেন! একটু আশীর্বাদ চাইতে গেছি, নিমেষে চোখের সামনে উধাও। সেই দিনই বুঝেছি ঠাকুর সাক্ষাত মহাদেব। আজ ফের দেখা যখন পেয়েচি, আর ছাড়ছিনে। পায়ের তলায় ঠাঁই একটু দিতেই হবে।"

গেঁজেল হলেও বোমশঙ্করের জ্ঞান টনটনে। আড় চোখে ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন উপস্থিত কৃপা-প্রার্থীদের। ভক্তিতে সবার চোখ প্রায় গদগদ। কদিনে জমিয়েছেন ভালই। তবে গ্রামের মেলা। চাষাভুষো মানুষ। প্রণামী বিশেষ যুতসই নয়। দুই মানিকজোড়কে শাগরেদ পেলে সেটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে। হাতের কলকেয় বড় একটা টান দিয়ে অল্প মাথা নাড়লেন।

বদন আর মদনের দৌলতে বোমশঙ্করের আখড়া ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেরি হয়নি। দুনো ভিড় এখন। সাধু সন্ন্যাসীদের উপর বেজায় ভক্তি নন্দরও। এসেছিল একটা কাজের খোঁজে। কিন্তু সব ভুলে আখড়ায় সাধুর সেবায় ভিড়ে পড়েছে সেও। দেখে দুই মানিকজোড় তো বেজায় খুশি। প্রায় বিনে খরচে আস্তানা। তবে নন্দকে তোয়াজ করতে ত্রুটি রাখেনি। দু'বেলা মাছ ভাত, পাঁঠার মাংস, ভালমন্দ খ্যাঁটের দিকে নজর রাখতেই হয়েছে। তাতে নন্দ একদিন মদনকে বলেই ফেলেছিল, "এসব খাওয়া আমার অভ্যেস নেই গো দাদা।"

তাতে বেজায় ঘাবড়ে মদন ছুটেছে বদনের কাছে। "সেরেছে গো বদনদা! ছোঁড়াটা বেগড়বাই করতে লেগেছে। ফের একদিন গজু ঘোষের রাজভোগ আর রাবড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা না করলে কোন ফাঁকে সটকে না পড়ে। এতবড় মেলা!"

অগত্যা সেই দিন বিকেলেই ফের গজু ঘোষের মেঠাই। ট্যাঁকে ফের ধস নামলেও বদন পরোয়া করেনি। মদন আরো হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। মন্ত্রের বাকি অংশ শিখে না নেওয়া পর্যন্ত ছোঁড়াটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবে না।

দিন কয়েক তোয়াজের পর সেদিন দুপুরে মেলা তখনো জমে ওঠেনি। ভিড় কম। বদন আর মদন নন্দকে নিয়ে হাজির হল মেলার এক কোনে নিরিবিলিতে। কাজটা বোমশঙ্করবাবার আখড়াতেও সারা যেত। কিন্তু তাতে ব্যাপারটা পাঁচকান হবার সম্ভাবনা। গেঁজেল বোমশঙ্করবাবাকে ভালই চেনে দু'জন। একবার আসল ব্যাপারের হদিস পেলে মুশকিল। দু'জন নানা ফন্দিফিকির খাটিয়ে বোমশঙ্করবাবা রোজগার ভালই বাড়িয়েছে। অথচ বখরা নিয়ে মোটেই উচ্চবাচ্য নেই। নন্দকে নিরিবিলিতে ডেকে আনতে হয়েছে সেই কারণে। আসার পথে ফের গজু ঘোষের রাজভোগ খাইয়ে এনেছে। ইলিক চিলিক গল্পের ফাঁকে বদন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "তুই নাকি মন্ত্রতন্ত্র জানিস!"

"কী মন্ত্র গো দাদা?" নন্দ আকাশ থেকে পড়ল।

"সেদিন নদীর ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকো যখন বেসামাল, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছিলি নাকি। আর তাতেই...।"

"সে মন্ত্র নয়গো দাদা।" বদনের কথার মাঝেই নন্দ বলল, "আমার তৈরি ছড়া। আমি না ছড়া কাটতেও পারি। শুনবে:

বনবাদাড় আর পথঘাট,
আঁধার রাতে চাঁদের হাট।
হিড়িং পিড়িং হিং টিং ছট,
মুশকিল আসান ফটাফট।"

দুই মানিকজোড় আলগোছে পরস্পরের দিকে তাকাল। "এই ছড়াটাই পড়েছিলি তখন? ঠিক বলছিস?"

"হ্যাঁ গো দাদা। ভাল হয়নি?"

নন্দ খুশিতে ফুরফুরে হয়ে উঠলেও মদনের ভুরু কুঁচকে উঠল। "কী বললি? হিড়িং কিড়িং হিং টিং ছট। মুশকিল আসান...।"

"না গো ভুল হল দাদা। হবে হিড়িং পিড়িং," নন্দ ফের ঝালিয়ে দিল ছড়াটা। মনে মনে বদন আর মদনও ঝালিয়ে নিল বারকয়েক। তারপর চারদিকে সন্তর্পণে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "নন্দ এবার বোমশঙ্করবাবার আখড়ায় যা। উনি খুঁজছেন হয়তো। আমরা একটু পরে আসছি।"

নন্দ চলে যেতেই বদন বলল, "মদনা, এবার তাহলে মন্ত্র পরখ করে নেওয়া যাক।"

"খেপেছ বদনদা।" আঁতকে উঠল মদন, "চারপাশে লোকজন। কারো চোখে পড়লে নিস্তার আছে! বাপরে বাপ!"

"কেন?" মদনের কথায় অবাক হল বদন।

"সেই বায়স্কোপ দেখনি? আমাদের মতোই দুই মাণিকজোড় গুপী আর বাঘা এমনই এক মন্ত্র পেয়েছিল। তারপর মন্ত্র পড়ে খাবার চাইতেই উড়ে এল হাঁড়ি ভরতি পোলাও কালিয়া। দই-মিষ্টি। এই মেলায় ভিড়ে ওসব ব্যাপার হলে উপায় আচে! খাবে কী? তার আগেই মেলাসুদ্ধ মানুষ হামলে এসে ছিঁড়ে খাবে দু'জনকে।"

যুক্তিটা মানতেই হল বদনকে। মন্ত্রের গুন পরখ করতে হলে এখনই সরে পড়তে হবে। জেটিঘাটের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল মহামায়াগঞ্জের গয়নার নৌকো ছাড়ব ছাড়ব করছে। দেরি না করে উঠে পড়ল দু'জন।

দুই মানিকজোড় এরপর হাঁফ ছাড়ল সেই রাত্তিরে মহামায়াগঞ্জ পৌঁছে। এর মধ্যে উত্তেজনায় ভাল করে নিঃশ্বাসটুকুও ফেলতে পারেনি কেউ। মদনের বাসা জেটিঘাটের কাছেই। একাই থাকে। বরং বদনই থাকে কিছু দূরে। দু'জনের কারোই তখন তর সইছে না। মদন বলল, "বদনদা, আজ আমার ঠেকেই চলো বরং। বড্ড খিদেও পেয়েছে। রাতের খাওয়া আজ গোবিন্দ সামন্তর জোড়া চিতলপেটি দিয়ে দেরাদুন-ভাত আর গজু ঘোষের রাবড়ি দিয়ে হয়ে যাক।" বলতে বলতে উলস্ করে জিবের জল টানল।

"তা মন্দ বলিসনি। সেদিন অত করে বললুম, হতচ্ছাড়া গোবিন্দ সামন্ত তবু দু'পিস চিতলপেটি দিলে না! বেড়ে স্বাদ ছিল রে। তার সঙ্গে গজু ঘোষের রাবড়ি! বেশ বলেছিস!" বলতে গিয়ে সুড়ুত করে জিবের জল টানল বদনও।

ছুটে ঘরে পৌঁছে মদন আগে দরজা বন্ধ করল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে মনের ইচ্ছে নিবেদন করে মন্ত্র। কিন্তু কোথায় কী! হাঁ করে অপেক্ষা করাই সার। কিছুই এল না। মিনিট পাঁচেক পার হবার পর বদন বলল, "কী হল রে? মন্ত্র ঠিক পড়েছিস তো?"

"একদম ঠিক...।" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল মদন। তারপরেই লাফিয়ে উঠল। "হ্যাঁ মনে পড়েছে গো। ছোঁড়াটাকে মন্ত্র পড়ার পর জোরে কবার হাততালি দিতে দেখেছিলুম।"

"হতচ্ছাড়া, এই বুদ্ধি নিয়ে আমার সাগরেদি কচ্ছিস! ক"বার দিয়েছিল হাততালি?" খেঁকিয়ে উঠল বদন।

"সে বার কয়েক গো বদনদা।" মদন ফের মন্ত্র পড়ে হাততালি দিল। এবারেও সেই এক ব্যাপার।

"তোর মন্ত্র ঠিক হচ্ছে না বোধহয়। দাঁড়া আমি পড়ছি।" মদনকে থামিয়ে এবার বদন শুরু করল। কিন্তু সব আগের মতোই ভোঁ-ভোঁ। খাবারের দেখা নেই।

মদন বলল, "বদনদা হাততালিতে ভুল হচ্ছে না তো?"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে রে।" ঘাড় নাড়ল বদন। অগত্যা দু'জনের শুরু হল হাততালির কম্পিটিশন। তাতে কিছু তো মিললই না। বরং এক ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেল। রাত দুপুরে বিকট হাততালির শব্দে কাঁচা ঘুম ভাঙতে বাড়িওয়ালা ঘটৎকচ হালদার খেপে কাঁই। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকটার যেমন চেহারা, মেজাজটাও সেই রকম। বেজায় বদরাগী। তার উপর মদনের তিন মাসের ভাড়া বাকি। অথচ ধরাই যাচ্ছে না। দেখা হলেই চ্যাং মাছের মতো পিছলে যাচ্ছে। মেজাজ তাই খাপ্পা হয়েই ছিল। দরজা খুলে বের হয়ে সোজা বদনের ঘরের সামনে হামলে পড়লেন।

"অরে হারামজাদা। তিন মাসের ভাড়া বাকি ফালাইছস! অখন আর একটারে জুটাইয়া রাত দুপরে তামসা! আইজ তো তরে খাইছি। আমারে চিনস নাই! দরজা খুলবি কিনা ক।"

কাঠ বাঙাল ঘটৎকচ হালদারকে ভালই চেনে দুই মানিকজোড়। এখন দরজা খুললে যে যমের বাড়ির দরজা দেখতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। অগত্যা কাঁথা মুড়ি দিয়ে এক লাফে বিছানায়। মদন কাঁপতে কাঁপতে কাঁথার ভিতর থেকে কোঁ-কোঁ করে বলল, "মাইরি গো দাদা, আমরা কেউ ঘরে নেই।"

তাতে ঘটৎকচ হালদার তো আরো খেপে কাঁই। "অ্যাঁ, আমার লগে তামসা করস! কাইল সকালে তগো একদিন কি আমার একদিন।" দরজা খোলার আশু সম্ভাবনা নেই দেখে রাগে গরগর করতে করতে ফিরে গেলেন তিনি। নেহাত নিজের বাড়ি। নইলে হয়তো দরজা ভেঙেই কাজ সেরে ফেলতেন।

পেটের খিদে পেটে চেপে দুই মানিকজোড় এরপর সারারাত মড়ার মতো বিছানায়। সেই শেষ রাতে যখন দু'একটা করে পাখি ডাকতে শুরু করেছে, মদন কাঁথা উলটে উঠে বসল। বেশ জানে, এই শেষ রাতে ঘটৎকচ হালদারের ঘুম কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়। চাপা গলায় বলল, "বদনদাগো, আর দেরি নয়। চলো ভেগে পড়ি এইবেলা। ঘটা হালদার টেরও পাবে না। উঠে দেখবে পাখি ফুড়ুৎ।"

"একে এভাবে বেইজ্জত! তারপর ঘটৎকচ হালদারের হামলা, বদন একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। মদনের কথায় চাঙা হয়ে বলল, "তাহলে দেরি না করে গাজনের মেলার দিকেই চল আবার। নন্দ ছোঁড়াকে ফের ধরতেই হবে আজ। ব্যাটা বেজায় ভোগা দিয়ে গেছে!"

পরামর্শ করে দুই মানিকজোড় এরপর নিঃশব্দে ঘটৎকচ হালদারের বাড়ির চৌহদ্দি পার হয়ে পথে। তারপর পড়ি কী মরি করে গঞ্জের ঘাটের দিকে। ভোর সকালে সাতখালির দিকে একটা লঞ্চ ছাড়ে। ধরতে পারলে শুধু ঘটৎকচের হাত থেকে নয়, ধরা

যাবে নন্দকেও। ব্যাটা ভিজে বেড়াল!

কিন্তু জেটিঘাটে পৌঁছবার আগেই আর এক ব্যাপার। গতকাল সংক্রান্তি গেছে। আজ যে পয়লা বৈশাখ হুঁশই ছিল না ওদের। হালখাতার দিন। কাকভোরে গণেশ মন্ত্র জপতে জপতে গোবিন্দ সামন্ত চানে বের হয়ে পড়েছেন। চান সেরে গণেশ পুজো। তারপর নতুন খাতায় সিঁদুরের ফোঁটা আর কাঁচা টাকার ছাপ মেরে বউনি। অনেক কাজ। তা দুই মানিকজোড় পড়ে গেল তার সামনে।

ভেবেছিল আধো অন্ধকারে পাশ কাটিয়ে ভেগে পড়বে। কিন্তু গোবিন্দ সামন্তর চোখ শকুনকেও হার মানায়। দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "কী হল রে তোদের? চুরি করে পালাচ্ছিস নাকি? শুনতে পাই, ঘটা হালদারের কাছে মদনের তিন মাসের ভাড়া বাকি। এবার আমাকেও ফাঁকি দেবার মতলব!"

শুনে দু'কান মলে দু'জন প্রায় হাউমাউ করে উঠল, "কী যে বলেন কাকা! আপনার ভরসাতেই তো বেঁচে আছি।"

"তাই বল," গোবিন্দ সামন্ত চোখ নাচালেন। "তা তোদের ভরসা আর কোথায় পাচ্ছি? একটা কাজ দিয়েছিলুম। তার কী করলি?"

"সেই খোঁজেই তো লেগে আছি গো," হাঁফ ছাড়ল বদন, "নন্দর খোঁজেই তো সাত সকালে ধাওয়া করেছি। খোঁজ পেয়েছি ছোঁড়া সাতখালির গাজন মেলায় গেছে।"

"দূর হতভাগা" সপাটে হাত নেড়ে গোবিন্দ সামন্ত মাছি তাড়ালেন যেন, "নন্দর খোঁজ পরে করিস। তার আগে অন্য এক কাজের কথা বলেছিলুম, ভুলে গেছিস?"

"সেরেছে!" মনে পড়তে বদন ততক্ষণে প্রমাদ গণেছে। গোবিন্দ সামন্ত দিন কয়েক আগে একটা কাজের কথা বলেছিল বটে। বাজারে মা তারা ব্রহ্মময়ী হোটেলের রমরমা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আয়তনে না বাড়ালে চলছে না। হোটেলের লাগোয়া বুড়ি দয়াময়ী দাসীর বাড়ি। তিনকুলে কেউ নেই। কিন্তু তেজ এখনো ষোল আনা। কাউকে গ্রাহ্য করে না। গোবিন্দ সামন্ত অনেক দিন থেকে লেগে আছে পিছনে। দয়াময়ী দাসীর বাড়িটা পেলে সোনায় সোহাগা হয়। এক লপ্তে বাড়িয়ে ফেলতে পারেন হোটেল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বুড়িকে রাজি করানো যাচ্ছে না। অগত্যা অন্য ফন্দি।

সেজন্য লাগানো হয়েছে গঞ্জের সেরা উকিল। দয়াময়ী দাসীর সম্পত্তির অন্য এক দাবিদার খাড়া করে কেস ঠোকার তোড়জোড় চলছে। কিন্তু তার জন্য বুড়ির দলিলটা আগে হাতানো দরকার। ওটা হাতে পেলে উকিল সাহেব কথা দিয়েছেন, দয়াময়ী দাসীর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবেন। দিন কয়েক আগে দুই মানিকজোড়কে গোবিন্দ সামন্ত সেই কাজের কথাই বলেছিলেন। বুড়ি রাতকানা মানুষ। আর বদন-মদনের চেনা জানা সিঁদেল মহামায়াগঞ্জে কিছু কম নেই। তাদের কাউকে লাগিয়ে দিলে সহজেই হাসিল করা যায়। কাজটা কঠিন নয় এমন। কিন্তু নানা কাজে খেয়াল ছিল না ওদের। বদন মস্ত জিব বের করে বলল, "ভুল হয়ে গেছে গো কাকা। তবে চিন্তা নেই, এই হপ্তাতেই সেরে দেব।"

"উঁহু, সেটি হচ্ছে না," গোবিন্দ সামন্ত ঘাড় ঝাঁকালেন, "আজ রাতের মধ্যেই চাই।"

"আজ!" বদন মাথা চুলকাল। গতকাল গাজন মেলায় নন্দকে বিদেয় করে দিলেও ফের আজ ছুটেছে তার খোঁজে। মরে গেলেও সে-সব কথা বলার উপায় নেই।

"হ্যাঁ রে। আজ। খবর পেয়েছি, বুড়ি গতকাল মেলায় গাজনের থানে পুজো দিতে গেছে। বাড়িতে কেউ নেই। আজ পয়লা বৈশাখের দিনটাও ওখানে পার করে আসবে। এই সুযোগ বারে বারে আসবে না রে। তোদের হাতে সিঁদেলের তো অভাব নেই। আজ রাতে লাগিয়ে দে একটাকে। ওফ! বুড়ির ওই বাড়ির উপর আমার লোভ কী আর আজকের রে! বাবা গণেশ বুঝি এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। দে বাপু, বুড়ির দলিলটা এনে দে।"

গোবিন্দ সামন্তর মর্জি। রাজি না হয়ে উপায় নেই। অগত্যা মাথা নাড়তেই হল বদনকে। গোবিন্দ সামন্তও ফের গণেশ মন্ত্র জপতে জপতে চানের ঘাটে চললেন। খানিক দূরে যেতেই মদন ফুঁসে উঠে বলল, "এটা কেমন হল বদনদা! একটা কাজে যাচ্ছি। এর মধ্যে এই সব উটকো ঝামেলায় রাজি হওয়া কী ঠিক হল? ওদিকে নন্দছোঁড়া ফসকে গেলে হাতপা কামড়াতে হবে, খেয়াল আছে। হায় হায়!"

একেবারে মনের কথাই বলেছে মদন। হাড় কৃপণ গোবিন্দ সামন্তের ফয়দার জন্য নন্দকে হাতছাড়া করা যায় না। ঠোঁট উলটে বলল, "তুইও যেমন। বলতে হয়, তাই বলেছি। সেদিন অত করে বললুম, কঞ্জুসটা তবু দু'পিস চেতলপেটি খাওয়ায়নি। সেকথা মনে নেই ভেবেছিস। চল চল, সকালের লঞ্চ ফেল হয়ে গেলে মুশকিল।"

(৫)

সাতখালির গাজন মেলায় বোমশঙ্করবাবার ঠেকে পৌঁছে দু'জনের তো মাথায় হাত। হায় হায়। একী কাণ্ড হয়ে রয়েছে এদিকে। পাখি যে হাতছাড়া! দু'জন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল বোমশঙ্করের পায়ে। "ও ঠাকুর, নন্দছোঁড়া গেল কোথায়? সেই সাত সকালে বের হয়ে ছুটে এলুম!"

"সে আমি কী জানি?" বোমশঙ্করবাবা প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, "তোরা ওইভাবে না বলে-কয়ে ভেগে পড়লি! ছোঁড়াকে রেখে কী করব? দিয়েছি খেদিয়ে। নিজে করে খেগে যা।"

"সর্বনাশ করেছ ঠাকুর!" আর চেপে রাখার উপায় নেই। একে একে সব কথাই খুলে বলল ওরা।

"বলিস কী রে!" বোমশঙ্করের দুই চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তারপর খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "এত ব্যাপার, আর একবারও বলিসনি! সব নিজেরা খাবার মতলব? যা, ছাই খেগে এবার।"

"ওঠাই বড্ড ভুল হয়ে গেছে গো ঠাকুর। মুখ্যু মানুষ।" বোমশঙ্করের পায়ে দু'জন মাথা ঠুকতে লাগল।

তাতে কিছুটা যেন নরম হলেন তিনি। "মুখ্যু বলে মুখ্যু! ডাহা মুখ্যু তোরা। শুধু মন্ত্র নয় রে। ছোঁড়ার কাছে আরো কিছু রয়েছে। ভাল করে খুঁজে দেখেছিলি?"

"সে আর খুঁজিনি ঠাকুর।" মদন ঠোঁট ওলটাল, "ছোঁড়ার পুঁটলি হাতড়ে দেখেছি। কানাকড়িও নেই। ছেঁড়া গুটিকয়েক জামাকাপড় মাত্র।"

"চোখের মাতা খেইছিস!" খেঁকিয়ে উঠলেন বোমশঙ্করবাবা। "আমি গেঁজেল বামুন। তাও নিজের চোখে দেখিছি ছোঁড়ার গলায় ঝুলছে দিব্যি এক কানাকড়ি। আর বলছিস, কানাকড়ি নেই। এই চোখ নিয়ে ঠগের ব্যাবসা করতিস!"

"হে-হে সে তো কথার কথা ঠাকুর! আমার গলাতেও তো অমন এক ফুটো কড়ি রয়েছে। ছেলেবেলায় পেঁচোয় ধরেছিল কিনা। শুকিয়ে আমসি হয়ে যাচ্ছিলুম। তাই গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। এই দ্যাকো।" বলতে বলতে জামার তলা থেকে তেলচিটে সুতোয় ঝোলানো এক ফুটো কড়ি বের করল মদন।

বোমশঙ্করবাবা তখন গাঁজায় দম দিতে ব্যস্ত। উত্তর এল না। কিন্তু বদনের মাথা ততক্ষণে খুলে গিয়েছে। চট করে বোমশঙ্করবাবার পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "ঠাকুর এই না হলে গুরু মেনেছি তোমায়? ওফ, যা ভোগা খেয়েছি গতকাল! চল রে মদনা।" বলে মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ছুটল।

পয়লা বৈশাখের দিন। মেলায় আজ বাড়াবাড়ি ভিড়। তিল ধারণের স্থান নেই। তার মধ্যে কাউকে খুঁজে বের করা কী চাট্টিখানি কাজ? কিন্তু দুই মানিকজোড়ের অসাধ্য কিছু নেই। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত নন্দর খোঁজ পাওয়া গেল। আর কপাল বলে একেই! নন্দর খোঁজ পাওয়া গেল খোদ বুড়ি দয়াময়ী দাসীর কাছে। যাকে বলে কিনা, মেঘ না চাইতেই জল। এক ঢিলে দুই পাখি!

বুড়ি দয়াময়ী দাসী যে মেলায় তীর্থ করতে এসেছে, সেই খবর সকালে গোবিন্দ সামন্তই জানিয়েছিলেন। সেই বুড়ির সঙ্গে এভাবে দেখা হবে, ভাবতেই পারেনি। গত কাল থেকে বুড়ি ভিড়ে নাজেহাল অবস্থা। পুজো দেওয়া দূরের কথা, ভিড়ের চোটে মন্দিরের কাছেও ঘেঁসতে পারেনি। হতাশ হয়ে আজ ফিরে যাবে কিনা ভাবছিলেন। হঠাৎ নন্দর সঙ্গে দেখা। গোবিন্দ সামন্তর মা তারা ব্রহ্মময়ী হোটেলের পাশেই বুড়ির বাড়ি। সেই দৌলতে পরিচয়। দেখা হতেই জড়িয়ে ধরে বলেছে, বাবা নন্দ, বুড়ি মানুষ, একা মেলায় এসে নাজেহাল হয়ে গেছি। বেজায় ভিড়ে এখনো পুজোটাও দিতে পেলুমনি।

দয়াময়ী দাসীকে এর বেশি কিছু আর বলতে হয়নি। নন্দ লেগে পড়েছে কাজে। দৌড়ঝাঁপ করে মন্দিরের এক সেবায়েত ধরে কাছেই এক ঘরে বুড়িকে নিয়ে তুলেছে। পুজোর ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। বুড়ি বেজায় খুশি। পুজো যখন হয়েই গেছে আজই ফিরে যাবার ইচ্ছা। বুড়ির সেই কথায় বদনের তো মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। "সে কী বুড়িমা! আজ বছরের পয়লা দিন। এই বচ্ছরকার দিনে তীর্থস্থান ছেড়ে যাওয়া কী ভাল কথা!"

"তা ঠিক বাপু," বুড়ি মাথা নাড়ল, "নন্দরও সেই কথা। বলে, তীর্থে এলে তিন রাত্তির থাকতে হয়। কিন্তু ওদিকে ফাঁকা ঘর রেখে এইছি। মন পড়ে রয়েছে।"

ইতিমধ্যে বুড়ি ওদের ঘরে এনে বসিয়েছে। ভিতরে ঢুকে ওরা তো থ হবার জোগাড়। থরে থরে সাজানো গোটা বিশেক মিষ্টির বাক্স আর হাঁড়ি। সব "মিরচিরাম" আর "নবীন ময়রা"র দোকানের। বদন ঠোঁট চেটে বলল, "এ যে কলকাতার মিষ্টি গো বুড়িমা! এখানে পেলেন কোথায়?"

"সে আর বলিনি বাপু!" একগাল হেসে বুড়ি বললেন, "বিধবা মানুষ। কাল থেকে উপোস। নন্দকে বলেছিলুম, চাট্টি দই-চিঁড়ের ব্যবস্থা করতে। তা পাগল ছেলে এইসব নিয়ে এসেছে। তোরাই বল, এই বয়সে এত খেতে পারি? ওদিকে নন্দ মুখেও দেবে না। শুধু এক কথা, তোমার জন্য এনেছি বুড়িমা। খাই কী করে? তাই পড়েই রয়েছে। তা ভালই হয়েছে বাবা। দেখা যখন হয়েছে, কিছু খেয়ে যাও তোমরা। তবু কিছু কমবে।"

কলকাতার এসব দোকানের মিষ্টির নামই শুনেছে ওরা। চেখে দেখার ভাগ্য হয়নি। তবু অতি কষ্টে জিব সামলাতেই হল। হাতে সময় নেই। আগে নন্দর খোঁজ দরকার। বদন বলল, "সে হবে বুড়িমা। মেলা সময় আছে। আজ বচ্ছরকার দিন। আমরাও পুজোটা দেব কিনা। তা নন্দকে দেখছি না যে! সে কোথায়?"

"আর বলিসনি বাবা। পাগল ছেলে আমার। একবার শুধু বলেছিলাম, অবেলায় খেয়ে কেমন অম্বলমতো হয়েছে। ব্যস, ছেলে ছুটেছে ডাক্তারের খোঁজে।"

"আমরা তাহলে পুজোর কাজটা সেরেই আসছি বুড়িমা। শুধু নন্দ কেন, আমরা কি তোমার ছেলে নই? ঠাকুর দয়া করলে এই বচ্ছরকার দিনে মেঠাই আমরাও খাওয়াব তোমাকে।" কথা শেষ করে দু'জন হন্তদন্ত হয়ে ছুটল।

নন্দকে খুঁজে বের করতে দেরি হল না। মেলায় সরকারি চিকিৎসার ঠেক কোনদিকে জানা ছিল। সেই দিকে ধাওয়া করতেই দেখা তার সঙ্গে। হাতে গোটা দুই ওষুধের শিশি আর পুরিয়া। ওরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে, "ভাইরে, কোথায় ছিলি তুই? সেই থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান," কোঁচার খুঁটে চোখ মুছল বদন।

"আর বলো না দাদা। ঠাকুরমশাই আজ সকালে হঠাৎ বিদেয় করে দিলেন যে। ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখা বুড়িমা দয়াময়ী ঠাকরুনের সঙ্গে। চেন তো ওনাকে?"

"খুব চিনি" বদন বলল, "আর বুড়িমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে। তাঁর কাছেই তো তোর খোঁজ পেলুম। তা হ্যাঁরে নন্দ, তোর গলার ওই কড়িটা কী জন্য রে? সেই থেকে দেখছি। ভাবি জিগ্যেস করব, তা মনেই থাকে না।"



"গলার এই কানাকড়ি!" নন্দ হেসে বলল, "সে এক কাণ্ড হয়েছিল গো দাদা। এক সাধুবাবার ঝুলি থেকে পড়েছিল। তখন খুঁজে পাইনি অবশ্য। উনিও খোঁজ করেছিলেন। তারপর যখন পেলাম, তিনি হনহনিয়ে চলে গেছেন। কত ডাকলাম। সাড়াও দিলেন না। সেই থেকে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। ওনার দেখা পেলেই ফিরিয়ে দেব।"

নন্দ থামল। ততক্ষণে ইশারায় দুই মানিকজোড়ের শলাপরামর্শ সারা হয়ে গেছে। একটু পরে তিনজন কথা বলতে বলতে বুড়ির আস্তানার দিকে রওনা হয়েছে। ভিড়ের ভিতর নন্দর গলার সেই কানাকড়ি হঠাৎ কিসের খোঁচায় বেঁধে ছিঁড়ে পড়ল। মদন তৈরি হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে দিল নন্দর দিকে। "এই নে নন্দ, তোর গলার কানাকড়ি হঠাৎ ছিঁড়ে পড়েছিল।" অবশ্য ইতিমধ্যে যে আসল কাজ, অর্থাৎ নিজের গলার কানাকড়ির সঙ্গে সেটা বদল হয়ে গেছে, টের পায় সাধ্য কার।

গলার কানাকড়ি ছিঁড়ে পড়েছে বুঝে নন্দ হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে ফের গলায় বাঁধছে, বদন বলল, "বুড়িমার ওষুধ নিয়ে তুই এগো রে নন্দ। আমরা মন্দিরে পুজোটা দিয়েই আসছি।"

নন্দ আপত্তি করল না। দুই মানিকজোড় দেরি না করে ছুটল মেলার এক কোনে খানিক নিরিবিলির দিকে। কিন্তু পয়লা বৈশাখের দিনে সাতখালির গাজন মেলায় তেমন জায়গা খুঁজে বের করা কী চাট্টিখানি কথা। চারদিক মানুষে ছয়লাপ। একবার

ভেবেছিল গয়নার নৌকোয় ফিরে যায় মহামায়াগঞ্জ। কিন্তু আগের দিনের কথা ভেবে ভরসা হল না। শেষে অনেক খুঁজে গোটা কয়েক গাছের আড়ালে নিরিবিলি জায়গা একটু পাওয়া গেল। আড়ালে গিয়েই বদন সেই কানাকড়ি কপালে ঠেকিয়ে বলল, "জয়গুরু, হাঁড়ি ভরতি গজু ময়রার রাজভোগ আর রাবড়ি দাও গো কানাকড়িবাবা। বুড়ি দয়াময়ী দাসীকে খাওয়াব বলে কথা দিয়ে এইচি।"

বদনের মুখের কথা পড়তে পেল না। ঠকাস করে বাঘা সাইজের রাজভোগ আর সরেস রাবড়ি ভরতি দুটো হাঁড়ি কোত্থেকে উড়ে এসে সামনে পড়ল।"

মার দিয়া কেল্লা! যুদ্ধ জয়ের আনন্দে দুই মানিকজোড় তখন আত্মহারা। হাঁড়ি নিয়ে ছুটল বুড়ি দয়াময়ী দাসীর উদ্দেশ্যে। দেখে বুড়ি তো হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "এ কী করেছিস বাবারা! আগের মিষ্টিই যে এখনো খালি হয়নি।"

"তাতে কী বুড়িমা! আমরা গরীব মানুষ। তাই কলকাতার মিষ্টি আর আনতে পারলাম কোথায়? তবে জানই তো, আমাদের গজু ঘোষের মিষ্টিও কিছু খারাপ নয়।"

"বেঁচে থাক বাবারা," মদনের কথায় আঁচলে চোখ মুছল বুড়ি, "তা থিতু হয়ে বোস দেখি। কিছু খেয়ে যা। নন্দ তুইও খা। ওরা ভালবেসে এনেছে।"

"খেপেছ বুড়িমা।" চোখ কপালে তুলে দুই মানিকজোড় বলল, "হাতে সময় নেই একদম। মেলা কাজ। আর একদিন হবে। বরং নন্দকে দাও। ছেলেমানুষ।"

নন্দ ঘরেই ছিল। হাঁ করে দেখছিল সব। বলল, "তাহলে দাও গো বুড়িমা। গজু ঘোষের মিষ্টি বদন আর মদনদা এই মেলায় আগেও খাইয়েছে। আহা, কী যে আস্বাদ!"

গজু ঘোষের সেই রাজভোগ আর রাবড়ির হাঁড়ি দেখতে দেখতে প্রায় অর্ধেক সাফ করে ফেলল নন্দ। কিন্তু সেই দৃশ্য দেখার জন্য বদন আর মদন তখন সেখানে নেই। দৌড় লাগিয়েছে জেটিঘাটের দিকে। লঞ্চ ধরে আজই পাড়ি দেবে মহামায়াগঞ্জ। ভাবনা নেই আর।

মহামায়াগঞ্জে পৌঁছোতে আজও বেশ রাত হয়ে গেল। বদন বলল, "চল, তোর ঠেকেই যাই আজ। রাত হয়েছে। খিদেও পেয়েছে বেজায়।"

শুনে মদন তো প্রায় আঁতকে উঠল, "খেপেছ বদনদা! ঘটা হালদার ওদিকে যে গুলি পাকিয়ে বসে আছে, ভুলে গেলে!"

"থাম দেখি।" প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল বদন। "যে অস্ত্র এখন হাতে রয়েছে, ওসব ঘটৎকচ, কুম্ভকর্ণদের কাত করতে দু'সেকেন্ডও লাগবে না।"

যুক্তি ফেলনা নয়। মদন তাই আর আপত্তি করল না। ঘরে ঢুকে মেঝেয় গ্যাঁট হয়ে বসে বদন বলল, "কী খাবি বল?"

মদন মাথা চুলকে বলল, "কলকাতার "দ্বারিক ময়রা"র বরফি রাবড়ির নামই শুনেছি বদনদা। কোনোদিন দেখার ভাগ্য হয়নি। আজ রাতের ভোজটা সেই রাবড়ি দিয়েই হয়ে যাক।"

বদন কানাকড়ি হাতে নিয়ে সেই প্রার্থনাই জানল। মুখের কথা সরতে না সরতেই দু'হাড়ি রাবড়ি উড়ে এসে পড়ল ওদের সামনে।

টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় সেই রাবড়ির দিকে তাকিয়ে ওদের চোখ তো ঠিকরে পড়ার জোগাড়। কী তার রূপ! কী গন্ধ! মুহূর্তমাত্র দেরি না করে যে যার হাঁড়িতে কবজি ডুবিয়ে এক খাবলা তুলে চালান করে দিল মুখের ভিতর। আর তারপরেই প্রায় বজ্রাঘাত।

"ওয়াক" করে বেজায় এক হেঁচকি তুলে বদন ব্যাপারী এক তুড়ুক লাফে উঠে গেল হাত কয়েক উঁচুতে। তারপর ধপাস করে নীচে পড়েই হাইমাই চিৎকার, "বাবাগো! কী তেতো! কী তেতো! থুঃ-থুঃ। স্রেফ কুইনিন আর চিরতা রে! মদন, জল আন শিগগির। মরে গেলুম।"

কিন্তু মদন জল আনবে কী। সে ততক্ষণে "দাদা গো! কী ঝাল! কী ঝাল! জ্বলে গেল সব! জ্বলে গেল! জল-জল।" বলে কানে হাত দিয়ে হাত কয়েক দূরে ঠিকরে পড়েই হাহাকার জুড়ে দিয়েছে। তারপর মস্ত জিব বের করে সমানে "হুস-হাস" শব্দ। রাবড়ি তো নয়, যেন হাঁড়ি ভরতি কেজি কয়েক ধানিলঙ্কা বাটা।

সেই ভয়ানক ধকল সামান্য সামলে উঠতেও বদন আর মদনের মতো দুই ঝানু ওস্তাদের লেগে গেল অনেকটা সময়। তখনো হাঁড়ির সামনে থম হয়ে বসে আছে, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন ঘটৎকচ হালদার, "তোরা আইয়া গেছস দেহি! তা ভাবস না, আমিও রেডি হইয়া.."

বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। চোখ দুটো জুলজুল করে উঠল। হাতের আস্তিন গোটাতে গিয়েও ফের নামিয়ে দিলেন, "হাঁড়িতে কী আনছস রে? অ্যাঁ, কলিকাতার মেঠাই!"

তাড়াতাড়িতে দরজার খিল দেওয়া হয়নি। কিন্তু চোখের সামনে ঘটৎকচ হালদারকে ঘরে ঢুকতে দেখেও দুই মানিকজোড়ের শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। ওদিকে ঘটৎকচ হালদার ততক্ষণে এগিয়ে এসে রাবড়ির হাঁড়ির উপর হামলে পড়েছেন। ওদের চোখের সামনেই দুই মিনিটে দুটো হাঁড়ি সাফ হয়ে গেল। তারপর বেজায় খুশি হয়ে একগাল হেসে বললেন, "আজ বেজায় খাওয়াইলি রে! জয়জয়কার হোউক তগো। এমন মাঝেমধ্যে যদি খাওয়াস, বকেয়া ভাড়া আর দিতে লাগব না।"

হাঁ করে দেখছিল মদন। হাত চাটতে চাটতে ঘটৎকচ হালদার বিদায় নিতে ঢোঁক গিলে চিঁচিঁ করে বলল, "এটা কেমন হল বদনদা? মাথায় যে কিছুই ঢুকছে না গো!"

উঠে গিয়ে কলসি থেকে অনেকটা জল ঢেলে কুলি করল বদন। মুখটা কিছু সাফ হতে ক্রমে মাথাটাও যেন সাফ হয়ে আসছিল। বার কয়েক ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল, "আমারই কী কিছু ঢুকছিল রে। তবে ধন্দটা এখন যেন কিছুটা সাফ হচ্ছে।"

"কী বদনদা?"

"কানাকড়ির গুণ আছে বটে, কিন্তু তাতে মালিকের ফয়দা নেই রে। নন্দ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খেত কী আর অমনি? কদিন স্রেফ আহাম্মুকের মত দৌড়দৌড়ি হল।"

"তাহলে ওই কানাকড়ি ভোগে লাগবে না! হায় হায়!" হতাশায় কপাল চাপড়াল মদন।

"হবে রে বাপু, হবে," বদন ভরসা দিল, "বোকা নন্দটা বিনে পয়সায় ভোজ দিয়ে বদনাম কুড়িয়েছে। আমরা তা করতে যাব কোন দুঃখে? চল গোবিন্দ সামন্তকে আগে একটু তোয়াজ করে আসি। দলিল চুরির কাজে আজ আর সিঁদেল লাগানো গেল না। জানতে পারলে অনর্থ করবে।"

(৬)

মা তারা ব্রহ্মময়ী হোটেল রাত দুপুর পর্যন্ত খোলা থাকে। দু'জন যখন পৌঁছল ঘরদোর সাফ করে কর্মচারীরা শুয়ে পড়লেও গোবিন্দ সামন্ত যথাস্থানে বসে নতুন খাতার হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। ওদের দেখেই একগাল হেসে বলল, "কীরে সিঁদেল এনে লাগিয়ে দিয়েছিস তো? দলিল কিন্তু আজই চাই। খোঁজ নিয়েছি, বুড়ি আজও ফেরেনি।"

"সে হবে এখন মহাজনকাকা। বুড়িকে নিয়ে চিন্তা নেই। সাতখালির গাজন মেলায় তার ব্যবস্থা করে এসেছি। তীর্থস্থান। তেরাত্তির না গেলে বুড়ি এদিকে পা মাড়াচ্ছে না। সবে তো আজ দু'রাত্তির।"

"এই রাত দুপুরে সেই খবর দিতে এলি!" ব্যাজার হয়ে গোবিন্দ সামন্ত বললেন।

"না গো কাকা। আরো বড় খবর রয়েছে। তাই বলতেই তো এই রাতে ছুটে এলাম।"

"কী খবর রে?" মদনের কথায় চোখ জুলজুল করে উঠল গোবিন্দ সামন্তর।

"নন্দকে নিয়ে সেই ধন্দ এতদিনে খোলসা করা গেছে। সে দারুণ জিনিস কাকা। যা চাইবে শুধু বললেই হল। আকাশ ফুঁড়ে সামনে এসে পড়বে।" বলতে বলতে মদনের গলা থেকে সুতো বাঁধা ফুটো কড়ি খুলে হাতে নিল বদন। দু'চার কথায় সব ব্যক্ত করে হাতের মুঠোয় সেই কানাকড়ি নিয়ে বলল, "এবার কী চাও বল। শুধু মুখের কথা সরার অপেক্ষা। বচ্ছরকার দিন। কলকাতার "মিরচিরাম"-এর সেরা জাফরান লাড্ডু খাও বরং। চাইলেই হাঁড়ি ভরতি হয়ে উড়ে আসবে"

"থাম দেখি বাপু।" খেঁকিয়ে উঠলেন গোবিন্দ সামন্ত, "লাড্ডু পরে হবে। আগে বুড়ির দলিলটা বাগিয়ে আন দেখি। বচ্ছরকার পয়লা দিন। একটু শান্তিতে ঘুমোই।"

ধমক খেয়ে বদন একটু দমে গেল। তারপর কানাকড়ি কপালে ঠেকিয়ে বলল, "জয়গুরু, বুড়ি দয়াময়ী দাসীর জমির দলিলটা এনে দাও গো কানাকড়িবাবা। মহাজনকাকার বেজায় দরকার।"

বদনের মুখের কথা সবে খসেছে। জুলজুল চোখে তাকিয়ে ছিল গোবিন্দ সামন্ত। "বাপরে" বলে লাফিয়ে উঠে দু'হাতে সারা শরীর চুলকোতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা কী হল বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল মদন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সেও। কাতরাতে কাতরাতে বলল, "ও বদনদা, এত জলবিছুটি কোথা থেকে এল! মরে গেলাম যে।"

কিন্তু জবাব দেবে কে? ততক্ষণে বদনের সারা গায়েও ভয়ানক চুলকুনি শুরু হয়ে গেছে। আর ওদিকে গোবিন্দ সামন্ত তো সারা হোটেলঘর জুড়ে চেয়ার টেবিল উলটে দাপাদাপি জুড়ে দিয়েছেন। সাথে পরিত্রাহি চিৎকার, "জলবিছুটিতে মরে গেলাম গো। বাঁচাও, কে আছ।"

রাত দুপুরে গোবিন্দ সামন্তর হোটেলঘরে তারপর সে এক ভয়ানক অবস্থা। দারুণ চুলকুনির চোটে শুধু গোবিন্দ সামন্তই নয়, লাফালাফি জুড়েছে বদন আর মদনও। যাকে বলে দক্ষযজ্ঞ। বদন আর মদনের চুলকুনি তবু কিছু কম। কিন্তু হোটেলের জনা দশেক কর্মচারীও তাদের মালিককে সামলাতে পারছে না।

রাত ভোর হল ওই ভাবে। গোবিন্দ সামন্ত পয়সাওয়ালা মানুষ। সকালের ট্রেনেই বাড়ির লোক তাকে নিয়ে ছুটল কলকাতার দিকে। বড় ডাক্তার দেখানো হবে। বদন আর মদনের সেই উপায় নেই। দু'জন অগত্যা ছুটল সেই গাজনের মেলার

দিকে। নন্দর খোঁজ যখন পেল, সে তখন ফুরফুরে হয়ে দয়াময়ী দাসীকে নিয়ে সার্কাস দেখে ফিরছে। বুড়ির হঠাৎ বাঘ-সিঙ্গির সার্কাস দেখার শখ হয়েছিল। ওরা ছুটে গিয়ে তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। "নন্দভাই বাঁচাও। চুলকুনির চোটে মরে গেলাম যে!"

ওদের ওই অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল নন্দও। উসকো খুসকো চুল। সারা গায়ে চুলকুনির দাগ। বিধ্বস্ত অবস্থা। ভয়ে ভয়ে বলল, "কী হয়েছে গো দাদা?"

"আর বলিসনি ভাই," দু'জন প্রায় হাহাকার করে উঠল, "তোর সেই কানাকড়ি আমাদের কানাকড়ি কাজেও লাগেনি রে! মতিভ্রম হয়েছিল। তাই ফের ছুটে এলাম তোর কাছে। ক্ষমা করে দে ভাই। রাগ করিসনি।"

গতকাল ভিড়ের ভিতর মদন যখন ওর গলার কানাকড়ি হাতসাফাই করে নেয়, তখন নন্দ টের পায়নি এমন নয়। কিন্তু গ্রাহ্য করেনি। এবার বলল, "দাদাগো, ওই কানাকড়ির বেজায় গুণ ঠিকই। কিন্তু নিজের কানাকড়ি কাজেও লাগাবার উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে এমন তো হবার কথা নয়! কারো অনিষ্ট করতে চাওনি তো?"

দু'জনের মুখে আর কথা নেই। তাকিয়ে রইল হাঁ করে। নন্দ বলল, "ওই জন্যই এই শাস্তি।"

দুই মানিকজোড় ককিয়ে উঠল এরপর, "আমরা নিজের ইচ্ছেয় চাইনি রে। ওই শয়তান গোবিন্দ সামন্ত। সে তো চিকিৎসা করাতে কলকাতা চলে গেল। আমাদের কী হবে রে? তোর কানাকড়ি ফিরিয়ে নে নন্দ। রক্ষে দে এবার।"

"তা হয় না গো দাদা।" নন্দ বলল, "ও কানাকড়ি এখন তোমাদের সম্পত্তি। রাখতে না চাও, বোমশঙ্কর ঠাকুরকে দিয়ে দিও বরং। খানিক আগে উনিও কানাকড়ির খোঁজ নিতে এসেছিলেন। আর একটা কথা বলি, জিনিসটা সঙ্গে রাখা খুব সহজ নয় কিন্তু।"

সহজ যে নয়, সেটা ইতিমধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে দুই মানিকজোড়। কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইল হাঁ করে। নন্দ বলল, "স্বয়ং সেই সাধুবাবাকেও দেখেছিলাম ঢাউস ঝুলি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। ছেঁড়া কাঁথার ঝুলি! তবু কী ভয়ানক তেজ গো তার! সেই ঝুলি থেকেই তো পড়েছিল ওই কানাকড়ি। কদিনের মধ্যেই টের পেয়েছিলাম তেজ।"

নন্দকে নিয়ে ধন্দ মিটতে এরপর বাকি থাকেনি দুই মানিকজোড়ের। ওর গলা জড়িয়ে ধরে দু'জন কেঁদে উঠেছিল ভেউভেউ করে। "তাই হবে রে নন্দ, তাই হবে। কানাকড়ি আজই বোমশঙ্করবাবার হাতে তুলে দিয়ে যাব। কিন্তু এই চুলকুনির কী হবে রে? মরে গেলুম যে! পয়সাও নেই যে, কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যাব। হায় হায়!"

"সারবে দাদা। নিজের ইচ্ছায় যখন অনিষ্ট করতে চাওনি, তখন নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবে। আর মনটাও বড় ভাল গো তোমাদের। গজু ঘোষের মেঠাই চোখে তো কম দেখিনি। তোমরাই প্রথম খাওয়ালে সেদিন। ঠাকুর দয়া করবেন নিশ্চয়," নন্দর দু'চোখ ছলছল করে উঠল।

নন্দর গল্প খুব বেশি আর বাকি নেই। সংক্ষেপেই বলি। মহামায়াগঞ্জ ফিরে এরপর ওর ঠাঁই হয়েছিল বুড়িমা দয়াময়ী দাসীর কাছে। নিজের ছেলের মতোই। শুধু তাই নয়, এর পর ঘটে গেছে আরও অনেক ব্যাপার। নন্দর কথামতো বদন আর মদনের চুলকুনি কিছুদিনের মধ্যে সেরে গেলেও গোবিন্দ সামন্তর তেমন উন্নতি আর হয়নি। পয়সাওয়ালা মানুষ। চিকিৎসা কম হয়নি। কিন্তু উপকার মেলেনি। এরপর আর এক বিপদ। চুলকুনির সঙ্গে সারা গায়ে ঘা আর পাঁচড়া। এমন মানুষের হোটেলে কে খেতে আসে? শেষে জলের দরে হোটেল বেচে দিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। সেই হোটেল কিনেছেন বুড়ি দয়াময়ী দাসী। বলতে গেলে, মা তারা ব্রহ্মময়ী হোটেলের মালিক এখন নন্দ। তবে বদলায়নি একটুও। সেই আগের মতোই সাদাসিধে সহজ মানুষ। দেশের বাড়ি থেকে সবাইকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। ভাই-বোন দুটি ভরতি হয়েছে স্কুলে। এখন দুই বুড়িকে নিয়ে কদিন পরে পরেই তীর্থে বের হয়ে পড়ে। বেশ আছে ও। দয়াময়ী দাসী ঠিক করে রেখেছেন, আর কদিন গেলে ধুমধাম করে বিয়ে দেবেন।

ওদিকে মা তারা ব্রহ্মময়ী হোটেলের দায়িত্ব এখন বদন আর মদনের উপর। গাজনের মেলায় সেই যে ওরা দয়াময়ী দাসীকে হাঁড়ি ভরতি মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল, তাতে বেজায় খুশি হয়েছিলেন তিনি। তারপর নন্দ যখন প্রস্তাবটা দেয়, বুড়ি এক কথায় রাজি। এমন সৌভাগ্য হবে, দু'জন স্বপ্নেও ভাবেনি কখনো। দুই মানিকজোড় মন দিয়ে হোটেল চালাচ্ছে এখন। নাক-কান মলে শপথ নিয়েছে, অসৎ পথ আর মাড়াবে না কেউ। কথামতো সেই কানাকড়ি গাজনের মেলাতেই ওরা বোমশঙ্করবাবার হাতে তুলে দিয়েছিল। বেজায় খুশি হয়েছিলেন তিনিও। কিন্তু ফল নাকি মোটেই ভাল হয়নি। পুরোহিতের কাজটা গেছে। এখন বদ্ধ উন্মাদ। সেই কানাকড়ির খোঁজও নেই।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য



সুন্দরবনের ধারে এক গাঁ। সেই গাঁয়ে দুখুর বাস। আপনজন কেউ ছিল না তার, সবাই মরেছে আকালে। শুধু ছিল একটা গোরু। ধবধবে সাদা তার গায়ের রং, তাই দুখু নাম রেখেছিল ধবলী। কচি কচি ঘাস এনে দুখু তাকে খাওয়াত। গা দলাইমলাই করে দিত, চান করাত। শুনলে লোকে হাসবে, যদি কখনো একটু তেল জোগাড় করতে পারত দুখু, তবে সেটকু ধবলীর গায়েই সে মালিশ করত। ধবলী তখন হাসি-হাসি মুখ করে আরামে চোখ বুঁজে থাকত। বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ, গোরু আবার হাসে নাকি? হাসে, হাসে। কথাও কইত ধবলী। অবাক হচ্ছ বুঝি? হয়ো না। অবাক হবার মতো অনেক কান্ডই এখনো ঘটবে। অবশ্যি, মিথ্যে বলব না ভাই, রামা-শ্যামা-যেদো-মেধোর সঙ্গে কথা কইত না ধবলী, কইত কেবল দুখুর সঙ্গে, তাও আড়ালে। তাই লোকে জানত না ধবলীর কথা কওয়ার খবর। জানলে একটা হুলস্থুল কান্ড হয়ে যেত! জানই তো লোকের স্বভাব। একটা কিছু পেলেই হল, যাচ্ছেতাই মাতামাতি শুরু করে দেয়। ভারি বুদ্ধিমতী গোরু ধবলী। মানুষ যতটা বোঝে গোরুকে, তার চাইতে মানুষকে সে বুঝত অনেক বেশি।

দুখু আর ধবলীতে খুব ভাব-ভালোবাসা। এমনটা বুঝি আর কোনো গোরুতে মানুষে হয়নি। ধবলীকে যেমন যত্ন করত দুখু, ধবলীও তেমনি দুধ খাইয়ে খাইয়ে দুখুকে বানিয়েছিল তাগড়াই জোয়ান।

ধবলীর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখে দুখু তাকে বেঁধে রাখত না। তা ছাড়া ধবলীর শিং দু'খানা ছিল মোক্ষম, তেমনি জোর গায়ে, কেউ যে তাকে আটকে রাখবে সে ভয় দুখুর ছিল না।

পাড়াবেড়ানি ধবলী কিন্তু কারো ক্ষেতে বা বাগানে ঢুকত না। মানুষের সঙ্গে তো দূরের কথা, মোটাবুদ্ধি গোরুদের সঙ্গেও সে গুঁতোগুঁতি করত না। মান-ইজ্জতের বোধটা তার অনেক মানুষের চাইতে বেশিই ছিল। বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ঠিক সময় সে ঘরে ফিরে আসত। দুখুকে সে নিজের ছেলের মতোই দেখত। যত বেশি পারত দুধ সে দিত দুখুকে।

যত অভাব-অনটনই থাক, বেশ সুখে-শান্তিতেই দিন কাটছিল দুখু আর ধবলীর।

কিন্তু একদিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, তবু ঘরে ফিরল না ধবলী। বারবার কুঁড়েঘরের বাইরে এসে বেলা ঠাহর করল দুখু। এমন তো কোনোদিন করেনি ধবলী। তবে কি কোনো বিপদে পড়ল? এই ছোট্ট গাঁয়ে সবাই সবার চেনা। বিপদ কিছু ঘটলে এতক্ষণে দুখুর ঘরেই খবর চলে আসত। এক ভয় বাঘের। তা হালফিল এদিকে বাঘের উৎপাতের কথাও শোনা যায়নি। মহা ভাবনায় পড়ে গেল দুখু।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে বেরিয়ে পড়ল ধবলীকে খুঁজতে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনে জনে জিজ্ঞেস করল ধবলীর খবর। কিন্তু কেউ ঠিকঠাক কিছু বলতে পারল না। অনেকেই দেখেছে তাকে, যেমন রোজই দেখে। কেউ কেউ আদরও করেছে। কিন্তু অমন শান্তশিষ্ট গোরু তো আর বেচাল কিছু করতে পারে না, তাই দেখাসাক্ষাতের পর সেকথা আর কারুর মনেও থাকেনি।

মনের দুঃখে তিন দিন তিন রাত ঘর থেকে বেরোলই না দুখু। দিনপিছু সের তিনেক করে কচুসেদ্ধ ছাড়া খেলও না তেমন কিছু। অবশ্যি দুখুদের গাঁয়ের বেশির ভাগ লোক কচুসেদ্ধ-টেদ্ধ খেয়েই দিন কাটায়।

সেই যে রূপকথার গল্পে বলে না– মনের দুঃখে বনে গেল, দুখুও সবরকম চেষ্টা করে যখন ধবলীর কোনো খবরই বের করতে পারল না, তখন সেও বনে যাওয়াই স্থির করল। মায়ের মতো ধবলীই যদি না রইল তার, তবে আর কচুসেদ্ধ খাওয়ার জন্যে বেঁচে থেকে লাভ কী! গাঁয়ে যখন ধবলীর কোনো খবর পাওয়া যায়নি, তখন যতদূর পারা যায় জঙ্গলটাই একবার দেখতে হবে। গাঁয়ের একদিকে নদী, অন্যদিকে জঙ্গল। ধবলীর মনে এমন কোনো দুঃখ ছিল না যে সে নদীতে ডুবে মরতে যাবে। তাহলে বাকি রইল ওই জঙ্গল, ওখানে যদি কোনো হদিস পাওয়া যায়। একলা জঙ্গলে যেতে সবার ভয়, কিন্তু দুখু এখন বেপরোয়া। ধবলী ছাড়া, ধবলীর দুধ ছাড়া, জীবনটা তো কচুসেদ্ধ। তা সেই কচুসেদ্ধ যদি বাঘের পেটেই যায় তো যাক।

দুখু একদিন একলাই ধবলীকে খুঁজতে গেল জঙ্গলে।

জঙ্গলটা তো একটুখানি নয়। সেই সকালে বেরিয়েছে দুখু, কেবলই ঘুরছে, থেকে থেকে ধবলীর নাম ধরে ডাকছে, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও। আরো এগিয়ে যায় দুখু। গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর চলে এসেছে সে। সূয্যি মাথার ওপর উঠে এখন পশ্চিমে হেলতে শুরু করেছে। ঘোরাঘুরির পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দুখু। মনটাও বড়ো দুর্বল, বেশ বুঝতে পারে ধবলীকে ফিরে পাবার কোনো আশা নেই। তবু শেষবারের মতো ধবলীর নাম ধরে একচোট ডাকাডাকি করে। তারপর উত্তরের আশায় কান পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সব নিঝঝুম। এ কোন্ রাজ্যে এল দুখু? ধবলীর সাড়া না পাক, অন্য জন্তু-জানোয়ারের সাড়াও তো পেতে পারে। তারাই বা সব গেল কোথায়? তবে এসব নিয়ে দুখু মাথা ঘামাল না, ভয়ও পেল না। ধবলীকেই যখন পেল না, তখন এ জীবন থাকলেই বা কী আর গেলেই বা কী।

আস্তে আস্তে ফেরার রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে দুখু।

হঠাৎ এক কেঁদো বাঘ লাফ দিয়ে পড়ে তার সামনে। রাস্তা আটকে বসে মাটিতে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে গররররর্ গররররর্ শব্দ করতে থাকে।

প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলেও দুখু তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বাঘের সামনাসামনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

মিনিট পাঁচেক এই রকম চলে। বাঘের শুধু ল্যাজ আছড়ানো আর গররররর্ গররররর্ করা আর দুখু বুক চিতিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুখু বলে -দ্যাখো বাপু, আমার মন-মেজাজ ভালো না। খেতে চাও তো খেয়ে ফ্যালো, না হলে রাস্তা ছাড়ো, আমি ঘরে ফিরব।

বাঘ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে (বাঘেরাও সময় সময় ঠোঁট বেঁকায়) -ঘর যায়েগা? হাঃ হাঃ হালুম, আভি পায়েগা মালুম। হাম হ্যায় সুন্দরবনকা বাঘ, হামারা রাজত্বমে কাহে ঢুকা তুম্?

একটুও ভয় না পেয়ে দুখু বলে -বাঙালি বাঘ, বাংলায় কথা বলো-না বাপু।

-- এয়ার্কি হচ্ছে? একটু যেন মিইয়ে গিয়ে বাঘ বলে, আমি কি যা-তা লোক!

হঠাৎ ভীষণ হাসি পেয়ে যায় দুখুর। হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে আর কী!

-- অত হাসিটা কীসের? আমার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ অমন দাঁত বের করে হাসলে আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাই -বাঘ রীতিমতো গম্ভীর হয়ে বলে।

পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতেই দুখু বলে -তুমি যা-তা বাঘ হতে পার, যা-তা লোক কী করে হবে হে?

-- ভাষার ভুল ধরতে এসো না, বাঘ আরো গম্ভীর হয়ে বলে, অত মানুষ খেলে মাঝে মাঝে নিজেকে একটু মানুষ-মানুষ মনে হয়ই। তুমি বাঘ খেতে থাক, দেখবে মাঝে-মধ্যে ভুল করে তোমারও মুখ দিয়ে হালুম-হুলুম বেরিয়ে আসবে।

অ্যাঁ! নাক-মুখ কুঁচকে দুখু বলে, কোন্ দুঃখে আমি বাঘ খেতে যাব? যা বোটকা গন্ধ!

-- অ্যা.....ই....ই....খবরদার, অপমান আমি সহ্য করব না। আমাদের গায়ে বোটকা গন্ধ? কাঁচকলাখেকোটা বলে কী!

-- কাঁচকলা আমি পাইও না, খাইও না। সেসব শহরে চলে যায়। আমি আগে খেতাম দুধ দিয়ে কচুসেদ্ধ, এখন খাই শুধু কচুসেদ্ধ। তা, অত কথায় দরকার কী? আমি তোমাকে অপমান করেছি, তুমি আমাকে খেয়ে ফ্যালো। জোর যার মুল্লুক তার এই যখন নিয়ম.....

--খাবার হলে তো অনেক আগেই খেয়ে ফেলতাম। তুমি এতক্ষণে প্রায় বাঘের নাদি হয়ে যেতে.....

--তার মানে? আমাকে খাওয়া যায় না? আমি এতই খারাপ যে বাঘেরও অখাদ্যি! রাগে দুঃখে চোখ ছলছল করে দুখুর।

দুখুর অবস্থা দেখে বাঘের বুঝি মায়া হয়। সে বলে -আরে না না, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। খেতে তুমি বেশ ভালোই হবে, সত্যি বলতে কী তোমাকে দেখে ইস্তক নোলাটা আমার সপসপ করছে। কিন্তু মাংস আজকাল আমার মোটেই সহ্য হয় না, খেলেই অম্বল হয়ে যায়।

-- কী খাও তবে? ঘাস?

-- দুর বোকা! ঘাস আমরা দু'চারটে খাই বমি করবার দরকার হলে। আমাদের মাসিদের দেখনি? তারাও তাই করে। বিড়ালের কথা বলছি হে, ওরা আমাদের মাসি হয় জান তো?

-- তা জানি। কিন্তু তুমি কী খাও তাহলে?

-- দুধ। দুধ ছাড়া আর কিচ্ছু খাই না আজকাল। অম্বল হলে ডাক্তাররা দুধ খেতেই তো বলে।

-- ডাক্তার! ভীষণ অবাক হয়ে দুখু বলে।

-- অবাকের ঠ্যালায় চোখ যে ছানাবড়া হয়ে গেল। ডাক্তার কাকে বলে তাও জান না?

-- জানব না কেন? ওই তো যারা লোকের অসুখ হলে লাল-নীল জল খেতে দেয়, পেট-টেট কেটে ছুরি-কাঁচি-ব্যান্ডেজ ভেতরে পুরে সেলাই করে দেয়। কিন্তু তুমি আবার ডাক্তার পেলে কোথায়? বাঘ-ডাক্তার আছে বলে তো শুনিনি। হ্যাঁ হে, বাঘ-ডাক্তারও আছে নাকি? আমি তো জানতাম বাঘা বাঘা মানুষ-ডাক্তারই আছে, যারা রুগির পকেট ফাঁকা করে টাকা শুষে খায়, তোমরা যেমন ঘাড় মটকে রক্ত শুষে খাও। সেজন্যেই মানুষেরা বড়ো ডাক্তারকে বাঘা ডাক্তার বলে। তা, সেকথা থাক। তুমি ডাক্তার দেখালে কী করে?

-- বাঃ, না-ই বা থাকল বাঘ-ডাক্তার, দু'চারটে মানুষ-ডাক্তার আমি খাইনি বুঝি! তাদের জ্ঞানগম্যি কিছুটা তো আমার মাথায় ঢুকেছে। ঠিক কি না?

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায় দুখুর মাথায়। সে ভুরু-টুরু কুঁচকে বাঘকে বলে -তবে কি দুধ খাওয়ার জন্যে তুমিই আমার ধবলীকে সরিয়েছ?

বাঘ উত্তর দেয় না। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে দুখু বুঝতে পারে সে ঠিকই ধরেছে। দেখতে জানলে বাঘের মুখের ভাবও বোঝা যায়।

বাঘের ল্যাজ আছড়ানো বন্ধ। মুখ মাটির দিকে নামানো। দুখু বুঝতে পারে চুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় খুব লজ্জা পেয়েছে বাঘ। নাঃ, বাঘটার বেশ মনুষ্যত্ব আছে, মানুষরাও আজকাল চুরি করে এত লজ্জা পায় না। দুখুর আশা হয় বাঘকে একটু ধর্ম-টর্মর কথা বললে সে হয়তো ধবলীকে ফেরত দিয়ে দেবে।

মিছরির মতো মিষ্টি গলা করে দুখু বলে -সত্যি বলতে কী ভাই বাঘ, বাঘেদের মধ্যে যে তোমার মতো লোক -থুড়ি–বাঘ আছে তা আমি কোনোদিন ভাবিনি। আমি ভাবতাম তাদের লজ্জা-ঘেন্না-ভয় কিছুই নেই। কিন্তু ধবলীকে চুরি করে তুমি যে রকম লজ্জা পেয়েছ তাতে মনে হচ্ছে লোক তুমি মোটেই খারাপ নও।

-- এই, লোক নয়, বাঘ। বাঘ এবার দুখুর ভুল শুধরে দেয়।

-- হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঘ। তা ভাই বাঘ, তুমি খুব ভালো বাঘ, সুন্দর বাঘ, ধার্মিক বাঘ.....

হঠাৎ কোথায় গেল বাঘের লজ্জা, সে রীতিমতো খেপে গিয়ে বলে -চোপরাও, কোনো মানুষের মুখ থেকে ধর্মের কথা শুনতে চাই না আমি।

-- কেন? মানুষের দোষ?

-- অনেক দোষ। সেসবের ফিরিস্তি আমি দেব না। তা ছাড়া বাঘের ধর্ম তুমি কী জান হে?

একটু বিরক্ত হয়ে দুখু বলে -আমিও তো বলতে পারি, মানুষের ধর্ম তুমি কী জান?

-- না জানলেও আমার চলে। তবু অনেক জানি। আট-দশটা সাধু-সন্ন্যিসি যে খেলাম সেগুলো গেল কোথায়। তোমাদের ধর্ম আর জানতে বাকি নেই আমার। ভগবানওলা সাধু হলে ঠিক হজম হয়ে যেত। কিন্তু প্রত্যেকটা সাধু খাবার পর আমার পেট খারাপ হয়েছে। এখন আর সেধে দিলেও সাধু আমি খাই না।

-- সে তুমি দাড়িগোঁফসুদ্ধু খেয়েছিলে বলে.....

-- থাক, আমাকে আর সাধু খাওয়া শেখাতে হবে না। ভগবানে সত্যি সত্যি মন থাকলে তারা অত গুরুপাক হয় না।

-- খুব যে বড়ো বড়ো কথা। বেশি চালাকি ভালো না।

বাঘ মুচকি হেসে বলে -তা বোকা মানুষের চাইতে চালাক বাঘ কি খারাপ?

-- আসল কথাটা হচ্ছে, দুখু বিরক্তভাবে বলে, কথার প্যাঁচ খেলে ধবলীর ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইছ তুমি। আমার গোরু ফেরত দেওয়ার ইচ্ছে তোমার নেই।

-- তোমার গোরু? গোরু কি একটা জিনিস যে সে কারুর হবে। গোরু গোরুর। যেমন আমি আমার, তুমি তোমার।

-- তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না আমি। তোমাকে আমি যা ভেবেছিলাম তুমি মোটেই তা নও। তুমিও আমাদের গাঁয়ের নগেন জোতদারের মতোই। পরের সম্পত্তি গায়েব করবার তালেই আছ। আমি চললাম।

বলে গটগট করে হাঁটতে শুরু করে দুখু।

-- দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাঘ একটু সরে দুখুর রাস্তা আটকে দাঁড়ায়, বাঘ জাতির সম্পর্কে অত খারাপ ধারণা নিয়ে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না। দুনিয়ার কোনো বাঘই নগেন জোতদারের মতো খারাপ নয়। জান, ওকে আমি একবার ধরেছিলাম, তা লোকটার গা থেকে এমন ছুঁচোর মতো গন্ধ বেরোচ্ছিল যে খাওয়া দূরের কথা মাঝপথেই ওকে ফেলে দিয়ে আমি চলে এসেছিলাম।

-- ও, তুমিই তাহলে সেই বাঘ যে নগেন জোতদারকে ধরেছিল? একটু যেন খুশি হয়েই দুখু বলে।

-- যাক, কাজের কথাটা শোনো এবার, তুমি ধরেছ ঠিকই, ধবলী আমার হেপাজতেই আছে। তাকে আমার বড়ো দরকার, তোমারও দরকার বুঝতে পারছি। চলো, দেখা যাক দু'জনেরই সুবিধেমতো ব্যাবস্থা একটা করা যায় কি না।

একটু ভেবে বাঘের কথায় রাজি হয় দুখু। নেই-মামার চেয়ে কানা মামা যেমন ভালো, তেমনি নেই-গোরুর চেয়ে অল্প-গোরুও মন্দের ভালো।

আগে আগে দুখুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে বাঘ।

অনেকটা পথ গিয়ে মস্ত বড়ো একটা বট গাছের নীচে ধবলীর দেখা পায় দুখু। ধবলী বসে বসে চোখ বুজে জাবর কাটছিল। সামনে কচি কচি ঘাসপাতার ছোটো একটা পাহাড়।

ধবলীকে দেখেই ভেউভেউ কান্না জুড়ে দেয় দুখু -ওরে আমার ধবলী-মাগো, আমায় ছেড়ে এ তুমি কোথায় এলে গো.....

দুখুর কান্না শুনে ধবলীও চোখ মেলে ডুকরে কেঁদে ওঠে -আঃ আঃ আঃ আঃ.....ম্...বা। ওরে আমার বাবুসোনা দুখু রে, এ তোমার কী হাল হয়েছে রে.....

পা ছড়িয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দুখু বলে -মা যাকে ছেড়ে যায় তার হাল এর চাইতে আর কী ভালো হবে?

তখন ধবলী এগিয়ে এসে বসে-থাকা দুখুর গলা সামনের একখানা পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে চকাৎ চকাৎ করে গাল চেটে আদর করতে থাকে।

একটু শান্ত হয়ে দুখু বলে—তুমি এখানে এলে কী করে ধবলী-মা?

-- সে এক বিত্তান্ত, ধবলী বলতে থাকে, সেদিন মনটা কেন জানি না খুব উদাস-উদাস লাগছিল, আর কেত্তন গাইতে ইচ্ছে করছিল। ভাবলাম একটু গলা ছেড়ে কেত্তন গাইতে পারলে মনটা হয়তো ভালো হবে। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে গাই কী করে? তুমি তো জান বাবা দুখু, গাইকে গাইতে দেখলে কী কান্ড শুরু করত মানুষগুলো। তোমার সঙ্গে কথা কই কত সাবধানে। তাই ভাবলাম, বনের ভেতর একটুখানি গিয়ে গান গেয়ে আসি.....

-- বুঝলাম, তারপর ওই বেঘোব্যাটা তোমাকে দেখতে পেয়ে এখানে ধরে নিয়ে এল, দুখু বলে।

বাঘ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল, দুখু তাকে বেঘোব্যাটা বলায় সে রেগে বলে—খবরদার দুখু, বাঘকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখো, নইলে মুন্ডুটা ঘাড়ের ওপর থাকবে না।

-- আহা বাঘা, মিথ্যে মিথ্যে রাগ করে না। দুখুর মনের অবস্থাটা তোমার বোঝা উচিত। ধবলী বলে।

--তুমি বললে বলে ধবলী-মা, নইলে ওর কপালে আজ দুঃখু ছিল—বাঘ বলে। দুঃখে অভিমানে ছলছল করতে থাকে দুখুর চোখ দুটো।

সে বলে—দুখুকে আর দুঃখু দেখিয়ে কী হবে। একজন আদর করে ডাকছেন বাঘা, আর একজন এর মধ্যেই বানিয়ে দিয়েছেন ধবলী-মা! আমি তো এখন একটা কাঁচকলারও অধম.....

বলতে বলতে ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলে দুখু।

ধবলী আবার তাকে আদর করে ঠান্ডা করে।

দুখু চোখ-টোখ মুছে বলে–তাহলে বাড়ি চলো এবার।

বাঘ খেঁকিয়ে ওঠে–মাইরি আর কী, উনি বললেন আর অমনি ধবলী-মা চলল ওনার পিছু পিছু।

শাসনের সুরে ধবলী বলে–ও কী হচ্ছে বাঘা, ছোটোলোকের মত মাইরি-টাইরি?

-- ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাঘ লজ্জা পেয়ে বলে, মানুষ খেয়েই ওসব শেখা, আর কখনো বলব না। কিন্তু দুখু তোমাকে নিয়ে যেতে চায় কেন?

দুখু বলে–বাঃ চমৎকার কথা। আমার মা–আমি খাইয়ে পরিয়ে, তেল মালিশ করে, দলাইমলাই করে মানুষ করলাম। আর উনি এখন উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।

বাঘ একরোখাভাবে বলে–সে তুমি যা-ই বল। মানুষ লোভের বশে এর চাইতে অনেক বড়ো বড়ো অন্যায় করে। আমি তো শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছোট্ট একটা অন্যায় করেছি। এতে আমি কোন দোষ দেখি না। সত্যি বলতে কী, ধবলী-মা'র দুধ খেয়ে তিন-চার দিনেই আমার অম্বল অনেকটা কম।

-- আসল কথাটা হচ্ছে, দুখু বলে–তুমি একটা অতি বজ্জাত স্বার্থপর বাঘ। আমার মুখের দুধ তুমি কেড়ে খাচ্ছ, আমার মায়ের ভালোবাসা আমাকে পেতে দিচ্ছ না। দুখুর জীবনে এখন শুধু কচুসেদ্ধ আর দুঃখু। তবে বলে যাচ্ছি, তুমিও শোনো ধবলী-মা, এ সুবিধের বাঘ নয়, এখন মা-মা করছে, কিন্তু যখন তুমি আর দুধ দিতে পারবে না, ও তোমাকেই খাবে।

-- ছি, ছি, বাঘ কানে থাবা দেয়, বাঘেরা মানুষের মতো খারাপ নয়, তারা মাকে খায় না।

-- আর মানুষ বুঝি মাকে খায়? দুখু বলে।

-- তা ঠিক খায় না বটে, তবে অনেকরকমভাবেই মানুষ মানুষকে খায়। ঠকিয়ে খায়, মেরে খায়.....

-- বাঘের বাঘামো সহ্য হয়, কিন্তু পাকামো মোটে সহ্য করা যায় না, গম্ভীর মুখে দুখু বলে, আমি তোমার কাছে জ্ঞান নিতে আসিনি বাঘ।

ধবলী একপাশে দাঁড়িয়ে জাবর কাটতে কাটতে চুপ করে দুখু আর বাঘের তর্ক শুনছিল।

কী ভেবে হঠাৎ সে বলে–বারবার বাঘ বাঘ বললে ভারি বিচ্ছিরি শোনায়। বাঘার একটা নাম রাখা দরকার।

বাঘ বলে–শুনেছি অনেক বাঙালি আছে যাদের বাবু না বলে সাহেব বললে খুশি হয়। সুন্দরবনের বাঘেরা ওরকম নয়, তাদের সিংহ বললেও তারা খুশি হয় না, বরং রাগ করে। আমরা নিজেদের ছোট ভাবি না। তবে নাম একটা রাখতে চাও রাখতে পার।

-- তোমরা কোনো নাম-টাম রাখ না? দুখু জিজ্ঞেস করে।

-- না।

-- কীভাবে ডাকাডাকি কর তবে?

-- সে খবরে তোমার দরকার আছে বলে মনে হয় না।

-- ঠিক আছে, এখন কিন্তু একটা নাম তোমার সত্যিই দরকার। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা কইতে সুবিধে হবে। ধবলী-মা ঠিকই বলেছে।

-- হ্যাঁ...ম্...বা, ধবলী বলে–একটা নাম না হলে চলে না।

-- বললাম তো, বাঘ বলে–নাম একটা রেখে দাও।

-- আজ থেকে তোমার নাম হল নটবর। ভেবে-চিন্তে দুখু বলে।

-- ধ্যুৎ, খ্যাঁক করে ওঠে বাঘ, বাঘের নাম নটবর! ইডিয়ট কোথাকার।

-- ইডিয়ট! সেটা আবার কী?

-- ওটা একটা ইংরিজি কথা। সাহেব না খেলে বোঝা যায় না। সেবার লঞ্চডুবি হয়ে দুটো সাহেব সাঁতরে পাড়ে এসে উঠল। দুটোকেই খেয়ে ফেললাম। তারপর থেকে ইংরিজিটা ভালোই আসে আমার।

-- ওঃ, দুখু বলে, খেয়ে-শেখা! তারই এত দেমাক, পড়ে-শেখা হলে না জানি কী হত। তা, নিজের নামটা নিজেই কেন ঠিক করো-না বাপু।

বেশ বোঝা গেল ইংরিজিটা একদম না জানা থাকায় দুখুর খুব অপমান হয়েছে।

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই।

তারপর বাঘ লাজুক হাসি হেসে বলে–আচ্ছা, ধৃষ্টদ্যুম্ন হলে কেমন হয়?

দুখু বলে–খুব খারাপ হয়। ও রকম দাঁতভাঙা নাম আজকাল কেউ রাখে না। মাসখানেক ওই নাম ধরে ডাকাডাকি করলেই দাঁতগুলো সব নড়বড়ে হয়ে যাবে।

বাঘ রেগে বলে–তার আগেই আমার থাবড়া খেয়ে তুমি নি-দাঁত হবে।

ধবলী জাবর কাটা বন্ধ করে একটু নড়ে-চড়ে মাথা নেড়ে বলে–হুম্.....বা। ঝগড়া করে না। বাঘা, বানানটা জানা আছে?

বাঘা সামনের থাবা দিয়ে মাথা চুলকে বলে–না.....মানে.....বানানটা ঠিক..... তা, তোমাদের কাছ থেকে শিখে নেব।

হাই তুলে ধবলী বলে–গোরুরা বানান নিয়ে মাথা ঘামায় না। বানান শেখার দরকার হয় না তাদের। দুধ দিতে শিখলেই তাদের দিব্যি চলে যায়।

করুণ চোখে দুখুর দিকে তাকায় বাঘ।

দুখুর একটু দুঃখ হয় বাঘের জন্যে। আহা, বানান জানে না বলে সাধের নামটা নেওয়া হবে না বেচারির। অবশ্যি নামটা বড়ো খটমটে, দাঁতভাঙা নাম একখানা। উচ্চারণ করাই শক্ত। তার ওপর বানান? দুখু যুক্তাক্ষরে পৌঁছবার আগেই বাবা গেল মরে। বানান আর শেখা হল কই। ভাত-কাপড় জোগাড় করতেই জীবন শেষ।

কিন্তু কথাটা বাঘকে বললে সে কী ভাববে? হয়তো ঘেন্না করে আর কোনোদিন মানুষই খাবে না। বাঘ আবার গাঁয়ের লোক ধরে ধরে খাক তা অবশ্যি দুখু চায় না। কিন্তু নগেন জোতদারের মতো কিছু কিছু লোক আছে যাদের খাওয়ার জন্যে দু'একটা কেঁদো বাঘ থাকা ভালোই।

দুখু তাই একটু কায়দা করে বলে–ও বানানটা আমার ঠিক..... অনেকদিন হয়ে গেল কিনা.....

-- আর চালাকি করতে হবে না, আসলে তুমি যেমন বোকা তেমনি মুখ্যু। ভেবেছিলাম অম্বলটা সেরে গেলে তোমাকে খাব, তা খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। এমন একটা রামবুদ্ধুকে খেলে আমারও বুদ্ধিশুদ্ধির বারোটা বেজে যেত।

-- খবরদার বেঘো, ভয়ানক রেগে একটা দেড়গজি লাফ দিয়ে দুখু বলে, অনেক সহ্য করেছি বেঘোব্যাটার বাঁদরামি, আর নয়। অপমান সহ্য করার পাত্র আমি নই। তেমন গরুর দুধ খেয়ে মানুষ হইনি আমি।

বাঘ বাঘা-হাসি হেসে গোঁফের শলা শলা শক্ত চুলগুলি খাড়া করে বলে–কী করবি তুই আমার? তোকে থাবাও লাগাব না, কামড়াবও না, শুধু এই শক্ত করা গোঁফের খোঁচায় তোর ওই তুলতুলে ভুঁড়িটা ফট্-ফটাস্ করে দেব।

কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়! রাগে দুঃখে মরিয়া হয়ে দুখু এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছের একটা ডাল-টাল খুঁজতে থাকে। আর বাঘ মিটিমিটি হাসতে হাসতে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে দুখুর কান্ড লক্ষ করে। মানুষের মুরোদ জানতে তার বাকি নেই। একটা হরিণ হজম করার চাইতেও একটা মানুষ হজম করা সোজা। বিশেষ করে দুখুর মতো খেটে-খাওয়া গরিব মানুষগুলোকে। বড়োলোকগুলোকে দেখতে মোটাসোটা নরম-সরম হলে কী হয় ওদের মাংস কিন্তু দুখুদের মাংসের মতো মিষ্টি না, হজম করাও বেশ শক্ত। বোধ হয় খাটাখাটনি করে না বলে ওদের শরীরে মরচে জমে–যাকে ওরা বলে চর্বি। ওই চর্বিতেই পেটের গোলমাল করায়, গরহজম হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে বাঘ একটু অন্যমস্ক হয়ে পড়েছিল। অম্বলের অসুখটা শুরু হওয়ার পর থেকেই সে হজম-টজমের ব্যাপার নিয়ে আজকাল খুব মাথা ঘামায়।

এদিকে দুখু এক ফাঁকে একটা গাছের ডাল জোগাড় করে মাথার ওপর বন্‌বন্ করে ঘোরাতে ঘোরাতে তেড়ে এসেছে।

গুণ বা দোষ যা-ই বল, খুব রেগে গেলে দুখুর মুখ দিয়ে ছড়া বেরোয়। গাছের ডাল ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছড়া বলে–

কোঁদলা বাঘা সোঁদর বনের
মারতে সাধ অনেক দিনের
বাঘ পিটিয়ে বানাই ছাতু
.....

এই পর্যন্ত বলে আর মেলাতে পারে না দুখু। হাতের ডাল ঘোরে বন্‌বন্, কিন্তু ছড়ার নতুন লাইন আর বেরোয় না। অ্যাঁ অ্যাঁ করে তোতলাতে থাকে সে।

বাঘ গমগম করে হেসে ওঠে–নে নে, মেলা, মেলা, ছাতুর সঙ্গে কাতুকুতু মিলিয়ে দে। তোর কান্ড দেখে কাতুকুতু দিলে যেমন হাসি পায় তামনি হাসি পাচ্ছে আমার।

আরো খেপে যায় দুখু। এক ঘা বসিয়েই দেয় বাঘের পিঠে। কিন্তু মড়্-মড়্-মড়াৎ। ডালটাই যায় ভেঙে ।



বাঘ আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায়। দুখু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার ভাঙা ডালের খানিকটা।

বাঘ বলে–ভেবেছিলাম তোর গায়ে হাত, থুড়ি থাবা তুলব না। হাজার হোক, রক্তের না হোক দুধের একটা সম্পর্ক তোর সঙ্গে তো আমার আছে। ধবলী-মা'র দুধ খেয়েই মানুষ। কিন্তু যেরকম বাড় বেড়েছিস তাতে তোকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

বলে বাঘ উবু হয়ে বসে প্রথমে ফ্যাঁচ করে একটা শব্দ করে, তারপর ঠোঁট উলটে ওপর-নিচের দু'পাটি দাঁত দেখায় দুখুকে। দেখেই তো দুখুর আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সে পেছিয়ে যায় চার দু'গুণে আট পা।

প্রথম দিকে বাঘের হালকা মেজাজ দেখে ধবলী ভেবেছিল ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবে না। কিন্তু এখন তার ভয় হয় একটা ভয়ানক কান্ডই না ঘটে যায়!

সে তাড়াতাড়ি বাঘ আর দুখুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

-- দ্যাখো বাবারা, তোমরা দু'জনেই আমার দুধ খেয়েছ, দু'জনেই আমার ছেলের মত। তোমরা ঝগড়া-মারামারি করলে আমার কষ্ট হয় না! কোনো মা-ই চায় না তার ছেলেরা এ রকম গুন্ডা-বদমাশ হয়ে যাক।

-- দুখু হারামজাদা আমাকে মারল কেন? বাঘ বলে।

-- তুই আমাকে অপমান করিসনি? একটু সাহস পেয়ে আড়াই পা এগিয়ে এসে দুখু বলে।

ধবলী এবার শাসনের সুরে বলে -ছি ছি, লজ্জাও নেই তোমাদের? ছোটোলোকের মতো তুইতোকারি করছ, মারামারি করছ, আবার এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ! অমন যদি ফের কর তোমরা, ওই বটপাতার পাহাড় আমি একদিনে খেয়ে ভেদবমি হয়ে মরে যাব।

ধবলীর কথায় বাঘ শিউরে ওঠে, তার ল্যাজটা যেন ভয়ে টানটান হয়ে যায়, এক লাফে ধবলীর সামনে এসে তার সামনের দুই খুরে মাথা ঘষতে ঘষতে বলে–অমন কাজটিও কোরো না মা। আমি কথা দিচ্ছি আর কখনো তোমার অবাধ্য হব না।

পেছনে পেছনে দুখুও এসেছে, সে ধবলীর গলকম্বলে হাত বোলাতে বোলাতে বলে– আমিও তোমাকে কথা দিলাম না, বাঘা আমার ছোটোভাইয়ের মতো, সে আমাকে যত হেনস্তাই করুক আমি ক্ষমা-ঘেন্না করে চালিয়ে নেব।

মুখ ঘুরিয়ে বাঘ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ধবলী তাকে বাধা দিয়ে বলে–তাহলে যা থেকে গন্ডগোল শুরু–বাঘার সেই নামের ব্যাপারটাই আগে মিটিয়ে ফেলা হোক।

দুখু বলে–আমার মত আমি বলেছি। আমার নাম দুখু, বাবার নাম সুখু, ঠাকুরদার নাম ছিল বুকু। আমি সোজা নাম রাখার পক্ষে। ডাকতে সুবিধে, বানান করতে সুবিধে। বাঘা যে বলছিল ধিরিষ্টিদুম্‌বো না কী, ওতে বড়ো ফ্যাচাং।

-- দুমবো নয়, ব্যাজার মুখে বাঘ বলে, দুম্‌বো এক রকম ভেড়াকে বলে–খাবার জিনিস। যাকগে, আমি কিছু বলব না, তোমাদের যা ইচ্ছে সেই নামই রাখো।

ধবলী মোলায়েম সুরে বলে–বাঘসোনা, নটবর নামটা খারাপ না বাবা। ওটাই আজ থেকে নাম হল তোমার। দেখবে, শুনতে শুনতে তোমারও খুব ভালো লেগে যাবে। আমার কর্তার নাম ছিল হলধর। বলো, নামটা খারাপ? এই যাঃ, বলে ধবলী প্রায় আট ইঞ্চি জিব কাটে, মেয়েদের আবার সোয়ামির নাম ধরতে নেই।

-- তা, উনি এখন কোথায়? নটবর জিজ্ঞেস করে।

-- দুঃখের কথা আর কী বলব, তোমাদেরই জাতভাই কেউ গেল বছর তাকে খেয়ে .....উঃ...উঃ.....ম্‌...বা...। ডাক ছেড়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে ধবলী।

তড়বড় করে নটবর বলে ওঠে– বিশ্বাস করো ধবলী-মা, আমি ওঁকে খাইনি।

-- খেয়ে থাকলেও তুমি কোনো দোষ করনি বাবা নটবর, উনি আমার সোয়ামি হলেও তোমার তো খাবার জিনিস। কান্নাভেজা গলায় ধবলী বলে, আর সামনের হাঁটু দিয়ে চোখের জল মোছে।

ধবলীর কষ্ট দেখে বড়ো কষ্ট হয় দুখুর। আর কষ্ট পেলেই তার পদ্য পায়। সে ছেলেবেলায় শেখা একটা পদ্যই একটু অন্যরকম করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলতে থাকে–

বাঘেদের কাজ বাঘেরাই করে
সবারে ধরিয়া খায়,
তা বলে বাঘেরে ধরিয়া খাওয়া কি
মানুষের শোভা পায়।

এই করুণ পদ্য শুনে নটবর আর স্থির থাকতে পারে না, ছুটে গিয়ে ধবলীর সামনের দুই ঠ্যাং জড়িয়ে ধরে বলে– তুমি আর অমন করে কেঁদো না ধবলী-মা, এই আমি তোমার খুর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো মাংস খাব না। যদি কচি কচি দু'পেয়ে চারপেয়ে মাংসরা নিজেরাই এসে আমার মুখে ঢুকতে চায়, তবু আমি তাদের ঢুকতে দেব না। মুখে নো-এন্ট্রি টাঙিয়ে রাখব। প্রবেশ নিষেধ। ঢোকা বারণ।

বাঘের করুণ অবস্থা দেখে ধবলীর কোমল প্রাণ কেঁদে ওঠে–না বাবা নটবর, অত কষ্ট তোমার সইবে না। তুমি একে বাঘ, তায় পুরুষমানুষ। তুমি তো আর হিঁদুঘরের বিধবা নও। মাংস খেতে প্রাণে না চায় খেয়ো না, কিন্তু মাছ-টাছ খেয়ো। নইলে শরীর টিকবে না।

-- তুমি মা, নটবর বলে, তুমি যা আদেশ করবে তা-ই হবে।

দুখু এবার আসল কথাটা তোলে–সবই তো হল, শুধু কাজের কথাটা ছাড়া। এবার সেটার একটা ফয়সালা হোক। ধবলী-মা কি আমার সঙ্গে যাচ্ছে, না যাচ্ছে না?

-- ওই এক কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর আর ভাল্লাগে না। ধবলী-মা যাচ্ছে না, যাবে না। এখানেই থাকছে, থাকবে। নটবরের সাফ জবাব।

-- তবে আমি চললাম। ওই গুন্ডাটার সঙ্গে তো গায়ের জোরে পারব না।

বলে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দুখু।

-- বাবা দুখু, চেঁচিয়ে তাকে ডাকে ধবলী–ছিঃ, অমন ছেলেমানুষি করে না। আমি যা বলছি শোনো।

ধবলীর ডাকে দুখু থামে, এগিয়ে আসে কাছে।

-- শোনো বাবা দুখু, ধবলী বলে চলে–আমি বলি কী, জগৎ-সংসারে তোমারও কেউ নেউ, আমারও কেউ নেই। মানুষের সঙ্গে এতকাল থেকে তো দেখলে। তোমার বাবাকে ভালোমানুষ পেয়ে তার সব জোতজমি ঠকিয়ে নিয়ে নিল নগেন জোতদার। সেই দুঃখে সে আর বেশিদিন বাঁচল না। না খেতে পেয়ে তোমার মা-ভাই-বোনেরাও একে একে মরে গেল। শুধু কপালগুণে আমি ছিলাম বলে তুমি কোনোমতে বেঁচে রইলে। তাই বলছিলাম কি, তোমার গাঁয়ে থাকাও যা, জঙ্গলে থাকাও তা-ই। বরং নটবরকে সঙ্গী পেলে তুমি অনেক জোর পাবে। আমি তোমার গো-মা, যা বলছি তোমার ভালোর জন্যই বলছি। যদিও তোমার গো-বাবাকে ও-ই খেয়েছে, তবু ছেলে ও খারাপ নয়। এ ক'দিন আমার খুব যত্নআত্তি করেছে। আমি যা দুধ দিতে পারি তাতে তোমাদের দু'জনের বেশ ভালোই চলে যাবে। আমরা তিন জনে এখানে থাকলে কোনো কষ্ট হবে না। তা ছাড়া, গাঁয়ে আমি প্রাণ খুলে কথা কইতে পারি না, এখানে আমরা কত স্বাধীনভাবে থাকব বলো তো।

ধবলীর যুক্তি দুখুর মনে ধরে। গাঁয়ে নগেন জোতদার ছাড়া সকলেরই এখন হাড়ির হাল। সকলেরটা গায়ের জোরে কেড়ে-কুড়ে না হয় আইন-আদালত করে হাতিয়ে নিয়ে সে-ই শুধু ফুলে-ফেঁপে উঠছে। নগেন জোতদারের অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ। কিন্তু ভয়ে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না। মনে মনে অনেকটা ভেবে নেয় দুখু। এই গভীর জঙ্গলে সে যদি এসে বাসা নেয় সবাই ভাববে মনের দুঃখে সে দেশান্তরী হয়েছে, নয়তো বাঘের পেটে।

এই একটা সুযোগ নগেন জোতদারের ওপর শোধ নেবার। বাবাকে মনে পড়ে দুখুর। মনে পড়ে জমিটুকু বাঁচানোর জন্যে তার সেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো। মনে পড়ে মা-ভাই-বোনদের না-খেতে-পাওয়া শুকনো মুখগুলি, মনে পড়ে একে একে তাদের মরে যাওয়া। বুকের মধ্যে দারুণ একটা রাগ গুরগুর করতে থাকে।

দুখু বলে—বেশ, আমি রাজি। কিন্তু আমরা তিন জন হলে না হয় কথা ছিল। নটবরের বউ-ছেলে-মেয়েরা আছে না?

-- বউকে আমি পরিত্যাগ করেছি, নটবর বলে।

-- পরিত্যাগ? সে আবার কী?

-- সোজা বাংলায় খেদিয়ে দিয়েছি। অমন দজ্জাল মেয়েছেলেকে অনেকদিন সহ্য করেছি। কিন্তু সবকিছুরই একটা শেষ আছে। যেদিন ঝগড়া করতে করতে ও আমার ল্যাজ কামড়ে দিল, সেদিনই ঠিক করলাম আর নয়, দিলাম খেদিয়ে।

-- তা বেশ করেছ, দুখু বলে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা?

-- ওদের কথা আর বোলো না, সবক'টা একদম হিপি হয়ে গেছে। যা ইচ্ছে খায়, যা-তা করে, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আমিও সাফ সাফ বলে দিয়েছি, বড়ো হয়েছ এখন, যা প্রাণে চায় করোগে যাও, কিন্তু এমুখো হলে আর রক্ষে রাখব না। আমি তোমাদের মুখদর্শন করতে চাই না।

হিপি কাদের বলে তা জানা ছিল দুখুর। সাহেবদের ছেলেমেয়ে বখে গেলে তাদের হিপি বলে। একবার লঞ্চে করে কয়েকটা এসেছিল এদিকে। দুখুদের গাঁয়ে নেমেওছিল। বিতিকিচ্ছি! মাথাভরতি জটপাকানো লম্বা লম্বা চুল, মুখময় গোঁফদাড়ি। আর কী জামাকাপড়ের ছিরি! নাঃ, নটবরের সত্যিই কপাল মন্দ। ওর জন্যে যে দুখুর একটু দুঃখ না হয় এমন না।

তবু আঁটঘাট বেঁধেই সে এগোতে চায়, জিজ্ঞেস করে—কিন্তু তোমার বউ যদি আবার ফিরে আসতে চায়? কিংবা ধরো, তুমিই যদি আবার বিয়ে করে বস?

নটবর হেসে বলে—খেপেছ? একবার বিয়ে করেই ঘরকন্নার সাধ আমার মিটে গেছে। তার ওপর দিনকাল যা পড়েছে, এটা নেই, সেটা পাওয়া যায় না। সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার দরকার নেই আমার। ধবলী-মাকে পেয়েছি, তুমিও এলে। বেশ চলে যাবে তিন জনে।

-- তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার খেদিয়ে-দেওয়া বউয়ের কথাটা যে বেমালুম চেপে যাচ্ছ। সে যদি ফিরে আসে? তখন?

-- মরে যাবার পর কেউ ফিরে এসেছে বলে তো শোনা যায়নি, নটবর বিজ্ঞের মতো বলে।

-- তার মানে?

-- মানে আর কী! আমার ল্যাজে কামড় দেবে আর আমি চুপ করে সয়ে যাব, তেমন মেনিমুখো ব্যাটাছেলে আমাকে পাওনি। যেই আমার ল্যাজে দাঁত বসানো আমিও অমনি হ্যাঁচকা টানে ল্যাজ ছাড়িয়ে ঘুরে এক কামড়ে একেবারে গোড়া থেকে তার ল্যাজখানা কচাৎ.....

-- অ্যাঁ! দুখু আর্তনাদ করে ওঠে।

-- হ্যাঁ। তারপর ওই ল্যাজকাটা মেয়েছেলেকে আর কে বিয়ে করবে বলো। সেই দুঃখে ও একদিন বুনো ওল খেয়ে মরেই গেল।

ধবলী চোখ বুজে এমনভাবে বসে ছিল যাতে মনে হচ্ছিল সে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু শুনছিল সবই। হঠাৎ চোখ মেলে সে বলে—ছিঃ বাবা নটবর, মেয়েরা হচ্ছে মায়ের জাত, তারা কামড়ালেও তাদের কামড়াতে নেই। কথাটা মনে রেখো। তা বউয়ের সেই কাটা ল্যাজটা নিয়ে কী করেছ বাবা?

-- ওকথা জিজ্ঞেস করে আর লজ্জা দিয়ো না ধবলী-মা। সে আমি বলতে পারব না। নটবর থতিয়ে থতিয়ে বলে।

-- বুঝেছি, বুঝেছি, তোমাকে আর বলতে হবে না। যাক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন যাও তো, দু'ভায়ে গিয়ে আমার জন্যে দু'টি কচি কচি ঘাসের ডগা নিয়ে এসো। জঙ্গলে আসা ইস্তক খিদেটা এত বেড়ে গিয়েছে.....

বট গাছের ডালপালাগুলি যেমন ছড়ানো, তেমনি তার ঘন পাতার বাহার। গাছতলাটা সাফসুতরো করে নিয়ে গাছের মিষ্টি ছায়ায় বেশ আরামেই দিন কাটে দুখু, ধবলী আর নটবরের।

এ তো আর মানুষের ঘরসংসার নয় যে হাজার রকমের ঝামেলা আর দিবারাত্তির শুধু রুটিন বাঁধে কাজের পরে কাজ। এদের সংসারে কাজ বলতে শুধু থাকার জায়গাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, আর খাওয়া-ঘুমোনোকে যদি কাজ বলতে চাও তো বলতে পার। খাবার-দাবারের ভাবনা নেই। ধবলী এত দুধ দিচ্ছে যে দুখু-নটবর খেয়ে শেষ করতে পারে না। আর ধবলীর জন্যে নানান রকম ঘাসপাতার অভাব কী জঙ্গলে। দুখুর মাঝে-মধ্যে মুখ বদলাতে ইচ্ছে করলে খুঁজে-পেতে বুনো কুল গাব-টাব এনে খায়। আর আছে মধু। জান তো, সুন্দরবনের মধু বিখ্যাত। কত লোক চুরি করে সেই মধু আনতে গিয়ে বাঘের পেটে যায়। এদের বলে মউচোর। বড়ো গরিব এরা, তাই অমন ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে যায় মধু জোগাড় করতে।

চাকভাঙা মধুর যেমন তুলনা নেই, তেমনি নেই মউমাছির হুলেরও। কী জ্বালা রে বাবা! আর রাগিও ওরা ভীষণ। চাকে হাত পড়লে আর রক্ষে নেই। বাঘই হও আর মানুষই হও, চাক ভেঙেছ কী অমনি লাখে লাখে গিয়ে কাছে যাকে পাবে তাকেই একেবারে ছেঁকে ধরবে, খতম করে ছাড়বে একেবারে। মউচোরেরা তাই অনেকরকম কায়দাকানুন করে চাক ভাঙে। কিন্তু সেসব তো আর দুখুর জানার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত নটবরই একটা মতলব বের করে। সুন্দরবনের বাঘ সাধারণত গাছে চড়ে না, হয়তো চড়তে পারেও না। নটবর কিন্তু চটপট গাছে চড়তে পারে। কী করে সে এই বিদ্যেটা শিখেছে তা দুখু জিজ্ঞেস করেনি। তবে ওর মনে হয়েছে নটবরের অনেক বিদ্যের মতো এ বিদ্যেটাও বোধ হয় খেয়ে-শেখা।

এখন নটবরের চাক ভাঙার কায়দাটা হচ্ছে এই রকম। সে জলার কাছাকাছি কোনো গাছে একটা মউচাক বেছে নেয়। দুখুকে তার সাবধান করে দেওয়া আছে—'খবরদার, এক মাইলের মধ্যে তুমি থাকবে না। আমি যখন হালুম-হুলুম-হুল্লুম করে তিনটে ডাক ছাড়ব তখন বুঝবে অল কিলিয়ার, তখন তুমি আসবে।' নটবর গাছে উঠে বেধড়ক থাবা চালাতে থাকে মউচাকে। বাস্, মউমাছিরাও তাকে ছেঁকে ধরে সর্বাঙ্গে। কিন্তু বাঘের ঘন মোটা লোম আর শক্ত মাস্কুল থাকায় ওরা খুব একটা সুবিধে করতে পারে না। তবু জ্বলুনি-পুড়ুনি যে খুব কম হয় তা নয়। চোখ পিটপিট করে নটবর যখন দেখে যে চাক ফাঁকা, মানে সব মউমাছিই এখন তার গায়ে সেঁটে আছে, সে তখন একখানা জ্যান্ত মউচাকের মতো চেহারা নিয়ে ঝপাং করে লাফ দিয়ে পড়ে জলায়। সেখানে জল-কাদায় সারা শরীর ডুবিয়ে শুধু নাকের ফুটো দুটো জলের ওপর তুলে রাখে শ্বাস নেবার জন্য। একটু পরেই মউমাছিগুলো দম বন্ধ হয়ে যায় মরে। তখন জলা থেকে উঠে নটবর হাঁক ছাড়ে—হালুম-হুলুম-হুল্লুম। ডাক শুনে ছুটে আসে দুখু। প্রথমে সে যত্ন করে নটবরের গা পরিষ্কার করে দেয়। তারপর গাছে উঠে চাক নামিয়ে আনে। চাক ভেঙে মধু বার করা হয়। সেই মধু মজা করে খায় ওরা তিনজনেই।

এ তো শুনলে শুধু একটা। সময়ের তো অভাব নেই ওদের। এমনি আরো কত মজার মজার নতুন নতুন কান্ডই করে ওরা। সব কথা লিখতে গেলে একখানা মহাভারত হয়ে যাবে। মোদ্দা কথা, খুব ফুর্তিতে আর আরামে আছে ওরা।

নটবরের অম্বলের অসুখ ভালো হয়ে গেছে। তবু তার যে কথা সেই কাজ। সেই যে ধবলীর খুর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো মাংস খাবে না, সেকথার কোনো নড়চড় হয়নি। মাংসে এখন তার ভীষণ অরুচি। কিন্তু বরাবরের আঁশ খাওয়ার অভ্যেসটা একেবারে ছেড়ে দিলে শরীর কমজোর হয়ে যেতে পারে বলে ধবলী পীড়াপীড়ি করায় মাঝে মাঝে খাল থেকে ধরে এনে একটু-আধটু মাছ-টাছ খায়। তাও আঁশটে গন্ধ লাগে বলে গাঁদালপাতার সঙ্গে মিশিয়ে খায়। এ বুদ্ধিটা দুখুর দেওয়া। তোমরা নিশ্চয়ই গাঁদালপাতার গন্ধটা জান। এমন গন্ধ—শুধু মাছের আঁশটে গন্ধ কেন, দুনিয়ার সব গন্ধই ও চেপে দিতে পারে। অনেকের মতে গন্ধটা বিটকেল, নটবরের মত অবিশ্যি তা নয়। কেননা, গাঁদালপাতা পেটের পক্ষে খুব ভালো, আর যা পেটের পক্ষে ভালো তা নটবরের কাছে ভালো হতে বাধ্য।

এই দ্যাখো, কী কথায় কী কথা এসে যাচ্ছে। যাকে বলে ধান ভানতে শিবের গীত। আমার বলার কথাটা এই, জঙ্গলের নতুন সংসারে দুখু, ধবলী আর নটবর মিলে-মিশে ভারি সুন্দর আছে।

মানুষকে যদি খাওয়া-পরা নিয়ে খুব বেশি ভাবতে না হয় তাহলে সে কী করে? যার যেমন ক্ষমতা ভালো কাজ করার চেষ্টা করে, তা-ই না? কারো কারো মনের ভেতরে অনেক সুন্দর সুন্দর ইচ্ছে লুকোনো থাকে, অনেক

গুণ চাপা থাকে, সময় সুযোগ পেলে কত ভালো কাজই না মানুষ করতে পারে! কিন্তু খিদে নিয়েই যদি মানুষ সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে তখন এইসব সুন্দর ইচ্ছে আর গুণগুলি শুকিয়ে যায়, মরে যায়।

দুখু ধবলী আর নটবরের সংসারে কোনো কিছুর অভাব না থাকায়, আর নিজেদের মধ্যে খুব ভাব-ভালোবাসা মন-বোঝাবুঝি গড়ে ওঠায়, ওদের মনে এসেছে শান্তি আর আত্মবিশ্বাস। ওদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে গুণগুলি ছিল, এখন প্রচুর অবসর পেয়ে সেগুলির চর্চায় ওরা মেতে ওঠে।

আগে শুধু রেগে গেলে আর দুঃখ পেলেই দুখুর মুখ দিয়ে ছড়া বেরোত। অবশ্যি এ অভ্যেসটা দুখু যে পাঠশালে দু'বছর তিন মাস পড়েছিল সেখানকার পন্ডিতমশায়ের কাছ থেকে পাওয়া। পন্ডিতমশায় পাঠশালে যত না পড়াতেন ঘুমোতেন তার চাইতে ঢের বেশি। ছেলেদের গোলমালে যদি তাঁর কাঁচাঘুম ভেঙে যেত তাহলে আর রক্ষে ছিল না। হাতের কাছে যাকে পেতেন তার পিঠেই একচোট হাতের সুখ করে নিতেন। হাতের সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলত তাঁর, গরম গরম ছড়া বলে যেতেন অনর্গল। তাঁর একটা প্রিয় ছড়া ছিল এই রকম–

মনে মনে বিপদ গনি
তোর ঘাড়ে চেপেছে শনি,
শনি যখন দিবে টান
ভেঙে যাবে পিঠখান।

সে যা-ই হোক, লেখাপড়া পন্ডিতমশায়ের কাছ থেকে কতখানি শিখেছিল দুখু তা না বলাই ভালো, তবে রেগে গেলে ছড়া বলার এই গুণটা পেয়েছিল। এতকাল দুখু ছড়া-পদ্য নিয়ে কিছু ভাবেনি, রেগে গেলে বা দুঃখ পেলে আপনা-আপনি যা তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত তার বেশি কিছু না। এখন কিন্তু অনেকসময়েই তার ছড়া-পদ্য পায়। সে মনে মনে সেগুলো আওড়ায়, যেটা মনে ধরে মুখস্থ করে রাখে, পরে ধবলী-নটবরকে শোনায়, শুনে ওরা তারিফ করে।

খিদের ভাব থেকে দুখুর তৈরি একটা ছড়া–

বাঘা ভাই ছুটে আয়
বড়ো যে রে খিদে পায়,
আরো চাই আরো খাই
দুধ চাই মধু চাই
খাই খাই আইঢাই
খেতে খেতে মরে যাই
আহা রে
তা তা ধিন্ ধিন্ ধিন্
ধিনা রে।

কিন্তু দুখুর যে পদ্যটা ওদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে, যেটাতে সুর দিয়ে ওদের পারিবারিক সংগীত হিসেবে গাইবার কথা ভাবা হচ্ছে, সেটা এই রকম–

আমরা তিনজনা
দেখতে শুনতে যেমনই হই
মনেতে একমনা।

ধবলীর সুরের কান গানের গলা বরাবরই ভালো। কিন্তু গাঁয়ে থাকতে গলা ছেড়ে গাইবার উপায় ছিল না বলে অমন গলাটা তার নষ্ট হয়েই যাচ্ছিল। এখন খোলা গলায় রেওয়াজ করে করে কী খোলতাই আর মিষ্টি গলাই না হয়েছে! দুখুর গানটা অদল-বদল করে সুর দেয় ধবলী–

হাম্বা হাম্বা হাম্বা
আমরা তিনজনা
দেখতে রকম রকম বা...
দেখতে শুনতে যেমনই হই
মনে একই রকম বা...
মিলে-মিশে আছি যেন
দুধ মধু আর রম্ভা...
হাম্বা হাম্বা হাম্বা.....

তার পদ্যটার খোলনলচে সব এভাবে পালটে দেওয়ায় প্রথমটা দুখুর মনে একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু প্রাণমাতানো সুরে ধবলীর মুখে গানটা শুনে একটুও আর দুঃখ থাকে না তার। এটা হয়ে ওঠে তাদের পারিবারিক সংগীত। গাছতলায় বসে, নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই ওরা গানটা গায়। ধবলীর গম্ভীর সুরেলা গলার সঙ্গে দুখুর গলার মিহিতান মিলে কী চমৎকারই না শোনায়! নটবরও মাঝে মাঝে গলা মেলাতে চেষ্টা করে। তবে গলাটা তার বাংলা গানের পক্ষে তেমন সুবিধের না। দুখু আর ধবলী তাকে কিন্তু খুবই উৎসাহ দেয়। তবে গাইতে শুরু করে নিজেই সে লজ্জা পেয়ে হঠাৎ আবার থেমে যায়।

কিন্তু নটবরের একটা গুণের খবর হঠাৎই পেয়ে যায় ওরা।

একদিন দুপুরে পেট পুরে দুধ আর গাঁদালপাতা দিয়ে মাছ খেয়ে একটু পরেই মাতলামো করতে শুরু করে নটবর। এলোমেলো পা ফেলছে, কথা যাচ্ছে জড়িয়ে, অর্ধেক কথার মাথামুন্ডু নেই কিছু।

ভয় পেয়ে ধবলী বলে–হ্যাঁ বাবা দুখু, মরে-টরে যাবে না তো নটবর? কিংবা যদি পাগল-টাগলই হয়ে যায়?

-- না, না, দুখু ধবলীকে ভরসা দেয়, খাবারে বিষ-টিষ কিছু থাকলে এতক্ষণে যন্ত্রণায় ও অস্থির হয়ে পড়ত। আসলে ওই গাঁদালপাতার সঙ্গেই বুনো সিদ্ধির পাতা-ফাতা কিছু ছিল হয়তো। ভুল করে তা-ই খেয়েই ওর নেশা হয়ে গেছে। চলো, ওকে নিয়ে নদীর ধার থেকে বেড়িয়ে আসি। খোলা হাওয়ায় নেশা ছুটে যাবে এক্ষুনি।

নদীর ধারে তিন জনে ওরা বেড়ায়। জনপ্রাণী কেউ কোথাও নেই। হু হু করে মিঠে হাওয়া ছুটছে। ধবলী আর দুখু সামনে, পেছনে বেতালা পা ফেলতে ফেলতে নটবর। ওর এখনো বেশ নেশা আছে। কিন্তু অসুস্থতার আর কোন লক্ষণ নেই দেখে ধবলী এখন নিশ্চিন্ত।

নেশার ঝোঁকে নটবর একবার পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে যায়। ধবলী ছুটে গিয়ে বলে– শরীর খারাপ লাগছে বাবা? বাড়ি যাবে? বলে নিজের ল্যাজ বাড়িয়ে নটবরকে ধরে উঠতে সাহায্য করে।

নটবর উঠে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় বলে–কেয়া বোলা? শরীর খারাপ? কভি নেহি। দেখো, হাম আভি নাচেগা। দুখুভাই, হাম বাঘ কা নেহি, মানুষকা নাচ নাচেগা।

বলে পেছনের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সত্যি সত্যিই নাচতে শুরু করে নটবর। উঁচু-করা সামনের দু'পায়ে চলে হাতের কাজ। হাত-পায়ের কাজ, ঘাড়-কোমর দোলানো, মুখ-চোখের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় নাচে সত্যিই এলেম আছে নটবরের। ধবলী তো বিভোর হয়ে খুর ঠুকে ঠুকে তাল দিতে থাকে। দুখুও মনে মনে স্বীকার করে মানুষের নাচ মানুষের মতোই নাচতে পারে নটবর। কীভাবে শিখেছে সেটা বড়ো কথা নয়!

নটবর নাচতে নাচতেই বলে–এতনা্ টাইম তুমলোক যো নাচ্না দেখা উস্কা নাম হ্যায় কত্থক। আভি দেখো মণিপুরি...

নতুন ধাঁচের নাচ শুরু করে নটবর। অবাক হয়ে ওর কান্ড দেখে দুখু আর ধবলী। পরের পর কত নাচই না নেচে চলে নটবর। সবশেষে টুইস্ট। ওটার ধকল আর সহ্য করতে পারে না, নাচ শেষ হওয়ার আগেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

ধবলী তো কেঁদেই ফেলে, ভাবে কী না কী হল নটবরের। দুখু দৌড়ে গিয়ে পরনের কাপড়টা জবজবে করে ভিজিয়ে নিয়ে আসে নদী থেকে।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই উঠে বসে নটবর। নেশা কেটে গেছে তার। সম্পূর্ণ সুস্থ সে এখন। প্রথম কথাই সে বলে–আমি দুদু খাব ধবলী-মা, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

--খাবে বইকী বাবা। বলে ধবলী নটবরের কাছে এগিয়ে যায়।

দুখু হাসতে হাসতে বলে–তুমি তো বড়ো চাপা স্বভাবের বাঘ হে নটবর। তুমি যে এত ভালো নাচতে পার সেকথা এতদিন বেমালুম চেপে ছিলে!

দুধ খেতে খেতে জবাব না দিয়ে লাজুকভাবে হাসে নটবর।

বর্ষা নামে। সবুজ সতেজ হয়ে ওঠে বনের গাছপালা। কত না অদ্ভুত শব্দ শোনা যায় চারিদিকে। পাতার ওপর বৃষ্টির টাপুরটুপুর, কখনো ঝড়ো হাওয়ার শনশনানি, পাখ-পাখালির বৃষ্টিভেজা ডানার ঝাপট, আর টইটুম্বুর খাল-বিলে অবিরাম চলে ব্যাংদের গাওনা–

ঘ্যাঙোর ঘ্যাং, ঘ্যাঙোর ঘ্যাং
বিষ্টি এল, প্রাণ জুড়োল
গাইছি গান, ছুঁড়ছি ঠ্যাং
ঘ্যাঙোর ঘ্যাং, ঘ্যাঙোর ঘ্যাং।



কিন্তু বনের বর্ষার রূপ যেমন মন মাতায়, তেমনি কিছু অসুবিধেও হতে থাকে ওদের। বিশেষ করে দুখু আর ধবলীর। বরাবর ঘরে থাকা অভ্যেস ওদের। বট গাছের ঘন পাতার ছাউনিও সব সময়ে পারে না বৃষ্টি ঠেকাতে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওদের প্রায়ই সর্দিকাশি হয়, গা ম্যাজম্যাজ করে। নটবরের অবিশ্যি ভ্রুক্ষেপ নেই। সে বৃষ্টিবাদলার তোয়াক্কা করে না।

শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে দুখুই কথাটা পাড়ে নটবরের কাছে–একটা ব্যবস্থা না করলে যে আর চলে না ভাই। এত জলে ভেজা আমার আর সইছে না, ধবলী-মা'রও শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

--তা ঠিক, নটবর স্বীকার করে, আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি রোদে-জলে বাঘ, আমার যা সয়, তোমাদের তা সইবে কেন। কিন্তু কী করা যায় বলো তো। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

--আমি একটা কথা ভেবেছি। আজ রাতের বেলায় একবার গাঁয়ে যাব। যদি চোরে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কোদাল আর কুড়ুলটা নিয়ে আসব। ও দুটো পেলে একটা চালা বানিয়ে নেওয়া এমন কিছু শক্ত হবে না।

--রাতে কেন? দিনের বেলায়ই যাও না। বিষ্টিতে পথঘাটের যা অবস্থা হয়ে আছে...! নটবরকে খুব চিন্তিত দেখায়।

--পাগল নাকি, দুখু বলে–দিনের বেলায় যাই আর আমাকে নিয়ে একটা হইহই কান্ড শুরু হয়ে যাক! তা ছাড়া আমার একটা মতলব আছে, তোমাকে সব বলব একদিন। আমি চাই গাঁয়ের লোক ভাবুক আমি মরে গেছি, না হয় দেশ ছেড়ে চলে গেছি।

--কথাটা খুলেই বলো-না। তুমি কি এখনো আমাকে বিশ্বাস কর না? নটবরের গলা অভিমানে ভেজা-ভেজা।

--ছি ছি, এ তুমি কী বলছ, নটবরের থাবা জড়িয়ে ধরে দুখু, তুমি আমার ভাইয়ের মতো। তোমাকে সব কথা বলতেই হবে, তোমার সাহায্যও দরকার হবে আমার। তবে বলি শোনো, ওই হারামজাদা নগেন জোতদার সর্বনাশ করেছে আমাদের। আমাদের সামান্য কিছু জমিজমা ছিল। বাবাকে ঠকিয়ে সেটুকু সে কেড়ে নিল। শুরু হল

আমাদের চরম কষ্ট। একে একে সবাই মরে গেল। পড়ে রইলাম শুধু আমি একা। গ্রামের আরো কতজনের এমন সর্বনাশ যে করেছে ব্যাটা...

--ইস্, আপশোশে থাবা কামড়ায় নটবর, এমন জানলে গন্ধ হোক আর যা-ই হোক নাক টিপে খেয়েই ফেলতাম ব্যাটাকে। ধরেও ছেড়ে দিতাম না।

--সে যা হবার হয়ে গেছে। এখন নতুন করে মওকা আর একটা পাওয়া গেছে। ওরা ভাবছে আমি মরেছি, আমি এই সুযোগে এমন ফন্দি একখানা আটব না.....

--কী ঠিক করেছ?

--এখনও কিছু ঠিক করিনি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সুযোগ একটা না একটা এসে যাবেই।

--আলবত, নটবর জোর দিয়ে বলে, চেষ্টা থাকলে সব কাজেই সফল হওয়া যায়। আর জেনো, সুন্দরবনের জব্বর বাঘ এই নটবর সব সময়ে সঙ্গে আছে তোমার। দরকার হলে জান লড়িয়ে দেব আমি।

আবার হাতে থাবার জড়াজড়ি হয়।

--তাহলে, আজ রাতে গাঁয়ে যাবার কী ব্যবস্থা করা যায় বলো তো? দুখু জিজ্ঞেস করে।

--এ আবার একটা সমস্যা নাকি? তুমি আমার পিঠে চেপে গলা জড়িয়ে বসে থাকবে, আর দেখতে না দেখতে পৌঁছে যাবে বনের শেষে। আমি তোমার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করে থাকব, তুমি চুপি চুপি গিয়ে কাজ সেরে ফিরে এলেই আবার নিমেষে তোমাকে নিয়ে চলে আসব এখানে।

দুখুর একটু লজ্জা-লজ্জা করে—অতটা পথ আমাকে পিঠে নিয়ে দৌড়তে কষ্ট হবে না তোমার?

--তুমি আমাকে হাসালে দেখছি, নটবর বলে—সেই মাংস খাওয়ার যুগে বড়ো বড়ো গোরু-মোষ পিঠে ফেলে নিয়ে আসতাম কী করে? মাংস আর খাই না বলে দুগ্‌লা হয়ে গেছি ভাবছ নাকি? না হে না, ধবলী-মা'র দুধের গুণ মাংসের চাইতে ঢের বেশি।

ধবলীকে কথাটা জানাতে সে ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলে—ওমা, রাতে আমি একলা থাকব কী করে? আমার ভয় করবে না বুঝি!

--কিচ্ছু ভয় নেই ধবলী-মা, ধবলীকে সাহস দেয় নটবর, নটবরের এলাকায় ঢুকবে তেমন বুকের নেই কারুর। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ো। আমরা তো যাব আর আসব।

রাত ঘুরঘুট্টি আঁধার হতে দুখু আর নটবর বেরিয়ে পড়ে। বৃষ্টিটা ধরেছে। ওদের একটু সুবিধে হয়।

--শোনো, দুখুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় নটবর, বাঘের পিঠে চাপা শক্ত মোটেই না। নিজের পিঠের প্রশংসা নিজে করা ভালো দেখায় না। কিন্তু বলতে কী, আমাদের পিঠের মতো পিঠ দুনিয়ায় কোথাও পাবে না তুমি।

--তবে যে লোকে বলে বাঘের পিঠে চাপা এক ভয়ানক ব্যপার?

--আরে, সে তো আমরা কাউকে পিঠে চাপতে দিতে চাই না বলে।

--কেন, চাও না কেন? তাতে তো তোমাদের পিঠের সুনামই আরো বেড়ে যাবে।

--কিন্তু মানসম্মানটা যে নষ্ট হবে। বাঘ বলে কথা! লোকে বলবে একটু পিঠ চুলকে দিলেই বাঘের পিঠে চড়া যায়। তোমার প্রশংসা করাকে পিঠ চুলকে দেওয়া বল না?

--হ্যাঁ, কিন্তু আমিও তো একটা মানুষ। আমাকে পিঠে চড়ালে বাঘ জাতির সম্মান নষ্ট হবে না?

--না, হবে না। তুমিও দুঃখী, আমিও দুঃখী। দুঃখ আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে, জাত-টাতের কথা ওঠেই না। জানবে দুঃখীরা সবাই এক, তাদের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, তারা সবাই দুঃখী।

--কিন্তু তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ তো এক নয়। দুখু বলে।

--তলিয়ে দেখলে একই। আমার বউটা যে দিবারাত্তির আমার সঙ্গে ঝগড়া করত সে কি শুধু তার স্বভাবের দোষ? তা নয়। লোভী মানুষগুলো জঙ্গলের সব জন্তু-জানোয়ার মেরে খতম করে দিতে লাগল। আমি হন্যে হয়ে খাবার খুঁজে বেড়াই। কোনোদিন পাই, কোনোদিন পাই না। ছেলেপুলেগুলো দিনরাত খাবারের জন্য ঘ্যানঘ্যান করে। দুটো বাচ্চা খিদের জ্বালায় একলা একলা খাবার খুঁজতে বেরিয়ে শিকারিদের ফাঁদে ধরা পড়ে গেল। আমি নজর রাখতে পারি না বলে অন্যগুলো বখে যেতে লাগল। দিনে দিনে আমার বউয়ের মেজাজও হয়ে উঠতে লাগল তিরিক্ষি, ছুতোনাতায় কেবলই ঝগড়া করে আমার সঙ্গে। অভাবে স্বভাবটাই খারাপ হয়ে গেল তার। তবেই দ্যাখো, আমাদের দু'জনের দুঃখে মিল আছে কি না। আমাদের দুঃখ কোন ঠাকুরদেবতার দেওয়া নয়। একদল মানুষের লোভেই আজ আমাদের এই অবস্থা—বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল নটবর, হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলেই চলবে? নাও, উঠে পড়ো পিঠে, শিগগির। বাঃ, ঠিক আছে। এইবার সামনের দিকে ঝুঁকে একেবারে লেপটে যাও আমার পিঠের সঙ্গে। গুড—ভেরি গুড। বেশ, এখন কষে

দু'হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরো। কক্ষনো আলগা দেবে না কিন্তু। আমি যখন ফুল স্পিড দেব, মানে খুব জোরে ছুটতে থাকব, তখন যদি পিঠ থেকে ছিটকে যাও, তাহলে কিন্তু এক্কেবারে ছাতু। আর একটা কথা, চোখ সব সময়ে বুজে থাকবে। চোখ খুলেছ কী আশপাশের গাছপালার সঙ্গে 'এই ধাক্কা লাগল, এই ধাক্কা লাগল' ভাব হবে তোমার। অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পার। কিন্তু চোখ বুজে থাকলে গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না। এমন দৌড়নোর কায়দা আমাদের। তাহলে রেডি, সেডি, গো.....

ধবলীর পিঠে দু'একবার শখ করে চড়েছে দুখু। প্রথমটায় সেই রকম একটা দুলকি চাল। কয়েক সেকেন্ড। হঠাৎ দারুণ একটা ঝাঁকুনি। দুখু দুই পা দিয়ে সাঁড়াশির মতো পেঁচিয়ে ধরে নটবরের পেটটা, হাত দুটো আপনা-আপনি আরো শক্ত হয়ে জড়িয়ে যায় তার গলায়। তারপর শনশন করে হাওয়া কেটে চলার শব্দ আর মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি। চোখ বুজে থাকায় দুখু ঠিক বুঝতে পারে না কত জোরে তারা চলেছে। শুধু ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন মনে হয় অন্ধকার গর্তের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছি, সেই রকম একটা ভাব হয় দুখুর। নটবরের নিষেধ সত্ত্বেও পিটপিট করে চোখ দুটো একবার একটু খোলে সে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আবার বুজে ফেলে। এমন অন্ধকার, মনে হয় যেন ঘন কালো জলের মধ্য দিয়ে হাঙর-কুমিরের পিঠে চেপে চলেছে সে। আর চোখ খোলবার কথা সে মনেও আনে না।

হঠাৎ আবার সেই দুলকি চাল। তবু চোখ খোলে না দুখু।

--নেমে পড়ো, নেমে পড়ো। পৌঁছে গেছি আমরা—নটবরের গলা। আস্তে আস্তে নটবরের পিঠ থেকে নেমে দুখু বলে—বাব্বা, এর নাম বাঘের পিঠে চড়া!

--কত তাড়াতাড়ি আর কত আরামে আলে বলো তো!

--তা বটে। তবে অভ্যেস নেই কিনা.....

--দু'চারবার চড়লেই অভ্যেস হয়ে যাবে। তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই। তুমি চটপট কাজ সেরে চলে এসো। আমি এখানেই রইলাম।

সরাসরি গাঁয়ের ভেতরে না ঢুকে একটা ঘুরপথ ধরে দুখু। তাঁর কুঁড়েঘরটা গাঁয়ের এক কোণে।

যেতে যেতে দুখু লক্ষ করে গাঁয়ের অন্যদিকে যেখানটায় জোতদার নগেন মন্ডলের বাড়ি সেখানটা বেশ আলো-আলো। ঢোল-কাঁসির আওয়াজ আর লোকজনের হই-হট্টগোলও বাতাসে ভেসে অল্প অল্প আসছে এদিকে। ব্যাপারখানা কী? দুখুর বড়ো জানতে ইচ্ছে করে। সে তো আর চোর-ডাকাত নয়, ইচ্ছে করলেই সোজাসুজি সে ওখানে চলে যেতে পারে। কিন্তু তাহলে সব মতলবই তার বানচাল হয়ে যাবে। আবার নিজের গাঁয়ে কী ইচ্ছে সেটা জানতেই বা কার না ইচ্ছে করে।

অন্য পথে বাঁক নেয় দুখু। বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে নগেন জোতদারের বাড়িতে যাতায়াতের পথের পাশে একটা ঘন ঝোপের পেছনে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকে। কথা কইতে কইতে হরদম লোকজন যাচ্ছে আসছে। কান খাড়া করে তাদের প্রতিটি কথা শুনতে চেষ্টা করে দুখু।

কিছুক্ষণ বসে থাকবার পরই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। ঘটা করে বনবিবির থানে পুজো দিচ্ছে নগেন মন্ডল। বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসায় বাঘের দেবী বনবিবিকে এই পুজো। একটা পা অবিশ্যি জবর জখম হয়েছে নগেন মন্ডলের, নেংচে নেংচে হাঁটে। কিন্তু প্রাণটা তো বেঁচেছে। সেই আনন্দে পুরুত-দরবেশে একেবারে ছয়লাপ করে দিয়েছে। গাঁয়ের সবার নেমন্তন্ন। দু'মণ আটার সঙ্গে দেড় মণ ভেলিগুড় আর সাড়ে সাতশো বিচিকলা মেখে সিন্নি দেওয়া হয়েছে। সিন্নি খেয়ে সবাই খুব খুশি। তা গরিবমানুষেরা যদি একদিন পেট পুরে সিন্নি খেতে পায় সে তো ভালো কথাই।

কিন্তু দুখুকে ভাবিয়ে তোলে অন্য ব্যাপার। নগেন জোতদার নাকি তার ল্যাংড়া পায়ের দিব্যি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে গাঁয়ের পাশের জঙ্গলকে সে নি-বাঘ করে ছাড়বে। কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তার দু-দু'খানা বন্দুক। চোরাগোপ্তা শিকার করে উপরি রোজগারও করে বেশ। এ কাজে তার দোসর ভিখু সর্দার। সে ব্যাটা স্বভাবে যেমন খুনে, বন্দুক চালাতেও তেমনি দড়। নাঃ, ভাবনাই কথা। নটবর আর মোটেই নিরাপদ নয়।

তাড়াতাড়ি উঠে নিজের কুঁড়ের দিকে পা চালায় দুখু।

গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। যা দু'একটা হাঁড়িকুঁড়ি ছিল চোরে সব নিয়ে গিয়েছে। তা যাক, সেজন্যে দুঃখ নেই। কোদাল আর কুড়ুলখানা থাকলেই হয়। সে দুটো ছিল গোয়ালঘরের এক কোনায়। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কিছু দড়িদড়ার সঙ্গে কোদাল আর কুড়ুলখানা ঠিক জায়গাতেই পাওয়া গেল। চোর ব্যাটা বোধ হয় আসল ঘরের অবস্থা দেখে গোয়ালঘরে আর ঢোকেইনি।

তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে দুখু বেরিয়ে পড়ে।

দুখুর দেরি দেখে নটবরও চিন্তিত হয়ে পায়চারি করছিল।

দুখুকে আসতে দেখে নটবর শুধোয়–এত দেরি হল কেন?

--সে অনেক কথা, দুখু বলে–আগে এখান থেকে পালাই চলো।

বুদ্ধিমান নটবর আর কথা বাড়ায় না। দুখুকে পিঠে নিয়ে একখানা হাওয়া-দৌড় লাগিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে নিজেদের আস্তানায়।

এসে দেখে ধবলী নাক ডাকিয়ে তোফা ঘুমোচ্ছে।

দুখু বলে–ধবলী-মাকে এখন ডেকে দরকার নেই। আগে কাজের কথাগুলো তোমার সঙ্গে সেরে নিই। আচ্ছা নটবর, বনবিবি কি সত্যিই তোমাদের দেবতা? যে মানুষের 'পরে তার দয়া থাকে তোমরা তার কিছু করতে পার না?

--বাজে কথা, বিলকুল বাজে কথা। বনবিবি-টিবি কিচ্ছু নেই। সব বানানো। কোনো বিবির দয়ায় বাঘের হাত থেকে কেউ বাঁচে না। যদি কেউ বাঁচে, সে বাঁচে হয় বাঘের ভুলে, না হয় নিজের বুদ্ধি আর সাহসে। মাঝখান থেকে বনবিবির থান বানিয়ে কিছু লোক পয়সা রোজগার করে। তা, বনবিবির খবরে অত কী দরকার তোমার?

--আছে, আছে। আজ দেখলাম গাঁয়ে নগেন জোতদার খুব ঘটা করে বনবিবির পুজো দিচ্ছে বাঘের হাত থেকে বেঁচেছে বলে। আর শুনলাম সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে এই বনকে নি-বাঘ না করে ছাড়বে না।

--বটে! গোঁফ চুমরে হাসে নটবর।

--না নটবর, ওকে অত সহজ পাত্র ভেবো না। ওর সঙ্গে আছে শাগরেদ ভিখু সর্দার। ওটাও একটা আস্ত শয়তান। এখন থেকে তুমি খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। নগেন জোতদারকে আমি বিলক্ষণ জানি। দু'চার দিনের মধ্যেই ও জঙ্গল ঢুঁড়তে শুরু করবে। আমারও এই মহা সুযোগ। এখন থেকে আমি বনবিবির মহাভক্ত বাবা দুখুরাম পীর! বলে মিটিমিটি হাসে দুখু।

দুখুর মতলব ঠিক বুঝতে না পেরে নটবর বলে–তুমি একটা কোন ফিকিরে আছ। খুলেই বলো-না সবকিছু।

--বলব, বলব, সময় হলে সব বলব। এখন শুধু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি–কাল থেকে এ জায়গা ছেড়ে একলা কোথাও যাবে না। আর এই বটগাছের গায়ে তোমার লুকিয়ে থাকার জন্য একটা খোঁদল আমি কাল বানিয়ে দেব। যখনই জঙ্গলের ভেতর থেকে আমার হাঁক শুনবে 'জয় মা বনবিবি', অমনি ওই খোঁদলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। বুঝবে বিপদ আসছে। এখন চলো দিকি, ধবলী-মাকে ডেকে তুলে খেয়ে-দেয়ে একখানা ঘুম লাগানো যাক। কাল অনেক কাজ।

অঘোরে ঘুমোচ্ছিল ধবলী। অনেক ডাকাডাকি করে তাকে ঘুম থেকে তোলা গেল।

ঘুমজড়ানো গলায় ধবলী বলে–এসেছ বাবারা! আমার কীরকম বিচ্ছিরি লাগছিল...

হো হো করে হেসে ওঠে নটবর–বিচ্ছিরি লাগলে কেউ অমন ঘুমোতে পারে নাকি!

নটবরের কথায় কান না দিয়ে ধবলী বলতে থাকে–তোমরা চলে যাবার পর একলা একলা কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল। কিছুতে ঘুম আসে না। ভেজা মাটিতে বসতেও ইচ্ছে করে না, দাঁড়িয়েই আছি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন একটু ঝিমুনি মতন এসেছে। হঠাৎ মনে হল আমার পেছনের পা দুটো অবশ অসাড় হয়ে গেছে। আর কেমন যেন স্বপ্নের মতো দেখলাম একটা কালো পেল্লায় চেহারার অদ্ভুত জানোয়ার আমার বাঁট থেকে সব দুধ শুষে খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই আমি তাকে ঠেকাতে পারছি না। তারপর যেই জানোয়ারটা আমাকে ছেড়ে দিল অমনি গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম আমি।

--স্বপ্ন, স্বপ্ন, নটবর বলে–ও নিয়ে ভাববার কী আছে? এখন খেতে দাও দিকি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! খেতে গিয়ে নটবর দেখে এক ফোঁটা দুধ নেই ধবলীর বাঁটে।

--এ কী! দুধ কোথায় গেল তোমার?

--তা তো জানি না বাবা। ধবলী বলে।

দুখুও তখন পরীক্ষা করে দেখে সত্যিই তো একটুও দুধ নেই ধবলীর বাঁটে। ভয়ানক একটা আশঙ্কা দেখা দেয় তার মনে। কিন্তু দিনের আলোয় ভাল করে পরীক্ষা না করে এখুনি কিছু বলে সে ওদের ভয় পাইয়ে দিতে চায় না। বলে–না-ই বা খেলাম দুধ একদিন। মধু তো আছে। একটা রাত মধু খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ধবলী-মা, তুমি খেয়েছ তো?

--এই তো খাব এখন। আমার খাবার আছে।

--এত রাত করে খাওয়ার অভ্যেস নেই তোমার, নটবর বলে, তুমি খেয়ে

নিলে পারতে।

--একলা একলা খেতে ইচ্ছে করে না যে।

--আমাদের মায়েদের ওই এক দোষ। ছেলেরা যেন চিরকালই শিশু, তাদের না খাইয়ে-দাইয়ে নিজের খাওয়া চলে না—দুখু মন্তব্য করে।

তারপর খাওয়া সেরে ওরা ঘুমোতে যায়। নটবর আর ধবলী ঘুমিয়ে পড়ে একটু পরেই। শুধু ঘুম নেই দুখুর চোখে। হাজারো চিন্তা তার মাথায়। মনে হচ্ছে শত্রুর সংখ্যা আর একটা বাড়ল। আর এ শত্রুও নগেন জোতদারের চাইতে কোন অংশে কম না।

ভোরের আলো ডালপালার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিতেই উঠে বসে দুখু। সারারাত সে ঘুমোয়নি। নটবর আর ধবলী তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

দুখু পা টিপে টিপে গিয়ে ধবলীর পাশে বসে। ওর ঘুম না ভাঙিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে ওর বাঁটগুলো। যা ভয় করেছিল দুখু ঠিক তা-ই। সাপের দাঁতের আঁচড়ের সরু সরু দাগ বাঁটগুলোতে। আর এ যে-সে সাপ নয়। বড়ো জাতের কেউ একজন। তিনিই এসে দুধ খেয়ে গেছেন কাল। ধবলী যে অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা বলছিল সেটা মিথ্যে নয়। কোনো কোনো বড়ো সাপের এই ক্ষমতা আছে। তারা চোখে চোখে তাকিয়ে অন্য অনেক প্রাণীর বুদ্ধিশুদ্ধি বিকল করে দিতে পারে এমন কথা শোনা যায়।

দুখু ভাবে—সাপের কাছে দুধের লোভ বড় লোভ। একবার যখন ধবলীর দুধের স্বাদ সে পেয়েছে, এখন থেকে শুধু তক্কে তক্কে থাকবে। নটবরকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। সব সময় ধবলী-মাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

একটু পরে ঘুম ভাঙে ধবলী আর নটবরের। আজকের সকালটা ভারি সুন্দর। একদম বৃষ্টি নেই। ঝকঝকে রোদ্দুরে বনের সবুজ যেন ঝিলিক দিচ্ছে। সারাটা দিন এমন থাকলে হয়। অনেক কাজ আজ করতে হবে দুখুকে।

আশেপাশে অনেক বড়ো বড়ো গাছ, বাঁশঝাড়। দুখু পছন্দমতো কিছু বাঁশ আর গাছের ডাল কেটে নেয়। বেনাঘাসের বনও কাছেই। পাঁজা পাঁজা বেনাঘাস কেটে লতা দিয়ে বেঁধে বান্ডিল করে দেয় দুখু। নটবর দাঁতে করে নিয়ে আসে ওদের গাছতলায়।

দুখু প্রথমে কোদাল দিয়ে মাটি তুলে তুলে খানিকটা জায়গা বেশ উঁচু করে নেয়। বৃষ্টি হলেও জল গড়িয়ে এসে ওই জায়গাটা ভিজিয়ে দিতে পারবে না। ওরা ওখানে ঘুমোতে পারবে, বসতে পারবে। তারপর চার কোণায় চারটে খুঁটি পুঁতে মস্ত একটা চালা তৈরি করে ওই বেদির ওপর। ছাউনির কাঠামোটা বানায় বাঁশ দিয়ে, তার ওপর ঘন করে বেনাঘাস বিছিয়ে শক্ত করে লতা দিয়ে বেঁধে দেয়। বটপাতার বুনুনির ফাঁক দিয়ে যেটুকু বৃষ্টির জল গড়িয়ে আসতে পারবে তা আটকে যাবে বেনাঘাসের ছাউনিতে। বেনাঘাসের গন্ধটাও ভারি মিষ্টি।

তারপরের কাজ নটবরের জন্য লুকোবার একটা জায়গা তৈরি করা। বটগাছের গুঁড়িটা পেল্লায়। কুড়ুল চালিয়ে গুঁড়ির গায়ে ঝটপট একটা গর্ত কেটে ফেলে দুখু। গর্তের ভেতরটা যথেষ্ট বড়ো করা হয় যাতে নড়াচড়া করতে পারে নটবর। কিন্তু মুখটা এমনভাবে করা হয় যাতে কোনরকমে শুধু ঢোকা-বেরনো চলতে পারে। উদ্দেশ্য গর্তটা যাতে কারুর চোখে না পড়ে। দুখু আর নটবর আলোচনা করে ঠিক করে ধবলীর খাবারদাবার স্তূপ করে রাখা হবে গর্তের মুখটায়। বাইরে থেকে গর্তটাকে দেখাই যাবে না।

এই গর্ত কাটার ব্যাপারটা ভালো লাগে না ধবলীর। তবে কি কোন ভয়ের কারণ ঘটেছে?

সে দুখুকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ বাবা দুখু, কী হয়েছে বলো তো। ওই গর্তটা কাটলে কেন?

দুখু ভেবে দেখে সাপের ব্যাপারটা কখনই ধবলীকে বলা চলে না, তাহলে ভয়েই সে মরে যাবে। কিন্তু নগেন জোতদারের ব্যাপারটা লুকোনো ঠিক হবে না। তা ছাড়া, ধবলি ভীতু হলেও বোকা নয়। দুখু কালকের সব কথা খুলে বলে ধবলীকে।

শুনে ভয়ে ধবলীর মুখ ঝুলে পড়ে, শব্দটি বেরোয় না তার মুখ থেকে।

দুখু তাকে ভরসা দিয়ে বলে—তুমি মিছেমিছি ভেবে শরীর-মন খারাপ কোরো না। নগেন কিচ্ছু করতে পারবে না নটবরের। উলটে সে-ই ঘায়েল হয়ে যাবে। তুমি আমার বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখো।

তারপর চোখের ইশারা করে নটবরকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে বসে দু'জনে যেন দিনের কাজের শেষে বিশ্রাম আর খোশগল্প করতে বসেছে দুই বন্ধু।

আসলে সাপের কথাটা পাড়বার জন্যই নটবরকে ডেকেছে দুখু।

--মন দিয়ে শোনো নটবর, খুব দরকারি কথা। আর খবরদার, ধবলী-মা যেন একটি কথাও জানতে না পারে। কাল বড়ো জাতের কোন সাপ এসে ধবলী-মা'র দুধ খেয়ে গেছে। তাই আমরা দুধ পাইনি।

--সে কী!

--হ্যাঁ, সকালবেলায় আমি খুব ভালো করে ধবলী-মা'র বাঁট দেখেছি। তোমরা তখন ঘুমোচ্ছিলে। সাপের দাঁতের আঁচড়ের স্পষ্ট দাগ। ও ভুল হবার নয়।

--কিন্তু কোন্ সাপের এত সাহস? আমার এলাকায় ঢুকে আমাদেরই আস্তানা থেকে আমাদেরই ধবলী-মা'র দুধ খেয়ে যায়? হাল্...লু...

দুখু দু'হাতে মুখ চেপে ধরে নটবরের। গর্জনটা বেরোতে দেয় না।

--হচ্ছেটা কী, দুখু বকুনি দেয় নটবরকে, চ্যাঁচামেচি করে কী লাভটা হবে শুনি! মাঝখান থেকে ধবলী-মা সব জেনে ফেলবে। তুমি বুদ্ধিমান বাঘ, তোমার এরকম বোকামি করা সাজে না।

--ঠিক আছে, ঠিক আছে, হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে নটবরের, এ নিশ্চয় সেই হতচ্ছাড়া কালকেউটের কাজ। দেখাচ্ছি মজা শয়তানটাকে।

--দাঁড়াও, দাঁড়াও, দুখু বলে—অত তড়বড় করে কোন কাজ হবে না। মনে রাখতে হবে দু-দুটো জাঁদরেল শত্তুর আমাদের। ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে নিকেশ করতে হবে ওদের। শোনো, কাল থেকে গাছতলা ছেড়ে এক পা-ও নড়বে না তুমি। আমি ঘুরে খোঁজখবর রাখব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আর মনে থাকে যেন, যেই শুনবে 'জয় মা বনবিবি' বলে আমার হাঁক, অমনি গিয়ে লুকোবে গর্তে। খবরদার, আমি না ডাকলে বেরোবে না।

--তা-ই হবে। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সায় দেয় নটবর।

এবার কালকেউটের ব্যাপারটা একটু বলা যাক।

নটবরের এলাকা ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে একটা নিচু জলা জায়গা। সেখানে ব্যাংদের বসত—নানারকমের ব্যাং— কোলা ব্যাং, সোনা ব্যাং, ধেড়ে ব্যাং, ধাড়ি ব্যাং, ছোঁড়া ব্যাং, ছুঁড়ি ব্যাং—জায়গাটা ব্যাঙে-ব্যাং, আর রাতদিন শুধু তাদের ঘ্যাঙোর ঘ্যাং।

ওদিকটায় নটবর বড়ো একটা যেত না, আর কাছাকাছি জল থাকায় বিস্তর ঘাসখেকো মাছখেকো ঠান্ডা মেজাজের জন্তু-জানয়ারের বাস ছিল ওখানটায়। ঝগড়াঝাঁটি যে হত না তা নয়, তবে তেমন মারাত্মক কিছু ঘটত না কখনো। মোটামুটি সুখে-শান্তিতেই ছিল ওরা।

হঠাৎ একদিন কালকেউটে এসে জুড়ে বসল ওখানে। তার বুকভরা শুধু হিংসে আর মুখভরা শুধু বিষ।

কারণে অকারণে যাকে কাছে পায় তাকেই ছোবলায় কালকেউটে। তার ছোবলে দারুণ বিষ। এমন বিষ যাতে জ্বলে-পুড়ে নীল হয়ে তক্ষুনি তক্ষুনি মরণ।

ভয় পেয়ে সবাই পালায় তল্লাট ছেড়ে।

জলার ধারের সরস মাটি ভরা ছিল গাছগাছালিতে। যখন জন্তু-জানোয়ারেরা সব পালিয়ে গেল তখন কালকেউটে তার অকারন আক্রোশ মেটাতে লাগল গাছপালার ওপর। তার ছোবলের বিষে সবুজ গাছপালাগুলি সব শুকিয়ে মরে গেল। দেখতে দেখতে অমন সবুজ সুন্দর জায়গাটা হয়ে গেলে একটা মরুভূমির মত। যখন হাওয়া বয়, গাছপালা না থাকায়, হু হু কান্নার মত একটা শব্দ হয়। বুকের ভেতরটা যেন শিউরে শিউরে ওঠে সেই শব্দে।

সবাই—এমনকী পাখিরাও জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে। শুধু ব্যাঙেরা পারল না পালিয়ে যেতে। জল ছাড়া ওরা থাকতে পারে না। কিন্তু ভয়ে দুঃখে ওদেরও গান গাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। রোজই তাদের কত-না আপনজন যায় কালকেউটের পেটে। অকারনেও কত জনকে মেরে ফেলে কালকেউটে।

বাধা দেওয়ার শক্তি ওদের নেই, কালকেউটের সঙ্গে লড়াই কি সহজ কথা! তবু ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—এর কি কোনো প্রতিকার হবে না? কতদিন চলবে এই অত্যাচার?

এইসব আলোচনা করতে করতে কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে। হয়তো সেইদিনই তার কোন প্রিয়জন গেছে কালকেউটের পেটে।

ওদের নেতাগোছের ভোম্বলদাস সোনা ব্যাং কিন্তু আশা হারায় না। সে ওদের বলে—অন্যায় কখনো চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। সুযোগ আমরাও একদিন না একদিন পাবই। সেদিনের জন্যে নিজেদের তৈরি রাখো। যত ক্ষুদ্রই হই আমরা, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার ডাক যেদিন আসবে সেদিন যেন নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারি। তরুণ ব্যাঙেরা মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকে।

আর তাদের খাদক কালকেউটে জায়গাটাকে একটা শ্মশান বানিয়ে সেখানে মহাসুখে রাজত্ব করে। তার হিলহিলে লম্বা কালো শরীরটা যেন কালো বিদ্যুতের মতো অস্থিরভাবে সর্বক্ষণ ছুটে ছুটে বেড়ায়। কেউ যেন না ঢুকতে পারে তার রাজত্বে। অবশ্যি তার দাপটে ওই জায়গার ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁষে না। নিজের বিষের দেমাকে কখনো কখনো বিরাট ফণা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গায় কালকেউটে—

হিস্ হিস্ হিস্
আমার আছে বিষ
ছোবল আমার সইতে পারিস্
এমন কে আছিস্?
হিস্ হিস্ হিস্
কারো ভালো চাইনে জানিস্
মরতে যদি ভালোবাসিস্
তবেই আমার কাছে আসিস্
হিস্ হিস্ হিস্।

অবশ্যি গান না বলে শাসানি বলাই ঠিক!

বিষের দেমাকে যতই দেমাকি হোক কালকেউটে, বোকা সে নয়। পারতপক্ষে বাঘের এলাকা সে মাড়ায় না। সে ভালোই জানে তার ছোবলে যেমন মরণ, বাঘের থাবাটিও তেমনি একবার মাথায় পড়লে তার দফারফা।

কিন্তু একদিন ঝুঁকি নিয়েই সে ঢুকে পড়ে বাঘের এলাকায়। ব্যাং খেতে খেতে তার অরুচি ধরে গেছে। নিজের এলাকায় ব্যাং ছাড়া নেইও কিছু, নিজেই সে রাখেনি। ইঁদুর-টিঁদুর কিচ্ছু না। ছোটো ছোটো পাখি আর পাখির ডিমও কালকেউটের খুব পছন্দসই খাবার। কিন্তু সব গাছই তার বিষ-ছোবলে শেষ। গাছ থাকলে তবে তো পাখির বাসা, বাসা থাকলে তবে তো ডিম।

বাঘের এলাকায় ঢুকে খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করে কালকেউটে। ঝপঝাড়ের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খোঁজে—নতুন কোনো খাবার। কিন্তু তেমন কিছু জোটে না।

পেটে দারুণ খিদে। জেদি কালকেউটের জেদ চেপে যায়। সে বাঘের এলাকার আরো ভেতরে ঢুকে পড়ে।

হঠাৎ তার চক্ষুস্থির। একটা ঘন ঝোপের পেছন থেকে নিস্পলক চোখে সে তাকিয়ে থাকে। বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে সুন্দর সাদা একটা গোরু। একটু দূরে বসে আছে বাঘ আর একজন মানুষ। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকলেও তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কালকেউটে। ওই গোরুর দুধ তাকে খেতেই হবে। কতকাল দুধের মুখ দেখেনি সে। এসপার-ওসপার যা হয় হোক, দুধ না খেয়ে সে এখান থেকে নড়বে না। তার জন্যে যদি সারারাত অপেক্ষা করতে হয় তাতেও সে রাজি। লতাপাতায় গা মিলিয়ে বসে থাকে কালকেউটে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়, সন্ধের অন্ধকার ঘন হতে হতে রাত। রাতও এগিয়ে চলে। অধৈর্য হয়ে ওঠে কালকেউটে। খিদেয় বত্তিরিশ নাড়ি চুঁইচুঁই করছে। ওদিকে বাঘ-মানুষ-গোরু কারুরই নড়াচড়া লক্ষণ নেই। ওদের কথাবার্তার আবছা শব্দ ভেসে আসছে। কখন ঘুমোবে ওরা? ঘুমোলেই.....

কিন্তু ঘুমোবে বলে তো মনে হচ্ছে না। কালকেউটে ভাবে—তবে কি ফিরেই যাবে আজ? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর ঘেন্নায় নিজেকেউ ছোবলাতে ইচ্ছে করে তার। সবসেরা সাপ হচ্ছে সে—সাপের রাজা কালকেউটে। এত সহজেই হার মানবে?

হঠাৎ কালকেউটের পলকহীন চোখ দুটো যেন দু'কুচি হীরের মতো জ্বলে ওঠে। বাঘের পিঠে চেপে মানুষটা যেন কোন্‌দিকে চলে গেল। যাক, জাহান্নমে যাক, আর যেন না ফেরে।

এই সুযোগ। কালকেউটে তার লতাপাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে।

নিঃশব্দে সে এগোয় ধবলীর দিকে। তার মিশমিশে কালো শরীরটা অন্ধকারের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার।

ধবলীর সামনে খানিকটা দূরে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় কালকেউটে। এবার তার বিশেষ শক্তির পরীক্ষা। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন হীরের কুচির মতো দুই চোখে এনে জড়ো করে। ধবলী ঝিমোচ্ছে। আর কিছু ভাবে না কালকেউটে, শুধু ভাবে—ঘুমিয়ে পড়ুক ওই গোরুটা, গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যাক। তার জ্বলজ্বলে দুই চোখ থেকে এই দারুণ ইচ্ছাশক্তি যেন ধবলীকে ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে ফেলতে পারে।

কালকেউটে বুঝতে পারে জয় হয়েছে তার শক্তির।

সে এগিয়ে যায় ধবলীর কাছে। শরীরের নিচের দিকটা দিয়ে দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে ধবলীর পা দুটো। তারপর রাক্ষুসে খিদেয় বাঁটে মুখ দিয়ে শুষে নিতে থাকে সব দুধ। গভীর ঘুমের মধ্যেও ধবলী একবার গা-ঝাড়া দেয়।

তারপরের ঘটনা তোমার জান।



দুখু-ধবলী-নটবরের সেই হাসিখুশি জীবনের ওপর ভয় আর দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া নেমে এসেছে। সেই যেমন-ইচ্ছে বেড়ানো নেই, নাচ-গান নেই, প্রাণ খুলে হাসি-গল্প নেই। সব সময়ে ভয়–এই বুঝি বিপদ এল। সর্বক্ষণ চোখ-কান সজাগ রেখে পাহারা দেয় ওরা।

ওদের আস্তানা থেকে কিছু দূরে মস্ত একটা গাছ বেছে নিয়েছে দুখু। সেই গাছের মগডালে চড়ে সারাদিন সে পাহারা দেয়। তাকিয়ে থাকে ওদের গাঁয়ের দিকে। ও জানে বাঘের খোঁজে জঙ্গলে আসবেই নগেন জোতদার আর ভিখু সর্দার। শিগগিরই আসবে। শুধু যে রাগ মেটানো তা-ই নয়, চোরাগোপ্তা বাঘ মেরে তার চামড়া বিক্রি করে বেশ দু'পয়সা রোজগারও করে সে।

নটবরকে বাঁচাতে হবে। আর সেইসঙ্গে তাদের পরিবারের ওপর যে অত্যাচার করেছে নগেন জোতদার, এখনো গাঁয়ের লোকের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে যে জুলুমবাজি তার শোধ তুলতে হবে। মনের তেজে চোখের তেজও যেন বেড়ে গেছে দুখুর। বহুদুরের গ্রাম, পথঘাট সব যেন সে স্পষ্ট দেখতে পায়। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও পাতাগাছটি নড়লে সে সজাগ হয়ে ওঠে।

নটবরের দিনের বেলায় কাজ ধবলীকে পাহারা দেওয়া।

বর্ষার জল পেয়ে বট গাছের আশপাশে প্রচুর ঘাস জন্মেছে। ধবলী চরে চরে তা-ই খায়। দূরে কোথাও যায় না। ওকে যে কেন এত সামলে রাখা হচ্ছে তা এখনো ও জানে না।

একদিন একটু বিরক্ত হয়েই ধবলী বলেছিল দুখুকে–আমাকে এত আগলে আগলে রাখছে কেন? নগেন জোতদারের রাগ বাঘের ওপর, সে তো আর আমাকে মারতে আসবে না।

দুখু বুদ্ধি করে সামলে নিয়েছিল–নগেন জোতদারকে ভালো চিনেছ তুমি! তোমাকে একলা পেলে ছেড়ে দেবে নাকি? গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুলবে না নিজের গোয়ালে!

কথার ফাঁকে নটবরকে চোখ টিপে দিয়েছিল দুখু।

নটবর তখন জোর দিয়ে বলেছিল–আসলে ধবলী-মা, আমাকে পাহারা দিচ্ছ তুমি, তোমাকে পাহারা দিচ্ছি আমি। একজনের কিছু হলে অন্যজন অন্তত একটা চিৎকার করেও দুখুভাইকে জানান দিতে পারবে।

কথাটা মনে ধরেছিল ধবলীর। সে এ নিয়ে আর কখনো প্রশ্ন করেনি।

সেই যে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে দুখু গিয়ে গাছে চড়ে বসে, সন্ধে না হতে আর নামে না। ধবলী তারও আগে ঘুম থেকে উঠে বসে থাকে। দুখু বেরোনোর আগে তাকে পেট ভরে খাইয়ে দেয়।

কোনো কোনো দিন অত ভোরে খেতে চায় না দুখু।

--তা বললে কি হয় সোনা, সেই রাতের আগে আর তো খাওয়া হচ্ছে না। শরীর ভেঙে যাবে যে।

--সকালবেলায় এত খাওয়া যায় নাকি? দুখু বাচ্চা ছেলের মত বলে।

--তবে আমিও সারাদিন উপোস দিয়ে থাকব–অভিমানে গলা ভারি হয়ে আসে ধবলীর।

--আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। দাও, খাচ্ছি।

নটবর একপাশ থেকে হেসে ওঠে।

--কী দুখুভাই, হার মানতে হল তো? ধবলী-মা যা বলে তা আমাদের ভালোর জন্যেই বলে। মা'র কথার অবাধ্য হতে নেই।

--ইয়ার্কি করতে হবে না, তোমার মতো বাঘা পেট আমার নয় যে যখন খুশি যত খুশি খাবার ঢুকিয়ে ফেলা যায়।

দুখুকে চটতে দেখে নটবর খিক্‌খিক্‌ করে হাসে।

--ভালো হচ্ছে না নাটু, দুধ খেতে খেতে দুখু বলে, অমন করলে তোমাকে পাঠাব গাছে চড়তে। মজাটি টের পাবে তখন।

--কেন, গাছে কি চড়তে পারি না আমি?

--তা পার, কিন্তু সারাদিন মগডালে বসে কাটাতে হলে শুধু জোরে কুলায় না, কায়দা লাগে।

--তা ঠিক। নটবর মেনে নেয়।

এই বিপদের দিনগুলোতে ওরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি আর আপন হয়ে উঠেছে। যেমন শত্রু দেশ আক্রমণ করলে দেশের মানুষরা ছোটোখাটো ঝগড়া-বিবাদ ভুলে একজোট হয়ে দাঁড়ায়, একে অন্যের ভরসায় বাঁচে। বড় বড় বিপদ তাই অনেক সময়ে মন্দের পোশাক পরে ভালোই করতে আসে মানুষের। তাকে বড়ো হতে, সাহসী হতে সাহায্য করে। দুখু-ধবলী-নটবর অবশ্যি এমনিতেই এতদিনে একই পরিবারের লোকের মতো হয়ে গিয়েছে। বিপদের দিনে সেই ভালোবাসাটা আরো গাঢ় হয়। একে অন্যের ভালো নিয়েই ভাবে সর্বক্ষণ।

সন্ধে হয়ে গেলে মগডালের পাহারাদারি শেষ হয় দুখুর। কারণ রাতে পায়ে হেঁটে জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে আসে না কেউ। মাচা বেঁধে টোপ দিয়ে বাঘ শিকার এ নয়। নগেন জোতদারকে দিনেই আসতে হবে। তাই রাতের বেলায় ওদিক থেকে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু কালকেউটের ভয়টা বেশি রাতেই। তাই ধবলীকে না জানিয়ে পালা করে রাত জাগে নটবর আর দুখু। সে জানতেও পারে না যে তার দুই ছেলের একজন না একজন সজাগ চোখ-কান মেলে পাহারা দিচ্ছে তাকে।

নটবর অন্ধকারে দেখতে পায়। দুখুর দুই চোখও ধীরে ধীরে অন্ধকারে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে হাতের কাছে সর্বদা একখানা মজবুত গাঁটওলা লাঠি রাখে।

এদিকে কালকেউটে দূর থেকে সব দেখে আর হিংসেয় বুক ফেটে যায় তার। ধবলীর দুধের স্বাদ সে ভুলতে পারে না, ব্যাং-ট্যাং আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না। তবু খিদের জ্বালায় তা-ই গিলতে হয় মাঝে মাঝে। দিন নেই রাত নেই যখন-তখন সে ঢুকে পড়ে বাঘের এলাকায়। ঝোপেঝাড়ে গা মিশিয়ে তাকিয়ে থাকে ধবলীর দিকে। কিন্তু কাছেই থাকে পাহারাদার। লোভী কালকেউটের কশ বেয়ে নাল গড়িয়ে তার গলা-বুক ভিজিয়ে দেয়। মরিয়া হয়ে ওঠে সে। ওই গোরুর দুধ তাকে খেতেই হবে, একবার নয় বারবার—অনেক—অনেকবার।

রাতের বেলায় কালকেউটে চলে যায় ওদের আস্তানার খুব কাছাকাছি। কিন্তু বুঝতে পারে কেউ-না-কেউ ঠিকই জেগে আছে। রাগে আক্রোশে তার সমস্ত বিষ টগবগ করে ফুটতে থাকে। মনে হয় এক্ষুণি এই বিষ উগরে দিতে না পারলে সে নিজেই বুঝি মরে যাবে বিষের জ্বালায়। না হোক দুধ খাওয়া, ইচ্ছে করে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবক'টাকে ছোবলে ছোবলে শেষ করে দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাগটা লোভের কাছে হেরে যায়। রাতের পর রাত জেগে একটা সুযোগের অপেক্ষা করে কালকেউটে।

একদিন শেষরাতে সুযোগ একটা পেয়েও যায় সে।

সেদিন রাত জাগার পালা ছিল দুখুর। শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল তার যাচ্ছে না বেশ কিছুদিন ধরে। রাতশেষের মিঠে বাতাসে কখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তার।

তক্কে তক্কে ছিল কালকেউটে। তার শরীরে ক্লান্তি নেই, চোখে নেই ঘুম, হিংসের আগুন শুধু দাউদাউ জ্বলে তার বুকের মধ্যে।

যেই সে বুঝতে পারে দুখু ঘুমিয়েছে, অমনি সে বিদ্যুতের মত ছুটে যায় ধবলীর পাশে। তীব্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আরো গভীর করে দেয় ধবলীর ঘুম।

কিন্তু মনে চিন্তা থাকলে যা হয়, ঘুমটা তেমন গভীর হতে পারেনি দুখুর। কালকেউটের নড়াচড়ার সামান্য শব্দেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তার। হাতের পাশেই লাঠি। ধড়মড় করে উঠে বসেই লাঠিটা হাতে নিয়ে হেঁকে ওঠে সে—কে রে? কে?

সবে ধবলীর বাঁটে মুখ দিতে যাচ্ছিল কালকেউটে। দুখুর চিৎকারে দারুণ রেগে গিয়ে ধবলীকে ছেড়ে সে যেন শরীরটাকে দশহাত লম্বা করে ছোবল হানে দুখুকে লক্ষ্য করে। ওই ছোবল গায়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ ভবলীলা

সাঙ্গ হত দুখুর। কিন্তু ঘুমচোখেও দুখু বুঝতে পারে কী হয়েছে, কী হতে যাচ্ছে। সবল হাতের লাঠিটা চরকির মতো ঘুরিয়ে সে আড়াল করে নিজেকে। লাঠির ঘায়ে কালকেউটে ছিটকে গিয়ে পড়ে খানিকটা দূরে। দুখু লাঠি বাগিয়ে দাঁড়ায়।

নটবরেরও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও এসে দাঁড়ায় দুখুর পাশে। শুধু এত কান্ডেও ঘুম ভাঙে না ধবলীর।

চোটটা তেমন লাগেনি কালকেউটের। সে চওড়া ফণা উঁচু করে দোলাচ্ছে আর ফুঁসছে–হি.....ই.....ই.....স্...হিস্...হিস্..... কালকেউটে আমার নাম খেয়াল রাখিস্, ভেবে-চিন্তে কাজ করিস্, কী করছিস্ মনে রাখিস্, মজাটা এবার টের পাবিস্.....

নটবর তেড়ে যাচ্ছিল, দুখু আটকায় তাকে–সাবধান!

ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে যায় কালকেউটে।

দুখু বলে–ওর ছোবলের মুখে এভাবে কেউ এগিয়ে যায়? ওকে জব্দ করতে হবে ফন্দি করে। এবার থেকে পাহারায় একটুও ঢিলে দিলে চলবে না। দোষ আমার। আমারই একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল, সেই সুযোগে শয়তানটা.....

ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে চলে ওরা। আরো কয়েকটা দিন কেটে যায়। নতুন কোনো ঘটনা আর ঘটে না।

তারপর হঠাৎ একদিন যখন ভোরের সোনারোদে কাছে-দূরের বনজঙ্গল আর অনেক দূরের গাঁ হেসে উঠেছে, দুখু তার মগডালের পাহারা থেকে দেখে দু'জন লোক জঙ্গলের দিকে আসছে। গাঁয়ের লোক নানা কাজে জঙ্গলে আসে। জ্বালানি কাঠ, মেটে আলু, কচু–কত জিনিসই না পাওয়া যায় জঙ্গলে! সেসবের লোভে প্রাণের মায়া না করে গাঁয়ের গরিবমানুষরা প্রায়ই জঙ্গলে ঢোকে। সবাই তারা দুখুর চেনা। দুখু ভালো করে দেখে লোকটাকে চিনে নেয়। বাস্!

আজকের লোক দুটোকে দেখেই কিন্তু দুখু চমকে ওঠে। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই। নগেন জোতদার আর ভিখু সর্দার! পা টেনে টেনে হাঁটছে নগেন, পাশে পেল্লায় চেহারার ভিখু। দূর থেকে মনে হয় ওদের হাতে লাঠির মতো কী যেন। ও দুটো নিশ্চয় বন্দুক।

আর একটু অপেক্ষা করে দুখু। ভেবে নেয়। অনেকটা দূর। তা ছাড়া ওরা হয়তো এদিকটায় আসবেই না। কিন্তু এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। সে তরতর করে নেমে আসে গাছ থেকে। তারপর নটবরকে সাবধান করে দেবার জন্যে আকাশ-ফাটানো হাঁক ছাড়ে একখানা–জয় মা বনবিবি।

নটবরের কানে পৌঁছোয় সেই আওয়াজ। সে ধবলীকে ডেকে বলে–ধবলী-মা, দুখুভাই বোধ হয় নগেন জোতদারকে দেখেছে। আমি গর্তে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু একচুলও নোড়ো না এখান থেকে। আর যদি কিছু ভয়ের কিছু দেখ–এই ধর সাপ-টাপ–সঙ্গে আমায় ডেকো কিন্তু। আমি নিমেষে বেরিয়ে আসব গর্ত থেকে।

ধবলী কথা বলে না, ভয়েই বোধ হয়, মাথা নেড়ে সায় দেয়।

ওদিকে দুখু নগেন জোতদার আর ভিখুকে যেখানে দেখেছিল সেইদিকটা আন্দাজ করে, মিনিটে বাঁশচেরা গলায় 'জয় মা বনবিবি' বলে এক একখানা ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগোতে থাকে। উদ্দেশ্য নগেন জোতদারকে এদিকে টেনে আনা।

অনেকক্ষণ এভাবে চলার পর দুখু দেখে খানিক দূরে নগেন আর ভিখু বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঝোপঝাড় সরাতে সরাতে এগিয়ে আসছে। আর একবার পিলে-চমকানো ধ্বনি দেয় দুখু–জয় মা বনবিবি।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে নগেন জোতদার আর ভিখু সর্দার বন্দুক তাক করে তার দিকে।

দুই হাত তুলে দুখু চেঁচিয়ে বলে–ভয় নেই মন্ডলমশায়, ভয় নেই, এখানে বাঘ-টাঘ কিছু নেই। আমাকেই যেন গুলি করে বসবেন না।

নগেন আর ভিখু বন্দুক নামিয়ে নেয়। কিন্তু দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে একই জায়গায়।

দুখু আস্তে আস্তে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ায়।

তাকে ভালোভাবে লক্ষ করে নগেন বলে–আরে, তুমি আমাদের দুখু না? গোঁফদাড়িতে এমন চেহারা করেছ.....

-- আগে আমি দুখুই ছিলাম বটে, দুখু গম্ভীরভাবে বলে, তবে মা বনবিবির আশীর্বাদে আমি এখন বাবা দুখুরাম পীর–মায়ের মহাভক্ত। জঙ্গলই আমার ঘরবাড়ি, জঙ্গলেই আমার বাস। আমার গোরু ধবলীকে নিয়ে আমি এখন জঙ্গলেই থাকে।

-- শুনেছিলাম বটে, নগেন বলে, তোমার গোরু আর তুমি দু'জনেই নিখোঁজ। তা গোরু নিয়ে জঙ্গলে আছ, কীরকম? বাঘ তোমাদের খাচ্ছে না?

-- এতক্ষণ কী শুনলেন তবে, যেন ভীষণ অপমানিত হয়েছে এমনভাবে দুখু বলে, বনবিবির মহাভক্ত বাবা দুখুরাম পীর আর তার গোরুকে খাবে বাঘে? জানেন, বাঘেরা আমার কথায় ওঠবোস করে, আমি ইচ্ছে করলে তাদের কান ধরেও ওঠবোস করাতে পারি। আমার ঘর-গেরস্থালি কাজকর্ম সব তারাই করে দেয়।

নগেন ভিখু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। দুখু বোঝে ওষুধ ধরেছে।

সে বলে—চলুন না মন্ডলমশায়, আমার আস্তানাটা একবার দেখে আসবেন।

নগেন বলে—চলো হে ভিখু, বাবা দুখুরাম যখন বলছে...

-- বেশ কথা। বাবা যখন বলছেন...। ভিখু বলে।

মনে মনে হাসে দুখু। দাওয়াইটা বেশ কাজ করছে। হেলাফেলার দুখুকে এখন বেশ সমীহ করেই 'বাবা দুখুরাম' বলছে নগেন মন্ডল। ভিখু সর্দার তো আপনি-আজ্ঞেই শুরু করেছে।

যেতে যেতে কথা হয়।

দুখু জিজ্ঞেস করে—তা মণ্ডলমশায়, আপনি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে জঙ্গলে কেন?

-- শরীর আমার দিব্যি সুস্থ। শুধু এই পা-টা.....

-- জানি। আপনাকে যখন বাঘে ধরেছিল আমি তখনো গাঁ ছাড়িনি। তা, আপনি জঙ্গলে এলেন কেন?

-- এলাম বাঘের গুষ্টির তুষ্টি করতে। এ জঙ্গলে আমি বাঘ রাখব না। হঠাৎই মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে ওঠে নগেন জোতদারের।

-- দোষ করল একটা বাঘ, আর শাস্তি পাবে সবাই, এটা কি উচিত কথা?

-- পীরবাবা, ভিখু সর্দার বলে, আপনি মণ্ডলমশায়ের কষ্টটা বুঝুন। একখানা ঠ্যাং ওনার একেবারে বরবাদ হয়ে গেছে।

-- খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু উনিও তো কম বাঘের জীবন বরবাদ করেননি। তাদের ছাল বিক্রি করে অনেক পয়সা পেয়েছেন। তাদের ছানাপোনা ধরে ধরে বাইরে চালান করেছেন, সার্কাস কোম্পানিকে বিক্রি করেছেন।

-- বেশ করেছি, আমার ক্ষমতা আছে তাই করেছি, আরো করব। নগেন মণ্ডল খিঁচিয়ে ওঠে।

-- তাতে কিন্তু দু'তরফাই ক্ষতি হবে মণ্ডলমশায়, বাঘও মরবে, মানুষও মরবে। তার চাইতে আমি বলি কী, দুখু বলে—বাঘেরা আমার কথা শোনে, মান্যিগন্যি করে। কোন্ বাঘ আপনাকে ধরেছিল তা আমি জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারব। আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে আপনি আসুন, সেই দোষী বাঘও থাকবে, আপনি তার একটা পা ল্যাংড়া করে দিন। শোধবোধ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে আপনি তাকে প্রাণে মারবেন না। বাঘেরা বনবিবির প্রজা, আর আমি হচ্ছি মায়ের মহাভক্ত বাবা দুখুরাম পীর। মায়ের কোনো প্রজা অবাধ্য হলে আমি তাকে শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু তাদের প্রাণ বাঁচানো আমার কর্তব্য।

অনেকক্ষণ ভেবে নগেন মন্ডল বলে—বেশ, তা-ই হবে।

কিন্তু তার মুখ দেখেই তার শয়তানি মতলবটা বুঝতে পারে দুখু। ভাবখানা এই—'পাই তো একবার হাতের কাছে... তারপর হাতে আছে বন্দুক।' মনে মনে খুব একচোট হেসে নেয় দুখু।

দুখুর আস্তানা দেখে অবাক হয়ে যায় নগেন মণ্ডল আর ভিখু সর্দার। বনবিবির দয়া না থাকলে কেউ এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে এমন একটি নধর গোরু নিয়ে ঘরসংসার পেতে বসতে পারে না। সেই ক্যাবলাকান্ত দুখু তাহলে সত্যিই এখন একটা জবরদস্ত লোক।

ভিখু সর্দার শুঁকে শুঁকে বলে—জায়গাটায় বড়ো বোটকা গন্ধ বাঘের গায়ের।

-- বাঃ, দুখু বলে, গন্ধ হবে না! দিনরাত বাঘেরা আসছে যাচ্ছে, কাজকর্ম করছে।

একটু ভয় পেয়েই নগেন মন্ডল বলে—তাহলে আমরা এখন যাই। আমাদের একটু এগিয়ে দেবে না বাবা দুখুরাম?

-- নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাহলে ওই কথাই রইল মণ্ডলমশায়, আজ থেকে সাত দিন পরে ঠিক এই সময়ে আপনি আসবেন এইখানে। ভিখুও আসতে পারে আপনার সঙ্গে। আমি চাই শান্তিতে ব্যাপারটার মিটমাট হয়ে যাক। হেঁ হেঁ, বলতে গেলে আপনার খেয়ে-পরেই আমি মানুষ, আবার বাঘেরাও আমার পর নয়।

তারপর ঘন জঙ্গলের মধ্যে সরু একটা পথ দেখিয়ে দুখু বলে—একটা কথা মণ্ডলমশায়, আপনারা আসবেন কিন্তু এই রাস্তাটা দিয়ে। আমি মন্ত্র দিয়ে এই রাস্তাটা বেঁধে রাখব। বাঘ কেন, এই রাস্তা দিয়ে এলে, কোনো জানোয়ারই আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

আরো কিছু কথাবার্তার পর দুখু নগেন জোতদার আর ভিখু সর্দারকে এগিয়ে দিয়ে আসতে যায়।

-- ফিরে এসে নটবর আর ধবলীকে নিয়ে আলোচনায় বসে দুখু। অনেকক্ষণ ধরে কথা কয়ে পরের কাজের সবদিক ঠিক করে ফেলে তারা।

পরের কয়েকটা দম ফেলার ফুরসত থাকে না দুখু আর নটবরের।

যে রাস্তা দিয়ে নগেন জোতদার আসবে সেই রাস্তায় গভীর একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করে ওরা। দুখুকেই বেশির ভাগ কাজ করতে হয়। নটবরের তাকে সাহায্য করার আগ্রহ খুব। সে একবার সামনের দুই থাবায় কোদাল ধরে চেষ্টাও করে মাটি কোপাতে। কিন্তু দেখা যায় এক এক বারে যেটুকু মাটি তার কোদালে উঠছে তাতে এক বচ্ছরেও গর্তটা খোঁড়া হবে না। নজের এই অক্ষমতায় নটবর বড় মনমরা হয়ে যায়।

দুখু তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে—দুর বোকা, মন খারাপ করছ কেন? তোমারও অনেক কাজ আছে।

দেখা গেল সত্যিই তা-ই। গর্তের দেয়াল এমন খাড়াই করে কাটে দুখু যাতে কেউ ওই গর্তে পড়লে তাকে আর নিজে থেকে উঠে আসতে হবে না। গর্তটা যখন দুখুর মাথা-সমান গভীর হয় তখন সে নটবরকে ডেকে বলে—এইবার যে তোমাকে ছাড়া অচল আমি।

খুব খুশি নটবর।

-- কী করতে হবে বলো।

-- আমি ঘর থেকে যে দড়িদড়া এনেছিলাম তার থেকে একটা বেশ লম্বা আর শক্ত দড়ি নিয়ে এসো তো।

দড়ি নিয়ে আসে নটবর।

সেই দড়ির এক মুড়ো বাঁধা হয় নটবরের কোমরে, অন্য মুড়ো নামিয়ে দেওয়া হয় গর্তের মধ্যে।

-- শোনো নটবর, দুখু বলে, গর্তটাকে অনেক গভীর আর খাড়াই করতে হবে। আমি কাটতে কাটতে নিচে নেমে যাব, মাটি জমলে পুঁটলি করে দড়িতে বেঁধে দেব, তুমি সেই মাটি নিয়ে গিয়ে আমাদের বটগাছের পেছনটায় রেখে আসবে। পরে আবার গর্তটা বোজাতে হবে তো। আমাকে দড়িতে বেঁধে নামানো-ওঠানোর কাজও তোমাকে করতে হবে।

দায়িত্ব পেয়ে খুশিতে ডগমগ নটবর। তার ছোটাছুটি হাঁকডাকে জায়গাটা সরগরম হয়ে ওঠে।

ধবলী ওদের কাছে থাকে। তার কিছু করার নেই। সে খায়-দায় আর মাঝে মাঝে পারিবারিক সংগীতটা গেয়ে ওদের উৎসাহ দেয়।

কয়েকদিনের উদয়াস্ত পরিশ্রমে গর্ত কাটা শেষ হয়। গর্তটা এমন গভীর আর খাড়াই হয়ে যে কিনারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। বর্ষার ভেজা মাটি। গর্তের নিচে কুয়ার মতো জল উঠে এসেছে।

দুখু তখন এক মতলব করে। গাদা গাদা পাঁক এনে ফেলে দেয় গর্তের মধ্যে। জলে পাঁকে থকথকে পায়েসের মতন একটা জিনিস তৈরি হয়, যাতে কেউ পড়লে মরবে না সঙ্গে সঙ্গে, চোটও লাগবে না তেমন।

তারপর সরু সরু লতা দিয়ে একটা জাল বুনে গর্তের মুখের ওপর টানটান করে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তার ওপর ঘাসের চাপড়া এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় দুখু যে আশপাশের জমির সঙ্গে জায়গাটা এক হয়ে যায়। বোঝাই যায় না যে ওখানে রয়েছে একটা মরণফাঁদ।

নগেন জোতদারের আসার দিনে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে থেকেই ওরা তৈরি হয়ে থাকে। নটবরকে বলে দেওয়া হয় তার গর্তে ঢুকে থাকতে আর নগেন মন্ডল আসবার পর ওখান থেকেই মাঝে মাঝে ডাক ছাড়তে। ধবলীকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় যাতে নটবরের গর্তের মুখটা আড়াল পড়ে যায়।

আর দুখু একটা কলাপাতায় কিছু ফুল-দুর্‌বো সাজিয়ে গর্তের এদিককার কিনারে জোড়াসন হয়ে বসে থাকে।

একটু পরে দেখা যায় নগেন জোতদার আর ভিখু সর্দার ইতিউতি তাকাতে তাকাতে এদিক পানে আসছে।

জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে দুখু চেঁচিয়ে ওঠে—জয় মা বনবিবি।

ওদিক থেকে নটবরও হুংকার ছাড়ে—হালুম...

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নগেন জোতদার আর ভিখু সর্দার।

দুখু বলে—কোনো ভয় নেই মণ্ডলমশায়, কোনো ভয় নেই। ওই সেই হারামজাদা বাঘ যে আপনার পা জখম করেছে। আমি ওকে বাঘবন্দী মন্ত্র দিয়ে আটকে রেখেছি। বাছাধনের চিল্লানোই সার, নড়বার শক্তিটি নেই।

-- বেশ, বেশ। নগেন মণ্ডল খুশি হয়ে বলে আর ভিখুর হাত ধরে নেংচে নেংচে এগিয়ে আসতে থাকে।

দুখু বলে—মণ্ডলমশায়, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন বাঘকে প্রাণে মারবেন না। গুলি-বারুদ পথের পাশে রেখে আসুন। এই মন্ত্রপড়া ফুল-দুর্‌বো আপনাদের মাথায় ঠেকিয়ে দিচ্ছি, কোনো বাঘই আর আপনাদের কিছু করতে পারবে না।

-- যা, যা, ওই ফুল-দুর্‌বো তুই তোর নিজের মাথায় ঠেকাগে, হঠাৎ নিজমুর্তি ধরে নগেন জোতদার, বসে থাক্ ওইখানে যেমন আছিস, নইলে এক গুলিতে দেব খুলি উড়িয়ে।

তারপর যা হবার তা-ই হয়। ভিখুর হাত ধরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে আসতে দু'জনে একই সঙ্গে ঝপ্-ঝ্প-ঝপাৎ...

গর্তের মুখ থেকে একটু সরে যায় দুখু। বলা যায় না, সঙ্গে ওদের গুলিভরা বন্দুক।

দুখু চেঁচিয়ে ডাকে—শিগগির চলে এসো নটবর, কেল্লা ফতে।

ছুটে এসে দুখুর পাশে দাঁড়ায় নটবর।

কিছুক্ষণ শুধু জলকাদায় হুটোপুটির শব্দ।

তারপর চিঁ চিঁ করে ভেসে আসে নগেন জোতদারের গলা।

-- বাবা দুখু—বাবা দুখুরাম পীর, শুনতে পাচ্ছ বাবা?

-- পাচ্ছি। কিন্তু আমি বাবা-রাম-পীর কিছুই না। শুধু দুখু। কী বলবেন বলুন।

-- বলছিলাম কী, তুমি অতি সজ্জন, তোমার কি এমন করে কাউকে পাঁকে ফেলা মানায় বাবা? আমাকে ওঠাও মানিক আমার।

-- আপনি যাদের পাঁকে ফেলেছেন তাদের কে ওঠাবে মণ্ডলমশায়?

কোনো উত্তর আসে না এ প্রশ্নের।

একটু পরে ভিখু সর্দারের গলা শোনা যায়—আমি গরিবমানুষ বাবা.....

দুখু খেঁকিয়ে ওঠে—কিন্তু ভালোমানুষ নও। গরিব হলেই কারো সাতখুন মাপ হয়ে যায় না। আমরা গরিবমানুষের পক্ষে, কিন্তু গরিবমানুষকে ভালোমানুষ হতে হবে।

-- তোমার জমিজেরাত সব আমি ফেরত দিয়ে দেব বাবা দুখু। করুণ গলায় ককিয়ে ওঠে নগেন জোতদার।

আহা, শুনে বড় আনন্দ হল। তা, আমার বাবা-মা-ভাই-বোনদেরও নিশ্চয় ফেরত দিয়ে দেবেন মণ্ডলমশায়?

-- তাদের ভগবানে নিয়েছে বাবা।

-- আপনাকেও তেমনি গর্তে নিয়েছে। নটবর বলে।

-- এ কার গলা বাবা দুখু? নগেন মণ্ডল শুধোয়।

-- এ হচ্ছে নটবর, সেই বাঘ যে আপনাকে খেতে খেতেও ঘেন্নায় খায়নি। দুখু পরিচয় করিয়ে দেয়।

-- তাহলে দয়া হবে না? গুলি করে যে নিজেই নিজেকে মারব সে উপায়ও নেই। পাঁকে বন্দুক দুটো একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।

-- ছি ছি, দুখু বলে, আপনি অন্যকে মারতে জন্মেছেন, নিজেকে মারবেন কোন্ দুঃখে।

-- কতদিন এই গর্তে থাকতে হবে? আমার যে এরই মধ্যে সারা গা কুটকুট করছে।

-- করুক না একটু। সয়ে গেলে আর করবে না। থাকতে থাকতেই সয়ে যাবে। থাকুন না দিন কতক। নটবর বলে।

-- দি-ন-ক-ত-ক! নগেন মণ্ডল কেঁদেই ফেলে বুঝি।

নটবর বলে—অত কমে আপত্তি থাকলে মাসখানেকেই থাকুন।

-- মাসখানেক?!

-- তাতেও আপত্তি? আচ্ছা, আচ্ছা, বছরখানেকই থাকুন তবে।

-- এক বছর কি এই পাঁকের মধ্যে থাকা যাবে বাবা?

-- কষ্ট হলে বলবেন, নটবর হেসে বলে, মাটির অভাব হবে না।

-- অ্যাঁ! হেঁচকির মতো একটা আওয়াজ তুলে চুপ করে যায় নগেন মণ্ডল।

-- আরে, হঠাৎ খেয়াল হয় দুখুর, ধবলী-মা কোথায়? এমন মজাটা দেখতে এল না!

-- তা-ই তো! নটবর বলে।

ওরা দু'জনে একই সঙ্গে পেছন পানে তাকিয়ে দেখে ছাউনির নীচে কীরকম অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছে ধবলী।

ছুটে গিয়ে ওরা দেখে ধবলীর দুই চোখের মণি স্থির, নিশ্বাস পড়ছে না, মুখ আধ-খোলা, জিভটা অনেকখানি বেরিয়ে আছে। দুখু-নটবরের বুঝতে কষ্ট হয় না ধবলী আর বেঁচে নেই।

বাঘেরা সাধারণত একটু বেশি আবেগপ্রবণ। নটবর তো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ছেলে-মানুষের মতো কান্না জুড়ে দেয়। দুখুও কাঁদে। কিন্তু সে নটবরের মতো বুদ্ধিশুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলে না। সে বেশ বুঝতে পারে, ধবলীর

মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তার সন্দেহটা যাচাই করে নেবার জন্যে সে কাঁদতে কাঁদতেও ধবলীর সর্বাঙ্গ খুঁজে খুঁজে দেখে। বেশিক্ষণ খুঁজতে হয় না। চোখে পড়ে পেটের এক জায়গায় পাশাপাশি ছোট কালো দুটো দাগ। সাপে কেটেছে ধবলী-মাকে। আর সাপ মানে নিশ্চয়ই সেই কালকেউটে। সে-ই এভাবে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। সে আর নটবর যখন ব্যস্ত ছিল নগেন জোতদারকে নিয়ে তখনই এক ফাঁকে কালকেউটে সর্বনাশটা করে গেছে। চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায় দুখু। হাতে নেয় তার লম্বা মজবুত লাঠিখানা।

এদিকে নটবরের কান্নার আর বিরাম নেই।

দুখু তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়–শুধু কেঁদে ভাসালেই কি ধবলী-মা ফিরে আসবে? কালকেউটে কেটেছে তাকে.....

মুহূর্তে কান্না থামিয়ে হুংকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে নটবর–এক্ষুণি শেষ করব শয়তানটাকে। হয় আমি থাকব না হয় ও থাকবে.....

-- বোকার মতো কিছু করে বোসো না। এখনো উপায় আছে ধবলী-মাকে বাঁচানোর। দুখু বলে।

-- কী! সত্যি বলছ তুমি?

-- হ্যাঁ। তুমি জান কোথায় থাকে কালকেউটে?

-- আমার এলাকার পরেই ওর এলাকা।

-- চলো, আর দেরি করা নয়।

যেতে যেতে দুখু তার মতলবটা খুলে বলে নটবরকে।

মতলবটা মনে ধরে নটবরের।

দুখু তাকে সাবধান করে দিয়ে বলে–মাথা একটুও গরম করবে না। কালকেউটেকে মেরে ফেললে কিন্তু ধবলী-মাকে বাঁচানো যাবে না।

ব্যাংদের জলার ধারে গিয়ে নটবর তার গুরুগম্ভীর গলায় একটা ভাষণ দেয়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকে দুখু।

-- বন্ধু ভেককুল, আমরা জানি দীর্ঘকাল ধরে কালকেউটের অত্যাচারে আপনারা ভেকের অধম জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। আপনাদের অগণিত আত্মীয়স্বজনকে শুধু যে সে পেট ভরানোর কাজে লাগিয়েছে তা-ই নয়, নিশ্চয় তার স্বভাব অনুযায়ী অকারণেও সে অনেককে মেরেছে।

-- ঘ্যাঙোর ঘ্যাং, ঘ্যাঙোর ঘ্যাং। ব্যাঙেরা সমর্থন জানায়।

-- বন্ধুগণ, আমরা খবর পেয়েছি, যে গানের জন্য আপনারা পৃথিবীবিখ্যাত সেই গানও আপনারা গাইতে পারেন না ওর ভয়ে। বন্ধুগণ, খাদ্য-খাদকের সম্পর্কটা খুবই দুঃখের হলেও সত্যি। কিন্তু বিনা কারণে খাদ্যকে কেন মারবে খাদক? তা ছাড়া, খাদকের অধিকার শুধু খাদ্যের শরীরের ওপর। তার মানসিক বিকাশ অর্থাৎ কথাবার্তা গান-বাজনা এসবের ওপরও সে কেন জুলুম চালাবে?

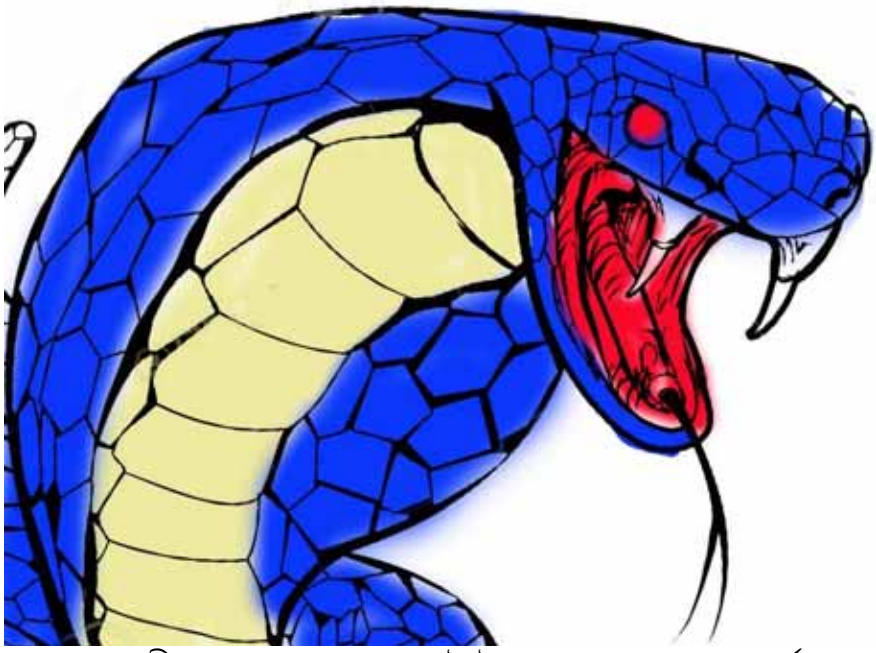
চাপা গলায় দুখু বলে–একটু সোজা করে বলো।

-- অর্থাৎ বন্ধুগণ, খাদ্য বলে সে কি এতই হীন যে তার নিজের মন বলে কিছু থাকবে না? অর্থাৎ তার শরীরের মতো তার মনটাও হবে খাদকের খাদ্য?

-- আঃ, দুখু ফিসফিস করে বলে, সোজা করো, সোজা করো। আমিই বুঝতে পারছি না কিছু।

-- সহজ করে বললে কথাটা এই দাঁড়ায় বন্ধুগণ, নটবর বলে–খাবার জিনিস হলে জন্মেছেন বলে আপনারা কিছু অপরাধ করেননি। অবশ্য তা না হলেই ভালো হত। কিন্তু এটাই নিয়ম। এই পৃথিবীতে একদল আর এক দলের খাবার। সুখের কথা, এই নিয়ম চেষ্টা করলে বদলানো যায়। এই যে দেখছেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন–ইনি আমার মানুষভাই দুখু। আমরা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের ওপরে উঠতে পেরেছি। আমাদের সম্পর্ক এখন ভাইয়ের–বন্ধুরা। আমার কথা হচ্ছে বন্ধুগণ, যতদিন আমরা এই জায়গায় পৌঁছতে না পারছি, ততদিন খাওয়া চলছে চলুক। কিন্তু অকারণে কেউ কাউকে মারতে পারবে না, জোর করে কারো নাচগানের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। যা-ই হোক বন্ধুগণ, দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আমি আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না। সংক্ষেপে কাজের কথাটা বলছি। আমি আর দুখুভাই চলেছি কালকেউটেকে শায়েস্তা করতে। সে আমার রাজ্যে ঢুকে আমাদের ধবলী-মাকে মেরে ফেলেছে। আমরা প্রথমে তাকে বাধ্য করব ধবলী-মা'র শরীর থেকে বিষ তুলে নিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে, তারপর তাকে তাড়িয়ে দেব এই দেশ থেকে। এ কাজে আপনাদের একজনের সাহায্য আমাদের দরকার। অবশ্য, তাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এ কাজে আসতে হবে.....

থপথপ করে এগিয়ে আসে ভোম্বলদাস সোনা ব্যাং, বলে–ঘ্যাঙোর ঘ্যাং, আমার নাম ভোম্বলদাস সোনা ব্যাং। কথা রাখুন, কাজে চলুন। আমি রাজি, জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।





ধবলীকে শেষ করে কালকেউটে এসে ঢুকেছে তার গর্তে। ব্যাপারটা কি সে ভালো করল? চিন্তা ঢুকেছে মাথায়। একটু ভয়ও। মানুষ একলা হলে তো ফুঃ--, বাঘও একলা হলে লড়া যায়। কিন্ত বাঘে মানুষে একসঙ্গে হলে? খিদেয় কালকেউটের পেট চুঁইচুঁই করছে। কিন্তু গর্ত থেকে বেরিয়ে খাবার খুঁজতে যেতে সাহস হয় না। এমন সময়ে গর্তের বাইরে ব্যাঙের গলা–ঘ্যাঙোর ঘ্যাং, আমার নাম ভোম্বলদাস সোনা ব্যাং। প্রভু, আমার বড়ো মনে কষ্ট, আমায় খেয়ে করুন কষ্ট নষ্ট।

কালকেউটের খিদেটা যেন তড়াক করে পেট থেকে লাফিয়ে ওঠে মাথায়। সে না ভেবে-চিন্তে পলকে বেরিয়ে আসে গর্তের বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গে দুখু ভোম্বলদাসের কোমরে বাঁধা দড়ি ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে দেয় নাগালের বাইরে। আর হাতের কাঠের টুকরোখানা গর্তের মুখে ফেলে গর্তের মুখ দেয় বুজিয়ে। তারপর শক্ত হাতে লাঠি বাগিয়ে দাঁড়ায় কালকেউটের পেছনে।

কালকেউটে বুঝতে পারে সে ফাঁদে পড়েছে। তার সামনে বাঘ, পেছনে মানুষ। বাঘের আছে থাবা, মানুষের হাতে লাঠি। কী করবে সে ঠিক করতে পারে না, শুধু ফণা দোলায় আর শব্দ করে–হিস্...হিস্...

দুখুর ইশারা পাওয়ামাত্র নটবর কালকেউটের ফণা দোলানোর তালে তালে সাপনাচ শুরু করে দেয়।

কালকেউটে খেপে যায় দারুণ।

-- হিস্...হিস্...আমায় ভ্যাংচাচ্ছিস্!

নটবরকে ছোবল মারতে যায় কালকেউটে।

পেছন থেকে তার চাঁদিতে আলতো করে লাঠির একটা ঠোকনা দেয় দুখু।

-- ইস্.....হিস্.....! ব্যথায় আর্তনাদ করে পেছন ফিরে দুখুকে কামড়াতে যায় কালকেউটে।

এবার এক থাবায় তার পৌনে এক ইঞ্চি ল্যাজ ছিঁড়ে নেয় নটবর।

-- উস্...ইস্... কী যে করিস্। আর কামড়ানোর চেষ্টা না করে ফণা দোলাতে দোলাতে কেমন যেন মিয়ানো গলায় কালকেউটে বলে।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে ভোম্বলদাস হাসে–ঘ্যাং...ঘ্যাং...ঘ্যাং.....।

তাতে আরো অপমান হয় কালকেউটের।

দুখু বলে–এবার তোমার সেই কত্থক নাচটা একটু হোক না নটবর।

কত্থক নাচে নটবর।

কালকেউটে ফণা দোলাতে বন্ধ করে বলে–তোমার নাচ কতক্ষণ চলবে?

নাচতে নাচতে নটবর বলে–তিনশো বার রকম নাচ জানা আছে আমার।

-- এক একটা পাঁচ মিনিট করেও যদি ধর তাহলে লাগছে গিয়ে তোমার...। দুখু হিসেবটা ঠিক মেলাতে পারে না।

-- পনেরোশো ষাট মিনিট। মানে ছাব্বিশ ঘন্টা–একদিন দু'ঘন্টা। হিসেবটা মুখে মুখে কষে দেয় নটবর, নাচ বন্ধ না করেই।

-- এ রকম অসভ্যতা অতক্ষণ কেউ সহ্য করতে পারে? কালকেউটে অসহায়ভাবে বলে।

-- পারে না বলেই তো করা। দুখুর উত্তর।

-- তা, কী করলে আমি ছাড়া পাব? কালকেউটে জিজ্ঞেস করে।

কথক থামিয়ে দ্রুততালে টুইস্ট আরম্ভ করে নটবর বলে–ছাড়া পেতে চাও?

বলেই নাচের বেগ আরো দু'গুণ বাড়িয়ে দেয়। সেই নাচের সামনে কালকেউটে আরো অসহায় বোধ করে।

-- চাই, চাই, আমি ছাড়া পেতে চাই। সে বলে।

-- ছাড়া পেতে হলে দেশছাড়া হতে হবে। রাজি আছ? দুখু শুধোয়।

-- আছি, আছি। তবে আমি যাই?

-- না। এই দেশ থেকে একেবারে বিদেয় হবার আগে ধবলী-মা'র বিষ তুলে দিয়ে যেতে হবে। রাজি?

-- রাজি, রাজি। আমাকে রক্ষে করো, ওই ভয়ংকর নাচ আমার আর সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমারই হাড়গোড় সব ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

-- চলো তবে।

কালকেউটেকে সামনে গিয়ে দিয়ে পেছনে পেছনে চলতে থাকে দুখু নটবর আর ভোম্বলদাস।

পৌনে এক ইঞ্চির ল্যাজ খোয়া যাওয়ায় কালকেউটের যত না কষ্ট শরীরের, তার চাইতে ঢের বেশি তার অপমানের জ্বালা। আপাতত ওদের হাত থেকে সে রেহাই পাওয়ায় জন্যে সে যা-ই বলে থাকুক, মনে মনে অনেক মতলবই ভাঁজতে থাকে সে। প্রতিশোধ সে নেবেই। জাত কালকেউটে সে, তাকে কিনা এভাবে হেনস্তা! কিন্তু পালাতে না পারলে প্রতিশোধটা নেবে কী করে? তাই খানাখন্দের রাস্তা ধরেই চলতে চেষ্টা করে সে।

কিন্তু কালকেউটের হালচালের ব্যাপারে সবচাইতে সেয়ানা ভোম্বলদাস। সে কালকেউটের একটু বেচাল দেখলেই হুঁশিয়ারি দেয়–ঘ্যাঙোর ঘ্যাং। অমনি দুখু না হয় নটবর গর্জে ওঠে–খবরদার, বাঁদরামো করলে মেরে শিরদাঁড়া ভেঙে দেব। সোজা রাস্তা ধরে চলো।

-- সাপেরা সাপামো করে, বাঁদরামো করে না। অপমানিত কালকেউটে মৃদু প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করে।

পালানো সম্ভব নয় বুঝে কালকেউটে সে চেষ্টা আর করে না। কিন্তু মনে মনে অনেকরকম ফন্দিই সে এঁটে চলে।

ওদের আস্তানায় পৌঁছে দুখু কালকেউটেকে বলে–যাও, বিষ তোলো গিয়ে। ঠিকমতো কাজ না হলে.....মনে থাকে যেন নটবরের তিনশো নয় রকম নাচ এখনো বাকি আছে.....

-- যাচ্ছি, যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ধবলীর কাছে যায় কালকেউটে।

যেখানে সে কামড়েছিল সেই জায়গায় মুখ দিয়ে চুষে চুষে বিষ তুলতে থাকে কালকেউটে। দুখু নটবর আর ভোম্বলদাস দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকে। কাজ হবে তো? বেঁচে উঠবে কি ধবলী-মা? শেষ পর্যন্ত কালকেউটে কোনো শয়তানি করে বসবে না তো! সাপকে বিশ্বাস নেই।

কালো কালো বিষরক্ত তুলে মাটিতে ফেলে কালকেউটে।

দুখু আর নটবর ঘন ঘন তাড়া লাগায়–তাড়াতাড়ি.....তাড়াতাড়ি.....। চোয়ালে কি ব্যথা হয়েছে তোমার, আরো জোরে টানতে পারছ না?

জবাব না দিয়ে কালকেউটে নিঃশব্দে কাজ করে চলে।

হঠাৎ যেন ধবলীর ল্যাজটা একটু নড়ে ওঠে।

দুখু-নটবর আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। ভোম্বলদাস খুশিতে ক'টা তুড়িলাফ দিয়ে নেয়।

আর একটু পরে ধবলী আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে। যেন সে ঘুমোচ্ছিল এতক্ষণ। প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেও তার মতো বুদ্ধিমতী গোরুর ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আনন্দে দুখু-নটবরের চোখে জল। তাদের কান্না দেখে ধবলীরও চোখে জল এসে যায়।

কালকেউটে নিস্তেজভাবে বলে–আমি যাচ্ছি।

নটবর তার পথ আগলে দাঁড়ায়–না। যাবে তুমি ঠিকই, তবে এভাবে নয়। তোমাকে একদম বিশ্বাস নেই। কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে আবার কার কোন্ সর্বনাশ করে বসবে।

-- তবে কি মেরেই ফেলবে আমাকে?

-- না, আমরা মিথ্যে কথা বলি না। তোমাকে একখানা কাঠের সঙ্গে বেঁধে ভাটার সময়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। ভাসতে ভাসতে কোনো চড়ায় গিয়ে ঠেকে যাবে.....

-- তবে রে.....। আচমকা লাফিয়ে উঠে ছোবল হানে কালকেউটে, একেবারে নটবরের মাথা লক্ষ্য করে।

কিন্তু সতর্ক ছিল দুখু। ঠিক সময়ে লাঠিটা বাড়িয়ে ধরে সে, কালকেউটের ছোবলটা পড়ে লাঠির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার পেল্লায় থাবার এক ঘায়ে নটবর কালকেউটের মাথাটা দেয় গুঁড়িয়ে।

ধবলী গম্ভীরভাবে বলে–হুঁ.....উ.....ম.....ম...বা, এইজন্যেই বলে শত্তুরের শেষ রাখতে নেই।

নটবর খুশিতে গমগম করে বলে–তবে বাঘে-মানুষে-গোরুতে-ব্যাঙে একসঙ্গে হলে কী করবে ওই কালকেউটে!

আনন্দে ডগমগ ধবলী বলে–ঠিক.....ম্...বা!

তারপর চারজনের খুশির নাচানাচিতে বনের ওই জায়গাটুকুতে যেন বর্ষাকালেই বসন্তকাল শুরু হয়ে যায়।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর



অনিরুদ্ধ সেন

মাঝে মাঝে কাজের চাপ কম থাকলে আমি পেঁচোর অফিসে চলে আসি। অফিস বলতে অবশ্য নামকরা এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাধারণত আমাকে দেখে পেঁচো উচ্ছ্বাসিত হয়ে চপ বা কাটলেটের অর্ডার দেয়। আজ কিন্তু দেখলাম ও গম্ভীর মুখে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে, আমাকে আড়চোখে দেখে শুধু একটু মৃদু হাসল। মনে হচ্ছে কিছু 'বেপার' আছে।

যারা 'পেঁচোর সাত-সতেরো' পড়নি তাদের জন্য বলি – পেঁচোর আসল নাম ডঃ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আর সে অঙ্কের জাহাজ। এখন সে এই তাবড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রফেসর। তার খুব নামডাক। তবে দুঃখের বিষয়, সে ঐ ডাকনামে।

পেশা ছাড়া তার নেশা শখের গোয়েন্দাগিরি। এ ব্যাপারেও সে বেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। দীর্ঘদিনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমি তার সহকারী, লেজুড় বললেও ভুল হয় না। পেঁচোকে গোমড়ামুখে দেখে আমার মনে কিন্তু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল – তাহলে কি কোনও কেস এসেছে?

ঠিক তা নয়। পেঁচো এক উদ্ভট ই-মেল পেয়েছে। প্রেরককে সে চেনে না। এতে চমকাবার কিছু নেই, অমন মেল আকচার আসে। কখনও সেটা বিজ্ঞাপন, আবার কখনও ভুল ই-মেল আইডি টাইপ করার ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট মেল। এই মেলটা স্পষ্টতই বিজ্ঞাপন নয়, কাজেই কেউ ভুলই করেছে। সেটা জানিয়ে প্রেরককে একটা রিপ্লাই দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

কিন্তু তা নয়। পেঁচোর তীক্ষ্ণ নাক নাকি এই ই-মেল থেকে কিছু বদগন্ধ পেয়েছে। আর একবার গন্ধ পেলে আর রক্ষে নেই - পেঁচোর অন্য সব কাজ শিকেয় উঠবে, রহস্যের হদ্দমুদ্দ না করে তার শান্তি নেই। এখনও তাই সে গভীর মনোযোগে ঐ ই-মেলের মর্মোদ্ধার করতে ব্যস্ত।

স্ক্রিনে উঁকি মারলাম, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেঁচো মেলটা দেখাল। বিচিত্র বটে মেলটা। আজকাল বাংলাতেও মেল চালাচালি হচ্ছে, এটাও তাই। মূল মেলে প্রেরক বা প্রাপকের নাম নেই, আছে শুধু একটা ছোট্ট ছড়া,

"ছবির বইয়ের ছাগশিশু মামাবাড়ি থেকে আজ সন্ধ্যায় রওনা দেবে গ্রহের সংখ্যা দেখে। পরশু ভোরে ঋতু গুণে নামলে যত্ন নিও। খোকা ঘুমোলে পুরুষে নয়, সমাসে জানিও।"

"হুঁ, মেলটা অদ্ভুত বটে, হেঁয়ালিতে লেখা। তবে তার মানেই এই নয় যে কেস উল্টোপাল্টা। বন্ধুবান্ধবরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মজা করে হেঁয়ালি আর কোড ওয়ার্ডে মেল চালাচালি করে।"

"বলছিস? বেশ!" বলে পেঁচো একটা ছোট্ট মেসেজ লিখে 'রিপ্লাই' পাঠিয়ে দিল, "মহাশয়, আপনার অন্য কাউকে পাঠানো এই মেলটি ভুলে আমার কাছে চলে এসেছে। আপনার অসুবিধা হতে পারে ভেবে জানালাম, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। আমি মেলটা 'ডিলিট' করে দিচ্ছি।"

'ডিলিট' না করে সে অবশ্য উল্টে গম্ভীর হয়ে বারবার মেলটা দেখতে লাগল। একটু পরে বলল, "লোকটা বেশ অভদ্র। একটা ভুল দেখিয়ে দিলাম। আবছা আভাষ পাচ্ছি, কাউকে 'রিসিভ' করতে বলছে। মেলটা পৌঁছোয়নি জানতে না পারলে কেলো হতে পারত। অথচ আমাকে একটু 'থ্যাঙ্কস'ও জানাল না।"

"হয়তো অন-লাইন নেই।" বললাম।

"ছিল, নিশ্চয়ই মেল রিসিভ করেছে। তার কিছুক্ষণ পরে অফ-লাইন হয়ে গেল।"

"ও নিয়ে দুঃখু করিস না।" আমি সান্ত্বনা দিলাম, "এই হচ্ছে টিপিকাল ইন্ডিয়ান মেন্টালিটি। ই-মেলের জবাব দেওয়াটা যে একটা শিষ্টাচার, জানে না।"

"মেন্টালিটি দেখাস না, অনেক ইন্ডিয়ান দেখেছি। কিন্তু এ ব্যাটা - দাঁড়া, একটা এক্সপেরিমেন্ট করি।" বলেই পেঁচো এবার কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে আবার কি-বোর্ডে কীসব খুটখুট করতে লাগল। একটু পর উদ্ভাসিত মুখে বলল, "যা ভেবেছি! মেলটা রিপিট করেছিলাম, 'বাউন্স' করল। অবশ্য হতে পারে ওর 'ইনবক্স' ফুল হয়ে গেছে। কিন্তু এও হতে পারে, মেলটা আঘাটায় গিয়ে পড়েছিল জেনে লোকটা তড়িঘড়ি অ্যাকাউন্টটাই ডি-অ্যাকটিভেট করে দিল। না রে গবু, কেসটা নেড়েচেড়ে দেখতে হচ্ছে।"

"তোর একটু বেশি বেশি ইয়ে। তাচ্ছেয়ে চল ক্যান্টিনের দিকে এগোনো যাক।"

"একটু বোস, কিঞ্চিৎ লাউড থিংকিং করে নিই। ততক্ষণে লাঞ্চের সময়ও হয়ে যাবে।"

অগত্যা!

"ই-মেল পাঠাতে ভুল হয় কেন?"

পেঁচোর আচমকা প্রশ্নে থতমত খেয়ে বললাম, "অনেক কারণে। ধর টাইপে ভুল।"

"ঠিক। কিন্তু তার মানে লোকটা পুরো আই-ডিটা টাইপ করেছে। অর্থাৎ সে যদি নিতান্ত আনাড়ি না হয়, তবে এই আই-ডিতে এই প্রথম মেল পাঠাচ্ছে। আর ঝট করে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার থেকে বোঝা যায়, সে আনাড়ি নয়।"

"তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?"

"এই আছে যে সে একজনকে প্রথম মেল পাঠাচ্ছে, কিন্তু পরিচিতের মতো 'কোড' ওয়ার্ড ব্যবহার করছে।"

"হুঁ, ব্যাপারটা যেন কেমন।" আমি নড়েচড়ে বসে বললাম, "তা, তুই কী করতে চাস?"

"কে মেলটা পাঠিয়েছে তো জানি। কিন্তু কাকে পাঠাচ্ছিল, সেটাও জানতে চাই। তারপর কেসটা একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চাই।"

"কাকে পাঠাচ্ছিল কীভাবে জানবি?"

"অনুমানে। ধরে নিচ্ছি, লোকটা হয় একটা অক্ষর ভুল টাইপ করেছে। নয়তো নামধাম সার্চ করে ই-মেল আই-ডি জোগাড় করেছে, কিন্তু সেই নামধামে একাধিক লোক থাকায় ভুল করেছে।"

"তোর ইমেল-আইডি তো jchakraborty@gmail.com. তাহলে লোকটা -"

“চক্রবর্তী স্পেলিং ভুল করতে পারে। পাশের কী-তে হাত পড়ে যেতে পারে – যেমন ধর এইচ-এর জায়গায় জে। অথবা জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী সার্চ করে আমাকে ‘হিট’ করে তার লোক ভাবতে পারে। দাঁড়া, একটু দেখছি।”

এই বলে পেঁচো কিছুক্ষণ কি-বোর্ডে ঝড় তোলার পর বলল, “শিওর নই, তবে এই গোটা দশেক আই-ডির একটা হবার চান্স।” বলেই চটপট একটা প্রিন্ট-আউট নিয়ে নিল।

“তাহলে আর কী!” আমি উজ্জ্বল মুখে বললাম, “এবার সাইবার পুলিশকে খবর দে। তারা সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে কথা বলে ঠিক লোকগুলোর নাড়িনক্ষত্র বের করে ফেলবে।”

“নট দ্যাট ইজি, ব্রো! প্রথমত, সাইবার পুলিশ আমাকে পাত্তা দেবে কেন? আমার – মানে, অঙ্কের জন্য একটু নামডাক আছে, গোয়েন্দাগিরির জন্য তো তেমন নয়।”

“জামাইবাবু মানে মোহনদাকে বলে চেষ্টা করা যেত। উনি তো এখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগে খুব উঁচু পোস্টে। কিন্তু তিনি আবার একটা সিক্রেট অ্যাসাইনমেন্টে কোথায় গিয়ে যেন বসে আছেন, দিদিও তার হদিশ জানে না।”

“জানলেও কদ্দুর কাজ হতো সন্দেহ। আমাদের সাইবার পুলিশ বলল আর গুগল শুনল, এমন নয়। খুব গম্ভীর কোনও ক্রিমিন্যাল কেসে তথ্যপ্রমাণ দিতে পারলে তবে যদি কিছু হয়। নইলে ওরা কাস্টমারদের প্রাইভেসিতে হাত দিতে দেয় না।”

“তা-হলে?” হতাশ হয়ে বললাম।

পেঁচো একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল মুখে বলে উঠল, “মানসীদি!” আমি বোকার মতো তাকাচ্ছি দেখে বলল, “তুই ক্যান্টিনে যাবি বলছিলি না? চল!”

ক্যান্টিনে গিয়ে পেঁচো হঠাৎ দিলদরিয়া হয়ে উঠল, “কী কী খাবি, বল।”

“ক্-ক্-ই, ক্কি!” আমি বিষম খেলাম। খাওয়ানোর ব্যাপারে পেঁচো আদৌ উদার নয়, বড়োজোর একটা আইটেম আর চা অফার করে। আজ ওর হলটা কী?

“এখানে নন-ভেজ কাটলেটটা ভালো করে। মোচার চপটাও মন্দ নয়। আর ঐ অমৃতিটা ফ্রেশ ভেজেছে মনে হচ্ছে। এক প্লেট করে বলে দিই, কী বলিস? চা না হয় একটু পরে আসবে।”

“চলবে।” স্মিত হেসে বললাম।

“তবে তোকে ভাই একটা কাজ করে দিতে হবে।”

“ক্-কী কাজ – ঝ্-ঝামেলার নয়তো?” সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম।

“বিশেষ কিছু নয়।” পেঁচো আমাকে নিশ্চিন্ত করে বলল, “তুই স্রেফ খেয়ে বলবি, কোনটা সবচেয়ে য়াম্মি। জানিস তো আমার টেস্ট বাডগুলি ঠিক –”

জানি। সবাই বলে, পেঁচো নাকি স্বাদের কোনও তারতম্য বোঝে না। কেউ কেউ আড়ালে বলে, ও গরুর মতো খায়। আমি খুশি হয়ে বললাম, “সে তোকে ভাবতে হবে না। তবে ফাস্ট রাউন্ডে টাই হলে কিন্তু টাই ব্রেকের জন্য –”

“আরেক রাউন্ড, নো প্রব্লেম। শুধু ব্রো, তুই ঠিকঠাক বলবি। জেনে রাখিস, তার ওপর নির্ভর করছে এই ই-মেল রহস্যের ভবিষ্যৎ।”

অ্যাঁ! ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম, একটু নার্ভাসও লাগল। তবে তা বলে চপ, কাটলেট ইত্যাদি সামনে নিয়ে তো বসে থাকা যায় না। বেশ কিছুক্ষণ হাত আর মুখের ব্যস্ততার পর আমি গম্ভীর মতামত দিলাম, “থার্ড আম্পায়ার কল করতে হল। তবে শেষ অবধি ডিসিশন – ঐ মোচার চপ।”

“আমারও তাই মনে হচ্ছিল।” এবার পেঁচো দ্রুত কাউন্টারে গিয়ে অর্ডার দিল, “এক ডজন মোচার চপ।” মালটা নিয়েই আমার হাত টেনে বলল, “চল।”

এ রাস্তা, ও রাস্তা ঘুরপাক খাবার পর আমরা হাজির হলাম ওদের কম্পিউটার সেন্টারে। সেখানে এদিক, সেদিক চলে এক টেবিলের সামনে এসে পেঁচো প্রায় জোড়হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি, সামনে এক ঢুলু ঢুলু, মাঝবয়েসী, থাপুস-থুপুস মহিলা। কবে যেন একটা কবিতায় পড়েছিলাম, “তন্দ্রা দাসের বাড়ি নিউ



জলপাইগুড়ি, অফিসে ঢোলেন তিনি কড়িকাঠে হাই ছুঁড়ি।” মনে হল, ইনিই কবিতার সেই তন্দ্রা দাস।“মানসীদি”, ফিসফিসিয়ে বলল পেঁচো।

এ-ই পেঁচোর সেই বিখ্যাত মুস্কিল আসান? বুকটা দমে গেল। মহিলার ফ্যালফেলে মুখে আকাট বোকামোর ছাপ। ফিসফিসিয়ে বললাম, “চল, কেটে পড়ি। এটা রং ই-মেল আই-ডি!”

থাবিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে পেঁচো বলল, “মানসীদি, এই চপগুলো একটু চেখে দেখুন। ক্যান্টিনে ভাজছিল, দারুণ গন্ধ। তাই আপনার জন্য ক’টা নিয়ে এলাম।”

তড়িৎগতিতে গোটা দুই চপ একসাথে মুখে পুরে দিয়ে মানসীদি উদ্ভাসিত বদনে বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ, প্ – মানে, জ্-জ্যোতির্ময় বাবু –”

আমি জানি, পেঁচোকে কেউ ডাকনামে রেফার করলে ও বেজায় বমকে যায়। আজ কিন্তু সে বিনয়ের অবতার হয়ে বলল, “ছি ছি মানসীদি, আপনি গুরুজন – আমাকে পেঁচো বলেই ডাকবেন।”

“বেশ। তা, এবার বলো কী ধান্দায় এসেছ।”

“ছিঃ, ধান্দা হবে কেন! মানে, দিদির প্রতি –”

“ভাইয়ের অন্তরের প্রগাঢ় ভালবাসা! ওসব যাত্রাপালা ছাড়ো, ঝেড়ে কাশো। মানসী চাটুজ্জের কাছে কেউ ধান্দা ছাড়া আসে না।”

অগত্যা পেঁচো মিনিমিনিয়ে বলল, “ক’টা ই-মেল আই-ডি আছে। এগুলোর মালিক কে, একটু বের করে দেবেন?”

“এরা কি ইনস্টিটিউটের মেম্বার?”

“না হওয়ারই সম্ভাবনা।”

“তাহলে ভাই আমি তাদের নাড়িনক্ষত্র তোমাদের কী করে জানাব?”

“কাম অন, মানসীদি।” পেঁচো এবার একটু বেপরোয়া হয়ে বলে ফেলল, “সারা কলকাতায় আপনি আনএথিকাল হ্যাকার বলে কুখ্যাত। এই সামান্য কাজটা আপনি –”

দেখলাম, মানসীদির ঠোঁট ফুলে উঠেছে, ফুঁপিয়ে উঠলেন বলে। বিপদ বুঝে আমি পকেট থেকে টিস্যু বের করে এগিয়ে ধরলাম।

“কী, কী বললে – আনএথিকাল?” ভদ্রমহিলা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, “হ্যাঁ ঐ কী বলে, হ্যাকিং – এট্টু-আধটু করি বটে, তা বলে আজ অবধি কেউ আমাকে ‘আনএথিকাল’ অপবাদ দিতে সাহস করেনি। আর তুমি দু’দিনের ছোঁড়া –”

“সরি মানসীদি, আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি।” পেঁচো আপোসের সুরে বলল, “কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো – আপনি কি আপনার ছেলেমেয়েদের ই-মেল, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করেননি? সেখান থেকে বন্ধুদের নামে আজেবাজে পোস্ট পাঠিয়ে তাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেননি? আপনার ভয়ে তারা তো সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে সেই ব্রিটিশ আমলের মতো চিঠি আর পথের মোড়ের ওপর নির্ভর করছে।”

“একে তুমি আনএথিকাল বল?” মানসীদি আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন, “সন্তানের মঙ্গল কোন মা-বাপ না চায়? জানো তো, আজকাল কত ঠগ-জোচ্চোর সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদ পেতে বসে আছে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য। সেই বিপদ থেকে তাদের বাঁচাতে হবে না?”

পেঁচোর চোখ দেখলাম হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, “আরে সেইজন্যেই তো আপনার হেল্প চাইছি। একটা ই-মেল হঠাৎ আমার হাতে এসে পড়েছে, যার মধ্যে বেশ রহস্যের গন্ধ আছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, এটার অর্থ সময়মতো ভেদ না করতে পারলে কোনও বাচ্চার জীবন বিপন্ন হবে।”

“তাই বলো।” মানসীদি হঠাৎ টানটান হয়ে উঠে বসলেন। মুহূর্তে তার বডি-ল্যাংগোয়েজ পাল্টে গেল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পেঁচোর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাহলে ঐ অ্যাকাউন্টের ধানাই-পানাই ছেড়ে আসল সমস্যাটা বলছ না কেন? বাচ্চাদের নিরাপত্তার ব্যাপার যখন, আমি জান লড়িয়ে দেব।”

“বেশ, বলছি।” পেঁচো একটু কাষ্ঠহেসে ই-মেলের ব্যাপারটা মানসীদিকে খুলে বলল।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ নীরব। তারপর বললেন, “বেশ, কাল দুপুরের মধ্যে তুমি মেল যে পাঠিয়েছে আর যার কাছে পাঠিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে যা যা জানার জেনে যাবে। দরকার হলে আমি সারা রাত জাগব। কিন্তু তারপর? তুমি কি পুলিশের কাছে যাবে?”

“তেমন কিছু পেলে তো যেতেই হবে। যতক্ষণ না পাই, নিজেকেই মাথা খাটিয়ে দেখতে হবে।”

মানসীদি কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “নিজেকে মানে? অ, তোমার তাহলে শখের গোয়েন্দাগিরির অভ্যেস আছে!”

মাথা চুলকোতে চুলকোতে পেঁচো বলল, “এই - মানে, এট্টু-আধটু। আর এ আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।”

পেঁচোকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে মানসীদি বললেন, “হুঁ, বউ নেই তাই এসব বদখেয়াল।”

“আজ্ঞে, বদখেয়াল নয়। মানে, আমরা বেশ কয়েকটা কেসে পুলিশকে -” বলতে বলতে হঠাৎ পেঁচোর খেয়াল হল, “কিন্তু আপনি কী করে জানলেন আমার বউ নেই?”

“একটা পাটভাঙা প্যান্টের ওপর একটা ন্যাতকানো শার্ট। তার আবার বোতাম কোনওটা নেই, কোনওটা উল্টোপাল্টা লাগানো। চুলে তো কদ্দিন চিরুনি পড়েনি ঠিক নেই। এর পরেও যদি বলতে তোমার বৌ আছে তো বলতাম তাকে আপগ্রেড করার সময় হয়েছে।”

কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকার পর পেঁচো বলল, “মানসীদি, ভুলে গেছি আপনি না আমি কে গোয়েন্দা!”

“এজ্ঞে, তুমি।” মানসীদি আবার তীব্র দৃষ্টিতে পেঁচোকে লক্ষ করতে করতে বললেন, “কিন্তু তার মানে তো তোমরা দুই মূর্তিমান এখন প্রায়ই এসে আমাকে জ্বালাবে? তাহলে আর চপের ঘুষে হবে না ভাই, একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে।”

“মা-নে?”

“মানে শিগগিরই বুঝতে পারবে। যাক গে, এখন কেটে পড়ো। কাল লাঞ্চের আগে এসে একবার খোঁজ নিয়ে যেও। আর হ্যাঁ, তখন তোমার ফোটোসহ একটা রিজিউমে আমার কাছে রেখে যেও।”

“রিজিউমে দিয়ে কী হবে?”

“ঐ যে বললাম, পাকাপাকি বন্দোবস্ত।”

“আপনি কি কোনও কন্ট্রাক্টের কথা বলছেন? দেখুন দিদি, আপনার কিছু সম্মানমূল্য আমি অবশ্যই ধরে দিতে রাজি আছি। তবে তা লিখিত-পড়িত হওয়া মুশকিল। আমি-আপনি দু’জনেই তো আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকুরে।”

“আমার ভদ্রমহিলার এক কথা - হয় রিজিউমে ও ফোটো, নয় ফোটো। কাল এক হাতে রিজিউমে দেবে, অন্য হাতে আমার রিপোর্ট নেবে। বুঝেছ?”

অগত্যা! দুর্বলভাবে ঘাড় নেড়ে পেঁচো আর আমি বেরিয়ে এলাম।

“আজ আমার সঙ্গে যাবি? রাতটা থাকবি? একটু আলোচনার দরকার ছিল।”

আলোচনা মানে তো স্বগতোক্তি। তবু জানি, নিজের কথার প্রতিধ্বনি শোনার জন্যও পেঁচোর আমা হেন একটা দেওয়ালের দরকার হয়। তাই বললাম, “বেশ। তবে বাড়িতে কিছু কাজ আছে। সেসব সেরে রাতে থাকার জামাকাপড় নিয়ে আমি সন্ধ্যার মধ্যেই চলে আসছি।”

ডিনার প্রায় নিঃশব্দেই সারা হল। তারপর দু'জন হলে সোফায় মুখোমুখি বসলাম। এবার পেঁচো বলল, "আয়, যতক্ষণে মানসীদি মেলের প্রেরক ও প্রাপকের বৃত্তান্ত বের করে, আমরা মেলের ধাঁধার মানে বোঝার চেষ্টা করি।"

"বেশ।" দুর্বলভাবে বললাম। জানি, পেঁচো 'আমরা' বললেও আমি এক্ষেত্রে স্রেফ 'ডামি'। পেঁচো কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল,

"মেলটা খুব পাকাপোক্ত কোডে লেখা নয়। ব্যবহার করা হয়েছে কিছু 'চলতা হ্যায়' পরিভাষা, যা লেখক-পাঠক দুজনে বোঝে। অর্থাৎ এরা ঐ কম্পিউটার অভিজ্ঞ ক্রিমিনাল হীরেন সামন্তর মতো ব্রিলিয়ান্ট নয়, অনেক পাতি। তবে বক্তব্যটা বাইরের লোকের কাছে গোপন করার চেষ্টা হয়েছে, যাতে মেল বাই চান্স বেহাত হলেও কোনও কেলো না হয়। তার থেকে আমার অনুমান, এদের মতলব ভালো নয়।"

"হ্যাঁ। আর দ্যাখ, ঘটনাচক্রে মেলটা বেহাতই হয়েছে। এটা যদি অন্য কারও হাতে পড়ত, স্রেফ 'ডিলিট' করে ছেড়ে দিত। তুই বলেই –"

"ছাড়, এবার হেঁয়ালিটা ভেদ করার চেষ্টা করা যাক। প্রথমে ধর ঐ 'ছবির বইয়ের ছাগশিশু'। তার মানেটা কী?"

"সে হয়তো বাচ্চাদের কোনও বইয়ের কোনও ছাগল বাচ্চার ছবির কথা বলছে।"

"আর সেই ছাগশিশু মামাবাড়ি থেকে রওনা দিচ্ছে?"

"তাই তো! তাহলে কেসটা কী?"

"স্পষ্টতই, যিনি মামাবাড়ি থেকে রওনা দিচ্ছেন তিনি ছাগ নন, মানুষ।"

"হুম!" হঠাৎ আমার খেয়াল হল, "আচ্ছা, ইয়ে – ছবির বই মানে কি অ্যালবাম, যাতে এই হবু যাত্রীর ফটো আছে? আর ছাগল, গাধা এসব তো আমরা অনেককেই বলে থাকি। যাকে লেখা হয়েছে সে হয়তো বুঝে গেছে অ্যালবামের কোন 'ছাগল'-মানুষটি তার মামাবাড়ি থেকে রওনা দিচ্ছে।"

"হতে পারে। কিন্তু মামাবাড়ি মানে কি স্রেফ কোনও লোকের মামার বাড়ি? নাকি –"

হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল, "মামা কিন্তু অনেকে চেকার বা পুলিশদেরও বলে।"

"বেঁড়ে বলেছিস, গবু – বুদ্ধি হ্যাজ!" পেঁচো আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

হঠাৎ আমার বুকটা এক বিচ্ছিরি সম্ভাবনায় ধক করে উঠল। বললাম, "পুলিশের বাড়ি, মানে থানা। সেখান থেকে কোনও বাচ্চা ছাগল – মানে ওটা যদি ওদের কোনও এজেন্টের কোড নেম হয়? শেষে পুলিশের মেল হ্যাক করতে গিয়ে আমাদের হাতে হাতকড়া পড়বে না তো?"

"এই জন্যেই তোকে 'গবু' বলি – একটা স্মার্ট কথা বললি তো ব্যালান্স করতে সাথে সাথে একটা গবেটের মতো কথা। পুলিশের গোয়েন্দা জি-মেলে খবর লেনদেন করছে? ভাবতেও আমার হাসি পাচ্ছে।"

"তা-হলে?"

"ভাবছি। আজ উঠে যখন পরশু নামছে, হয়তো কোনও দূরপাল্লার ট্রেন। কিন্তু কে, কেন, কোথায় ট্রেনে চড়ছে, কোথায় নামবে সবই ধোঁয়াশা। আজ সন্ধ্যায় গ্রহের সংখ্যা দেখে চড়ছে, পরশু সকালে ঋতু গুণে নামবে মানেটাই বা কী?"

"সে, অনেকের অমন গ্রহ নক্ষত্র দেখে যাতায়াতের অভ্যেস থাকে। অবশ্য ঋতু গোণাটা জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে বলে শুনিনি।"

"কিন্তু ট্রেন তো শাস্ত্র হিসেব করে চলে না। লোকটা মনে হচ্ছে কাউকে রিসিভ করতে বলছে। তাহলে ট্রেনের সময় বা নাম জানাবে না?"

"হুম, প্রবলেম হ্যাজ।" গম্ভীর চালে বললাম।

"তবু এ অব্দি একরকম। কিন্তু 'ছাগশিশু'র পর ঐ 'খোকা ঘুমোলে'র মধ্যে – আমি একটা খুব খারাপ গন্ধ পাচ্ছি।"

"কোনও ছোটো ছেলে এর মধ্যে জড়িয়ে আছে বলছিস?"

"না, আরও সর্বনেশে কোনও ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে ঐ 'খোকা ঘুমোলে'তে। পেটে আসছে, মুখে আসছে না।"

"তবে এবার কী করবি?"

"কিছু করার নেই, এখানেই লটকে গেছি। কাল মানসীদির কাছ থেকে কিছু 'লিড' পেলে যদি এগোনো যায়।" পেঁচো এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "যাই, আবার রিজিউমে তৈরি করতে হবে। মহিলা বড্ড এঁড়ে, নইলে মাল ছাড়বে না।"

বলা বাহুল্য, পরদিনও আমি পেঁচোর সাথে পাইলন হলাম। বেলা দুটো নাগাদ যখন মানসীদির সাথে দেখা করতে গেলাম, দেখি পেঁচো স্পষ্টতঃই উত্তেজনায় ঘামছে। মানসীদির চোখদুটি আজ আরও ঢুলুঢুলু, উপরন্তু তা টকটকে লাল - মনে হয় ভদ্রমহিলা সত্যিই রাত জেগে কাজ করেছেন।

কিন্তু মাল কিছু উদ্ধার হল কি? পেঁচো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মানসীদির দিকে চাইছে। মানসীদিও পাল্টা তার হাতের দিকে চেয়ে চোখের ইশারা করলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেঁচো রিজিউমেটা টেবিলে রাখল। ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে মানসীদি একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "ঠিক আছে।"

কিন্তু-কিন্তু করে পেঁচো বলল, "দেখবেন মানসীদি, ঝোলাবেন না। আমি কিন্তু আধা-সরকারি চাকুরে।"

"তোমায় কে বলেছে পাশাপাশি আর কোনও দায়িত্ব নেওয়া যায় না?"

"ন্-না, মানে সার্ভিস রুল। আর আমি এখানে - মানে, একটা রিসার্চ করছি। কোনও ব্যাঘাত হলে -"

"সার্ভিস রুল না ভেঙে আর রিসার্চের ব্যাঘাত না ঘটিয়েও যে অন্য দায়িত্ব নেওয়া যায়, সেটা তুমি যথাসময়ে বুঝতে পারবে।" মানসীদির চোখে চাপা হাসি। তারপর তিনি পেঁচোর হাতে একটা প্রিন্ট-আউট ধরিয়ে দিলেন।

"মেলটা পাঠিয়েছিল মহারাষ্ট্রের থানে থেকে চন্দন রায় বলে কেউ। আর সেটা পাঠানো হয়েছিল যতীন চক্রবর্তী বলে কলকাতার হাতিবাগান এলাকার এক বাসিন্দাকে। অবশ্য নামঠিকানা সঠিকই হতে হবে এমন কোনও কথা নেই, বেনামিতেও অনেকে চালিয়ে যায়। চন্দন রায় তোমাকে যে অ্যাকাউন্ট থেকে মেল পাঠিয়েছিল, সেটা কাল সকালেই তৈরি করা হয়েছিল। তারপর তুমি যেমন বলেছিলে - আবার কালই সেটা ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়েছে। আবার একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে সে ঐ মেলটা যতীন চক্রবর্তীকে পাঠিয়েছে।"

"কামাল, মানসীদি!" পেঁচোর সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেয়ে মানসীদি বললেন, "না না, এ আর এমন কী! তা, তুমিও তো বাপু কম যাও না। প্রাপকের সম্ভাব্য ই-মেল আই-ডির যে লিস্ট রেখে গিয়েছিলে, তার দ্বিতীয়টা চেষ্টা করতেই তো মাল পেয়ে গেলাম। নইলে অন্ধকারে হাতড়াতে অনেক সময় লেগে যেত। তা, আর কিছু তথ্য লাগবে?"

"আগে এগুলো হজম করি। তারপর দরকারে নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসব। তবে মানসীদি, এবার আমি নিশ্চিত যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক আর এতে কোনও অল্পবয়সী ছেলের নিরাপত্তা জড়িয়ে আছে।"

"বলেছি তো, জান লড়িয়ে দেব। যখন হয় আমাকে বিরক্ত করতে পারো।" মানসীদির চোখ আবার জ্বলজ্বল করছে। তাঁর ফোন নম্বর ও ঠিকানা নিয়ে পেঁচো আর আমি বেরিয়ে এলাম।

"মহারাষ্ট্রের থানে হচ্ছে মুম্বইয়ের পাশের এক জেলা কাম শহর। থানে থানে - একে লোকে থানাও বলে থাকে।" হঠাৎ পেঁচো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মামাবাড়ি মানে তুই কী যেন বলেছিলি?"

"প্-পু-পুলিশ স্টেশন, মানে - থানা", ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যালফেলের মতো বলি।

"থানা - তুই তো কেল্লা মেরে দিয়েছিস! অর্থাৎ থানা শহর থেকে কোনও ছেলে কাল কিছুতে চড়েছে। সম্ভবতঃ কোনও ট্রেন। দাঁড়া, দেখছি।"

পেঁচো এবার চটপট ইন্টারনেটে indianrail.gov.in খুলে ব্যস্তহাতে সার্চ করতে লাগল। একটু পর বলল, "যতীন চক্রবর্তী কলকাতার বাসিন্দা। তাকে যখন 'রিসিভ' করতে বলা হচ্ছে, সেটা হাওড়াতেই হওয়া সম্ভব। মুম্বই থেকে হাওড়া অনেকগুলি ট্রেন। কিন্তু তার মধ্যে মোটে দুটো থানা দাঁড়ায়। থানা থেকে ধরতে হলে ঐ দুটোর একটাই হবে। প্রথমটা হাওড়া মেল ভায়া নাগপুর - রাত ন'টা দশে থানা এসে পরের পরদিন সকাল পাঁচটা পঞ্চান্নয় হাওড়া পৌঁছোয়। আর দ্বিতীয়টা শালিমার এক্সপ্রেস - রাত দশটা পঁচিশে থানা ছেড়ে পরের পরদিন বেলা বারোটা পঁচিশে শালিমার পৌঁছোয়। এর কোনটা?"

একটু ভেবে বললাম, "জানিস পেঁচো, ঐ গ্রহ, ঋতু এসব খুব ছোটোবেলা কী একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম। পঞ্জিকা, তা ছাড়া -"

পেঁচো কিছুক্ষণ জুলজুল করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর সবলে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, "আবার ফাটিয়ে দিয়েছিস, গবু - ধারাপাত! ওতে একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র এইসব দিয়ে সংখ্যা শেখানো হয়। ঐ তালিকায় ছয়ের জন্য হচ্ছে ঋতু, আর নয়ের জন্য গ্রহ! ব্যাটারা সময় বোঝাতে এগুলোই ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ 'গ্রহের হিসেব রেখে' মানে ন'টা, সন্ধে ন'টায় ট্রেন ছাড়বে। আর 'ঋতু গুণে' মানে ছ'টা, সকাল ছ'টায় ট্রেন হাওড়া পৌঁছোবে। এটা ঐ মেলের টাইমের সাথে মোটামুটি মিলে যাচ্ছে। ছোঁড়া মুম্বই-হাওড়া মেলে হাওড়া আসছে। গতকাল রওনা দিয়েছে, আগামীকাল সকালে পৌঁছোবে।"

"বাঃ!" আমি বিমোহিত হয়েও বললাম, "কিন্তু ধারাপাতের দৌড় তো দশ দিক অবধি। তবে ওরা এগারোটা, বারোটা বোঝায় কীভাবে?"

"কে জানে, হয়তো এগারো খেলুড়ে, বারো ভূত এইসব যোগ করে নিয়েছে। তবে তোর ঐ ধারাপাতের ধাক্কায় কিন্তু আমার মাথায় বাকি সমস্যাগুলোর জটও খুলতে চলেছে। একেই বোধহয় বলে 'ডোমিনো এফেক্ট'। ছবির বই - তুই বলছিলি না অ্যালবাম? তা, আজকাল ছেলে ছোকরাদের অ্যালবাম কোথায়?"

"ফেসবুকে! অর্থাৎ ছবির বই মানে -"

"ফেসবুক। আর ফেসবুকের ছাগশিশু মানে -"

"কোনও ছোঁড়াকে ফেসবুকে বকরা বানিয়েছে, নিশ্চয়ই নকল বন্ধুত্বের টোপ ফেলে। আর সেইভাবে তাকে থানা থেকে কলকাতা টেনে আনছে। কিন্তু কীসের জন্য?"

"সেটা রয়েছে শেষ লাইনে, অর্থাৎ ঐ 'খোকা ঘুমোলে'তে। বল তো, 'খোকা'র ইংরিজি কী কী হয়?"

"বয়, ল্যাড, কিড -"

"দ্যাটস ইট, কিড!" পেঁচো উত্তেজিত হয়ে বলল, "আর ঘুমের ইংরিজি?"

"স্লিপ, স্লাম্বার, সিয়েস্তা, ন্যাপ।" হঠাৎ আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল, "পেঁচো - কিড-ন্যাপ! তাই তুই বলছিলি ঐ শব্দদুটোর থেকে -"

"ই-য়েস! খোকা ঘুমোলে মানে, কিডন্যাপ হয়ে গেলে। এবার শেষ শব্দ দুটো পুরুষে নয়, সমাসে - অর্থাৎ খবরটা পুরুষ বা মেলে নয়, সমাস বা -"

"এস-এম-এস-এ।" আমি ফিক করে হেসে বললাম, "এটা আমিও মাঝে মাঝে বলে থাকি। তাহলে পুরোটা দাঁড়াল -"

"ফেসবুকের বকরা ছোকরা থানা থেকে আজ সন্ধ্যা ন'টায় রওনা দিচ্ছে। পরশু সকাল ছ'টায় পৌঁছোলে, সম্ভবত হাওড়ায়, তাকে 'রিসিভ' কোরো। তারপর কিডন্যাপটা হয়ে গেলে মেলে নয়, এস-এম-এসে খবর জানিও। তিনি হয়তো এমন জায়গায় থাকবেন যে থ্রি-জি, ফোর-জি ভালো পাবেন না - তাই মেলের বদলে এস-এম-এস।"

"তাহলে চল, পেঁচো - কাল সকালে পুলিশ নিয়ে হাওড়ায় গিয়ে মালকে হাতেনাতে ক্যাচ-কট-কট।"

"নট দ্যাট ইজি, ব্রো!" পেঁচো চিন্তিতমুখে বলল, "মেলটা একটা বাইশ-তেইশ কামরার ট্রেন। তার থেকে শয়ে শয়ে লোক নামবে। তাদের মধ্যে -"

"কিন্তু চারদিকে যদি পুলিশের জাল থাকে তবে তার মধ্যে কোনও ছেলেকে কিডন্যাপ করতে গেলে ঠিক চোখে পড়ে যাবে।"

"না রে! যে আসছে, সে আশা করছে কেউ তাকে রিসিভ করবে। কোনও সন্দেহ বা শোরগোল না করেই সে তাদের সঙ্গে চলে যাবে। অমন তো কতজনই রিসিভ করতে আসে - তুই ক'জনকে চেক করবি? তার ওপর মনে রাখিস - 'খোকা' শব্দটার থেকে ধরে নিয়েছিলাম যে আসছে সে ছোকরা। কিন্তু ওটার মানে যখন অন্য, তাহলে সে ছুকরিও হতে পারে!"

"তবে তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা হবে!"

"না, আমাদের নির্দিষ্ট ইনফরমেশন চাই। ইস, মোহনদাও যদি থাকতেন!"

বলতে বলতেই আমার ফোনটা বেজে উঠল আর আমি উদ্ভাসিত মুখে পেঁচোকে বললাম, "নে, ধর - মোহনদা ফোন করেছে।"

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেঁচো মোহনদাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। ফোনটা স্পিকারে দেওয়া, তাই আমিও শুনছি। মোহনদা বললেন, "হুঁ, কেস তো সিরিয়াস। আমি সবে আজ অপারেশন থেকে রিলিজ হয়েই ফোন করছি, এখনও কলকাতা পৌঁছোইনি। তা তুমি আমার কী সাহায্য চাও?"

"আপনার ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে রেলের ঐ ট্রেনের চার্ট থেকে থানার থেকে অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে কে কে কোন কোন কোচে উঠেছে, তার একটা লিস্ট আমাকে দেবেন।"

"কাজটা সহজ। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে বাস্তবে অসম্ভব, পেঁচোবাবু! রেলের ডেটাবেস থেকে খবর নিতে হলে পরপর একগাদা ফোন, একগাদা পারমিশন। তারপর এতগুলো নামের লিস্ট ঝেড়েবেছে বের করা। তার আগে ট্রেন পৌঁছে যাবে।"

"ট্রেনে কাউকে যোগাযোগ করা যায় না?"

"ট্রেন এখন ছুটছে। তার এতগুলি কামরায় টি-টিকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে বা যে লটকানো চার্টগুলোর কিছু আছে, কিছু ছিঁড়ে পড়ে গেছে তার থেকে দেখে থানাতে ওঠা যাত্রী বের করা, এটুকু সময়ে অসম্ভব।"

"যদি খবর পেতেন ঐ ট্রেনে একজন টেররিস্ট আসছে?"

"তবে কোনও স্টেশনে আমাদের লোক ঢুকিয়ে ট্রেন ছেঁকে ফেলতাম, হাওড়া স্টেশনেও তাই। দরকার হলে কোথাও ট্রেন দাঁড় করাতাম। কিন্তু তোমার যেটুকু সন্দেহ তার ভিত্তিতে তো এতসব –"

"বুঝলাম।" পেঁচোর চোয়াল হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। বলল, "ঠিক আছে, আমিই খবর বের করে নিচ্ছি। তবে তাতে যদি একটু ডানদিক-বাঁদিক হয়, আপনি পরে সামাল দিতে পারবেন?"

"আরে কী করতে যাচ্ছো, শার্লকবাবু?" মোহনদা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "বেশ, আমি সামলে দেব – তবে খুন-জখম অবধি এগিও না। আর আমি আমাদের একজনকে বলে দিচ্ছি – সে নাম বলবে সুশান্ত আর কাল পৌনে ছ'টার থেকে হাওড়া স্টেশনে থাকবে। তোমার জি-মেলের প্রোফাইল পিকচার ওকে হোয়াটসঅ্যাপ করছি। আর তুমি একটা নীল রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে চশমার কাঁচ মুছবে। তবেই ও তোমাকে চিনে নেবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, মোহনদা।" লাইনটা কেটে দিয়েই পেঁচো আবার ব্যস্ত হাতে ডায়াল করতে লাগল, এবার মানসীদিকে।

"তুমি কি আমায় জেলে পাঠাতে চাও, পেঁচো!" মানসীদি আর্তনাদ করে উঠলেন, "রেলের ডেটাবেস হ্যাক করা – আমার আধা-সরকারি চাকরি –"

"ভয় নেই, প্রোটেকশন ঠিক করেই আপনাকে বলেছি। আর এটা এমন কিছু সিক্রেটও নয়, ট্রেনের গায়েই তো প্যাসেঞ্জার লিস্ট ঝুলছে।"

"বেশ বলো, তুমি ঠিক কী চাও।"

"ঐ ট্রেনের চার্ট থেকে থানাতে হাওড়ার যাত্রী যারা উঠেছে তাদের থেকে এই ধরুন বিশের কম বয়সের মধ্যে কোনও ছেলে বা মেয়ে থাকলে তাদের একটা কামরার নম্বর ওয়ারি লিস্ট আমাদের চাই।"

"ব্যস – মাত্র এইটুকু ক্লু, তার থেকে স্রেফ ক'ঘণ্টার মধ্যে –"

পেঁচো এবার সংক্ষেপে মানসীদিকে কেসটা বুঝিয়ে দিল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, "তাহলে বুঝতে পারছেন মানসীদি, আপনার ওপর একটা অল্পবয়েসী ছেলের, বা মেয়ের নিরাপত্তা নির্ভর করছে।"

"আর বলতে হবে না।" মানসীদির কণ্ঠে এবার দৃঢ়তার ছাপ, "ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে তোমাকে জানাচ্ছি।"

তারপর এক একটা মিনিট যেন এক একটা ঘণ্টা। পেঁচো পায়চারি করছে আর ঘন ঘন সময় দেখছে। এক সময় দু'ঘণ্টা কেটে গেল, আরও আধ ঘণ্টা। পেঁচো হতাশ হয়ে বলল, "মনে হচ্ছে, মানসীদিও ফেল! সত্যিই এইটুকু সময়ে –"

বলতে না বলতেই পেঁচোর ল্যাপটপে টুং করে ঘণ্টা – নতুন মেল এসেছে। সাথে সাথেই ওর মোবাইলও বেজে উঠল। মানসীদি!

"সরি পেঁচো, সব মিলিয়ে দেরি হয়ে গেল। তবে তোমার 'বকরা'কে পেয়েছি – সঞ্জয় কুলকার্নি, যাচ্ছে এসি টু টায়ারের কোচ টু'তে। ও এক বড় কাপড় ব্যবসায়ীর ছেলে। ওর ফেসবুক বান্ধবী দীপিকার সঙ্গে দেখা করতে ও কলকাতা আসছে। মানে, ঐ ফাঁদ পেতে ওকে আনা হচ্ছে।"

"কামাল, মানসীদি। আপনি এত তাড়াতাড়ি – আর ওসব খবর তো রেলের চার্টে থাকে না?"

একটু আত্মতৃপ্ত ভঙ্গীতে মানসীদি বললেন, "দ্যাখো, গোটা ট্রেনের চার্ট খুঁজতে ভোর হয়ে যেত। কিন্তু কিডন্যাপ তো বড়োলোকের ছেলেরই হওয়ার কথা। তাই আপার ক্লাস থেকে দেখতে শুরু করলাম। শেষে এসি টু-টায়ারে থানা থেকে ওঠা দু'জন ছেলেমেয়েকে পেলাম। তার মধ্যে পূজা ফ্যামিলির সাথে যাচ্ছে, সুতরাং সঞ্জয়ই হবে। আর একবার যখন নাম পেয়েছি, তখন ফেসবুকে ঢোকা কী আর এমন ব্যাপার! তার ওপর ছেলেটা সিকিওরিটি সম্বন্ধেও সচেতন নয়। কাজেই ফটাফট সব ডিটেইলস পেয়ে গেলাম। তোমাকে ওর ফোটো সহ সব বিবরণ মেলে পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার যাও, বদমাসগুলোকে ধরো।"

"শিওর মানসীদি! থ্যাঙ্ক ইউ।" পেঁচো থামস আপ সাইন দেখিয়ে আমাকে বলল, "এবার মোহনদাকে বলে স্টেশনে পুলিশ পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাক।" তারপর দ্রুত ডায়াল করতে লাগল।

একটু পরই কিন্তু ওর মুখ ফ্যাকাশে, "শিট, সেল আউট অফ রিচ! আবার কি কোনও অ্যাকশনে গেল?"

"হয়তো কলকাতার প্লেনে উড়ছে। তুই পুলিশ হেল্পলাইনে ফোন কর না।"

"দ্যাখ আমার তো, মানে গোয়েন্দা হিসেবে তেমন নামডাক নেই - তাই এত রাতে ওসব শুনে ওরা হেসে উড়িয়ে দেবে, বলবে কাল সকালে থানায় রিপোর্ট করতে। আর মোহনদা যে সুশান্ত মহাপ্রভুর কথা বলেছেন তিনিও তো কাল সকালের আগে কনটাক্ট করবেন না।"

"যাক গে, কাল সকালে চল আমরাই একটু আগে স্টেশনে গিয়ে ঐ কোচটা যেখানে পড়বে সেখানে অপেক্ষা করি। তাহলে সুশান্তও তোকে দেখে ওখানে আসবে।"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা, এখন ক'টা বাজে - সাড়ে এগারো? ইস, এক্ষুণি শুয়ে পড়তে হবে - নইলে কাল সকালে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবো না। দাঁড়া, সাড়ে চারটায় অ্যালার্ম দিই।"

"অত সকালে ট্যাক্সি পাবি?"

"এই মেইন রোডেই একটা স্ট্যান্ড আছে, ওখানে সব সময় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে।"

"তবে তো পাঁচটায় উঠলেই যথেষ্ট। এখান থেকে ঐ ভোরে হাওড়া যেতে বড়োজোর আধ ঘণ্টা।"

"ন্-না, মানে আমার একটু আগে উঠতে হবে। আমি সাড়ে চারেই অ্যালার্ম দিচ্ছি।"

তখন মনে পড়ল, অনেক ধীমান বাঙালির মতো পেঁচোরও একটু আমাশার দোষ আছে। সকালে বার কয়েক ছোটোঘরে না গিয়ে সে তাই বেরোতে ভরসা পায় না। সুতরাং পেঁচো সাড়ে চারেই অ্যালার্ম লাগাল। তারপর আমরা শুয়ে পড়লাম আর সারাদিনের ধকলের পর শুয়েই ঘুম।

একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল। দেখি, বাইরে দিব্যি ভোরের আলো। সেলটা হাতে নিয়ে দেখি, সোয়া পাঁচটা। সর্বনাশ! পেঁচোকে ধাক্কা দিলাম, ও ধড়মড়িয়ে উঠল।

"অ্যালার্ম বাজল না তো!"

পেঁচো দেখি মাথা চুলকোচ্ছে। তাবড় তাবড় সমস্যার সমাধানে ওর দুর্ধর্ষ মাথা। কিন্তু ছোটোখাটো, সাধারণ ব্যাপারে কেলো করে প্রায়ই তার সুফল জলাঞ্জলি দেওয়ার উপক্রম করে। ওর মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহ হওয়ায় বললাম, "অ্যালার্ম দিসনি?"

"দিয়েছি, বোধহয় ভুল করে এ-এম-এর বদলে পি-এম -"

কী বলবে বলো! বললাম, "নে, এবার চল - এখনও ট্রেন ধরা যাবে।"

"শিওর।" পেঁচোর হাতেপায়ে এখন যেন বিদ্যুৎ। ছোটোঘর-ফর মাথায় রইল - পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে দু'জন রাস্তায়।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে তাকিয়ে কিন্তু বিপদ সঙ্কেত পেলাম। ভোর হয়ে গেছে দেখেই বোধহয় গাড়িগুলো একে একে বেরিয়ে গেছে। শেষ ট্যাক্সিটিকে হাত দেখিয়ে একজন ঘাড়ে-গর্দানে প্রৌঢ় ধীরেসুস্থে এগোচ্ছেন। হঠাৎ একটা কালো বিদ্যুৎ খেলে গেল। প্রায় একশো মিটার স্প্রিন্ট করে পেঁচো মোটাবাবুর আগেই ট্যাক্সিতে পৌঁছে তার লিকলিকে পেঁচো-গতর সামনের দরজা দিয়ে ট্যাক্সির ভেতরে ঠেলে দিয়েছে। অমন পান্তোভূতের মতো এক স্পিশিস কাকভোরে হাওয়ায় উড়ে হাজির হওয়ায় ট্যাক্সি ড্রাইভারের এমনিতেই বাক্‌রোধ হবার জোগাড়। তারপর পেঁচো যখন তর্জন করে বলল, "জলদি চলো, ডাকু, ভাগ যায়েগা", সে কেঁদেই ফেলল। ততক্ষণে আমি হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির হয়েছি। শুনতে পেলাম লোকটা কাঁদোকাঁদো গলায় বলছে, "ডাকু সাব, আপ

ট্যাক্সি লেকর ভাগ যাইয়ে। লেকিন মুঝে ছোড় দিজিয়ে, গরিব আদমি।" অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমরা রওনা দিলাম।

ভূত না ডাকু কীসের ভয়ে জানি না, লোকটা আমাদের প্রায় উড়িয়েই হাওড়া হাজির করল। ছ'টা বাজতে দশ। নেমেই ছুটেছি ভেতরে, প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটার শিষ্টাচারের সময় নেই। গেটে পেঁচো চেকারকে জিজ্ঞেস করল, "মুম্বই মেল ক'নম্বরে আসছে?"

"আঠেরো নম্বরে এসে গেছে।" চেকারটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

"সে কী, এখনও তো দু'মিনিট বাকি!"

"কুড়ি মিনিট বিফোর টাইমে ঢুকেছে।" চেকারটি দয়ালু কণ্ঠে বললেন, "কাউকে রিসিভ করবেন বুঝি? যান, তাঁরা হয়তো প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছেন।"

"এদের কোনও পাংচুয়ালিটি নেই!" বিড়বিড় করতে করতে পেঁচো দৌড়োল। এসি টু টায়ারের কাছে গিয়ে দেখি, ভোঁ-ভাঁ। প্যাসেঞ্জাররা নেমে চলে গেছে।

"পাখি উড়ে গেছে।" বলল হতাশ পেঁচো।

"অন্তত ঐ সুশান্তকে তো ধর, নীল রুমালটা দিয়ে চশমার কাঁচ মোছ।"

"তাড়াহুড়োয় রুমালটা আনতে ভুলে গেছি।" বলে এক মুহূর্ত ভেবে পেঁচো বলল, "চটপট চল। এখন একমাত্র আশা হাতিবাগানের যতীন রায়ের ঠিকানাটা। যদি ভুয়ো না হয়, ওখানে গেলে কিছু সূত্র মিলবে।"

আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। যখন বেরোচ্ছি, হঠাৎ একজন গাঁট্টাগোট্টা লোক একবার নিজের স্মার্টফোনে, একবার পেঁচোর মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললেন, "আপনি কি –"

"কেউ না, কিছু না!" বলতে বলতে পেঁচো আমার হাত টেনে বেরিয়ে এল।

বললাম, "এই বোধহয় সেই সুশান্ত?"

"গুলি মার!" পেঁচো দৌড়োতে দৌড়োতে বাইরে এসে আবার একটা ট্যাক্সি বলতে গেলে ছিনতাই করে তার ভেতরে ঢুকেই "হাতিবাগান" বলে হাঁফাতে লাগল।

কী সৌভাগ্য, ঠিকানাটা পেঁচোর সেলে নোট করা ছিল। কিন্তু হাতিবাগানের অলিগলি ঘুরে তা খুঁজে পাওয়া কি সোজা? শেষে ট্যাক্সি ছেড়ে আমরা পয়দলে চললাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি, পেঁচো মুখ বিকৃত করছে।

"পেটটা মোচড়াচ্ছে। ইয়ে, মানে, সকালে ঐটা ক্লিয়ার করে বেরনো হয়নি কিনা।"

সর্বনাশ! বললাম, "ব্রাহ্মমুহূর্তে – ডোবাস নে, পেঁচো। এখানে এখন সুলভ শৌচালয় কোথায় পাবি!"

পেঁচোও আপ্রাণ লড়ছে, তবে সে যেন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু সঙ্কট মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। রাস্তার বাঁপাশে এক পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি, পেঁচো সোজা দরজায় গিয়ে বেল মারল।

"কাকে চাই? কী চাই?" ঘুমজড়ানো চোখে দরজা খুলতে খুলতে বললেন এক মাঝবয়েসি ভদ্রলোক।

"কাউকে চাই না, বিশেষ কিছু চাই না।" পেঁচো ফস করে তার আই-কার্ড বের করে বলল, "আমি এক সজ্জন ব্যক্তি। রাস্তায় বেরিয়ে খুব বিপদে পড়ে শুধু আপনার টয়লেটটা মিনিট পাঁচেকের জন্য চাইছি।"

"আরে, আসুন, আসুন!" ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে পেঁচোকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম, কাউকে জিজ্ঞেস করে যদি যতীনের ঠিকানাটার হদিস মেলে।

এই বাড়ির পিঠোপিঠি পাশের গলির ওপর যে বাড়ি চোখে পড়ে, সেটাও দোতলা। তার বাইরে কিছুটা গাছপালা সহ কম্পাউন্ড। সেদিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ আমার চক্ষু চড়কগাছ। দোতলার ঘরের একটা জানালা, সেখান দিয়ে একটা ছেলে ভীত মুখে উঁকি মেরে কী যেন বলতে চাইছে। কোথায় দেখেছি না একে? ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল এ সেই ফেসবুক বকরা সঞ্জয়, যার ছবি মানসীদি পাঠিয়েছে!

বিশেষ কিছু না ভেবেই সামনের বাড়ির গেট টপকে ঢুকে গলি দিয়ে পেছনের পাঁচিলের দিকে এগিয়েছি, হঠাৎ দেখি সঞ্জয়ের মুখের ওপর একটা হাত। আর একটা হাত তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল।

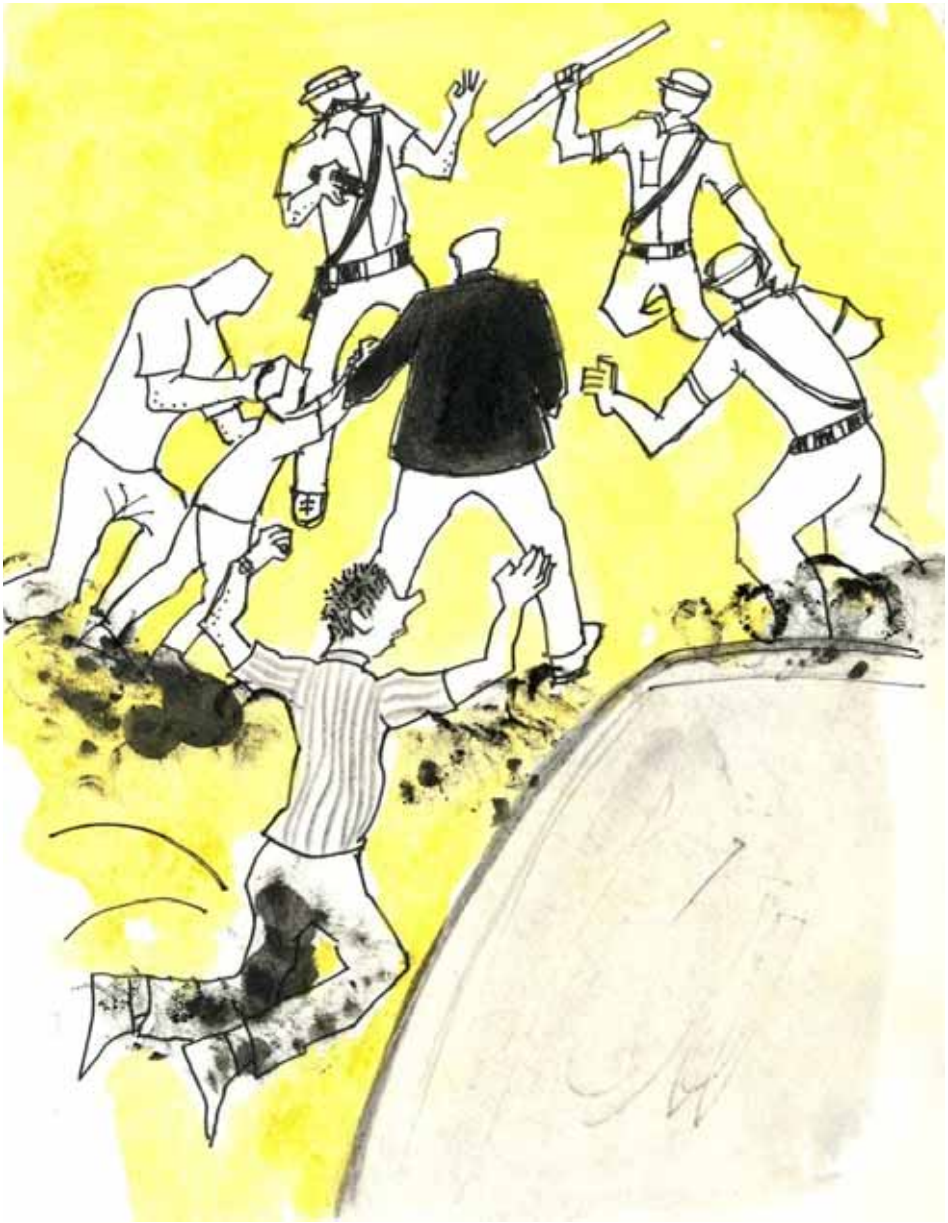
"পেঁ-চো-ও-ও!" চিৎকার করে ডাকলাম।

"দে-খে-ছি-ই-ই!" বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ গলায় জবাব এল। সাথে সাথে দোতলার টয়লেটের হাফ-জানালা দিয়ে একটা লিকলিকে বিদ্যুৎ ঝাঁ করে বেরিয়ে পাশের বাড়ির দেয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর পাইপ ধরে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে এক লাথিতে ওই জানালাটা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল।

পেঁচো ওর পান্তোভূতের মতো নমনীয় চেহারা নিয়ে ঝাড়পিটের সমস্ত ব্যাকরণের বাইরে গিয়ে একটা গ্যাংকে একাই কেলিয়ে লাট করতে পারে, এটা আমরা ছোটোবেলার থেকেই জানি। কিন্তু এই কিডন্যাপারের দল সশস্ত্র থাকতে পারে ভেবে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। বিপদে আমার বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। মোহনদাকে ফোন করলে হয়, এটা মাথায় এল না। পাঁচিল ডিঙোবার চেষ্টা করলাম। না পেরে শেষে পেছিয়ে এসে ঘুরপথে ঐ বাড়ির সামনের দিকে রওনা দিলাম। আসার আগে শুনতে পেলাম গৃহস্বামী আকূলভাবে টয়লেটের দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বলছেন, "ও মশাই, আপনার হল? টেঁপি আর থাকতে পারছে না।"

ওখানে পৌঁছে অবশ্য দেখলাম, অবস্থা তত খারাপ নয়। 'পেঁচোর পাঁচন' যথারীতি জনাতিনেককে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। কিন্তু একজন স্যুট-বুট পড়া লোক তার মধ্যেই এক ফাঁকে সঞ্জয় ছোকরাকে টানতে টানতে এসে একটা গাড়িতে উঠল আর পেঁচো ভিড় ঠেলে নিচে নেমে আসার আগেই স্টার্ট দিল। সামনে দাঁড়িয়ে আটকাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু গাড়িকে ভয়ঙ্কর স্পিডে ছুটে আসতে দেখে সরে দাঁড়াতে হল।

"গেল, গেল!" পেঁচো হাহাকার করে উঠল। তখনই দুম-দুম দুটো পিস্তলের শব্দ, তারপর ফটাস-স-স করে টায়ার ফাটার আওয়াজ। ফেরারি গাড়ি কেতরে কেতরে কাত হয়ে শেষে দাঁড়িয়ে গেল।



"হ্যান্ডস আপ!" কয়েকজন সাদা পোশাক গাড়ি ঘিরে ধরেছে। তাদের মধ্যে স্টেশনে দেখা সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিকেও চোখে পড়ল। একটু পর অবশ্য কাঁধে এক দশাসই থাপ্পড়ে আর আশ্বাসভরা স্বরে "সব ঠিক আছে, শালাবাবু" শুনে সব সংশয় দূর হয়ে গেল – মোহনদা!

"আপনারা – এখানে – কী করে?" পেঁচোও অবাক।

"সুশান্ত তোমাকে ঠিক স্পট করেছিল। তুমি বোকার মতো ওকে এড়িয়ে গেলেও ও তোমাকে ফলো করে এখানে পৌঁছেছিল আর আমাদেরও খবর দিয়েছিল। যাকগে, খেল খতম। এবার আমার সঙ্গে চলো – ব্রেকফাস্ট করতে করতে পুরো গপ্পোটা শোনা যাবে।"

তারপর আর কী? সব ভালো যার শেষ ভালো। কিডন্যাপাররা সব ধরা পড়ল। তাদের গ্যাংয়ের অন্য অনেকেও টানে টানে পুলিশের জালে এল। সোশ্যাল মিডিয়ার সুযোগ নিয়ে এর আগেও তারা বেশ কিছু ছেলেমেয়েকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ আদায় করেছে বলে জানা গেল। এদের মধ্যে চন্দন রায় নাকি ছিল এক ব্যর্থ কবি। তার সঙ্কেতের দুর্বোধ্যতা কেউ ভেদ করতে পারত না দেখে সে হতাশ হয়ে কবিতা ছাড়ে। কিন্তু তার এক অনুরাগী পাঠক যতীন চক্রবর্তী চন্দনের এই প্রতিভাকে কাজে লাগায় তাদের দলের মেসেজ নিরাপদে পাঠাবার জন্য। কোনও চিহ্ন যাতে না থাকে তাই তারা অনবরত নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করে খবর পাঠাত,

আবার পুরনোটা ডি-অ্যাকটিভেট করে দিত। সবই ঠিকঠাক চলছিল, শুধু চন্দন ভুলে যতীন চক্রবর্তীর মেল জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে কেলোটা করল।

সঞ্জয় নিরাপদে বাড়ি ফিরে গেল। কৃতজ্ঞ সঞ্জয়ের বাবা পেঁচোর সাথে দেখা করে তার আপত্তি সত্ত্বেও এক মূল্যবান স্যুটপিস প্রেজেন্ট করে গেলেন। পেঁচোর নাম বড় করে কাগজে বেরোল। অবশ্য ঘটনার হ্যাকিং প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক অংশ গোপন রেখে গপ্পোটা মিডিয়াকে নতুন করে পরিবেশন করা হয়েছিল। মানসীদির নাম তাই গোপনই থাকল। তবে কিছু কাগজে এক অসমর্থিত সংবাদে ইন্ডিয়ান রেলের ডেটা বেস হ্যাক হবার কথা বেরিয়েছিল। সেটা ক্রিকেট খেলায় হেরে ক্ষুব্ধ প্রতিবেশী দেশের কোনও ফ্যানদের কাজ বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হল। তবে রেলওয়ে জানাল কোনও গোপন তথ্য নয়, শুধু ইতিমধ্যে প্রকাশ হওয়া কিছু তথ্যই হ্যাকারদের হাতে পড়েছে।

মানসীদিকে পেঁচো যখন কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছিল, তিনি উল্টে ধরা গলায় ওকেই অনেক ধন্যবাদ জানালেন গ্যাংকে ধরে অনেক ছেলেমেয়েকে বাঁচানোর জন্য। তবে তারপর তিনি বললেন, "তাহলে তো বুঝলে আমি যে আপ্রাণ চেষ্টায় ছেলেমেয়েদের আগলে রাখি সেটা ওদের নিরাপত্তার জন্যই করি?"

"আসলে আপনাদের গার্জেনদের দোষ কী, জানেন?" পেঁচো হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আপনারা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেন না। তাই ওরা আপনাদের কাছে কিছু খুলে বলে না আর তারপর হয়তো একদিন বিপদে পড়ে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মানসীদি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "তুমিই বোধহয় ঠিক।"

কিছুদিন পর পেঁচোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মানসীদির সেই রিজিউমে নেওয়া, কীসব পাকাপাকি বন্দোবস্ত - সেটা শেষ অব্দি কী দাঁড়াল রে?"

"ন্-না, তেমন কিছু নয়।" পেঁচো বলেছিল। আমার কিন্তু মনে হল, ওর এই নীরবতার পেছনে কোনও রহস্য আছে।

কিছুদিন পর অবশ্য সেই রহস্য ভেদ হয়েছিল, যেদিন পেঁচো একটা বিয়ের চিঠি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। "কার রে?" না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারপর ওর লজ্জায় বেগুনি মুখটা দেখে চটপট খুলে দেখলাম - জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সাথে কুহেলি সান্যালের বিয়ে।

"ডুবে ডুবে জল খাওয়া!" ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিলাম, "তা, তিনি কে? চিনি?"

"মানসীদির মাসতুতো বোন। মানে, হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল।"

কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকার পর বলেছিলাম, "চোরে চোরে কী যেন হয় - তা ইনিও কি -"

"অন্তত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো তো হ্যাক হবেই।" পেঁচো হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।



ছবিঃ মৌসুমী



উদয়ারুণ রায়

গল্পেরও গল্প

মেলা বা সার্কাস আমার কমবেশি সকলেই দেখেছি। ছোটবেলায় বাবা-মা জেঠা-কাকার হাত ধরে। একটু বড়ো হলে একা একা বা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আর আমার মতো প্রৌঢ় হলে নাতি-নাতনীর আঙুল ধরে। আমরা মেলায় গেছি। নগর দোলনা বা বিভিন্ন মজাদার খেলা দেখছি বা চড়েছি। নানান খাবার-দাবার খেয়েছি। মনে খুব আনন্দ হয়েছে তারপর বাড়ি ফিরে এসেছি। কিন্তু আমরা এই মেলাওয়ালাদের সুখ- দুঃখের খবর কি কখনও রেখেছি? কারা এই মেলায় থাকে, তাদের বাড়ি কোথায়? মেলাওয়ালাদের জীবনযাত্রা কীরকম এর খেয়াল কি আমরা করেছি? মনে হয় না। একসময় টানা পাঁচ বছর আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই মেলাওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে এ মাঠ থেকে ও মাঠ, এ শহর থেকে ও শহর, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম, এমন কী এ রাজ্য থেকে ভিন্ন এক রাজ্যে ঘুরে বেরানোর। আমি খুব কাছ থেকে এদের জীবন যাত্রা, সুখ-দুঃখ, শিক্ষা- সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করেছি। মেলার মজা সাধারণত উপভোগ করে থাকে শিশু, কিশোর কিশোরী আর একদম এগিয়ে যুবক যুবতীরা। আমি চাই আমার এই প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে আমার গল্প পড়ে তারা জানুক অসহায়, নিরন্ন, যাযাবর, কিছু মানুষের জীবনযাত্রার কথা। এ গল্প গল্প নয়, অনেকাংশে সত্য ঘটনা। আমি মনে করি আমার গল্পের বাচ্চা মেয়ে মংলি বা তার ওস্তাদ ফুল কোনো অংশে বাংলার স্পোর্টস হিরো সৌরভ গাঙ্গুলীর থেকে কম নয়। তাদের জীবনে সঙ্গে লড়াই। ভয়ঙ্করের সঙ্গে আলিঙ্গন লর্ডসের মাঠে সৌরভের জামা ওড়ানোর মতোই বীরগাথা।

মরণকুঁয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু ঘাবড়েই গেল মংলি। পাহাড়ের মেয়ে সে। জন্ম থেকে পাহাড় দেখছে। তাই উচ্চতা তাকে অবাক করে না। ভয়ও দেখায় না। উলটে উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোই ওর বন্ধু। ওর কল্পনার উড়াণ। তবুও পাঁচ- ছয় ফুট তফাতে মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে যাওয়া খাড়া কাঠের পাটাতনগুলো দেখে কেমন গা ছম ছম করে উঠল মংলির।

ও নেপালি। বাড়ি দার্জিলিং জেলায়। ওর বাবা শিলিগুড়ি শহরে রিকশা চালায়। মা বড়োলোক বাড়িতে বাসন মাজে। রান্নার ফাইফরমাশ খাটে। ওদের বাড়ি তিস্তা নদীর ধারে একটা ঝুপড়ি বস্তিতে। বাড়ির সামনে দিয়ে একটু নেমে গেলেই প্রথমে বালি, পাথর তারপর জল। নদীর বয়ে যাওয়া জল। বাড়িতে থাকলে মংলি নদীতে গিয়ে স্নান করে। নদীতে ডুবজল নেই। উবু হয়ে বসলে কোমর পর্যন্ত ডোবে। তারপর বাটি বা মগ দিয়ে স্নান করতে হয়। কী ঠান্ডা জল! মংলির শীত শীত করে ওই জলে। বর্ষায় নদীতে জল ভরে যায়। তখন ডুবজল। সে সময় মংলির মা ওকে নদীতে নামতে দেয় না। তিস্তা নদীর মাঝখানে গেলে দূরে মেঘের মতো আবছা পাহাড় দেখা যায়। মংলিকে পাহাড় খুব টানে।

বছর তিন হল মংলিরা শিলিগুড়ি এসেছে। মংলির বয়স এখন দশ। ওদের বস্তির সামনে একটা স্কুল আছে। প্রাইমারি স্কুল। সেই স্কুলে ক্লাস ফোর এ পড়ত সে। স্কুলে মাত্রে দুটো দিদিমণি। আর দুজন রান্নার মাসি। স্কুল থেকে রোজ দুপুরে খেতে দিত। ভাত, ডাল, সোয়াবিনের তরকারি মাঝে মাঝে খিচুড়ি। সপ্তাহে একদিন ডিম। খাবার লোভে মংলি একদিন ও স্কুল কামাই করত না। তার পড়াশোনাতে মন নেই। ক্লাসে পড়া পারত না। দিদিমণিরা বকত। তবু মংলি স্কুলে যেত। স্কুলে টিফিনের সময় গরম গরম খাবার খাওয়াটা দারুণ। পেট ভরে খেত মংলি।

তিন বছর আগে মংলিরা ওদের গ্রামে থাকত। ওখানে চারদিকে পাহাড়। মাথার উপর ঝকঝকে নীল আকাশ। পাহাড়ি ঝোড়া। ঝোড়ার জল তিস্তার থেকেও ঠান্ডা। গ্রামে দাদু- ঠাকুমা ছিল। ছিল কাকা- কাকিমা।

পাহাড়ে ঢাল বেয়ে ওরা ওর বন্ধুরা দল বেঁধে নীচে নেমে যেত আবার দৌড়ে ওপরে উঠত। পাথর গাছপালার আড়ালে লুকোচুরি খেলত। রাতে যেদিন চাঁদ উঠত আকাশে সেদিন পাহাড়ের গা বেয়ে রুপোলি ঝর্ণার স্রোত বয়ে যেত। গোল চাঁদের সেই মিষ্টি আলো অবাক হয়ে দেখত মংলি। চারদিকের পাহাড়গুলোকে তখন কী সুন্দরই না লাগত তার!

কিন্তু বাবার যে কী খেয়াল চাপল! রোজগারের জন্য ওদের নিয়ে চলে এল শহরে। শহরে একটুও ভালো লাগে না মংলির। সে শহর ছেড়ে পালাতে চায়। তার ভালো লাগে পাহাড়, মাটি, গাছ, ফুল, প্রজাপতি, ফড়িং, নানান রঙের পাখি। ঝোড়ার জলের শব্দ, ঠান্ডা জলের ছিটে, নীল আকাশ আর গোল চাঁদের ফুটফুটে রুপোলি আলো।

তাই মা বলার পড়েই এক কথায় রাজি হয়ে গেল মংলি। তার মা যে বড়োলোক বাবুদের বাড়িতে কাজ করে সেই বাবুদের মেলার ব্যাবসা। মেলাতে নাগরদোলনা আছে। আছে নানান রকম চরকি দোলনা, টয়ট্রেন। আর আছে মরণ কুঁয়া। হিন্দিতে যাকে বলে "মওত্ কা কুঁয়া"। ওই মরণ কুঁয়ার জন্য একটা বাচ্চা মেয়ে লাগবে। তাই মংলিকে তার মায়ের কাছ থেকে চেয়েছেন সেই বাবু। বলেছেন, "যদি আমাকে দিস তবে ওকে আমি মানুষ করে দেব। ওর কোনো দিন ভাতের অভাব হবে না। এমন খেলা ওকে শিখিয়ে দেব আমি। একদিন দেখবি ওই তোদের সংসার টানবে।"

মংলির মা তার বাবুর কথা বাড়িতে ফিরে মংলি আর ওর বাবাকে বলেছে। বাবা কিছু বলবার আগেই মংলি বলেছে, "আমি তোর বাবুর সঙ্গে যাব।"

আসলে মংলির ওই শহরে ঝুপড়িতে থাকতে একটুও ভালো লাগে না। ওর চাই পাহাড়। খোলা আকাশ। আর মেলাতে তো কত আনন্দ। কত নাচগানা। কত মানুষ। কত আলোর ঝকমক। আজ এখানে মেলা বসে তো কাল ওখানে। বেশ মজা। খুব মজা। খেলাও শেখা যাবে। বড়োলোক বাবু নিশ্চই পেট ভরে খেতে দেবে। মংলির মন মুহূর্তে ওদের ঝুপড়ি ছেড়ে উড়ে যায় মেলার মহলে।

মংলির বাবা ওর মাকে বলে, "মংলি মেলায় গেলে কত টাকা দিবে তোর বাবু?"

মংলির মা একগাল হেসে বলে, "মংলির খাওয়া পড়া ছাড়া চার হাজার টাকা দিবে প্রতি মাসে। তুই অত রোজগার করতে পারিস না রিকশা চালিয়ে।"

বাবা- মা'র কথা মংলি শুনতে পায় কিন্তু ওর কানে সে সব কথা ঢোকে না। ওর মন তখন মেলার মাঝখানে। শিলিগুড়িতে সে একবার মেলায় গিয়েছে। মার সঙ্গে। উরিবাব্বা! কত উঁচু নাগরদোলনা! কু ঝিক্ ঝিক্ টয়ট্রেন। চরকি দোলনা। তাতে কাঠের হাতি, ঘোড়া, বাঘ সিংহ ঝুলছে আর বনবন করে ঘুরছে। এছাড়া আর একটা আছে ব্রেকডান্স। চেয়ারে বসে উলটো পালটা ঘুরপাক। ওটায় খুব ভয়। মাথা ঘুরে যাবার ভয়। মংলি ওটা কোনোদিন চড়বে না। যদিও সে শুধু দেখেছেই। একটাতেও চড়েনি সে। ওদের তো চড়বার মতো পয়সা নেই! মার কাছেও নেই।

মা ওকে মেলাতে একটা বুড়ির চুল কিনে দিয়েছিল দু টাকা দিয়ে। একটা কাঠির মধ্যে মিষ্টি লাল চুলের মতোন জড়ানো। খেতে খুব মজা। মংলি ভাবে ও যদি মেলায় চলে যায় তবে তো সে মেলার লোক হয়ে যাবে। তখন যত খুশি নাগরদোলনা চড়তে পারবে। যত খুশি চড়কি দোলনা চড়তে পারবে। ব্রেকডান্স সে চড়বে না। ওটা খুব বাজে । ট্রেন চড়বে সে। কু ঝিক্ ঝিক্ ট্রেন। নৌকা চড়বে সে। নৌকাটা বেশ ভালো হুম করে সামনের দিকে ওঠে আবার ভুস করে সামনে দিকে ওঠে আবার ভুস করে নেমে পিছনের দিকে উঠে যায়। একটু ভয় করলেও দোলনা চড়ার মতো মজা আছে নৌকা চড়ায়। সে মাকে বলে, "অ্যাই মা, আমি যাব তোর বাবুর সঙ্গে। আমি খেলা শিখব, নাগরদোলনা চড়াব। তোর বাবু বলেছে না আমি বড়ো হয়ে তোদের দেখব? বহুত টাকা কামাব? তুই তোর বাবুকে বলে দে আমি যাব ওর সঙ্গে।"

মংলির মার চোখ ছলছল করে ওঠে। মংলি ওদের একমাত্র সন্তান। ওকে ছেড়ে দিতে মন চায় না। কিন্তু এই ঝুপড়িতে থেকে ওর কিচ্ছু হবে না সেটা বোঝে তার মা। বাবুর সঙ্গে মেলায় গেলে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। খেলা শিখে ওস্তাদ বনবে। প্রচুর টাকা কামাবে। বাড়ি বানাবে। ঝুপড়িতে আর থাকতে হবে না। মংলির মার

চোখেও স্বপ্ন ভেসে ওঠে। সে চোখের জল মুছে বলে, "বাবুরে কইব তোরে নিয়া যেতে। তোর ভবিষ্যৎ হবে। তুই বড়ো হবি। আমাদের দুঃখ কষ্ট ঘোচাবি।"

****

মরণ কুঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে মংলির একটু ভয়ই লাগছিল। পাতালে যেন দাঁড়িয়ে আছে সে। চারদিকে লম্বালম্বা কাঠের পাটাতনের প্রাচীর ক্রমশ চওড়া হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। নীচে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবার মত লম্বা, গাঁট্টা-গোঁট্টা পেটানো চেহারার একটা কালো মানুষ। মাথায় কোঁকড়ানো চুল।

কালো লোকটার নাম ফুল। আর তার পাশে মায়ের বড়োলোক বাবু শিবু ঘোষ। ফর্সা ছোটোখাটো চেহারা। চকচকে জামাপ্যান্ট। মাথায় কিছু কাঁচাপাকা চুল। ডানহাতের আঙুলগুলোয় চারপাঁচটা সোনার আংটি। গলায় মোটা সোনার চেন। বাঁ হাতে সোনালি রঙের ঘড়ি। পায়ের জুতোটা এত চকচকে যে তা দিয়ে মুখ দেখা যায়।

শিবু ঘোষ মংলিকে বলল, "কীরে মংলি দেখলি তো সব কিছু। এই কুঁয়ায় একদিন তোকে বাইক চালাতে হবে। এই ফুল দাদা এখন চালায়। নীচ থেকে বাইক চালিয়ে কুঁয়ার গা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপর দিকে ওঠে এই ফুল দাদা। হাত ছেড়েও বাইক চালায় ও। তোকেও ওর কাছে ট্রেনিং নিয়ে ফুলের মতো ওস্তাদ হতে হবে। পারবি তো?"

শিবু ঘোষ যখন কথা বলছিল ফুল নামে লোকটা মাথা নীচু করে মিচকি মিচকি হাসছিল। মংলি বুঝতে পারছিল না সে কী বলবে। ও তো মোটর বাইক চালাতেই জানে না। মংলি বড়োলোক বাবুর কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শিবু ঘোষ আবার বলল, "ফুল এই বাচ্চা মেয়েটাকে তোর চ্যালা বানিয়ে বানিয়ে নে। তুই ওর গুরু। ওকে কুঁয়ায় বাইক চালানো শেখাবি। আমি জানিনা কীভাবে শেখাবি। আমি চাই ছ'মাস পরে ও তোর সঙ্গে কুঁয়ায় বাইক চালাবে আর এক বছরের মধ্যে একা একা মরণ কুঁয়ায় খেলা দেখাবে তোর শো-এর আগে। এ অঞ্চলে "মওত্ কা কুঁয়া" যতগুলো আছে তার মধ্যে মেয়ে রাইডার কারুর নেই। তুই ওকে মেয়ে রাইডার বানা। আমি সকলকে তাক লাগিয়ে দেব। টিকিটের দাম বাড়িয়ে দেব। তোর মাইনেও বাড়িয়ে দেব।"

টানা কথা বলে থামল শিবু ঘোষ।

ফুল মাথা নেড়ে বলল, "জি হুজুর।" মংলি তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে 'মরণ কুঁয়া।'

ফুলের তাঁবুতে ফুল আর ওর বউ পদ্মা থাকে। সেই তাঁবুতেই মংলির থাকার ব্যবস্থা হল। ওদের চৌকির একটু দূরে বাঁশ আর কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি হল ওর শোবার চৌকি। এতদিন সে কখনও মাকে ছাড়া একা শোয়নি। এখন ওকে একা একটা খাটে শুতে হল। মার জন্য ওর কষ্ট হল খুব। দু-তিন দিন রাতে একা শুয়ে খুব কাঁদল সে। খুব কাঁদল। কিন্তু ওই পদ্মাবৌদি ছাড়া কেউ ওর কষ্ট বুঝল না। জানতেই পারল না কেউ।

একদিন ও কাঁদছে দেখে পদ্মাবৌদি ওর চৌকিতে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "কাঁদিস না বোন। আমাদের গরিবদের জন্য এ দুনিয়া বড়ো কঠিন। এখানে চোখের জলের দাম কেউ দেবে না। আমরা এখানে মানুষকে মজা দিতে এসেছি। আমাদের খেলা দেখে মানুষ মজা পায়। হাততালি দেয় আর তারপর চলে যায় যে যার বাড়িতে। আমাদের দুঃখ বোঝার কেউ নেইরে বেটি।"

পদ্মাবৌদির কথা কিছু বুঝতে পারে না মংলি। সে শুধু মা হারাবার দুঃখে কেঁদেই চলে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় চোখের জল ফুরিয়ে যায়। সে মিশতে থাকে মেলার মানুষদের সঙ্গে। বাবলু বলে একটা ছেলের সঙ্গে ওর ভাব হয়। ছেলেটা ওর থেকে একটু বড়ো। আসামের বড়পেটা বাড়ি। ও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। বাবলুরও ঘরে থাকতে ভালো লাগত না। বাইরের জগৎটা দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে মেলায় এসে পড়ছে। এখন সে মালিকের তাঁবু পাহারা দেয়। মালিকদের ফাইফরমাশ খাটে আর মালিকদের স্পেশাল যা রান্না হয় সেই রান্নাটা সে করে।

বাবলুর সঙ্গে ভাব হওয়াতে মংলি মাঝে মাঝে মালিকদের স্পেশাল রান্না থেকে ভাগ পায়। বাবলু এনে দেয়। ভালো মাছ, মাংস। বাবলুর থেকে পাওয়া খাবার মংলি একা খায় না। ওর গুরু ফুলদাদা আর পদ্মাবৌদির

সঙ্গে ভাগ করে খায়। ফুলদাদাও নিজের তাঁবুতে স্পেশাল রান্না করায় পদ্মাবৌদিকে দিয়ে। পায়রার মাংস অথবা শুয়োরের মাংস। দেশি ব্যাঙের ছাতাও পদ্মাবৌদি খুব ভালো রান্না করে। আলু দিয়ে দেশি ব্যাঙের ছাতা খেতে মাংসের মতো লাগে। মংলি সেদিন এক থালা ভাত খায়। বাবলু যখন ওকে মালিকের রাউটির স্পেশাল রান্না চুপি চুপি খাইয়ে যায়, মংলি তার বদলে পদ্মাবৌদি স্পেশাল যা রান্না করে সেই রান্নার থেকে চেয়ে বাবলুকে দেয়। অনেক সময় নিজে সে রান্না না খেয়েও বাবলুকে দিয়ে দেয়। বাবলুকে ওর নিজের দাদার মতো মনে হয়।

মংলী ধীরে ধীরে আরও মেলার অন্যদের সঙ্গে মিশতে থাকে। ছোটো ছোটো অনেকগুলো তাঁবু পড়ে মেলাতে। তাঁবুকে মেলার লোকেরা বলে রাউটি। একটা মালিকের রাউটি। আর একটা ম্যানেজারের রাউটি। এছাড়াও প্রত্যেকটা শো এর দুটো করে রাউটি পড়ে। যে রাউটিগুলোতে কর্মচারীরা থাকে। একটা রান্নার রাউটি হয়। সেখানে থাকে মেলার ঠাকুররা। যারা মেলার সকলের জন্য রান্না করে। ডাল, ভাত আর একটা তরকারি রান্না হয় সকলের জন্য দুইবেলা। মাঝে মাঝে ডিম বা মাছ। মাসে একদিন মাংস। মাছ, মাংস বা ডিম যেদিন হয় সে দিন খাবার পরিবেশন করার সময় ম্যানেজার নিজে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নইলে ঠাকুরদের সঙ্গে খাবার নিয়ে মেলার স্টাফেরা ঝামেলা করে। ম্যানেজার দাঁড়িয়ে থাকলে সেটা হয় না।

ম্যানেজারের খুব ডাকাবুকো চেহারা। গলার আওয়াজ ও খুব বাঁজখাই। মালিকপক্ষ ছাড়া সবাই ওকে খুব ভয়-ভক্তি করে। মেনে চলে। উলটো-পালটা চললে ম্যানেজার স্টাফদের পেটায়ও মাঝে মাঝে। মংলি ম্যানেজারবাবুকে বেশ ভয় পায়। ওর সামনে যায় না সে। তবে ক্যাশিয়ারদাদাটা খুব ভালো। ওর সঙ্গে মংলির খুব খাতির। মংলিকে সে লজেন্স কিনে দেয়। বাবলুকেও কিনে দেয়। ক্যাশিয়ারদাদাকে আবার ম্যানেজারবাবু খুব খাতির করে। সমঝেও চলে। সে হল মালিকের মামাতো ভাই। এক কথায় মালিক। ম্যানেজার বিশু ক্যাশিয়ারদাদার কাছে টাইট।

****

মংলি মেলায় আসার দু তিন দিন পর থেকে ওর ট্রেনিং শুরু হল। ফাঁকা মাঠে মোটরবাইক চালানো শেখা। সে কোনোদিন সাইকেলই চড়ে নি। তাকে নিয়ে শুরু হল ট্রেনিং। বাইকের সামনে মংলি আর পেছনে ওর ওস্তাদ ফুল। হ্যান্ডেলটা দুজনে ধরা। ফাঁকা মাঠে গোল চক্কর কেটে ঘোরা। দিনচারেকের মধ্যে ব্যালান্স এসে গেলে মংলির। এখন হ্যান্ডেল একা মংলির হাতে আর গিয়ার আর ব্রেক ফুল-এর পায়ে। এর কিছুদিন পর সবকিছুই মংলির কাছে। শুধু মোটর বাইকের পেছনে বসে থাকে ওর ওস্তাদ ফুল। মংলি চালাতে চালাতে কোনো ভুল করলে সামলে দেয় সে। তবে পুরোটাই ফাঁকা মাঠে গোল চক্কর কেটে।

এর মধ্যেই একদিন মংলি এমন ভুল করল যে শেষ সময় ফুলও সামলাতে পারল না বাইকটাকে। দুজনেই হুড়মুড়িয়ে পড়ল মোটরবাইকশুদ্ধু মাটিতে। মংলির হাঁটু কেটে রক্ত পড়তে লাগল। বাঁ পা ফুলে ঢোল। মাথাতে ও চোট লাগল। ওর মাস্টার ফুল নিজেকে অনেকটা বাঁচিয়ে নিলেও শেষ রক্ষা হলনা। কনুইয়ে চোট পেল সে। বাঁ হাতে।

খুব বড়ো অ্যাকসিডেন্টের থেকে রক্ষা পেল দুজনে। ব্যাথায় যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকল মংলি। পদ্মাবৌদি ওকে ওষুধ লাগিয়ে দিল। ব্যাথার ওষুধ কিনে দিল ক্যাশিয়ারদাদা। সেই রাতে মংলির খুব জ্বর এল। জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ওর মা-বাবার কথা খুব মনে পড়ল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু বিছানায় সে একা। কেউ পাশে নেই গায়ে হাত বুলিয়ে দেবার। মংলির মনে হল পাশের খাটে শুয়ে থাকা পদ্মাবৌদির কথা-

"গরিবদের জন্য এ দুনিয়া বড়ো কঠিন। এখানে চোখের জলের দাম কেউ দেবে না।"

কথাটা মনে পড়তেই শক্ত হয়ে গেল মংলি। চোখের জল মুছে নিল সে। বাঁপায়ের গোড়ালিটা ফুলে ঢোল। নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ওর মনে একটা যেদ চেপে বসছে। মংলি ধীরে ধীরে নিজের চৌকির উপর উঠে বসল। তারপর চৌকি থেকে নেমে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে রাউটির বাইরে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে

তাকাল আকাশের দিকে। চাঁদের আলোয় নিস্তব্ধ মেলা প্রাঙ্গনে তখন রুপোলি বন্যা। মংলি খুশি হয়ে উঠতে লাগল। সে ক্রমশ ব্যাথা ভুলে মায়াবী চাঁদটার দিকে চেয়ে রইল।

****

প্রথম যে দিন মংলি 'মওত্ কা কুঁয়া'তে খেলা দেখাল তখন সে মটর বাইক চালাতে পারে একাএকাই। কিন্তু মাঠে চালানো আর কুঁয়ায় চালানো কি এক কথা! তাই তার গুরু ফুল তাকে বাইকের পেছনে নিয়ে কুঁয়ার মধ্যে ঘুরল। ফুলের পেছনে বসে ছিল মংলি। বাইক চালাবার সময় বার বার ফুল বলে দিয়েছিল তাকে যেন পেছন থেকে মংলি চেপে না ধরে। কারণ ফুলের বডি ব্যালান্সের উপরই বাইকটা কুঁয়ার দেওয়ালে পাক খেতে থাকবে।

ফুল বলেছিল, "শোন মংলি তুই একদম ঘাবড়াবি না। মনে সাহস আন। বাইক যেমন যেমন হেলবে তুই তোর বডিটাকে তেমন তেমন হেলাবি। আমার শরীটাকে ফলো করবি। দেখবি এতে সাপ- ব্যাঙে কিছু নেই।"

মংলি কোনো কথা বলতে পারেনি। শুধু মাথা নেড়েছিল। কিন্তু তিন-চার পাক কুঁয়ার মধ্যে পাক মেরে নামবার পর মংলির মনে হল খেলাটা খুব কঠিন নয়। শুধু একটু সাহসের প্রয়োজন। মনে সাহস থাকলে মানুষ সব করতে পারে। কথাটা একদিন ফুল ওকে বলেছিল, বলেছিল, "আমিও একদিন তোর মতো প্রথম বাইক শিখেছিলাম। আমার ওস্তাদ ছিল রহমত নামে এক মুসলমান রাইডার। দারুন রাইডার ছিল। রানিং বাইকে উঠে দাঁড়াত হ্যান্ডেল ছেড়ে। এখন আমি যেমন দাঁড়াই। রানিং-এ কুঁয়ার মধ্যে দু পা বাইকের একদিকে করে ঘুরত। ওটাও আমি করি দেখিস তো। রানিং এ হ্যান্ডেল ছেড়ে বুক দিয়ে টিউবলাইট ভাঙা তো মামুলি ব্যাপার।

মংলি হাঁ হয়ে বলল, "তুমি এসব শিখলে কীভাবে?"

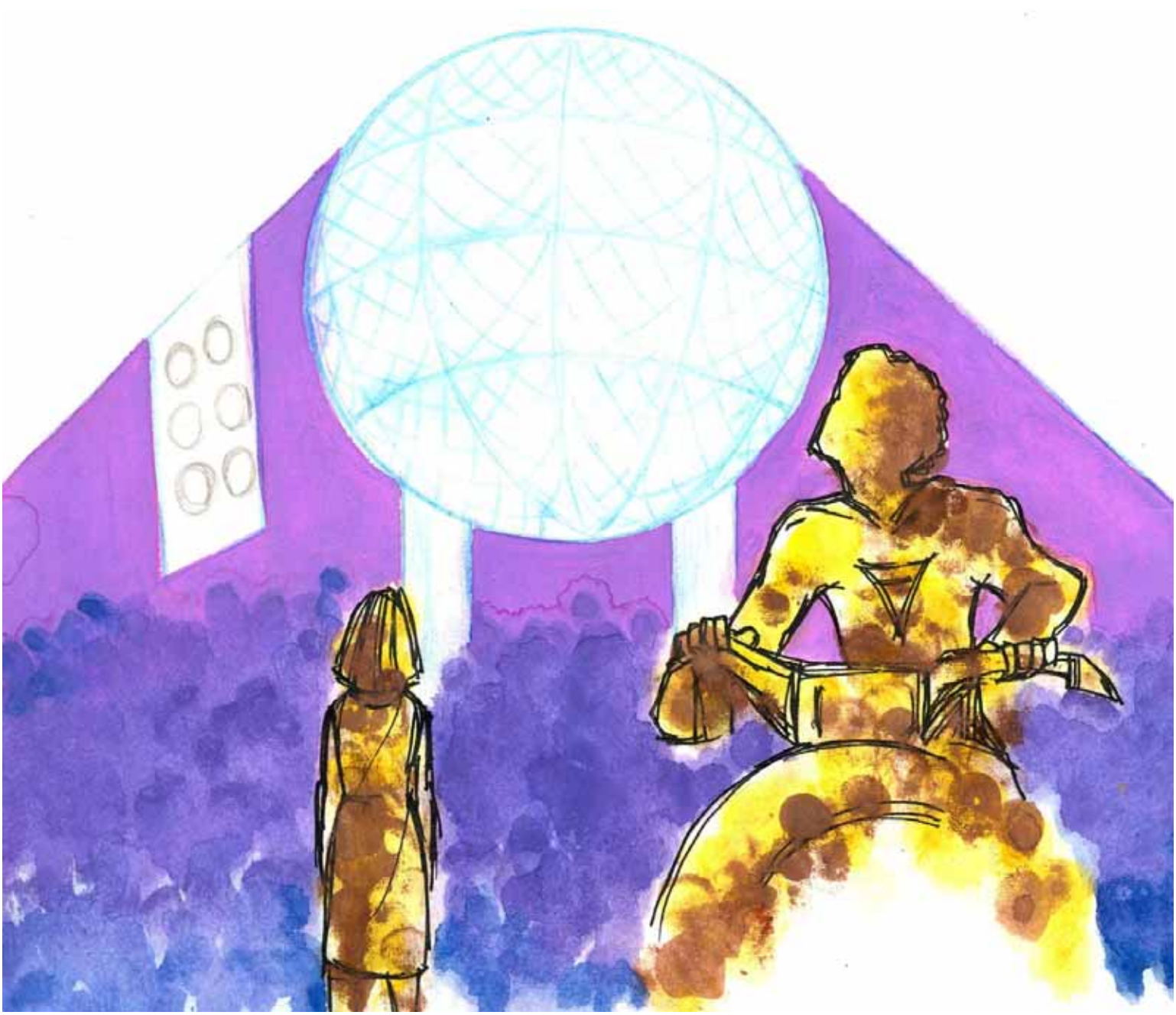
ফুল হেসে মংলির গাল দুটো টিপে দিয়ে বলল, "তুই শিখবি যেভাবে! শুধু এক বুক সাহস রাখবি মনে। তবেই পারবি। আমরা গরিব। আমাদের পয়সা নেই। আমাদের সাহসই হল পয়সা। সাহস থাকলে পয়সা কামাবি বহুত। দেখ না আমাকে! প্রত্যেক শো-এর বিশ পারসেন্ট আমাকে দিতে হয় ঘোষদাকে।"

মংলি তো তেমন লেখাপড়া শেখেনি। শতকরার অঙ্ক সে জানে না। সে বলল, "আচ্ছা ফুলভাই বিশ পারসেন্ট মানে কত টাকা গো?"

ফুল মজা করে আবার ওর গালা টিপে দিল। বলল, "ও সব তোর এখন ভাবতে হবে না। আগে মন দিয়ে খেলাটা শেখ। মনে সাহস আন। দেখবি টাকা তোর পেছনে ছুটে ছুটে আসবে।"

এসব বলে ফুলদাদা রাউটি ছেড়ে চলে যায়। রাউটির বাইরে বসে পদ্মাবৌদি শুঁটকি মাছ রান্না করছে। পেঁয়াজ রসুনের একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসছে। মংলি রাউটির বাইরে আসে। এখন দুপুরবেলা। মেলা বন্ধ। বিকেল চারটে থেকে মেলা চালু হবে। মাইক বাজতে শুরু করবে। মেলার দোকানগুলো খুলে যাবে। দোকানগুলোর মধ্যে নানারকমের দোকান আছে। চুড়ি- গয়নার দোকান আছে। ছোটোদের খেলনার দোকান আছে অনেকগুলো। বাসনের দোকান আছে চারটে। কাঠের জিনিসের দোকান আছে। আর আছে নানান লটারির দোকান। সব দোকান খুলে যাবে চারটেতে মাইকে গান বাজার সঙ্গে সঙ্গে। বিরাট উঁচু নাগরদোলনা ফাঁকা ঘুরতে ঘুরতে শুরু করবে। চড়কি দোলনাটার হাতি, ঘোড়া, বাঘ সিংহগুলো নিজের মনে ঘুরতে থাকবে। ডিসকো ডান্সের তাঁবুতে মাইক বাজতে শুরু হবে। ব্রেকডান্সের চেয়ারগুলো খালি একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে ঘুরবে। এক একে মানুষজন আসতে শুরু করবে মেলায়। দোকানগুলোতে ভিড় লাগবে। নাগরদোলনার চেয়ারগুলো ভরে যাবে। বাঘসিংহের পিঠে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা উঠে বসবে। ডিসকো ডান্সের তাঁবুতে নাচ শুরু হবে। ব্রেকডান্সের চেয়ারে বসে সবাই আচমকা ডানদিকে, বাঁদিকে এলোপাথারি ঘুরতে ঘুরতে ভয়ে আর আনন্দে হাউমাউ করে চেঁচাবে। মংলি ফুলদাদার বাইকের পেছনে বসে, 'মওত্ কা কুঁয়া'র দেয়ালে ঘুরতে থাকবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে।

এগুলো তো হবে বিকেল চারটার পর। এখন মেলা একদম নিশ্চুপ। মংলি গিয়ে চড়কি নাগরদোলনার বাঘের পিঠে চেপে বসল। চড়কি দোলনাটা ঘুরছে না। সে স্থির হয়ে ঝুলে থাকা ফাইবারের বাঘের পিঠে চড়ে ভাবতে লাগল- ভয় পেলে চলবে না তার। ফুলদাদার মতো তাকেও সব শিখতে হবে বাইকের খেলা। তাকে অনেক



টাকা রোজগার করতে হবে। বাবা মা-র দুঃখ ঘোচাতে হবে। ওরা তখন আর ঝুপড়িতে থাকবে না। দেশে একটা বড়ো বাড়ি বানাবে। ভালো ভালো খাবার খাবে। চুড়ি কিনবে। টিপ কিনবে। মাকেও কিনে দেবে। বাবাকে একটা নিজের রিকশা কিনে দেবে। বাবাকে তখন আর অন্যের রিকশা টানতে হবে না। বাবার রিকশা করে ও আর মা বেড়াতে বেরুবে। খুব মজা হবে। সে একটা সুন্দর মোটরবাইকও কিনবে। তার পিছনে বসিয়ে সে তার বাবা- মা কে নিয়ে এখানে ওখানে যাবে। খুব মজা হবে।

কিন্তু সব মজার আগে ওকে সাহসী হতে হবে। ফুল দাদা বলেছে গরিবের সাহসই হল পয়সা। যে গরিবের সাহস নেই সে চিরকাল গরিবই থাকবে। কোনোদিন সে বড়োলোক হবে না। সুতরাং আগে তাকে সাহসী হতে হবে। বাইকের খেলা শিখতে হবে।

****

সাহস করে সব শিখল মংলি। একবছরের কম সময়ে সে ফুল-এর কাছ থেকে কুঁয়াতে বাইক চালানো শিখে নিয়েছে। আরো দু-একবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তা নয়। তবে প্রথমবারের পর হাতে পায়ে চোট পাওয়াটাকে সে তেমন আর গুরুত্ব দেয় না। ওর প্রিয় এক কাকু আছে এই মেলায়। ও তাকে ইমিটেশন কাকু বলে ডাকে। কাকুর একটা ইমিটেশন গয়নার দোকান আছে। তাকে বাবার মতো মনে হয় তার।

খুব ভালোবাসে ইমিটেশন কাকু মংলিকে। একদম নিজের মেয়ের মতো। ইমিটেশন কাকুর দোকানের বিপুলদাদাও খুব ভালোবাসে মংলিকে। বিপুলদাদা আর ইমিটেশন কাকু আলাদা রান্না করে খায়। ভালো কিছু রান্না হলে বিপুলদাদা ওকে ডেকে খাওয়ায়। বলে, ওর বাড়িতে মংলির বয়সি একটা বোন আছে। নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যার মাথায় অনেক চুল। চোখ দুটো কালো আর বড়ো বড়ো। মংলিকে দেখে বিপুলদাদার সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে।

মংলির কিন্তু বড়ো বড়ো চুল নেই। চোখও বড়ো বড়ো নয়। তবু কেন ওকে দেখে বিপুল দাদা ওর ছোটবোনের কথা মনে পড়ে মংলি বুঝতে পারে না। তবে সে এটুকু বোঝে বাড়ি ঘর ছেড়ে আসা বিপুলদাদা ওকে দেখেই বোনের দুঃখ ভুলে থাকে। তার বাড়ি নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। ইমিটেশনকাকুর বাড়িও একই জায়গায়। ওরা দুজনেই বর্ষাকালে তিন-চার মাসের জন্য দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। বর্ষাকালে মেলা চলে না। মেলা বসেই থাকে। মালিক শিবু ঘোষ বলেছে সে সময় মংলিও বাড়ি যেতে পারবে ছুটিতে। বাড়ি যাওয়ার নাম শুনে মংলির মনটা নেচে ওঠে। কতদিন সে বাবা-মাকে দেখেনি! প্রায় এক বছর। গত বর্ষার পরপরেই সে এসেছিল এই মেলায়। এখন গরমকাল। সামনে বর্ষা আসছে।

ওদের মেলা লেগেছে এখন ত্রিপুরার কৈলাশহরে। এর আগে মেলা চলছিল ধর্মনগরে। ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর আসতে মাঝখানে উনোকুটি পাহাড় পড়ে। মংলি শুনেছে উনোকুটি পাহাড়ে একটা কম কোটি দেবতার মূর্তি আছে। তাই ওই পাহাড়টার নাম উনোকুটি। এই গল্পটা ওকে বলেছে বাবলু। বাবলু তিন বছর আছে এই মেলার সঙ্গে। গতবছরও সে ধর্মনগর, কৈলাশহরে মেলা করেছে। সে একদিন ক্যাশিয়ার দাদার সঙ্গে গতবছর উনোকুটি পাহাড় দেখে এসেছিল। কত দেবতার মূর্তি গুণে শেষ করা যায় না। মংলি হাঁ করে শুনেছে বাবলুর গল্প।

ধর্মনগরের আগে ওরা আসামের কাছাড় জেলায় ছিল। হাইলাকান্দির রবীন্দ্রমেলা, করিমগঞ্জের নেতাজি মেলা ও শিলচরের গান্ধীমেলা খুব বড়ো। প্রচুর মানুষ আসে ওই সব মেলায়। দেখে হাঁ হয়ে গেছে মংলি। কতো মানুষ বাপ রে! প্রায় দু-মাস ধরে চলে ওই তিনটে মেলা পরপর। মংলি ওই মেলাগুলোতে ফুলদাদার বাইকের পেছনের সিটে উঠে দাঁড়িয়েছে হাত দুটো পাখির মতো দুদিকে মেলে দিয়ে। দর্শকরা হাততালি দিয়েছে প্রতি শো-এ। মাইনে বাদে ছুট টাকাও পেয়েছে সে অনেক। সবটাকা ও জমিয়ে রেখেছে ক্যাশিয়ারদাদার কাছে। বর্ষাকালে বাড়ি যাওয়ার সময় সে নিয়ে যাবে। মা-র হাতে দেবে টাকাগুলো। মা-হাসবে। ওকে আদর করবে।

ত্রিপরায় ঢোকার আগে ওরা মনিপুরের বর্ডারে আসামে জিরিঘাট বলে একটা গ্রামে মেলা করেছে। জিরিঘাট গ্রামটা খুব সুন্দর। চারদিকে পাহাড়। মধ্যিখানে সরু নদী। নাম জিরিনদী। জিরি নদীর একপাশে জিরিঘাট অন্যপাশে মনিপুরের জিরিবাম। নদীর উপর দিয়ে একটা মোটা লোহার তার ঝোলানো ব্রিজ। তার ওপর দিয়ে গাড়ি বা লরি গেলে ব্রিজটা কাঁপতে থাকে। মংলি নিজে বাইক চালিয়ে ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে জিরিবাম বাজারে গেছে। জিরিবাম থেকেই শুরু হয়েছে মনিপুরের পাহাড়। ক্যাশিয়ারদাদা মংলিকে বলেছে মনিপুরের রাজধানী ইম্ফল ছাড়ালেই আর একটা অন্য দেশ আছে। তার নাম বার্মা। এখন তাকে বলে মায়ানমার।

ক্যাশিয়ার দাদারা বছর সাতেক আগে ভারতবর্ষের বর্ডার ছাড়িয়ে বার্মায় মেলা করে এসেছে। সে মেলায় নাকি খুব ভিড় হয়েছিল। শিবু ঘোষ অনেক টাকা কামিয়েছিল। মংলির ওই পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে ইম্ফল পেরিয়ে বার্মায় যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় দূরে পাহাড়ের আড়ালে কী যেন এক রহস্য লুকিয়ে আছে যা তার দেখা হয়নি।

জিরিঘাটে একদিন ভয়ানক কালবৈশাখী উঠল। মেলা সে'দিন সবে শুরু হয়েছে। "মওত্ কা কুঁয়ায়" মাত্র একটা শো হয়েছে। এখন মংলি কুঁয়াতে একাই বাইক চালায়। প্রথম ও চালায়। তিন চারপাক চালিয়ে ও নেমে যায়। তবে কুঁয়ার নীচের দিকে। ফুল ওকে বেশি ওপরে উঠতে বারণ করেছে। ওর শেষ হলে ফুল কুঁয়ার ভিতর বাইক নিয়ে নানান খেলা দেখায়। সে এক্সপার্ট বাইক রাইডার।

প্রথম শো এরপর দ্বিতীয় শো শুরু হবে। একজন দুজন করে দর্শক ঢুকছে "মওত্ কা কুঁয়ায়। গোটা দশ-পঁচিশ দর্শক হলে দ্বিতীয় শো শুরু হবে। হঠাৎ জিরিবাম পাহাড়ের মাথা থেকে একটা বিশাল কালো মেঘ দানবের মতো তেড়ে এলো ওদের মাঠের দিকে। সঙ্গে ভয়ঙ্কর হাওয়া আর শোঁ শোঁ আওয়াজ। মংলি টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল। একটু দূরে ফুল দাঁড়িয়ে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথা বলছে। হাওয়ার আওয়াজ শুনেই ফুল চিৎকার করে বলল, " মংলি ভাগ। আপনা রাউটিতে যা বৌদির কাছে।"

কথাটা শুনেই দৌড় লাগিয়ে ছিল মংলি। কিন্তু নিজের রাউটির কাছে পৌঁছানোর আগেই ও দেখল ওদের তাঁবুটা দুই পাক খেয়ে ছিটকে গেল একদিকে। যে বাঁশদুটোর উপর খাড়া ছিল তাঁবুটা সে বাঁশ দুটোও উড়ে গেল তাঁবুর কাপড়ের সঙ্গে। হঠাৎ ওর মাথার উপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে উড়ে গিয়ে নাগরদোলনার গায়ে আছড়ে পড়ল ডিস্কোডান্সের স্টেজের ছাদটা।

মংলি ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পদ্মাবৌদির বুকে। ফুলের বউ পদ্মাও তখন বিভ্রান্ত। ওদের তাঁবু উড়ে গেছে। প্রাণ বাঁচাতে ওরা দুজন ফুলদের চৌকির তলায় ঢুকে গেল। সেখানে পদ্মাবৌদির কোলে বসে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরেছিল তাকে মংলি। এরপর শুরু হল বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি। চলল একঘন্টা।

বৃষ্টি যখন থামল তখন সব কিছু লণ্ডভণ্ড। কোন এক দানবের দৌরাত্মে যেন হঠাৎ নরকে পরিণত হয়েছে সাজানোগোছানো মেলাটা। পুরো তিনদিন লাগল আবার মেলা চালু হতে। দু-রাত ওরা কেউ রাতে ঘুমোতে পারল না। সারারাত মেলার সব লোক জেগে রইল। ওই বৃষ্টি ঝড়ে ইমিটেশন কাকু দিনরাত পরিশ্রম করে সারিয়ে তুলল নিজেদের দোকান।

মংলি ফুলদাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা ফুলদাদা এমনটা কেন হয়?" ফুল হেসে বলেছিল, "সবই নসিব মংলি নসিব। সবই আমাদের ভাগ্য। কপাল খুব খারাপ না হলে কেউ মেলাওয়ালা হয়?

ফুলদাদার গলাটা করুণ শোনায়। মংলির মন খারাপ হয়ে যায়। পদ্মাবৌদি ও ফুলদাদা দুজনে মিলে আবার ঝড়ে উড়ে যাওয়া রাউটিটাকে তৈরি করেছে। এখন রোদে শুকোচ্ছে লেপ তোশক। মংলি খালি চৌকিতে ঘুমোচ্ছে একটা চাদর পেতে। ওর পদ্মাবৌদিদের মতো লেপ তোশক নেই। একটা কাঁথা ও একটা বালিশ আছে। সেদুটো এখন শুকোয়নি। ঝড়ের পর প্রথম দুদিন তো মাথার উপর তাঁবুটাও ছিলনা। এখন সেটা হয়েছে কিন্তু বিছানা ভেজা। রাতে খালি বিছানায় চাদর পেতে শুয়ে থাকে মংলি। এই অবস্থাটা শুধু যে মংলিদের তা নয়। মেলার মাঠে যারাই থাকে তাদের সকলের।

****

এখন কৈলাশহরে মেলা লেগেছে। শহরের একদম শেষপ্রান্তে একটা খোলা মাঠে। মাঠের শেষে বিশাল ধানজমি। তারপর বাংলাদেশ। এখানে বাংলাদেশ আর ভারতের মধ্যে কোনো তারকাঁটার বেড়া নেই। মংলি কোনোদিন বাংলাদেশের ওদিকটায় যায়নি। শুনেছে ওদিকে সিমেন্টের ছোটো ছোটো খুঁটি পোতা আছে। তার এপারটা ভারত আর ওপারটা বাংলাদেশ। কৈলাশহরটা খুব সুন্দর, ছোট্ট। বড়ো বড়ো পুকুর আছে অনেকগুলো। একটা পুরানো এয়ারপোর্ট আছে। আগে এখানে প্লেন নামত । প্লেন উড়তো। মংলি আকাশে বাদে কোনোদিন প্লেন ওঠা নামা দেখেনি। ওর প্লেন নামা ওঠা দেখতে খুব ইচ্ছা করে। অফিস রাউটিতে একটা ছোটো কালার টিভি আছে। সেই টিভিতে অবশ্য প্লেন ওঠা নামা দেখেছে। কিন্তু টিভিতে দেখা আর নিজের চোখে দেখা কি এক জিনিস? মংলি ওর কুঁয়ায় চালানোর বাইকটা নিয়ে সারা কৈলাশহর চক্কর মেরে এসেছে। কুঁয়ায় চলানো বাইকে সাইলেন্সার থাকে না। ওর ভটভট আওয়াজটাই "মওত্ কা কুঁয়ার" আকর্ষণ। সেই বাইক নিয়ে চারদিক খান খান করে মংলি কৈলাশহর চক্কর কেটেছে। একটা অত ছোট মেয়েকে ওই বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে অনেকেই অবাক হয়েছে আবার ওদের আনন্দমেলার একটা প্রচারও হয়েছে। কৈলাশহরে যে আনন্দমেলা এসে গেছে তার সচল বিজ্ঞাপন মংলির বাইক অভিযান।

আজই প্রথমদিন মংলি ফুল এর সঙ্গে একসঙ্গে বাইক চালাবে কুঁয়ার মধ্যে। অর্থাৎ একসঙ্গে দুটো মোটর বাইক ঘুরবে কুঁয়াতে। একটা চালাবে ফুল একটা চালাবে মংলি। প্র্যাকটিস হয়ে গেছে দুজনের। কোনো অসুবিধে হয়নি। সব ঠিক ঠাক। ফুল মংলিকে বলেছে, "তুই তোর মতো চালিয়ে যাবি আমি পরে সময় বুঝে এন্ট্রি নেব। শুধু মনে সাহস রাখবি আর নজর রাখবি তোর বাইক যেন আমার বাইকে সামনে না আসে। তুই নীচে থাকলে আমি উপরে থাকব তুই উপরে থাকলে আমি নীচে থাকব। ইন্টারক্রসিং আমি করব। সিটের উপর উঠে হাত ছেড়ে বাইক চালাব আমি। তুই শুধু নিজের বাইকটা মন দিয়ে চালিয়ে যাবি। চালাতে চালাতে আমার খেলা দেখবি না।"

সব শুনে মাথা নেড়েছে মংলি। মেলার মালিক শিবু ঘোষ বলেছে, মংলি যদি আজ সাকসেসফুল হয় তবে ওর মাইনে পাঁচশো টাকা বাড়িয়ে দেব এমাস থেকে আর ছুট যা পাবে এতদিন ফুল পেত আশি ভাগ আর মংলি পেত কুড়িভাগ। এখন থেকে সেটা হয়ে যাবে সত্তর তিরিশ।

মংলি ভাবে আজ ওর ঠিকঠাক খেলা দেখাতেই হবে। ওর সার্কাশের মানে আরো টাকা। এবার বর্ষায় বাড়ি গিয়ে সে মার হাতে অনেক টাকা দিতে পারবে। বাবলু ওকে পনেরো টাকার একটা চকলেট দিয়ে গেছে। ইংরাজিতে বলেছে – "বেস্ট অফ লাক।"

ইমিটেশন কাকু ওর একটা রোলগোল্ডের বড়ো গলার চেন দিয়েছে বিনা পয়সায়। বলেছে, "আজ এটা পড়ে তুই খেলা দেখাবি।"

বিপুলদাদা বলেছে, "দেখিস সাবধান। খুব মন দিয়ে বাইক চালাবি। চালাতে চালাতে একদম ফুলের খেলা দেখবি না। একটু অন্যমনস্ক হলেই কিন্তু সর্বনাশ।" ক্যাশিয়ার দাদা ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে হাতে পঞ্চাশটাকা দিয়েছে। ক্যাশিয়ার দাদার দেখা দেখি ম্যানেজার কাকুও দিয়েছে পঞ্চাশটাকা। খেলা দেখানোর আগেই ওর একশ টাকা ইনকাম হয়ে গেছে।

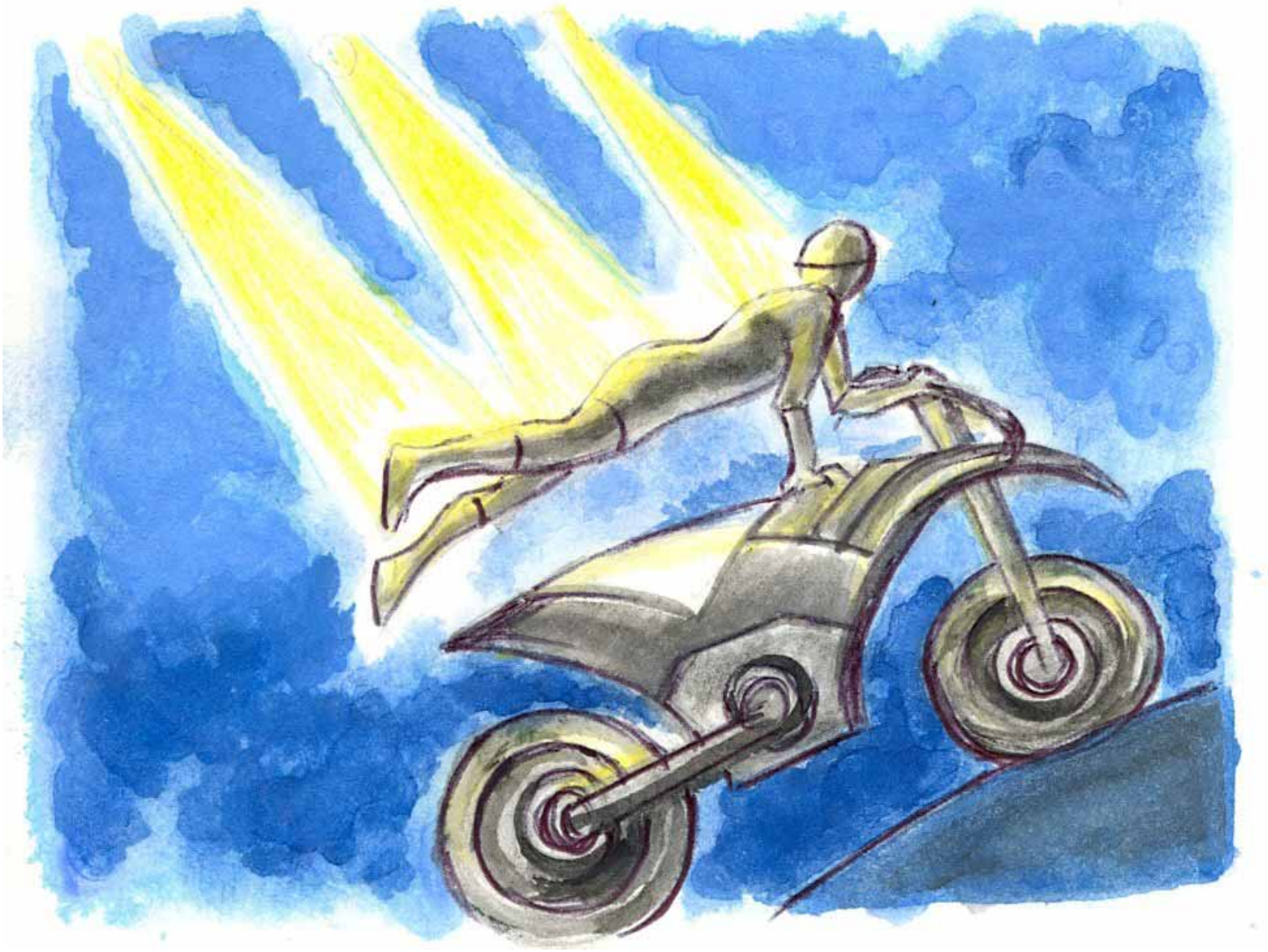
পদ্মাবৌদি ওর জন্য সামনে কালীবাড়িতে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছে। ওর মাথায় পুজোর ফুল ছুঁইয়েছে। হাতে প্রসাদ দিয়েছে। আজকে খেলা দেখাবার জন্য মালিক শিবু ঘোষ মংলির নতুন সাটিনের পোশাক বানিয়ে দিয়েছে। লোয়ারটা লাল লেগিংস আর উপরে লাল শর্ট ফ্রক কুচি দেওয়া। পায়ে লাল কেডস্। সব নতুন। সব দিয়েছে মালিক শিবু ঘোষ।

আজ রবিবার। বাবলু সারাদিন একটা অটোরিকশায় মাইক লাগিয়ে সারা কৈলাশহরে "মওত্ কা কুঁয়া"র প্রচার করেছে। আজই প্রথম "মওত্ কা কুঁয়াতে" একসঙ্গে বাইক চালাবে দুজন। একজন ছেলে একজন মেয়ে। ভয়ঙ্কর খেলা। ডেঞ্জারাস প্লে। দেখতে ভুলবেন না। এইসব বলে সারা শহরে প্রাচার করে এসেছে বাবলু। আশা করা যাচ্ছে মেলায় বিশেষ করে "মওত্ কা কুঁয়ার" টিকিটের দামও বাড়িয়ে দিয়েছে দশটাকা। আগে ছিল কুড়ি টাকা আজ থেকে তিরিশ।

ফার্স্ট শো। হাউস ফুল। কুঁয়ার উপড়ে প্রায় শ'খানেক দর্শক। খেলা শুরু হবে এইবার। পনেরো মিনিটের শো। কুঁয়ার নীচে দুটো বাইক। ফুল আর মংলি দাঁড়িয়ে। শো শুরু হবে এবার। মংলি এগিয়ে এসে প্রণাম করল ফুলকে। ওরে আজ লাল ড্রেসে পরির মতো লাগছে। ফুল পড়েছে কালো জিন্স এর সঙ্গে স্কিন টাইট কালো ফুল হাতা শার্ট। মাথায় কালো টুপি। ফুল মাথায় হেলমেট পরে না। ওটাই ওর মস্তানি। মংলিকে হেলমেট পড়তে হয়। ওর ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচ করে লাল হেলমেট পড়েছে ও। মংলি প্রণাম করবার পর ফুল ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় একটা চুমু খেল। পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, "চল বেটি আজ আজ তু কামাল কর দে।"

ফুলের কথাটা বিদ্যুতের মতো কাজ করল মংলির মধ্যে। সে বাইকে উঠে হেলমেট পড়ল। স্টার্ট দিল বাইকে।

মংলি ঘুরছে কুঁয়ার দেওয়ালে ভট ভট বিকট শব্দ তুলে। এক পাক, দুই পাক বাইকের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিল মংলি। বাইক ঘুরছে। হাত দুটোকে মেলে দিল মংলি পরীর ডানার মতন। বাইক ঘুরছে মরণকুপের দেয়ালে। দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠল। এবার কুঁয়ার দেওয়ালে এন্ট্রি নেবে ফুল। বাইকে উঠে পড়েছে সে। একসিলারেটর ঘুরিয়ে ভট্ ভট্ আওয়াজ করছে। সিগনাল দিচ্ছে মংলিকে। মংলি যেন কুঁয়ার দেওয়ালে একটু উপর দিকে উঠে যায়। মংলি খেয়াল করল সেটা। পরীর ডানা দুটো নামিয়ে আনল হ্যান্ডেলে। একটু ওপরে উঠে গেল সে।



ফুল এন্ট্রি নিল। এবার কথা মতো মংলি নীচের দিকে নেমে আসবে ফুল উপরে উঠে যাবে। তারপর দুজনে দু'একবার ক্রস করবে। অর্থাৎ কখনো ফুল কুঁয়ার উপর দিকে ঘুরবে মংলি নীচের দিকে আবার কখনো মংলি উপর দিকে ঘুরবে ফুল নীচের দিকে। দু-একবার এরকম করার পর মংলি নেমে যাবে নীচের দিকে ফুল কুঁয়ার উপর দিকে বাইক চালাতে চালাতে নানান খেলা দেখাবে। কখনো বাইকের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে। কখনো বা রানিং বাইকের সিটের উপর দাঁড়িয়ে দু-হাত ছেড়ে। আবার কখনো বা ফিউজ টিউবলাইট বাইক চালাতে চালাতে বুক দিয়ে ভেঙে। সে সময় মংলি শুধু কুঁয়ার নীচের দিকে ঘুরতেই থাকবে বাইক নিয়ে।

দু-তিনবার ক্রস করে যাওয়ার পর ফুল খেলা দেখাতে শুরু করল। প্রথম সে হাত ছেড়ে ঘুরতে শুরু করল। বাইক চলছে। ফুলের হাত দুটো মাথার পেছনে। নীচে মংলি ঘুরছে বাইক নিয়ে। হঠাৎ দর্শকরা জোড়ে হাততালি দিয়ে উঠল, হাততালির আওয়াজে ফুল খেয়াল করল মংলির কান্ডটা। সে চিৎকার করে মংলিকে বলল, "সাবধান মংলি।"

কথাটা মংলির তার ভট ভট আওয়াজ আর হেলমেটের আচ্ছাদন ভেদ করে কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। ফুল এবার রানিং বাইকের সিটের উপর উঠে দাঁড়াল। কুঁয়ার নীচের দিকে মংলি বাইকের হ্যান্ডেল ছেড়ে দুহাত ডানার মতো মেলে দিয়ে ঘুরছে আর ফুল কুঁয়ার উপর দিকে বাইকের সিটের উপর দাঁড়িয়ে ঘুরছে। অসম্ভব শো। মৃত্যু হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে দু-জন। দর্শকদের হাততালি ঢেউ এর মতো আছড়ে পড়ছে ওদের উপর। কুঁয়ার আকাশে পাখির মতো উড়ছে দর্শকদের ছুঁড়ে দেওয়া দশটাকা কুড়ি টাকার নোট।

হঠাৎ সবাই খেয়াল করল মংলিও রানিং বাইকের উপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে প্রথমবার। সে পারল না। আবার বসে পড়ল বাইকের সিটে। দ্বিতীয় বার আবার ট্রাই করল মংলি। এবার সে পেরেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে

মোটর বাইকের সিটের উপর। বাইক ঘুরছে মৃত্যুকুপের দেওয়ালে। উপরে একইভাবে ঘুরছে ফুল। ওর গুরু। মংলির ট্রেনার। দর্শকদের হাততালিতে ফেটে পড়ছে “মওত্ কা কুঁয়ার” তাঁবু। টাকা উড়ছে কুঁয়ার আকাশে। মংলি বাইকের উপর দাঁড়িয়ে হাতছেড়ে মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছে এবার ওর বাবা -মার দুঃখটা ঘুচবে হয়তো।

ছবিঃ মৌসুমী

মিনুর লাল ঘুড়ি আর লামিয়া



সায়ম আমান

সকালবেলা ছাদে উঠতেই মিনুর মনটা খুশিতে নেচে উঠল। এমনিতে ঘুম থেকে উঠে মায়ের কাছে একদফা বকুনি খেয়ে মনখারাপ হয়েছিল, তার ওপর পোষা বেড়ালটা কাল রাত থেকে বেপাত্তা।

বকুনি খাবার পরে কিছুক্ষণ বইতে মুখ গুঁজে বসে ছিল মিনু, কিন্তু মনে ঘুরঘুর করছিল অন্য চিন্তা। কাল স্কুলে একটা আজব ব্যাপার দেখিয়ে তাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে চিটু। রহস্যটা যে ঠিক কী তা মিনু এখনও ভেবে বের করতে পারেনি। আজ সকালে উঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল কিন্তু তার আগেই মা এমন ধাতানি দিল যে সেটুকু আর সাহস হল না। (আপনারা হয়ত এখন জানতে চাইবেন সাত সকালে কেন মিনু মায়ের কাছে বকুনি খেল, কিন্তু মাফ করবেন, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কাল রাতে সে ঘুমের ঘোরে বিছানায় কী করে ফেলেছিল সেটা হাটের মাঝে ছড়িয়ে দিলে তার গল্পগুলো আমাকে বলাই বন্ধ করে দেবে সে।) যাই হোক, রহস্যটা হল চিতু কাল তার দাদার ফেলে দেওয়া একটা ক্যালকুলেটার কোনমতে লুকিয়ে চুরিয়ে স্কুলে এনেছিল, এমনিতে সেটা দেখতে এমন কিছু আহামরি নয়, বরঞ্চ ভাঙাচোরাই বলা যায়, মিনু তাচ্ছিল্য করতে চিতু মিচকে হেসে বলেচিল, “ হুঁ, হুঁ, বাবা, এসব অত ফেলনা নয়। এ ক্যালকুলেটারে ইংরিজি লেখা যায়, সেটা জানিস?”

মিনু প্রথমে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চায়নি, ক্যাল্কুলেটার কি মোবাইল ফোন নাকি যে তাতে লেখাও যাবে? হাতে নিয়ে দেখতে পেল তার কোথাও ইংরিজি হরফের বাটনগুলোও লেখা নেই, ধুর... চিতু ঢপ দিচ্ছে। সেটা ফেরত দিয়ে মিনু আবার নিজের বেঞ্চের দিকে ফেরার উপক্রম করেছিল, তারমধ্যেই চিতু ক্যালকুলেটারটাকে বাগিয়ে ধরে পটাপট কীসব টিপে মিনুর হাতে সেটা দিয়ে বলল, " এই দেখ, হুঁ, হুঁ ..."

মিনু দেখল ছোট্ট স্ক্রিনটার ঠিক মাঝখানে বড়োবড়ো হরফে ইংরাজিতে কী যেন লেখা আছে, ইউ এন ডি, পুরোটা সে পড়তে পারল না। চিতু ক্যালকুলেটারটা তার হাত থেকে নিতে নিতে বলল, " বিদেশি জিনিস, এতে গেমও খেলা যায়, সে আর একদিন দেখাব।" বলে সেই মিচকে হাসিটা আর একবার হেসে বসে পড়ল। তারপর থেকে মিনুর এই এক চিন্তা, এ-বি-সি-ডির বাটন নেই কিন্তু তাও লেখা যায়! ভারি আশ্চর্য জিনিস বটে! একবার ভেবেওছিল বাবাকে এনে দিতে বলবে, কিন্তু বিদেশি জিনিস যে, এখানে কি পাওয়া যাবে?

এখন কিন্তু ছাদে উঠতেই সেই চিন্তাটা মাথা থেকে একেবারে মুছে গেল, তার কারণ অন্য কিছু নয়, ছাদের একপাশে যে ছোটো মিটারঘরটা আছে তার ঠিক মাথার কাছে আটকে আছে একটা লাল ঘুড়ি, দুপুরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় সেটা তিরতির করে কাঁপছে, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মিনু সেদিকে এগিয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল ঘুড়িটা। কিন্তু হাতের আওতার বেশ খানিকটা ওপরে আটকেছে সেটা, এমনকি লাফিয়েও ধরা গেল না। মিনু হতাশ হয়ে ছাদের পাঁচিলের একপাশে বসে পড়ল। কি সুন্দর রঙিন চাঁদিয়াল ঘুড়ি, কোথা থেকে কেটেছে কে জানে। এখন তো বিশ্বকর্মা পুজোও ঢের দেরি আছে, তাহলে এলো কোথা থেকে?

এমনিতে কিন্তু মিনু ঘুড়ি ওড়াতে পারে না। একবার পাশের বাড়ির বিল্টুদাদারা তাকে লাটাই ধরতে দিয়েছিল, কিন্তু তখন সে এতই হালকা যে লাটাইটা প্রায় টেনে আকাশে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে, তারপর থেকে মা বলেছে বড়ো না হলে আর লাটাই না ধরতে। মিনুর অবশ্য ঘুড়ি ওড়াতে তেমন ভালও লাগে না, কিন্তু দেখতে মজা লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল ঘুড়িটা না পেলেই নয়। পড়ার বইয়ের সামনে সাজিয়ে রাখলে বেশ লাগবে দেখতে। এইসব ভেবে সে আবার উঠে দাঁড়াল, আবার লাফ দিল, কিন্তু লাফ দিলেই যেন আরও খানিকটা সরে যাচ্ছে, কী আশ্চর্য! যদি হাতেই না আসবে তাহলে ছাদে এসে লাগল কেন?

মিনুর এবার জেদ চেপে গেল। কী দুঃসাহস ঘুড়িটার! যেন বারবার তাকে বেঁটে বলে ভেংচি কাটছে, আহাহা! বাঁকা কাঠির হাসি দেখ না, গা জ্বলে যায়। মিনু উঠে দাঁড়াল। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে বটে কিন্তু সেটা করতে গেলে যদি আশপাশের বাড়ি থেকে কেউ দেখে নেয় আর তারপর যদি মাকে বলে দেয় তাহলে তার পিঠের একখানা হাড়ও আর আস্ত থাকবে না।

যাই হোক জেদ যখন চেপেছে তখন না করে উপায় নেই, তাছাড়া এখন চারপাশে কেউ নেইও। ছাদের পাঁচিলের ওপর একটা পা রাখল মিনু, তারপর আর একটা পা, নিচে তাকাতেই গা টা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। ঘুড়িটা কিন্তু হাতের কাছে এসেছে। এবার যাবে কোথায়? হাত বাড়িয়ে ঘুড়ির একটা পাশ ধরল সে, আর সাথে সাথে পাঁচিলের ওপর থেকে পা পিছলে গেল। ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিল মিনু, হয়ত এক্ষুনি নিচে পড়বে, খুব কি ব্যথা লাগবে? পা ভেঙে যাবে? অন্তত কয়েকটা হাড়...

বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে সে এইসব ভাবছিল, কিন্তু এখনও মাটিতে ধাক্কা লাগল না কেন? দুতলা থেকে পড়তে তো এতক্ষণ লাগার কথা নয়! মিনু দুরুদুরু বুকে চোখ খুলল। আর চোখ খুলতেই বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল, সে নিচে পড়েনি। ঘুড়িটাই বাঁচিয়ে নিয়েছে তাকে, কিন্তু সেটা আর মিটারঘরের ছাদে আটকে নেই, হাওয়ায় দুলতে দুলতে ভেসে পরেছে ছাদের বাইরে।

মিনু একবার ভাবল চেঁচিয়ে কাউকে ডাকবে, এ কী সর্বনেশে ঘুড়ি রে বাবা! অন্তত পঁচিশ কেজির একটা মানুষকে নিয়ে দিব্যি উড়ে চলেছে, শুধু উড়ছে যে তাই নয়, আস্তে আস্তে ওপরের দিকে চলেছে! হায় ভগবান, এবার কী হবে? হাত ছেড়ে দিলে নিচে পড়ে হাত পা ভাঙবে, আবার ধরে থাকলেও কোথায় গিয়ে যে থামবে কে জানে!

ভাবতে ভাবতেই সে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেল। যত ওপরে উঠছে তত গতি বাড়ছে ঘুড়িটার, মিনুর কান্না পেয়ে গেল। তার ঠিক পায়ের নিচে তখন খেলার মাঠটা সরে যাচ্ছে, সব কিছু ছোটো হয়ে আসছে। ছাদে মায়ের শুকোতে দেওয়া ভেজা শাড়িগুলো, বিল্টুদাদাদের এন্টেনা। ঘুড়িটা এবার রকেটের মত শোঁশোঁ করে ওপরে উঠছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে।

মিনু বুঝল নিচে তাকিয়ে আর কোন লাভ নেই, ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ঘুড়িটা কোথাও যেন নিয়ে যাচ্ছে তাকে। আকাশের বুকে সাদা ঝকঝকে মেঘেদের দল দুপুরের রোদ মেখে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। একটা দুটো পাখি ঘুড়ির ঠিক পাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে মিনুকে দেখে অবাক বিস্ময়ে তার পায়ে দুটো ঠোক্কর মেরে গেল, সত্যিকারের মানুষ তো? নাকি ফানুশ?

এদিকে মিনু কিন্তু এতক্ষণে ঘুড়িটার ওপর চড়ে বসেছে, তার একটু আগের ভয়টা কেটে গেছে। এখন বরঞ্চ বেশ মজাই লাগছে। যেভাবে ঘুড়িটা বোঁবোঁ করে মেঘগুলোর দিকে ধেয়ে যাচ্ছে তাতে সেগুলোকে পার না করে থামবে বলে তো মনে হয় না। কী আছে মেঘগুলোর ওপারে? এ ভাবনাটা আগেও তার মাথায় এসেছে, আজ মনে হচ্ছে সেই রহস্যের সমাধান হবে। মিনু ঝটপট ভেবে নিল বাড়ি ফিরেই এই সমস্ত ঘটনা লিখতে বসবে, অবশ্য কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না - তাও সে ভাল করেই জানে। তবে যখন বড়ো হবে তখন মোটামোটা ছবিছাড়া বইতে এই সব ফলিয়ে লিখে দেবে। আর সেই বই পড়ে স্কুলের বাংলার স্যার গগনবাবু জিভ কেটে বলবেন, " আহা গো, মৃন্ময়ী বাংলায় এত ভাল ছিল, আর আমি কিনা নম্বরই দিতুম না খালি বানান ভুল করত বলে!"

ব্যাপারটা ভেবেই মিনুর হাসি পেল। হাওয়ার টানে তার ঘাড় অবধি লম্বা চুলগুলো সোজা হয়ে দাড়িয়ে আছে, ফ্রকের একটা দিক লেপটে আর একটা দিক পিছনে ফুলে ফেপে পতপত করে উড়ছে। নিচে তাকালে এখন আর কিছুই চোখে পড়ে না, সব যেন সাদা সাদা বাক্স। খুশিতে ডগমগ হয়ে মিনু খালি গলায় গান ধরল, "বিড়াল হল বাঘের মাসি, বাঘের মেসো হুলো..."

গানটা গাইতেই তার বিড়াল প্লুটোর কথা মনে পড়ে গেল। কাল রাত থেকে কোথায় যে ভ্যানিশ হয়ে গেল কে জানে। আজ সকালে খেতেও আসেনি। প্লুটো দিনকতক হল একটা নতুন খেলা পেয়েছে। শুধু খেলা নয়, তার সাথে খাওয়াও। পাশের বাড়ির ছাদগুলোতে গম ছড়িয়ে রাখা হয় বলে সেখানে দুপুরবেলা পায়রা এসে বসে, প্লুটো তক্কে তক্কে থাকে, সুযোগ বুঝলেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পায়রা ধরে নেয়। আজও হয়ত সেই লোভেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্লুটোকে আর দেখতে না পেলে খারাপ লাগবে মিনুর। যতই পায়রাখোর হোক, প্লুটোর "ম্যাও" ডাকটা ভারি সুন্দর। কাঁচুমাচু মুখ আর ওই করুণ "ম্যাও" ডাকেই তার সব দোষ মাফ করে দেয় মিনু।

এদিকে ঘুড়িটার তো থামার নাম নেই। শেষ পর্যন্ত যদি আকাশে মাথা ঠুকে যায়? আচ্ছা আকাশটা কি নরম না শক্ত? দেখে তো খুব শক্ত বলে মনে হয় না। আচ্ছা জল জমেই তো নাকি মেঘ হয়, তাহলে মেঘগুলোকে কি জলের মত খাওয়া যায়? মিনুদের পাড়ায় একটা বুড়ো লোক হাওয়াই মিঠাই বেচতে আসে, কী যেন বলে কটন ক্যান্ডি না কী... সেরকমই হবে বোধ হয় মেঘগুলো।

এইসব ভাবতে ভাবতে মিনুর ঘুম পেল, ঘুড়ির ওপরেই কোনরকমে জায়গা করে শুয়ে পড়ল সে। দুএকটা লম্বা লম্বা হাই তুলল। পাশ ফিরে না শুলে ঘুম আসে না। পাশ ফিরতেই দেখতে পেল তার চোখের ঠিক সোজাসুজি সূর্যটা হালকা লাল হয়ে ওপাশে ঢলে পড়েছে। মানে এখন বিকেল, তার সব বন্ধুরা এতক্ষণে মাঠে বউবসন্ত খেলছে। মা ছাদে জামাকাপড় তুলতে এসে দেখছে মিনু নেই, সারা বাড়িতে খোঁজ খোঁজ রব পড়েছে। এত সব কিছু ভাবতে ভাবতে মিনুর চোখ বন্ধ হয়ে এলো, মেঘের বুক চিরে উড়তে থাকা আশ্চর্য ঘুড়িতে শুয়ে বিকেলের হালকা সোনালি আলো গায়ে মেখে ঘুমিয়ে পড়ল ছোট্ট মেয়েটা...

ঘুম যখন ভাঙল তখন চারিদিকে অন্ধকার নেমেছে। মিনু চোখ খুলে দেখল কোথাও একটা এসে দাঁড়িয়েছে ঘুড়িটা। শুয়ে শুয়ে মনে হল কোন খালি জায়গা, আকাশে টিমটিমে তারা দেখা যাচ্ছে। সে উঠে বসে দু'হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। আকাশের একদিকে গোল মোটাসোটা চাঁদ উঠেছে। মিনু দুটো হাত মুঠো করে চোখ রগড়ে নিল, তারপর নিচে তাকিয়ে দেখল তার পায়ের ঠিক নিচেই মেঘের জমাট চাদর, তার ওপরে এসে থেমেছে ঘুড়িটা। চাঁদের চকচকে আলো চারপাশের মেঘের ওপর পড়ে মনে হচ্ছে যেন মুক্তোর সমুদ্রর ওপর ভেসে রয়েছে একটা লাল ঘুড়ি। এখন ক'টা বাজে কে জানে! মিনুর এতক্ষণে কেমন যেন ভয় লাগল। ঘুড়িটা এতদূর নিয়ে তো এল, কিন্তু এবার যদি ফিরিয়ে না নিয়ে যায়? এখানে সে খাবেই বা কী? আর কথাই বা বলবে কার সাথে?

ঘুড়ির ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে ঠিক নিচের মেঘটায় পা লেগে গেল। বেশ শক্ত। বোধহয় এর ওপর দিয়ে হাঁটা যায়। মিনু মেঘের ওপর নেমে পড়ল। এত শক্ত মেঘ ফুঁড়ে ঘুড়িটা কী করে এল কে জানে। যাই হোক অত শত না ভেবে মিনু হাঁটতে লাগল। মেঘগুলো কিছু দূর গিয়ে ছিঁড়ে গেছে, তারপর আবার শুরু হয়ছে অন্য মেঘ। সে একমনে চাঁদের দিকে পা চালাল। চারপাশে কোথাও কিচ্ছু নেই, এমনকি একটা আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ মিনুর মনে হল তার জলতেষ্টা পেয়ছে। মেঘগুলোকে কি খাওয়া যায়? এত কাছে যখন আসা গেছে তখন একবার মুখে দিয়ে দেখাই যায়। সে নিচু হয়ে বসে শক্ত মেঘের ওপর আঙুল দিয়ে চাপ দিল, আর ওমনি সেখানটা দেবে গিয়ে আঙুলটা ভিতরে ঢুকে গেল। হাতে করে খানিকটা মেঘ তুলে মিনু মুখে দিল। ওমা! এ তো জল নয়, আইসক্রিম! কিন্তু ভুগোলস্যার নীলকণ্ঠবাবু যে বলেছিল জল জমেই মেঘ হয়? মিনুর এমনিতে ভূগোল পড়তে একদম ভাল লাগে না। একবার ফিরতে পারলে সে সবাইকে বলে দেবে যে জল জমে নয়, আসলে আইসক্রিম জমেই মেঘ হয়।

বেশ খানিকটা খেয়েও অবশ্য সে বুঝতে পারল না স্বাদটা ঠিক কীসের। পেট ভরে আইসক্রিম খেয়ে মিনু আবার চলতে লাগল, এ জায়গাটা খারাপ লাগছে না। কয়েকদিন থেকে গেলেও বেশ হয়, খালি প্লুটোটা যদি থাকত, খানিকটা গল্প করা যেত। প্লুটো অবশ্য ম্যাও ছাড়া কিছু বলতে জানে না, কিন্তু হলেই বা, সব "ম্যাও" একরকম নয়। এতদিন তার সাথে মিশে মিনু বেশ বুঝতে পারে কোন ম্যাও দিয়ে প্লুটো কী বোঝাতে চায়।



আর একটু এগোতেই কিন্তু সে থেমে গেল। সামনে আর এগোনোর পথ নেই, এই মেঘটা এখানেই শেষ। তারপর অন্য একটা মেঘ শুরু হয়ছে বটে কিন্তু দুটো মেঘের মাঝখানে একটা বড়োসড় ফাঁক। মিনুর পক্ষে অতটা লাফ দেওয়া সম্ভব নয়। সে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল, নিচে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, বাড়িঘর, গাছপালা সব একসাথে মিশে ড্রয়িং বইতে ওয়াটার কালারে আঁকা ছবিগুলোর মত দেখাচ্ছে। এবার কী হবে? চারদিক থেকেই

তো রাস্তা বন্ধ, আবার কি ঘুড়িটায় ফিরে যাবে? কিন্তু সেটা তো আর নড়বে বলে মনে হচ্ছে না। মিনুর এতো দুঃখ হল যে আইসক্রিম খেতেও ইচ্ছা করল না, সে ছেঁড়া মেঘের একটা সুতোর ওপর বসে পড়ল।

আর সাথে সাথে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। ওপাশে দূরে থাকা মেঘটা ধীরে ধীরে এই মেঘটার কাছে চলে এল, কাছে আসতে আসতে দুটো মেঘ জুড়ে গেল। মিনুও এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মনটা আবার খুশিতে নেচে উঠল। এইভাবে মেঘের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সে চাঁদে পৌঁছে যাবে, আচ্ছা চাঁদে কী আছে? নীলকণ্ঠবাবু অবশ্য বলেছিল চাঁদের গোটা গা জুড়ে শুধু বড়োবড়ো ফুটো, কিন্তু একটু আগে মেঘের গা থেকে আইসক্রিম খাবার পর মিনুর ধারণা হয়ছে যে আসলে ভূগোলের মাস্টাররা কিছুই জানে না। শুধু যে জানে না তাই নয়, পরীক্ষার খাতায় নিজের মত কিছু লিখতে গেলে রীতিমত গোল্লা দিয়ে দেয়। মিনু গম্ভীর গলায় বলল, “দাঁড়াও, একবার ঘুড়িটা আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাক, গোল্লা দেওয়া কাকে বলে আমিও দেখিয়ে দেব।”

এইরকম করে বেশ কিছুক্ষণ চলল, মিনু খানিকদূর চলে, আইসক্রিম খায়, জিরিয়ে নেয়, গান গায়, আবার চলতে থাকে। যত এগোয় তত মনে হয় চাঁদটা যেন বড়ো হচ্ছে। বেশ খানিকটা হেঁটে আসার পর কিন্তু মিনুর মনে হল সে আর চলতে পারবে না, পায়ে ব্যথা করছে, এদিকে ঘুমও পাচ্ছে না, শুয়ে থাকতেও ভাল লাগছে না, চলতেও ইচ্ছা করছে না, অগত্যা সে বসে পড়ল। মেঘের ওপর কয়েকবার গড়িয়ে নিল। বাড়িতে এখন কী হচ্ছে কে

জানে! বাবা বোধহয় পুলিশে খবর দিয়েছে। মা কি কান্নাকাটি করছে? মিনু মাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি। পিসতুতো ভাই গল্লুর একবার হাত পুড়ে গেছিল বলে পিসি একটা গোটা দিন হাপুস হয়ে কেঁদেছিল। অথচ মিনুর কোথাও কেটে গেলে মা কোনোদিন কাঁদেনি।

হঠাৎ মিনু হিহি করে হেসে উঠল। আর সাথে সাথে তার মনে হল তার পিঠের তলার মেঘটা যেন কেঁপে উঠল। ব্যাপার কী? উঠে দাঁড়াতেই সে অবাক হয়ে গেল, মেঘটা আর স্থির নেই, লাল ঘুড়িটার মতই সেটা হন্তদন্ত হয়ে চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্য সব মেঘগুলোকে পাশ কাটিয়ে। বাসের সামনের সিটে বসলেও অনেকটা এরকম দেখায় বটে।

আর একটা ব্যাপার চোখে পড়তেই বিস্ময়ে মিনুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। চারপাশের মেঘগুলো এতক্ষণ সে ফাঁকা ভেবেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তার প্রত্যেকটার ওপর বসে আছে তারই বয়সি ছেলেমেয়েরা। তাদেরকে নিয়ে চাঁদের দিকে ছুটে চলেছে মেঘগুলো। কিন্তু কেন? এতক্ষণে মিনুর সত্যিকারের ভয় লাগল, কী আছে চাঁদে যে এতগুলো ছেলেমেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? মিনু চিৎকার করে বাকিদের ডাকার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ শুনতে পেল না। কানের পাশ দিয়ে শনশন করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তাতে কীরকম একটা আওয়াজ হচ্ছে যেন, হয়ত যতটা সম্ভব আর্তনাদ করে তারা কিছু বলতে চাইছে মিনুকে, কিন্তু কী? হাওয়ার ভাষা তো সে বোঝে না। আর বুঝেই বা কী লাভ, এখান থেকে পালানোর উপায় নেই।

শেষপর্যন্ত মেঘটা যখন চাঁদের ওপর গিয়ে থামল তখন চারপাশে বেশ একটা হইহট্টগোল পড়ে গেছে। বাকি মেঘগুলো থেকেও নেমে এসেছে ছেলেমেয়ের দল। তাদের কেউ ভয়ে কাঁপছে, আবার কেউ দিব্যি আনন্দে লাফচ্ছে।

মিনু নিচে নেমে দেখল চাঁদের মাটিটা বেশ নরম। ঠিক যেন স্পঞ্জের মত, মনে হয় নিচে স্প্রিং লাগানো আছে, একটু লাফালেই অনেকটা ওপরে ওঠা যায়। এতক্ষণে সে বুঝল যে নীলকণ্ঠবাবু লোকটা ভারি মুখ্যু। এখানে ফুটো তো নেইই বরঞ্চ প্রায় মানুষের সমান উঁচু বেশ কয়েকটা টিলা দেখা যাচ্ছে। মাটিটা একদম সমান, শ্বেতপাথরের মেঝের মত। হাঁটতে ভারি আরাম লাগে। মিনু হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে চলে এল। হঠাৎ চোখে পড়ল তারই বয়সি একটা মেয়ে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে চারিদিকে নজর রাখছে, ভাবখানা এমন যেন এক্ষুনি কেউ এসে ধরে নিয়ে যাবে। মিনু সাতপাঁচ না ভেবে তার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। মেয়েটা আচমকা কারো উপস্থিতি বুঝতে পেরে চমকে উঠে পালাতে যাচ্ছিল তারপর মিনুকে দেখে একটু আশ্বস্ত হল। সমস্ত ব্যাপারটা মিনুর কাছেও গুলিয়ে গেছিল, তাও সে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। মেয়েটা চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে মনে মনে কী যেন হিসেব করতে লাগল, তারপর হঠাৎ করে মিনুর কাঁধ চেপে ধরল, মুখের একদম সামনে মুখ নিয়ে এসে বলল, “তোকেও নিয়ে এসেছে, ঘুড়ি ধরতে গেছিলি নিশ্চই?”

মিনু মাথা নাড়ল। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, “ হ্যাঁ, লাল ঘুড়ি।”

মেয়েটা দুঃখে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “ওই লোভেই আমারও এই হাল হয়েছে।”

“কী হাল?” মিনু সভয়ে জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটা আবার কীসব ভাবতে লাগল, বোধহয় মিনুকে সব কিছু বলা উচিত হবে কিনা সেটাই হিসেব করে দেখার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর হতাশ মুখে বলল, “ লামিয়ার নাম শুনেছিস?”

“ লামিয়া! সেটা কে?”

“ হুম... না শোনাই ভালো। আয় আমার সাথে।”

মিনুর হাত ধরে সে টান দিল। দুজনে উঠে পড়ল। মনে হচ্ছে মেয়েটা অনেকদিন আছে এখানে, হয়ত কিছু জানে, কিন্তু লামিয়া কে? তাকে এতো ভয় পাবারই বা কী আছে। যাই হোক মিনু বেশি না ভেবে এগিয়ে গেল। এইদিকের মাটি আর সমান নেই, কয়েকবার হোঁচট খেল। সামনেই একটা বড়ো পাথর, মেয়েটা সেদিকেই টেনে নিয়ে চলেছে তাকে, দূর থেকে কীসের যেন একটা আওয়াজ আসছে, ভাল করে শুনলে মনে হয় খুব মিনমিনে সুরে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। মেয়েটা তারই বয়সি হলে কি হবে, হাতে বেশ জোর। কেমন যেন রুক্ষ বালিমাখা হাত।

খানিকটা এগোতে মিনুর চোখের সামনে থেকে পাথরটা সরে গেল আর সাথে সাথে ভয়ে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, পা আর এগোতে চাইল না। মেয়েটা ধরে না নিলে সে হয়ত পড়েই যেত। সামনে এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর পড়ে আছে কয়েকটা হাড়! গোটা নয়, ভাঙাভাঙা। যেন একটা বিশাল দৈত্য কামড়ে কামড়ে খেয়েছে তাদের, হাড়গুলো ফেলে দিয়েছে মাটির ওপরে। ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা সেগুলো বাচ্চাদের হাড়। এক মুহূর্তে মিনুর মাথায় সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহলে এই কারণেই এতগুলো বাচ্চাকে ডেকে আনা হয়ছে এখানে! কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এই মেয়েটা এখানে বেঁচে থাকল কী করে? মিনু পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে পড়ল। এবার কী হবে? এখান থেকে তো আর পালানোর পথ নেই, একটু পরেই হয়ত আকাশ জুড়ে দেখা যাবে দৈত্যটাকে। মিনুর কান্না পেল। মেয়েটা তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বলল, “ ভয় পেলি?”

মিনু উত্তর দিল না। তার চোখ ফেটে জল আসছে। প্লুটোকে আর দেখতে পাবে না হয়ত। একটু পরে তার হাড়গুলোও পড়ে থাকবে মাটির ওপর। মেয়েটা তার পাশে বসে পড়ল। তারপর মাটির ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বলল, “ লামিয়া কোন দৈত্য নয়, অনেকটা মানুষের মতই দেখতে। কিন্তু দৈত্যের থেকেও ভয়ানক।”

এই কথাটা শুনে মিনু খানিকটা ভরসা পেল। মানুষের মতই যখন তখন তাকে দেখে অন্তত ভয় লাগবে না। উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “ তুই দেখেছিস?”

“হ্যাঁ, দুবার, পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত মানুষের, তার নিচটা সাপের মত। একটা সাপের খোলস জড়ানো থাকে কোমরে। একবার দেখলেই হাত পা অবশ হয়ে আসে, আমি কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। তারপর থেকে এই পাথরের আড়ালেই লুকিয়ে থাকি।”

মিনু দেখল তারও খানিকটা আশা আছে, কিন্তু এভাবে লুকিয়েই বা কতদিন থাকা যায়, একসময় তো লামিয়া খুঁজে নেবেই তাকে। তখন? কথাটা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতেই তার মুখে কেমন একটা ঝিলিক খেলে গেল, মিনুর দিকে আর খানিকটা সরে এলো সে, তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, “ জানিস, এই ক’দিনে আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি।”

“কী?”

“ এখানে লামিয়া ছাড়াও আরও কিছু আছে।”

“কী আছে?” মিনু আশার আলো দেখল।

“ তা ঠিক জানি না, তবে লামিয়া ভয় পায় তাকে।”

“কী করে বুঝলি?”

মেয়েটা আঙুল দিয়ে একদিকে দেখিয়ে বলল, " ওই যে উঁচু পাহাড়টা দেখছিস, ওটাতে উঠে মাঝে মাঝে চারদিক নজর রাখে লামিয়া। আমি একদিন ওর নিচেই লুকিয়ে ছিলাম। অন্য কোথাও থাকলেই আমায় ধরে ফেলত। লামিয়া পাহাড়ের ওপরে থাকলে পাহাড়ের নিচটাই বাঁচার জায়গা। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ কীসের একটা ডাক শোনা গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম এখানে তো আর কেউ থাকে না? তবে এতো জোরে ডাকল কে? হঠাৎ ঠিক সামনেই কিছু একটা দেখতে পেলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল সেটা একটা বড়ো পাথর। পরে বুঝলাম কারো পা সেটা। আমি তো অবাক! এতো বড়ো পা তো কোন জন্তুর হয় না! অথচ নখ আছে। পুরো জন্তুটাকে দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখেলাম লামিয়া ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে পাহাড় থেকে নেমে গেল। বুঝলাম সেও কাউকে ভয় পায়।"

এতগুলো কথা বলে মেয়েটা দম নিতে একটু থামল। মিনু ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখার চেষ্টা করল। সেই অজানা জন্তুটা যদি লামিয়াকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে তার বাঁচার আশা আছে বটে, কিন্তু ততদিন পালিয়ে পালিয়ে বাঁচাও তো মুখের কথা নয়। তার আগেই যদি লামিয়া দেখতে পেয়ে যায় তাকে? সে যা হোক, মিনুর ভয়টা এতক্ষণে কেটে গেছে। সে মেয়েটার কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "নাম কী রে তোর?"

"অন্তি। তোর?"

"মৃন্ময়ী মিত্র।" অচেনা লোকের কাছে নিজের ডাকনামটা বলতে একদম ইচ্ছা করে না।

"ভালই হল তোকে পেয়ে। শোন, একটা কাজ করতে পারবি?"

"কী কাজ?"

"যদি লামিয়াকে দেখে আমি অবশ হয়ে যাই তাহলে তুই আমাকে টেনে নিয়ে পালাবি, আমি যেতে না চাইলেও নিয়ে যাবি, বুঝেছিস?"

মিনু মাথা নেড়ে দিল। অবশ্য ততটা জোর তার গায়ে আছে কিনা সেটাই সন্দেহের। যেকোনো একজনকেই যদি লামিয়া দেখে ফেলে তবে দুজনকেই তার পেটে যেতে হবে, পিছনে পড়ে থাকা মানুষের হাড়গুলোর কথা ভেবে মিনুর গা শিউরে উঠল।

"চ, এবার উঠি," অন্তি উঠে পড়ল।

"কোথায়?"

"ওই পাহাড়ের কাছে, লামিয়াও হয়ত ওদিকেই গেছে।"

মিনুও উঠে পড়ল। তারপর কী যেন ভেবে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমার সাথে তো আরও অনেকে এল এখানে। তাদের কী হবে?"

"আস্তে আস্তে সবাইকেই খাবে। এখানে তো পালানোর উপায় নেই! তুই ভাল লুকোচুরি খেলতে পারিস তো?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে ভয় নেই।"

“কিন্তু শুধু বাচ্চাদেরই এখানে আনে কেন?”

“আমিও ঠিক জানি না, তবে শুনেছি লামিয়া একসময় এতটা খারাপ ছিল না। খুব সুন্দর এক রানি ছিল তখন, ছেলেমেয়েও ছিল, তো একদিন হেরা বলে আরেক রানি তার সব কটা ছেলেমেয়েকে খেয়ে নেয়, তারপর থেকে রাগে দুঃখে লামিয়া মানুষের ছেলেমেয়েকে খেতে শুরু করে।”

“কিন্তু হেরাই বা ওর ছেলেমেয়েকে খেয়ে ফেলল কেন?” মিনু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

“তা আমি বলতে পারব না। তাড়াতাড়ি আয়, দেরি করলে আমাদের দেখতে পেয়ে যাবে।”

দুজনে দ্রুত পা চালাল। দূর থেকে আসা সেই বাঁশির আওয়াজটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এতক্ষণ শান্ত হয়ে হাওয়া দিচ্ছিল, সেটাও যেন ধীরে ধীরে গতি নিচ্ছে। দূরে পাহাড়ের চুড়াটা দেখা যাচ্ছে। তার ওপরদিকটা মেঘে ঢাকা। আলোআঁধারের অদ্ভুত রঙে সেজেছে চারিদিক। চারপাশের স্থির নিস্তব্ধ পাথরগুলো যেন কীসের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। এতগুলো ছেলেমেয়ে এখানে এসে নামল কিন্তু এখন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই গেল কোথায়?

মিনু আর অন্তি আস্তে আস্তে পাহাড়ের কাছে পৌঁছল। মিনু শক্ত করে ধরে আছে অন্তির কবজিটা। লামিয়া কাছেপিঠেই কোথাও আছে। এখানে থাকলে সে দেখতে পাবে না বটে কিন্তু তার সটান নিচে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভাবলেই ভয়ে গলা বন্ধ হয়ে আসছে। একটা ফোকরের সামনে বসে দুজনে অপেক্ষা করতে লাগল। মিনু ঢোঁক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “ হ্যাঁরে, এলে বুঝব কী করে?”

“ঝুমুরের আওয়াজ, আর সাপের হিসহিস শুনতে পাবি।”

“যদি বুঝতে পারে আমরা এখানে আছি?”

অন্তি উত্তর দিল না। চারপাশটা নিস্তব্ধ। মিনু বেশ কয়েকবার কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। ওই সর্বনাশা ঘুড়িটা যে তাকে এখানে নিয়ে আসবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত লামিয়ার পেটে যদি যেতেই হয় তাহলে ওই ঘুড়িটা অন্তত ছিঁড়ে দিয়ে এলে হত।

মিনু এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল, এমন সময় হাতের ওপর চাপ পড়তেই সে চমকে উঠল। একটা হিসহিসে শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাপের শিসের মত। বাড়ছে কমছে। শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। মিনু বুঝতে পারল না সে নিঃশ্বাস নেবে কিনা। যতক্ষণ না লামিয়া দূরে না চলে যাচ্ছে ততক্ষণ যদি শ্বাস আটকে রাখতে পারে তাহলে অসুবিধা নেই, কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়বে। তখন? অন্তি শক্ত করে ধরে আছে তার কনুইটা। মনে হল এই বুঝি সমস্ত পাহাড়টা ভেঙে পড়বে তাদের মাথায়।

ফোকরের কাছে এসে হিসহিস শব্দটা থেমে গেল। সেটা আর ওপরের দিকে উঠছে না। তবে কি কিছু বুঝতে পেরেছে? গর্তটার ঠিক বাইরে থেকে একটা খিলখলে হাসির শব্দ ভেসে এলো, ফোকরের ভিতরের ফাঁকা দেওয়ালে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল হাসিটা। মিনু অন্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল তার চোখদুটো ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে, মাথা নামিয়ে সে বলল, “ কোনোদিন তো এভাবে হাসে না, আজ...”

মিনু আর কিছু বলতে পারল না, এই প্রথম তার বাড়ির সবার জন্য মন কেমন করতে লাগল। হিসহিস শব্দটা এখনও একই জায়গা থেকে আসছে। হাসিটা থেমে গেছে। কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ তারপর ফোকরের

ঠিক বাইরে যেন কিছু একটা নড়তে লাগল। অনেকটা সাপের গায়ে যেরকম দাগ থাকে সেইরকম। তারপরেই দেখা গেল একটা মুখ, মানুষের মতই তবে মানুষের নয়, টানা টানা ভয়ঙ্কর হলদে দুটো চোখে হিংসা জ্বলজ্বল করছে। থুতনিতে একটা লাল পাথর বসানো, বাঁকান ঠোঁটে ক্রূর হাসি, মাথায় সোনালি মুকুট।

ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে জিভটা কয়েকবার বেরিয়ে এল। চেরা জিভ। অন্তি জড়িয়ে ধরেছে মিনুকে, আতঙ্কিত স্বরে কয়েকটা ভাঙা ভাঙা শব্দ উচ্চারণ করছে সে, "তাকাস না ওদিকে, মরে গেলেও ওর দিকে তাকাস না।" মিনুর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল, তবু সে মুখ ফেরাতে পারল না। একটু একটু মাথার মধ্যে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে, এইবার হাত পা অবশ হয়ে আসছে, আর একটু সময় বাকি...

ঠিক এইসময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। ফোকরের সেই ভয়ঙ্কর মুখটা হঠাৎ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একটা বিকৃত শব্দ করে বাইরে ছিটকে পড়ল। এতক্ষণ ভয়ে মিনু খেয়ালও করেনি যে সেই হালকা বাঁশির শব্দটা এখন বেশ জোরে শোনা যাচ্ছে। ব্যাপার কী? সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ঠেলা দিয়ে অন্তিকে ডাকল, "ওই, ওঠ ওঠ, চলে গেছে রে।"

অন্তি কোন সাড়া দিল না, বোধহয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মিনু সাহস করে ফোকরের বাইরে পা বাড়াল, আর বাইরে এসে দাঁড়াতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তার বুকের ধুকপুকুনি কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। চাঁদের মাটির ওপর শুয়ে ছটফট করছে লামিয়া। আর তার বুকের ওপরেই তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা মানুষ। না, ঠিক মানুষ নয়, তার সারা শরীর নীলচে রঙের ফিনফিনে কাপড়ে ঢাকা, তার ওপর তারার মত জ্বলজ্বল করছে কয়েকটা বিন্দু, যেন রাতের আকাশ থেকে কেটে খানিকটা কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে সে। মুখটাও ঢাকা পড়েছে তাতে। এই কি তবে অন্তির দেখা সেই জন্তুটা? কিন্তু এর হাতে তো ঝলমল করছে আলোর তলোয়ার!

মিনু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। সাপটা বারবার ছোবল মারছে তলোয়ারধারীকে, পরমুহূর্তেই সে লুটিয়ে পড়ছে মাটির ওপরে। প্রচণ্ড চিৎকার আর আক্রমণের শব্দে মাটি কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ মিনুর কাঁধে হাতের স্পর্শ লাগতে সে পিছন ফিরে তাকাল। অন্তি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। মিনু কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে, তার আগেই অন্তির মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো, " সাইবিল।"

"সেটা কে?" মিনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"যার হাতে তলোয়ার।"

মিনু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে এই অনেক। এবার বাড়ি ফিরবে কীভাবে সেটাই চিন্তা। এতক্ষণে সাইবিলকে বেশ কাবু করে ফেলেছে লামিয়া, তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের হলকা, সেই সাথে আকাশ ফাটানো চিৎকার। একটা হলকা এসে লাগল সাইবিলের হাতে, হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ল আলোর তলোয়ার। মিনু প্রমাদ গুনল। তবে কি হেরে যাবে সাইবিল? তাহলে তো আর লামিয়ার হাত থেকে নিস্তার নেই!

সাপের শরীর নিয়ে লামিয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। এইবার সে উঠে দাঁড়াল আহত সাইবিলের বুকের ওপর। কয়েকবার ডান হাত দিয়ে ছিটকে পড়া তলোয়ারটা ধরার চেষ্টা করল সাইবিল, কিন্তু পারল না। কবজির কাছ থেকে পুড়ে গেছে হাতটা। তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আকাশ কাঁপিয়ে হাসল লামিয়া। হিংস্র জিভটা বেরিয়ে

এলো কয়েকবার। দুহাতের বিষাক্ত নখগুলো তুলে ধরল মাথার ওপরে। এখুনি সেগুলো নেমে আসবে সাইবিলের বুকের ওপর।

পোড়া ডানহাত দিয়ে শেষ বারের মত তলোয়ার চেপে ধরার চেষ্টা করল অসহায় সাইবিল, আর ঠিক এই সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। পাহাড়ের একদম ওপর থেকে লামিয়ার ঘাড়ের ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা লোমশ জানোয়ার। কী বিরাট! মিনুদের গোটা বাড়িটাও এর থেকে ছোটো।

জানোয়ারটার ধাক্কায় বেশ কিছুদূরে ছিটকে পরেছিল লামিয়া। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই উঠে দাঁড়াল সাইবিল, তার বাঁ হাতে তুলে নিল তলোয়ার। মুহূর্তের মধ্যে সেটা বসিয়ে দিল লামিয়ার বুকের ঠিক মাঝখানে।

মিনু আর দাঁড়াল না। অন্তির হাত ধরে দৌড়াতে লাগল ভেসে থাকা মেঘগুলোর দিকে। আবার যদি জেগে ওঠে লামিয়া? আর একমুহূর্তও এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না।

মেঘগুলো আর আগের মত নেই, তাদের সমস্ত গা জুড়ে এখন কালো রঙ ধরেছে, কিন্তু তাও থামলে চলবে না, ওগুলো করেই ভেসে পড়তে হবে ঘুড়িটার কাছে। একটা মেঘের ওপর উঠে বসল দুজনে। কিন্তু মেঘটা এক বিন্দুও নড়ল না, দুজনে দৌড়াতে লাগল। আর সাথে সাথে প্রচণ্ড গর্জন করে ভাঙতে লাগল কালো জমাট মেঘটা। ধীরে ধীরে সেটা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে, পুরোটা গলে যাবার আগেই অন্য মেঘে উঠতে হবে।

অন্তির পায়ের ঠিক পিছনেই খানিকটা মেঘ গরম হয়ে গলে পড়ল, সাথে বাজ পড়ার শব্দ। দুজনে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল। কয়েকটা মেঘের ওপারেই দেখা যাচ্ছে লাল ঘুড়িটাকে। কিন্তু অতদুর দৌড়াতে পারল না ওরা। আকাশে এখন একটাও রুপোলী মেঘ নেই। একটা নরম, প্রায় জল হয়ে যাওয়া মেঘের ওপর পা রাখতেই সেটা গলে পড়ল। শূন্য আকাশ বেয়ে নেমে আসতে লাগল দুটো শরীর। অন্তি মিনুকে চেপে ধরল, পায়ের নিচে আর কিচ্ছু নেই–

না। আছে। অনেক নিচে আছে, চেনা পৃথিবী, ঘর বাড়ি, মানুষ। বৃষ্টির জলের সাথে মিশে দুজনে নামতে লাগল নিচে। আস্তে আস্তে চাঁদ আর মেঘের দেশ দূরে চলে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে পৃথিবীর মাটি। মিনুর ঘুম পেল...

.....

কানে টান পড়তেই সম্বিৎ ফিরল মিনুর । সাথে সাথে মায়ের ঝাঁঝালো গলা কানে এল, “গেছো মেয়ে কোথাকার! ফের তুই ছাদের পাঁচিলে উঠেছিলি? দাঁড়া, বাবাকে আসতে দে, তারপর তোর একদিন কি আমার একদিন।”

দুপুরের রোদ ঝলমল করছে। মিনু থমথমে মুখে নিচে নেমে এল। তারপর গামছা কাঁধে নিয়ে স্নান করতে ঢুকে গেল। তবে কি এতক্ষণ সব কিছুই তার ভাবনা ছিল? ছাদের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিল? ধুর... মিনুর মনটা খারাপ হয় গেল, আগে জানলে মেঘের আইসক্রিমটা আরও খানিকটা খেয়ে নিলেই হত।

স্নান করে মিনু খেতে বসল। চিংড়িমাছ সে একদম পছন্দ করে না। অথচ আজ মা সেটাই রান্না করেছে। কেন, লুচি করা যায় না? মা বাটি থেকে তরকারি তুলে থালায় দিচ্ছেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার চোখে পড়তেই মিনু অবাক হয়ে গেল। কী যেন ভেবে প্রশ্ন করল, “ মা, তোমার হাতে অতটা পুড়ল কী করে?”

“তেলে তেজপাতা দিচ্ছিলাম, ছিটকে এসেছে। তুই খা এখন।”

মিনু চুপচাপ খাওয়া শেষ করে নিচে চলে এল। একতলার ঘরে বসেই সে পড়াশোনা করে। আজ কিন্তু ঘরটা খুলতেই দেখতে পেল জানলায় বসে ঘুমাচ্ছে প্লুটো। মিনুকে দেখতে পেয়েই সে একলাফে ঘরের ভিতর ঢুকে এলো। জুবুথুবু হয়ে বসে পড়ল কোলে। মিনু লক্ষ করল তার গলার নিচ থেকে একটা কাটা দাগ। যেন কিছু একটা আঁচড়ে দিয়েছে তাকে। অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন ঘুরছিল মনে, প্লুটোর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সেটাই জিজ্ঞেস করল মিনু, "তুই কি পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলি লামিয়ার ঘাড়ে?"

প্লুটো গর্বভরে মিনুর হাত চাটতে চাটতে বলল, " ম্যাও।"

(আগেই বলেছি প্লুটোর ম্যাওয়ের অর্থ খালি মিনুই বুঝতে পারে, সেদিনও বুঝেছিল। তবে সেটা হ্যাঁ কি না তা আমাকে সে বলতে চায়নি। উল্টে বাকি গল্পটার জন্য আমার কাছ থেকে একটা ইংরিজি লেখা ক্যালকুলেটার হাতিয়ে নিয়েছে। অতএব আমি নাচার। আপনারাই চেষ্টা করে দেখুন ওর পেট থেকে কিছু বের করতে পারেন কিনা...)

ছবিঃ মৌসুমী





বাঁকুড়া থেকে আউসারা, যাবো ছুটির দিনের রেলগাড়ি চড়তে। রাত কেটেছে ডাকবাংলোয়। কেটেছে কোথায়। এখনও আছে শেষ রাত্তির। রিকশা চলেছে এঁকে বেঁকে শিউলি ফুলের বাস জড়ানো হিমেল বাতাস গায়ে মেখে। রাস্তায় টিমটিমে চা মিষ্টির দোকান দুটো একটা। মাঝে মাঝে হঠাৎ অন্ধকারের মাঝ থেকে ঝাঁপিয়ে আসা আলোয় আলো পুজোমন্ডপ। দূর্গা অসুর সিংহ সবাই কাপড়ে ঢাকা, পুজো এখনও শুরুই হয়নি! কাল গেছে পঞ্চমী আজ মোটে ষষ্ঠী! এখনও আনন্দের ঝুলিতে সম্বল বাকি দিন কটা। চলতে চলতে গাল্লু ধরলো গান, আপ্পু ধরলো তান। তুফান মেল যায় তুফান মেল।

খুশি হয়ে ওদের সাথে গলা মেলাল পথের কটা কুকুর। অন্তু ডাকলো- যাবি আমাদের সাথে রেলগাড়ি চড়তে? সাহেবমামার ক্যামেরা চম্‌কে চম্‌কে উঠছে থেকে থেকেই।

পুরোন ষ্টেশনটা খুঁজে বার করে টিকিটের জানালায় দাঁড়াল ক'জন, বাকিরা গেল জায়গা রাখতে। গাড়ির কাছে গিয়ে বাঁশবনে ডোম কানা। বসব কোথায়? সবটাইতো খালি! ক্ষুদে লাইনে সারাদিনে এই একটাই ক্ষুদে গাড়ি, তাও খালিই পড়ে থাকে। সবাই তো কাজের মানুষ! এ গাড়িতে চড়বার সময় আছে কার? টিকিটদাদা বললেন দশদিন বাদে একসাথে বারোটা টিকিট বিক্রি হল।

ছোটো হলে কী হয়, ক্ষুদে ইঞ্জিনটা ফোঁস্ ফোঁস্ করছে 'আগুন কয়লা' খেয়ে, উগরে দিচ্ছে কালো রঙের খোঁয়া। চিমনীর ধোঁয়া কালো, নিচের ধোঁয়া সাদা। বুড়ো ড্রাইভার পিস্টন চাপতেই ফি-স্-স্ করে শব্দ হচ্ছে আর ধোঁয়ায় ধোঁয়া চাদ্দিক! ছোটোরা নিচু হয়ে লাইনের পাশে বসে যন্ত্রপাতি দেখছে অবাক হয়ে। বড়োদের কারও কারও স্মৃতির পুরোন রেলগাড়িরা বহুদুর থেকে ছেলেবেলার বাঁশি শোনায়। ডুবন্ত সুখে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

আদ্যিকালের বামনমার্কা ইঞ্জিনের সাথে দুটি কামরা আর গার্ডের গাড়ি- সাকুল্যে এই! ততক্ষণে সকাল হয়ে এসেছে। ফিটফাট গার্ডবাবু সবজে-লাল নিশেন হাতে প্ল্যাটফরমে এসে ভারী অবাক!

'দল বেঁধে কোথায় চললেন আপনারা! কী কাজ? এ গাড়িতে তো এ রকম দল যায় না!'

হেঁকে উঠলো পুরো দল, 'কোন কাজ নেই! আমরা চলেছি ছুটির দিনের রেলগাড়িতে মজা করতে।'

গার্ডসাহেব হেসে বললেন, 'মজা কোথায়, এ হল বি-ডি-আর! মন্দ লোকে বলে- বড়ো দুঃখের রেল।'

টিং টিং ঘন্টা পড়লো, সবজে নিশেন উড়লো, নীল জামা ড্রাইভার বাঁশির শেকল টানতেই- কু-উ-উ-উ-উ! বাব্বা! এইটুকু শরীরে কি জোর আওয়াজ। যেন খ্যাপা হাতি!

চললো রেলের গাড়ি ঘস্-ঘস্-ঘস্স।

বাঁকড়ো শহর ভুলতে বসেছে ক্ষুদে লাইনটাকে, তাই বাঁচোয়া! ঝোপঝাড় পোস্কার করেনি কেউ। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিস্তর গাছপালা লতাপাতা যেমন ইচ্ছে বেড়েছে, নানান রঙের ফুলটুল ফুটিয়ে পথটার বাহার

খুলেছে বেশ! হেলেদুলে চলছে মজার রেলের গাড়ি এর উঠোন ওর খিড়কিদোরের গা ঘেঁষে। জানালা পথে আগ্রহী লতাপাতারা ঢুকে আসছে আলাপ জমাতে, কচিকাঁচাদের নরম হাতের আদর খেয়ে পিছিয়ে পড়ছে ফের। গাছপালা ছিঁড়তে বারণ। বড়োদেরও গপ্পোগাছা গানটান চলছে। তার সাথে সমানতালে চলেছে জিলিপি সিঙাড়া কেক মিষ্টি আর মাটির ভাঁড়ে ফ্লাক্সবাহিনী লাল চা। দলের সবচাইতে ছোটোটার বেআইনী আবদার 'আমিও ভাঁড়ে করে চা খাব।' বেশ তাই সই!

চলতে চলতে ছবি পাল্টাচ্ছে ট্রেনের জানালায়। ক্ষেপে উঠে স্বভাবের তুলনায় একটু জোরেই চলছে ট্রেন। মাঝে মাঝেই চরাচর কাঁপিয়ে হুইসেল দিচ্ছে কারণে অকারণে। দুর্বল রেললাইন ট্রেনের দুরন্তপনায় আপত্তি জানিয়ে নানারকম আওয়াজ করছে, শুনে ছোটোর দল হেসেই কুটিপাটি! গাল্লু বলল ইঞ্জিনটা ছোটোভাইদের হাত ধরে পুজো দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। দেখছ না মাঝে মাঝে কেমন হ্যাঁচকা টান মারছে! ছোটোভাইরা কি আর অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে?

পুজো দেখতে যাবার ব্যাপারটা হলেও হতে পারে! ভোরের কুয়াশাভাব কেটে গিয়ে সোনারঙের রোদ উঠেছে ততক্ষণে। গাড়ির জানালায় ফুলে ফুলে সাদা শিউলির বন। বনের মাঝ বরাবর আঁকা বাঁকা দুলন্ত কাশবনে ছাওয়া ছোটো এক নদী। নদীর ধারে সাদা বালির চরায় ছোট্ট শামিয়ানার তলায় আলো আলো মুখ করে দিব্যি দুজ্ঞাঠাকুরটি। রেলের গাড়ি ঝন্‌ঝনানি গরগরানি থামিয়ে থিতু হল। এ কোথায় এলাম? স্টেশন কই? থামবে কতক্ষণ? জানালায় সবাই মিলে উঁকিঝুঁকি স্টেশনের খোঁজে, হদিশ নেই স্টেশনের! গার্ডসাহেব হাসিমুখে উদয় হলেন।

'একী বসে আছেন যে! ঠাকুর দেখবেন না? চলুন চলুন?'

বলামাত্তর ঝুপ ঝাপ করে গাড়ি খালি। সবাই ছুটল ঠাকুর দেখতে। কেউ গেল শিউলিবনে ফুল কুড়োতে কেউ গেল নদীর ধারে। গাড়ি ছেড়ে দেবার ভয় নেই। গার্ডসাহেব নিজেই বসে আছেন নদীর ধারে উল্টোন নৌকোর পিঠের ওপর চেপে। নদীটির শান্ত বুকে নীল আকাশের ছায়া। দুলছে কাশফুল উড়ছে রেলগাড়ির ধোঁয়া। ছবি ধরা রইল সাহেবমামার ক্যামেরায়। ট্রেন ছাড়বার ধরাবাঁধা সময় নেই আজ। আপ্পুর ছোটো হাতের মুঠোয় সবজে নিশান ধরিয়ে গার্ডসাহেব বললেন- তুমি এটা নাড়লেই গাড়ি চলবে। শুনেই আপ্পু নিশেন লুকিয়ে ফেলেছে জামার তলায়, পাছে নড়ে যায়!



খানিক বাদে অবশ্য চলল আবার রেলগাড়ি আপ্পুর ইশারায়। সাহেবমামা ক্যামেরা কাঁধে চড়ে বসেছে গার্ডসাহেবের ক্ষুদে কামরার মাথার ওপর। চলতি গাড়ির ছাতের ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। গার্ডসাহেব নিজের জায়গা ছেড়ে এসে উঠলেন আমাদের কামরায়। সবাই মিলে গলা ছেড়ে গাওয়া গানের টান ছেড়ে কি থাকা যায়? গানের গলা ভালো মানুষটার, ভারী মিশুকে। এক বাদলা দিনের পাগলা ঝড়ে দুঃখের রেলের দুর্দশার গল্প শোনালেন তিনি।

সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! দিনের বেলা রাতের আঁধার! গুম্ গুম্ শব্দ করে বুনো মোষের মতো মেঘের দল রাগ করছে, আগুনে ঝিলিক মারছে এখানে ওখানে। সেলেটের গায়ে আলোর দাগ টেনে সটান বাজ নেবে এল একটা তালগাছের মাথায়। দাউ দাউ আগুন! দেশলাই বাক্সোর মত রেলগাড়ি চলেছে জঙ্গলের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে ভীতু বাচ্ছা ছেলেদের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। জঙ্গল ছেড়ে খোলা জমিতে যেতেই চিত্তির! দেশলাই বাক্সো দমকা হাওয়ার দাপে কাৎ হতে হতে পড়লো হাত পা শূন্যে তুলে উল্টে। যাত্রী বিশেষ ছিল না তাই রক্ষে। অবশ্য দশ মিনিটের মধ্যে উল্টো হাওয়ার ঠ্যালায় আবার সিধে খাড়া লাইনের ওপর ঠিক্ ঠাক্! কারো চোট হয়নি। শুধু নাগোরদোলায় চাপলে যেমন হয়, মাথা টাথা ঘুরে গেছল আরকি। ঝড় যেন একটু নড়া ধরে নাড়া দিয়ে শাসণ করে গেল শুধু। জামা কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে আবার চল্লো খেলনাগাড়ি নিজের পথে! গপ্পো বটে একখানা! অবশ্যি সত্যি মিথ্যে বোঝা গেল না।

চলে গেল ছোটোখাটো খানকতক্ ইস্টিশন্। প্ল্যাটফরম বলতে ঘাস বিছোন কাঁকুরে জমি, ছাউনি, ইচ্ছেসুখে বেড়ে ওঠা বড়ো ছোটো ক'টি গাছ। টিকিটঘর বলতে একখান করে ঘর ছিল বটে, এখন না থাকার সামিল। জানলা দরজা নেই কারো, দেয়ালেও এখানে ওখানে ইঁট নেই। থাকবার মধ্যে নিশ্চিন্তে জাবর কাটা ক'টা গরুবাছুর। আদ্যিকালের লেখা নামগুলো মুছে যায়নি অবিশ্যি। চোখ ঠাহর করে দিব্যি পড়ে নেয়া যায়। খাতায় তখন লেখা হয়ে ওঠেনি বলে মনেও পড়তে চাইছেনা আর। তবে নাম শুনলেই আদর আদর ভাব আসবে মনে।

ভাবছ টিকিটঘর নেই বলে টিকিট বিক্রিও নেই? উঁই এ কথা বলা যাবে না কোনমতেই! যে বাউল মানুষটা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে শোনাচ্ছিল, কী একটা স্টেশন আসতেই সে হয়ে গেল টিকিটবাবু! কমিশন এজেন্ট। নতুন দুজন যাত্রী উঠতে দেখে একগোছা টিকিট হাতে কি তার আকুলিবিকুলি! তারাও নেবে না এ-ও ছাড়বে না! দুজন মিলে অন্তত একখান টিকিট কাটুক তারা তাহলেও খানিক নিয়মরক্ষা গোছের হয়! জোরজবরদস্তি নেই কোনো, হাতে পায়ে ধরাধরি প্রায়। শেষে দুজনকে নগদ দুখানা বিড়ি ঘুষ দিয়ে বিক্রি হল একটা টিকিট!

ওমা! বলতে ভুলেছি নির্জন শালবনের মাঝে সেই একলা ময়ুরটার কথা। সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট!

চলতে চলতে হঠাৎ গাড়ির শব্দ গেল পাল্টে। রেলে চাকায় সহজ ছন্দের খুশিয়ালি খুনসুটি সুর-তাল হয়ে গেল গম্ভীর, গমগমে। সবাই গানটান থামিয়ে কান পাতল। উঁচু নিচু খোলামাঠ ছেড়ে শালবনের গহণ আঁধারে ঢুকে পড়েছে মজার রেলের গাড়ি। দুষ্টুটা যেন ঘুম ভাঙাতে এসেছে শালবনের। এখানে হাতির কানের মত বড়ো বড়ো পাতা দোলানো শালপিয়াল সেগুন গাছেরা শব্দ ধরে রাখেনা, ফিরিয়ে দেয়। তাই রেলের বাঁশীর প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসে। রেশ রেখে যায়। বনের আঁধারে রেলের ধোঁয়ায় রহস্য ঘনায়। রেল গাড়ির ঝক্কর ঝক্কর শব্দ গহন বনের জমাট গাম্ভীর্যকে ঠাট্টা করে এগিয়ে চলে।

সূয্যিঠাকুর উঠে এসেছেন মাথার ওপর। শালবনের পাতাদের নাগাল এড়িয়ে শরতের সোনা রোদ্দুর বনের সবুজ মখমল মেঝের ওপর কোথাও পেতেছে ছোটো বড়ো রুমাল, কোথাও বা খুচরো হয়ে অসংখ্য আলোর সিকি আধুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এ বনের সবুজ বড়ো মনমাতানো সতেজ, এ রঙকে বলে এমারেল্ড বা পান্না সবুজ। হঠাৎ সবার চোখ ধাঁধালো উজ্জ্বল সাতরঙের কারসাজিতে। পেখম মেলে সাথীহারা ময়ূর পান্নার পটে ছবি হয়ে ফুটে আছে। ছোটোদের আবদারে এগিয়ে যাওয়া রেলগাড়ি থেমে পিছিয়ে এলো ফের। কোথায় কী! বনের ছবি বনেই গেছে হারিয়ে। মন থেকে অবশ্য মুছে গেল না কারও। শালের চাঁদোয়ার তলায় ফের কিছুক্ষণ ছোটাছুটি গড়াগড়ি সবাই মিলে। ভারী রসিক এক কারবারি দোকান ফেঁদেছে এ হেন নির্জনতায়। হাতে হাতে গরম চা, ছোটোদের জন্য গরম দুধ, 'নানখাটাই' আর 'কখনো মেঘ' বিস্কুটে জমে উঠলো খাওয়াদাওয়া। কাঁচা শালপাতার দোনায় গরম ঘুঘনীটাই বুঝি ছেড়ে যাওয়া যায়!

এখানে ঘর বেঁধে থাকবার কথা মনে এলে দোষ দেয়া যায় না। নিদেন চোখের দেখাটি দেখে যাওয়া মাঝে মাঝে? সময় না পাবার দোষ কি সময়ের, না যে সময় পাচ্ছে না তার মনের?

তা বলে সময় অনন্ত নয় কারো! সবুজ নিশান দুলে ওঠে ফের। পিছিয়ে পড়ে শালের বন। গহন সবুজ থেকে আবার নীল আকাশ, খোলা রোদ্দুর, ধানের ক্ষেতে গড়িয়ে যাওয়া হাওয়ার ঢেউ। ডেকে ডেকে রেলের বাঁশি যেন ক্লান্ত। চলে চলে চাকায় রেলে ঝিমিয়ে পড়া সঙ্গত। জানলার ফ্রেমে পর পর সাজানো চলার নেশায় মাতোয়ারা মুখ, উড়ো উড়ো চুল, হাওয়ায় ধোঁয়ায় লালচে চোখ। অনেকটা পথ চলে এলাম, আবার কবে?

'বর্ধমান জেলায় এসেছি বহুক্ষণ, রায়না আসতে দেরি নেই।' দুপুর রোদে ঝিমিয়ে পড়া কি এক স্টেশনে থেমেছে গাড়ি, গার্ডসাহেব জানিয়ে গেলেন। স্টেশন আগলে এক প্রকান্ড বুড়ো বট। অসংখ্য জটার মতো ঝুড়ি নাবিয়ে ধ্যানে বসে আছে। বেশ লম্বা একটা অবসর সবাইকার, ইঞ্জিনের পেটে জল ঢালা হচ্ছে। তেষ্টা পেতেই পরে তার! সেই কোন ঝুঁঝকোবেলা থেকে এই দুপুর অবধি পুজোর ধূনোগন্ধী অলস রোদ্দুরে দুষ্টুমি কম করেনি সে!

জটাধর বটের থেমে ঠেস দিয়ে বুড়ো ড্রাইভারদাদা হুঁকো ধরিয়ে বসেছে। ঝড়তিপড়তি খাবারদাবার ভাগাভাগির পর বড়োরা কেউ শুয়েছে ঘাসের বিছানায় কেউবা বাউলদাদাকে পাশে বসিয়ে গান শুনছে চক্ষু মুদে। আপ্পু গেছে গার্ডসাহেবের হাত ধরে রেলগাড়ি চালানো শিখতে। গাল্লু ব্যস্ত খাতায় কলমে।

'এ গাড়ির আয়ু ফুরিয়ে এসেছে বাবু।' ড্রাইভারদাদা হুঁকোয় নীলচে ধোঁয়া বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে আনমনে বলল।

'কেন?'

'রেল কোম্পানির লাভ নেই!'

মন খারাপ হয়ে গেল। সব লাভই কি টাকার অঙ্কে কষা যায়? মাঝে মাঝে নিষ্কর্মা যাত্রীদের লাভও দেখলে পারত কোম্পানী, লোকসান হলেও।

যাক! মজার রেলের যাত্রায় মন খারাপ করতে নেই। তাই বলে কি মনের দুঃখ কমে? তোলা রইল সেটা বাড়ির জন্য। পেটপুরে ঠান্ডাজল খেয়ে দম নিয়ে মাঠঘাট কাঁপিয়ে ট্রেন হুইশ্যল্ বাজাতেই যে যার আপন আপন জায়গা নিয়ে বসে গান জুড়েছেঃ

'এবার আমার উমা এলে
আর উমায় পাঠাবো না,
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারো কথা শুনবো না।
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়
উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া
জামাই বলে মানবো না।'

গাইতে গাইতে কখন এসেছে আউসারা, মাঠের মাঝে থেমেছে গাড়ি। বিদায় জানাতে গাড়ি থেকে নেবে এসেছেন ড্রাইভারদাদা, গার্ডসাহেব, বাউলদাদা, সক্কলে। নেবে যেতে হয় তাই নাবতে হল। নেবেছি বটে, কোনদিকেই গাঁ ঘরের কোন চিহ্ন নেই! ধু ধু ধানের ক্ষেত হেলছে দুলছে, মাথা নুইয়ে ঝিমোচ্ছে যতদূর দু'চোখ যায়। আলপথে চলেছি সবাই সারবেঁধে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে ফিরে হাত নাড়ানাড়ি চলছে। রেল বাঁধের ওপাড় থেকে হাত নাড়ছে মজার রেলের আজব রেলের বন্ধুরা। ছোট্ট শুঁয়োপোকার মত দেখাচ্ছে এখন রেলের গাড়িটাকে। হুইশ্যল বাজালো একবার, শোনা যায় কি যায় না। মিঠে গলায় যেন বলল – মনে রেখো। তারপর নীল আকাশের গায়ে কালো ধোঁয়ার আলপনা এঁকে দিতে দিতে চলে গেল নজরের শেষ সীমা পেরিয়ে!

দূরে নজরে পড়ছে আউসারা গাঁয়ের ঘরবাড়ি। বর্ধমান সদর শহর যাবার বাস পাব ওখানে। মাঠের মাঝে খোড়া চালার এক পূজামণ্ডপ। ধানের বুকে ঢেউ খেলানো পাটবন কাশবন দোলানো হাওয়ার দূর থেকে কানে এসে পৌঁছল দেবীবোধনের ঢাক;

' ঢ্যাং কুরা কুড় ঢ্যাং কুরা কুড় কুর কুর কুর তাক্
দুজ্জামায়ের ছানা পোনা গাঁ শহরের সকল জনা
বেঁচে বর্তে থাক্।'

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

চম্পকলাল



অমর মিত্র

চম্পকলাল খুব বুদ্ধিমান। তার বাবা তাই জানে। বুদ্ধি করে করে সে এতোটা বড়ো হয়েছে। কতটা বড়ো? না সাড়ে পাঁচ ফুটের উপর উঁচু চম্পকলাল তার বাড়ির ভিতরে সব চেয়ে লম্বা। তার বয়স কত? এখন হয়ে গেছে অনেক, আগে ছিল অনেক কম। তার আগে ছিল আরো কম। আর এটাও ঠিক চম্পকলালের বয়স বেড়েও যাবে আরো ক'দিন পরে। ক'বছর পরে। তা হোক, তার মতো বুদ্ধিমান কে আছে ?

চম্পকলাল জানে সে খুব বুদ্ধি ধরে। তার মাও তাই বলে। বাবা জানে কিন্তু কিছু বলে না। বাবা খুব গম্ভীর মানুষ। বাবার ব্যাবসা আছে চিৎপুরে। সে একটা ঝাড়াই মশলার আর গোখাদ্য, খৈল ভুষির দোকান। বাবা সেই দোকান নিয়ে ব্যস্ত। বাবা খোঁজও রাখে না চম্পক কত বুদ্ধি তার ঘটে ভরেছে এতদিনে। বাবা খোঁজ রাখে না চম্পক এক ক্লাসে দুবার করে থাকে। চম্পকের মা ইস্কুলে গিয়ে হেড স্যারকে ধরে ক্লাসে তুলেছে এই নাইন পর্যন্ত।

বাবা মাঝে মাঝে চম্পককে জিজ্ঞেস করে, "লেখাপড়া হচ্ছে তো ?"

"চম্পক ঘাড় কাত করে, "হচ্ছে।"

"কোন কেলাস?"

চম্পক বলে, টেন।

"টেনে উঠে গেলি, গেল হপ্তায় নাইন ছিল না ? "

চম্পক বলে, "না উঠিনি তো উঠছি।"

"কোথায় উঠছিস ? "

চম্পক বলে, "টেনে।"

বাবা অবাক। বাবার নাম চৌধুরীলাল দত্ত। ব্যবসায়ী হতে হলে অমন নাম হতে হয়। চাউডুরিলাল ডাট। নামেই অর্ধেক হয়ে গেছে। ওই চিৎপুরে এমন নাম আর কারো নেই। সবাই সমীহ করে। চাউডুরীজি চাউডুরীজি বলে হাত কচলায়। আর চৌধুরীলাল দত্ত হে হে করে হাসে, আরে বৈঠিয়ে, কেয়া চাহিয়ে।

চম্পকের বাবা ছেলের কথা শুনে বলে, "টেনে উঠছিস ? "

"হাঁ সার।"

"আরে বাবাকে কেউ সার বলে ? "

চম্পক বলে, "হাঁ সার।"

"কে বলে ? "

বলে অঙ্ক স্যারের ছেলে তপেন। সে ইস্কুলে বাবাকে স্যার বলতে বলতে বাড়িতেও তা বলতে আরম্ভ করেছে। আর তাতে কী হয়েছে চম্পকের মনে হয়েছে সেও তার বাবাকে স্যার বলতে পারে। স্যার থেকে সার। চম্পকের কথা শুনে চৌধুরীলাল দত্ত বোঝেন ছেলের বুদ্ধি আছে। চম্পকের মাকে বললেন তিনি কথাটা, "এ ছেলের হবে।"

"কী হবে?" চম্পকের মা জিজ্ঞেস করে।

"দেখ কী হয়।"

এরপর আর ছেলের সঙ্গে বাবার কথা হয় না। চম্পক তার বুদ্ধি বাড়িয়ে যেতে থাকে। ইস্কুলে খেলার মাঠে পাড়ায় চম্পকের বুদ্ধি নিয়ে কথা হতে থাকে। সে নাকি তৈলাক্ত বাঁশের অঙ্ক মুখে মুখে করে দিচ্ছে ইদানীং। চৌবাচ্চায় জলের প্রবেশ আর নল দিয়ে জলের প্রস্থানের অঙ্ক চোখবুঁজে বলে দিতে পারে। পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি তার খাতায় পড়তে পারে না, নকুলদানার মতো পেটে গিয়ে ফুস। বইয়ের পিছন পাতার উত্তরমালা দেখে প্রশ্নমালা শেষ করে ফেলে একদিনেই গোটা একটা। আর ইংরিজি সে নিজের ইচ্ছেমত লেখে। বাংলা ইতিহাস ভূগোল নিয়ে তার মাথাব্যথা কম। যেমন মনে হয় লিখে দেয়। আবার না লিখে ছবি এঁকেও রাখে। তবে একটা গুণ তার আছে, গল্প জানে কত! গল্প বলতে তার জুড়ি নেই। ক্লাসে কতবার সে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে বন্ধুদের, এমনকি স্যারদেরও। এমন প্রতিভাধর চম্পকলাল ডাট ক্লাস টেনে উঠবে বলে বহুদিন বসে আছে, কিন্তু হচ্ছে না। চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তার বাবার আবার একদিন খেয়াল হল, বলল, "টেনে উঠলি?"

"না সার।"

"কেন উঠতে কতদিন লাগবে?"

"হেড সার ইচ্ছে করলেই হয়ে যায়।"

"আমি ইস্কুলে যেতে পারব না, কিন্তু তোকে ব্যাবসায় নেব, টেনেটুনে টেনে না উঠলে কী করে টানি?"

চম্পকলাল বলল, "টানতে হবে না, আমিই চলে যাব।"

"পারবি?"

"ইয়েস সার।"

"তো বসে বসে এই হিসেবের খাতা কমপ্লিট কর দেখি।"

লাল খেরোয় মোড়া একটা মস্ত হিসেবের খাতা চম্পকের কাছে দিয়ে তার বাবা চৌধুরীলাল ঘুমোতে গেল। চম্পকলাল সেই খাতা নিয়ে বসল। রাতের ভিতরেই হিসেব করে ফেলতে হবে। কত যোগ আর কত বিয়োগ। গুণ আছে, ভাগও আছে। খাতার মাথায় ওঁ মা লেখা। এই খাতা নিয়ে বাবা দোকানে যায় প্রত্যেকদিন। বাড়ি ফিরে হিসেব দ্যাখে, কলম চালায়। চম্পকলাল অবাক হয়ে দ্যাখে যোগ বিয়োগ গুন ভাগ, প্রশ্নমালা রয়েছে, উত্তরমালা নেই। সে যেমন মনে হল, নিজের অঙ্ক বইয়ের উত্তরমালা দেখে বসিয়ে দিতে লাগল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোতে সে খুব ভালবাসে।

২

পরদিন হিসেবের খাতা দেখে চৌধুরীলাল অবাক। এতদিন ধরে যা হয় নি, একবছরের হিসেব চম্পকলাল এক রাত্তিরে করে ফেলেছে। আর তারপর সেই হিসেবে চোখ রাখতেই তার মাথা বোঁ বোঁ করতে লাগল। কী অদ্ভুত সব জিনিস লিখে দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে চম্পকলাল, কোনো হিসেবের সঙ্গে কোনো হিসেবের মিল নেই। ১৪২৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল গো-খাদ্যের দাম হলে, ১৫ কুইন্টালের দাম

হয়েছে ৯৫ টাকা। লোকসান লোকসান লোকসান। হবে ২১৩৭৫ টাকা, হয়েছে ৯৫, মানে, ২১২৮০টাকা গঙ্গার জলে। ক্যালকুলেটর দিয়ে কষে ফেলল চৌধুরীজি। চম্পকলাল গুণের পরিবর্তে ভাগ করেছে। আবার যেখানে ভাগ হবে, স্রেফ গুণ করে দিয়েছে। হিসেবের খাতা এলোমেলো করে দিয়ে চম্পকলাল ঘুমোচ্ছে। চৌধুরীলাল বলল, আর টেনে ওঠার দরকার নেই, এবার ওকে টেনে তোলো, আমার সঙ্গে ব্যাবসা শিখবে।

উফ, বাঁচা গেল। চম্পকলাল বাবার সঙ্গে ট্রামে চেপে চলল চিৎপুর। বাবা তাকে চিৎপুরে নামিয়ে গঙ্গায় নিয়ে গেল। একটা মুশকো মতো ল্যাঙট পরা পালোয়ান লোকের কাছে দিয়ে বলল, "গঙ্গায় ডুবিয়ে নিয়ে এস, ইস্কুলে যা শিখে এয়েছে তা গঙ্গামাটি ঘষে তুলে দাও।"

উফ, সে কী স্নান! মুশকো পালোয়ান তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে, স্নানের হাফপ্যান্ট পরিয়ে এই ডুবোয় আর সেই ডুবোয়, "বল, ফির ইস্কুলে পড়বি? বল, টিনে উঠবি?"

জল খেতে খেতে চম্পকলাল বলে, "নেহি পালোয়ানজি নেহি।"

"নেহি বললে তো হোবে না, সিনান কর ভাল করে, সব ধুয়ে ফেললে তবে তোর বাবু নিবে।"

চম্পকলাল গঙ্গার জলে তার ভুলভাল অঙ্ক, ইংলিশ, ইতিহাস, ভূগোল ধুয়ে একঘন্টা বাদে উঠল ঘাটের ধাপে। তখন পালোয়ান তাকে থাবড়াতে লাগল, "এইসা করেগা আর?"

"নেই নেই পালোয়ানজি নেই।"

"চোপ, ফির পানিতে ডুবাব আর তুলাব, এক হপ্তা যদি এইসা করি?"

"নেই পালোয়ানজি নেই। "

"আর টিনে উঠবি?"

"কভি নেই।"

"কান ধর বেটা, পানিতে নেমে কান ধরে উঠ আর বস। "

কী সব্বোনাশ! গঙ্গার ঘাটে কত লোক, সবাই তাকে দেখছে। সে বুক জলে দাঁড়িয়ে কান ধরে উঠ-বস মানে ডুবছে আর উঠছে। এমনি করে তার হিসেব তার মাথা থেকে ধুইয়ে পালোয়ান আবার তাকে ঘাটে তুলে বলল, "হামি ইস্কুল যাইনি, লেকিন সব হিসেব মনে মনে করে দিতে পারি, এই বল গঙ্গায় কিতনি পানি হায়।"

চম্পকলাল বলল, "ইতনি পানি।"

পালোয়ান তার ঘাড়ে রদ্দা বসিয়ে বলল, "বুড়বক আছিস, বোল ইখন জুয়ার না ভাটা?"

"আমি জানিনে।"

"জানতে হবে, ফির তুকে নাহাব আমি।"

"প্লিজ পালোয়ানজি।"

"প্লিজ কিয়া রে, বোল জুয়ারে কত পানি আসে আর ভাটায় কত পানি যায়।"

চম্পকলাল বলল, "অনেক পানি আসে আর অনেক পানি যায়।"

"তেরা মুন্ডু আর মেরা মাথা, পানিতে চুবাব আর তুলব।"

"না জি না।"

পালোয়ান বলল, "তবে বোল আর করবি?"

চম্পকলাল বলল, "নেহি জি নেহি।"

"কী করবি না?"

চম্পকলাল বলল, "মালুম নেহি। "

"বোল বোল, কেয়া মালুম নেহি, বোল। "

শেষে চম্পকলাল বলল, "আর করব না সার, ছেড়ে দিন।"

সার শুনে পালোয়ানের মুখে কী হাসি। বলল, "ফির বোল।"

"ইয়েস স্যার।"

"আবার বোল।"

"প্রেজেন্ট সার।"

"আহা হা হা, কেয়া বাত, বোল বোল।"

বেঁচে গেল চম্পকলাল। তাকে রিকশায় তুলে পালোয়ান নিয়ে এল চৌধুরীলালের দোকানে, এসে বলল, "সাফা হো গিয়া বাবু।"

চৌধুরীলাল বলল, "এবার খাতা লেখ, ভুল হলে গঙ্গাস্নান। "

৩

চম্পকলাল দ্যাখে দোকানে কতজন আসে, কতজন কতরকম গল্প করে তার বাবার সঙ্গে। সে শুধু শুনেই যায়। প্রতিদিন বাবা তাকে নিয়ে আসে দোকানে, নিয়ে যায় বাড়িতে। মাঝে দুপুর যায়, বিকেল যায়। খেলার মাঠে ফুটবল লাফায়, ইস্কুলে ছুটির ঘন্টা পড়ে, বিকেল গড়িয়ে যায়। বাবা চৌধুরীলাল স্যারের কোনো মায়া হয় না। তাকে খাতা লিখতে হয়ই। বড়ো বড়ো যোগ স্যার চৌধুরীলাল করে নেয় ক্যালকুলেটর দিয়ে। তাকে মাথা খাটিয়ে করতে হয়। কিন্তু তার যে ভাল লাগে না। একদম না। অঙ্ক কষতে তার চিরকালই ঘুম পায়। আর এখানে তো আরো। মস্ত দুপুরে খুব। কিন্তু পালোয়ানকে বলা আছে ঘুমলেই গঙ্গায় ডুবিয়ে আনতে। পালোয়ানের ওইটা ডিউটি। যে খরিদ্দার ধারে নিয়ে টাকা না দিয়ে লুকোচুরি খেলে, তাকে গঙ্গায় চুবোন তার ডিউটি।

একদিন কী হল সে আবার ভুল করল। যোগের জায়গায় গুণ। ইচ্ছে করে। বারবার ভুল করলে বাবা বিরক্ত হয়ে আবার তাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু খাতা দেখে আবার তাকে পালোয়ানের হাতে তুলে দিল স্যার চৌধুরী। ঠুনঠুন রিকশায় চাপিয়ে পালোয়ান তাকে গঙ্গায় চুবিয়ে সাফা করতে নিয়ে গেল। তো চম্পক আচমকা পালোয়ানকে জিজ্ঞেস করে, "সার গড়ের মাঠ কাঁহা? "

"আবার সার!" পালোয়ানের মুখ হাসিতে ভরে গেল, "বলল, উ কেয়া চিজ হ্যায়?"

"বহুত বড়ো মাঠ।"

"কিতনা বড়ো?"

"ব হু ৎ বহুৎ। বলে চম্পকলাল দুই হাত প্রসারিত করল।"

"কাঁহা হায় উ?"

চম্পকলাল বলল, "মালুম নেহি কাঁহা হায়।"

"কিঁউ?" পালোয়ান স্যার এমনি, কিঁউ বললে উত্তর দিতে হবেই।

তখন ঠুনঠুন রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে, "হররোজ গঙ্গামাঈকি পাশ যাও বাবু, আজ মহাদেও কা পাশ চলো।"

পালোয়ান জিজ্ঞেস করল, "কাঁহা?"

"কিঁউ, উ গড়ের মাঠ, কিল্লা কি মাঠ।" রিকশাওয়ালা গামছায় গা মুছতে মুছতে বলল, "কিল্লা কি মাঠ নেহি দেখা পালোয়ানজি?"

না, পালোয়ানজি এই গঙ্গা আর চিৎপুর ছেড়ে কোথাও যায় নি কখনো। তাকে হাওড়া স্টেশন থেকেই ধরে এনেছিল চৌধুরীলাল। তারপর থেকে সে চৌধুরীলালের দোকানের প্রহরী। বুক চিতিয়ে বসে থাকে। খুব প্রভুভক্ত আর হনুমানজির ভক্ত। সকালে উঠে মুগুর ভাজে আর গঙ্গাস্নানে পুণ্য করে। এখন সরকার চাউডুরীবাবুর আউলাদকে মানুষ করছে। সে কিছুই দ্যাখে নি কলকাতার। কালীঘাট মন্দিরেও যায় নি। তার প্রভু চাউডুরীবাবু বলেছে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন তার মনে গড়ের মাঠ, কিল্লা কি মাঠ দেখার সাধ জেগে উঠল। এই চম্পক বেটাকে কত দলাইমলাই করবে, কত চুবাবে পানির ভিতর। চম্পক বলছে, তার একদম ভাল লাগে না অঙ্ক, তাই যেমন ইচ্ছে উত্তর বসিয়ে দেয়।



তবে কী ভাল লাগে তার? খেলতে আর গল্প শুনতে, আর গল্প বলতে। শুনে পালোয়ানের চোখে জল এসে গেল। আরে তারও যে তাই। খেলতে আর মুগুর ভাজতে আর কাহানি শুনতে, ভূত প্রেত, দত্যি দানো, রামজি, হনুমানজি, রাবণ ভি তার ভাল লাগে, রাবণ মেঘনাদ এইসবও তার ভাল লাগে, জটায়ু পঙ্খি ভি ভাল লাগে, লছমন, সুপরনখা.....সব।

"তবে গল্প বলো।"

"চ বাবু চ, কিলার মাঠে কাহানি হবে," রিকশাওয়ালা বলল, "কিতনা দিন চলে গয়ি, হনুমানজি, রাবনজি, রামজির কাহানি শুনা নেহি।"

তারপর কী হল? মস্ত গড়ের মাঠ দেখে পালোয়ানজির চোখে জল এসে গেল, "উ বাপুরে, কিলাকি মাঠ দিখে যা বাপু হামার, সাত গাঁও সমান এক মাঠ।"

রিকশাওয়ালা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, "আরে বেটা রো মাত। "

চম্পকলাল বলল, "কাঁদে না সার কাঁদে না পালোয়ানজি। "

পালোয়ানজি বলল, "তবে কাহানি বোল।"

চম্পকলাল বলতে লাগল। আর রিকশাওয়ালা ও পালোয়ানজি শুনতে লাগল। চম্পকলাল এই গল্প বলতে লাগল, তা শুনতে শুনতে তারা চোখের জল ফেলতে লাগল, "ইস, তোর বাবা কেমন আদমি আছে, পানিতে চুবায়, মেথমেটিক করবি না, কাহানি করবি, বোল বোল, তারপর কী হলো বোল।"

মাথায় মস্ত আকাশ, বেলা পড়ে আসছে। কতদূর মাঠ, কতদূর সেই কেল্লা, তারা চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সবুজ ঘাসের ভিতর। গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে পালোয়ানজি আর রিকশাওয়ালা। তারপরে চম্পকও। তার বাবা তখন সেই উল্টোপালটা হয়ে যাওয়া খেরোর খাতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। সব হিসেবে গোল করে দিয়েছে চম্পক, জলে চুবিয়েও সাফ হয় নি। ওকে আর আনবে না এখানে। বরং আবার ইস্কুলে গিয়ে গল্প শুনাক।

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

দুই বুড়ির গল্প



শুভময় মিশ্র

ওই যে, আবার লাগল দুই বুড়িতে। সারাদিন খিটিমিটি লেগেই আছে। যখনই দেখ, কারণে অকারণে দুজনের তর্ক চলছে - ছোট-বড়-মেজ কোনও একটা প্রসঙ্গ পেলেই হল। কী নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল তা হয়ত দুজনেই কিছুক্ষণ পরে মনে করতে পারবেন না, কিন্তু তর্ক চলতে থাকবে; হয়ত কে শুরু করেছিল বা কার আগে থেমে যাওয়া উচিত তাই নিয়ে।

খুব মজা হয় যদি কেউ ধরতাইটা মনে করানোর চেষ্টা করে। সেবার যেমন হল, কথা শুরু হল বাড়তে থাকা দুধের দাম নিয়ে। কথার থেকে আলোচনা, আলোচনা থেকে ক্রমশ তর্কে পৌঁছল কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু ততক্ষণে পুরো মোড় ঘুরে গেছে বিষয়টার - দুজনেরই দাবি তাঁদের পাড়ায় দুধ সস্তা কিন্তু একেবারে খাঁটি। দুজনেই সমানে দাবি করে গেলেন যে অন্যজন কিচ্ছুটি জানেননা।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বুধোর মা, বলল, "যাই বল মা, দুধের দাম কিন্তু খুব বেড়েছে, ভাল দুধ পাওয়াও যায়না সহজে। পালাপার্বণে বাচ্চাগুলোর জন্য একটু পায়েস বানাতে পারিনা।"

সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই একটু থেমে গেলেন তারপর একযোগে ফুঁসে উঠলেন্ "তুমি থাম দিকিনি!"

তারপর একজন বললেন, "গোবিন্দভোগ চালে আজকাল আর অত সুন্দর গন্ধ হয়না।"

অন্যজনের জবাব, "বুড়ো বয়েসে গোবিন্দর নাম নিতে সময় হয়না, তার ওপর ভোগ রান্না কখন করি?"

দুজনেরই বয়েস যথেষ্ট, ছেলেপুলের চুল পেকে গেছে, নাতিপুতির বিয়ের বয়েস হয়েছে; দুজনেই কানে একটু খাটো, কথার খেই হারানো স্বভাব আছে; দুজনের যত ঝগড়া তত ভাব। একজন আমার নিভাঠাকুমা, ভাল নাম নিভাননী। অন্যজন তাঁর বোন জগুঠাকুমা, ভাল নাম জগৎজননী। দাদুদের নামগুলোও বলে রাখি, নিভাঠাকুমার বরের নাম ধরণীধর আর জগুঠাকুমার বরের নাম চন্দ্রমোহন।

সেকালের মানুষ সব, বরের নাম মুখে আনতে বাধে। যেমন আকাশে চাঁদ উঠেছে বোঝাতে জগুঠাকুমা বলেন, "দীপুর বাবা উঠেছে।" আগুপেছু না জানলে বোঝা যায়না, মনে হয় জিজ্ঞাসা করি এই ভর সন্ধেবেলায় দাদু ঘুমোচ্ছিলেন কেন, শরীর ঠিক আছে তো! আবার নিভা ঠাকুমা যদি কখনও বিরক্ত হয়ে বলতে যান,"ধরণী দ্বিধা হও", এমন ভাবে বলেন যেন অপুকাকুর বাবাকে কেটে দুফাঁক করতে বলছেন। দুজনে থাকেন অনেক দূরে দূরে;

যে-যার ছেলের কাছে। দেখাসাক্ষাত না হলেও ফোনেই চলতে থাকে ভাব আর ঝগড়া। আবার দু'চার বছরে একবার এ ওর বাড়ি এলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, মন্দিরে যাওয়া, টিভি দেখার পাশাপাশি চলতে থাকে কথার লড়াই।

একবার কী হল বলি শোন। দুই বোন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় মাদুর পেতে বসে সুখ দুঃখের কথায় মত্ত, সামনে দোলায় ছোটপিসির মেয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ছ'সাত মাস বয়েস। দুজনে পালা করে দোল দিচ্ছেন আর সজাগ দৃষ্টি আছে যাতে বাচ্চাটা উঠে না পড়ে। এমন সময় শুরু হল বাদানুবাদ। প্রথমে চাপা স্বরে, তারপর গলা চড়তে লাগল। শুরু করলেন নিভাঠাকুমা, "আরে এত জোরে কেউ দোল দেয়? বাচ্চাটা চমকে উঠবে যে!"

"কোথায় জোরে? এইটুকু না দোলালে বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে যাবে যে" - জগুঠাকুমার ব্যাখ্যা।

ঘুম ভেঙে যাওয়া নাকি ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা, কোনটা বাচ্চার পক্ষে বেশি খারাপ তা নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে যায়। মুখের পারদ যত চড়তে থাকে হাতের ঠেলায় জোর তত বাড়তে থাকে।

মাঝপথে হুঁশ ফিরল একজনের। নিভাঠাকুমা বললেন, "এত জোরে দোল দিলে বাচ্চা কেন বুড়োরাও দোলা থেকে ছিটকে পড়বে। আমাদের পাড়ায় কত্ত এমন হয়েছে।"

"কথায় কথায় তোমাদের পাড়াকে টেনো না তো; আজব জায়গা তোমাদের। হেলমেট পরে বাগানে যেতে হয়, আরশোলা দেখে লাফ মারলেই ছাদে মাথা ঠুকে যায়। তোমাদের পাড়ার বাজে গল্পগুলো শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।"

"ভাল কথা সহ্য না হয়, কান বন্ধ রাখ।" তারপর নিভা ঠাকুমার স্বগতোক্তি,"কী জায়গা বাবা! একটু কথা বললেই সবাই বলে চিৎকার করছি।"

"এ কি আর তোমাদের দেশ? হাজার চেঁচালেও কেউ কিছু শুনতে পায় না?" জগু ঠাকুমার উত্তর।

নিভাঠাকুমা প্রায় গর্জে উঠলেন, "শুনতে পায় না বলেই তো দীপাবলীর রাত্রে শান্তিতে থাকা যায়। গেলবারেই তো ফোনে ঘ্যানঘ্যান করলে, 'এই শুরু হল বাজি ফাটানো, তিন চারদিন ঘুম নেই, শান্তি নেই, মাথা ধরা, প্রেশার বাড়া সব চেপে ধরল।' এখন শোনা যায় না বলে আমাদের পাড়ার নিন্দে!"

জগুঠাকুমাও নাছোড়বান্দা, "তা বলে ঘরে ঘরে সন্ধে পড়বে, আর পাড়ায় শাঁখের আওয়াজ শোনা যাবে না!"

"সে আমাদের যা হয় তা হয়। তাই বলে তুমি এরকম জোরে দোল দেবে?" নিভাঠাকুমা দেখাতে গেলেন কত জোরে জগুঠাকুমা দোল দিচ্ছিলেন। দেখানোটা বেশ একটু জোরেই হল।

"আমি এত জোরে দোলাচ্ছিলাম? আমি তো এমনি করে করছিলাম, তুমিই তো জোরে দোলালে।" দুরকম ভাবে দুলিয়ে দেখালেন জগুঠাকুমা।

"এমনি করে আমি না তুমি? আমি তো এমনি করে-" গলা তুললেন নিভাঠাকুমা, সঙ্গে হাতেকলমে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা।

দুজনেরই গলা চড়তে লাগল আর কে কীভাবে দুলিয়েছেন হাতেনাতে দেখাতে লাগলেন। যুগপৎ গলা আর দোলায় ভয় পেয়ে বাচ্চার ঘুম ভেঙে গেল। শুরু হল চিল চিৎকার। ছোট পিসি ভেতরের ঘরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। দৌড়ে এসে বাচ্চাকে কোলে তুলে থামানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, সঙ্গে সমানে দুই বুড়িকে বকুনি চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার শুরু হল দুজনের বকবক, "আর কারও বাচ্চা যেন কাঁদে না। এদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি।"

"ঠিক বলেছ, আমরা যেন বাচ্চা মানুষ করিনি।"

আর একবার, পাড়ার রমেনবাবুর মা মারা গেছেন লম্বা রোগভোগের পরে। অন্যদের আলোচনা থেকে দুজনেই শুনেছেন খবরটা। সন্ধ্যের পরে চা খেতে খেতে দুই বোনের আলোচনা শুরু হল -

"শুনেছ! রমেনের মা মারা গেছে।"

"কোথায় কি? সন্ধেবেলা আজেবাজে বকছ কেন?"

"কোথায় আজেবাজে বকছি? রমেনের মা মারা গেছে, সেটাই বলছি।"

"বালাই ষাট; বাজে বকা নয়তো কী? দিব্যি সুস্থ মানুষ, তার নামে যা নয় তা বলছ!"

"সুস্থ মানুষ! কিছুই খবর রাখ না দেখছি। এতদিন ভুগল, হাসপাতালেই তো মারা গেল।"

"এই তো ঘন্টাখানেক আগে এসেছিল। দেখনি? চোখের মাথা খেয়েছ?"

"মরণ, এতক্ষণে সবাই শ্মশান থেকে ফিরে এল, আর রমেনের মা নাকি একঘন্টা আগে তার সঙ্গে দেখা করে গেছে!"

"আবার যা নয় তাই বলছ ভর সন্ধের সময়। সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখ, জয়ন্ত একটু আগে এসেছিল কিনা! ওই তো খবর দিয়ে গেল রমেনের মা মারা গেছে, সবাই শ্মশানে যাচ্ছে।"

এ'রকম নানান মজার কথা একটু কান পাতলেই শোনা যায়। কি নিয়ে দুজনের ঝগড়া হয় আর কি নিয়ে নয় তার হিসেব কেউ জানেনা। খুব চেঁচামেচি না হলে কেউ থামাতেও যায় না।

দু'জনেই পাঁজি-পুঁথি, শনি-মঙ্গল, পূর্ণিমা-অমাবস্যা, অশ্লেষা-মঘা ইত্যাদি খুব মেনে চলেন। একজন আরেকজনের বাড়িতে যখন যান সঙ্গের লটবহরে একটা পাঁজি অবশ্যই থাকে। তর্ক শুরু হলেই দুজন যে যার পাঁজি বের করে দেখাতে থাকেন। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় দুজনের পাঁজি মিলছে না। তর্ক বাড়তে বাড়তে তারপরে অন্যদিকে ঘুরে যায়।

পাঁজি নিয়ে সেবারে যা তুলকালাম হল তা আর বলার নয়। দীপুকাকা, মানে জগুঠাকুমার ছেলে, অফিসের কাজে বাইরে যাবেন; সকালবেলা রওয়ানা হওয়ার কথা। সে সময় নিভাঠাকুমা বোনের বাড়িতে আছেন। গল্প করতে করতে নিভাঠাকুমা জানতে চাইলেন দীপুকাকা কোথায় যাচ্ছেন কখন যাচ্ছেন ইত্যাদি। কথায় কথায় যেই জানা গেল তিনি সকাল সকাল বেরবেন অমনি নিভা ঠাকুমা বের করে আনলেন পাঁজি, চন্দ্র-পঞ্জিকা।

উল্টে পাল্টে দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, "দীপুকে তো খুব ভোরে বেরিয়ে যেতে হবে - সাতটা দশ পনেরোর মধ্যে। তারপরে তো বেরনো যাবে না। সাতটা বাইশ মিনিট গতে তো গ্রহণ লাগবে; ছাড়তে ছাড়তে তো সেই বেলা সাড়ে ন'টা।" তারপর আবার একপ্রস্থ কীসব দেখেটেখে বললেন,"ও দিদি, তোমাদের রান্নার মাসিকে খুব ভোরে আসতে বলে দিও। সাতটার মধ্যে সবাইকে জলখাবার সেরে ফেলতে হবে। তারপরে তো খাওয়াও যাবে না।"

বিনা প্রশ্নে অনেকক্ষণ জগুঠাকুমা বকবক শুনেছেন। আর চেপে থাকতে পারলেন না, বললেন, "আ মোলো যা, কী হয়েছে বল না। আসল কথা না বলে খালি বাজে বকা।"

ব্যাস, শুরু হয়ে গেল, "আমি বাজে বকছি? নিজেই দেখনা; পরিষ্কার লেখা আছে - সাতটা বাইশ মিনিটে গ্রহণ লাগবে, ছাড়বে সেই তোমার ন'টা তেরো মিনিট গতে।"

"কীসের গ্রহণ?"

"সূর্যগ্রহণ গো, আর কী হবে? অপুর বাপে গ্রহণ লাগলে এত কিছু মানতে হয় নাকি?"

"কাল আবার সূর্যগ্রহণ কেন হবে? কাল তো পূর্ণিমা। হলে বড়জোর গ্রহণ হবে দীপুর বাবার।"

"তোমাদের যত বাজে বুকনি। পূর্ণিমা অমাবস্যা আবার কী! গ্রহণ হবে হয় রাত্রে নয় দিনে। দিনে হলে সূর্যগ্রহণ আর রাতে অপুর বাবা।"

এত বড় মতভেদ কি চুপিচুপি মিটমাট হওয়া সম্ভব? গলা ছেড়ে জগুঠাকুমা ডাক দিলেন, "ওরে আমার পাঁজিটা নিয়ে আয় তো!" তারপর গজগজ করে, "উনিই সব জেনে বসে আছেন, আমরা তো সব মুখ্যু!"

পাঁজি এল, এলো মানে ধৈর্য সামলাতে না পেরে ধুপ ধুপ করে পা ফেলে ঘরের ভেতর থেকে জগুঠাকুমা নিজেই নিয়ে এলেন, একেবারে সূর্য-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। অনেকক্ষণ দেখে টেখে একটা খোলা পাতা বাড়িয়ে ধরলেন নিভাঠাকুমার সামনে। নিভা ঠাকুমাও কম যান না। দুজনে মুখোমুখি, চোখে চোখ, হাত সামনে বাড়ানো, আর হাতে পাতাখোলা পাঁজি।

"দেখ দেখ, ভালো করে দেখে নাও, কাল পূর্ণিমা। সকালের দিকে দীপুর বাবার গ্রহণ, সাতটা বাইশ থেকে ন'টা তেরো। আর দিপুর বাবাকে রাহু গ্রাস করলে আমাদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনও নিষেধ নেই, আমরা অত মানিনা।" - বললেন জগুঠাকুমা; পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে তিনি নিশ্চিত। তাঁর পাঁজিতেও তাই লেখা আছে।

নিভাঠাকুমা এত সহজে হেরে যাওয়ার পাত্রী নন। তেড়েফুঁড়ে উঠে তিনিও নিজের মতামত জানালেন, "হাজারবার বললেও তোমার কানে কিছু ঢোকে না দিদি! এই দেখ, হাতে নিয়ে দেখ। এখন দিন চলছে, সূর্যগ্রহণ হবে। কিছু তো রীতি রেওয়াজ মানতে হয়। গ্রহণের সময় খাওয়াদাওয়া, বাড়ি থেকে বেরনো সব নিষেধ। অপুর বাবা হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু সূর্যগ্রহণেও নিয়মকানুন মানবে না নাকি?"

এরপর অবশ্য কথা অন্য দিকে মোড় নিয়েছিল। জগু ঠাকুমা বলেছিলেন, "ও, তোমার অপুর বাবা হলে নিষেধ নেই খাওয়াদাওয়ায়। আর আমার দীপুর বেলায় সব মানা। ছেলেটা বাইরে যাবে, না খেয়ে! কত দিন ছেলেটার কপালে ভাল করে দুটি ডালভাত জুটবে না ঠিক আছে? কী কপাল করেছিলি রে দীপু এমন মাসী জুটেছে।"

বুঝতে পারলে না, তাইতো? গল্পে গল্পে খেই হারিয়ে গেছে, একটা ছোট্ট কথা তো বলা হয়নি। নিভাঠাকুমা থাকেন ছেলে অপুর কাছে - চাঁদে, মারে নেক্টারিশ-এ। অপুকাকা ওখানে চাকরি করেন, টাইকো ক্রেটার আর লেক অফ ড্রিমস-এ বিশাল দুটো নতুন টাউনশিপ তৈরি হচ্ছে, তার চার্জে আছেন। আর জগুঠাকুমা থাকেন মূর এভেনিউতে, নাকতলায়, পৃথিবীতে।

দুজনের পাঁজিতে তাই আলাদা কথা লেখা আছে। যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে আছে চাঁদ, চাঁদের এইপিঠে আলো নেই তাই রাত আর পৃথিবীতে অমাবস্যা। চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপরে পড়লেই নাকতলায় সূর্য গ্রহণ আর নেক্টারিশ-এ পৃথিবী গ্রহণ। ধরণী, মানে 'অপুর বাপ' এর রক্ষে নেই। যখন পৃথিবী এলো মাঝখানে, চাঁদে তখন সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝকে দিন, পৃথিবীতে পূর্ণিমা। তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়লেই নেক্টারিশ-এ সূর্য গ্রহণ কিন্তু নাকতলায় চন্দ্রগ্রহণে ফেঁসে গেল দীপুর বাপ।

বিশ্বাস না হলে কিছু করার নেই; আমার কাছে দুরকমের বিজ্ঞান বই নেই, থাকলেও আমি তো আর ভূগোল-বিজ্ঞানের খোলা বই বাড়িয়ে ধরে ঝগড়া করতে যাব না।

ছবিঃ অংশুমান



জয়দীপ চক্রবর্তী

স্বস্তিক অ্যাপার্টমেন্টের যে ফ্ল্যাটটায় থাকে সায়ন্তন সেখান থেকে জানলা দিয়ে আকাশ ঠিক মতন দেখা যায় না। চারদিকেই উঁচু উঁচু বাড়ি, শপিং মল। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে কমপ্লেক্স পেরিয়ে ওদিকে যেখানে কালো রঙের রাস্তাটা নির্বিবাদে শুয়ে আছে আর তাকে মাড়িয়ে পথ চলছে মানুষ, গাড়ি, সব্বাই, সেদিকে এক চিলতে আকাশ চোখে পড়ে বটে তবে সে আকাশের গায়ে হাজারো রকমের তার আর ফেস্টুন এমন জড়াজড়ি করে থাকে যে তার আসল রঙ আসল রূপটা যে কী তা বোঝা দুষ্কর।

অবশ্য এসব নিয়ে ভাবার সময়ও খুব একটা নেই সায়ন্তনের। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে রিডিং রুমে পড়তে বসে যাওয়া, তারপরে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি। পুল কার আসে ঠিক সকাল দশটায়। তার আগেই রেডি হয়ে যাওয়া চাই। একটু দেরি হলেই ড্রাইভারকাকু যা রাগারাগি করে! তারপর বিকেলবেলায় স্কুল থেকে ফিরে আবার টিউশন পড়া। সায়ন্তন খুবই ব্যস্ত। মা বলে দিয়েছেন এবারে পরীক্ষায় সে যদি ফার্স্ট ফাইভের মধ্যে আসতে পারে তাহলে দারুণ একটা সারপ্রাইজ গিফটের ব্যবস্থা করে দেবেন বাবাকে বলে।

সায়ন্তন ঠিক করেই রেখেছে যে করে হোক একটা ভালো রেজাল্ট করে ফেলতে হবে এবারে। তারপর বাবাকে বলবে দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে। অনেক দূরে। বেশ ঝাঁ চকচকে জায়গা। অ্যাব্রডও হতে পারে, এই ধরা যাক সিঙ্গাপুর টিঙ্গাপুর... বন্ধুদের গল্প বলে তাক লাগিয়ে দেবে একেবারে ফিরে এসে। এই রুটিনে মাঝে মাঝে যে তার হাঁফ ধরে যায় না তা নয়। অনেকসময়েই বিশ্রি লাগে। অহেতুক ভারী হয়ে থাকে মন। কিচ্ছুটি ভাল্লাগে না যেন এইসময়। মনে হয় স্কুল থেকে বাড়ি না ফিরে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে।

কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর তা করা যায় না। কাজেই বেজার মুখে বাড়ি ফিরতে হয় আবার। এ সময় গল্পের বই পড়ে সায়ন্তন। মনে মনে গল্পের সাথে মিশে গিয়ে গল্পে পড়া জায়গাগুলোয় চলে যায়। গল্পের চরিত্র হয়ে গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে মনে মনে। অবশ্য গল্প পড়ব বললেই তো আর পড়া যায় না। মায়ের কড়া নজর সমস্ত দিকে। স্কুলের পড়ায় ফাঁকি দিয়ে গল্পের বইতে বেশি সময় দেওয়ার উপায়ই নেই কোনো।

সারাদিনের মধ্যে যে সময়টুকু স্কুলে থাকে বেশ লাগে সায়ন্তনের। বন্ধুদের সাথে গল্প হয় ক্লাশের মাঝের সময়টুকুতে। টিফিন আওয়ারে মাঠ দাপিয়ে খেলাধুলো। স্কুল থেকেই মাঝে সাঝে নানা দারুণ দারুণ সব মন ভালো করে দেওয়া অনুষ্ঠানের



আয়োজন করা হয়। কখনও ফিল্ম শো, কখনও দারুণ দারুণ ওয়ার্কশপ, আবার কখনও ম্যাজিক। এই দিনগুলো কিছুতেই স্কুলে গরহাজির হতে চায় না সায়ন্তন। যত অসুবিধে থাক, এসব দিনে সে স্কুলে যাবেই।

কিন্তু এবারে তার কিছুতেই আর স্কুলে যাওয়া হল না। এমন সময় জ্বরটা তেড়েফুঁড়ে এসে বাসা বাঁধল তার শরীরে... আগে থেকেই ক্লাশে নোটিশ দেওয়া ছিল। কিছুতেই স্কুল কামাই করতে চাইছিল না সায়ন্তন। কিন্তু মা বললেন, "কিছুতেই না। গায়ে জ্বর নিয়ে স্কুলে যাবার কোনো দরকার নেই। বিশেষত থার্ড পিরিয়ডের পরে যখন ক্লাশ হবে না আর।"

মায়ের মুখের ওপরে কিছু বলা যায় না। আর বললেও বা শুনছে কে? তাছাড়া সায়ন্তন নিজেও বুঝতে পারছিল মাথাটা যেন একেবারে ভারী হয়ে আছে। গায়েও বলশক্তি নেই তেমন। মনখারাপ করে বিছানায় চুপ করে শুয়ে ছিল সে। মন খারাপটা আরো বেড়ে গেল বিকেলে তুষার যখন ফোন করে জানাল যে আজকের ম্যাজিক শো একেবারে সুপারহিট। ম্যাজিশিয়ান জুনিয়র ডি কে সামন্ত সকলকে একেবারে হতবাক করে দিয়েছেন। শুকনো খড়ের ওপরে টাটকা গোলাপ ফুল ফুটিয়েছেন, একটা তাসকে মুহূর্তে দশখানা বানিয়েছেন, ফাঁকা টুপির মধ্যে থেকে একজোড়া পায়রা বের করে উড়িয়ে দিয়েছেন স্কুলের মাঠের ওপরের খোলা আকাশে, আরো কত কী...

টেলিফোনে শুনতে শুনতেই উত্তেজনা আর বিস্ময়ে চোখদুটো রসগোল্লার মতন গোল গোল হয়ে যাচ্ছিল সায়ন্তনের। মায়ের ওপরে অভিমানও হচ্ছিল খুব। ইশ মা যে কেন আজ তাকে স্কুলে যেতে দিল না! জ্বর গায়ে একটু হয়ত কষ্ট হত তার। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ ম্যাজিক শোটা দেখা হল না তার। কিছুই যেন আর ভালো লাগছিল না সায়ন্তনের। সন্ধের পর থেকে চুপ করে বিছানায় শুয়ে ছিল সায়ন্তন। পড়তে ভালো লাগছে না। টি ভির দিকে চাইতেও ইচ্ছে হয়নি একবারও। এমনকি গল্পের বইয়ের পাতা উল্টেও দেখল না সে একবারও। মা একবার কাছে এসে মাথায় হাত রাখল। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী রে শরীর খারাপ লাগছে?"

"উঁহু," মায়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দু'দিকে মাথা নাড়ে সায়ন্তন।

"গায়ে তো জ্বর নেই আর সোনাই," মা স্বগতোক্তি করলেন নীচু স্বরে। সায়ন্তন কথা বলল না কোনো। চোখ বুজিয়ে শুয়েই রইল চুপটি করে।

বাবা যখন বাড়ি ফিরলেন তখন বেশ রাত হয়েছে। ঘুমিয়েই পড়েছিল তখন সায়ন্তন। মা ডেকে ঘুম ভাঙালেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ওঠ এবার, খেয়ে নে। নাহলে শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে যে!"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানার ওপর উঠে বসল সে। বেসিনের সামনে এসে চোখে মুখে জল দিল। তারপর নিঃশব্দে এসে বসে পড়ল খাবার টেবিলে। খেতে খেতে মাঝে মাঝেই ওর বাবা আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন সায়ন্তনের দিকে। সায়ন্তন বুঝল, কিন্তু মুখ তুলল না। অন্যদিন এইসময় সে ঝরঝর করে কথা বলতে থাকে বাবার সঙ্গে। সারাদিনের সমস্ত জমে থাকা কথা উজাড় করে দেয় বাবার কাছে। বাবাও কত কিছু বলেন তাকে। বাবার সাথে কথা না বলে মনের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল, তবু আজ কথা বলবে না সায়ন্তন। সমীরণ ছেলেকে আড়চোখে জরিপ করলেন খানিক। একবার স্ত্রী মনিদীপার দিকে তাকালেন। মনিদীপা চোখ টিপে হাসলেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপরে চুপ করে বসে পড়ল সায়ন্তন। দক্ষিণদিকের জানালা খোলা তবু ভালো করে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। আজ আকাশে চাঁদ আছে নাকি নেই তা বোঝার উপায় নেই। কী করবে ভাবছিল সায়ন্তন। এমন সময় সমীরণ ঢুকলেন ঘরে। হাল্কা আওয়াজ করে গলা খাকারি দিলেন। সায়ন্তন বাবার দিকে চাইল। সমীরণ ছেলের পাশে বসে তার মাথায় হাত দিলেন। নরম গলায় বললেন, "তোর আজ মন খারাপ নারে সোনাই?"

সায়ন্তন মাথা নীচু করল। জবাব দিল না। তার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। সমীরণ আবার বললেন, "আমি সব বুঝতে পারি।"

"কী বুঝতে পারো?" এবারে বাবার দিকে মুখ তুলে বলে সায়ন্তন।

"তোর মন খারাপ থাকলেই বুঝতে পারি, তুই যখন খুব আনন্দে থাকিস তখনও বুঝতে পারি। তোর মাও বুঝতে পারে।"

"মা পারে না।" অভিমানী গলায় বলে সায়ন্তন।

"তুই ভুল জানিস রে সোনাই।"

"তাহলে তোমরা জানো কেন আমার মন খারাপ?"

"জানি।"

"কেন বলতো?"

"আজ স্কুলে ম্যাজিক শো ছিল। তুই যেতে পারিসনি বলে শো টা মিস হয়েছে। তাই তো?"

"হুঁ।"

"মাও বুঝেছে?"

"বুঝেছে বৈকি।"

"তাহলে মা আমায় যেতে দিল না কেন?"

"তোর যে শরীর ভালো ছিল না। তুই যদি কষ্ট পাস মায়ের কি ভালো লাগে?"

"কিন্তু আমি তো এখনও কষ্ট পাচ্ছি।"

"মা জানে সে কষ্ট তোর থাকবেই না।"

"কী করে জানল?"

"মা যে আমায় জানে। জানে আমি নিজেই তোকে কত ভালো ম্যাজিক দেখিয়ে দিতে পারি।"

"সত্যি পারো?"

"পারি।"

"তাহলে দেখাও।"

"এক্ষুনি?"

"হ্যাঁ, এক্ষুনি।"

"ঠিক আছে দাঁড়া," বলে উঠে পড়েন সমীরণ। তারপর পাশের ঘর থেকে এক বান্ডিল তাস আর একটা দুটো এক দু'টাকার কয়েন নিয়ে আসেন। সায়ন্তন বাবাকে কখনও আগে এমন ম্যাজিক দেখাতে দেখেনি। সে চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে ছিল। মনিদীপাও এসে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণ এই ঘরে। বাবা তাসের গোছাটা সায়ন্তনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, "নে এর মধ্যে যে কোনো একটা বেছে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দে। আমাকে দেখাবি না কিন্তু কোন তাসটা নিলি। আমি ম্যাজিক করে জেনে যাব তুই কোনটা নিয়েছিস।"

সায়ন্তন অবিশ্বাসের চোখে বাবার দিকে চাইল একবার তারপর খুব সন্তর্পণে একটা তাস বের করে নিল। নিজে সেটা দেখে নিয়েই লুকিয়ে রাখল পকেটে। সমীরণ তাসগুলোর উল্টোপিঠের দিকে তাকিয়েই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে বলে দিলেন সায়ন্তন কোন তাস নিজের কাছে রেখেছে। সায়ন্তন অবাক হয়ে গেল। এবারে সমীরণ একটা এক টাকার কয়েন হাতে নিলেন। সায়ন্তনের দিকে হাতের তালু মেলে ধরলেন, "ক'টা কয়েন?"

"একটা।" সায়ন্তন উত্তর দেয়।

"ঠিক?"

"ঠিক।"

তাহলে হাত মুঠো করি?"

"করো, কিন্তু হাত পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"বেশ, নেব না। এই হাত খুললাম এবার। ক'টা কয়েন?"

"তিনটে।" বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলে সায়ন্তন, "উরিব্বাস তুমি তো দুর্দান্ত ম্যাজিক দেখাতে পারো বাবা! মাকে দেখিয়েছ আগে এই ম্যাজিক?"

"দেখিয়েছি," সমীরণ হাসেন, "কিন্তু কথা হল এই ম্যাজিক তো মামুলি ম্যাজিক। আজ তোর বন্ধুরাও হয়ত স্কুলে এই ম্যাজিকগুলোই দেখেছে। কিন্তু আমি তোকে এমন ম্যাজিক দেখাব সোনাই যে তুই হাঁ হয়ে যাবি একেবারে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তোমারই ম্যাজিক?"

"উঁহু। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ানের সবচেয়ে সেরা ম্যাজিক।"

"মা দেখেছে এই ম্যাজিক?"

"কে জানে, তবে আমি দেখাতে নিয়ে যাইনি কখনও।"

"আমায় কবে নিয়ে যাবে তুমি বাবা?"

"তুই একটু সুস্থ হলেই।"

"প্রমিস?"

"একদম।"

২

আজ সমীরণ ছুটি নিয়েছেন। সায়ন্তনের স্কুল ছুটি স্কুলের ফাউন্ডেশন ডে বলে। মনিদীপা বলেছিলেন, "ছুটি নেবার কী আছে? রোববার গেলেই তো হত?"

"হত, কিন্তু ছুটির জন্যে মানুষ যদি অহেতুক ভিড় জমায়..."

"হলই বা ভিড়। বড় ম্যজিশিয়ানের শো, ভিড় তো হবেই," সায়ন্তন বলে।

"উঁহু। ভিড়ে ম্যাজিকটা ঠিক মতন উপভোগ করতে পারব না রে সোনাই..." উদাস ভঙ্গীতে বলেন সমীরণ। ড্রাইভারকাকুকে সমীরণই রাস্তা বাতলে দিচ্ছিলেন। এখন মূল শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটছে এক্কেবারে ফাঁকা চকচকে পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে। দু পাশে বাড়ি ঘর সরে গিয়ে ধু ধু করছে ক্ষেত, চাষের জমি, দু একটা পুকুর।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" মনিদীপা অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, "আমরা যে এমন লং ড্রাইভে যাব বলোনি তো আগে। কিচ্ছু প্রিপারেশন নিয়ে আসিনি।"

"আমরা আসলে একটা সময়কে পেরিয়ে যাচ্ছি," কেমন ঘোর লাগা গলায় বলেন সমীরণ, "আমি নিজে এখন ক্রমশ চল্লিশ বছর পিছিয়ে যাচ্ছি। এখন প্রশ্ন কোরো না মনি, এগিয়ে আসা নতুন ম্যাজিকটাকে রিয়ালাইজ করার চেষ্টা করো," বলেই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, "ডান দিকে ডান দিকে। আরো মাইল পাঁচেক যাব আমরা। একেবারে নদীর গায়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাবে কিন্তু।"

গাড়ি থেকে নেমে নৌকা নিলেন সমীরণ। সঙ্গে জেটি ঘাট থেকে কিনে নিলেন প্রচুর খাবারদাবার। বললেন, "ক্ষিদে পেলে নৌকায় বসে খাওয়া যাবে।" সায়ন্তন চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল। যা কিছু দেখছে সব, সমস্ত কিছুই অসাধারণ লাগছে তার। আকাশের এমন নীল সে আগে কখনও দেখেনি। এমন সবুজের সমারোহ এই প্রথম দেখল আজ। পাতাগুলো কী মসৃণ, ধুলোয় ঢেকে ম্লান হয়ে যায়নি তারা। সামনে জল টলটল আস্ত একটা নদী। মাঝি দাঁড় টানছে সেই সেই নৌকার আর গান গাইছে আপনমনে। সায়ন্তনের এই সব কিছু মিলে মনে হচ্ছিল একটা সুন্দর নিটোল স্বপ্ন। সে মনে মনে প্রার্থনা করছিল যেন স্বপ্নটা তাড়াতাড়ি ভেঙে না যায়। সমীরণ শিশুর মতন মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগছে সোনাই?"

"দারুণ।" সায়ন্তন উজ্জ্বল মুখে বলে।

"আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু স্কুলে পড়ার সময় রোজ এই সময় এখানে আসতাম। নৌকায় চড়ে দেখতাম সেই ম্যাজিক যেটা দেখাতে তোকে এত দূরে নিয়ে এলাম। তোর মাকেও।"

"কী ম্যাজিক বাবা?" সায়ন্তন অবাক হয়ে বলে।

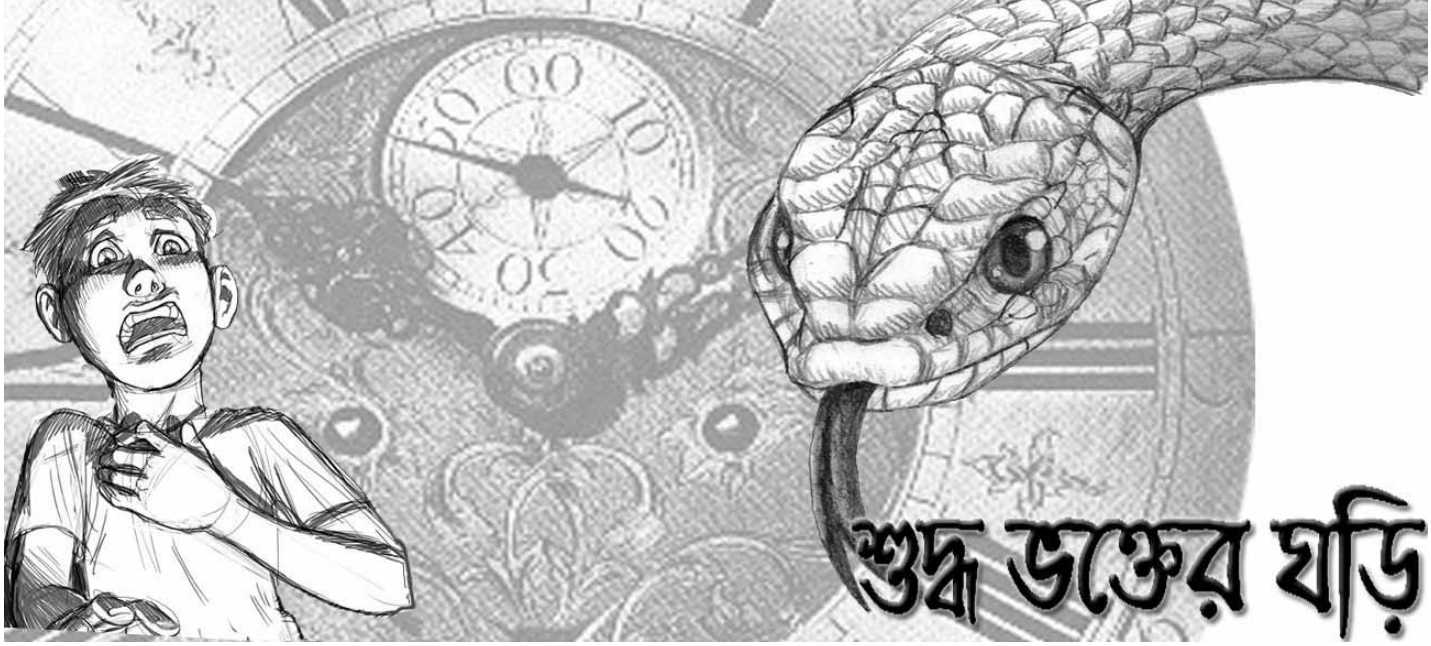
"বিকেল মরে আসছে। এইবার আরম্ভ হবে সেই অদ্ভুত ম্যাজিক, আকাশ জুড়ে। যা কক্ষনো দেখিস না তোরা। তুই না, তোর মা না, তোর বন্ধুরাও নয়। আকাশ থেকে আর চোখ ফেরাস না সোনাই। তাকিয়ে থাক। তাকিয়েই থাক।"

সায়ন্তন আকাশের দিকে চেয়ে রইল। সূর্য সারাদিন আলো দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরছহে এবার। যাবার আগে সেদিনের মতন শেষবারের জন্যে পৃথিবীকে রঙে রঙে সাজাতে বসল সে। আকাশে হলুদ, গোলাপী, গেরুয়া, কমলা, গাঢ় লাল আরো কত রকম রঙ খেলা করতে শুরু করল। আকাশের মস্ত ক্যানভাসে ছবির পর ছবি আঁকা হতে শুরু করল, মুছেও যেতে লাগল খানিক

পরে। তারপর আকাশ আঁধার করে সন্ধে নামল। এক দুই তিন চার, তারার দল এসে জমতে শুরু করল আকাশের উঠোনে। সায়ন্তন সব ভুলে তাকিয়ে ছিল ওপর দিকে। চোখ সরাচ্ছিল না। যদি কোনো দৃশ্য মুহূর্তের অসতর্কতায় হারিয়ে যায়। এমন আশ্চর্য সুন্দর রঙের ম্যাজিক, আলোর ম্যাজিক, অন্ধকারের ম্যাজিকও আগে কখনও দেখেনি সে। সমীরনের গলার শব্দে চমক ভাঙল তার। তিনি মাঝিকে বলেন, "পাড়ে লাগাও। ফিরতে হবে আবার।"

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে আসতে আসতে বাবার ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল সায়ন্তন। গাঢ়স্বরে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ বাবা।" সমীরণ খুব আরামের শ্বাস ছাড়লেন একটা। কথা বললেন না। শুধু ছেলের এই ভালোলাগাটাকে নিজের দেহে, নিজের মনে মেখে নিতে লাগলেন নিবিড় করে।

ছবিঃ শিমুল



চুমকি চট্টোপাধ্যায়

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ। হাতে অঢেল সময়। অর্চিত আর আমি দু-চারদিনের জন্যে কোথাও বেড়িয়ে আসা যায় কিনা তার প্ল্যান প্রোগ্রাম করছি ওর ঘরে বসে।

“ওই দিঘা, পুরী, দার্জিলিং যাবনা বুঝলি। একটু অফবিট জায়গার কথা ভাব,” আমি বললাম।

“ঠিক বলেছিস,” অর্চিত সায় দিল, “একটা জায়গা আছে, জানিস বিতান। জায়গাটা মোটেই কোনো টুরিস্ট স্পট নয়। নেহাতই গ্রাম। অন্তত আগে তাই ছিল। এখন অবশ্য জানিনা। উন্নতি হয়েছে হয়ত অনেক। আসলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

“গ্রামটার নাম গড়মানিকপুর। একসময় আমার বড়মামা কিছুদিন ওই গ্রামে ছিলেন। তুই তো জানিস, উনি ছিলেন আর্কিওলজিস্ট। ওই অঞ্চলে কাজ করেছিলেন বছরদুয়েক। সেই সময় একবার বাবামায়ের সঙ্গে গেছিলাম। তিন চারদিন ছিলাম। যদিও আমি তখন বেশ ছোটো, কিন্তু আমার মনে একটা ছাপ ফেলেছিল জায়গাটা। বিশেষ করে বাড়িটা।

“জানিস বিতান, যে বাড়িটা অফিস থেকে ঠিক করে দিয়েছিল বড়মামাকে থাকার জন্যে,সেটা ছিল এক সময়ের জমিদার বাড়ি। পেল্লায় বাড়ি। মামা থাকতেন একতলায় দুটো ঘর নিয়ে।আরও অনেক ঘর তালাবন্ধ দেখেছিলাম।

“দোতলা বাড়ি ছিল। কিন্তু আমাকে কোনদিন দোতলায় উঠতে দেননি মামা। দোতলায় নাকি একটা গুমঘর ছিল যেখানে প্রচুর মানুষকে ঢুকিয়ে অত্যাচার করতেন জমিদার শুদ্ধ ভক্ত। খুবই অত্যাচারী জমিদার ছিলেন।

“যাবি ওখানে? জানি না অবশ্য সেই বাড়ি এখনো টিকে আছে কিনা। তবে যদি থাকে,এবার গেলে সেই গুমঘর দেখবই দেখব। আমার প্রচণ্ড কৌতূহল সেই তখন থেকে।”

“শুনে তো আমারও খুব কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু বাড়িটা যদি এখনও থেকে থাকে, আমাদের মতো অচেনা দুটো ছেলেকে ওই বাড়ির বর্তমান বাসিন্দারা কেন ঢুকতে দেবে বলত?”

“সে ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলব। আমি কনফিডেন্ট। তুই যেতে রাজি কি না, শুধু বল।”

****

গড়মানিকপুর বাস স্টপে যখন নামলাম তখন দুপুর দুটো ষোলো। জব্বর খিদে পেয়েছে দুজনেরই। অর্চিত বলল, “একী রে, এই বাজার এলাকাটা বেশ জমজমাট হয়ে গেছে তো! আগে যখন এসেছিলাম মোটেই এরকম ছিলনা। যদ্দূর মনে পড়ছে, চার- পাঁচটা খড়ের ছাউনির দোকান ছিল । সাইকেল সারাবার দোকান ছিল তার মধ্যে একটা। বড়মামা একদিন আমাকে নিয়ে টায়ারে হাওয়া ভরাতে এসেছিলেন মনে আছে। মামা সাইকেলই বেশি ব্যবহার করতেন। বলতেন, 'একমাত্র এই বিস্ময়কর যানটিতেই সর্বত্র সেঁধিয়ে যাওয়া যায়!'

“এখন দেখ। কেমন শহুরে পরিবেশ। গাদা গাদা দোকান। রোল, চাউমিন, মোবাইল রিচার্জের দোকান... কী নেই! ধুর, ভালো লাগছেনা । গ্রামগুলো যদি সব শহর হয়ে যায়, তাহলে গ্রামের নিজস্ব ফ্লেভার হারিয়ে যাবে রে! এরপর ছবিতেই ' গ্রাম ' দেখতে হবে!”

অর্চিতের বিন্দুমাত্র পছন্দ হয়নি গড়মানিকপুর বাজার এলাকার এই উন্নতি। আসলে ওর মনে সেই পুরনো গড়মানিকপুরের সবুজ গ্রাম্য ছবিটা রয়ে গেছে। বললাম, “কী বলছিস রে, উন্নতিই তো সভ্যতার বিকাশের মাপকাঠি। শুধু শহরেই উন্নতি হবে? গ্রাম সেই প্রিমিটিভই থাকবে? গ্রামের মানুষ সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত থাকবে আর আর আমরা ম্যাগনাম হাতে আইনক্সে সিনেমা দেখব? তাই চাস তুই?”

“অ্যাই! মেলা ফ্যাচর ফ্যাচর করিস না তো! খুব জ্ঞান ঝাড়ছিস না? পরে তোর এই কথাগুলোর উত্তর দেব। এখন চল, কিছু খেয়ে নি।”

তাজ হোটেলে আমরা ভাত,ডাল, আলুভাজা আর পার্শে মাছের ঝাল খেলাম তৃপ্তি করে। ও হ্যাঁ, টমেটোর চাটনিও ছিল। খেয়ে দেয়ে তাজ হোটেলের ক্যাশে যিনি বসেছিলেন তাকে অর্চিত জিগ্যেস করল, “আচ্ছা, এখান থেকে মাইল আটেক ভেতরে একটা জমিদার বাড়ি ছিল। ওই অঞ্চলটার নাম সম্ভবত ভক্তগঞ্জ। জমিদার শুদ্ধ ভক্তর বাড়ি। এখনও আছে কি না বলতে পারেন?”

“আজ্ঞে, আছে বৈকি। একদিকের অংশ ভেঙেচুরে গেছে তবে বেশিটাই ঠিকঠাক আছে। তা, বাবুরা অইখেনে যাবেন নাকি?”

অর্চিত ঘাড় নাড়ল।একটু অবাক হলেন ভদ্রলোক। ওই বাড়িতে যাবার লোক বড় একটা আসে না তো! এক ভ্যানওয়ালা কে ডেকে আমাদের পৌঁছে দিতে বললেন।

তাজউদ্দিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা দিলাম আমরা। হ্যাঁ,তাজউদ্দিনই তাজ হোটেলের মালিক।

****

যেতে যেতে আলির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আলি আমাদের ভ্যান চালক। জমিদার বাড়িতে এখনও ভক্ত বংশেরই একটা পরিবার থাকে। তবে বাড়ির অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।

রাস্তা বেশ ভালো হয়ে গেছে । উন্নতির আর এক চিহ্ন। রাস্তার দুপাশে এখনও পর্যাপ্ত গাছপালা। পাঁচটার একটু আগেই পৌঁছে গেছি আমাদের গন্তব্যে। শুদ্ধ ভক্তের জমিদার বাড়ি।

বড়মামা যেভাবে বলে দিয়েছিলেন সেভাবেই ভক্ত বংশের বর্তমান বংশধরদের সঙ্গে কথা বললাম। প্রথমে একটু তো আপত্তি আসবেই। একেবারে অচেনা দুটো ছেলেকে বাড়িতে থাকতে দিতে সহজে কেউ রাজি হয়! নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে, লাখ লাখ কথা বলে অবশেষে অনুমতি পাওয়া গেল।

“আমাদের ওপরতলাতেও থাকতে দিতে পারেন। অসুবিধে নেই।”

“না,না। ওপরের ঘরগুলো বহুবছর ব্যবহার হয়না। চূড়ান্ত নোংরা হয়ে পড়ে আছে,” বললেন বাড়ির গিন্নি, বাণীজেঠিমা।

“সে নিয়ে একদম ভাববেন না। আমরা সাফসুতরো করে নেব।”

অর্চিত আর আমার অতি উৎসাহ দেখে শেষে তাঁরা নিমরাজি হলেন। আমাদের আসার উদ্দেশ্য আগেই বলেছি আমরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকের ঘরটা খুলে দেয়া হল আমাদের। বাড়িটা এল প্যাটার্নের। বাঁদিকের হাতার শেষ প্রান্তে চারটে সিঁড়ি উঠে সেই গুমঘর।

****

পরের দিন ভোর ভোর উঠে পড়েছি । মাথায় গুমঘর ঘুরলে কি আর ঘুম হয়! চোখে মুখে জল দিয়েই সোজা গুমঘর। এ বাড়ির কর্তা শিবনন্দনবাবু বার বার করে বলে দিয়েছিলেন, “দেখবে ঠিক আছে। কিন্তু কিচ্ছুতে হাত দেবে না।”

গুমঘরের দরজাটা ছোট মাপের জানলার মত। বা বলা ভালো, ওটা ছোট মাপের জানলাই। শিক বা গ্রিল কিছু নেই বলে দরজা মনে হয়েছিল। ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ শব্দে খানিক ফাঁক হল। ভেতরে নিকষ অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। আমরা দুজনেই মোবাইল অন করে আলো ফেললাম। সে আলোতে অস্পষ্ট কিছু হাড়গোড় দেখা গেল। ওইটুকুতেই গা শিউরে উঠেছে। অর্চিত একবার বলল, “নামব নীচে? কী বলিস?”

আমি অর্চিতের শার্ট খামচে ধরে বললাম, "খবরদার না! দেখেছিস মেঝে কতটা নীচে? আলোই পৌঁছচ্ছেনা। লাফিয়ে নেমে পড়লেও উঠতে পারবিনা।" অর্চিত বুঝল। কিন্তু আমরা যারপরনাই হতাশ হয়েছি। কতকিছু রহস্য আশা করেছিলাম । ওই হাড়গোড় ছাড়া তেমন কিছু নেই।

লম্বা করিডর ধরে হেঁটে ফিরছি, হঠাৎ চোখ পড়ল একটা ঘর তালাবন্ধ। কিন্তু পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে কোনো জানলা খোলা থাকার কারণে বা ঘুলঘুলির আলোতেই হোক ভেতরটা আবছা হলেও দেখা যাচ্ছিল। দুজনেই পাল্লা ফাঁক করে উঁকি মারলাম।

"অ্যাই বিতান! দ্যাখ, দ্যাখ, কী যেন একটা ঢাকা দেয়া রয়েছে মেঝেতে। ছোট বাচ্চার মতো লাগছে।"

"হ্যাঁ রে, দেখেছি। কী, তা কে জানে।"

"তুই এখানে দাঁড়া, আমি আসছি।"

খানিক বাদে অর্চিত তার মিনি টুল কিট নিয়ে হাজির হল। ওর ব্যাকপ্যাকে সবসময় এটা থাকে। একটা ছোট্ট স্ক্রু ড্রাইভার মতো বের করে তালায় ঢুকিয়ে এদিক ওদিক করতেই তালাটা খুলে গেল। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

খাট, আলমারি, আলনা, চেয়ার...অনেক কিছুই আছে ঘরে। সবই কাঠের। ধুলোতে মাখামাখি। শুধু মেঝেতে রাখা বস্তুটাই ঢাকা দেওয়া।

হাত দেব কি দেব না করতে করতে অর্চিত ঢাকাটা সরিয়ে ফেলল। কাঠের অপূর্ব কারুকাজ করা একহাত মাপের একটা ঘড়ি। ওপরের দিকটা রাজমুকুটের মতো । মাঝখানে বড় সাইজের একটা লাল পাথর বসানো।

"কী দারুণ দেখতে রে ঘড়িটা! চল, এটাকে নিয়ে যাই," অর্চিত বলল।

"ধ্যাৎ! মাথা খারাপ নাকি? অন্যের জিনিস এভাবে নেওয়া যায়?"

"আমি যদি কিনে নিই, তাহলে?"

"কী আশ্চর্য! তোমাদের বারণ করা সত্ত্বেও তোমরা না বলে ঘরে ঢুকেছ এবং ঘরের জিনিসে হাত দিয়েছ? আমি থানায় জানালে তোমাদের হাজতবাস হবে সেটা জানো?" হঠাৎ পেছন থেকে রাগত গলার আওয়াজটা আসতে আমরা চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম। শিবনন্দনবাবু সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"জানি জেঠু, আমরা অন্যায় করেছি। কিন্তু এমন একটা চুম্বকের মতো টানছিল, যে না ঢুকে পারিনি," অর্চিত মাথা নীচু করে বলল।

"হবেই তো! ওটা শয়তান ঘড়ি। আমার ঠাকুরদার বাবা ছিলেন জমিদার শুদ্ধ ভক্ত। তিনি এক কারিগরকে দিয়ে ওই ঘড়ির ফ্রেমটা তৈরি করিয়েছিলেন। আর মূল ঘড়িটা আনিয়েছিলেন নেপাল থেকে। ফ্রেমের মাথায় ওই লাল পাথরটা চুনি। কিন্তু ঘড়িটা অশুভ। ঠিক চলতে চলতে হঠাৎ- হঠাৎ কাঁটাদুটো উল্টোদিকে ঘুরত। আর তখনই পরিবারে কারো না কারো মৃত্যু নেমে আসত। তাই ওটাকে ওইভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। দম পড়ে না বলে চলেও না।"

"আচ্ছা, হতেও তো পারে জ্যেঠু, ওই মৃত্যুগুলো এমনিতেই হত। হয়ত ঘড়ির দম কমে গেলে কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরত। তার সঙ্গে মারা যাবার আদৌ কোন সম্পর্ক ছিলনা?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"প্রথম প্রথম তাই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, পুরো দম থাকা সত্ত্বেও কাঁটা উলটো দিকে ঘুরছে এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে পরিবারে। ওই ঘড়ি মৃত্যুর আগাম খবর দিত। মৃত্যু ঠেকানো যায় না একথা ঠিক। কিন্তু আগেভাগে জেনে 'এবার কার পালা' ভেবে আধমরা হয়ে থাকার কোন মানে হয় কী? তোমরাই বল?

একটু চুপ করে থেকে অর্চিত বলল, "জেঠু, একটা কথা বলব?"

অর্চিতের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন শিবনন্দন ভক্ত।

"বলছিলাম কী, ঘড়িটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখব ভেতরের কলকব্জাতে কোন গলদ আছে কিনা? আমার আবার এসবে খুব ইন্টারেস্ট। বিতান জানে। বাড়িতে কোন যন্ত্রপাতি খারাপ হলে প্রথমেই আমার ডাক পড়ে। আমি ফেল করলে তারপর ওয়ার্কশপে যায়।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শিবনন্দনবাবু বলেন, "দেখতে চাইছ, দ্যাখো। আমার কিন্তু একেবারেই ইচ্ছে নয় ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হোক। নতুন করে কোন অশান্তি, বিপদ আর চাই না।"

****

অর্চিত খাটে ঘড়ির পার্টস ছড়িয়ে কাজ করছে। আমি জানলা দিয়ে দেখছিলাম এই বাড়িটার পেছন দিকে বুনো ফুল আর আগাছার জঙ্গল। প্রচুর কচু গাছ। তারই মধ্যে একটা হাসনুহানা ফুলের গাছ ঝলমল করছে। বিকেলের আলো মরে আসছে। একটু পরেই সন্ধে নামবে। আজকের রাতটা কাটলেই কাল আবার কলকাতা পাড়ি।

"বুঝলি বিতু, মনে হয় ঠিক করতে পেরেছি । নীচে গিয়ে বাণীজেঠিমার কাছ থেকে একটু নারকোল তেল নিয়ে আয় তো। কাঁটাগুলো একদম জ্যাম হয়ে গেছে।"

খানিক বাদে তেলটেল দিয়ে চালু করে ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে গর্বের হাসি হাসল অর্চিত, "স্মুদলি চলছে দ্যাখ। কী সুন্দর লাগছে। কাঁটা দুটো মনে হয় রূপোর তৈরি।"

আমি তাকালাম। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মাঝখানের ওই লাল চুনিটা ঠিক রক্তচক্ষুর মতো জ্বলজ্বল করছে।

****

খেয়ে দেয়ে ফের ঘরে ঢুকে পড়েছি। রাত ন'টা বেজে গেছে। ঘরে ঢুকতেই ধ্বক করে বাসমতি আতপ চালের মতো একটা গন্ধ নাকে লাগল। অর্চিত টেবিলের সামনে গিয়ে ঘড়িটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে।

আমি ওর দৃষ্টি ফলো করে ঘড়ির দিকে তাকাতেই গায়ে কাঁটা দিল। ঘড়ির কাঁটা দুটো উলটো দিকে ঘুরছে খুব... খুব আস্তে।

"অর্চিত, ঘড়িটাকে যেখানে ছিল সেখানে রেখে আসি চল। আমার একদম ভালো লাগছে না।"

অর্চিতও ঘাবড়ে গেছে। খুটখাট করছে তখনও।

আচমকা আমার চোখ চলে গেল জঙ্গলের দিকের জানালাটায়। এ কী! সাপ! সরসর করে ঢুকে আসছে কালো কুচকুচে একটা সাপ! তার লক্ষ্য অর্চিত। কিছুক্ষণের জন্যে দুজনেরই হাত-পা অসাড়। সাপকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। কিন্তু কিন্তু... আটকাতে হবে ওটাকে...

"অর্চিত! অর্চিত!...সাবধান!"

আমার কথায় অর্চিত ঘুরেই দেখতে পায় সাপটাকে। ততক্ষণে আমি দরজার পাশে দাঁড় করানো লোহার খিলটা হাতে তুলে নিয়েছি।

সাপটার অর্ধেকটা মেঝেতে। বাকিটা দেওয়ালে। ঠিক পাঁচ- ছ হাত দূরেই স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে অর্চিত। খিলটা মাথার ওপর তুলে প্রাণপণে মারলাম সাপটার মাথা লক্ষ করে। আঘাতটা পড়ল সাপটার গলার কাছে। মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল অর্চিতের বাঁ পায়ের পাতায়। পাতায় দুটো দাঁত ফুটে গেল।

****

অর্চিত এখন কলকাতার নার্সিং হোমে। আপাতত লাইফ রিস্ক নেই। তবে খুবই ক্রিটিকাল অবস্থা গেছে। ডাক্তার বলেছে, কেউটে সাপের বিষ । কেউটের শরীর থেকে নাকি বাসমতি আতপের গন্ধ বেরোয়।

আসার আগে আমি ঘড়িটা মাটিতে আছড়ে ভেঙে দিয়ে এসেছি।



অলংকরণঃ ইন্দ্রশেখর



পূর্বজন্ম

অর্ক পৈতন্ডী

আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার সবাই খুব অবাক হল। অনেক প্রশ্ন করল, "ছাড়লি কেন?" "মাইনেপত্তর কম ছিল বুঝি?" "খুব খাটাখাটনি করাতো?"

আমি সবার প্রশ্নই কিছু একটা বলে এড়িয়ে গেছি। কারণ আমি জানি আসল কথাটা কেউ বিশ্বাস করবে না। হাসবে। ভাববে আমি পাগল। অন্যদের আর কী দোষ দেব, মাঝে মাঝে আমারই ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে এরকম একটা অলৌকিক ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল। আজ সেই ঘটনার কথাই লিখব।

সেদিন আমি কাজের সূত্রে দমদম ক্যান্টনমেন্টের গ্রিনপার্কে ডঃ অরিজিত মুখোটীর চেম্বারে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় দেখি টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অন্যদিন হলে বিরক্ত হতাম। আজ যেহেতু আর কোথাও যাওয়ার নেই, সোজা বাড়িই ফিরব, তাই আর ততটা বিরক্ত হলাম না। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি গায়ে মেখে তখন বারাসাত যাওয়ার কোন ট্রেন পাব তা ভাবতে ভাবতে স্টেশনের দিকে চললাম।

বেশ হাঁটছিলাম। আচমকা কী হল বুঝতে পারলাম না। মনে হল প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে। পরক্ষনেই মনে হল জল তেষ্টা পাচ্ছে। বুকের বাঁদিকে একটা চিনচিনে ব্যথাও যেন অনুভব করতে পারছি।

এই জায়গাটা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে আছে। রাস্তায় কোনও দোকানপাটও নেই যে একটু জল চাইব। আমার ব্যাগে জলের বোতল আছে তবে তার শেষ বিন্দুটা বিকেল সাড়ে চারটেয় কলেজ স্ট্রিটের মোড়-এ খরচ করে ফেলেছি।

এমন সময় রাস্তায় বাঁপাশের একটা বিশাল দোতলা বাড়ির দরজা খোলা পেলাম। ভেতরে একটা টিমটিমে নীল আলো জ্বলছে। শরীর এত খারাপ লাগছিল যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ঐ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। তাও যা দেখতে তাতে মনে হল একটা বসার ঘর। সোফাসেট, সেন্টার টেবিল রাখা আছে। আমি "কেউ আছেন" বলে একটা চিৎকার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু গলা দিয়ে এত ক্ষীণ স্বর বেরোল যে আমি নিজেই শুনতে পেলাম না ঠিকমত। অগত্যা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকলাম। ওখানে একটা সিঁড়ি নজরে এল। দোতলায় লোকজনের গলার আওয়াজ পাচ্ছি যেন। কোনওমতে টলতে টলতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় পৌঁছতেই কিছু লোক আমাকে দেখে হাই হাই করে ছুটে এল- "ঐ এসেছে, ঐ এসেছে !!" এত অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি অবাক হলাম। ওরা যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। যেন জানত আমি আসব।

আমি ততক্ষণে কথা বলার ক্ষমতা প্রায় হারাতে বসেছি। ইশারায় বললাম জল খাব। তৎক্ষনাৎ কে একজন একটা কাচের গ্লাসের এক গ্লাস জল নিয়ে এল। আমি মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া পথিকের মত সেই গ্লাসে চুমুক দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে গ্লাসের তরল আর যাই হোক না কেন, জল নয়। তবুও এক চুমুকে সেই তরল নিঃশেষ করে ফেললাম আর অবাক হয়ে বুঝলাম শরীরে এখন আর কোনও কষ্ট নেই।

আমি এবার ঘরের ভিতরটা ভালোভাবে লক্ষ করলাম। ঘরটা কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে আছে। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল। ঘরের এককোণে একটা চারকোণা জায়গা ইঁট দিয়ে ঘিরে তার মাঝে আগুন জ্বেলে যজ্ঞ হচ্ছে। সেই আগুনের সামনে একজন দশাসই চেহারার লোক চোখ বন্ধ করে পদ্মাসনের ভঙ্গীতে বসে। তার পরণে লাল ধুতি। গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় জটা, মুখ ভর্ত্তি দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। দেখেই কেমন তান্ত্রিক তান্ত্রিক লাগল। দু-একজন লোক মাঝে মাঝে আগুনে ঘি ঢালছে। কাঠ গুঁজে দিচ্ছে। এরা বোধ হয় এই তান্ত্রিকের সহকারী। আরও কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন। এরা হয়ত এই বাড়িরই লোকজন।

ধোঁয়া ধোঁয়া ঘর। একটা মিষ্টি গন্ধ। খুব সম্ভবত ধূপের। ভয়ঙ্কর চেহারার এক কাপালিক বা তান্ত্রিক। সব মিলিয়ে এক অস্বাভাবিক পরিবেশ। আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। চলে যাব না থাকব!

এমন সময় এক সুদর্শন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমাকে এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে। বললেন, "আমার সাথে আসুন। আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি।" আমি বিনাবাক্যব্যয়ে ভদ্রলোককে অনুসরণ করে একতলার বসার ঘরে এলাম। ঘরে এখনও সেই টিমটিমে নীল আলোটা জ্বলছিল। ভদ্রলোক সেটাকে অফ্ করে টিউব জ্বাললেন, তারপর একটা সোফা দেখিয়ে আমাকে বললেন, "বসুন।" বসলাম। ভদ্রলোক আমার সামনের সোফাটার দখল নিয়ে বললেন, "আপনার নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত লাগছে সব কিছু, তাই না?" আমি একটা লম্বা দম নিয়ে বসলাম, "দেখুন, আমি এখানে অফিসের কাজে এসেছিলাম। তখন সুস্থই ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় এত খারাপ লাগতে শুরু করল যেন মনে হচ্ছিল এক্ষুনি মরে যাব। তখনই আপনাদের বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ি। কিন্তু এখানে এসে আপনাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল যেন আপনারা জানতেন যে আমি আসব। এটা কি খুব অস্বাভাবিক নয়?"

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করছেন, যেন বুঝতে পারছেন না কথাটা কোথা শুরু করে করবেন। অবশেষে বললেন, "আপনি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করেন?"

"কী?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "পূর্বজন্ম ?"

"হ্যাঁ! পূর্বজন্ম," ভদ্রলোক এবার কথা খুঁজে পেলেন, "এই ঘটনা পূর্বজন্মের সঙ্গেই জড়িত। অন্তত গুরুদেব তো তাই-ই বলছেন।"

"আপনার গুরুদেব ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যাকে দোতলার ঘরে করতে দেখলেন উনিই আমার গুরুদেব," ভদ্রলোক বলতে থাকেন, "উনি বেনারসে থাকেন। খুব বড়ো তান্ত্রিক। চন্দনবাবা। বাবাই বললেন যজ্ঞটা করতে। না হলে এই বাড়ির যে অভিশাপ তা কাটবে না।"

অভিশাপ? আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। বললাম "আপনি দয়া করে আর হেঁয়ালি করবেন না। প্লিজ... সব খুলে বলুন।"

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, "আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমি প্রথম থেকে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি।"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থাকলেন। বুঝলাম উনি মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছেন কি বলবেন। অবশেষে সামান্য গলা ঝেড়ে নিয়ে উনি বলতে শুরু করলেন, "আমার নাম তুণীর হালদার। পেশায় পোস্টাল ক্লার্ক। আপাতত পার্কস্ট্রিট ব্রাঞ্চে আছি। এই বাড়িটা আমি কিনি প্রায় মাসতিনেক আগে! কেনার সময় বাড়িটার বদনাম শুনেছিলাম। কিন্তু বাড়িটা এমন জলের দরে পেয়ে গেলাম যে সে সব গুজবে আর কান দিইনি। কেনার পর বুঝলাম কী ভুলই না করেছি। এ বাড়িতে আর যাই হোক না কেন থাকা অসম্ভব। মাঝে মাঝে এঘর ওঘর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ আসে। কখনও মনে হয় কেউ বুঝি একদম আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ঘোরালেই তাকে দেখতে পাব। অথচ ঘর ফাঁকা। এরপর এই বাড়ির আগের মালিকের কাছে গিয়ে জানতে পারি আসল ঘটনা। আজ থেকে প্রায় সত্তর আশি বছর আগে এই বাড়ি তৈরি করেন এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। তাঁর দুই ছেলে ছিল একটু পাগলাটে। যাকে বলে মেন্টালি রিটার্ডেড। সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল। মুশকিলটা হল বৃদ্ধ মারা যাওয়ার পর। দেখা গেল উনি কোনও উইল করে যাননি। সুতরাং তাঁর বিপুল সম্পত্তি আর এই বাড়ি দুই ছেলের ভাগে সমানভাবে পড়ল। অদ্ভুতভাবে এর কিছুদিন পরেই সেই পাগল ছোটোভাই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। লোকে বলত সম্পত্তির লোভেই নাকি বড়োভাই ছোটোভাইকে গুমখুন করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস দেখুন! সেই বড়োভাইও কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যায়। তারপর থেকেই এই বাড়ি হাত বদল হতে থাকে, কিন্তু কেউ টিকতে পারে না এই বাড়িতে। আমিও পারতাম না যদি না আমার গুরুদেব ইতিমধ্যে বেনারস থেকে হঠাৎ এখানে আসতেন। গুরুদেব এই বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়েই বললেন, "বেটা, এই বাড়ি কিনে তুই ভালো কাজ করিসনি। এই বাড়িতে দুটো দুঃখী আত্মার শাপ আছে। এই শাপ যতক্ষন না কাটবে, কেউ এ বাড়িতে থাকতে পারবে না।"

এই অবধি বলে তুণীরবাবু থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "দুটো দুঃখী আত্মা কারা বুঝতে পারলেন তো ?" একজন সেই পাগল ছোটোভাই যাকে সম্পত্তির লোভে খুন করা হয়েছিল আর দ্বিতীয়টি সেই বড়োভাই যে সম্পত্তি পেয়েও ভোগ করতে পারেনি বলে একরাশ হতাশা নিয়ে মারা গেছে। গুরুদেব বললেন, "সম্ভবত ঐ দুই ভাইয়েরই এখন পুনর্জন্ম হয়েছে। এখন কোনওভাবে যদি ওই দুই ভাইয়ের পুর্নজন্ম হওয়া শরীরকে এই বাড়িতে আনা যায় আর তারা যদি এই বাড়ির সদর দরজার চৌকাঠে হাত রেখে বলেন যে "আমি সব ক্ষমা করলাম" তবেই একমাত্র এই বাড়ির অভিশাপ কাটবে।"

আমি এতদূর অবধি শুনে তুণীরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "এ তো বেশ একটা অলৌকিক গল্প হয়ে গেল। শুনতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু এর সাথে আমার কী সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারলাম না।"

তুণীরবাবু পকেট থেকে একটা ফটো বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই ফটোটা দেখুন তো।" বহু পুরোনো হলদে হয়ে যাওয়া একটা সাদা কালো ছবি।

ছবিটা দেখে আমি চমকে উঠলাম নিজেকে চিনতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু এটা আমার ছবি হতেই পারে না। আমি আজ অবধি চিরদিন বাঁদিকে সিঁথি করে চুল আঁচড়ে এসেছি, কখনও গোঁফও রাখিনি। আর এই ছবিতে আমার মাঝখানে সিঁথি, একটা সরু গোঁফও দেখা যাচ্ছে। অবাক হয়ে বললাম, "এ কার ছবি?" তুণীরবাবু ছবিটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললেন, "আমি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে ওই দুই ভাইয়ের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সন্ধান পাই। তাঁর কাছ থেকে ঐ দুই ভাইয়ের দুটো ছবি জোগাড় করি। আপনি এখন যে ছবিটা দেখলেন

সেটা ঐ পাগল ছোটোভাইয়ের ছবি। দেখলেন তো আপনার সঙ্গে কত মিল? এখন বুঝলেন তো কী করে আপনাকে আমরা দেখামাত্র চিনে ফেলেছিলাম?"

আমি কপালে হাত দিয়ে দেখলাম অতিরিক্ত ঘামছি। এখানে আর এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমি আসি"। তুণীরবাবু বললেন, "আর বসবেন না? ঠিক আছে তাহলে শেষ উপকারটা করে দিয়ে যান। সদর দরজার চৌকাঠে হাত রেখে বলুন, "আমি সব ক্ষমা করলাম।"

আমি বললাম, "না, বলব না।"

তুণীর বাবু থতমত খেয়ে বললেন, "সে কী? বলবেন না মানে? জানেন, আজ আপনাকে আনার জন্যই এই যজ্ঞ করা হল! এই যজ্ঞ এত শক্তিশালী যে আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, আসতে বাধ্য হতেন। আর এতদূর এসেও আপনি বলছেন এই সামান্য কাজটুকু করবেন না? আপনি এই কথাটা না বুঝলে আজকের পুরো আয়োজন ব্যর্থ হবে তা জানেন?"

আমি আর কিছু শুনলাম না। ঐ অদ্ভুত বাড়ির বসার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনের দিকে দৌড় শুরু করলাম।

বাড়ি ফিরলাম বিধ্বস্ত অবস্থায়। কাউকে কিছু বললাম না। তবে রাত্তিরে ঘুমও হল না। সারা রাত ধরে শুধু ভাবলাম আর ভাবলাম। আজ কি দল বেঁধে কিছু লোক আমায় বোকা বানাল? নাকি এই সবকিছুই সত্যি! আমি পূর্বজন্মে পাগল ছিলাম এবং সম্পত্তিলোভী বড়দার হাতে খুন হয়েছিলাম? সত্যিই কি পূর্বজন্ম বলে কিছু হয়?

রাত্রিবেলা ঘুমোতে দেরি হয়েছিল বলে সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল। সেদিন আমাকে শিয়ালদা যেতে হবে। তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়ে ডাউন বনগাঁ লোকালে নিজেকে গুঁজে দিলাম।

ট্রেন তখন মধ্যমগ্রাম স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আমি এক হাতে ট্রেনের হাতল ধরেছি, অন্য হাতে ভারি ব্যাগ। আচমকা মনে হল কেউ আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। সর্বনাশ, বাঁ পকেটে মোবাইল আছে। আমি ট্রেনের হাতল ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই হাতটাকে চেপে ধরলাম। ঐ সময়ই ট্রেন ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল। এক সেকেণ্ডের জন্য আমি একটু টাল হারাতেই এক ঝাট্‌কায় আমার হাতটা ছাড়িয়ে আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটা অদ্ভুত কায়দায় চলন্ত ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মের প্রায় শেষ প্রান্তে নেমে গেল। আমি এক ঝলক ছেলেটার মুখ দেখেছি। বছর পঁচিশেক বয়স হবে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ডান ভ্রু'র উপর লম্বা কাটা দাগ। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম মোবাইলটাই গেছে। এখন আর চেঁচামেচি করে লাভ নেই। সত্যিই সময়টা খারাপ যাচ্ছে আমার। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে কোথাও একটু হাওয়া বদল করে আসতে হবে।

বিকেলবেলা ঠিক করলাম আমি আবার ওই বাড়িতে যাব। আজই। এই আমার বরাবরের অভ্যেস। কোনও ঘটনার শেষ না দেখলে মনটা ঠিক শান্তি পায় না। আজও সারাদিন মনটা খচ্ খচ্ করল। সকালে তার উপর মোবাইলটাও চুরি হয়েছে। এরকমই নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনে পোষণ করে আমি গ্রিনপার্কের সেই বাড়ির সামনে পৌঁছলাম যখন তখন বাজে ঠিক আটটা দশ। একটু রাত হলেই পাড়ার চারপাশটা কেমন জানি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে আজও কোনও লোক নেই। তুণীরবাবু বাইরের বসার ঘরটায় বসেছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, "কাল আপনার সামান্য ছেলেমানুষীর জন্য কত বড়ো সর্বনাশ হল আপনি জানেন?" আমি কী উত্তর দেব! চুপ করে রইলাম।

তুণীরবাবু ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "এই যজ্ঞ দু'দিনের বেশি করা যাবে না। তাই গুরুদেব ঠিক করেছিলেন প্রথম দিন ছোটোভাইয়ের পূনর্জন্মপ্রাপ্ত আত্মাকে আনবেন আর পরদিন ঠিক একইভাবে বড়োভাইয়ের আত্মাকে আনবেন। কারণ একই দিনে দু'জনকে একসাথে আনলে একজনের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। অথচ আপনার জন্য সেই ভয়ঙ্কর ঝুঁকির কাজটাই করতে হচ্ছে।"

তুণীরবাবু চুপ করলে আমি বললাম, "কালকের আচরণের জন্য আমি খুবই লজ্জিত। আপনি অসুবিধায় পড়ুন তা আমি চাইনি। আপনি যা বলবেন তাই-ই করব। তারা আগে আপনি কি আমাকে ঐ বড়োভাইয়ের ছবিটা দেখাতে পারেন?"

তুণীরবাবু পকেট থেকে কালকের মতই আর একটা ফটো বের করে আমার হাতে দিলেন, এই ফটোটা হাতে নিয়েও আমার অস্বস্তি শুরু হল। ছবির লোকটাকে আমি কোথায় যেন দেখেছি। আচমকা বাইরে একটা কোলাহল শুরু হল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার হাতে ধরা ছবির মানুষটাই যেন বসার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকেই দরজার ছিটকিনিটা আটকে দিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "কিছু লোক আমাকে তাড়া করেছে। পেলেই মেরে ফেলবে। আমাকে বাঁচান।"

তুনির বাবু উচ্ছসিত হয়ে বললেন, "আজকে যজ্ঞ সফল হল। বড়োভাই এসেছে।"

এতক্ষণে আমি লোকটার বাঁ ভ্রু'র উপরের কাটা দাগটা দেখতে পেয়েছি। এ সেই বনগাঁ লোকালের পকেটমার। যে আজই আমার মোবাইল ফোন হাতিয়েছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম, "তুণীরবাবু! এই লোকটাকে ধরে রাখুন। এ একজন পকেটমার। আজই আমার মোবাইল চুরি করেছে বনগাঁ লোকাল থেকে।"

আমার কথা শেষ হল না। লোকটা তীব্র বেগে দরজা খুলে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একদঙ্গল লোক ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চলতে লাগল অবিরাম কিল ঘুসি চড়। তুণীরবাবু হায় হায় করে উঠলেন। আমি আর দাঁড়ালাম না । কালকের মতই দৌড়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম।

পরদিন সকালে খবরের কাগজের পাতায় একটা ছোটো খবর চোখ আটকাল। খবরটা এরকম-

গণপ্রহারে মৃত্যু

আপ বনগাঁ লোকালে এক মহিলার সোনার হার ছিনতাই করে পালাবার সময় এক ছিনতাইকারীকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে সংলগ্ন গ্রিনপার্ক অঞ্চলে উত্তেজিত জনতা ধরে ফেলে। তারপর চলতে থাকে বেদম প্রহার। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছন'র আগেই ছিনতাইকারী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আমি কাগজটা রেখে দিয়ে প্যাড আর কলম টেনে নিলাম। রেজিগনেশন লেটার লিখব। এমন চাকরি আর করব না যেখানে এত ঘুরে বেড়াতে হয়। কে জানে আবার কোন্ সাধুবাবার খপ্পরে পড়ে যাব!

ছবিঃ লেখক



অনন্যা দাশ

লয়কে নিয়ে ওর মা, বাবা আর দিদি লিসা সবাই খুব বিরক্ত। লোকের মুখের ওপর দুমদাম কথা বলে দেয় সে। কার মনে কষ্ট হবে, কার দুঃখ হবে সে সব একবারের জন্যেও ভেবে দেখে না! কতবার বোঝানো হয়েছে যে এটা ভাল স্বভাব নয় তাও লয় শুনবে না।

সেদিন যেমন পাড়ার জোজোদাদের বাড়িতে গিয়ে দুম করে তার ভাগ্নে পোকোকে বলে, "কী মোটা, খুব খায় বুঝি?" আর ওদের কুকুর রকিকে "হ্যাংলা" বলে দিল লয়। আসলে রকি ওর জুতোটার একপাটি চিবিয়েটিবিয়ে অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে দেখে রেগে গিয়েই লয় কথাগুলো বলেছিল। সেটা বলার তাও কারণ ছিল কিন্তু পোকোর বয়স মোটে তিন, তাকে মোটা বলাতে জেঠু, জেঠিমা, পোকোর মা টুসিদি, জোজোদা সবাই ভীষণ অখুশি হয়েছেন বোঝা যাচ্ছিল। লিসা সেটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি লয়কে ওখান থেকে টেনে বাড়িতে নিয়ে চলল।

বাড়ি ফেরার পথে লয় ওকে পাথরটা দেখালো। একটা গোল মতন চকচকে বেগুনি রঙের পাথর।

"কী রে ওটা?"

"জোজোদা দিল!"

"তুই নিলি কেন? নিশ্চয়ই ওটাতে কিছু একটা গন্ডগোল আছে! নাহলে তোর ওই রকম ব্যবহারের পর কেউ মোটেই তোকে কিছু দিতে চাইবে না।"

"কী সুন্দর রঙ না পাথরটার? তুষারকাকুদের বাড়িতে যে আমেথিস্ট আছে সেটার মতন দেখতে! আর জোজোদা মোটেই রাগ করেনি। রকি যে হ্যাংলা সেটা তো সবাই জানে!"

"আর পোকো? কতবার তোকে বলেছি অমন করে বাজে কথা বলতে নেই! তা তোর যদি শিক্ষা হয়! ওটা ফেরত দিয়ে দিবি, নাহলে মা দেখলে বকবে!"

লয় শুনে বলল, "হুঁ!"

সেদিনটা শনিবার। বড়মাসির শরীরটা ভাল নেই বলে মা বাবা বিকেলবেলা মাসিকে দেখতে চলে গেলেন। পরদিন বিকেলে ফিরে আসবেন বলে গেলেন। কাজের লোক রাধামাসি রয়েছে ওদের সঙ্গে। পাছে লিসা পাথরটা জোজোদাকে ফিরিয়ে দেয় সেই ভয়ে বাড়ি ফিরেই ওটাকে লুকিয়ে ফেলল লয়।

রাত নটা নাগাদ দরজায় কে যেন বেল দিল। লয় গিয়ে ম্যাজিক আই দিয়ে না দেখেই ঝপ করে দরজাটা খুলে দিল। মা ওকে অনেকবার ওই রকম করতে বারণ করেছেন তা সত্ত্বেও। ওমা দরজা খুলতেই একটা গাঁট্টাগোট্টা বেঁটে মতন লোক হুড়মুড় করে



ঘরে ঢুকে এল। তার পোশাকও বেশ অদ্ভুত গোছের, মাথায় একটা ইয়া বড় একটা বেগুনি রঙের টুপি।

তাকে দেখে রাধামাসি তো হাঁ হাঁ করে উঠল, বলল, "কে গো তুমি? কী চাই?"

লোকটা বেশ রাগরাগ ভাব করে বলল, "আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা হয়েছে এখানে! আমি তো শুনেছিলাম এখানকার লোকেরা খুব অতিথিবৎসল হয়!"

রাধামাসি কিছু না বুঝে বলল, "ও, তোমাকে নিশ্চয়ই তাহলে দাদাবাবু ডেকেছেন। দাদার অফিসের লোক বুঝি? তা বৌদি তো আমাকে কিছু বলে যাননি। রাতে এখানেই খাবে নাকি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! আমার খুব খিদে পেয়েছে।" বলে লোকটা বাইরের ঘরে সোফাটায় আরাম করে বসে রিমোটটা নিয়ে টিভিটা অন করে দিল!

বাবার অফিস থেকে মাঝে মাঝেই লোকজন আসে ওদের বাড়িতে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয় কিন্তু বাবা বাড়িতে থাকলে তবেই।

এদিকে ওদের সবার রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তাই মাসি আবার রাঁধতে বসল। গজগজ করে বলে চলল, "দাদার অফিসের ওই রকম কিম্ভুত দেখতে লোকজন রাতের বেলা কেন এসে হাজির হয়েছে জানি না বাপু! বাইরে কোথাও খেয়ে এলেই তো পারত!"

লয় আর লিসার অবশ্য প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল যে লোকটা মোটেই বাবার অফিসের নয়। সে টুপিটা খুলতে সেটা আরও স্পষ্ট হল। লোকটা দেখতে কেমন যেন শ্রেকের মতন, শুধু এর চামড়াটা বেগুনি।

লয় ফিসফিস করে বলল, "দেখে মনে হচ্ছে অন্য গ্রহ থেকে এসেছে! বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দেব!"

লোকটা শুনতে পেল কিনা কে জানে হঠাৎ বলল, "সেবার যখন জোজোদের বাড়িতে ছিলাম তখন খুব মজা হয়েছিল। ওর মা কী ভাল রান্না করে।"

"তুমি জোজোদার বাড়িতে ছিলে? মানে আমাদের পাড়ার জোজোদা?"

"হ্যাঁ, ওদের কুকুর রকি প্রথমে আমাকে দেখে খুব ঘেউ ঘেউ করছিল তারপর আমার সঙ্গে এমন ভাব হয়ে গেল যে আর বলবার নয়!"

লয় হোমওয়ার্ক নিয়ে বসেছিল। ওর পেনসিলটা ভোঁতা দেখে লোকটা উঠে এসে সেটা নিয়ে হাত বোলাতেই মুখটা ছুঁচলো হয়ে গেল। টেবিলে রাখা ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল হাত বুলিয়ে সেগুলোকে টাটকা করে দিল। মেঝের ভাঙা টাইলটা গোটা হয়ে গেল ফাটল মিলিয়ে গিয়ে। তারপর লোকটা হাত নাড়াতেই লয়ের হাতের লেখায় অঙ্কটা হয়ে গেল খাতায়। সে তো আহ্লাদে আটখানা, বলল, "তুমি কি জাদু জানো?"

লোকটা বলল, "না, না, জাদু আবার কী? আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে এই সব তো সবাই করতে পারে। ওখানে আর সব কিছু ভাল কিন্তু তোমাদের এখানকার মতন খাবারদাবার পাওয়া যায় না মোটেই। সব খালি বড়ি আর ক্যাপসুল! ওসব খেয়ে মজা নেই। তবে পৃথিবীর যত জায়গাতেই গেছি কোথাও এখানকার মতন খাবার পাইনি! আচ্ছা এত দেরি হচ্ছে কেন বলতো রান্না হতে? আর যে তর সইছে না!"

রাধামাসির রান্না হতেই সে হাঁউমাউ করে খেতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে সব খাবার শেষ! ঢেকুর তুলে পরমনান্দে হাত পা ছড়িয়ে আবার টিভির সামনে গিয়ে বসে পড়ল সে।

একটু পরেই লয় আর লিসাকে বলল, "তোমরা শুয়ে পড়ো। আমার ঘুম পেলে আমি এখানেই ঘুমিয়ে নেব।"

শুতে যাওয়ার আগে লিসা লয়কে বলল, "আমার মনে হয় তুই ঠিকই বলেছিস। অন্য গ্রহ থেকেই এসেছে লোকটা। মাসি ভেবেছে বাবার অফিসের লোক তাই কিছু বলছে না। মা-বাবা শুনলে কিন্তু খুব ভয় পাবে..."

লয় বলল, "তা পাবে হয়তো কিন্তু খুব মজা হচ্ছে। যতদিন না ওরা ফিরছে ততদিন থাক। কেমন সুন্দর অঙ্কটঙ্ক করে দিচ্ছে!"

লিসা কিন্তু চিন্তিত মুখে বলল, "জানি না বাবা, আমার কিন্তু কেমন ভয় ভয় করছে!"

পরদিন সকালে রাধামাসির চিৎকারে ঘুম ভাঙল ওদের।

লয় আর লিসা ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল মাসি মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। ওদের দেখে বলল, "সাংঘাতিক কান্ড হয়ে গেছে। ওই লোকটা বাড়িতে যত খাবার ছিল সব খেয়ে ফেলছে! ফ্রিজে কিছুই নেই আর। রান্না করা খাবার, কাঁচা আনাজপাতি সব শেষ। বিস্কুট, চানাচুর, মুড়ি যা ছিল সব হাওয়া। দাদা-বৌদি তো আমাকে টাকাকড়িও দিয়ে যাননি বাজার করার জন্যে সব বাজার করা ছিল বলে। এখন কী হবে? কী রাক্ষুসে খিদে রে বাবা লোকটার!"

লিসা শুনে বলল, "আমার কাছে টাকা আছে, দিদা জামা কেনার জন্যে দিয়েছিলেন। তোমাকে দিচ্ছি, তুমি তাই দিয়ে সব্জি ইত্যাদি যা লাগে কিনে নিয়ে এসো।"

যার জন্যে এত কান্ড সে মনে হয় ঘুমোচ্ছিল। একটু বাদেই কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে বলল, "রবিবার দিন সকালে তোমাদের বাড়িতে লুচিটুচি হয় না?"

লিসা মুখ চুন করে বলল, "কী করে হবে? লুচির সঙ্গে তো তরকারিও কিছু খেতে হয় আর তুমি তো সব আনাজপাতি খেয়ে ফেলেছো তাই মাসিকে আবার বাজারে যেতে হয়েছে! কাঁচা আলু পটল কেউ খায়?"

লোকটা লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, "কী করব বলো? রাতে এত খিদে পেল গেল যে কী বলব। আর খিদে পেলে আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারি না।"

রাধামাসি বাজার করে এনে লুচি ভাজল। লয় আর লিসা যতক্ষণে একটা করে লুচি খেয়েছে ততক্ষণে লোকটা সব লুচি আর তরকারি খেয়ে শেষ করে ফেলল! খেয়েই আবার সোফায় বসে গেল টিভি দেখতে।

লয় এবার বেশ রেগে গেল, "কী হ্যাংলা রে বাবা!"

লিসা ওকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, "তুই রকিকে জোজোদার সামনে হ্যাংলা বলেছিলি, পোকোকে যাতা বলেছিলি বলে জোজোদা সত্যিকারের হ্যাংলা কাকে বলে দেখাবার জন্যে ওকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে! তোকে ওই বেগুনি পাথরটা সেই জন্যেই দিয়েছিল। লোকটার সঙ্গে পাথরটার নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে।"

“কী হবে তাহলে এবার?”

“কী আবার হবে? জোজোদাকে “সরি” বলে পাথরটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।”

লয় পাথরটা যেখানে লুকিয়েছিল সেখানে খুঁজতে গিয়ে সেটাকে পেল না। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাথরটাকে পাওয়া গেল না।

দুজনে কী করবে ভাবছে এমন সময় রাধামাসি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো, “সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমি দুপুরের রান্না করে স্নান করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি রাক্ষসটা সব খেয়ে ফেলেছে! আমি আর রান্না করতে পারব না বাপু!”

লয় আর লিসার মুখ শুকিয়ে গেল। সকাল থেকে সেই একটা লুচি খেয়ে রয়েছে। দুজনে এবার জোজোদার বাড়ি ছুটল।

লয় জোজোদার কাছে কেঁদে পড়ল, “জোজোদা আমি খুব সরি। হ্যাংলা কাকে বলে এবার আমি বুঝেছি। আমি আর কোনদিন রকিকে হ্যাংলা বলব না আর পোকোকেও মোটা বলব না। তুমি প্লিজ আমাদের বাঁচাও – সকাল থেকে কিছু খাইনি!”

জোজোদা মুচকি হেসে বলল, “পাথরটা লোকটার কাছেই থাকবে। ও দিনেরবেলা বেশি ঘুমোয়, তখন পাথরটা নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিলেই হবে। ওটাকে বাড়িতে রাখলেই মুশকিল!”

ওরা যখন ফিরল তখন লোকটা সোফাতেই ঘুমোচ্ছিল। বেগুনি পাথরটা ওর জামার পকেটেই ছিল। সেটা বার করে মাসিকে সব বলতে মাসি বলল, “তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, দাদা-বৌদি জানতে পারলে রাগ করবেন। আমি ওটা নিয়ে যাচ্ছি দাও। আর তোমাদের ঘরে দু”বাটি মুড়ি মেখে রেখে এসেছি। রাক্ষসটা ঘুম থেকে ওঠার আগে খেয়ে নিও। আমার ফিরতে একটু দেরি হবে, আবার বাজার করে আনতে হবে। রাতে দাদা-বৌদি ফিরে এসে খাবেন তো।”

মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুই ভাইবোন। বিকেলবেলা ঘুম ভাঙতে বাইরের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখল টিভিটা চলছে কিন্তু অবাঞ্ছিত অতিথি হাওয়া। সারা বাড়ি খুঁজে যখন কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া গেল না তখন লয় আর লিসা আনন্দে খানিক ধেই ধেই করে নেচে নিল।

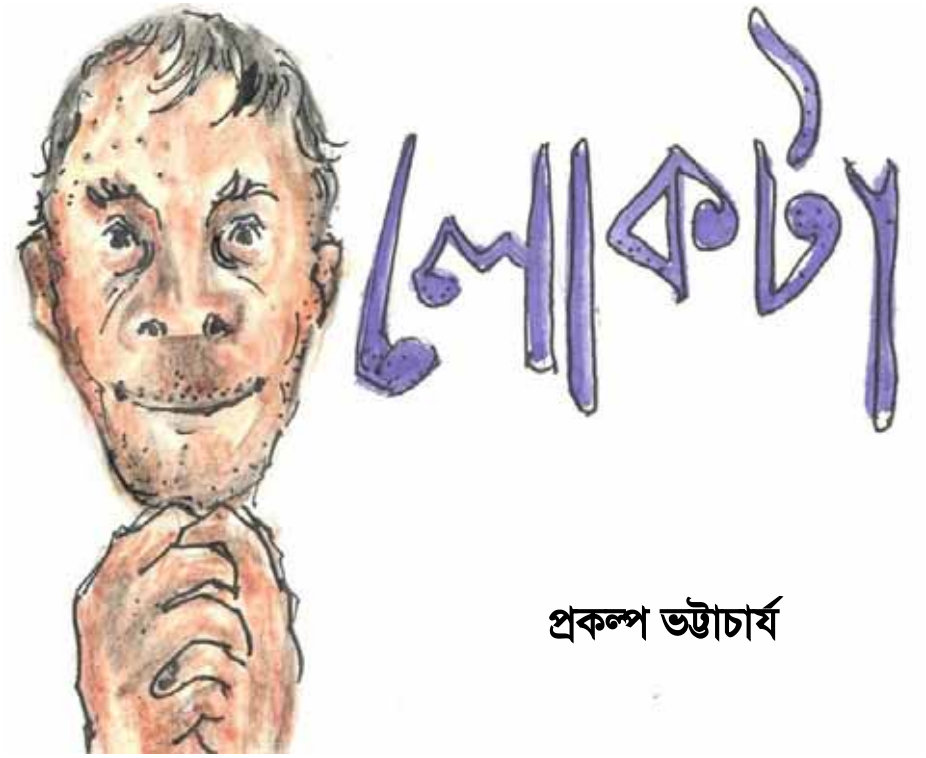
একটু পরে রাধামাসি বাজার নিয়ে ফিরতে ওরা দুজনে তাকে গিয়ে ধরল, “পাথরটা কাকে দিলে, কাকে দিলে” করে।

রাধামাসি চোখ কপালে তুলে বলল, “ওই রকম রাক্ষুসে অভিশাপ তো বড় শত্তুরকেও দেওয়া যায় না গো! তাই আমি পাথরটাকে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে এসেছি!”

মা-বাবা ফিরতে ওদের কিছু বলেনি ওরা বা রাধামাসি। বাবা শুধু ফাটা টাইলটা ঠিক হয়ে গেছে দেখে একটু অবাক হয়ে বলেছিলেন, “এটা ফাটা ছিল না? জোড়া লাগল কী ভাবে?”

ভিন গ্রহের জীবের কী হল জানা নেই কিন্তু লয় আর কখনও কাউকে মুখের ওপর সমালোচনা করেনি।

ছবিঃ শিমূল



শোকটা

প্রকল্প ভট্টাচার্য

"পেন্নাম হই কত্তা!"

খোনা গলার ডাকে গজুবাবুর চটকাটা ভেঙে গেল। বেলার দিকে তাঁর দোকানে বিশেষ কেউ আসে না, তাই এই সময়ে একটু ঝিমিয়ে নেন তিনি। রোজকার অভ্যাস। বিরক্ত হয়ে পিটপিট করে তাকালেন। একটা রোগা পাতলা, খেমো চেহারার লোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

"কে হে তুমি?"

"আজ্ঞে কত্তা বোদয় খুশি হননি আমায় দেকে!"

এই রে, বিরক্তিটা বোধহয় একটু বেশীই ফুটে উঠেছে চোখেমুখে। হাজার হোক, খদ্দের লক্ষ্মী! চেষ্টা করে একটু হাসি আনলেন মুখে, "মানে, আসলে এই সময়ে তো কোনো খদ্দের আসে না দোকানে..."

"কত্তা, ছোট মুকে বড় কতা, কিন্তু অন্য সময়েও কি খদ্দের আসে? তাইলে কি আর দোকান বেচে দেওয়ার কতা ভাবতেন কত্তা?"

এইবার একটু চমকে উঠলেন গজুবাবু। কে লোকটা? ছদ্মবেশী পুলিশ-টুলিশ নয় তো? সত্যিই তাঁর দোকানে আজকাল খদ্দের আসে না বিশেষ, ব্যাবসা একেবারে বন্ধই বলা চলে। যে ক'জন পুরোনো লোকজন আসে, আড্ডা মারতেই। এই বইয়ের দোকান তাঁর বাবার খোলা, নামও তাঁর নামেই, 'ভজহরি বুক স্টোর্স।' লোকে বলত ভজুবাবুর বইয়ের দোকান। গল্পের বই নয়, পড়ার বই। ছোটবেলা থেকেই গজানন বাবার সঙ্গে আসতেন দোকানে, তখন এই অঞ্চলে বইয়ের দোকান বলতে এটাই ছিল, বিক্রিবাটাও ভালোই হতো।

"বুঝলি গজু, বইয়ের ব্যাবসা করলে সরস্বতী আর লক্ষ্মী একসাথে আশীর্বাদ করবেন," বাবা বলতেন।

"আরো একটা সুবিধে হলো যে বই কখনো বাসী হয়ে নষ্ট হবে না মিষ্টি বা বিস্কুট লজেন্সের মতো।"

গজুবাবুও সেটাই মেনে এসেছেন এত বছর। কিন্তু ইদানিং লোকজনের রুচি বদলাচ্ছে। ইস্কুল থেকেই পাঠক্রমের বইপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া, বইপত্র পড়বার চেয়ে ছোটদের ভিডিও গেমস বা ডিভিডি কেনায় ইন্টারেস্ট বেশি। সেদিনই তো রমেশ ডাক্তার বলল, সে নাকি কাগজ কেনাই বন্ধ করে দিয়েছে, ইন্টারনেটেই সব খবর দেখে নেয়। পড়াশোনাও আজকাল ওই ইন্টারনেটে, তাহলে লোকে আর বই পড়বে কেন! ডাক্তার বুদ্ধি দেয় ইন্টারনেট সেন্টার খুলতে, তার সঙ্গে জেরক্স।

"কিন্তু আমি তো কিছুই জানিনা হে এইসবের!"

"সে আমার জানা বিশ্বাসী ছেলে আছে, সামলে দেবে। মাস গেলে সব মিটিয়ে ছেলেটার মাইনে দিয়েও হাতে ধরাবাঁধা হাজার পঞ্চাশ আসবে তোমার। শুধু এখন লাখখানেক ঢালতে হবে।"

"এক লাখ টাকা! কোথায় পাবো?"

"ভাই, কমসম করেই বললাম, ওটুকু তো লাগবেই! এখন কি আর ভজুবাবুর যুগ আছে!"

তা নেই। দাপুটে দোকানদার সেই ভজুবাবু এখন ফটো। প্রতি সোমবার গজুবাবু তাঁর মালাটা বদলে দেন, আর প্রতিদিন ধূপ জ্বালেন সেই ফটোর সামনে। বিড়বিড় করে বলেন, "বাবা, আমায় কী প্যাঁচে ফেলেছ দ্যাখো! তোমার সাধের দোকান বোধহয় আর রাখতে পারব না!" পিছন থেকে দেখলে মনে হবে উনি "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম" বলে পুজো করছেন।



ভজুবাবুর এক মেয়ে। বিয়ে থা করে দিল্লীতে থাকে। ফি-বছর পুজোয় আসে, আর বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার বায়না করে। "কী হবে বল তো দোকান আঁকড়ে থেকে! কটা টাকাই বা আসে! ছাড়ো তোমার ওই বইয়ের ব্যাবসা!"

মানতে না চাইলেও, নিরূপায় তিনি। এভাবে চলবে না, ব্যাবসা বাঁচাতে গেলে টাকা ঢালতেই হবে। অথচ সঞ্চয় বলতে তেমন নেই, বউয়ের গয়নাগাঁটিও বিশেষ বাকি নেই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর। যা আছে, তাঁদের শেষ বয়সের ভরসা। কেউ তাঁকে ধারও দেবেনা এক লাখ টাকা। অগত্যা, তিনি প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন, তেমন পার্টি পেলে দোকানটা বেচে দিয়ে দিল্লীই চলে যাবেন স্বামী স্ত্রী মিলে।

কিন্তু এত্তসব এই লোকটা জানল কেমন করে! স্বরে একটু সম্ভ্রম ফুটিয়ে বললেন, "আসুন, ভিতরে আসুন!"

"হেঁ হেঁ কত্তা আমায় আপনি আজ্ঞে করবেন না, আমি হলেম ছোটখাট মানুষ। আপনি বোদয় আমায় চিনতে পারেননি, কিন্তু ভজুবাবু খুব চিনতেন আমায়।"

গজুবাবু নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর বাবা চিনতেন? বয়স কতো লোকটার? ঠাহর হচ্ছে না, কিন্তু উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। কোনো ধান্দাবাজ নয় তো? কিন্তু তাঁর ধান্দাই তো প্রায় চৌপাট, আর কীই বা করবে এ!

"ভয় পাবেন না কত্তা, আমি কোনো মতলব নিয়ে আসিনি। আপনার উপকার কত্তেই এসিচি।"

লোকটা কি মনের কথা টের পায়? বিস্ময় চেপে গজুবাবু বললেন, "কী উপকার শুনি?"

"বলচি, আগে একটু জল আর বাতাসা দেবেন না? অনেক দূর থেকে আসচি তো!"

গজুবাবু আবার চমকালেন। হ্যাঁ, তাঁর দোকানে একটা কৌটোয় বাতাসা থাকে বটে, আর এক কুঁজো জল। অতিথি কেউ আসেনা, তবু কেউ খাতিরের লোকজন এলে জল বাতাসা দেন। লোকটা তাহলে সেই খবরও রাখে! নাঃ, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে কাচের ডিশে চারটে বড় বাতাসা আর এক গেলাশ জল এগিয়ে দিলেন। লোকটা চোখ বুঁজে তৃপ্তি করে খেল। তারপর ছোট্ট একটা ঢেঁকুর তুলে বললো, "আহ, খুব শান্তি পেলেম। তবে কী জানেন কত্তা, ছোটমুকে বড় কতা, ভজুবাবুর কাছে যেমন সোনার রেকাবিতে মিষ্টি খেতেম, তেমন তিপ্তি হলো কই!"

এবার চমকে উঠে চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন গজুবাবু। সোনার রেকাবি! একটা ছিল বটে, কিন্তু সে তো বহুদিন আগেকার কথা! হ্যাঁ এই দোকানেই থাকত। ভজুবাবু ছিলেন খুব শৌখিন মানুষ। বিশেষ অতিথিদের ঐ রেকাবিতেই সাজিয়ে দিতেন বড় সন্দেশ। সেই রেকাবি হঠাৎ হারিয়ে গেছিল, অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন ওটা চুরি হয়ে গেছে কোনোভাবে। দোকানে কোনো কর্মচারী রাখতেন না ভজুবাবু, ভিড় একাই সামলাতেন, কিন্তু খদ্দেরদের বিশ্বাস করতেন খুব। মেনে নিতে পারেননি কেউ ঐ রেকাবি চুরি করবে। মন ভেঙে গেছিল তাঁর। সেই যে বিছানা নিয়েছিলেন, তার মাসকয়েকের মধ্যেই তিনি মারা যান। আজ সেই সোনাবাঁধানো রেকাবির কিছু না হোক লাখখানেক টাকা দাম। টাকার টানাটানির সময়ে অনেকবার ভেবেছেন গজুবাবু, আহা, সেই রেকাবিটা আজ থাকলে দোকানটাকে বদলে ব্যাবসাটা বাঁচানো যেত! কিন্তু এই খেমো লোকটা সেই রেকাবির কথাও জানে! এতো কোনো সাধারণ মানুষ নয়!

"আপনি কে বলুন তো? অনেক খবর রাখেন দেখছি আমাদের?" গলার স্বর গম্ভীর করে প্রশ্ন করলেন গজুবাবু।

লোকটা খয়েরি মাড়ি বার করে খ্যা-খ্যা করে খানিক হাসল, "কত্তা ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? আমি পুরোনো মানুষ, খেতি করবো না আপনার। তবে বলছিলেম কি..."

"হ্যাঁ, কী উপকারের কথা বলবেন বললেন?" কৌতুহল বাড়ছে গজুবাবুর।

"উপকার তো বটেই! অনেকদিন পরে এ তল্লাটে এলেম, ভাবলেম দুটো পুরোনো কতা বলে যাই। তা ভজুবাবু তো আর নেই, সেই রেকাবিতে মিষ্টি খেতেও পেলেম না। বলছিলেম কি, একটু যদি বড় দেরাজটার তলাটা খুঁজতেন, আপনার উপকারই হোত। সে যাক গে, দেখচি ভজুবাবুর উদ্যম আপনার মদ্দে নেই। থাকলে ব্যাবসাটা তুলে দেওয়ার কতা ভাবতেন না। টাকাকড়ির একটা ব্যবস্তা করতেন ঠিক। তা আর কী করা? যার যা নেই, তার তা নেই! আচ্চা, তাহলে আসি কত্তা, পেন্নাম!"

লোকটা চলে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন গজুবাবু। এইভাবে তাঁকে কথা শুনিয়ে গেল একটা চিমড়েপানা উটকো লোক! ধীরে ধীরে তাঁর রাগ হতে লাগলো। ভজুবাবুর ছিল জমিদারী মেজাজ, সেই রক্ত তাঁর শরীরেও বইছে। কী সাহস! বলে কিনা, তাঁর উদ্যম নেই! এক্ষুনি দেরাজের তলাটা খুঁজবেন তিনি। যেই ভাবা, সেই কাজ, ধুতিটা কোমরে কষে বেঁধে দেরাজের পাল্লাটা খুললেন। হিসেবপত্তরের খাতা সাজানো থরে থরে, এখানে কী উপকারের জিনিস পাবেন তিনি? লোকটা বলেছিল দেরাজের তলাটা খুঁজতে। হ্যাঁ, একেবারে নীচের তাকে একটা বাক্স আছে বটে, তাতে কী আছে দেখেনও নি কখনো খুলে। টেনে দেখলেন, রাজ্যের পুরনো কাগজ। মেঝেতে থেবড়ে বসে সেই কাগজের বাণ্ডিল নামালেন তিনি।

খানিক বাদে তাঁর গিন্নি খেতে ডাকলেন, তিনি গেলেন না। গিন্নি খোঁজ করতে এলে, তাঁকেও বললেন সব খুলে।

"ও মা, লোকটা এতসব জানল কোত্থেকে!"

"আমিও তো তাই ভাবি!"

"আর তুমিও কার না কার কথায় ভর দুপুরে নোংরা কাগজ ঘাঁটতে বসলে!"

ভজুবাবু কী একটা কাগজ টেনে বার করে বললেন, "দ্যাখো তো, এটা যেন কোন জমির দলিল মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ তাই তো!" গিন্নিও দেখলেন। কাঠাপাঁচেক জমি আছে তাঁর নামে, ভজুবাবু কবে কিনেছিলেন কে জানে... উৎসাহের চোটে তিনিও খুঁজতে লাগলেন কাগজের তাড়া। বেশিরভাগই তামাদি রশিদ, কিন্তু তার থেকে আরও বেরোল এই এলাকারই দুটো গুদোমঘরের কাগজ, ভাড়া দেওয়া। ভাড়া পান না বহু বছর। জানতেনই তো না! কত্তা গিন্নির চোখ কপালে উঠল!

"হ্যাঁগো, এতো অনেক টাকার সম্পত্তি! তুমি জানতেও না!"

"কী করে জানব! বাবা বলেননি কোনোদিন! হয়তো আমি বড়ো হলে বলবেন ভেবেছিলেন, তার আগেই..."

"এই দিয়ে আমাদের দোকানটা বড়ো করা যায় না?"

"অবশ্যই যায়! যা দরকার তার থেকেও বেশি পাব!"

"সত্যি তাহলে তো আমাদের উপকারই হল! কে এসেছিলেন গো?" তাঁর উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম ঠুকলেন গিন্নী।

"কিন্তু রেকাবিটা..."

"সে রেকাবি আর কোথায় পাবে এত বছর বাদে! এই ঢের পেয়েছ, এখন চলো খাবে। কাল দয়াময়ী কালীবাড়ি গিয়ে একটা পুজো দেব দুজনে মিলে।"

গিন্নীর কথামত উঠেই পড়ছিলেন গজুবাবু, হঠাৎ কী মনে হতে বললেন, "দাঁড়াও তো, লোকটা বলেছিল দেরাজের তলাটা! আমি তো নীচের তাক খুঁজলাম শুধু! তলাটা একবার..."

“মাথা খারাপ নাকি তোমার! এত্ত বড় দেরাজের তলায় কী খুঁজবে!”

“দাঁড়াও না! হ্যাঁ ওই দিকটা একটু ঠেলে দাও তো!”

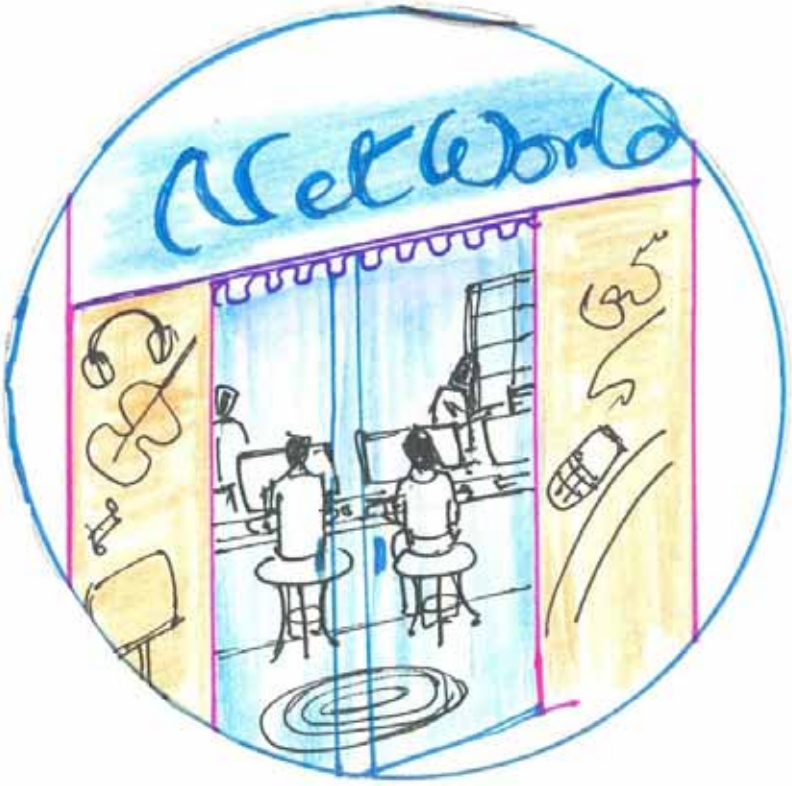
“কী সব্বোনাশ! বুড়ো বয়সে কোমর ভাঙবে নাকি!”

“আরে কিচ্ছু হবে না, দেখিই না!” কোমরে ধুতিটা ভাল করে জড়িয়ে হেঁইও করে টান দিতেই দেরাজটা বেশ খানিকটা সরে এল দেওয়াল থেকে। আর...

আর তার তলায় চকচক করে উঠলো ধুলোমাখা একটা সোনার রেকাবি!

আনন্দে কেঁদে ফেললেন গিন্নী “ওগো, সত্যি করে বলো, কে এসেছিলেন তোমার দোকানে!” গজুবাবুও হতভম্ব। হুঁশ এলে বললেন, “গিন্নী, দোকানটা তো বদলাবই, ওই রেকাবিটাও ধুয়ে রাখব। হতভাগা বলে কিনা আমার উদ্যম নেই! ফের যেদিন আসবে, ওই রেকাবিতেই সন্দেশ খাওয়াব আমি! আমিও ভজুবাবুর ছেলে, হুঁ!”

তারপর সেই পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করে, গুদোমঘর বিক্রি করে সেই টাকায় বইয়ের দোকান বন্ধ করে সেখানে ‘নেট ওয়ার্ল্ড’ দোকান খোলা হল। ছ’টা কম্প্যুটার আর একটা জেরক্স-স্ক্যান মেশিন বসিয়ে, একটা চটপটে ছেলে রেখে ভজুবাবুর ব্যাবসা হুড়হুড়িয়ে চলতে লাগল।



কিন্তু সেই খেমো লোকটা আর এলো না। না, ভুল বললাম। সে এসেছিল পাক্কা এক বচ্ছর পর, তবে ভজুবাবুর স্বপ্নে। আগের মতো বিগলিত,খোনা স্বরে বলে গেছিল “কত্তা, দোষ নেবেন না। আপনাকে চাগিয়ে তুলতেই সেদিন ওইভাবে বলেচি। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, কিন্তু আমাদের তো আর মানুষের হিসেবে বয়স হয় না, তাই সেটা বলে লাভ নেই। আপনি যখন খুব ছোট, আমি এই পাড়ার ছিঁচকে চোর ছিলেম। ওই রেকাবিটার ওপর আমার লোভ ছিল খুব। কিন্তু ভজুবাবুর কড়া নজর এড়িয়ে সরাতেও পারতেম না। একদিন ওনার নজর এড়িয়ে এক ফাঁকে দেরাজের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছিলেম, ভেবেছিলেম পরে কখনো সুযোগ পেলে এসে নিয়ে যাব। সে সুযোগ আর হয়নি, তার আগেই একটা দুগ্‌ঘটনায় এপারে চলে এলেম। ওদিকে রেকাবির দুক্কে ভজুবাবুও চলে এলেন। সেই থেকে আপনার দোকানের ধারেকাছেই ঘুরে বেড়াই, খোঁজপত্তর রাখি। আপনার এখনকার অবস্তা দেখে বড্ড কষ্ট হলো তাই শরীর ধরে চলেই এলেম সেদিন আপনার কাচে। রেকাবিটার হদিশ দিয়ে পাপের বোঝা নামল, আর অপঘাতে মিত্তুর পর আপনার হাতে জল বাতাসাও পেলেম। এবার আমার মুক্তি। কত্তা, ছোট মুকে বড় কতা, আশীব্বাদ করি যেন সুকে শান্তিতে থাকেন সক্কলে!!”

ছবি মৌসুমী



অরিন্দম দেবনাথ

হাঃ হাঃ হাঃ ওই দেখ তপনানন্দ সেন পাগল গেট খুলে বেরোচ্ছে।

এই পাড়ায় নতুন বাড়ি করে এসেছি। সবাইকে ভাল করে চিনি না। রিক্সা ধরব বলে চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। মোড়ের মাথায় দাঁড়ান কতকগুলো স্কুল পড়ুয়া ছেলের কথা শুনে সামনে রিক্সা এসে থামতেও, রিক্সায় না উঠে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একদিন সকালে তপনানন্দ সেনের সঙ্গে খানিক কথা হয়েছিল। এমনিতে আমি কারো সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারি না। তবে কেউ কথা বললে আমি নাওয়াখাওয়া ভুলে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মারতে পারি।

তপনানন্দ সেনের পুরনো দিনের বাগানবাড়ি পার হয়ে আমাদের বাড়ি। একদিন ভোর বেলা প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দেখি কুয়াশা ভেজা জানুয়ারির সকালে পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর ফুল সোয়েটার পরা একজন লোক রাস্তার ধারের ঘাসে হাত বুলিয়ে কিছু খুঁজছে। শীতের সকালে কুয়াশাভেজা ঠান্ডা ঘাসে লোকটাকে হাত ঘষতে দেখে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু হারিয়েছেন না কি?"

আমার কথা শুনে তিনি মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। ফরসা গোল মুখ। একমাথা চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি। হাতে বড়ো পাউডারের কৌটোর মত একটা কৌটো। বললেন, "একটা স্ক্রু হারিয়ে গেছে।"

বললাম, "কী সাইজের? এই কুয়াশাভেজা ঘাসের মধ্যে খুঁজে পাবেন কি?"

ভদ্রলোক বললেন, "পেতেই হবে। ওটা চুলের মত সরু টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি স্ক্রু। প্রায় দশ বছর পরিশ্রম করে তৈরি করেছি।"



বলে সামনের পুরনো দিনের দোতলা বাড়িটার জেলখানার দরজার মত বিশাল লোহার দরজা ঠেলে খুলে ঢুকে গেলেন। গেটের বাইরে একটা কাঠের ফলক। তাতে বাড়ির মালিকের নাম লেখা। তপনানন্দ সেন। বৈজ্ঞানিক। আমি মনে মনে বললাম, লোকটার মাথার স্ক্রুটাই বোধহয় ঢিলে হয়ে পড়ে গেছে। দশ বছর ধরে চুলের মত সরু স্ক্রু বানিয়েছেন।

প্রায় তিন বিঘে জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মাঝখানে তপনানন্দের দোতলা বাড়ি। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায় তাতে দেখেছি বাড়ির কম্পাউন্ড ভর্তি ফুলের গাছ। একটি দারোয়ান ছাড়া, কোন লোকজন দেখিনি। তবে বেশ কয়েকটা ভয়ঙ্কর চেহারার কুকুর দরজার কাছে চুপচাপ বসে থাকে।

মাঝে মধ্যে বিশাল বড়ো বড়ো ঘুড়ি ওড়ে তপনানন্দের বাড়ি থেকে। কোনদিন ঘুড়ির মালিককে দেখিনি। তবে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তপনানন্দের ঘুড়ি উড়ে বেড়ায় আকাশ জুড়ে। আমারও ঘুড়ি ওড়ানোর শখ আছে, কিন্তু শত টেনে খেলেও অত দ্রুতগতিতে ঘুড়িকে ডাইনে- বাঁয়ে বা গোঁত্তা খাইয়ে নীচে নামাতে পারব না। শুনেছি বিদেশে নাকি বিদ্যুৎ-চালিত লাটাই বেড়িয়েছে। তাই দিয়ে বোধহয় লোকটা ঘুড়ি ওড়ায়। কেউ কোনদিন তপনানন্দের ঘুড়ির সাথে পাঞ্জা লড়তে যায়নি। কারণ ওর ঘুড়ির সুতোয় হদিশ কেউ করতে পারেনি।

পাড়ার বাচ্চারা, এমনকি বড়োরাও ওকে আড়ালে আবডালে বলে ঘোড়া বৈজ্ঞানিক পাগলা তপনানন্দ। ঘুড়ি থেকে ঘোড়া।

একদিন একটু বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরছিলাম। অমাবস্যার রাত। তায় লোডশেডিং, রিকশা থেকে নেমে প্রায় হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছি। তপনানন্দের পাঁচিলঘেরা বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মাথার উপর ফরফর আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে প্রায় রাস্তার উপর বসে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, প্রায় বিছানার চাদরের সাইজের একটা বিশাল ঘুড়ি, তপনানন্দের পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেল তাঁর বাড়ির ভেতরে। অন্ধকারে ভালো বুঝতে না পারলেও মনে হল ঘুড়ির আকৃতিটা অদ্ভুত। যেন একজন মানুষ বসে আছে ঘুড়ির ওপরে। একজন ঘুড়িপ্রেমী হিসেবে লোভও লাগল। চায়নার অনেক ঢাউস সাইজের ঘুড়ির ছবি দেখেছি। কিন্তু আমি এক-তা বা দো-তার বেশি

বড়ো সাইজের ঘুড়ি কোনদিন ওড়াইনি। তবে নিশ্চিন্ত হলাম। ঘুড়ির মালিক নিশ্চই বদ্ধ পাগল। না হলে কেউ রাতে ঘুড়ি ওড়ায়!

****

তপনানন্দ সেন, ঢোলা প্যান্ট আর লাল রং এর গেঞ্জি পরে এগিয়ে আসছেন রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে। হাতে একটা বড়ো কৌটো। নিজের মনে বিড় বিড় করে কী যেন বলছেন আর হাসছেন। এক্কেবারে হোঃ হোঃ করে অট্টহাসি। যাকে বলে বদ্ধ পাগল। ব্যারাকপুর স্টেশনে একটা লোককে রোজ দেখি। ঠিক এ'রকম করে নিজের সাথে কথা বলে, আর হোঃ হোঃ করে হাসে, আর লোকজনের সামনে গিয়ে হাত পেতে আকাশের দিকে চেয়ে বলে, "একটা টাকা দেবেন ভাত খাব।"

স্কুল পড়ুয়া ছেলেগুলোর একজন বলে উঠল, "চল পাগলাটাকে ক্ষ্যাপাই।"

পাগলদের কেউ পাগল বললে আমি সহ্য করতে পারি না। কারন পাগল মানে মানসিক ভারসাম্যহীন। এরা অসুস্থ।

আরও একটা খালি রিকশা এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াল, আর দেরি করলে স্টেশানে গিয়ে ট্রেন পাব না। তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি না এই ফাজিল ছেলে গুলো তপনানন্দকে কী করে!

তপনানন্দ কাছে আসতে ছেলেগুলো ঠিক তপনানন্দের মত করেই হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল। একটি ছেলে রাস্তা থেকে একটি পাথরের কুঁচি তুলে ছুঁড়ে মারল তপনানন্দের পিঠে। তবু তপনানন্দ সেন কিছু না বলেই বিড়বিড় করে হাঁটতে লাগলেন। একটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে গিয়ে তপনানন্দকে এমনভাবে পেছন থেকে ধাক্কা মারল যে, তিনি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন।

দুটো ছেলে গিয়ে তপনানন্দকে রাস্তা থেকে তুলে এমন ভাবে ওঁর শরীর থেকে ধুলো ঝাড়ার ভান করে, জামাকাপড় এমন টানাটানি করল যে, লাল গেঞ্জিটা ছিঁড়েই গেল। একজন আবার ভালোমানুষের মত মুখ করে বলল, "শুনলাম আপনি নাকি ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য নোবেল প্রাইজ পাবেন? ভুতুড়ে ঘুড়ি!"

তপনানন্দের যেন হাসির ঘোর লেগেছে। আবার হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে বলল, "পাবই তো! দেখ আমার ঘুড়ি। বলেই সবাইকে আবাক করে দিয়ে হাতের বড়ো পারফিউমের মত কৌটোটার ওপরের নবটা চাপ দিতেই, ভস্ ভস্ করে লাল ধোঁয়ার মত কী বেরোতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লাল ধোঁয়া জমাট বেঁধে, একটা বিছানার চাদরের মত বড়ো শক্তপোক্ত ধাতব লাল চকচকে পাতের মত হয়ে হাওয়ায় ভাসতে লাগল। তপনানন্দ হাতের বড়ো লম্বা কৌটটায় আবার চাপ দিতেই কৌটোর গা থেকে দুটো কব্জা বেরিয়ে এল। কব্জাদুটো ওই ভাসমান ধাতব চাদরের কাছে ধরতেই তা চুম্বকের মত লেগে গেল চাদরটার গায়ে।

চুম্বকের মত লেগে থাকা কৌটোটায় চাপ দিতে তা থেকে ইলেকট্রিক পাখার মত তিনটে ছোটো ছোটো পাখার ব্লেড বেরিয়ে এসে প্রবল গতিতে ঘুরতে লাগল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তপনানন্দকে নিয়ে চাদরটা ভাসতে ভাসতে দ্রুত আকাশের উঁচু থেকে আরও উঁচুতে নিঃশব্দে ঘুড়ির মত উঠে যেতে লাগল।

ছবিঃশিমুল



অদিতি ভট্টাচার্য্য

সিনেমাটা দেখে এসে অবধি সুপ্রকাশবাবু স্বস্তিতে নেই। সিনেমাটার প্রশংসা ইদানীং সকলের মুখেই শুনছিলেন, খবরের কাগজে, পত্রিকাতেও তার সমালোচনা পড়েছেন। সবাই একবাক্যে বলেছে দারুণ সিনেমা। এরকম সিনেমা কমই হয়, তাই সুযোগ পেলে অবশ্যই দেখা উচিত। সবারই। ছেলে বুড়ো - সব্বার। সিনেমাটার জনপ্রিয়তার কারণে হিন্দিতে ডাবিংও হয়েছে।

সুপ্রকাশবাবু এমনিতে শান্তশিষ্ট মানুষ, হুজুগে মাতেন না বললেই চলে। কিন্তু এবার কী হল কে জানে রবিবার চলে গেলেন সিনেমাটা দেখতে। ঝাড়া একটি ঘন্টা লাইন দিতে হল টিকিটের জন্যে। কী ভিড়! কিন্তু সিনেমাটা দেখে বুঝলেন এ সিনেমা ওঁর জন্যে নয়। মানে উনি না দেখলেই ভালো হত। সিনেমা চলাকালীন হল থেকে উঠে আসতে পারেননি এরপর কী হয় দেখি করে। তাছাড়া যে সিনেমার জন্যে এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছেন তা পুরো না দেখলে আর কী হল! কিন্তু সিনেমাটা দেখার পর থকেই যে এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে আছেন তা বেশ বুঝতে পারছেন। খেয়ে, বসে, ঘুরে, ঘুমিয়ে - কিছুতেই শান্তি নেই।

সুপ্রকাশ ধাড়া নেতাজিনগর বয়েজ হাই স্কুলের ইংরিজির মাস্টারমশাই। অনেককাল পড়াচ্ছেন এখানে। বয়স হয়েছে। আর মাত্র দু'বছর এক মাস নাকি আছে অবসরগ্রহণ করতে। মানুষটা অতি শান্ত, নিরীহ এবং নির্বিবাদী। সারা স্কুলে একটা ছেলেও ওঁকে এক ফোঁটাও ভয় পায় না। বরং উঁচু ক্লাসের ধেড়ে বদমাশগুলোকে উনিই সমঝে চলেন। ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারে কোনো গাফিলতি করেন না ঠিকই কিন্তু ওঁর গলার আওয়াজ মাঝে মধ্যেই পেছনের বেঞ্চের ছেলেদের গুলতানির আওয়াজে চাপা পড়ে যায়। বাধ্য হয়েই তখন কণ্ঠস্বর একটু চড়িয়ে "চুপ করো চুপ করো, কোয়ায়েট কোয়ায়েট" বলে বার দুই চেঁচান। সাময়িক কাজ হয় তাতে, তারপর আবার যে কে সেই। কিন্তু এর বেশি কিছু উনি করেও উঠতে পারেন না। জোর বকুনি দেওয়া বা চড়চাপড় মারা তো দূরের কথা।

প্রবল প্রতাপশালী হেডমাস্টারমশাই আর অঙ্কের কমলেশবাবু মাঝে মাঝে বলেন, "আর একটু কড়া হোন সুপ্রকাশদা। কিছু তো বলেন না আর এদিকে বাঁদরগুলো একেবারে মাথায় চড়ে বসছে।"

এ হেন শান্তশিষ্ট ইংরিজির মাস্টারমশাই সত্যিই দেখা যায় না। কিন্তু সুপ্রকাশবাবু এরকমই।

সিনেমা দেখে হল থেকে বেরিয়েই সুপ্রকাশবাবু বুঝলেন যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। লোকজনকেও সব বলিহারি বাবা! খালি বলে, "দারুণ সিনেমা, দুর্দান্ত!" ঠিক কী তা কেউ আর ভেঙে করে বলে না।

সুপ্রকাশবাবু দু চারজনকে চেপে ধরেছিলেন, "পুরো গল্পটা কী একটু খুলে বলুন তো।"

কিন্তু তাঁরা মোটে আমল দেননি, "তাহলে তো মজাই নষ্ট মশাই! এই তো ছায়াবাণীতে হচ্ছে, বাড়ির কাছেই তো, যান না রবিবার গিয়ে দেখে আসুন না!"

আর খবরের কাগজ বা পত্রিকার সিনেমা বোদ্ধারা যেসব সমালোচনা করেছেন তাঁরা তো আরো এক কাঠি ওপরে। গল্পের শুরুটা ভাসা ভাসা বলে খালি স্পেশাল এফেক্টস, লোকেশন এইসব হাবিজাবি বকেছেন আর কেউ দশে সাড়ে আট দিয়েছেন তো কেউ চারখানা তারা দিয়েছেন! যেন ক্লাস টেস্টের খাতা দেখা হচ্ছে! কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরেও বলেনি যে সিনেমাটাতে এই জিনিস আছে। একটু আভাস পেলে সুপ্রকাশবাবু জীবনে হলমুখো হতেন না। কক্ষণো না।

ইংরিজি সিনেমা। এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আর তাঁর পোষা দুই তাগড়াই কুকুর নিয়ে। ভদ্রমহিলা একাই এক প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকেন দুই পরিচারিকাকে নিয়ে। প্রভূত সম্পত্তির মালকিন এই বৃদ্ধা। তাঁর বইয়ের সংগ্রহও দেখার মতো। ওঁর আত্মীয় পরিজনদের ধারণা যা সম্পত্তির খবর তাঁরা জানেন তার থেকে ঢের বেশি আছে ওঁর। বাড়িটার আনাচে কানাচেও নাকি রহস্যের শেষ নেই। এর মধ্যে হঠাৎই একদিন মারা গেলেন বৃদ্ধা। একটা উইল পাওয়া গেল। কিন্তু তাতে বিশ্বাস করল না অনেকেই, গোলমাল শুরু হল। এর পরপর কুকুরদুটোও হঠাৎ করেই মারা গেল। ভদ্রমহিলা মারা যাওয়ার পর তো তারা বলতে গেলে অন্নজল ত্যাগ করেছিল। এরপরই শুরু আসল গল্প। ভদ্রমহিলার আসল উইল কী করে খুঁজে পাওয়া গেল, ওঁর মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না, সম্পত্তির লোভেই যে হত্যা করা হয়েছে, কে বা কারা সেই হত্যাকারী, ওঁর মহামূল্যবান পান্নার নেকলেসই বা কে চুরি করেছিল - এসব আস্তে আস্তে জানা গেল। আর এসবই বার করল ওই কুকুরদুটোর বিদেহী আত্মা। সোজা কথায় কুকুরদুটো ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাঘা বাঘা গোয়েন্দা, পুলিশ যার সমাধান করতে পারছিল না তা করল এরা!

এটাই সুপ্রকাশবাবুর অস্বস্তির কারণ। ভূতে বড়ো ভয় পান উনি। এই বয়সেও। সিনেমা তো মাত্র আড়াই ঘন্টার কিন্তু সুপ্রকাশবাবু ভুলতে পারলে তো? থেকে থেকেই কুকুরদুটোর চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কালো বিশালাকায়, চোখগুলো কীরকম যেন লালচে লালচে, রেগে যখন গজরায় মুখের ভেতরের ধারালো শ্বাদন্ত দেখা যায় - মনে পড়লেই শিউরে উঠছেন সুপ্রকাশবাবু।কী ভয়ংকর! লোকে যে একাধিকবার কী করে দেখছে তা তারাই জানে! রবিবার সিনেমা দেখে ফিরে আসা পর থেকে রাস্তার নেড়িগুলোকে অবধি সহ্য করতে পারছেন না সুপ্রকাশবাবু।



সোমবার সকালে দুটো রাস্তার কুকুর পাঁচিল টপকে সুপ্রকাশবাবুর উঠোনে ঢুকে পড়েছিল। তাতে সুপ্রকাশবাবু "তাড়া তাড়া, শিগগির তাড়া, এক্ষুণি তাড়া, লাঠি নিয়ে যা" করে এমন চেঁচামিচি শুরু করলেন যে ওঁর গৃহ পরিচারিকা বাসন্তী খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "এমন করছেন যেন বাড়িতে চোর ডাকাত ঢুকেছে! কুকুর দেখে দিনে দুপুরে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠছেন! কী হয়েছে আপনার কাকু?"

সুপ্রকাশবাবু তাড়াতাড়ি "কই কিছু হয়নি তো, কী আবার হবে। নোংরা করে রাখবে তাই তাড়িয়ে দিতে বলছি" বলে তখনকার মতো সামলে নিলেন বটে কিন্তু বেশ বুঝতে পারলেন গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢুকেছে দুটো রোগা প্যাংলা লোম ওঠা নেড়ি আর উনি মনশ্চক্ষে দেখছেন কালো দশাসই দুটো কুকুরকে। সোমবার স্কুলেও বেশ

অন্যমনস্ক ছিলেন। সবার চোখে সেটা ধরাও পড়ল। "কী হল সুপ্রকাশদা, কী এত ভাবছেন?" কমলেশবাবু তো জিজ্ঞেসই করলেন।

এইরকম করেই চলছিল। হয়তো আস্তে আস্তে ভয়টা কেটেও যেত। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধেয় যা হল তা আরো ভয়ংকর। সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে খাতা দেখছিলেন হঠাৎ ঘরের বাইরের জানলার কাছে কুকুরের ডাক। প্রথমে ঘেউ ঘেউ তারপর রাগে গজরানোর আওয়াজ। সুপ্রকাশবাবু এত চমকে উঠলেন যে হাত থেকে পেনটা মাটিতে পড়েই গেল। আবার কুকুর ঢুকেছে? কিন্তু এ ডাক তো রাস্তার নেড়ি কুকুরের ডাক নয়! এ একেবারে ভরাট আওয়াজ, পিলে চমকে যাওয়ার মতো! সুপ্রকাশবাবুর এক আত্মীয়র বাড়িতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল একটা, সে এরকম করে ডাকত। আর আর সম্প্রতি এরকম ডাক শুনেছেন ..... সুপ্রকাশবাবু শিউরে উঠলেন। চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল কুকুরদুটোর চেহারা।

ডাকটা থামল কিন্তু মিনিটখানেক পরে আবার শুরু হল। সুপ্রকাশবাবুর ঘরের পূব দিকের জানলাটার ঠিক বাইরেই ডাকছে। এক চিলতে জমি আছে ওখানে, তার মানে ওখানেই এসে ঢুকেছে কুকুর। কিন্তু এরকম কুকুর তো আর রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় না যে পাঁচিল টপকে এসে ঢুকবে? তাহলে? তার মানে ওই দুটোই? খাতা দেখা মাথায় উঠল। সুপ্রকাশবাবু ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন, খাটের ওপর সিঁটিয়ে বসে রইলেন।

কতক্ষণ যে এভাবে বসেছিলেন তা নিজেরই খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা টিকটিকির বেশ জোরে টিকটিক আওয়াজে নড়েচড়ে বসলেন। চোখ খুলে বিছানা থেকে উঠে অনেক সাহস সঞ্চয় করে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করতে করতেই শুনলেন আবার ডাকটা।

এখনও গরম তেমন পড়েনি। রাতে জানলা বন্ধ করে শুলেও পাখা লাগে না। জানলা বন্ধ করাতে তাই ঘুমের অসুবিধে হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সুপ্রকাশবাবু ঘুমোতে পারলেন না। খালি মনে হচ্ছে জানলার বাইরে কুকুর ওরকম গজরাচ্ছে কেন? কুড়ি বছর হয়ে গেল এ বাড়িতে বসবাস করছেন, কোনো দিন হয়নি, আজই হচ্ছে? সত্যিই কুকুর ঢুকেছে না অন্য কোন ব্যাপার? মানে যদি জ্যান্ত কুকুর না হয়? কিন্তু তারা ওঁর বাড়িতে আসবে কেন? অবশ্য এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে যার ব্যাখ্যা বুদ্ধিতে দেওয়া যায় না। জানলা বন্ধ, তাও সুপ্রকাশবাবুর মনে হল যেন উনি শুনতে পাচ্ছেন কুকুরের গজরানি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেই সুপ্রকাশবাবু ভাবতে লাগলেন কখনো কোনোদিন কোনো কুকুরের ওপর অত্যাচার করেছেন কীনা। মনে পড়ল। তখন নতুন এসেছেন এ বাড়িতে। একটা কুকুর খুব উপদ্রব করত। বাড়ির ভেতরেও ঢুকে আসত। একদিন বিরক্ত হয়ে একটা ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। নিখুঁত নিশানা। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে আর্তনাদ করে গেটের ফাঁক গলে পালিয়েছিল। আর আসেনি। সেই কি তবে? রাস্তার কুকুর, কখন কোনটা মরছে, কোনটা কোথায় যাচ্ছে - কে খেয়াল রাখে! মরে ভূত হয়ে সে যদি এখন আসে প্রতিশোধ নিতে? সুপ্রকাশবাবু ঘামতে লাগলেন।

সারারাত প্রায় জেগেই ছিলেন। ভোরের দিকে চোখ লেগে এসেছিল। উঠতে বেলা হয়ে গেল। স্কুলে আর গেলেন না। অনেক ছুটি জমা হয়ে আছে, একটা ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নিলেই হবে। হেডমাস্টারমশাইকে ফোন করে বললেন যে শরীরটা একেবারে জুতের নেই, স্কুলে আজ যেতে পারছেন না।

"সিজন চেঞ্জের সময়, ঠাণ্ডা গরমে সবার শরীর খারাপ হচ্ছে। নয়তো আপনার শরীর ভালো নেই - এ তো শোনাই যায় না। বিশ্রাম নিন," বললেন হেডমাস্টারমশাই।

তা সত্যি কথা। অসুখ বিসুখ সুপ্রকাশবাবুর ধারে কাছে বড়ো একটা ঘেঁষে না। স্কুলে ছুটিও খুব কমই নেন।

"কী যে হয়েছে, কেন যে শরীর ভালো লাগছে না সে তো আর আপনাকে বলা যায় না," নিজের মনেই বললেন সুপ্রকাশবাবু।

ততক্ষণে বাসন্তী এসে গেছে, কাজ করছে। বাইরে ঝকঝকে রোদ উঠেছে। সুপ্রকাশবাবু বাইরে এলেন। বোধহয় দিনের বেলা বলেই এইটুকু সাহস জোটাতে পেরেছেন। ঘরের ওপাশে এক ফালি জমি, তাতে গোটা তিনেক নারকোল গাছ আর চারটে সুপুরি গাছ সার দিয়ে লাগানো। কতটুকুই বা জায়গা! নাহ এখানে তো এখন কোনো কুকুর টুকুর নেই, অবশ্য রাতে ঢুকেছিল কিনা তা তো আর এখন বলা সম্ভব নয়।

ফিরে আসছেন এমন সময় আবার কুকুর ডেকে উঠল! সেই একরকম ডাক! কী গলা! কী আওয়াজ! পা চালিয়ে চলে আসার আগে কোনরকম একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সুপ্রকাশবাবু। নারকোল গাছের তলায় কিছু রয়েছে মনে হচ্ছে না? কালো কালো মতো? এক ঝলক দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল! সুপ্রকাশবাবু আর দেরি করলেন না, দুদ্দাড়িয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে বৈঠকখানার সোফার ওপর বসে পড়ে হাঁফাতে লাগলেন। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে ঘরে গেলেন।



বাসন্তী তখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, সব জানলাক'টা হাট করে খুলে দিয়েছে। সুপ্রকাশবাবু ঘরে পা দেওয়া মাত্রই আবার সেই ডাক, আবার সেই গজরানি।

সুপ্রকাশবাবু আঁতকে উঠলেন, কাঁপা কাঁপা গলায় বাসন্তীকে বললেন, "জানলা খুলেছিস কেন? বন্ধ কর, শিগগির বন্ধ কর। শুনতে পাচ্ছিস না কুকুর ডাকছে!"

বাসন্তী এক মনে ঝাঁট দিচ্ছিল। সুপ্রকাশবাবুর কথা শুনে কাজ থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, অবাক হয়ে বলল, "কুকুর ডাকছে তো কী হয়েছে? কুকুর বেড়াল তো কতই ডাকে, তাই বলে জানলা বন্ধ করবেন কেন?"

"বন্ধ কর, বন্ধ কর, শিগগির বন্ধ কর," দু হাতে কান চাপা দিয়ে সুপ্রকাশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুঝছিস না কেন ও কুকুর যে সে কুকুর নয়! ওরে বাবা! বন্ধ কর, ওরে বন্ধ কর জানলাগুলো।"

বাসন্তী কয়েক সেকেণ্ড হাঁ করে দেখল সুপ্রকাশবাবুকে, তারপর হাতের ঝাঁটাটা সজোরে মেঝেতে ফেলে জানলা বন্ধ করতে লাগল। সুপ্রকাশবাবু তখনও দু হাতে কান চাপা দিয়ে বসে আছেন।

"কী কুকুর ডাকছে বাবা কিছুই তো বুঝলাম না। কুকুর বেড়াল তো ডাকেই। কথাগুলোও কেমন যেন ঠেকছে। এই বুড়ো বয়সে মাথার গোলমাল হল কীনা কে জানে! একা মানুষ থাকে, এসব হলে দেখবে কে? তাছাড়া সত্যিই পাগল টাগল হয়ে গেলে আমাকেও কাজ ছাড়তে হবে, কী জানি কখন কী করে বসে! কিছু তো হয়েইছে নাহলে এরকম করছে কেন?" বাসন্তী ঝাঁট দিতে দিতে নিজের মনেই গজগজ করতে লাগল।

সারা দিন যে বাড়িতে কী করে কাটল সুপ্রকাশবাবুর, তা আর কহতব্য নয়। ছোটো বাড়ি, দুটি মাত্র ঘর। এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সব জানলা বন্ধ, তাও মনে হচ্ছে সে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। আর যখন শুনতে পাচ্ছেন না তখন ভয় করছে এই বুঝি ডাকল, এই বুঝি ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে শুতেও পারছেন না। কাউকে বলারও নেই। কে বিশ্বাস করবে? বাসন্তী কীরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওঁকে দেখছিল তা এত কিছুর মধ্যেও ওঁর চোখে পড়েছে। ওপাশের বাড়িতে কেউ থাকলে তারা হয়তো শুনতে পেত কিন্তু সে গুড়েও বালি। ও বাড়ির মিত্রবাবুরা সবাই মিলে বেড়াতে গেছেন। বাড়ি ফাঁকা।

সারা দিন, সারা সন্ধ্যে অন্য ঘরে কাটালেন। কিন্তু রাতে নিজের বিছানায় না শুলে ওঁর ঘুম হয় না। তাই আর উপায় না দেখে একখানা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লেন যাতে ওসব আওয়াজে ঘুম না ভাঙে। গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে সুপ্রকাশবাবু দেখলেন ওঁর ঘরের মধ্যে যেন কালো কালো বড়ো বড়ো দুটো কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"বাবু, বাবু, ও বাবু....."

কেউ ডাকছে?

সুপ্রকাশবাবু বেশ কষ্ট করে চোখ খুললেন। মাথার বালিশের পাছেই ছোটো টাইমপিসটা থাকে। পৌনে সাতটা নাজে। বাসন্তী তো এখন আসে না। তাহলে? কে এল?

সুপ্রকাশবাবু উঠে দরজা খুললেন। গোপাল। ওঁর ওই এক ফালি জমিটা পরিষ্কার করে রাখে, নারকোল, সুপুরি পেড়ে দেয়।

"কী হয়েছে গোপাল?"

"বাবু আমার ফোনটা হারিয়ে গেছে। পরশু....."

"এই তো কিনলে কিছু দিন আগে, এর মধ্যে হারিয়েও ফেললে! কোথায় হারিয়েছে? কোথাও ফেলে এসেছ নাকি দেখো। নাকি আবার নতুন কিনবে বলে....." সুপ্রকাশবাবু ভাবলেন নিশ্চয়ই সাহায্য চাইতে এসেছে।

"না না বাবু এখন ফোন কিনতে পারব না। মার অসুখ, হাসপাতালে ভর্তি করেছি, তাতেই কত খরচ! পরশু হারিয়েছে ফোনটা। তিনটে বাড়িতে কাজ করেছিলাম সেদিন। ওই দুই বাড়িতে খুঁজে দেখেছি নেই, আপনার বাড়িতে আর আসতেই পারিনি। মাকে নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছিলাম। আজ এলাম, দেখি একবার যদি থাকে," বলল গোপাল।

"বেশ তো দেখো বাগানে, যদি ফেলে যাও" বলে সুপ্রকাশবাবু ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন, গোপাল আবার ডাকল।

"বাবু বলছিলাম কী আমি তো দেখবই, আপনি যদি আপনার ফোন থেকে একটা ফোন করেন আমারটায়। বাজলে খুঁজতে সুবিধে হবে।"

"আচ্ছা দাঁড়াও নিয়ে আসছি আমার ফোন।"

সুপ্রকাশবাবুও বাগানেই এলেন ফোন নিয়ে। গোপালের নম্বরটা সেভ করা আছে, মাঝে মাঝেই তো দরকার হয়। ডায়াল করলেন নম্বরটা।

ঘেউ ঘেউ ঘেউ..... গররররর..... কুকুরের গজরানি। সুপ্রকাশবাবুর হাত থেকে ফোনটা পড়েই যাচ্ছিল আর একটু হলে। খুব জোর সামলেছেন।



ওদিকে গোপালের দন্ত বিকশিত, এক গাল হাসি, "এখেনেই ফেলে গেছি বাবু। আরেকবার বাজান না।"

সুপ্রকাশবাবু কিছু বলার বা বোঝার আগেই গোপাল প্রস্তুত হয়ে গেছে। তরতরিয়ে উঠে পড়ল দ্বিতীয় নারকোল গাছটাতে যেটা সুপ্রকাশবাবুর ঘরের পূবদিকের জানলাটার একেবারে সামনে। নেমেও এল একটু পরে। তরতরিয়ে নারকোল, সুপুরি গাছে উঠতে গোপালের জুড়ি নেই।

"পরশু সকালে এলাম না আপনার নারকোল গাছগুলোকে ছাড়াতে, পকেটে ফোন ছিল। গাছের ওপরে যখন তখনই একটা ফোন এসেছিল। টুক করে কথা বলে আর পকেটে পুরিনি, পাতার খাঁজে রেখে দিয়েছিলেম। তারপর এক্কেবারে ভুলে গেছি," বলল গোপাল, হাতে ফোনটা ধরা।

“তোমার ফোন নারকোল গাছের ওপরে ছিল? পড়ে যায়নি? আশ্চর্য তো!” সুপ্রকাশবাবু একেবারে থ।

কী মনে হতে গোপালের নম্বরটাই আবার ডায়াল করলেন। আবার সেই গজরানি।

“আমার ফোনের আওয়াজ বাবু,” গোপালের মুখে এখনও হাসি, হারা নিধি ফিরে পেয়ে।

“তোমার ফোনের এটা রিং টোন? এই কুকুরের ডাক?” সুপ্রকাশবাবু বেশ জোরেই বললেন।

“হ্যাঁ বাবু। ছেলে করে দিয়েছে। কী একটা নতুন সিনেমা এসেছে না, সবাই দেখতে যাচ্ছে? তাতে আছে। আমার বড়ো ছেলে কোত্থেকে পেয়ে আমার ফোনে করে দিয়েছে। ভালো হয়নি বাবু?”

“মোটেও ভালো হয়নি, খুবই খারাপ হয়েছে। কুকুরের ডাক কেউ রিং টোন করে! এর জন্যে কত কিছু হতে পারত তুমি জানো? এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে ছেলেকে বলবে রিং টোন পালটে দিতে। তুমি নিজে এসব পারো বলে তো মনে হয় না। অন্য কিছু দিতে বলবে, গান বাজনা টাজনা কিছু, বুঝলে? এসব কুকুরের ডাকটাক নয়,” সুপ্রকাশবাবু একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন, তারপর একটু নরম হয়ে বললেন, “কী যেন বেশ বলছিলে, মার অসুখ, অনেক খরচ হচ্ছে, একশটা টাকা নিয়ে যেও।”

ছবিঃ মৌসুমী



বৈশাখী ঠাকুর

আমার শিলিগুড়িতে পোস্টিং হচ্ছে শুনেই মনটা নেচে উঠেছিল। আসলে শিলিগুড়ির সাথে যে আমার নাড়ির টান! আমার জন্ম হয়েছিল শিলিগুড়ির ডাক্তার মিত্রর নার্সিং হোমে। শৈশব কেটেছে ঐ পাহাড়ের সমতলভূমিতে। যেদিন ওয়েদার ভাল থাকত সেদিন ঘরে বসেই আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেতাম। জানালা খুলেই মায়ের কাজ ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফাকীর্ণ শ্বেত-শুভ্র শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে কিনা লক্ষ করা। নজর করতে পারলেই উচ্ছ্বাসে- আবেগে চীৎকার করে উঠতেন। বাবা ভারী বিরক্ত হতেন। এমনিতেই শিলিগুড়িতে বেশ ঠান্ডার আমেজ।

"আহা রুমা , একটু ঘুমুতে দাও না! চিৎকার করছ কেন?"

"করব না! লোকে কত পয়সা খরচ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে আসে। আর আমরা ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছি। এ কি কম কথা নাকি!"

প্রায় উইক এন্ডে আমরা দার্জিলিং বা জলদাপাড়ায় পাড়ি দিতাম। পিকনিকে কালিঝোরা বা জয়ন্তিয়া পাহাড়। বড়ো সুন্দর সময় কেটেছে ওখানে। সোনালী দিনগুলোর কথা মনে করতেই মনটা অনাবিল আনন্দে ভরে গেল।

গত দশ বছরে যদিও শিলিগুড়ি দুর্দান্তভাবে উন্নতি করেছে তবুও আনাচকানাচ ঘুরে আমি আমার শৈশবের মণিমাণিক্যর খোঁজ অর্থাৎ সেই স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো ঠিক খুঁজে বার করব বলেই মনস্থ করলাম। ট্রেন থেকে নেমে তো কোম্পানির গেস্টহাউসেই ওঠার কথা। দিন পনেরর মধ্যে একটা বাড়ি ভাড়া দেখে নিতে পারব বলেই আমার আশা। একটা নামিদামি মশলার কোম্পানির অ্যাকাউন্টসের হেড করে আমাকে পাঠান হয়েছে শিলিওগুড়িতে। বি কম পাশ করার পরই এমন একটা চাকরির প্রস্তাব ঠেলে ফেলে দিতে পারিনি এই বাজারে। কলকাতায় ছ'মাস চাকরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আমি শিলিগুড়িতে পা রেখেছি।

এসে ইস্তক পুরনো স্মৃতি মনপ্রাণ ছেয়ে আছে। দার্জিলিং মেল-এ সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে চারপাশের বহুল পরিবর্তনটা ধরা পড়ল। ইট- কাঠ- পাথরের হাজার অদলবদল হলেও মানুষগুলো যেন সব আমার পরিচিত বলেই মনে হল। এমনই আকর্ষণ জন্মস্থানের!সবাই আমার আপজন! একটু ফ্রেশ হয়ে জলখাবার খেয়েই অফিসে দৌড়তে হয়েছে। প্রথম দিন আর বাচ্চাছেলে দেখে শিলিগুড়িতে ভারপ্রাপ্ত সুভাষদা আমাকে অব্যহতি দিয়েছেন, "যাও আজকে দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে রেস্ট নাও। কাল আবার এস। সেকেন্ড হাফে আর আসতে হবে না।"

আমি যৎপারানাস্তি আহ্লাদিত হয়ে ফিরে এসেছি। ভাল করে স্নান করে খেতে বসলাম। দেখলাম গেস্টহাউসের ঠাকুরের হাতের রান্নাটা বেশ ভালোই। ভাত, তেতোর ডাল, আলুপোস্ত আর রুইমাছের কালিয়া খেয়ে একটা পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা যা বাকি ছিল। ফের একটা জম্পেশ ঘুম। বিকেলে এমনি আর কোনও কাজ নেই। জরুরি কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে।

রোদ পড়লে ধীরে ধীরে বেরোলাম। হিলকার্ট রোডের ওপরেই আমাদের কোম্পানির গেস্টহাউস। সামনেই মণিহারী দোকান। জিনিসগুলো কিনে বড্ড মন হচ্ছিল আমার সেই ছোটবেলার পাড়া মানে হাকিমপাড়ায় যেতে। এমনিতেই তো আমাকে বাড়ি ভাড়া খুঁজতেই হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। রিকশা সওয়ার হয়ে চললাম চারদিক দেখতে দেখতে।

পাড়াটার মধ্যে ঢুকে দেখি আমার স্মৃতিশক্তি এখনও অটুট। সব কেমন ধীরে ধীরে মনে পড়ে যাচ্ছিল। এবার ডানদিকে বেঁকে নাকবরাবর গেলেই একটা মোড়মতন পড়বে। তার বাঁ হাতেই গ্রিন হাউস। আমরা তো ওখানেই ভাড়া থাকতাম।

আমি রিকশাওয়ালাকে নির্দেশ দিতেই সে আমায় সঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। আমার স্মৃতিশক্তিতে আমি নিজেই চমৎকৃত। আসলে জীবনের প্রথম দশটা বছর যে এখানেই কাটিয়েছি! শৈশব বলো বা বাল্যকাল বলো তা তো এই জল-হাওয়ার মধুর রেশে- সারা অঙ্গে তার গন্ধ মেখে- ধুলোবালি ঘেঁটেই তো বড়ো হওয়া! দেখেই মনটা ভাল হয়ে গেল।

আগের চেয়ে গ্রিন হাউসের কৌলীন্য ফিকে হয়েছে ঠিকই কিন্তু একদম মলিন হয়ে যায়নি। এই গ্রিন হাউস নাম নিয়েও এক কাহিনী আছে। আমি জন্মে ইস্তক মা বাবার সাথে এই বাড়িতেই থাকতাম একতলাটায়। সুবিমল স্যানাল অর্থাৎ যিনি এই বাড়ির মালিক ছিলেন, তাঁর স্ত্রী বন্দনাদেবী আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ভাবলাম খুব বেশিদিনের ব্যবধান তো নয়। একবার নক করে পরিচয় দিয়েই দেখি ওঁরা মনে রেখেছেন কিনা। নিঃসন্তান থাকার দরুন আমি ওঁদের অপত্য স্নেহের একমাত্র দাবিদার ছিলাম।

তো সেই স্নেহমমতার ভরসাতেই আমি দরজায় টোকা মারলাম। এক প্রৌঢ়া দরজা খুলে দিলেন। জেঠু-জেঠিমার নাম করাতে ভেতরে এসে বসতে বললেন। একতলার যে ঘরটায় বসলাম সেটা এককালে আমার বাসস্থান ছিল। কত স্মৃতি হুড়মুড়িয়ে চোখে ভিড় করে এল।

আমি ঠিক যেখানটায় বসেছিলাম, সেখানটায় আমারই আবদারে একটা অ্যাকোরিয়াম থাকতো। ব্ল্যাক অ্যাঞ্জেল, টাইগার সার্ক,সিলভার শার্ক, গোল্ডেন ফিশ ইত্যাদি শোভা পেত হরেক জলজ উদ্ভিদের সাথে। ভারী প্রিয় ছিল আমার সেটা। এই মাছগুলোর মত একটা বেড়ালও বড়ো প্রিয় ছিল। আমি নাম দিয়েছিলাম ভূতুড়ি। মিশমিশে কালো ছিল দেহটা। কেবল লেজ আর মুখটা সাদা। সাদাকালোর এমন মিশেল কিন্তু রাতের অন্ধকারে আমায় বেশ ভয় পাইয়ে দিত।

বেড়ালটা বেশ ন্যাওটা ছিল আমার। কেবল পায়ে পায়ে ম্যাও ম্যাও করে ঘুরে বেড়াত। রোজ মা ওকে দুধ ভাত মেখে দিত। চেটে পুটে সাফ করে খেত কি আনন্দ করে! খুব সভ্য ভদ্র বেড়াল নেহাত তাই কক্ষনো মাছটা বা ছানাটা অযাচিতভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে নিত না। বায়না করত মায়ের কাছে গিয়ে। লেজ তুলে ম্যাও ম্যাও করে মায়ের কাছে সে কী আবদার! মা কিংবা আমি নিজে হাতে খেতে দিলে তবেই সে মুখে তুলত।

"কে বলতো তুমি? ঠিক চিনতে পারলাম না তো!"

আমার স্মৃতি রোমন্থনে ছেদ পড়ল। বয়স্ক এক ভদ্রমহিলা এসে ঘরে প্রবেশ করেছেন।

"আমি জেঠিমা। ইন্দ্রাশিস চক্রবর্তী। এখানে ভাড়া থকতাম। আজ থেকে প্রায় দশ বারো বছর আগে। আমার বাবার নাম ছিল ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী।"

ততক্ষণে মায়াময় দুটো চোখে চেনার আভাস। অকৃত্রিম ভালবাসার সেই দৃষ্টি। ফোকলা দাঁতে এক চিলতে হাসি।

"কাছে আয়। কাছে আয়। আমাদের ইন্দ্র যে! কই দেখি কত বড়ো হয়েছিস।"

কাছে যেতেই বুকে জড়িয়ে নিলেন। তার পরের খানিকক্ষণ আবেগে উচ্ছ্বাসে কেটে গেল। জেঠুও এসে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা যে সত্যি আমাকে কাছে পেয়ে দারুন খুশি সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুড়ি তেলেভাজা সহযোগে চা পানও হল। ঘন্টাদুয়েক আড্ডায় কেবল সেই সব পুরনো দিনের কথা ফিরে ফিরে এল।

এবার উঠতে হবে। যাওয়ার আগে আমি কথাটা পেড়ে দেখলাম, "এ তলাটা তো দেখছি ফাঁকাই পড়ে আছে তোমাদের। আমি বাড়ি ভাড়া খুঁজছি। আবার একসঙ্গে থাকার সুযোগ হবে নাকি গো? "

জেঠিমা তো লাফিয়ে উঠলেন, "আয় আয় মানিক আমার। আজই চলে আয়। একা একা থাকতে ভাল লাগে না। আর তুই তো আমাদের নিজেদের লোক!"

হঠাৎ ভ্রু কুঞ্চিত করে জেঠু দাঁড়ালেন।

"কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা আছে। তোমাকে সাবধান করা দরকার।"

আমি ঘুরে তাকাতেই জেঠিমা পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমে পড়লেন, "ওরে ওর কথা তুই কানে নিস না। কেমন হয়ে গেছে একা থাকতে থাকতে। মানুষজন আর সহ্য হয় না।"

"কিন্তু বন্দনা, ওর জানা দরকার।"

"আহা! ও কি জানে না যে আমরা মাছ মাংস ডিম খাই না? ও বাচ্চা মানুষ। ও বেশি বেশি করে খাবে। ওপরে নিয়ে যাবে না। তাহলেই হবে। আর কোন সমস্যা থাকবে না। না রে মানিক আমার। তুই কালই চলে আয়। তুই তোর মত সবই খাবি। নিজের বাড়ি মনে করে গুছিয়ে নিয়ে থাকবি।"

কথাবার্তা কিঞ্চিত অসংলগ্ন লাগলেও প্রকাশ করলাম না। মনে হল বয়সের ভারে মানুষের তো কতরকম বিকারই তো হয়! জেঠু হয়তো এখন আর আমিষের গন্ধই সহ্য করতে পারেন না। নিরামিষাশী তো হয়েছেন বহুকাল। এই নিয়ে একটা মজার ব্যাপার আছে।

প্রথম আসার পর এই বাড়িটার নাম ছিল ইয়েলো হাউস। সারা বাড়ি হলুদ রং করা ছিল বলেই এমন নাম। তারপর আচমকা দীক্ষা নিয়ে জেঠু নিরামিষাশী হয়ে উঠলেন। হলেন যখন তখন একেবারে কট্টর নিরামিষাশী। পুঁইশাক পর্যন্ত ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে দেন না। অঢেল সবুজ গাছপালা পুঁতলেন। বাড়ির রং বদলে সবুজ করলেন। নতুন নামকরণ হল-গ্রিন হাউস।

আগে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরা পশুপাখিদের জন্যও খাবার নিয়ে আসতেন। সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কুকুরগুলো আর বাড়ির রোয়াকে শুত না। বেড়ালগুলো এ বাড়ি সে বাড়ি করে পাততাড়ি গোটাল। রয়ে গেল কেবল ভূতুড়ি- জেঠিমার আর আমার ভালবাসার টানে। কিন্তু কেবল নিরামিষ দুধে কি আর তার পোষায়! বড়ো হলে খিদেও বাড়ছিল। তাই সেও এদিক ওদিক খাবারের সন্ধানে যাওয়া শুরু করেছিল। কিন্তু জেঠিমা তো তাকে চোখে হারাতেন। খানিকক্ষণ দেখতে না পেলেই সন্তান হারানোর মত বিলাপ জুড়ে দিতেন। ঘরেই তাকে জানালার পাশে চেন দিয়ে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হল। এ'রকম কত কথা যে আমার মনে পড়ে যেতে লাগল!

ঠিক হল আমি পরদিনই গ্রিন হাউসে চলে আসছি। আবারও চিন্তান্বিত জেঠু বলে উঠলেন, "সব দিক ঠিক সামাল দিতে পারবে তো বন্দনা? ভাবনা চিন্তা করে ওকে আসতে বলছ তো? আমার কিন্তু বেশ চিন্তা হচ্ছে।"

"আঃ! তুমি থাম দেখিনি। দেখছিস তো কেমন হয়ে গেছে মানুষটা! সারাদিন ঘরের মধ্যে গুমরে গুমরে থেকে এই হাল হয়েছে। তুই চলে আয় দেখিনি। তবু মনে বল পাই। একটু অন্য কথা বলে প্রাণের সাধ মেটাই।"

প্রথম দিন এসে আমায় কোনওরকম অসুবিধেতে পড়তে হয়নি। ঘরদোর গুছিয়ে দেয়া থেকে খাওয়াদাওয়ার সমস্ত ভার জেঠিমা নিজে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। মায়ের মত এমন আদর যত্ন করে বিদেশ বিভুঁয়ে আর কে খাওয়াবে! আমিও নিশ্চিন্ত হলুম। ব্যাচেলার ছেলের আর কবে এ সব করতে ভাললাগে!

****

আরামের ঘুম ঘুমচ্ছিলাম রাত্রে হঠাৎ মনে হল জানালায় কিসের আওয়াজ। আমার খাটটা জানালার পাশেই। চোরছ্যাঁচড়ের উপদ্রবের জন্য জেঠিমা জানালা বন্ধ করে শুতে বলেছেন। আমিও বিনা বাক্যব্যায়ে মেনে নিয়েছে। অনেকদিন বাদে এসেছি। এখানকার হালচাল জানা নেই বিশেষ। আমার চেয়ে ওঁরাই জানবেন ভাল।

উঠে বসে বালিশের তলা থেকে টর্চ বের করে জানালায় ফেলতেই দেখলাম এক চারপেয়ে প্রাণীর ছায়া নিমেষে সরে গেল। এখানে খুব ভামের উপদ্রব আমায় বলেছিলেন সুভাষদা । তাই হবে হয়তো! আমি এই নিয়ে আর কারুর কাছে কিছু উচ্চবাচ্য করিনি। সামান্য ঘটনা।

প্রথম দফায় তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর প্রতিদিন এমন উপদ্রব শুরু হল। ইদানীং সাথে একটা গড়গড় আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি। ভীষণ রেগে আছে যেন। গত পরশু রাতে আমি পার্সেল নিয়ে এসেছিলাম। মাটন বিরিয়ানি আর চিকেন কষা। সেদিন জেঠিমাদের একটা নেমন্তন্ন ছিল। আমার জন্যও আলাদা করে রাঁধতে বারণ করেছিলাম। সেদিন জমিয়ে বিরিয়ানি সহযোগে ডিনারটা সেরে সবে শুতে গেছি। রাত বারোটা হবে তখন। আগাথা ক্রিস্টির স্পারক্লিং সায়ানাইড পড়তে পড়তে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল।

চোখটা প্রায় লেগে এসেছে যখন আচমকা আওাজটা শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মুখ ঘোরাতেই দেখি জানালায় সেই চারপেয়ে প্রাণীটা টিকটিকির মত জানালার কাচ বেয়ে উঠছে। আমি টর্চটা হাতে নিয়ে ছিটকিনিটা খুলতে গেলাম। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেটা একটা বিশাল লাফ দিয়ে জামরুল গাছটায় চলে গেল। তার সাথে একটা হালকা শিসের শব্দ শুনতে পেলাম।

কাঠবেড়ালী? লেজটা ওরকমই লোমশ মনে হল। টিকটিকির তো আর যাই হোক এত বড়ো কলেবর নয়। বাঁদরও নয় তাহলে অমন লোমশ লেজ হত না! মুখায়বয়ব যতটুকু কাচে ধরা পড়েছিল ঐ হালকা আলোয় দুটো কান আর গোল মুখ বুঝতে পেরেছিলাম। তবে কী ওটা? এমনিতে এবারে এসে জামরুল গাছটায় একটাও কাঠবেড়ালি দেখতে পাইনি। ছোটবেলায় জামরুল গাছটা মুখর থাকত ঐ ছোট্ট প্রাণীগুলোর অদ্ভুত ভাষায়।

অথচ দিনের বেলা কোথাও কোনও সমস্যা নেই। এমনি দিনে তো অফিস থাকে। ছুটির দিনেও কোণ সমস্যা দেঝি না। শান্তিপ্রিয় এলাকা। নিরামিষ সুস্বাদু রান্না রোজই জেঠিমার হাতের পাই। দুপুরে ক্যান্টিনে আমিষ খাই। কোনও অসুবিধে হয় না।

সেদিন শখ জাগলো একটু চিকেনে হাত পাকাব। মা নিজে হাতে গুছিয়ে আমায় সব সরঞ্জাম দিয়ে দিয়েছেন। ইন্ডাকশান ওভেন থেকে বাসনপত্র সবই আছে আমার। বাড়ির সামনে একটা মুর্গীর দোকান আছে। সেখানে গিয়ে পাঁচশো গ্রাম মুর্গীর অর্ডার দিলাম। আমাকে দেখেই লোকটা বলল, "ওহো! মাসিমা আজকে আপনাকে পাঠিয়েছে। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসতাম।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "আপনার বোধ হয় ভুল হচ্ছে।"

"আরে আপনিই গ্রিন হাউসে নতুন ভাড়া এসেছেন তো একতলায়।"

"হ্যাঁ কিন্তু...।"

"আরে যান না মশাই। আমি ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে আসব। ওঁরা আমার রোজের খদ্দের।"

কথাটায় কেমন খটকা লাগল। তবে ভাবনাচিন্তার বেশি অবকাশ পেলাম না। আমার মোবাইলটা বেজে উঠল দুর্দান্ত ঝঙ্কারে। রিসিভ করে দেখি আমার মাসতুতো ভাই টোটা। দার্জিলিং বেড়াতে এসেছিল। মায়ের মুখে শুনেছ আমি শিলিগুড়িতে আছি। তা ফেরার পথে দু'চারদিন আমার কাছে থেকে যাবে।

আমার তো মেঘ না চাইতেই জল। টোটা আর আমি প্রায় সমবয়সী। ও আমার থেকে মাসছয়েকের ছোট। তাই ও ভাই কম বন্ধু বেশি। ওর সাথে আমার জমেও খুব।

জমিয়ে চিকেন রান্না করলাম। মোড়ের মাথায় রুটি কিনতে গিয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে ঢুকলাম।তখন রাত নটা মতন বাজে। তাই আর জলখাবারের ব্যবস্থা না করে সটানে রুটি আর চিকেন কষা দিয়ে ডিনার সারলাম।তাড়াতাড়ি পেটপুজো হলেও আড্ডা মারতে মারতে সেই একটা দেড়টা বেজেই গেল।

বিছানা করে শুয়েছি কি না শুয়েছি সেই অদ্ভুত প্রাণীর অদ্ভুত আওয়াজ শুরু হল। আমি জানালার দিকে টোটার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে টর্চ হাতে ও বেড়িয়ে এল। ফের সেই হালকা শিসের সুর। সেই প্রাণীটাও কালবিলম্ব না করে তার লম্বা পা ফেলে জামরুল গাছটায় গিয়ে উঠল। ওর বিদায় নেবার এটাই সিগন্যাল।

টোটা চিরকালই অদম্য সাহসী। সে টর্চের আলো ফেলল জামরুল গাছটার দিকে। কিছু ডালপাতা নড়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। আর সেই মুহূর্তেই জেঠিমা দোতলার বারান্দায় বেড়িয়ে এসে চেঁচাতে লাগলেন, "কে কে ? কে ওখানে আলো ফেলছে? কে ? কী ব্যাপার?"

আমি বেরিয়ে এসে বললাম, "আমি জেঠিমা, ইন্দ্র।"

"এত রাতে কী করছ বাগানে? আর তোমার সাথে ওটা কে?"



“আমার মাসতুতো ভাই টোটা।”

“কই ও আসবে আগে বলনি তো! কী করছ কী তোমরা রাতবিরেতে? এটা ভদ্রলোকের পাড়া। যাও ভেতরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়।”

আমরা ভেতরে গেলাম আর শুয়েও পড়লাম। জেঠিমার ব্যবহারটা একটু বেশিই রূঢ় মনে হল! আর ব্যাপারটা যে ঠিক কী ঘটল তা নিয়ে মন থেকে খচখচানিটা গেল না।

পরের দু’দিন কোনোরকম উপদ্রব হয়নি। জেঠিমা টোটাকেও দু’বেলা খাওয়াতে লাগলেন। কৃতজ্ঞতার ভারে নুয়ে পড়ে আমরা জেঠিমার জয়গান গাইতে লাগলাম।

তা সেদিন খেতে বসে আচমকাই টোটা কথাটা বলল, "জেঠিমা ইন্দ্র তো সারাদিন অফিসে থাকে। আমি তো বসে বসে বোর হই। আমি একটু আপনার ছাদ-বাগান এইসব একটু ঘুরে দেখতে পারি।"

এক লহমায় অমন স্নেহশীলা মহিলার গলার স্বর বদলে গেল, "খবরদার না। একদম না। তাছাড়া আমার ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই।"

থতমত খেলেও আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "আগে তো ছিল। আমি তো কত উঠেছি ছাদে!"

"এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

বলে ইশারা করলেন যে দিকটায় সেদিকে দেখে খেয়াল করলাম, সত্যিই তো! এ যে পুরো কংক্রিটের গাঁথনি! সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাবার রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তারপর মুহূর্তের মধ্যে জেঠিমা আবার যে কে সেই, "-বোর তো হবেই। বাচ্চা ছেলে! সারাক্ষণ কি আর বুড়োবুড়ির কাছে ভাললাগে! তা একটু সিনেমা দেখে আসতে পার তো! কত মল আছে এখানে! কত অ্যামিউজমেন্ট পার্ক!

টোটার মাথা থেকে কিন্তু ভূত নামেনি। ও তক্কে তক্কে আছে। আমার থেকে বারবার সব ঘটনা শুনে মনে হয়েছে এ প্রাণী মাংসতে আকৃষ্ট। অনেক দূরের এক বাজার থেকে ফের চিকেন নিয়ে এসে নিজেই রান্না করেছে টোটা। সে ইচ্ছে করেই দু'কিলো মাংস রেঁধেছে যাতে দুজনে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ার পরও পড়ে থাকে।

রাত তখন ক'টা হবে কে জানে! অচমকা বাসনকোসনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। রিফ্লেক্স অ্যাকশানের মত টোটা মোবাইলের আলোটা জ্বালল। অবাক হয়ে দেখলাম বড়োসড়ো বেড়ালের শরীরে কে যেন লম্বা লম্বা পায়ের জোগান দিয়েছে। আমি ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "ঢুকল কী করে?

"তুই ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি দরজা খুলে দিয়ে এসেছিলাম ইচ্ছে করে।"

প্রাণীটা রাগত স্বরে অদ্ভুত ভাবে গজরাচ্ছিল। টোটা মোবাইলের ক্যামেরা ফ্ল্যাশ করে একটা ছবি তুলে নিল। যেমনি চোখে আলো পড়েছে ওমনি বাঘের মত দাঁত-মুখ খিচিয়ে আক্রমণের জন্যও উদ্যত হল সে তার লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে। আমিও টর্চটা দিয়ে মুখে মেরেছি তাক করে। চোখে আলো পড়তেই থতমত খেয়ে সে একটা 'ম্যাও' শব্দ করে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে সেই শিসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তার খানিক বাদেই মেয়েদের গলার একটা তীব্র চিৎকার শুনলাম। আমি যাবার উদ্যোগ নিতেই টোটা আমায় আটকাল।

গোটা রাতটা যেন ঝড় বয়ে গেল। একটু থিতু হয়ে আমি টোটার কাছে মোবাইলে তোলা ছবিটা দেখতে চাইলাম। হিংস্র বাঘের ছোটখাটো একটা সংস্করণ। কিন্তু ডান চোখের তলায় ওটা কিসের কাটা দাগ? ফের স্মৃতির আলপথ বেয়ে কিছু কথা মনে পড়ে গেল।

শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে আসার দিনতিনেক আগের ঘটনা। আমার তখন কত বয়স হবে? দশ! আমি একটা গাড়ি নিয়ে মন দিয়ে খেলা করছিলাম। আচমকা একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি অ্যাকোরিয়ামটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে আর ভূতুড়ি সেখান থেকে একটা মাছ নিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। মাথাটা তড়াক করে গরম হয়ে গেল আমার। আমার প্রিয় মাছগুলোর এমন পরিণতি আমি যেন ভাবতেই পারছিলাম না। দিলাম হাতে থাকা মজবুত হট উইলস গাড়িটা তাক করে ছুঁড়ে। লাগবি তো লাগ একেবারে ওর ডান চোখের তলায় গিয়ে লাগল সেটা। কেটে গলগল করে রক্ত পড়ছিল তবু শিকার সে ছাড়ল না। মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে দেখে বলল, "বেড়ালটা ধীরে ধীরে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সেদিন দেখলকাম জামরুল গাছটায় উঠে কেমন চুপিসারে ওঁত পেতে বসে একটা কাঠবেড়ালিকে ধরল। আবার সেদিন একটা চড়াই পাখিও মুখে নিয়ে ছুটতে দেখলাম।"

"মানুষ পেটের চিন্তায় চুরি-চামারি-জচ্চুরি কী না করছে! আর পশুরা করলেই দোষ। বাবা বলেছিল কথাগুলো।

আমি সবিস্তারে সব বললাম টোটাকে। ও চিন্তিত মুখে বলল, "এ যে ভূতুড়ি তাতে কোনও সন্দেহ নেই তাই তো?"

"কাটা দাগটা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভূতুড়ি একদম স্বাভাবিক বেড়াল ছিল।

"কিন্তু জেঠিমা যে ওকে কোথাও যেতে দিতেন না বললি! জানালার কাছে চেন দিয়ে বেঁধে রাখতেন। ওর সব চাহিদা মিটবে কোথা থেকে? এখন বুঝতে পারছি কেন রোজদিন চিকেনের প্রয়োজন পড়ে গ্রিন

হাউসে! কিন্তু পরাধীনতায় কে থাকিতে চায় হে ? কে থাকিতে চায়? তাই রাতের বেলা ওকে ছেড়ে দিতেই হত।"

"কী বলতে চাইছিস বলতো তুই?"

"ও জানালার কাছে বাঁধা থাকত। আর জানালার কাছেই তো জামরুল গাছটা। সেখান থেকে কাঠবেড়ালিগুলোকে টার্গেট করার চেষ্টা করত। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে হয়তো পাগুলো বড়ো বড়ো হয়ে গেছিল ওর। আর গ্রিন হাউসে খাবার অভাব ওকে মাংসাশী করে তুলেছিল। ফলে ঐ দাঁতের আকৃতিও ধীরে ধীরে বদলে যায়। ডারুইন সাহেবের মতবাদ মনে আছে তো? সারভাইভ্যাল অফ দ্যা ফিটেস্ট। স্পিশিস হুজ ইন্ডিভিজুয়ালস আর বেস্ট অ্যাডাপ্টেড সারভাইভ; আদারস বিকাম এক্সটিঙ্কট।

"কিন্তু এক জীবনে? সম্ভব?"

"সম্ভবত একটা আকস্মিক মিউটেশান। বেঁচে থাকবার তীব্র তাড়নায় জেনেটিক বদল। অথবা তোর সেই ছোটোবেলায় ওকে করা আঘাতটাও তার জন্য দায়ী হতে পারে। কে জানে! প্রকৃতির অনেক রহস্যই তো এখনো আমাদের অজানা। তবে কারণটা যাই হোক, আসল কথা হল, এই খাদ্যাভাব তো দিনে দিনে প্রকট হবে। জাঙ্ক ফুড, ইটিং আউট, রেডি টু কুকের জাঁতাকলে তো স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস এমনিই হাঁসফাঁস করছে। তায় আবার কৌটো বন্দি এখনকার বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি। খাবার খুঁজতে যাবে কোথায় এই প্রাণীগুলো!

"অতঃপর ব্রাদার বিবর্তন। নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যও যা যা প্রয়োজন হবে প্রকৃতি ঠিক সময়ে ঠিক সেটা গড়ে দেবে। বিবর্তনের ফলে নতুন প্রজন্মের বেড়াল এমন হবে না তাই বা কে বলতে পারে!"

সেই রাতে দু চোখের পাতা আমরা এক করতে পারিনি। এমন একটা অভিনব ঘটনা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু সে রাতেই জেঠিমাকে নিয়ে ছুটতে হল নার্সিং হোমে। জেঠুর বয়স হয়ে যাওয়াতে আমরাই ছোটাছুটি করলাম। অভূক্ত এবং আহত অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ফলে সামনে জেঠিমাকে পেয়ে তার ওপরই মোক্ষম আক্রমণ চালিয়েছে ভূতুড়ি। অবস্থা সঙ্গিন।

পরদিন ভোরবেলা বাড়ি ফিরে আরও বাজে খবরটা পেলাম। ভূতুড়িও প্রাণত্যাগ করেছে। এবং জেঠূ তাকে দূরে কোথাও কবর পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন।

এ এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ইচ্ছে ছিল কোনরকমে ধরে তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোনও জুলজিস্টকে বা বিজ্ঞানীকে দেখাব। কিন্তু সে আর হল না।

"ও এমনিও আর বেশিদিন বাঁচত না।"

"কেন?" টোটার এই কোথায় আমি উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলাম।

"তুই যখন শিলিগুড়ি ছেড়েছিলি তখন ওর বয়স বছরখানেক ছিল। তোর প্রায় এগার-বারো বছর পর আবার এখানে আগমন। বেড়ালেরা খুব যত্নে থাকলে ঐ বারো থেকে চোদ্দ বছর বাঁচে। এর বেশি না।"

"তা সেই কবরটা কোথায় আমরা খোঁজ করতে পারি না!"

"থাক না! দুটো বয়স্ক মানুষের সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে।"

কথাটা শুনে আমারও বুকটা কেমন টনটন করে উঠল। সন্তানহারার শোক পাচ্ছেন জেঠিমা আর জেঠু । কোথাও একটা অপরাধবোধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আমি না এলে হয়ত এতকিছু ঘটতই না!

ছবিঃ শিমুল



পেঁয়াজের খোসা ছড়াতে ছাড়াতে মিতুমাসি বলল, “আর কিছু না, খেদ একটাই। ভূত কখনও দেখলাম না।”

মা মন দিয়ে মাছের চপ ভাজছিল। মাসির কথা শুনে হেসে ফেলল, “কী যে বল, ভুত দেখনি। যেন, রাক্ষস খোক্ষস দত্যিদানো সব দেখেছ!”

বাটনা বাটতে বাটতে সবিতাদি মুখ খুলল, “ভূত আছে গো! সেবার আমি যখন মাঝরাত্তিরে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলাম, ওম্মা গো! আমার পাশ দিয়ে একটা কী যেন...বেঁটে মত...”

মা থামিয়ে দিল, “আঃ, তাড়াতাড়ি করো সবিতা, লোকজন চলে আসবে তো!”

আলোচনাটা বেশিক্ষণ চলতে পারল না। নিমন্ত্রিতরা আধঘন্টার মধ্যে চলে আসবেন। গরম গরম লুচি ভাজতে হবে। কাজেই ভূতের প্রসঙ্গ উপস্থিত থমকাল। আসলে এই মেঘলা দিন, ঝোড়ো হাওয়া, সব মিলিয়ে ভূত ভূত গন্ধ ছড়াচ্ছিল। বুলুর জন্মদিনটা বরাবর বৃষ্টি, নয়তো মেঘলা থাকে। শ্রাবনে জন্ম কিনা! বুলু বলল, “এমন দিনেই খিচুড়ি খেতে হয়।”

"তা হয়। তবে যেতিস জলপাইগুড়িতে, তবে বুঝতিস কী আনন্দ বর্ষায় । তার সঙ্গে ভূতের গল্প। তবে গল্পই, সত্যি ভূত আর দেখলাম কোথায়!" মিতুমাসি দুঃখ করে।

"মা, তুমি ভুত দেখেছিলে না?" বুলু উৎসাহে কাছে ঘেঁষে আসে।

"আমি? ও, ওটা ? বুঝলে দিদি, সেবার বুলু ওর বাবার সঙ্গে শোভাবাজারে পুজো দেখতে গেছে। বাড়িতে আমি একা। ওদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে জানালা খুলে দেখতে গেছি ওরা এল কিনা। ওমা, দেখি একটা লোক। ঝাঁকড়া মাথা। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তো ভয়ে ... বুঝতেই পারছ! সাহস করে কে রে -কে রে, করে বারান্দার আলো জ্বেলে দেখি সুপুরি গাছটা।"

"তাহলে আমার কথা বলি," মিতুমাসি গুছিয়ে বসেন, "আমার বাড়ির পাশে যে গলিটা, সেখানে মোটাসোটা একটা লোক হিন্দিতে গান গাইছিল। লালুরাম যেই না বলেছে - এই, কোন হ্যায় রে তুই? ওমা, কোথায় কী? কেউ নেই কোত্থাও! এ কথা শুনে কত দিন তো দাঁড়ালাম গলির সামনে। ধুর! কিচ্ছু নেই। তাছড়া বিরবিটি পুল বলে একটা পুল আছে, শুনেছি ,গভীর রাতে একটা মেয়ে ছুটে এসে জলে ঝাঁপ দেয়। নাকি ঝপাং করে শব্দও হয়। কে জানে সত্যি না মিথ্যে!" মাসি চোখদুটো মোছে। ভুত না দেখতে পাওয়ার দুঃখ, নাকি পেঁয়াজের ঝাঁঝ? ভাবে বুলু। ওর মনটা খারাপ হয়ও। কে ওরা? কেন এদের মনে এত দুঃখ?

"বুলু, নতুন জামা পরে নাও," মা ডাকছিল।

"বুলু, তোমার ফ্রেন্ডরা এসে গেছে," বাবার গলা পেল বুলু।

এরপর তো অন্য জগত। সেখানে ভূত বলে কিছু নেই। আছে কেবল বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। টেবিলটেনিসের তুখোড় খেলুড়ে জয়, ক্লাসের ফার্স্ট বয় শাক্য, গায়ক মৃদু, নিলাজ, দারুণ আঁকিয়ে গহন, ... সবাই ক্যারম আর গেমে মেতে উঠল। এরপর খাওয়াদাওয়া। সোমকাকা, ডাক্তার আঙ্কেল, সঙ্কামনি, পিসি, দিদু, রাজনদা, হাসছে, খাচ্ছে, গল্প করছে। মা জোর করে মাংস প্লেটে তুলে দিতেই রাজনদা মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলে উঠল, "ডিও না, ডিও না, আর পাব্বনা।"

দিপু কাকিমা এতগুলো মিষ্টি খেল! সোমকাকা "এক পিস মাংস-" বলেও প্লেট ভরে নিলেন। সোনামাসি "আজকাল আর খেতে পারি না" বলে দুবার লুচি নিল।

দশটা বাজতেই বাড়ি ফাঁকা। বৃষ্টিটাও ধরেছে। মা ঘরদোর গোছাতে গোছাতে বলল, "যা বুলু, খাওয়াটা বেশি হয়েছে। বারান্দায় পায়চারি কর।

বাবা বলল, "হ্যাঁ। খাওয়ার পর হাঁটা ভালো। সাহেবদের একটা কথা আছে জানিস? আফটার লাঞ্চ রেস্ট আ হোয়াইল, আফটার ডিনার ওয়াক আ মাইল।"

বাহ্! বেশ তো কথাটা! বাবার মত বড় হলে ও কি সব কথা জানতে পারবে?

"কেন জানবিনা? আরে, জানতে জানতেই তো বড় হয় মানুষ! বড় থেকে বুড়ো," মিতুমাসি আরাম করে চেয়ারে বসল। বসতেই চেয়ারটা 'ও মাগো' বলে উঠল। স্পষ্ট শুনল বুলু। আসলে মিতুমাসির ওয়েট খুব বেশি। মা বলছিল বাবাকে, "কত বলি, মিতুদি দূরে নাহয় না-ই গেলে। পাড়ার স্লিমিং পয়েন্ট নামের জিমে তো যেতে পার! শরীরে মেদ থাকা মোটেই ভাল নয়। অসুখ করে। মিতুদি শুনবে? বলে কিনা-'ওকথা বলিস না। জিমে গেলেই খাওয়া বন্ধ। বাঁচবো কী করে?'"

আজ বুলু নিজের চোখে দেখেছে কী পরিমাণ খেল মিতুমাসি। যাক বাবা। এসব শুনলে মা আবার বকবে- "ছিঃ বুলু, কারও খাওয়ার সময় নজর দিতে নেই।"

বুলু বোঝে না মানুষ দু'রকম কথা বলে কেন! মিতুমাসির ওয়েট লস হওয়াই তো উচিত।

"নজর দিলে শরীর শুকিয়ে যায়," বলছিল রিকির দিদু। সেদিন রিকির বেড়াল চিনি যখন মাছ ভাত খাচ্ছিল, রিকিদের কাজের মাসি কড়কড় গলায় বলেছে, "বাপরে বাপ! কেমন টাউ টাউ করে খাচ্ছে দেখ!" তখন রিকির দিদু গোমড়া মুখ করে বলেছিল, "ওভাবে বলবে না কলামনি, ওতে নজর লাগে। চিনি রোগা হয়ে যাবে তো!"

আজ একটু আগেই বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘ ডেকে টেকে পরে কী বৃষ্টি ! বাড়ির পেছনের বাগানে নিশ্চয় জল জমে গেছে। ব্যাঙ ডাকছে। ঠিক ওদের পাড়ার নার্সারি স্কুলের নাম ধরে ডাকছে -কিডস কেন! কিডস কিড

কিড কিডস কেন! বৃষ্টির ছাঁট আসছিল বলে জানালা বন্ধ করে রেখেছে মা। কাচের জানালার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেমন নিঝুম নিঃসীম বাগানটা! এতক্ষণ বাড়িতে লোকজন ছিল, বাড়ি ভরে ছিল আলোতে, কথায়। এখন ঝট করে থমকে গেল সব। পৃথিবীর ঘূর্ণন থেমে গেছে যেন। কেবল বাসনপত্রের ঘ্যাচ্যাং খাচাক আওয়াজ। কেউ অনেক বাসন নাড়াচাড়া করছে। মনে হয় সবিতাদি।

বাড়ির সামনের রাস্তাতে জল জমে আছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে অল্প আলো আসছে। এই অস্পষ্ট আলোতে ভয় ভয় করছিল বুলুর। চারদিক বড় রহস্যময়। কিছু নেই অথচ কেমন যেন ছায়া ছায়া, ভুতুড়ে। বারান্দায় আলো ছায়ার কারিকুরি। চাঁদ বড্ড ফ্যাকাশে। মেঘের ছায়া গায়ে মেখে কেমন অন্যরকম চেহারা হয়েছে চাঁদের। মাঝেমাঝে কালো মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে চাঁদ। তখন চারপাশ অন -ধ -কা-র! ভয় ভয়! ফের মেঘমাখা চাঁদ আবছা!

দ্রুত হাঁটছিল বুলু। অনেকটা দূরে চলে এসেছে বাড়ি থেকে। এই ছায়া ছায়া আলোতে গাছগুলোর নীচ দিয়ে যেতে যেতে কেমন কেমন লাগছিল ওর। ক্লাস এইটে পড়ে, ভয় কীসের? আসলে সেই মোটাসোটা অবাঙালি ভূতের গল্প, সেই মেয়েটার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া... শিরশির করছিল মেরুদন্ডটা। চুলের গোড়ায় কার যেন ঠান্ডা আঙুল। বুলু সোজা হাঁটে। সোজা হেঁটে বাড়ির বারান্দায় উঠবে ও। ভয় কীসের?

চারপাশ বড় নিস্তব্ধ। কেবল বহুদূর থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে। আজ কি কোনও উৎসব? আর ঠিক এই সময়, ঝাউগাছের গোড়া ঘেঁষে একতাল কালো কালো অন্ধকার টুকরো টুকরো হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বুলুর চিৎকারটা পেটের ভেতরে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছিল । গলা খুলে বাইরে আসতে পারছিলনা ।

রোগা কালো কালো, মেঘমাখা শরীরে সরু সরু লম্বা হাতপাগুলো নড়বড় করতে করতে এগিয়ে আসছে। কে? কে? বুলু অজ্ঞান হচ্ছে না কেন? একটা নয়, দুটো নয়, ঝাউগাছের পেছন থেকে, ভ্যাটের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে টুকরো টুকরো অন্ধকার, জ্বলজ্বলে চোখ...

এক মুহূর্তের জন্য সাহস ফিরে পেল বুলু। সব শক্তি জোটবদ্ধ করে বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

ক্যাঁ ক্যাঁ করে একটা রাতজাগা পাখি উড়ে যায়। সেই অসীম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কেঁপে ওঠে বুলু। ছায়া ছায়া অন্ধকারগুলো আর এগিয়ে আসছে না। বুলুর থেকে হাত পাঁচ- ছয় দূরে অন্ধকারের টুকরোগুলো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কে হেঁচে উঠল। চ্যাঁ চ্যাঁ করে বলল, "আমরা ব্রিজের নীচের বস্তির ছেলে।"

আবার রক্ত বইছে শরীরে। পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়ায় বুলু। গাঢ় শ্বাস নেয়। চারদিকে বড় শান্তি , বড় আনন্দ ।

"কী চাই?"

"তোমাদের আজ খুব খানাপিনা হয়েছে। লুচির গন্ধ! ফেলানি ছড়ানি আছে?"

সর্দিতে নাক বন্ধ। বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগিয়েছে ঠিক। কারো উদোম গা। তেল সাবানহীন শরীর থেকে বোঁটকা গন্ধ বের হচ্ছে। বুলু আঙুল তুলে দেখাল, "ওইখানে দাঁড়া।"

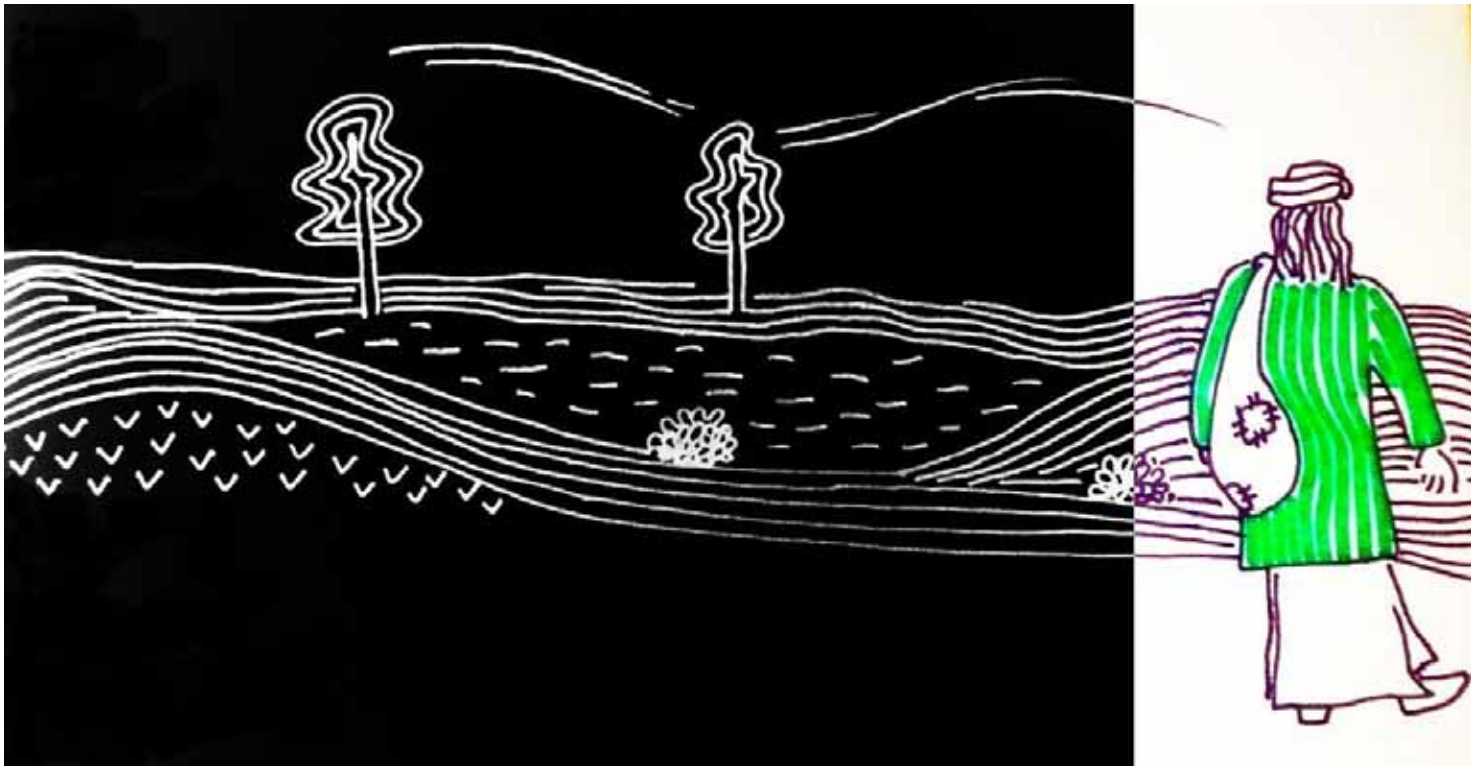
পেছন দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলো বুলু। কিচেন ফাঁকা। সবিতাদি এখনও বাইরে কলপাড়ে বাসন মাজছে। একটা বড়ো খবরের কাগজের ওপর খাবারগুলো ডাঁই করল বুলু। লুচি, মাংস, চপ, মিষ্টি...সব। তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। কেউ এসে বাধা দেওয়ার আগেই যা করার করতে হবে।

আবার আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসছে। ছায়া শরীরগুলো নাচতে নাচতে চলে গেছে যেদিকে, বুলু কখনও ওইদিকে যায়নি। কোনওদিনও না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরল বুলু। মিতুমাসিকে একটা নতুন খবর দিতে হবে। ভূত দেখেছে বুলু। জ্যান্ত ভূত। সত্যিকারের। অথচ ভয় নয়, কষ্ট হচ্ছে ...

ছবিঃ দেবজ্যোতি

বাঁশিওয়ালা



তরুণকুমার সরখেল

খুব বড়ো একটা মাঠ। মাঠের এখানে ওখানে ছোটো ছোটো ঝোপ। আর ঝোপের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলা রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে অলস পায়ে হেঁটে চলেছে লোকটি। কাঁধে তার লম্বা ঝোলা। হাতে একটা বাঁশি। অভ্যাসমতো বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে সে। বেশ কিছুদূর গিয়ে লোকটি একটা শিরিষ গাছ দেখতে পেল। গাছের ছায়ায় বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে কাঁধের ঝোলাটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। আর তখনই সে দেখতে পেল ছোট্ট ছেলেটিকে।

গাছের নীচে একটা পলিথিন বিছিয়ে লোকটি বসে পড়ল। তারপর বাঁশিটা পকেটে রেখে ছেলেটিকে কাছে ডাকল।

"এই যে খোকাবাবু, কী নাম তোমার ? একা একা কী করছো এখানে ?"

ছেলেটি কাছে এসে বলল, "আমার নাম ঋক। আমাদের গ্রামেই তো তুমি এইমাত্র খেলা দেখিয়ে এলে। খুব ভালো খেলা দেখাও তুমি। তুমি কি জাদুকর?"

লোকটি এবার ঋককে ডেকে পাশে বসাল। তারপর কাঁচা পাকা দাড়িতে হাত চালাতে চালাতে বলল, "না খোকাবাবু। আমি জাদুকর নই। জাদুকর হতে গেলে বিদ্যেবুদ্ধি লাগে যে। আমার তো তা নেই। তবে বাঁশি বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে। বাঁশি বাজানোর সময় আর কোনদিকে খেয়াল থাকে না। এই যে তুমি এতটা পথ আমার পিছন পিছন চলে এলে, বুঝতেই পারিনি।"

ঋক বলল, "আমার কিন্তু জাদুর খেলা খুব ভালো লাগে। ঐ যে তুমি টাকার খেলাটা দেখালে ওটা আমাকে শিখিয়ে দেবে ? আমিও তাহলে বন্ধুদের খেলাটা দেখিয়ে অবাক করে দিতে পারব।"

"কোন খেলাটা?"

"ঐ যে টুপির মধ্যে এক টাকার একটি কয়েন ফেলে এক মুঠো টাকা তুলে আনলে, ওইটা।

জাদুকর বলল, "সব খেলাগুলোর মধ্যেই হাতের কায়দা থাকে। ওগুলো শিখিয়ে দিলে আর মজা থাকবে না খোকাবাবু।"

ঋক বলল, "একটা খেলা অন্তত শিখিয়ে দাও। তাহলে আমি বন্ধুদের দেখাতে পারব।"

“আচ্ছা আচ্ছা, শিখিয়ে দেব। তার আগে আমি একটু বাঁশি বাজিয়ে নিই। দেখো আমার বাঁশি তোমার খুব ভালো লাগবে। শিরিষ গাছের ছায়ায় বসলে মন ভালো হয়ে যায়। আর মন ভালো হলেই আমার বাঁশি বাজাতে ইচ্ছে করে।”

জাদুকর একমনে বাঁশি বাজাতে লাগল। ঋক চুপটি করে বসে রইল পাশে। এমন সময় দূরে একটা হইচই শোনা গেল। ঋক তাকিয়ে দেখল তাদের গ্রামের লোকজন লাঠি হাতে এদিকেই ছুটে আসছে। জাদুকরের অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই। সে চোখ বন্ধ করে একমনে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

গ্রামের লোকজন মারমুখী হয়ে অনেকটা কাছে চলে এসেছে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে ঋক জাদুকরকে ডাকল। অবশ্য লোকজনের চিৎকার ততক্ষণে তারও কানে পৌঁছেছে। সে বাঁশি থামিয়ে ঋককে বলল, “খোকাবাবু এবার আমি যাই। এই বলে তড়িঘড়ি ঝোলাটা কাঁধে ফেলে কাঁকুরে মাঠ ধরে ছুটতে শুরু করল।”

(২)

জাদুকরের কী অপরাধ ঋক তা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। লোকজন সব লাঠি উঁচিয়ে জাদুকরের পিছন পিছন গিয়ে ঠিক তাকে ধরে ফেলল। তারপর কিল-চড়-ঘুঁষি মারতে মারতে বলল, “আমাদের গ্রাম থেকে ছেলে ধরে নিয়ে যাস্, এত সাহস। ছেলেধরাদের কী শাস্তি দিই সেটাই এবার দেখাচ্ছি।”

ঋক বুঝল জাদুকরকে এরা ছেলেধরা ভেবেছে। অবশ্য এ জন্য ও নিজেই দায়ী। ঋক যদি একা জাদুকরের পিছনে পিছনে এতদূর না আসত তাহলে কেউ তো জাদুকরকে সন্দেহ করত না। এই ভরদুপুরে একা একা তার চলে আসা মোটেই ঠিক হয়নি। তার জন্যই লোকটা এমনভাবে মার খাচ্ছে।

ঋক ছুটে গেল জাদুকরের কাছে। তবে তার কাছে যেতে পারল না। লোকজন সব ভিড় করে আছে আর সমানে লাথি-ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছে। তার কথা কারো কানেই পৌঁছাল না। চোখে জল এল ঋকের। একটু আগেই যে লোকটা গাছের ছায়ায় বসে মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাচ্ছিল সেই এখন মরতে বসেছে।

অনেক চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে ঢুকে লোকটির অনেক কাছাকাছি চলে এল ঋক। দু-একটা কিল থাপ্পড় তাকেও খেতে হল। মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে জাদুকরের। সেই রক্ত কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে এসে ময়লা আলখাল্লা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ঋক সে দৃশ্য আর দেখতে পারল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। উত্তেজিত গ্রামবাসী তখনো রাগে ফুঁসছে। এরকম ছেলেধরাদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা তাদের জানা আছে।

শিরিষ গাছের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে লোকটিকে। মাথা থেকে এখনো একটু একটু করে রক্ত গড়াচ্ছে। পোশাক ভিজে যাচ্ছে। কাঁধের ঝোলাটা ছিটকে পড়েছে কোনদিকে। ম্যাজিক দেখানোর হাবিজাবি জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে মাঠময়। গ্রাম থেকে আরো লোকজন আসছে। পাশের গ্রাম থেকেও দু-একজন আসতে শুরু করেছে। এরকম একজন ছেলেধরাকে চাক্ষুস দেখতে চায় সকলে।

গ্রামবাসীদের বহু কষ্টে আটকেছে ঋক। লোকটা যে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসেনি সে কথা মানতে রাজি নয় কেউ। ভরদুপুরে লোকটা ছোটো ছোটো ছেলেদের উপর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে। তারপর বাঁশি বাজিয়ে পেছনে পেছনে নিয়ে আসে। একসময় ফাঁকা মাঠে এসে ঝোলায় ভরে ফেলে, এ তাদের জানা কথা। তাছাড়া লোকটাকে বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসতেও দেখেছে দু-একজন। তারাই গ্রামে গিয়ে ছেলেধরার খবরটা দেয়।

মাঠ জুড়ে জটলা পাকিয়ে ছেলেধরা বিষয়ে বিস্তর গল্প চলতে লাগল। তারপর একসময় শিরিষ গাছের পাতায় বিকেলের আলো ঝরে পড়ল। ক্লান্ত পাখির দল এসে বসল গাছের ডালে। তাদের কিচির মিচির ডাক শোনা যেতে লাগল। লোকজন সব গ্রামে ফিরে গেল। তারা ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ দিতে দিতে ঋককেও সঙ্গে নিয়ে গেল। শুধু ফাঁকা মাঠে পড়ে রইল জাদুকর আর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া তার সাধের বাঁশি।

সূর্য একসময় সব আলো মুছে, শিরিষ গাছের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের দেশে পাড়ি দিল।

ছবিঃ অংশুমান



ভেবলি ভালো আছে

তাপস মৌলিক

ভালো নাম বাবলি। দাদু ডাকেন ভেবলি। ভ্যাবলাকান্ত থেকে ভেবলি।

আর একটা কারণ আছে। ভেবলির যখন কথা ফুটল, সে মা, বাবা, গাগা এসব কিছুই বলল না। তার মুখে শুধু লি লি। খুশিতে লি লি, খিদে পেলেও লি লি, এমনকি কাঁদলও লি লি করে। দাদু বললেন, "আমার নাতনি বাংলার বিলুপ্তপ্রায় স্বরবর্ণ ৯ কে ফিরিয়ে এনেছে।" নাম দিলেন ভেব৯।

ছেলেকে ডেকে বললেন, "বাসু দেখিস, ওর ভালো নামেও যেন ৯ থাকে।"

বাবা তাই মেয়ের নাম রাখলেন বাব৯। লেখার সময় অবশ্য বাবলি-ই লেখেন। আর মা তো আরও ছোট করে নিয়েছেন, স্রেফ লিলি ডাকেন।

পাঁচ বছর বয়সে মেয়ে একটু একটু কথা বলতে শিখল। টানা একটা বাক্য নয়, কিছু কিছু শব্দ। তবে খুশি হলে, রেগে গেলে বা দুঃখ পেলে তখনও তার মুখে কেবল লি লি।

ছ'বছর বয়সে ভেবলিকে একটা স্পেশাল স্কুলে ভর্তি করা হল।

আসলে ভেবলি একটু অন্যরকম, আর পাঁচটা স্বাভাবিক বাচ্চার মতো নয়। জন্ম থেকেই ওর একটা অসুখ আছে। অসুখটার ইংরিজি নাম ডাউন সিনড্রোম। জিনগত এ অসুখে বাচ্চার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সাধারণ বাচ্চাদের থেকে দেরিতে হয়, বড় হয়েও তারা অধিকাংশ সময় মনের দিক থেকে ছেলেমানুষই থেকে যায়। জিনের ভেতর 'ক্রোমোজোম ২১' নামের একটা ক্রোমোজোম দুটোর বদলে তিনটে থাকলেই এই বিপত্তি। ব্রিটিশ ডাক্তার জন ল্যাংডন ডাউন-এর নামে অসুখটার নাম হয়েছে ডাউন সিনড্রোম।

অন্যরকম হলেও ভেবলিকে দেখতে খুব মিষ্টি। মোটাসোটা গোলগাল ফরসা চেহারা, নাকটা বোঁচা, কানদুটো ছোট ছোট, হাত-পাগুলোও ছোট ছোট, আর জিভটা বেশ লম্বা। প্রায় সময়েই সে মুখ হাঁ করে থাকে, জিভটা অল্প বার করে রাখে। সর্বদা হাসিখুশি ভেবলি জন্ম থেকেই দাদুর আদরের নাতনি, বাবা-মায়ের চোখের মণি।

ভেবলি অবশ্য ঠাকুর্দা, মানে দাদুর কাছে থাকত না। দাদু-ঠাম্মা থাকতেন গ্রামের বাড়িতে, হুগলীর গুপ্তিপাড়ার কাছে, আর বাবা-মায়ের সঙ্গে ভেবলি ছিল দিল্লির পাশে গাজিয়াবাদে। তার বাবা দিল্লিতে চাকরি করতেন; সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পাশ করে একটা নির্মাণ সংস্থায় কাজ পেয়েছিলেন তিনি।

ভেবলি দেরিতে হামাগুড়ি দিতে শিখল, হাঁটতেও শিখল দেরিতে, অনেক দেরিতে আধো আধো কথা বলতে শিখল, তবে তাইতে ওর বাবা-মায়ের কোনও সমস্যা ছিল না। আপনমনে খোশমেজাজে থাকা ভেবলিকে নিয়ে সুখেই ছিলেন তাঁরা।

ঝামেলা শুরু হল ভেবলিকে স্কুলে ভর্তি করার সময়। সাধারণ কোনও স্কুল ভেবলিকে কিছুতেই ভর্তি করতে চাইল না। এই ধরনের বাচ্চাকে ভর্তি করার মত বন্দোবস্ত নাকি তাদের নেই। ভেবলির তো একজন সহকারী লাগবে! তাকে বাথরুমে নিয়ে যেতে হবে, টিফিন খাইয়ে দিতে হবে, ব্যাগ গুছিয়ে দিতে হবে - এরকম স্পেশাল অ্যাটেন্ড্যান্ট সেসব স্কুলে নেই। তাছাড়া, আলাদা করে, মানে ভেবলি যাতে বুঝতে পারে সেরকম করে পড়াশুনো বুঝিয়ে দেওয়ার সময়ও তাদের দিদিমণিদের নেই। কোনও কোনও স্কুল বলল, ভেবলিকে ভর্তি করলে অন্য স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা আপত্তি করবেন। ভেবলির বাবা অনেক তর্ক করলেন, সরকারি আইন অনুযায়ী সব স্কুলে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে। কিছুতেই কিছু হল না।

শেষমেশ বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে দিল্লির একটা স্পেশাল স্কুলে ভেবলিকে ভর্তি করা হল। মানসিক প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের সেখানে বিশেষভাবে পড়ানো হয়, সবসময় দেখাশুনো করার জন্য প্রত্যেক ক্লাসে তিন-চারজন আয়া রয়েছে, পড়ানোর পদ্ধতিও ভেবলির মতো ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেই তৈরি। দূরে হলেও স্কুলটার নিজেদের বাস আছে, ভেবলিকে তারা বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে, ফের বাড়ি পৌঁছে দেবে। তবে খরচা অনেক, স্কুলের মাইনে প্রচুর। ভেবলির বাবা বিরাট কিছু রোজগার করেন না। তাও আদরের মেয়ের মুখ চেয়ে কষ্টেসৃষ্টে ম্যানেজ করে নিলেন।

প্রথম প্রথম স্কুলে যাবার সময় ভেবলি খুব কাঁদত, মা'কে ছেড়ে যেতে চাইত না। কিছুদিন মা সঙ্গে গেলেন, সারাক্ষণ স্কুলে বসে রইলেন। একটু একটু করে অভ্যেস হয়ে গেল ভেবলির। সে অক্ষর চিনল, পড়তে শিখল, তারপর দু'বছরের মাথায় একদিন ট্যারাব্যাকা করে স্লেটের ওপর নিজের নাম লিখে ফেলল। বাবা-মায়ের আনন্দ আর ধরে না। হবে না? মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য তাঁরাও তো স্কুলের দেওয়া নির্দেশ মেনে বাড়িতে যতটা সম্ভব করেছেন।

এরপরই হল আসল মুশকিল। ভেবলির বাবার হঠাৎ বদলির নির্দেশ এল, অবিলম্বে যেতে হবে মধ্যপ্রদেশের সাতপুরায়। তাঁর কোম্পানি সাতপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের কিছু নির্মাণকাজ পেয়েছে। সেখানে সাইটে থাকতে হবে, তাই ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

ভেবলির মা রুমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি বাংলার মফস্বল শহরের মেয়ে, সাদামাটা নিরীহ ভালোমানুষ। দিল্লির মতো জায়গায় মেয়েকে নিয়ে একা একা থাকা, ভেবলিকে সামলানো আর রান্নাবান্নার সঙ্গে সঙ্গে বাজারহাট দোকানপাট করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ভেবলি যে স্পেশাল স্কুলে পড়ে সেরকম স্কুল তো সবজায়গায় নেই! কলকাতায় কিছু আছে। সেখানকার কিছু বড়ো বড়ো নামকরা স্কুলে স্বাভাবিক বাচ্চাদের সঙ্গে ভেবলির মতো ছেলেমেয়েদেরও ভর্তি করা যায়, যদিও সে সব স্কুলে খরচা অনেক। কিন্তু কলকাতাতেও রুমার একই সমস্যা। একা একা কোথায় থাকবেন? কী করে থাকবেন? রুমার বাপের বাড়িতেও কেউ নেই। তাঁর বাবা, মানে ভেবলির দাদামশাই মারা গেছেন, বৃদ্ধা মা দিদির কাছে আসানসোলে থাকেন। ভেবলিকে নিয়ে দিদির সংসারে তো আর ওঠা যায় না!

সব শুনে ভেবলির দাদু ছেলেকে ফোনে বললেন, "এতে এত চিন্তার কী আছে? ভেবলি আমার কাছে থাকবে। রুমা আর ভেবলিকে এখানে রেখে যা।"

"কিন্তু বাবা, ভেবলি তো এখানে একটা স্পেশাল স্কুলে পড়ে। সেরকম স্কুল তো ওখানে নেই।"

"ও আমাদের গ্রামের স্কুলেই পড়বে, তুই যেখানে পড়েছিস। এখানকার সবাই আমাদের চেনা। কোনও অসুবিধে হবে না।"

ভেবলির বাবা-মায়ের হাতে বিকল্প কিছু ছিল না। তাই একদিন দুপুরবেলা, ভেবলি আর তার বাবা-মাকে নিয়ে একটা ভ্যান-রিক্সা গ্রামের ছায়াঘন পথ দিয়ে এসে থামল জয়চন্ডীতলায়, তাদের গ্রামের বাড়ির উঠোনের সামনে। মেয়ে আর তার মাকে রেখে বাবা পরদিনই ফিরে গেলেন কাজে।

ভেবলিকে পেয়ে দাদু-ঠাম্মা দারুণ খুশি। ফাঁকা বাড়িতে বুড়ো-বুড়ির নিরালা সংসারে সময় কাটত না তাঁদের। নাতনির সঙ্গে সারাদিন খেলার ফাঁকে ফাঁকে দাদু তো নতুন উদ্যমে তাকে বাংলা শেখাতে শুরু করলেন। তিনি গুপ্তিপাড়া

টাউনের এক স্কুলে বাংলার শিক্ষক ছিলেন, অবসরের অনেকদিন পর ফের পড়ানোর সুযোগ পেলেন। দিল্লির স্পেশাল স্কুলে ভেবলি ইংরিজিতে পড়ছিল, গ্রামের স্কুলে ভর্তি হলে তো বাংলায় পড়তে হবে তাকে।

গ্রামের বাড়ির খোলামেলা জায়গা, কৃষ্ণচূড়া ফুলের ঝরা পাপড়িতে রঙিন হয়ে থাকা উঠোন, সবুজ গাছপালার ঠাণ্ডা ছায়া, মাটির দাওয়া, পুকুরের হাঁস এসব দেখে ভেবলিরও আনন্দ আর ধরে না যেন! গাজিয়াবাদে ছোট্ট দু'কামরার ভাড়া ফ্ল্যাটে সে ছিল বন্দী, সামনেই বড়ো রাস্তা, বাইরে বেরোনো মানা। এখানে সে টলমল পায়ে একা একাই উঠোনে দাওয়ায় খেলে বেড়ায়।

হাসি নেই শুধু ভেবলির মায়ের মুখে। মেয়ের পড়াশুনো নিয়ে তার দুশ্চিন্তা। দিল্লির স্কুলে ব্যাপারটা সুন্দর এগোচ্ছিল। হঠাৎ এভাবে সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রুমা মুষড়ে পড়েছেন। দাদু ব্যাপারটা বুঝলেন। একদিন বললেন, "অত চিন্তা কোর না বৌমা। সামনের সপ্তাহেই ভেবলিকে স্কুলে ভর্তি করে দেব, সবে দেড় মাস সেশন শুরু হয়েছে। এখানে তো ওসব স্পেশাল স্কুল-টুল নেই, সবাই সাধারণ স্কুলেই পড়ে। এ পাড়ারই একটি ছেলে আছে, বাসুর চেয়ে বছর দশেকের বড়ো, জন্ম থেকেই বোবা-কালা। সেও গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেই পড়েছে, তারপর টাউনে আমার হাই স্কুলে ভর্তি হল। অন্য স্বাভাবিক ছেলেদের সঙ্গেই পড়ত, দিব্যি মাধ্যমিক পাস করে গেল, দু-তিন বছর হয়ত বেশি লেগেছে। এখন সে কালনার বাজারে কাপড়ের দোকান দিয়েছে, বিয়ে-থা করেছে, দিব্যি আছে।"

"কিন্তু বাবা, ভেবলি তো সব কাজ নিজে নিজে পারে না। ওকে খাইয়ে দিতে হয়, বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়, চেয়ারে তুলে বসিয়ে দিতে হয়, বইপত্র এদিকওদিক ছড়িয়ে ফেলে। দিল্লির স্কুলে এর জন্য স্পেশাল অ্যাটেন্ড্যান্ট ছিল, তারাই সব করে দিত।"

"ওতে কোনও অসুবিধে হবে না। প্রাইমারি স্কুলের দিদিমণিরা সবাই আমার চেনা, দু'জন এই গ্রামেরই মেয়ে, ওদের বলে দেব। তাছাড়া, দিল্লির স্কুলে ভেবলির সঙ্গে যারা পড়ত তারা সবাই ওরই মতো, সবারই কিছু না কিছু মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে। এখানে ভেবলি স্বাভাবিক বাচ্চাদের সঙ্গে পড়বে, তাদের সঙ্গে খেলবে, এতে ওর মানসিক বিকাশ তাড়াতাড়ি হবে। কালনা শহরের ডাক্তার সুধীরবাবু আমার পরিচিত, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনিও তাই বললেন। মাঝে মাঝে এসে তিনি ভেবলিকে দেখেও যাবেন বলেছেন।"

অতএব, ভেবলির যখন প্রায় ন'বছর বয়স, তখন গ্রামের শৈলবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করে দেওয়া হল। সকালে স্কুল, দাদু সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ক্লাসটিচার পাড়ার মেয়ে বাণী দিদিমণিকে বলে দিলেন, "বাণী, তুই তো জানিস আমার নাতনিটা একটু ন্যালাক্যাবলা, একটু দেখিস।"

বাণী দিদিমণি ভেবলিকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে গিয়ে বললেন, "শোনো সবাই, এই দিদিটা আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে পড়বে। একে সবাই দেখে দেখে রাখবে তোমরা।"

টিফিনের সময় দাদু আবার এসে নাতনিকে দেখে গেলেন, স্কুল ছুটি হলে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। উৎকণ্ঠিত রুমা অধীর অপেক্ষায় বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মেয়েকে পেয়েই জড়িয়ে ধরলেন।

প্রতিদিনই দাদু ভেবলিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন, টিফিন টাইমে ফের একবার দেখে যান, ছুটির পরে বাড়ি নিয়ে যান।

পাঁচ-ছ'দিন এরকম চলার পর একদিন রুমা দেখলেন, স্কুলের টিফিনের সময় হয়ে গেছে, ওদিকে শ্বশুরমশাই তখনও একমনে খবরের কাগজ পড়ে চলেছেন। তাঁর যেন স্কুলে যাবার কোনও গরজই নেই। এ গাঁয়ের রাস্তাঘাটের সঙ্গে রুমা তেমন সড়গড় নন। নইলে বুড়ো মানুষটাকে রোজ তিনবার স্কুলে না পাঠিয়ে তিনি নিজেও দু'একবার যেতে পারেন। তাছাড়া শ্বশুরমশাই নিজে থেকেই ভেবলিকে দিয়ে আসা নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই নিজে যাবার কথা রুমা ভাবেনওনি। একটু ইতস্তত করে বললেন, "বাবা, স্কুলে যাবেন না? টিফিন টাইম হয়ে গেছে কিন্তু।"

দাদু কাগজ থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, "একেবারে ছুটির সময় গিয়ে নিয়ে আসব। তুমি চিন্তা কোর না বৌমা, ভেবলি ঠিক আছে।"

শ্বশুরবাড়িতে রুমা বেশিদিন থাকেননি; তাঁর জড়তা তখনও পুরো কাটেনি। দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আমতা আমতা করে বললেন, "না মানে... মেয়েটা খেলো কিনা ঠিকঠাক..."

দাদু রুমার উদ্বেগটা বুঝলেন। কাগজ রেখে উঠে তাড়াতাড়ি পাজামার ওপর একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে নিয়ে বললেন, "চলো যাই দেখেই আসি, তুমিও চলো আমার সঙ্গে, স্কুলটা দেখে আসবে।"

নিচু পাঁচিলঘেরা কম্পাউন্ডের ছোট্ট গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে স্কুলের একতলা বিল্ডিং, টানা বারান্দার পেছনে সারি দিয়ে ক্লাসঘর, টিচার্স রুম; ডানদিকে ঘাসে ঢাকা ছোট একটা খেলার মাঠ। মাঠের তিনদিকে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে কয়েকটা গাছ, দুটো সুপুরি, একটা কাঠমালতী, একটা বকুল।



দূর থেকেই বাচ্চাদের হৈ-হুল্লোড়, চীৎকার-চ্যাঁচামেচির আওয়াজ কানে আসছিল, বোঝা যাচ্ছিল টিফিন টাইম চলছে। ভেতরে ঢুকে বারান্দায় উঠে ভেবলির দাদু আর মা দেখলেন, মাঠে তুমুল খেলাধুলো চলছে। সব ক্লাসের ছেলেমেয়েরাই মাঠে নেমে পড়েছে, একদিকে এক্কাদোক্কার ঘর কাটা, একদিকে ছোঁয়াছুঁয়ি চলছে, আরেকপাশে লেমম্যান খেলা। কারও কোনওদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই।

কিন্তু ভেবলি কোথায়? আছে, সেও আছে। বারান্দার সামনেই মাঠের একপাশে একটু ছায়ার নিচে দুটো চেয়ার মুখোমুখি রাখা হয়েছে। তার একটায় বারান্দার দিকে পিঠ, মাঠের দিকে মুখ করে বসে আছে ভেবলি। দুটো মেয়ে, ভেবলির থেকে বয়েসে ছোট, হয়ত ওর ক্লাসেই পড়ে, ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন টানটান করে ভেবলির চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, আরেকজন বিনুনি বেঁধে দিচ্ছে। ভেবলির সামনের চেয়ারটাতে রাখা আছে ওর টিফিন বাক্সটা, খোলা; আছে জলের বোতলটাও। ঠাম্মা আজ টিফিনে একটু সুজি করে পাঠিয়েছিলেন। ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতে খেলতে একেকবার একেকটা মেয়ে ছুট্টে এসে ভেবলিকে এক চামচ করে সুজি খাইয়ে দিচ্ছে, তারপর চেয়ারের পেছনে ঝোলানো একটা কাপড় দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিয়েই একদৌড়ে ফের খেলায় ফিরে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে একসঙ্গে দু'জনও চলে আসছে, একজন সুজি খাইয়ে দেওয়ার পর আরেকজন ওয়াটার বটল থেকে একটু জল খাইয়ে দিচ্ছে। ভেবলির ফ্রকের একজায়গায় অল্প একটু ধুলো লেগে ছিল, হঠাৎ একটা ছোট্ট ছেলে ছুট্টে এল, সামনে দাঁড়িয়ে একটু দেখল ভেবলিকে, তারপর ধুলোটা ঝেড়ে দিয়ে একছুটে ফের খেলতে চলে গেল। ভেবলি মাঠের দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না, সারা মুখ হাসিতে খুশিতে ঝলমল করছে তার। চেয়ারে বসে বসে জোরে জোরে পা দোলাচ্ছে সে আর ক্রমাগত হাততালি দিতে দিতে বলে চলেছে, "লি লি লি লি...।"

দাদু ভেবলির মায়ের দিকে ফিরলেন, "কী বৌমা, ঠিক আছে তো?"

মায়ের চোখে তখন আনন্দাশ্রুর বান ডেকেছে, দুই গাল ভেসে যাচ্ছে জলে, উত্তর দেওয়ার অবস্থা নেই।

ছবিঃ সুতপা নাথ

ওহ্ আচ্ছা আচ্ছা...

শুভজিৎ বরকন্দাজ



ছোট্ট মেয়ে টুসকি। যেন ছোট্ট্ পুতুলটি। সক্কলের খুব আদরের। রোববারের সারাটা সকাল ধরে একমনে সে একটা ভারি সুন্দর ছবি আঁকল। ফুটফুটে জোছনারাতের ছবি। নীল রঙের আকাশ আর হলদে সাদা জোছনা যেন গড়িয়ে পড়ছে আঁকার পাতায়। এবার কী চাই! কী চাই...!

হুঁ হুঁ... একটা সুন্দর ফুটফুটে ডানামেলা পরি চাই।

চাই বললে চলবে কেন! চাই-ই... চাই। তাই খুব মন দিয়ে একটা পরি আঁকল টুসকি। টানা টানা চোখ। ধবধবে নীল-সাদা ফিনফিনে তার পোশাক। মা যেমনটি বলে, ঠিক সেই গল্পের পরিটার মতোই। কী মিষ্টি তার হাসি!

পরি আঁকা হতেই চোখ পিটিয়ে পরিটা হেসে উঠল মিষ্টি করে। টুসকিকে বলল, "টুসকি সোনা, তোমার যেমন মা আছে, আমারও তেমন খুব ছোট্ট্ ছোট্ট্ ফুটফুটে কত মেঘ-পরি ছানা আছে। তাদেরকে আমার কাছে এনে দিলে না যে!"

"ওমা! তোমার ছানা?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ... জোছনাপরি আদর করে টুসকির রেশম-চুলে হাত বুলিয়ে দিল।"

"আহা! তাদের কথা কি তোমার খুব মনে পড়ছে? তাহলে তো আনতেই হয়। নইলে যে খুব কষ্ট্ হবে তোমার গো!"

টুসকির কথায় জোছনাপরি খুব মিষ্টি করে হেসে টুসকির গাল টিপে আদর করে দিল, "হুঁ সোনা, চাই-ই চাই। আমার ছোট্ট্ মেঘপরিদের এনে দাও দিকি!"

টুসকি তখন দু'চোখ বুজে মেঘছানাদের খুঁজতে থাকল, "কই গো কই! মেঘছানারা কই! কোথায় যেন, কেমন যেন!"

"ওহ, আচ্ছা! আচ্ছা!" বলতে বলতেই দল বেঁধে মিষ্টি হেসে গান গাইতে গাইতে এসে হাজির হল পুচকু পুচকু মেঘপরিদের দল।

তাদের দেখে জোছনাপরি খুব খুশি। টুসকিও খুশি। খুব মন দিয়ে সে সাজিয়ে দিল মেঘপরিদের। টানা টানা কাজল-চোখ দিল। চুলে লাল-নীল ফিতে দিল। গায়ে ফিনফিনে জরির ডানা দিল। সক্কলে মিলে দল বেঁধে সে কী হুটোপুটি তাদের! মা-পরির তাই দেখে মুখে হাসি আর ধরে না। ছানাপরিরাও খুশি। টুসকিও হাসল খিলখিলিয়ে।

কিন্তু এ ছবি তো বাবাকে গিয়ে দেখানো চাই! যেমন ভাবা তেমনি কাজ! টুসকি গেল দৌড়ে তার বাবার ঘরে, "বাবা বাবা... দ্যাখো দ্যাখো...আমার জোছনাপরি আর মেঘপরিদের দ্যাখো।"

বাবার কি আর দেখার সময় আছে! বাবা বসে মুখ গুজেঁ তার কম্পিউটারে। টুসকির ছবি ভালো করে না দেখেই মাথা নেড়ে বলল, "ছবি একেঁছো! ওহ, আচ্ছা! আচ্ছা!"

ইসস্...বাবাটা ভারি দুষ্টু! ছবিটা না দেখেই বলল, আচ্ছা আচ্ছা! টুসকি গেল এক দৌড়ে রান্নাঘরে। মাকেও তো দেখানো চাই!

মারও কি দেখার সময়! মা তখন সকালের জলখাবার বানাতেই হিমসিম। ঘেমে নেয়ে একসা। পরোটা তো ভাজা হয়েছে। এবার মাংসটাও রাঁধতে হবে কষে! মশলা কই! মশলা কই! বলতে না বলতেই টুসকি হাজির তার জোছনাপরি আর মেঘপরিদের দল জুটিয়ে।

মাও তার হাতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে কোনরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে একঝলক দেখেই হেসে বলল, "ছবি এঁকেছ? ওহ, আচ্ছা! আচ্ছা!"

ইসস্... মা'টাও কেমন! ভারি বাজে! ছবি না দেখেই বলল, আচ্ছা আচ্ছা! ভারি রাগ হল টুসকির। আলাপই করল না তার বন্ধুদের সাথে! দু'গাল বেয়ে জল নামল ফোঁটায় ফোঁটায়। যাও তো যাও.... সবার সাথেই আড়ি। আড়ি আড়ি আড়ি।

মনখারাপ করে টুসকি এল পড়ার ঘরে। সেখানে আছে তার মুন্নি পুতুল, মিঞাঁও মশাই আর গজক সাহেব। মুন্নি পুতুল টুসকির নতুন সাথীদের দেখে ভারি খুশি। চোখ পিটিয়ে ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকালো। তারপর ঝিকিয়ে উঠে বলল, "এস এস। বোস বোস! কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য!"

মিঞাঁও মশাই ভীষণ ভারিক্কি হয়ে গলা ঝাড়ল। তারপর বলল, "এসেছ তোমরা?বেশ!বেশ!"

গজকসাহেব তো একটা মোটুরাম হাতি। হেলতে দুলতে তার চব্বিশটি ঘন্টা পার। জোছনাপরি আর মেঘপরিদের দেখে শুঁড় তুলে নমস্কার করে বলল, "খবর ভালো তো?"

তো সব্বার সাথেই ভাব। কী মজা! কী আনন্দ!



এতক্ষণ জোছনাপরির মুখে কথাই ছিল না। কেবলি মিটমিটিয়ে হাসছিল। এবার একে একে তার মেঘপরিদের সাথে সবার আলাপ করিয়ে দিল। তারপর বলল, "চল তাহলে, তোমাদের সব্বাইকে একবার মেঘের রাজ্যখানা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

কী মজা! কী মজা! আহা! আহা! চলো চলো! সব্বাই চলো!

কিন্তু টুসকি পড়ল মহা ভাবনায়, "আমি তো উড়তে জানি না। মুন্নিপুতুল, মিঞাঁও মশাই, গজকসাহেব– কেউই তো উড়তে জানে না। আমরা যাই কী করে!" টুসকির মুখে মেঘ নামল।

জোছনাপরি মিষ্টি হেসে টুসকির ছোট্ট চিবুক ছুঁয়ে বলল, "আহা! এমন মিষ্টি মেয়ে তুমি! মনখারাপ করলে কি চলে! আমি তো আছিই! চলো চলো...! তোমাদের সব্বাইকে নিয়ে যাব মেঘের দেশে। সেখানে এখন জোছনারাত...চলো চলো...চলো শিগগির!"

বলতে বলতে থোকা থোকা সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ভেলা এসে হাজির। কাশফুলের দাঁড় বেয়ে সেই ভেলা ঠেলে নিয়ে এল এত্তটুকুনটুকুন খুদে চেহারার মেঘবালকের দল।

আহা! দেখেই চোখ জুড়োলো। খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল টুসকি। মিঞাঁও মশাই খুশিতে বলে উঠল, মিয়াঁওওও...! গজকওসাহেব খুশিতে শুঁড় দোলালো, ওঁয়াওওওও...!

দেখতে দেখতে চোখের পলক পড়তে না পড়তে সক্কলে এসে হাজির হল মেঘপরিদের দেশে। যত উপরে উঠছে ভেলা, টুসকির গায়ে জোছনা ঝরে পড়ছে গুঁড়ো গুঁড়ো। গায়ের রং কী সুন্দর চাঁপা ফুলের মতো হয়ে যাচ্ছে ওর। ইসসস্... কি সুন্দর! টুসকির মুখে আর হাসি ধরে না।

জোছনাপরি মেঘরাজ্যের সকলকে ডেকে ডেকে বললে, "শোন শোন, এই আমাদের টুসকি সোনা। আর এরা ওর বন্ধুরা। সক্কলে খুব আদর করবে ওদের। যত্ন করবে কিন্তু! সবাই মাথা নেড়ে বললে, "সে কী কথা! করব না কেন? নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

এবারে খাওয়াদাওয়ার পালা। কত্ত সুন্দর সুন্দর খাবার এল টুসকিদের জন্যে। মেঘের থালায় এল মিহি সোনাপাপড়ির মতো জোছনার গুঁড়ো। একটু মুখে তুলতেই কী অমৃত স্বাদ! মনটা ভরে যায়। মুখ ধোওয়ার জন্যে পদ্মপাতায় এল মিঠি জল। সে কী ভারি ঠান্ডা জল! আর সেসব পরিবেশন করছে ফুটফুটে সব মেঘ-মেয়েদের দল। চুলের খোঁপায় তাদের কাশফুলের পালক গোঁজা।

টুসকি জোছনাপরির কোলে বসে তার চিবুক ছুঁয়ে বলল, "তোমাদেরও কি ফ্রিজ আছে গো? ভারি ঠান্ডা তোমাদের জল।"

জোছনাপরি হাসতে হাসতে বলল, "না গো মেয়ে না! আমরা এখানে মেঘ জমিয়ে জমিয়ে বরফ বানাই আর তা দিয়ে জল ঠান্ডা রাখি।"

মিঞাঁওমশাই উসখুস করছিল আর চারিদিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। তা দেখে মেঘপরিরা বলল, "কী গো মিঞাঁও মশাই, তোমার কী পেট ভরল না?"

মিঞাঁওমশাই ইয়াব্বড়ো ঢেঁকুর তুলে মুখের সামনে তিনটে তুড়ি মেরে বলল, "নাহ! আসলে আমি তো খুব মাছ, মাংস খাই; তা এখানে বুঝি মাছ মাংস মেলে না?"

তা শুনে জোছনাপরি মনখারাপ করে বলল, "উঁহু, আমরা তো কাউকে কষ্ট দিই না। আর কাউকে হত্যাও করি না। আমরা সবাই এখানে বরফজল আর জোছনাগুঁড়ো খেয়েই থাকি।"

জোছনাপরির কথায় টুসকি ভারি খুশি হল। তাইতো তোমরা এত্ত সুন্দর! তোমরা এত্ত মিষ্টি। আমিও আর কাউকে মারব না। কক্ষণও কষ্ট দেব না। মাছ মাংসও খাব না...কক্ষণও না...!"

বলতে না বলতেই মেঘের ওদিক থেকে কে যেন ডেকে উঠল টুসকির নাম ধরে। ভারি চমকে উঠে টুসকি চাইল চোখ বড়ো করে।

ওম্মা! এ যে মা!

হাতে গরম পরোটা আর মাংসের প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা। আর হেসে বলছে, "ঘুমিয়ে পড়েছিলি সোনা মা? কার সাথে বলছিলি, মাছ খাবি না, মাংস খাবি না? কীরে? ওরে পাগলি, তোর জন্যেই তো বানিয়েছি পরোটা আর মাংস। তুই-ই তো খেতে ভালোবাসিস মা!"

টুসকির বুকের মধ্যে ছোট্ট দু'হাতে তখনও আঁকড়ে ধরা ছিল আঁকার খাতাটা। সেখানে এখন শুধু মেঘ আর মেঘ। মিঞাঁওমশাই আর গজকসাহেব উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিছানার ওপর। মুন্নিপুতুল বালিশে আধশোয়া।

মা তখনও বলছে, "খেয়ে নে সোনা! খেয়ে নে লক্ষ্মীটি!" টুসকি ছবির দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখল মেঘপরিরা সকলেই মিলিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। জোছনাপরিও মিলিয়ে যেতে যেতে বলছে, "ওহ, আচ্ছা! আচ্ছা!"

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর



যশোধরা রায়চৌধুরী

আধো অন্ধকার একটা ঘর। কোথাও কেউ নেই। সমস্ত ঘরটাই জানালার বাইরের স্ট্রিটলাইটের চুঁইয়ে আসা আলোয় ভারি ছায়া ছায়া, মায়াময়। খানিক বিভ্রান্তিকরও বটে। অনেকক্ষণ একটানা চেয়ে থাকলে বোঝা যায় টেবিলের ওপর একটা ছোটো পর্দায় আলো কাঁপছে। আরো মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় আলোর সামনে বসে আছে কেউ। একটা মানুষের অবয়ব।

জানালার বাইরে থেকে দেখছিলেন সূর্যশেখর। প্রবল গরমের দাপটে দরদর করে ঘাম হচ্ছে। বন্ধ জানালার বাইরে একটা ছোটো ইট বাঁধানো ধাপ। ওখানে গা সাঁটিয়ে দাঁড়ানো অনেকক্ষণ। কেন না সাহস নেই প্রথমেই দরজা খটখটানোর। বাড়িটার গতিপ্রকৃতি বুঝে নিতে হবে তো আগে! কারা থাকে এখন এ বাড়িতে?

একটু আগেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন সূর্য। যে যন্ত্রের কাঁটা ত্রিশ বছর এদিক ওদিক হবার কথা, তা পঞ্চাশ বছর এগিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৫ সালে বসে, সময়যানের কাঁটাকে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে ২০১৫ র দিকে! ভাবা যায়। ভাবতেই গায়ে কাঁটা।

চেয়েছিলেন অতীতে যেতে। সাহস পাননি। স্যারও বলেছেন, প্রথমেই এমন কোন বিষয় নিয়ে নাড়াঘাঁটা না করতে, যেটা সম্পূর্ণ অজানা। তবে ভবিষ্যত আর কত অজানা হবে! বড়োজোর কিছুদিন আগেই যেখানে পাঠ সাঙ্গ করে এসেছেন সেই আমেরিকার মত উন্নত হবে ভারত, ত্রিশ বছর পরে।

ক্যালিব্রেশনে ভুল ছিল মনে হয়। কাঁটার দাগ একেবারে ধরে ধরে এগোলেও , ত্রিশ বছর কীভাবে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল কে জানে! ১৯৯৫ এর বদলে এসে গেলেন ২০১৫য়।

প্রথমে বুঝতে পারেননি। যন্ত্রটা ঘটরমটর করে নড়ে উঠে নাগাড়ে পঞ্চাশ মিনিট থরথর করে কেঁপেছে। ঝাপসা কাচের জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে পাননি। উনি তখন দক্ষিণ কলকাতায় স্যার শিবাজী রায়ের বাড়ির পেছনদিকে একটা টিন ঢাকা চালাঘরের মধ্যে যন্ত্রের ভেতর ঢুকে বসেছিলেন।

যন্ত্র থেকে বেরিয়ে দেখলেন, খোলা মাঠ একখানা। শিবাজী রায়ের বাড়িটাই নেই। কিছু ভাঙা দরজা জানালা পড়ে আছে।

কী সর্বনাশ।

এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রথমেই রাস্তায় পা ফেলে আঁতকে উঠলেন। সাঁ সাঁ করে কয়েকটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। একটু আগেই দেখেছেন এক বুড়ো রিকশাওয়ালা বসে বসে ঝিমচ্ছে ঠিক এইখেনেতেই।

তা না হয় হল। সহ্য করে নিলেন। ১৯৯৫তে কলকাতা এতটা পাল্টাতেই পারে। কিন্তু তারপর একটু হাঁটতে হাঁটতেই ধাক্কা খেলেন প্রচন্ড। না সত্যিকার ধাক্কা নয়। মনে ধাক্কা খেলেন।

একটা বিশাল সাইনবোর্ড দেখলেন। যেটা আদৌ বোর্ড নয়। টিনের ওপর রঙ করে করে সাইন লেখার কাজ করছে লোকজন, এটাই সারাজীবন দেখেছেন, মই বেয়ে বা বাঁশ বেঁধে উঠে সে কাজ যারা করে, ছোটো একটা চৌখুপি কাটা কাগজ থেকে দেখে দেখে বিশাল বোর্ডে ঠিক মাপে মাপে স্কেলমাফিক বড়ো করে বসিয়ে দেয় আস্ত একটা মেয়ে বা ঘোড়া বা সিগারেটের প্যাকেটের ছবি, দেখে সাবাশ দিতে হয়।

সেরকম আঁকা নয়, সেরকম বোর্ড নয়। কোন ফ্রেমও নেই সে অর্থে। লোহার বড়ো ফ্রেম । নাঃ এ তো নড়বড়ে একটা বাঁশের ফ্রেম মনে হচ্ছে। অথচ ফোটোগ্রাফের মত সুন্দর ছবি বিশালকায় একটা ক্যানভাস বা কাপড়ের ওপর আঁকা। নাঃ আঁকাও নয়, ছাপা ।

আর তার বিষয়বস্তুই জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। এটি একটি গানের অনুষ্ঠান।

কিন্তু এ কী বানান লিখেছে এরা? বাংলা ভাষার এত বিবর্তন হয়ে গিয়েছে আগামী ত্রিশ বছরে?

“চিল চিল চিল। সামার চিল। গানের ভেলায় অনুশঠানে সকলের সাদোর আমোন্ত্রন।“

হায় চিল , সোনালি ডানার চিল।

সূর্যশেখরের কলেজ জীবনে পড়া জীবনানন্দের কবিতা মনে পড়ল। আমন্ত্রণের এক্সট্রা ওকার আর মূর্ধণ্য ণ এর অভাব বুকে বাজল। তারপরই মাথাটা ঝঝন করে উঠল। লেখা রয়েছে,

আগামি ৩০ অক্টোবর ২০১৫
শীশুবিকাস মঞ্চে
শপোরিবারে আশুন।

তাহলে ক্যালিব্রেশনে এতটা ভুল ছিল? হায়। কী করবেন ভাবছেন। আবার ফিরে যাবেন নিজ কালে? কিন্তু প্রচন্ড এক লোভের খপ্পরে পড়ে গেলেন সূর্যশেখর।

২

শিবাজী রায়ের বাড়ি থেকে ঢিল ফেলার দূরত্বেই তো তাঁর নিজের বাড়ি। ২০১৫ তে শিবাজী রায়ের বাড়ি মাঠ হয়ে গেছে। তাঁর নিজের বাড়িটাও যদি--

বুকের ভেতরটা অকারণে প্রচন্ড ঢিপ ঢিপ করে উঠল। উফফফ। কী হবে। বাড়িতে দুটো ছোট্ট শিশু , একজনের বয়স ছয় একজনের দুই। ২০১৫ তে নিয়মমত তাদের বয়স হবে ছাপ্পান্ন আর বাহান্ন। উফ্‌ফ্‌! ভাবা যায় না।

সাহস করে যাবেন? যদি বাড়িটাই খুঁজে না পান?

কিন্তু সংশয়ের থেকে কৌতূহলেরই জয় হল। এসে প্রথমেই বাড়ির চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে গেলেন। আষ্টেপৃষ্ঠে সবকিছু বন্ধ! এই গরমে ... ১৪ টা জানালা বন্ধ! বাড়িটার প্রকৃতিই যেন পালটে গেছে। সবদিক আঁটোসাঁটো। ১৯৬৫ সালের মত খোলামেলা নয়।

শুধু সদর দরজাটা কাঠের, সেই রকম বিবর্ণ। আর সিঁড়িটুকু একই আছে। বড়ো বড়ো কয়েকটা জানালা , জানালায় সবুজ কাচ।

এই বাড়ির সামনে একটা বড়ো ঝাপড়া বুগেনভিলিয়া গাছ আছে। সেই গাছে একইসঙ্গে হলুদ আর গোলাপি দু রকম বুগেনভিলিয়া হয়। ২০১৫ তেও সেই গাছটা থাকবে এ আশা করাই ভুল। তবু চোখ তারেই খুঁজে বেড়ায়। নাঃ, তার বদলে অন্য গাছ চোখে পড়ল বাড়ির সামনেই । দরজার ধারে ছোট্ট মাটির টব থেকে উঠে গেছে। রক্তকরবী।

এই বাড়ির আশপাশের ছোটো ছোটো ঝুপড়ি বস্তিগুলো কোথায় গেল? পাশের ফাঁকা প্লটে গোয়ালারা থাকে। খাটাল একটা।

তাকিয়ে দেখলেন, বড়ো গেট, গেটের ওপারে একটা বিশাল চারতলা বাড়ি। আর বস্তির জায়গায় এখন দুতিনটে দোতলা, একতলা ব্যাঁকাচোরা বাড়ি।

সন্ধে হয়ে আসছে। এই এক বাঁচোয়া। ঢোলা প্লিট দেওয়া প্যান্ট পরা , মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করে ব্রাইল ক্রিম লাগানো সূর্যশেখরকে রাস্তার লোক সেভাবে দেখতে পেল না। পেলে পাগলই ভাবত। যেভাবে হাঁ করে তিনি বাড়ির দিকে প্রথমটা তাকালেন!

তারপর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে একটা জানালার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

চোর ভেবে কেউ যে পিটিয়ে দিল না ওঁকে, এ-ও এক বিশাল বাঁচোয়া।

এতবড়ো একজন বিজ্ঞানী এখন নিজের বাড়ির জানালার বাইরে থেকে ভেতরে দেখার চেষ্টায় মগ্ন।

ভেতরে অন্ধকার। বাইরে আধো আলো। সন্ধে নামছে।

গরমে ঘামছেন। অথচ ভেতরে মৃদু গুণগুণ গান গাইছে যেন কোন যন্ত্র।

৩

হায় বিজ্ঞান।

ছোটোবেলা থেকে সূর্যশেখর হতে চেয়েছিলেন একজন বিজ্ঞানী। তাঁর পড়াশুনো তাঁকে দূরদূরান্তে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশ-ষাট দশকে একটা কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। ব্রিলিয়ান্ট স্কলার। সূর্যশেখর হচ্ছেন তাই। বাবামায়ের মুখ উজ্জ্বল করেননি শুধু। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলের অগাধ বিস্ময় আর ভালবাসা পেয়েছেন কেবল লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েই।

কোন একভাবে, বোধ করি, তাঁর আদর্শ হল , রনেসাঁসের সময়ে, অর্থাৎ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের মাঝামাঝি অবস্থানরত বৈজ্ঞানিক লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কমপ্লিট ম্যান। তাঁর এক হাতে পদার্থ বিদ্যা রসায়নের যাদুমন্ত্র। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অন্য পছন্দের বিষয়। অন্য হাতে আছে সাহিত্য। গান । কবিতা পড়তে ভালবাসেন। কবিতা আর বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন সময়যানের চর্চায়।

পড়াশুনো করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৫০ এর দশকের মাঝামাঝি। ১৯৫০ দশকটা অন্যরকম একটা দশক। চাচা নেহরু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন ভারতের মুক্তি আর স্থায়ী উন্নতির কথা বলছেন, নন অ্যালাইনমেন্ট মুভমেন্টের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ইস্ট ব্লক ওয়েস্ট ব্লকের বাইরে একটা অন্য মর্যাদায় স্থাপন করছেন। এদিকে একের পর এক নতুন নতুন শিল্প স্থাপন হচ্ছে। নেহরু বলেছিলেন, ইস্পাত শিল্পের বিশাল টাওয়ার, ডোম, এগুলোই ভবিষ্যতের মন্দির।

সেইসব মন্দিরে অনেক সেবাদাস লাগবে, আর অনেক পুরোহিত। ভারতীয় তখন এই দুটোর কোন একটা হবে বলে নিজেকে তৈরি করছে।

সূর্যশেখর নিজেকে পুরোহিতই ভাবেন।

৪

কে যেন নড়ে উঠল। জানালার ভেতর দিয়ে চোখকে খুব স্ট্রেন করে দেখতে হচ্ছে। ওঁরই নাতিপুতি কেউ হবে । সালটা দু হাজার পনেরো। মনে রাখতে হবে। দরজার বাইরে দেখেছেন ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই নাম লেখা। অর্থাৎ এ বাড়ি হাত বদল হয়নি। এমনকি পার্টিশনও হয়নি। দেবু আর ফুচি অত নীচে নামেনি। ওঁর ছেলেমেয়ে হয়ে কী করে নামবে? ভারতীয় মহাকাব্য ঘেঁটে বড়ো বড়ো নাম রেখেছেন ওদের। দেবব্রত আর অনসূয়া।

কিন্তু ভেতরে যে বসে আছে সে পঞ্চাশোর্ধ হতেই পারে না। অত্যন্ত ক্ষীণকায়। হাত পায়ের গড়ণ শিশুর মত। অংক করে দেখতে হবে, এ সূর্যশেখরের ছেলের দিকের না মেয়ের দিকের।

১৯৬৫তে সূর্যশেখর ছোট্ট বাচ্চা দুটোকে ফেলে এসেছেন। ইস্কুলে যায় বড়োটা। ছোটোটা গিন্নির নজরদারিতে। আচ্ছা, সময়যানে চাপলে নিজের সঙ্গে দেখা তো হয় না। গিন্নি বেঁচে থাকলে তাঁর সঙ্গে তো দেখা হতেই পারে, তাই না?

দেবেন নাকি বুক ঠুকে কলিং বেল টিপে?

যেই করে থাকুক, সূর্য দেখলেন, প্রাচীণ, পৈত্রিক তাঁর ভাঙাচোরা বাড়ি কেউ একটা সারিয়েছে। ওই জানালায় সাদা কাচের জানালা লাগিয়েছে। যে সরু সরু ধাতব পাতের ওপরে লাগিয়েছে সেটা কি অ্যালুমিনিয়াম? হাঁড়িকুড়ি ছাড়া এমন ব্যবহার কখনো দেখেননি।

আর ওই গুণগুণ গান গাওয়া যন্ত্রটাই কি এয়ারকন্ডিশনার? তাহলে তা ইভলিউশন অর্থাৎ বিবর্তন হয়ে, এক নতুন আজব রূপ ধরেছে। ঘরে না থেকেও ঘর ঠান্ডা করছে। ঐ তো, দেখতেই পাচ্ছেন, বাইরে বসানো আছে। বারান্দায়। কিন্তু ভেতরটা ঠান্ডা হচ্ছে কীভাবে? মেশিনটা গোঁ গোঁ করে চলছে। পাখা ঘুরছে বনবন। কিন্তু ঘরের ভেতরে তো কাচের গায়ে বিন্দু বিন্দু শিশিরজল জমেছে। ফুলহাতা গায়ের সঙ্গে সেঁটে বসা অলিভ রঙ এর জামা পরে আছে মনে হচ্ছে ওই ছায়ামূর্তি। বয়স বড়োজোর আঠারো উনিশ হবে। খুব রোগা, আর অন্ধকারে বসে আছে বলেই, ভাল দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে ও নাগাড়ে, স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে ঐ জিনিসটার দিকে। একটা বইয়ের মত ছোট্ট। সাধারণ বইয়ের তুলনায় পাতলা হবে। লাল রঙ এর গীতা বা চন্ডীর মতই আকার আকৃতি। তার মধ্যে হালকা আলো ফুটেছে। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক সূর্যশেখরের মস্তিষ্ক বুঝল, ওটা কোন স্ক্রিন।

কিন্তু এই স্ক্রিন টিভির মত উত্তল নয়। তাঁর বিদেশ থেকে আমদানি করা কাচের খোলস পরানো গণকযন্ত্রের স্ক্রিনের মতও নয়। চ্যাপ্টা। কেমন যেন প্রাচীন যুগের হায়রোগ্লিফিক লিপিতে লেখা ট্যাবলেটের মত দেখতে। ওভাবেই হাতে নিয়ে আছে। যেমনটা মিশরীয় আঁকাজোঁকায় দেখা যায়!

টিভির উত্তল স্ক্রিনের ভেতর সিনেমা দেখা যায়, যা তিনি আমেরিকায় দেখেছিলেন। সাদা কালো ছবি। তারপর এতগুলো বছরে টিভি নিশ্চয় অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আজ কি ওইটুকু স্ক্রিনে ওই যুবক বা যুবতী টিভিই দেখছে? নাকি অন্যকিছু করছে।

খানিক লক্ষ করে বুঝলেন, শুধু দেখছেই না, ওর হাত নড়ছে। একটা আঙুলের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে । ও কি স্ক্রিনের ওপর হাত বোলাচ্ছে মাঝে মাঝে।

দূর থেকে দেখে সূর্যশেখরের মনে হচ্ছে এক ভৌতিক ব্যক্তি বসে আছে। পবিত্র কোন পাথরের টুকরোয় মারণ উচাটনের মন্ত্রোচ্চারণ করছে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, সূর্যশেখর কি ভেবেছেন কখনো, যিনি নাকি জীবন থেকে সবরকমের কুসংস্কারকে দূরে সরাতে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁরই কপালে এই আছে। তাঁর বংশধরই একদিন নিজের ঘরে বসে তুকতাক করবে!

৫

পাশেই বারান্দার গ্রিল। সূর্য যে খাঁজে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশিক্ষণ পারবেন না আর। বোঝাই যাচ্ছে। সরে যেতেই হবে। বারান্দার দিকে যেতে চাইলেন। পা টনটন করছে। পিঠ কনকন করছে।

বারান্দার দিকে আগে পুরোটাই ফাঁকা ছিল। এখন গ্রিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে দেখলেন। যেখানে ওই গোঁ গোঁ করা যন্ত্র বসে।

তা ভাল করেছে ওরা। বাড়ির পেছনে একটু মনোযোগ যে দিয়েছে এই অনেক। কিন্তু গ্রিল থাকায় উনি তো বারান্দা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে পারবেন না।

সবার চক্ষুর অন্তরালে বাড়িতে ঢোকার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ তবে! অন্ধকারের আড়াল নিয়ে এভাবে ঘরে যাওয়ার চেষ্টা বোধ হয় সফল হবে না।

ঘুরে দরজায় গিয়ে, ঘন্টি বাজাতেই হবে। ওদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

নাঃ সূর্যর কপাল ভালই। বারান্দার গ্রিলে একটা একটা জানালার মত পাল্লা করা আছে। সেই পাল্লা দিয়ে ঢুকে যেতে পারবেন মনে হয়। ঠিক পারবেন।

টুক করে ঢুকে পড়লেন সূর্য। আরে, নিজের বাড়ি তো। আজ সকালেও, ১৯৬৫ সালের ২৮ এপ্রিল, ওই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েই চা খেতে খেতে খবরকাগজ পড়ছিলেন।

এত্তো ইয়ার্কি! নাঃ।

বারান্দার দিকের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। আঃ। বাড়ির ভেতরটা!

আজ সকালেও গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। এখন একেবারে ঠান্ডা। চিলড ।

ওহহহহ। এতক্ষণে বোধগম্য হল, একটু আগে দেখা ওই সাইনবোর্ড টার অর্থ । ওটা পাখি চিল নয় । ঈগলের ভায়রাভাই। নাঃ ওটা গরমের থেকে মুক্তির চিল। সি এইচ আই এল এল!

ইংরিজি শব্দ বাংলা অক্ষরে, এ আবার কেমনধারা ব্যাপার? হ্যাঁ তিনিও লেখেন বটে। ওই যে, চেয়ার টেবিল এইসব। একটু খটমটো হলেও তো রোমান অক্ষরের শরণ নেন। বাংলা কথার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এইভাবে ইংরিজি কথা, নাঃ মনে হয় এটা ত্রিশ বছরে , থুড়ি, পঞ্চাশ বছরে ঘটেছে।

করিডোর ধরে ধরে বছর পঞ্চাশ আগেকার বাড়ির হিরের টুকরো ছেলেটি, পা টিপে টিপে হাঁটছেন। সাদা ধবধবে মাখনের মত রঙ করা করিডোরে, অনেক ছোটোবড়ো জিনিস রাখা। কোনটাই কাজের কিছু না। বইয়ের র‍্যাকে বইয়ের চেয়ে সাজানোর জিনিশ বেশি। ফুলের টবে নকল গাছ। এসব দেখলে হোটেল হোটেল লাগে। ছাতের থেকে ম্লান আলোর গোল গোল ল্যাম্প ঝুলছে। এগুলোও অদ্ভুত , অচেনা। গোল কাচের ডুমের মত আলোগুলো হাপিশ!

ঘরগুলোর দরজা আঁটা, কিন্তু হয়ত বা ভেতর থেকে খিল দেওয়া নয়। উফফফ। কী উত্তেজনা হচ্ছে! যে ঘরটার জানালা দিয়ে আড়ি পাতছিলেন সেই ঘরেই ঢুকে পড়বেন নাকি, বুক ঠুকে?

হঠাৎ পাশের দিকের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি যুবক। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে কি? গায়ে রঙিন গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। তাঁর কৈশোর কালে খাকি প্যান্ট পরতেন, সেরকমই দৈর্ঘ্য বটে, কিন্তু রঙিন, চক্রাবক্রা প্রিন্ট দেওয়া।

কিন্তু এ কে? এ যে ভীষণ চেনা! বুকের মধ্যে ধড়াশ করে উঠল। তারপরেই বুঝতে পারলেন সূর্যশেখর। এই চেহারা তো তিনি রোজ দুবেলা আয়নায় দেখেন!

পুরুষটিকে গটগট করে হেঁটে যেতে দেখে, একটা পর্দার পাশে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন নিজেই। এই কি তবে দেবব্রত? উফফফ। কিন্তু হিসেবমত তার বয়স তো এখন পঞ্চাশোর্ধ! সব হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছে কেন? যদি এটা ২০১৫ হয়...

তবে কি ভারতের মানুষ আয়ুবৃদ্ধিকে জয় করার কোন ওষুধ শেষমেশ আবিষ্কার করে ফেলেছে?

একটা দরজা ঠেলে যেটা তাঁদের খাবার ঘর সেঘরেই ঢুকে গেছিল যুবকটি। থুড়ি, দেবব্রত। বেরিয়ে এল হাতে একটা টিনের ক্যান নিয়ে। এরকম টিনের ক্যানে স্যুপ থাকে। এটা কী?

টিনের ক্যানের মাথাটা হ্যাঁচকা মেরে খুলে ফেলে ঢকঢক গলায় ঢালল সে।

আর তখনই, অসম্ভবটা সম্ভব হল।

ছাপ্পান্ন বছরের দেবব্রতর সামনে সশরীরে হাজির হলেন তার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী পিতৃদেব!

৬

আঁতকে উঠল দেবব্রত।

এক ক্যান চিলড বিয়ার আগেই পেটস্থ হয়েছে। এখন নতুন এক ক্যান খুলেছে! এরই ভেতরে এত নেশা হয়ে গেল?

নিজেকে দেখছে কেন সামনে? হ্যাঁ, গিন্নি বসুন্ধরা করিডোরে জুতোর র‍্যাকের ওপরে একটা কেতার আয়না রেখেছিল বটে, কিন্তু দেবব্রত তো সেটাকে সরিয়ে দিতে বলেছিল। আবার এসে হাজির হল নাকি?

কিন্তু এক শতাংশ অফ এক মুহূর্তের মধ্যে চটকা ভাঙল। এটা তার রিফ্লেকশন হবে কী করে?

এই মূর্তি যতই তার মত দেখতে হোক না কেন, এ তো প্যান্টুলুন পরা এক কিম্ভূত মূর্তি। বেশ কমসবয়সি কিন্তু চেহারায় একটা বুড়োটে ভারিক্কে ভাব। যেন পুরনো বাংলা সিনেমা থেকে উঠে আসা লোক। কেমন যেন চেনা চেনা!

চোখ কচলে তাকাল দেবব্রত। ও ঘরে বসুন্ধরা সান্ধ্য বৈঠক করছে, ওর কিটিপার্টি না স্কুল ফ্রেন্ডসদের ওয়াটস্যাপ গ্রুপের জিটি আছে বোধ হয়। এদিকে রিম্পাই নিজের ঘরে থুড়ি নিজের বুদবুদে আছে। কে কখন এই বিচিত্র ভদ্রলোকটিকে দরজা খুলে দিল জানা নেই।

“আ-আপনি????” কিছুটা ফ্রেন্ডলি অনেকটা থতমত গলায় বলল দেবব্রত।

“আমি, আমি হলাম... গলা ঝেড়ে নিয়ে , বললেন সূর্যশেখর। আমি তোমার পিতৃদেব , দেবব্রত! তুমিই দেবব্রত , আশা করি?”

৭

ঠাশ্ ধপাস্ একটা আওয়াজ পেয়েছিল বসুন্ধরা। ডাইনিং রুমে বারো ঘন্টার আয়া মালতী কিছু ফেলেছে ভেবে আর ওদিকে যায়নি। এদিকে পরনিন্দা পরচর্চা চলছিল কিনা। সঙ্গে ক্রিস্পি চিলি বেবিকর্ন। বাড়িতে এরকম রেস্তোরাঁর মত কী করে বানাল বসু, তা নিয়ে সব্বাই চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিল।

কেউ খেয়াল করল না।

সূর্যশেখর বিশালবপু পুত্রটিকে টানতে টানতে কোনমতে তাঁর ১৯৬৫ র শোবার ঘরে এনে তুললেন। পুব-দক্ষিণের এই ঘরটিই যে এখনো দেবব্রতদের ঘর, অর্থাৎ মাস্টার বেডরুম তা নিঃসন্দেহে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। ঠিক যেমন, সবচেয়ে নিঃশব্দ ও নিরিবিলিও মনে হয়েছিল গৃহের ওই কোণটিকে।

সে ঘরে দেবব্রতকে এনে, মেঝেতেই ফেলে রেখে, তিনি জল খুঁজলেন। পেলেনও। রঙিন প্লাস্টিকের বোতলে বিছানার ধারেই গড়াচ্ছে একটি। কাচের বোতল আর নেই। ভ্যানিশ! জল বার করে চোখে মুখে ছিটোলেন নিজের পয়ঁত্রিশ বছরের মত টানটান দেখতে ছাপ্পান্ন বছরের পুত্রের। ঘরে ঠান্ডামৃদু হাওয়া আছে। যথেষ্ট সুখকর। আশপাশে তাকিয়ে বাহারি পর্দা দেখলেন। দ্রুত হাতে আবার জল ছিটোতে যেতেই, একাদিক্রমে কয়েকটি ব্যাপার ঘটল।

ছেলে জেগে উঠে বলল, “বাবা!” মুখ চোখ ভেবলু। একেবারে হতভম্ব।

ইতিমধ্যে ঘরে দরজা ঠেলে সন্তর্পণে প্রবেশ করল অন্য ঘরের ওই ফুল হাতা জামা পরা বাসিন্দাটি , হাতে সেই যন্ত্র। যা উত্তল অবতল নয় একেবারে ফ্ল্যাট। ছোট্ট। বড়োজোর ন ইঞ্চি বাই এগারো ইঞ্চি।





বাসিন্দাটি একটি কন্যাসন্তান। চকচকে চোখে চশমা। মুখে কৈশোরের সারল্য মুছে খানিকটা সর্বজ্ঞ আত্মপ্রত্যয়ী ভাব এসেছে। (এ'সব ভাষা সাহিত্যপ্রেমী সূর্যশেখরের মাথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আসে) সে নিজের বাবার দিকে, এবং হুবহু বাবার মত দেখতে এই অচেনা ভদ্দরলোকের দিকে তাকাল, মেপে নিল তার বাবার মতই দেখতে এবং বাবার মতই তরুণ, ঝলমলে, টানটান এই মধ্যবয়সী যুবককে এবং বাবার কুম্ভমেলায় হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই ভেবে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বলল, "হাই!!!"

আত্মপ্রত্যয়ের জায়গায় এখন এসে হাজির হয়েছে একটি আনন্দ , মজা আর অবাক হবার অভিব্যক্তি। তার পেছনে পেছনেই ঢুকলেন এক স্থূলাকৃতি সুন্দরী। কিশোরী মেয়েটির মত করে দরজা সন্তর্পণে না খুলে ঘটাং করেই ঢুকলেন, এবং "কী গো, বেবিকর্ন চাইছিলে না? এ কীঈঈঈঈঈঈঈঈ, এটা কে এ এ এ ?"

একটানে অনেকটা কথা বলে , চক্ষু বর্তুল করে তিনি তাকিয়ে রইলেন সূর্যশেখরের দিকে। সূর্যশেখর মেঝে ছেড়ে ততক্ষণে উঠে পড়েছেন , টান টান হয়ে দাঁড়িয়েছেন পিঠ ঝাড়া দিয়ে। এবং অবশ্যই মহিলার চোখ চড়কগাছে উঠে গেল এই সুদর্শন সৌম্যকান্তি চশমাপরা প্যান্ট শার্ট শোভিত যুবকটিকে দেখে, যে নাকি তার বার্মুডা টি শার্ট পরা স্বামীর একজ্যাক্ট প্রোটোটাইপ বললেও কম বলা হয়।

ম্যাট ফিনিশের আইভরি রঙ এর টাইলসের মেঝেতে শায়িত স্বামীর মুখের ফ্যালফেলে ভাবটি দেখে নিজেই কোনমতে তাকে হাত ধরে উঠিয়ে বসালেন স্থূলাঙ্গিনী। নিজেই নিচু হতে কষ্ট হয় তার, স্বামীরও মেঝে থেকে উঠতে বেশ কষ্ট হল। মাথায় একটা আলুও হয়ে গিয়েছে করিডোরে পড়ে গিয়ে। নিজের অজ্ঞাতেই প্রায় রিফ্লেক্স বশত ঠান্ডা বিয়ার ক্যানটা মাথায় ঠেকিয়ে সেটার ব্যবস্থা করতে শুরু করল দেবব্রত। মেয়ে এবং বউয়ের সামনে কেমন ক্যাবলার মত বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "না না , এটা তো বাবা!"

"বাবা?????" সমস্বরে মেয়ে ও বউ চীৎকার করে উঠল।

তারপরেই বর্তুল চক্ষু বিঘুর্ণিত করে বৌমা শ্বশুরের আইডেন্টিটি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেন। "কী বলছটা কী তুমি? এটা কি সায়েন্স ফিকশনের গল্পো নাকি! যা তা বললেই হল? কে না কে এসে গেছে বাড়ির মধ্যে, হ্যাঁ, তা মশাই, আপনি কখন কীভাবে বাড়িতে ঢুকলেন বলুন ত?"

প্র্যাক্টিকাল গৃহিণী হিসেবে খুব কনফিডেন্স আছে বসুন্ধরার। গলা খাটো করে, তখনো বিস্ময়াহত, নড়বড়ে কর্তার কানের কাছে বললেন, "বাবা, বাবা , কী বলছটা কী তুমি! তোমার বাবা কি সুভাষচন্দ্র, যে একশো বছর পরে নিখোঁজ বাবা হঠাৎ ফিরে আসবেন। মামদোবাজি?"

"না না না, একশো বছরের বাবা কেন হবে। ১৯৬৫ র বাবা... উফফ , আমি জানি না কী করে সম্ভব।"

"এই রিম্পাই, পুলিশকে একটা ফোন কর তো ! ইমপার্সোনেশনের কেস।"

ভয় খেয়েছেন ইতিমধ্যেই সূর্যশেখর। ছ্যাঁক করে উঠল মনের মধ্যেটা পুলিশের কথায়। এসব সম্ভাবনার কথা আগে ভাবেন নি কেন? ঘরের চারিদিকে চোখ মেলে দেখলেন। নাঃ কোণের দিকে যে কালো কোলাব্যাঙ এর মত দেখতে টেলিফোন যন্ত্রটা ছিল সেটাকে দেখতেই পেলেন না। পুলিশকে ফোন করা বোধ হয় এ যাত্রায় এদের হল না। নাকি, ফোনটা অন্য কোন ঘরে আছে?

অনেক কিছুরই কোন উত্তর পাচ্ছেন না, যেমন এখুনি ছেলে বলল উত্তরাঞ্চলের গন্ডগ্রামে উনি হারিয়ে গেসলেন। উত্তরাঞ্চলটা আবার কী? উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুনে, হ্যাঁ। শিবাজীদা ওটা টপ সিক্রেট রাখতেই চান তো । আপাতত ত কলকাতা থেকে সময়যানে চড়া হয়েছে। কিন্তু এখন যে ওই কচি মেয়েটি সেই চ্যাপ্টা ছোটো বইজাতীয় বস্তুটিকে হাতে নিয়ে কী সব খুটখাট করছে চিন্তিত মুখে, তার কী ?

মেয়েটা কিন্তু শুরুতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বেশ খুশি হয়ে হেসেছিল।

এখন মায়ের কথা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

ঐ তো,ছোটো যন্ত্রটা এখন ওর কানে উঠেছে। হ্যালো হ্যালো বলছে।

নাঃ পুলিশ আসার আগেই যা হয় কিছু একটা করতে হবে।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন সূর্যশেখর, "শোনো শোনো শোনো। দেবব্রত ঠিকই বলছে। আসলে আমি সত্যিই সূর্যশেখর। সত্যিই টাইম ট্র্যাভেল করে এসেছি এখানে। বিশ্বাস কর।"

কান থেকে যন্ত্র নামিয়েছে নাতনি। বৌমাও তাকিয়ে আছে হাঁ করে। তারপর বলেছে, "আপনি, আপনি সত্যি আমাদের বাবা? কী করে বুঝব? মায়ের নামটা বলুন তো!"

"সর্বাণী।"

"আপনাদের আদি দেশ কোথায় বলুন তো?"

"ময়মনসিংহ।"

"এই বাড়ি কবে কিনেছিলেন?"

"আমি কিনিনি, আমার বাবা কিনেছিলেন, জনৈক কস্তূরচাঁদ নাগরমলের কাছে।"

"যাকগে যাক। আপনি যদি সত্যিই বাবা হন, হ্যাঁ, বাবার মতই তো দেখতেও আপনাকে, তাহলে ছেলের নামটা খামখা দেবব্রত রাখলেন কেন বলুন তো? আর কোন আধুনিক নাম পেলেন না?"

এতক্ষণে দেবব্রতর চোখ চকচক করে উঠেছে। বাবা যে বাবা-ই, সে প্রমাণ গিন্নিকে দিতে পেরে। বাবা, "তুমি কোথায় আছ আজকাল বাবা? উত্তরাঞ্চলেই?"

"আরে, উত্তরাঞ্চল কেন হতে যাবে বোকা, উত্তরপ্রদেশ তো। না না আমি গাড়োয়াল হিমালয়ে এক দু'বার গেছি মাত্র। ওখানে সেটল করার তো কোন প্ল্যান নেই। আর, আপাতত তো আমি কলকাতাতেই আছি। আজ সকালেই এই তো, মোড়ের শ্রীকৃষ্ণর দোকানের কচুরি তরকারি আর জিলিপি খেয়েছি। যতই বলা হোক ডালডা চর্বিতে ভাজা, খেতে বড্ড ভাল্লাগে রে। তোরা খাস?"

" না না, শ্রীকৃষ্ণের খাবার বড্ড আনহেলদি। ডিপফ্রাইড কিচ্ছু খাইনা। বলে, বোকা বোকা মুখে মাথা দুপাশে নেড়ে নেড়ে, ধপাস করে খাটে বসে পড়েছে ছেলে, ছেলের বউ।"

নাতনিও খাটের পাশে দাঁড়িয়ে দাদুর পরিচয় কনফার্মড হতেই, মিটিমিটি হাসতে হাসতেই দ্রুত খ্যাচাক খিচিক আওয়াজ করছে। দাদুর দিকে তাক করে। তার ওই ছোট্ট হস্তধৃত মুকুরের মত জিনিসটি দিয়ে। ও জিনিস দিয়ে ফোনও করা যায়, টিভিও দেখা যায়, লেখাও পড়া যায়, ছবিও তোলা যায়? আগফা ক্যামেরাটার চামড়ার বেল্ট, মোটা গোল ভিউফাইন্ডার এর কথাটা ভেবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিটা আরেকবার মাপতে চেষ্টা করলেন সূর্যশেখর।

৮

একটাই প্রশ্ন সূর্য শেখরের মাথায় এখন ঘুরছে।

ভবিষ্যতে এলে কি নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হবে?

কেউ কেউ বলেছে, হয়। সময় পেরিয়ে এলে যেমনকার তেমন সব দেখা গেলে, বয়স্ক নিজেকেও দেখা যাবে তো!

কেউ কেউ বলেছে, হয় না। যে শরীর নিয়ে তুমি আছ, সে শরীরের ভবিষ্যত তুমি দেখ কীভাবে। এর ভেতরে একটা লজিকাল ফ্যালাসি আছে !

এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন সূর্যশেখর। কোন ঘরে নিজেকে পাবেন , বা চেঁচামেচি শুনে উঠে আসবেন তাঁর একটি বৃদ্ধ ভার্শান।

এল না কেউ। আবার কোথাও তাঁর কোন ছবিও নেই, যা বলে দেবে , তিনি ইতিমধ্যেই মৃত। ছবিতে ফুলের মালা টাঙানো থাকবে, ঝুল লাগা কাগজের মালা।

ইশ।

উদ্‌বেগে ছাতি ফেটে যাচ্ছিল সূর্য শেখরের।

শেষমেশ বলেই ফেললেন, কথাটা।

"আমি, আমি কোথায় রে?"

"তুমি ... তুমি ... জানি তুমি টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে কাজ করছিলে, কিন্তু সে তো নাকি উত্তরাঞ্চলের কোন গন্ডগ্রামে... তারপর তো তোমার আর কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি, বাবা!"

একটা জোর টাল খেলেন সূর্য। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

নাঃ এখানে আর এক দন্ড নয়।

এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে টাইম মেশিনের কাছে।

আর, হ্যাঁ, খুঁজে বের করতেই হবে নিজেকে।

ছেলে আর নাতনির এই ভরাভর্তি সংসারে নিজে যদি না থাকতে পারেন, তাহলে আবার পঞ্চাশ বছর পর লাইফটা কীরকম বোরিং হয়ে যাবে না?

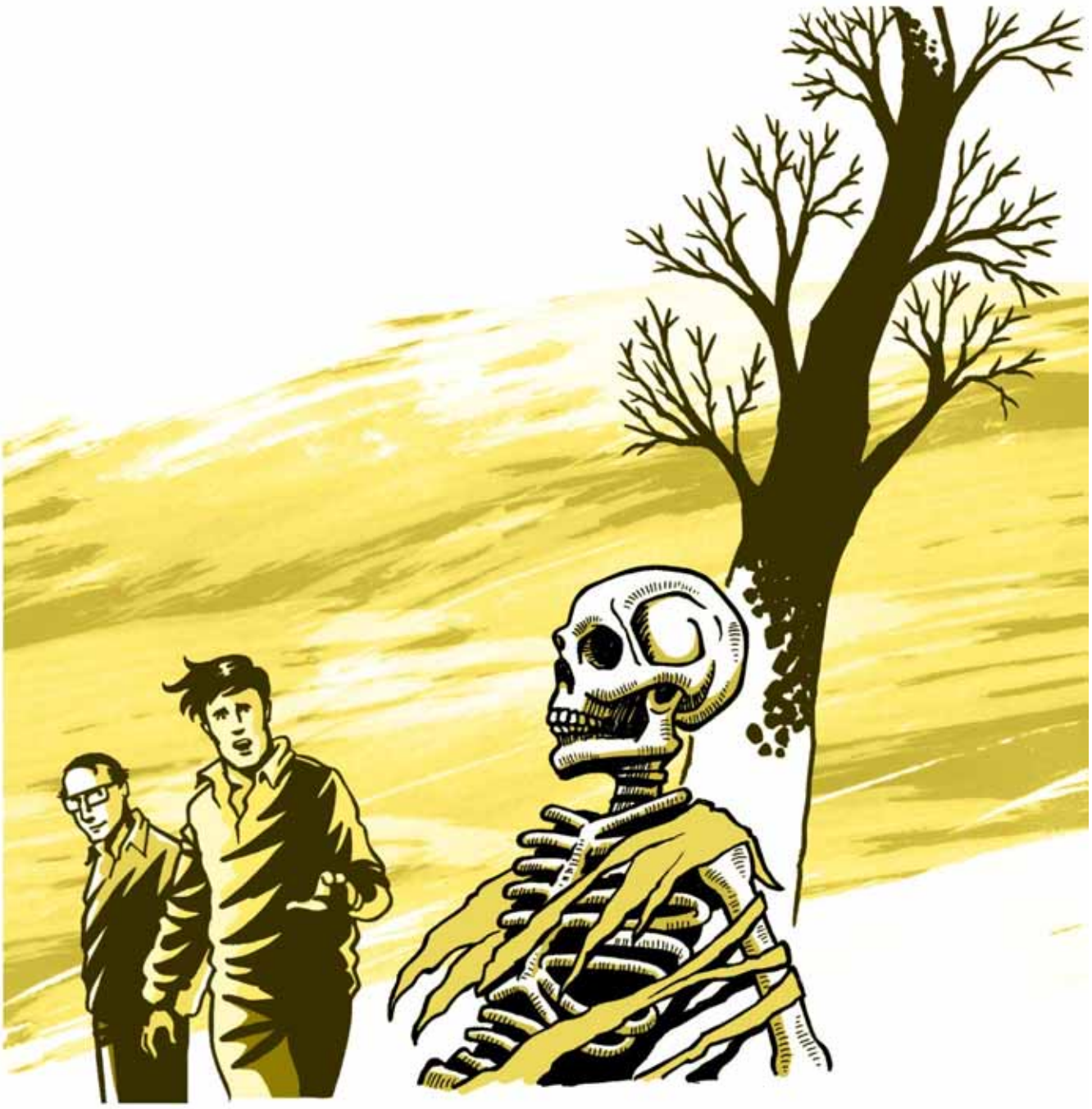
আজ থেকে নিজের সময়ে ফিরে, নানা সময়ে গিয়ে গিয়ে নিজেকে ট্র্যাক ডাউন করাই হবে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর সেটা করতে গেলে...

“চলি রে, আমার আবার বেশিক্ষণ থাকার উপায় নেই এ সময়ে। এতটুকু এদিক ওদিক হলেই গোল বাধবে...” বলে , হাঁ মুখ ছেলে ছেলের বউকে ফেলে গুটিগুটি পায়ে তিনি রাস্তার দিকে এগোন।

“বাবা, যাও বাবা,” ফোঁপাতে ফোঁপাতে দেবব্রত বলল, “তোমার টাইমমেশিন একলা পড়ে থাকলে সেটা আবার কেউ না ও এল এক্সে বেচে দেয়। তখন তো তুমি ফিরতেও পারবে না...”

নাতনিকে একবার শুধু , বাড়ি থেকে যাবার সময়, চোখের দেখা দেখে যাবেন সূর্যশেখর। ওর হাতের ওই ছোট্ট জিনিসটা ...বড়ো লোভ ওটায়। পারলে, স্পেসিমেন হিসেবে নিয়ে যাবেন।

অলংকরণঃ ইন্দ্রশেখর



ছায়া ফেলে যায়

তন্ময় বিশ্বাস

বিকালের সোনালী রোদ মেখে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। বয়স কম করেও ১০০ বছর। চারদিকে নোনা লাগা দেয়াল আর গাছের থাবা। অনেকটা জায়গা জুড়ে কোন এককালে বাগান ছিল। আজ জংলা গাছের কবলে তাও বিলুপ্তপ্রায়।

বাগানটার তুলনায় বাড়িটা ছোটোই। দোতলা। তবে কতটা বাসযোগ্য সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। সুশান্ত এগিয়ে যায়। পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ আসে, আলো ছায়া মেখে। সাদা কালো কিছু ছায়া পেরিয়ে যায়। পেরিয়ে যায় সাদা কালো স্মৃতির দল। সাদা সুখ, কালো দুঃখ।

সুশান্ত উই ধরা দরজায় নক করল। এখানে আগে কোনদিন আসেনি সে। এখানে তার জেঠু থাকে! তার প্রাণাধিক প্রিয় জেঠু! মনের সেলুলয়েডে ভেসে উঠতে থাকে নানান ছবি। ভেসে ওঠে ছেলেবেলা। কয়েক ফোঁটা। বিশ্বকর্মা পুজো। আকাশ ভরা ঘুড়ি। টুকরো টুকরো আনন্দ। টুকরো টুকরো উচ্ছ্বাস।

"এই লাগা লাগা লাগা লাগা, ভোকাট্টা!" শব্দে ভেসে যেত চারদিক। সুশান্ত মুখভার করে বসে থাকে। ছলছলে চোখে ছায়া ফেলে, ঘুড়ির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারা ঝাপসা একটা আকাশ।

জেঠু এসে পাশে বসে। ফোলা ফোলা গাল দুটো টিপে দিয়ে বলত, " কী সুশান্তবাবু? রামগরুড়ের ছানা হয়ে গেছ কেন?"

সুশান্ত ব্যাজার মুখে কোনরকমে বল্ " ঘুড়ি...."

গলা ধরে আসে। দলাপাকানো একটা কী যেন উঠে আসতে চায় গলা বেয়ে।

"ও বুঝেছি! আচ্ছা ওগুলো কী রে?"

সুশান্ত তাকিয়ে দেখে উঠনের খুঁটিতে বাঁধা কয়েকটা ডোরাকাটা ঘুড়ি! ডোরাকাটা আনন্দ। তারা পাক খাচ্ছে, বাতাসের তালে তালে।

জেঠু সুশান্তের পেটে একটা চিমটি কেটে বলত, "প্যাঁকু"। সুশান্ত খিল খিল করে করে হেসে উঠত। জেঠুও হাসত। নিঃশব্দে। স্নেহমমতা দিয়ে গড়া সেই মুখ। সেই হাসি। হাসলে জেঠুকে ভগবানের মত লাগে। যাদের মন পবিত্র, তাদের হাসিও বড্ড পবিত্র হয়। সুশান্তর মনে হত ঈশ্বর যদি কোথাও থেকে থাকেন, তবে তা ওই মুখের আড়ালে। ওই শরীরের মধ্যে।

তার ফ্রেন্ড ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড তার জেঠু। চলে গেল বদলি হয়ে। তার থেকে দূরে। অনেক দূরে। সুশান্ত খুব কেঁদেছিল। তার ঝাপসা চোখের সামনে থেকে জেঠু হারিয়ে গেল। আর ফিরল না!

সময় মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। তারপর এক এক করে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। হঠাৎই সুশান্ত হাতে পেল চিঠিটা। যেন একটুকরো টাটকা বাতাস।

সুশান্ত,

কী রে চিনতে পারছিস? নাকি জেঠুটাকে ভুলে মেরে দিয়েছিস? হা হা হা হা–কী? মুখ ভার হয়ে গেল তো? আরে জানি জানি তুই আমাকে ভুলবি না। তোর ঘাড়ে কটা মাথা রে?

যা:, আবার উল্টোপাল্টা বকছি! কী করব বল? বুড়ো হয়ে গেছি। তোকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে রে। আমি আর ক'দিন! আজ আছি কাল নেই। ঠিকানা দিচ্ছি চলে আয়।

ইতি,
জেঠু

সুশান্ত এসেছে। ছুটে এসেছে।

ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে জমা হয়ে আছে একরাশ অন্ধকার। যেন কালো ধোঁয়ায় ভরা একটা ঘর। একটু পরেই অন্ধকার সরিয়ে ফুটে উঠল একটা মুখ। মোটা ফ্রেমের চশমা, দুটো উজ্জ্বল চোখ আর একটা বেশ উঁচু নাক। মুখে বয়সের ভাঁজ স্পষ্ট। তবে ভদ্রলোকের শিরদাঁড়া সোজা। বয়সের ভারে এখনো ঝুঁকে যায় নি।

সুশান্ত চিনতে ভুল করে না। এই সেই মুখ! স্নেহ মমতায় গড়া, ভালোবাসায় ভরা।

দুজনেই চুপ করে থাকে। একসাথে যেন বেরিয়ে আসতে চাই হাজার হাজার না বলা কথারা। নীরব কান্নারা।

"সুশান্ত! এসেছিস বাবা...."

ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে জেঠু। শত শত নীরব শব্দ পাক খেতে থাকে তাদের ঘিরে। হলুদ স্মৃতিরা উড়ে বেড়ায়। জোনাকির মত! বয়ে যায় দু'জোড়া চোখ।

"আমি জানতাম। জানতাম তুই আসবি।"

"কেমন আছ জেঠু?"

"আর থাকা! ওই আছি একরকম। চল ঘরে চল।"

সুশান্ত ভেতরে ঢোকে। সামনেরটা সম্ভবত ড্রয়িংরুম মত। বাতাস কেমন ভ্যাপসা ভ্যাপসা। কেমন পুরনো পুরনো। জেঠুর পেছনপেছন একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল সুশান্ত। ঘরে চাপ চাপ অন্ধকার। জেঠু একটা জানালা খুলে দিলেন। বিকেলের ম্লান আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যায় ঘরটা।

ছোট্ট এক চিলতে ঘর। একটা পুরনো আমলের বিছানা আর মাঝারি সাইজের একটা টেবিল। কিন্তু, টেবিলের ওপর ওগুলো কী! আলো-আঁধারি মেখে বসে আছে নানান সাইজের সব কঙ্কাল! পাখির কঙ্কাল! অকারণেই সুশান্তর গাটা ছম ছম করে উঠলো। একটা হালকা স্রোত যেন শিরদাঁড়া বেয়ে হারিয়ে যায়।

"এগুলো আমার একধরণের শখ বলতে পারিস। নানারকমের কঙ্কাল জমানো। আরও আছে।"

সুশান্তে চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে জেঠু বলল "কী রে ভয় পেলি নাকি?"

সুশান্ত জেঠুর দিকে তাকাল। চশমার কাচে সোনালী আকাশের ছায়া। আড়াল করে রেখেছে চোখদুটোকে। তারা যেন আড়ালেই থাকতে চায়। মেখে থাকতে চায় একরাশ রহস্য।

বিশাল একটা মাঠ। কিন্তু, পুরোটা দেখতে পাচ্ছে না সুশান্ত। সাদা সাদা কুয়াশা ছেয়ে আছে চারদিকে। চলতে চলতে নরম ঘাসে পা ভিজে যাচ্ছে সুশান্তর। একটু এগোতেই কুয়াশা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে একটা ছোটোমত ঢিবি। আর তার ওপর! তার ওপর, একটা বিশাল আকারের নেকড়ে! তার মুখের প্রতিটা ভাঁজে ফুটে উঠছে হিংস্রতা। জান্তব হিংস্রতা। চোখ দুটো সুশান্তের ওপর স্থির!

নেকড়েটা লাফিয়ে ঢিবি থেকে নামল। তারপর এক পা এক পা করে সুশান্তের দিকে আসছে। সুশান্তের যেন কিছু করার নেই। তার সমস্ত স্বত্বা যেন লুপ্ত। সে অপেক্ষা করে আছে। তার চরম নিয়তির জন্য।

কিন্তু, এ কী! সুশান্তের চোখের সামনেই নেকড়েটা বদলে যাচ্ছে। ঝরে ঝরে পড়ছে তার সমস্ত চোখ কান! ঝরে পড়ছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! সমস্ত মাংসপেশি! জেগে থাকে শুধু নেকড়ের কঙ্কাল! সেটা একইভাবে এগিয়ে আসছে সুশান্তের দিকে। নিয়তি হয়ে!এবার যেন সুশান্ত নিজেকে ফিরে পেল। সজাগ হয়ে উঠল তার সমস্ত ইন্দ্রিয়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি জেগে উঠে ছড়িয়ে দিতে লাগলো ভয় আর আতঙ্কের রাশি। সে ঘুরে ছুটতে লাগলো।

একটা কী যেন তার ঘাড়ে এসে পড়ল। সুশান্ত ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। বিচ্ছিরি স্বপ্ন। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। মেঘ করে আছে বোধহয়। সুশান্ত উঠে টেবিলের কাছে গেল। মোমবাতির হালকা হলুদ আলো মেখে বসে আছে সারি সারি পাখির কঙ্কাল। পাখির প্রেত! অদ্ভুত নেশা বটে! অনেকে পশু পাখি স্টাফ করে ঘর সাজায় বলে সুশান্ত শুনেছে। কিন্তু এরকম অদ্ভুত জিনিস শোনেনি কোনদিন। আন্দাজে বোঝা যায় শালিক, পায়রা, চড়াই এসবের কঙ্কাল। সুশান্ত ভালো করে দেখে মৃদু চমকাল। একটা কঙ্কালও অক্ষত নয়! হাতুড়ি বা ওই জাতীয় কিছু ভারি জিনিস দিয়ে যেন তাদের মারা হয়েছে। কারো পায়ের হাড় ভাঙা তো কারোর বুকের খাঁচাটা অর্ধেক নেই! একটা অজানা অস্বস্তি সুশান্তকে চেপে ধরল।

সুশান্ত ড্রয়িংরুমের দিকে এগোল। সেখানে একটা মোমবাতি অন্ধকার তাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে জেঠু। দেওয়ালে পড়ছে তার দুলন্ত ছায়া।

"কী রে উঠে পড়েছিস? বোস বোস। কত বড়ো হয়ে গেছিস রে!"

সুশান্ত সামনের একটা চেয়ারে বসে। হালকা একটা ক্যাঁচ শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যায়। ঘরটা মাঝারি আকারের। সুশান্ত দেখল একপাশে ডাঁই করা আছে আরও কয়েকটা কঙ্কাল। সম্ভবত এগুলো কুকুর, ছাগল এই ধরণের জীবজন্তু। আশ্চর্য এগুলোও অক্ষত নয়!

"কঙ্কাল গুলোর কথা ভাবছিস তাই তো?" জেঠুর গলা ভেসে আসে।

"না ওই আর কি..." সুশান্ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

"এটা শখ না বলে, আমার একটা রোগের উপসর্গ বা ফসল বলতে পারিস।"

"রোগ?"

"হ্যাঁ রোগ। দাঁড়া তোকে তাহলে গল্পটা বলি। চায়ের বদভ্যেস আছে?"

"না, আমি চা খাই না।"

"সেকী রে! ছোটোবেলায় তো আমার কাছে খালি বায়না করতিস, জেঠু চা খাব, চা খাব!"

সুশান্ত শুধু একটু হাসে।

"ওয়েল। শোন তাহলে। বদলি হয়ে চলে গেলাম একেবারে দক্ষিণ ভারতে। তামিলনাড়ুর একটা ছোট্ট গ্রাম। যাকে বলে একেবারে অজ পাড়া গাঁ। সেখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আমি হেড। কদিনের মধ্যেই জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেললাম। পাহাড়, নদী যতদূর তাকাও সবুজ আর সবুজ। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের মানুষ আমাকে দেবতা বানিয়ে বসল। সেই নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। জেঠুর চশমার কাচে তির তির করে কাঁপছে দুটো মোমবাতির শিখা। একটা টিকটিকি কোথা থেকে টিকটিকি করে ডেকে উঠল।

"৩০টা বছর! পাক্কা ৩০ টা বছর আমি ওখানে ছিলাম," জেঠু বলে যায়, "পাহাড়ি নদীর মত সময় বয়ে গেছে। চোখে চশমা লেগেছে, চুলে রুপোলী রেখা। এরকমই একটা সময়ে ঘটনাটা ঘটল। তারিখটা ছিল ৩০ই মে। সারাদিন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টি মাথায় করে গ্রামের কয়েকজন ধরে আনল লোকটাকে। লিকলিকে শরীর, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। খালি গা, পড়নে শুধু একটা নীল চেকচেক লুঙি। উন্মাদের মত চিৎকার করছে। লিকলিকে শরীরে অমানুষিক জোর। চারজন মিলেও ধরে রাখতে পারছে না। আর লোকটার চোখে যেন রক্ত জমে আছে! রক্তও বুঝি এত লাল হয় না!

"আমি অবস্থা বুঝে একটা ঘুমের ইনজেকশন দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটা ঝিম মেরে গেলো। আস্তে আস্তে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমনোমাত্রই তার সাথের লোকগুলো পালিয়ে গেলো।

"আমি চেক করে দেখলাম ঘুমন্ত অবস্থাতেও লোকটার প্রেশার আর হার্ট-বিট অসম্ভব রকমের হাই! টেম্পারেচার ১০৮- ১০৯ এর ঘরে ঘোরাফেরা করছে। এই অবস্থায় লোকটা বেঁচে আছে কী করে সেটা ভেবে অবাক হয়ে গেলাম। বৃষ্টির জন্য সেদিন কম্পাউন্ডার আসেনি। আমি একাই ছিলাম। স্যালাইন ট্যালাইনের ব্যবস্থা করে পাশে বসে থাকলাম। কখন দরকার লাগে!

"তখন কত রাত বলতে পারব না। বসে বসে বোধহয় একটা ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ, বাইরে ভীষণ জোরে একটা বাজ পড়ল। আমার চটকা ভেঙে গেলো। বাইরে তখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। টিউব লাইটের মত আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরে। আর সেই আলোতেই দেখলাম, লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে। ওই দুটো চোখ আমি জীবনে ভুলব না। ভাঁটার মত জ্বলছে সে দুটো। লাল একদম লাল! আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমার হাতে একটা কামড় বসাল। চোঁ চোঁ করে কী যেন শুষে নিতে চাইলো। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সে পৈশাচিক একটা হাসি হেসে বাইরে ছুটে গেল!

"তখন থেকেই রোগটা দেখা দিল। চোখের সামনে কম্পাউন্ডার, সিস্টার, পেশেন্ট সব অদৃশ্য! আমি, আমি গ্রামটাকে খুব ভালবাসতাম। আমি ওদের ক্ষতি করতে চাইনি। এই বাড়িটা পড়েই ছিল। চলে এলাম নির্বাসনে। কিন্তু সেই রোগটা আমার পিছু ছাড়ল না।"

একটানা বলে থামল জেঠু। ঘরটা অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে। চেয়ারটা খুব জোরে জোরে দোলাচ্ছেন জেঠু। দুলছে দেওয়ালের বাদামি ছায়াটা।

"আচ্ছা....মানে... রোগটা কী?" সুশান্ত একটু অস্বস্তি নিয়েই জিজ্ঞেস করল।

"হুমম, বলছি। আজ খুব গরম। চল বাগান থেকে একটু ঘুরে আসি।"

"আচ্ছা চলো।"

আকাশে মেঘ থাকলেও একটা বেশ বাদামি আভা। চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। পায়ের নীচে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

"তোর বিপ্লবকে মনে আছে? সেই যে ওকে কোলে নিলেই তুই মুখ ফুলিয়ে বসে থাকতিস? তখন তোকে কাতাকুতু ট্রিটমেন্ট দিতে হত। হো হো হো"

জেঠু হেসে ওঠে। তার মুখে জেগে ওঠে সেই পুরনো স্নেহ মমতারা। তারা কোনওদিন পুরনো হয় না।

“বাব্বা! মনে নেই আবার। ছোটোবেলায় আমরা ছিলাম সাপে নেউলে। হি হি হি। তবে ও কোথায় কে জানে। ওর সাথে দেখা হয় না অনেক বছর।”

“হুমম, সাপে নেউলে হলেও তোকে হয়তো এখন থেকে তার সাথেই থাকতে হবে। বড়ো ভালো ছেলে। আমি ডাকতেই এসেছিলো। আমি ওকে এখানেই রেখে দিয়েছি।”

“এখানে! এখানে কোথায়?”

জেঠু একদিকে আঙুল তুলে দেখায়। একটা মরা গাছ। গাছে পাতা বলে কিছু নেই। আর তার গোড়াতেই ঠেস দিয়ে বসে আছে, একটা কঙ্কাল! নরকঙ্কাল! কঙ্কালটার গায়ে তখনো লেগে আছে ছিন্ন ভিন্ন পোশাকের টুকরো। ভয়ের একটা তীব্র স্রোত নেমে এলো সুশান্তের মেরুদণ্ড বরাবর। সাপের মত ছড়িয়ে গেল সমস্ত কোষে কোষে। সমস্ত লোমকূপে।

“সরি সুশান্ত। তোর জেঠুটা সেই রাতেই মরে গেছে। এখন শুধু বেঁচে আছে এই পিশাচটা। রক্তপিশাচ! হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা রক্ত রক্ত--”

একটা পৈশাচিক স্বর ভেসে এলো জেঠুর দিক থেকে। একটানে চশমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জেঠু। জোড়া পায়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন মড়া গাছটার একটা ডালে!

সুশান্তর চোখের সামনে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে জেঠু। সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা ভরা মুখটা চুপসে দুমড়ে যাচ্ছে। জেগে উঠছে একটা পৈশাচিক মুখ! ভাম্পায়ার! সারামুখে একটা অদ্ভুত নীল আভা। যেন কালো কাগজের ওপর শয়তানের তুলির টানে ফুটে উঠছে এক পিশাচের ছবি। তার চোখ দুটো থেকে ঠিকরে বেরচ্ছে সবুজ আলো। বেরোচ্ছে সবুজ পিপাসা । রক্ত পিপাসা!

সুশান্ত ঘাসের ওপর বসে পড়ল। তার যে জেঠুকে সে এত ভালোবেসে এসেছে, যে জেঠুকে দিয়েছে মনের সব থেকে উচ্চতম স্থানটা, সেই জেঠু আজ...

সুশান্ত আর ভাবতে পারল না। হঠাৎ বিচ্ছিরিভাবে হেসে উঠে জীবটা দুটো হাত বাড়িয়ে বাতাসে ভেসে উঠল। এসে নামল সুশান্তর ওপর। সুশান্ত তার চোয়ালের দুপাশে তীক্ষ্ণ দুটো দাঁত দেখতে পাচ্ছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা লালা ঝড়ে পড়ছে সুশান্তর মুখের ওপর। সুশান্তর গা ঘিন ঘিন করে উঠল। দাঁতগুলো আস্তে আস্তে নেমে য়াসছে সুশান্তের দিকে---

আর ঠিক তখনই মেঘ সরে গেলো। খুলে গেলো মেঘের জানলা। ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল থালার মত একটা চাঁদ। আজ পূর্ণিমা! সমস্ত বাগানটা ভেসে গেলো জ্যোৎস্নায়। আলোকিত হয়ে উঠল প্রেতমঞ্চ!

সুশান্তের দু চোখে টলমল করে উঠে দু টুকরো চাঁদ। দু টুকরো জ্যোৎস্না।

পিশাচটা হঠাৎ সুশান্তকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার সবুজ চোখ দুটোই এখন হানা দিচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বিস্ময় আর আতঙ্কের দল। তার সারা মুখে কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে অজানা ভয়ের ছায়া!

সুশান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল পিশাচটার ওপর। জ্যোৎস্না মেখে ঝাপটা ঝাপটি করতে থাকে দু টুকরো অন্ধকার। দুটুকরো ছায়া।

ভ্যাম্পায়ারটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছড়ানোর। কিন্তু, পারছে না। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার দেহটা। বয়ে যাচ্ছে নীল রক্ত! তারপর একসময় বাতাসে হারিয়ে গেল একটা আর্তচিৎকার। শেষ আর্তনাদ।

সুশান্ত উঠে দাঁড়ায়। তার কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীল রক্ত। শয়তানের নীল রক্ত! জ্যোৎস্না এসে খেলা করে তার সারা শরীরে। ঢেলে দেয় রাশি রাশি রুপো। রাশি রাশি করুণা। সুশান্তর চোখ বেয়ে গড়িয়ে যায় এক ফোঁটা মুক্ত। ভেসে যায়। এলোমেলো হাওয়ায় চড়ে। দূরে, বহুদূরে। সেই চোখের জলে মানুষ নেই। সেই জল নেকড়ের! ওয়ারউলফের!

ছবিঃ অর্ক পৈতণ্ডী



দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের প্রপিতামহের দুরন্তপনা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল পুটকাই। ভদ্রলোক যেমনি চঞ্চল, তেমনি ডানপিটে! তাঁর একহাত লম্বা পাকা দাড়ি, মাথায় উসকো খুসকো চুল, সেসব কামাবেন না, কাটবেন না, মাথায় তেল দেবেন না। কেবল দিনরাত এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে মাটি খুঁড়ে এটা সেটা খুঁজে বেড়াবেন আর বলবেন, "হায় হায়, কোথায় যে রেখে গেলাম জিনিসটা। কিছুই মনে পড়ছে না।"

গতকালই বাবা, দাদু-ঠাকুমা সবাই মিলে গেল বোলপুরের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে। যাবার সময় পুটকাইকে সঙ্গে তো নিলই না বরং উল্টে নিজেদের মধ্যে গজগজ করে আলোচনা করল, "পুটকাইকে না নিয়ে যাওয়াই মঙ্গল! লাল মাটি পেলে তো ছেলের মাথা ঠিক থাকে না। সেবার বোলপুরে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে - গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে - গান শুনে কোথায় যে হারাল! খুঁজে খুঁজে হয়রান! এবার আবার লালমাটি দেখে কী যে অনর্থ করবে কে জানে!"

যাক গে, নিয়ে যায়নি বলে পুটকাইয়ের অবশ্য তেমন দুঃখ নেই। ছোটবেলা থেকে সে মাকে কখনও দেখেনি। বাবা আপনভোলা মানুষ, দিনরাত ব্যস্ত থাকেন গবেষণায়। দাদু নামকরা কল্পবিজ্ঞান লেখক। এক ঠাকুমা আছেন, সবসময় পুটকাইকে আগলে রাখেন, নানারকম বিধিনিষেধ জারি করে। ঠাকুমা না থাকলে বরং কদিন নিজের খেয়ালখুশি নিয়ে চলার একটু স্বাধীনতা পাওয়া যায়।

তাই ছাড়া পাওয়ার লাগামছাড়া আনন্দে পুটকাই বারণ না মেনে ঢুকেছিল বাবার গোপন গবেষণাগারে। নেড়ে চেড়ে দেখছিল এটা ওটা। কত রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে বাবা কাজ করে, বাপ রে বাপ! টেবিলের ওপর পড়েছিল টাইম-গানটা। এটা সেই যেদিন পুটকাই লুকিয়ে এঘরে ঢোকার পাসওয়ার্ডটা জেনে নিয়েছিল সেদিন প্রথম দেখেছিল। পুটকাই টাইম-গানটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। অদ্ভুত রোমাঞ্চ হচ্ছিল পুটকাইয়ের। এটা দিয়ে ফায়ার করে কোনও বস্তুকে কিছুটা অতীত সময়ে পৌঁছে দেওয়া যায়। খুদে খুদে জেমস চকলেটের মতো লাল নীল কঠিন জমাট-বিন্দুদের স্থিতিস্থাপক রাসায়নিক সুতো দিয়ে গেঁথে গেঁথে একটা জটিল প্রাণের ডিএনএ-এর মডেল সামনে বানিয়ে রেখেছিল বাবা। মডেলটাকে হাতে নিয়ে বেশ মজার খেলনা মনে হয়েছিল পুটকাইয়ের। তাই সেটাকে টাইম গান দিয়ে ফায়ার করে একঘণ্টা আগের সময়ে পাঠাতে চেয়েছিল পুটকাই। আর দেখতে চেয়েছিল কেমন করে সেটা আবার বর্তমানে ফিরে আসে। কিন্তু হাতে নিয়ে লুফতে লুফতে টপ করে সেটা গিয়ে পড়ল বাবা বানানো নতুন সময় যন্ত্রটার মধ্যে। ব্যাস পুটকাই যেই না দরজা খুলে ভেতরটা দেখতে গেছে, ভোঁ ও ও! কী বন বন ঘোরা

সময়-যন্ত্রটার। বাবারে! ওটা যে সময়-যন্ত্র সে কি আর পুটকাই জানত! ব্যাস, ঠাকুরদার বাবা স্যার হংসরাজ মজুমদার এসে জলজ্যান্ত হাজির হলেন অতীত থেকে।

এসেই মাথা চুলকে বললেন, ঠিক সময়েই এসেছি মনে হচ্ছে। তুই নিয়ে এলি আমাকে?

"আমি?" পুটকাই বিস্ময়ে গালে হাত দিল। কী থেকে যে কী হয়ে গেল! এখন কী হবে!

হংসদাদু চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন, "বাঃ! আমার ল্যাবরেটরিটার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।"

পুটকাই বলল, "বাবা,দাদু,ঠাকুমা ফিরে এসে বকাবকি করবে।"

হংসদাদু একগাল হেসে বললেন, "ফিরে এসে মানে - বাড়িতে কেউ নেই নাকি? তাহলে তো মজাই মজা।"

পুটকাই গম্ভীর মুখে তাকাল হংসদাদুর দিকে। মানুষটাকে ছবিতে তো বেশ শান্তশিষ্ট মনে হয়েছিল। বাবা ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল - ইনি তোর দাদুর বাবা। মস্ত বড় জীববিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু সেই মানুষটাই যে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে মন খুলে দস্যিপনা শুরু করবেন পুটকাই ভাবতে পারেনি। এখন তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে অতীতে ফেরত পাঠানোরও কোনও আশা দেখছে না পুটকাই। সবচেয়ে সর্বনাশ হবে আলোমাসির সামনাসামনি পড়ে গিয়ে আসল পরিচয়টা ফাঁস হয়ে গেলে। এমনিতেই আলোমাসি ভয়ে ভয়ে কাজ করে এবাড়িতে। লাইব্রেরিতে ঢুকতে ভয় পায়, ল্যাবরেটরির আসেপাশে যেতে ভয় পায়। বলে, জায়গাগুলো মোটেই সুবিধের নয়। কখন কী হয়ে যায়। শেষে না ডাইনোসর বেরিয়ে পড়ে। সেই আলোমাসি এখন দাদুর বাবাকে চাক্ষুষ দেখে না "বাবা গো!" বলে মূর্ছা যায়।

পুটকাইকে তো আলোমাসির দায়িত্বেই রেখে গেল বড়রা। আপাতত লাইব্রেরি আর ল্যাবরেটরিতেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে হংসদাদুকে। কিন্তু তিনি লুকিয়ে থাকতে চাইছেন কোথায়? রাত হলেই তিড়িং করে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তারপর সারা বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁড়ে চলেছেন খুরপি দিয়ে।

পুটকাই হংসদাদুর কাণ্ড দেখে তাই জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী খুঁজছো দাদু?"

"ঘোড়ার ডিম!"

এই উত্তর শুনেই পুটকাইয়ের মেজাজটা চটকেছে। কী খুঁজছেন বললে পুটকাই তো খুঁজতে সাহায্য করতে পারত। এই বাড়িটা সেই পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ছিল এখন কি আর তেমনি আছে?

ওদিকে পুটকাই আলোমাসির বালিশের নীচে একটা বোতামের মতো ছোট রিসিভার রেখে এসেছে। যাতে আলোমাসির নাকডাকার আওয়াজটা কানে হেড-ফোন লাগালেই শোনা যায়। আলোমাসি যখন ঘড়র ঘঁড়র ছেড়ে খোঁৎ খোঁৎ আওয়াজ করে তখন বোঝা যায় পাশ ফিরছে। এই সময় বড় কিছু গোলমাল হলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তাই হংসদাদুকে সাবধান করতে হয় পুটকাইকে।

রাতে জ্যোৎস্না ফুটেছিল চমৎকার। বসন্তের হাওয়া বইছিল মিষ্টি মিষ্টি। পুটকাই চিন্তামগ্ন হংসদাদুকে ঠেলা মেরে বলল, "চলো না, বাইরেটা একটু বেড়িয়ে আসি। কত দিন মাঝরাতে খোলা জানলার বাইরে জ্যোৎস্না দেখে মাঠে ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে হয়েছিল। সাহস করে পালাতে পারিনি। সেই বোলপুরের বাড়িতে গিয়ে একবার পেরেছিলাম। মনে হয়েছিল আকাশে উড়ে যাই।"
হংসদাদু পুটকাইয়ের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সে সব ব্যবস্থাই করে ফেলতাম। ডিমটা চুরি না গেলে।"
পুটকাই মুখ বেজার করে বলল, "আবার সেই ঘোড়ার ডিম নিয়ে পড়লে। দাদুর কল্পবিজ্ঞানের বইগুলোতেও এমন উদ্ভট আইডিয়া থাকে না।"

হংসদাদু গলাটা কর্কশ করে বললেন, "কখনও খোঁজ নিয়ে দেখেছিস আমার সুপুত্র তাঁর গল্পের সূত্রগুলো কোথা থেকে পায়? সব আমার ডাইরি থেকে।"

"কই কখনও তো দাদুর লেখা গল্পে ঘোড়ার ডিম পাড়ার কথা পড়িনি কখনও।"

হংসদাদু মুচকি হেসে বললেন, "আরে, আমি মজা করে ওটার নাম দিয়েছিলাম ঘোড়ার ডিম। ওটা আসলে খোলের মধ্যে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা একটা ভ্রূণ। আমার সমস্ত কল্পনা দিয়ে বানানো একটা জীবনের স্বপ্ন বলতে পারিস। ওই ভ্রূণ থেকে জন্ম নেবে এমন একজন মানুষ যে - "

বলতে বলতে হংসদাদু উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকালেন। চাঁদের আলোর দাপটে বেশিরভাগ তারাই আড়ালে চলে গেছে। কয়েকটা রাত পাখি সেই দামাল জ্যোৎস্না ছুঁয়ে উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

হংসদাদু বললেন, "চোরটাকে একবার হাতে পাই।"

পুটকাই বলল, "চোরকে আর এত বছর বাদে কখনও পাওয়া যায় দাদু? হয়তো বা সে চোর মরেই গেছে। তাছাড়া অমন ঘোড়ার ডিম চুরি করবেই বা কেন?"

“মানে? তুই কী আমার আবিষ্কারকে হেজিপেঁজি ভাবছিস না কি? জানিস কত ডলার দাম দিতে চেয়েছিল সাহেবরা ওই ঘোড়ার ডিমের? আবার আমারই বানানোর প্রাণের জেনেটিক মডেল বানানো হয়েছে! কে বানিয়েছে? তোর বাবা? ওটা টপ করে কুড়িয়ে পেয়েই চটপট দৌড়ে অতীত থেকে এলাম ভবিষ্যতে। তার মানে এখানেই কিছু রহস্য লুকোনো আছে।”

পুটকাই মনে মনে ভাবল, এই রে! এই বাবার বানানো ওই মডেলটাই তাহলে হংসদাদুকে ডেকে এনেছে অতীত থেকে। আর পড়বি তো পড় জিনিসটা একেবারে টাইম-মেশিনে গিয়ে পড়ল!

হংসদাদু মাথা চুলকে বলল, “সে সময় ডন সাহেব কত গুণ্ডা লাগিয়েছিল জিনিসটা হাতাতে! আমি বাগানে এমন জায়গায় লুকিয়েছিলাম না। ব্যাটারা খুঁজে খুঁজে হয়রান। শেষে রাগের চোটে হাত পা বেঁধে আমায় মারধোর করবে ভেবেছিল। এসেছিল দলবেঁধে এক রাতে। আমার হাত পা বেঁধে যেই মুখের সামনে হম্বিতম্বি, ধমকানো, চমকানো শুরু করেছে, ব্যাস, দিলাম গায়ে কাতুকুতু লাগার ওষুধ ছিটিয়ে। ডাকাতি করতে এসে হেসে গড়াগড়ি বাড়ির উঠোনে। কিন্তু তার পরের দিন নিজেই সেই গুপ্ত জায়গায় গিয়ে দেখি “ঘোড়ার ডিম” নেই। কিন্তু আজ ওই ডিএনএ-এর মডেলটা দেখে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ঘোড়ার ডিমটা কেউ ভবিষ্যৎ থেকে গিয়েই সরিয়েছে।”

“তোমার ওই ঘোড়ার ডিমের খবর ভবিষ্যতে কে ছাই জানবে ...!” বলতে গিয়ে থমকে গেল পুটকাই, “আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! গল্পের প্লটটা খুব চেনা চেনা লাগছে।”

“কী হল?” হংসদাদু ও চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল পুটকাইয়ে কথা শুনে।

চারপাশের শহরে তখন হাওয়ায় জ্যোৎস্নায় মিশে রূপকথা নেমে এসেছে। আকাশে টুকরো কয়েকটা সাদা মেঘ চাঁদের গায়ে ঘেঁষে রূপালী জ্যোৎস্না মেখে নিচ্ছে। তারপর ভেসে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে।

“দাদুর লেখা উপন্যাসেই তো পড়েছি। অতীতের রূপকথার দেশের কোন এক তেপান্তর থেকে ডক্টর মজুমদার কুড়িয়ে এনেছিল একটা পক্ষীরাজের ডিম। তারপর সেই ডিম ফুটে পক্ষীরাজের বদলে বেরল একটা ফুটফুটে রাজকুমার ...।”

পুটকাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হংসদাদুকে তাড়া দিয়ে বলল, “চলো একবার বাবার ল্যাবে ফিরে যাই। একটা ছোট্ট সময়-সফর করতে হবে। তুমি টাইম-মেশিনে চেপে পিছিয়ে যাওয়াটা কন্ট্রোল করতে পারবে তো?”

বিজ্ঞানী স্যার হংসরাজ মজুমদার আমতা আমতা করে বললেন, “আমি জীববিজ্ঞানের লোক। ওই সব পদার্থবিদ্যার ব্যাপার স্যাপার একটু কম বুঝি। তবু আমার আবিষ্কারের চুরি ঠেকাতে আমি সবকিছু করতে পারি। তবে ...!”

“তবে মানে? উল্টো পালটা সময়ে নিয়ে চলে যাবে না তো? বেঘোরে প্রাণটা যাবে তাহলে। কেউ জানতেও পারবে না।”



এই সব বিপদের সম্ভাবনার কথা বলতে বলতে পুটকাই হংসদাদুকে সঙ্গে নিয়ে বাবার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টাইম মেশিনে চেপে বসল।

তারপর ওরা হুস্ করে কেমন একটা সাদাকালো পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে নেমে একপাল লোকের অট্টহাসির শব্দ শুনে থমকে গেল।

পুটকাই চুপিচুপি বলল, “মনে হচ্ছে কিছু দুষ্টু লোক অট্টহাসি হাসছে।”

হংসদাদু উত্তেজনায় পুটকাইয়ের হাত চেপে ধরে বললেন, “চুপ কর ওই দ্যাখ কে যেন ল্যাবরেটরি থেকে ছাদে ওঠার গুপ্ত কাঠে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠছে।”

পুটকাই লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে থ হয়ে গেল।

লোকটা ছাদ থেকে একটা দড়ি ঝোলাল বাগানে। তারপর সেই দড়ি বেয়ে নেমে বাগানের হাসনুহানা গাছের গোরাটা খুঁড়ে একটা ছোট কাঁচের জার বার করল। জারটার রঙ ঠিক বোলপুরের লালমাটির মতো। তার মধ্যে একটা ডিমের মতো কিছু সংরক্ষণ করে রাখা রয়েছে। এরপর লোকটা চুপিসারে আবার ল্যাবরেটরিতে এসে হাজির হল।

আরে এই গল্পটা তো দাদুর লেখা। এখন চোখের সামনে ঘটছে।

হংসদাদু আর থাকতে পারলেন না। বললেন, “এখান থেকে চলে চল পুটকাই। ও ভবিষ্যতটা যেমন করে সাজাতে চাইছে সাজাক। তার জন্য আমরা যে সময়-যন্ত্রে এখানে এসেছি সেটা চেপে ওর ফিরে যাবার জন্য দরকার, না হলে এই সাজানো-গোছানো ভবিষ্যৎ সব গণ্ডগোল হয়ে

যাবে।”

হংসদাদু পুটকাইকে এক ঝটকা মেরে টেনে নিয়ে গেলেন শোবার ঘরে। এরপর পুটকাইয়ের হাতে একগাছা দড়ি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, “কাতুকুতুর ওষুধের প্রভাবে ডন সাহেব লোকজন নিয়ে হেসে মরুক। বাড়ির উঠোনে গড়াগড়ি খাক। এখন তুই আমাকে এখানে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে যা। যাতে সব ঘটনা আবার আগের মতো সাজিয়ে যায়!

সব কিছু দাদুর আদেশ মতো করতে করতে পুটকাইইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। সে ভেজা গলায় বলল, “বাবা-ই তাহলে ভবিষ্যৎ থেকে এসে তোমার আবিষ্কার নিয়ে পালিয়েছিল।”

দড়িতে বাঁধা হংসদাদু শান্ত হেসে বলল, “পালিয়েছিল নয়, বল পালাল। ডন সাহেবের লোভের হাত থেকে আবিষ্কারটা বাঁচাতে সেটা সে ঠিকই করেছে বুঝলি। আমি বৃথাই আকাশ পাতাল ভেবে মরলাম! ভাগ্যিস তুই ভবিষ্যতে ডেকে নিয়ে গেলি। যাক, সব ভালয় ভালয় জেনে বুঝে আবার নিজের সময়ে ফিরে এসে বেশ আরাম লাগছে।”

পুটকাই করুণ চোখে দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, “আর আমি? আমি কী করে নিজের সময়ে ফিরব? বাবা,দাদু, ঠাকুমা এসে আমায় খুঁজে পাবে না। আলোমাসিকে বকাবকি করবে। সবাই মিলে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে।”

হংস দাদু মৃদু হেসে বললেন, “তোর দাদুর লেখা গল্পে ডিম ফুটে যে রাজকুমার জন্মেছিল। সে যেন কী পারত? বোলপুরে সেই জ্যোৎস্না রাতে তোর কোথায় যেতে ইচ্ছে করেছিল পুটকাই?” যা, চুপিসারে ল্যাবরেটরির ওই গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে যা। গিয়ে দেখ বোলপুরের সেই রাতের মতো আজও কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে।”

পুটকাই ছাদে গিয়ে দেখল সেই ক্ষুদে সাদা মেঘগুলো চাঁদের রঙ মেখে উড়ে যাচ্ছে। পুটকাই সেই গল্পের রাজকুমারের মতো হাতদুটো ডানার মতো মেলে দিল। সে এবার উড়ে যাবে সময়ের আকাশে। পুটকাই জ্যোৎস্না ভেতর ঘুরপাক খেল কয়েকবার গাছের মাথার ওপরে। তারপর উড়তে লাগল মেঘেদের সঙ্গে মায়া জ্যোৎস্নায়। এরপর হাতদুটো কোমরের সঙ্গে টানটান রেখে হাউইয়ের মতো উড়ে গেল আকাশের গায়ে সাদা দাগ টেনে।

আলোমাসি এখনও নাক ডেকে ঘুমচ্ছে। পুটকাই ছাদে ঝুপ করে ল্যান্ড করল, আস্তে আস্তে গুপ্ত সিঁড়ি বেয়ে নীচের ল্যাবরেটরিতে নেমে এল। তারপর পা টিপে টিপে ঘরে গিয়ে চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। হেডফোনে কান রেখে শুনতে টের পেল আলোমাসির নাক ডাকা থেমে গেছে। এবার সে উঠে বসে পুটকাই ঘুমচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে আসবে।
পুটকাই চাদর টেনে নিল গায়ের ওপর।

সকাল সকাল বাবা ফোন করল। একবার কথা বলেই ছাড়বে। “আরলি টু বেড এণ্ড আরলি টু রাইজ...”। এত বেলা পর্যন্ত পুটকাই বিছানায় শুয়ে কী করছে! পুটকাইয়ের ঘুম ভাঙতে চাইছিল না। সে যেন একটা সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে ডুবে রয়েছে, জেগে উঠলেই স্বপ্নটা ভেঙে যাবে।

আলোমাসি কর্কশ গলায় কাউকে বলছিল, “কাল ভোর রাতে দেখি একটা মস্ত বড় লক্ষ্মীপেঁচা বাড়ির মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। যেন স্বয়ং মা লক্ষ্মীর বাহন, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। আমি তাই উঠে দেখতে গেলাম, কোথাও পেঁচাটাকে দেখতে পেলাম না।”

“লক্ষ্মীপেঁচা?” পুটকাই বাবার ফোনটা শেষ করে ঘুমচোখে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের মুখটা আয়নায় ভাল করে আয়নায় দেখল কিছুক্ষণ।

এরপর চেঁচিয়ে বলল, “আলোমাসি তোমার চোখটা সত্যিই খারাপ হয়েছে। ডাক্তার দেখাও!”

গ্রাফিক্স্- ইন্দ্রশেখর

পুজো সংখ্যা ২০১৬ PART 02

৫৮তম সংখ্যা, ৩৫তম ইনটারনেট সংখ্যা

চয়ন



প্রচ্ছদ শিল্পী-দেবাশিস সিনহা

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী



উমাদিদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা



সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, পুরাণ, ভারতের বনাঞ্চল, জাপানের গল্প · দেশবিদেশের ভূত



মহাশ্বেতা

লোককথা, সিনেমা হল ভূতের আড্ডার গল্প



তাপস মৌলিক

অন্নপূর্ণা, বিজ্ঞাপন, নতুন বই
কার্যনির্বাহী সম্পাদক- শব্দপদ্রুম

জয়ঢাকের ইউনিকোড কম্পোজিটর টিম



মনস্বিনী



দেবপ্রিয়া



ঋত্বিক



মহুল

এই সংখ্যার আঁকিয়েরা



শিবশংকর ভট্টাচার্য



অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়



মৌসুমী



অর্ক



অংশুমান



পিয়ালী



শিমুল



শাম্ব



সংস্মিতা



শ্রীময় দাশ

জয়ঢাক শারদীয় ২০১৬ ২য় খণ্ড

ভ্রমণ	হাঁটছি	অর্ণব চক্রবর্তী
ভ্রমণ	অতীত ভ্রমণের অন্তরালে	রাখী নাথ কর্মকার
ভ্রমণ	বিপাশার বুকে র‍্যাফটের দোলায়	ঊর্মী মুখার্জি
ভ্রমণ	দূরের মাটির ধুলো (ভেনিস)	অরুন্ধতী রায়চৌধুরি
ভূতের আড্ডা	ভূতের গল্প-ফ্লায়িং ডাচম্যান	বিরুপাক্ষ
ভূতের আড্ডা	ভূতের বাড়ি দুঃখী দে মন্ট ও তাঁর	ইন্দ্রশেখর
ভূতের আড্ডা	দেশবিদেশের ভূতেরা-আলেয়া ও উইল অ দ্য উইস্প	সংহিতা
বিদেশী গল্প	ইংরিজি গল্প দখল	ফিলিপ কে ডিক অনুবাদ অমিত
বিদেশী গল্প	রাশিয়ান গল্প-সাত সিমোন	ভেরা জেনোফন্টোভনা অনুবাদঃ দেবজ্যোতি
বিদেশী গল্প	জাপানি-গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্প{অষ্টম পর্ব)	বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ড অনুঃ সংহিতা
বিদেশী গল্প	জাপানি-তিনটে রক্ষাকবচ	সোনালী ঘোষাল
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মাথে মে ট্রিকস-	সূর্যনাথ ভট্টাচার্য
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	সহজ বিজ্ঞান-শ্রুথপ্রসারণ সমাচার	সুজিতকুমার নাহা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মহাবিশ্বে মহাকাশে-সূর্য	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	আবিষ্কারের খোঁজখবর	রাজীব কুমার সাহা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	কেম্যাজিক	পান্নালাল গোস্বামী
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	প্রতিবেশী গাছ-তুলসি	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	লক্ষ করি পক্ষীকে-হাঁড়িচাচা	মনস্বিনী ঘোষাল
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	ভারতের বৈজ্ঞানিক-বীরবল সাহনি	সংহিতা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	টেকনো টুকটাক-আগুনের গল্প	কিশোর ঘোষাল
বনের ডায়েরি	ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প -বিষ্ট অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়ার	পিয়ালী চক্রবর্তী, (মূল লেখাঃ লকউড কিপলিং)
বনের ডায়েরি	ভারতের বনাঞ্চল-পূর্ব হিমালয়ের বায়োডায়ভার্সিটি হটস্পটে	সংহিতা
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	জুপিটারের গভীরে	ঋত্বিক
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	কাঁকড়ামশাই	অধিরাজ দেবনাথ

বনের ডায়েরি	নাগজিরা	স্বপ্না লাহিড়ী
জাতক কথা	মরুভূমির পথে	নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়
ছড়ার পাতা	বরফঝড়ের রাত	নাতালিয়া ইউরকোভা। অনুবাদ
ছড়ার পাতা	পক্ষিরাজ গোরু	রোয়াল্ড ডাহ্‌ল অনুবাদ কৌশিক
ছড়ার পাতা	বিল্লিনামা	টি এস এলিয়ট অনুঃআবু হোসেন
ছড়ার পাতা	ইশকুলে মুশকিল	মৃন্ময় ঘোষ
ছড়ার পাতা	মহাকাশ অভিযান	অরুণাচল দত্তচৌধুরি
ছড়ার পাতা	লোকটা	দেবাশিস বসু
ছড়ার পাতা	ম্যাওবাচ্চা	সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
ছড়ার পাতা	ছুটির গপ্পো	তাপস শঙ্কর ব্রহ্মচারী
ছড়ার পাতা	পাখির গল্প	প্রসেনজিত চক্রবর্তী
ছড়ার পাতা	ও চাঁদ	প্রিন্স মাহমুদ হাসান
ছড়ার পাতা	আমার আছে	রওশন মতীন
ছড়ার পাতা	দূরন্ত দুপুরে	রুচিস্মিতা ঘোষ
ছড়ার পাতা	নীলখামে আঁধারের কথা	মনসুর আজিজ
ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	ভ্রুভ্‌ল	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	মগজ ধোলাই	রণিত পাল
ধাঁধা মজা রহস্য	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক উপন্যাস	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস
ধারাবাহিক উপন্যাস	জাদু রাজ্য	মুরাদুল ইসলাম
কাতকত	মানুষ শিকার পদ্ধতি ইত্যাদি	রসিকলাল দাস
স্মরণীয় যাঁরা	সীতারাম রায়	উমা ভট্টাচার্য
টাইম মেশিন	ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী
টাইম মেশিন	সীমান্তের অন্তরালে	সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
টাইম মেশিন	ইতিহাসের খন্ডচিত্র-হরিনাথ দে	বাসুদেব দাস
টাইম মেশিন	ইতিহাসের খন্ডচিত্র-দিপালী সিনহা	অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়
টাইম মেশিন	ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ -অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
লোককথা	সারস পাখির পালক	মৌসুমী রায়
সেই মেয়েরা	শ্রীমতী ইংবোর র‍্যাপোর্ট	উমা ভট্টাচার্য
ক্যামেরার পেছনে	ওয়ান টু থ্রি ক্লিক	শম্পা গুহমজুমদার
এস গান শুনি	সুরঢাক	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
ধারাবাহিক অভিযান	এভারেস্ট	এরিক শিপটন অনুবাদ বাসব
ধারাবাহিক অভিযান	অন্নপূর্ণা	মরিস হারজগ অনুবাদ তাপস মৌলিক
ধারাবাহিক অভিযান	কনটিকি অভিযান	থর হেয়ারডাল অনুবাদ ইন্দ্রনাথ



অর্ণব

দুয়ার তব রেখেছ খুলি...হে মৌন ঋষি

জীবনে প্রথমবার উত্তরাঞ্চলে যাব, বেশ একটা রোমাঞ্চ থরোথরো ব্যাপার। তার উপর সেই বছরই জানুয়ারির শেষে লাল টুকটুক বউটিকে নিয়ে গোয়া ঘুরে এসেছি। আর এখন সেপ্টেম্বর, প্রায় উনিশ দিনের প্রোগ্রাম, তায় সাথে থাকবে আমার লাল টুকটুক বউটি। উত্তেজনা তো হবেই। সেই উত্তেজনার আগুনে ঘি পড়ে যখন লাখনউ থেকে ন্যারো গেজের ট্রেনটা ছাড়তেই হাতে এসে পড়ে তুণ্ডে নবাবের বিরিয়ানির বাক্সটি।

সুহানাল্লা একেবারে। জয় হোক সৌরভদার [সৌরভ বিশ্বাস]। এরপর বেশ কিছু ধরনের পথ ও যানবাহনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পৌঁছই সঙ গ্রামে। এবারের হাঁটা শুরু এখান থেকেই। খালিধার বাংলোর চৌকিদার আমাদের খুব অভয় দেন, বিশেষ করে রাজ্যশ্রীকে - দেখো, বিটি ঠিক ভালভাবে ঘুরে আসবে।

আমারাও জয় মা মাইকতোলি বলে নেমে পড়ি, সামনে যে ঢাকুরির চড়াই, জার্মানদের লড়াই। এরপর ... সেই দুরতিক্রম্য ঢাকুরি পাস পেড়িয়ে ঠিক তার ওপারে এসে দাঁড়াই, সামনে খুলে যায় সেই দৃশ্য, যার জন্য আমার নিয়তির একটি স্থানাঙ্ক নির্ধারিত হয়ে যায় - হিমালয়, ঠিক যেভাবে বাবু জীবনানন্দ রক্তের মধ্যে কবিতার অসুখ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেভাবে ঢাকুরি আমার জীবনে জুড়ে দিয়ে গেল মগ্ন ঋষির মত হিমালয়কে, যার কাছে ছুটে যাওয়া ব্যাতিরেকে আমার শান্তি নেই।

ঢাকুরি পাসে দাঁড়িয়ে আছি, বেশ কিছুটা নীচে এক সবুজ গালচের উঠোন, ছোট ছোট দু চারটি ঘর, ঘরের পিছনে পাথরের তৈরি একটা ছোট পাঁচিল, উঠোনটির বাঁদিকে সবুজ পাহাড়ের ঢাল উঠে গেছে বুকে পাইন গাছের অলংকার নিয়ে, আর ওই পাঁচিলটার পরেই যেন উঠোনটা ঝাঁপ দিয়েছে এক অসীম খাদে, যার অন্য পারে নীলের ক্যানভাসে মাথা তুলে জেগে তুষারের বর্শা ফলার মত একে একে - মাইকতোলি , বালজউরি , পানোয়ালিদুয়ার।

এর পরের কয়েকদিনে পরিষ্কার হয়ে যায় এই পথের অমোঘ বৈশিষ্ট, উচ্চতর সবুজে ঢাকা পাহাড়ের গভীরে গভীরে এক পথ সুন্দরডুঙ্গা নালার হাত ধরে চলে গেছে সেই মাইকতোলি বেসিন পর্যন্ত। প্রথমদিকে একটু ঘাবড়ে গেছিলাম - একীরে বাবা, এ কীরকম ট্রেক, কোন সাদা বরফে ঢাকা শৃঙ্গ তো দেখাই যাচ্ছে না। কিন্তু দু'এক দিনের মধ্যেই প্রেমে পড়ে গেলাম সেই পাহাড়ি পথের। অগুন্তি জলপ্রপাত, গাঢ় সবুজের বুনট, সুন্দরডুঙ্গা নালার অবিরল নুপুর বাজিয়ে বয়ে চলা, কখনো খুব কাছে আবার কখনো অভিমানে যেন বেশ দূরে।

সেই পথের মাঝে এক নিবিড় পাহাড়ি গ্রাম জাতোলি, বড় অদ্ভুত ব্যাপার হল সেই গ্রামের বাইরে এসে দাঁড়ালে শোনা যায় সুন্দরডুঙ্গার প্রবল পরাক্রান্ত ভাবে বয়ে চলার শব্দ, কিন্তু গ্রামের ভিতরে তার ছিটেফোঁটা শোনা যায় না। এই গ্রাম ছেড়ে আরও এগিয়ে পাই এক ধ্বসে ফুটিফাটা হয়ে থাকা অঞ্চল, কমবেশি দুশো ফুট নিচে ভয়ঙ্কর জলধারা গিলতে আসছে যেন। প্রায় এক কিলোমিটার এই প্রায় পড়ে গেলাম পড়ে গেলাম করতে করতে পেরিয়ে এসে হাঁফ



ছেড়ে ভাবি ধন্য নাম এই জায়গার - ঢুনিয়াঢঙ।

শুধু কি এই, এরপর পেরোতে হল প্রায় ষাট ডিগ্রি হেলে থাকা এক পাথরের চট্টান, যার উপর দিয়ে ক্ষীণ কটিদেশ নিয়ে বয়ে যাচ্ছে চপলা এক ধারা, আর তাকে টপকাতে গিয়ে সারা শরীরের ভারসাম্য প্রায় শূন্য। হাতে হাতে ধরি ধরি করে কোনক্রমে পেরিয়ে গিয়ে জানতে পারি - বাবা মা তাদের ছোট নালাটিকে আদর করে নাম রেখেছেন ভৈরব নালা। কী উপযুক্ত আর মানানসই নামকরণ। যাইহোক, এই পথে বৈচিত্রের যা সমারোহ তা সম্পূর্ণ এই পরিসরে বলা কঠিন। এই অভিমুখে যাত্রার শেষ রাত আমরা কাটাই সুখরাম গুহা নামক জায়গায়। তাঁবু জীবন। এক বিশাল হেলে থাকা পাথরের এক গুহা যেখানে অনায়াসে কুড়িজন রাতে থেকে যেতে পারে, তারই নাম সুখরাম গুহা। নিশ্চয়ই কোন সরল পরিশ্রমী মেষপালকের নামে এই গুহা নামাঙ্কিত। 'রাম' পদবি এই অঞ্চলের নিম্নবর্গের হয়ে থাকে।



কিন্তু কে নিম্নবর্গ আর কে উচ্চ সে কি আর পদবি ধরে হয়! যেমন একটি ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে, সুখরাম গুহায় যেদিন পৌঁছেছিলাম তার পরদিন ছিল বিশ্রাম। আমরা রুকস্যাকহীন ভারমুক্ত এগোলাম উত্তর পশ্চিমে, ক্রমশ ভানোটি, থারকোট, টেন্ট শৃঙ্গ চোখের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে, কিন্তু রাস্তাহীন ধূসর ঘাসের টানা

চড়াই আমাদের দমের কড়া পরীক্ষা নেয়া শুরু করে। দু'একজন পিছিয়ে পড়ে ক্রমাগত। হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখি পরম যত্নে আমাদের দলের গোপালদা, ভারারির বাসিন্দা, আমাদের দলের সাহায্যকারী স্থানীয় মানুষ গোপাল রাম, রাজ্যশ্রীর হাত ধরে ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে উঠে আসছেন। প্রথমত লজ্জা লাগল আমার, সেই বেদম চড়াই পথে রাজ্যশ্রীর পাশে না থেকে নিজের ছন্দে উঠে আসায়, দ্বিতীয়ত মনে হল ভানোটি, থারকোট, টেন্ট প্রভৃতি শৃঙ্গের মধ্যে আরেকটি শৃঙ্গ যেন চোখের সামনে বৃহৎ হয়ে উঠছে - গোপাল রাম। এইসব নাম না জানা অপরিচিত শৃঙ্গের সাক্ষী থাকতেইতো বারবার ফিরে আসা হিমালয়ের গহনে।

সে যাত্রায় ফেরার পথে আমরা তিনজন হঠাৎ ঠিক করি এত কাছে যখন এসেছি, দেবীকুণ্ড নামক লেকটি দেখে ফিরব। দলের বাকিদের শরীরের ক্লান্তি তাদের কাঁঠালিয়া ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের মেষপালকের ঘরের দিকে হাতছানি দেয়। অতএব আমরা তিনমূর্তি বড় পাথরের খাঁজে আমাদের স্যাকগুলো রেখে প্লাস্টিক ঢাকা দিয়ে উপরের দিকে মাটি আর পাথর বেয়ে টানা চড়াই উঠতে শুরু করি। বেশ কিছু পথ পেরিয়ে দেখা মেলে ব্রহ্মকমল, আরও কিছু পথ পেরিয়ে সেই পবিত্র হ্রদ - দেবীকুণ্ড। ষাট সত্তর মিটার ব্যাসার্ধের একটা জলাশয়, চারদিকে গুঁড়িগুঁড়ি পাথরে পূর্ণ পাহাড়ের ঢাল উঠে



গেছে, গায়ে তার গুঁড়ো বরফের আস্তরণ। হ্রদের ধারে বিস্কিট দিয়ে আমরা সামান্য পুজোর আয়োজন সমাপ্ত করে পিছনে ফিরতেই দেখি, সাদা ধুসর মেঘের একাংশ মুছে দিয়ে জেগে আছে বালজউরি শিখরের ছুরির ফলার মত গা। কিছুক্ষণ মোহিত হয়ে চেয়ে থাকা আর তারপর গতি বাড়িয়ে নেমে চলা। বন্ধুরা যে আমাদের জন্য দুশিন্তায় থাকবে!

দিনের শেষে নেমে আসি কাঁঠালিয়া - একখণ্ড সবুজে ছাওয়া মাঠ, যার আঙিনায় এসে মিশেছে মাইকতোলি আর সুখরাম নালা, আর রংবেরঙের পাথরের অলঙ্কারে সেজে সুন্দরডুঙ্গা নাম নিয়ে নুপুর পায়ে চলেছে পিণ্ডারি নালার সাথে চির আলিঙ্গনে ব্যাপৃত হওয়ার জন্য।

আমরাও নেমে আসি সুন্দরডুঙ্গাকে অনুসরণ করে, আর দু'দিনের মাথায় প্রবেশ করি পিণ্ডারি উপত্যকায়। এবার আমাদের সঙ্গী মায়াময় এক উৎস অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসা পিন্ডার নালা। উপত্যকার প্রথম গ্রাম খাতি, বেশ বর্ধিষ্ণু, স্কুল আছে, দোকান আছে আর আছে বনবাংলো, যার হাতায় আমরা বিছিয়ে নিই রাতের আস্তানা। এর ঠিক দু'দিনের মাথায় আমরা পৌছই কাঙ্ক্ষিত পিণ্ডারি জিরো পয়েন্টে, যার অনতিদূরের গ্লেসিয়ার থেকে জন্ম নিয়েছে এই চির-চঞ্চলা কিশোরী পিন্ডার।

কপালগুণে যথারীতি একটি পরিত্যক্ত মেষপালকের ঘর জুটে যায়, আর আমরা নামিয়ে রাখি লম্বা দিনের ক্লান্তি। একটু ধাতস্থ হতেই চোখে পড়ে একটি মন্দির আর তার লাগোয়া একটি ঘর। গুটিগুটি এগিয়ে গিয়ে আলাপ হয় বাবা ধর্মানন্দের সাথে, কঠোর কোমল এই হিমালয়ের অন্দরে যিনি ঈশ্বরীর সাধনায় মেতে আছেন - সঁপে দিয়েছেন মা নন্দাদেবীর আরাধনায়। অবাক হই তাঁর কুড়ির কোঠার বয়সের নিষ্ঠা দেখে, আরও অবাক করে তার হেঁশেলের কলেবর। কুণ্ঠিতভাবে বাবা জানান, জনাচল্লিশ দর্শনার্থীকে তিনি একবেলার সেবা করাতে সক্ষম। আমরাও ভাগ্যবান, বাবার কাছে গরম খিচুরির সেবা গ্রহণ করি, চূড়ান্ত নাস্তিকের দল যেন সাময়িক আধ্যাত্মিকতার স্রোতে সাঁতার দিয়ে উঠি।



অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। আগামি দিন বিশ্রাম, তাই রাতের খাওয়া সেরে আমরা অলসভাবে গরম জামাকাপড় মাফলার গ্লাভস ইত্যাদি চাপিয়ে ছানের বাইরে এসে দাঁড়াতেই এক স্তব্ধতার গান যেন আমাদের বিদ্ধ করে। হাতের নাগালের মধ্যে বাঁদিক থেকে ডানদিক জুড়ে জেগে আছে একে একে নন্দাখাত, নন্দাভানার, ট্রেলস পাস, ছাঙ্গোছ, নন্দাকোট। তাদের সারা শরীরে চাঁদের রুপোলী মায়ার স্রোত, মাথার উপর এক অনন্য রাতের নক্ষত্র-খচিত শামিয়ানা। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, শুধু অনুভব করছিলাম - সমস্ত গ্লানি, নীচতা, দ্বেষ, অভিমান যেন ধুয়েমুছে সবুজ গালচে বেয়ে পিন্ডারের তুমুল হর্ষে মিশে যাচ্ছে।

প্রায় ষোল বছর হয়ে গেল - লালকুয়া হয়ে এপথে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু আজো সব ছোটোবড়ো ঘটনা চোখের সামনে ভাসে। মাঝে মাঝেই মনে হয় কাঁঠালিয়ায় সেই বিশাল পাথরটা, যেটা সুন্দরডুঙ্গার উপরে এক প্রাকৃতিক সেতু তৈরি করেছে, যেটা পেরিয়ে অপর পাড়ে গিয়ে মাইকতোলি বেসিনের দিকে এগোতে হয়, সেটা সেই আগের মতোই আছে তো? কেমন আছে কমল, ওয়াছাম গ্রামের কমল রাম, কাজের খোঁজে ভারারি এসে আমাদের হোটেলের আসে পাশে যে ঘুরঘুর করতে থাকে। অবশেষে তাকেও দলভুক্ত করে নেয়া হয়। তারপর ঝড়ে, বৃষ্টিতে, পিছল পথে, ভোর রাতের চায়ে, কমল হয়ে ওঠে আমাদের ঢক্কন - আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। মনে পড়ে দলনেতার খুড়োর কলের



টোপ, পিন্ডারি জিরো পয়েন্ট থেকে সেদিন আমাদের সরাসরি খাতি গ্রামে নেমে যাওয়ার পালা, দলনেতা বলে দিলেন, খাতি পৌঁছে সক্কলকে ডবল ডিমের অমলেট খাওয়াবেন। আর যায় কোথা, সেই ডবল ডিমের অমলেটের টানে আমরা প্রায় উড়তে উড়তে পৌঁছলাম খাতি, সন্ধ্যা নামার কিছু আগে। ডবল ডিমের অমলেটের অর্ডার গেল দোকানে, সেই মুহূর্তে রাজ্যশ্রী গম্ভীর মুখে জানালো, সে দুটি ডিমই খাবে, কিন্তু সিঙ্গল সিঙ্গল অমলেট করে। কারণ জানতে চাইলে

মুচকি হেসে বলে - তোমাদের ডবল ডিমের অমলেট তাড়াতাড়ি শেষ হবে আর আমি তারিয়ে তারিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দুটি অমলেট খাবো। বোঝো তাহলে, পাহাড় যাদের ডাকে, তাদের গভীরের ছেলেমানুষিটাকে নিংড়ে বের করে নেয়ার দায়িত্বও সে তুলে নেয় হাতে। বেশ মনে পড়ে হিন্দোলের সেই বিস্ফারিত চোখ, যখন কাঁঠালিয়া নেমে এসে সে বলছিল তার একা হয়ে যাওয়ার গল্প, চারিদিক সাদা মেঘে ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে, বন্ধুরা এগিয়ে গেছে অনেকটা, হিন্দোল একটু জিরিয়ে নেওয়ার আছিলায় মখমলি ঘাসে শরীরটা এলিয়ে দিতেই মেঘের একচিলতে ফাঁক দিয়ে দেখে, কিছু শকুন ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঠিক মাথার উপর, যেন ওত পেতে আছে কখন মনুষ্যজীবটি গত হবে আর তারা ধেয়ে এসে গিলে নেবে তাকে।

এই আমরা যারা পাহাড়ে যাই, যেতে থাকি বা যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই অবিরত, তাদের এই নগণ্যতার, নিশ্চিহ্নতার অনুভুতিও ঘুরেফিরে আসে বৈকি। আর ঘুরেফিরে আসে খালিধার বাংলোর সেই রাতটা। রাতের খাওয়া সেরে বাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় বসে আছি আমি আর শান্তনুদা, রাতের চরাচর জুড়ে বিস্তৃত নিকষ অন্ধকার আর নিস্তব্ধতার সাথে সমপ্রাণে সমাহিত হতে হতে হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, কমল বাংলোর হেঁশেল থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ভালু ভালু বলে ছুটে আসছে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পড়িমরি করে আমরাও ছুটে বাংলোর মধ্যে ঢুকে দরজার খিল তুলে দি। তারপর এর ওর মুখ চেয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি। অবশেষে যথারীতি সৌরভদার নেতৃত্বে একটা লাঠির ডগায় কাপড় জড়িয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে মশাল বানানো এবং ভালুর সন্ধানে বা বলা ভাল, ভালু তাড়াতে বেরিয়ে পড়া। বাংলোর চারদিকে আমরা চক্রাকারে ঘুরতে থাকি ভালুর সন্ধানে। সেই চক্রবৃত্ত দলের শেষতম সদস্য হিসেবে আমি দুরুদুরু বুকে যেন পরিখা কাটতে থাকি সমস্ত মনের কোনে লুকিয়ে থাকা দীনতা আর ভয়ের বিপ্রতীপে। যে ভয়ের ঊর্ধে ওঠার বাসনা আমায় আজো তাড়িয়ে বেড়ায়, ডাক দিয়ে যায় সকালের রৌদ্র-আলেখ্যে এলিয়ে থাকা অলস লালকুয়া স্টেশন।





রাখী নাথ কর্মকার

ঠুমরি জানে,এই শিরশিরাণি এখন ডালপালা মেলবে তার মনের গভীর অতলেও। মনের উৎসুক চিলেকোঠায় ওর ইচ্ছে হয়ে জমে আছে কিছু গুপ্ত মুহূর্ত আবিষ্কারের নেশা। ইউ এস ক্যাপিটল নিয়ে শোনা হাজারো গুজব,লক্ষ জনশ্রুতির মধ্যে গল্পের বইএর পাতায় এক কোণে দুলাইনে সেরে দেওয়া সেই অনামী শ্রমিকের কষ্টের সাতকাহন। ইউ এস ক্যাপিটল তৈরির সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জাহাজভর্তি করে নিয়ে আসা শ্রমিক আর ক্রীতদাসের দল কত কষ্ট,কত না দুঃখের পাহাড় ভেঙে তৈরি করেছিল এই সুবিশাল ইমারত! ঠুমরি জানে,দাসপ্রথা একটি অভিশাপ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সব শাসনব্যবস্থাতেই দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। অবশেষে আঠারো শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটেছিল।

এই ইউ এস ক্যাপিটলের ফাউন্ডেশন অর্থাৎ ভিত নির্মিত হয়েছিল ১৭৯৪ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে। চাঁদিফাটা গরম,অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর অবিরাম তুষারপাতের মত নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করেই অগুনতি দাস ও শ্রমিক এই মহিমান্বিত ইমারত নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ খেটে গিয়েছিল।

সেই অসংখ্য শ্রমিক ও দাসেদের মধ্যেই এক অনামী শ্রমিকের অস্বাভাবিক,গোপন মৃত্যু ঘিরে শোনা এক অদ্ভুত গুজব ঠুমরিকে অস্থির করে তুলেছে গত কয়েকদিন ধরেই। সে এক অনামী শ্রমিকের গল্প, যিনি ক্লান্ত দুপুরের পরিশ্রান্তিতে চুপি চুপি সবার অলক্ষে একাকি গিয়ে শুয়েছিলেন নির্মীয়মাণ ফাউন্ডেশনের এক নির্জন,নিঝুম কোণে। তারপর? তারপর নাকি সবার অজান্তেই,তার গভীর ঘুমের মাঝেই নাকি ভিতের সেই অংশের নির্মাণ কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। কেউ জানতেই পারেনি, এক কোণে ঘুমিয়ে থাকা এক শ্রমিকের শরীরের ওপর স্যান্ডস্টোনের পাহাড় জমে গেছে,সেই পাহাড়ের নীচে সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেছে একটি তরতাজা প্রাণ। আজও নাকি ক্যাপিটলের দেওয়ালে দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায় সেই অবরুদ্ধ মানুষটির হাহাকার! গভীর রাতে নাকি ক্যাপিটলের দেওয়ালে দেওয়ালে নখের আঁচড় শুনতে পাওয়া যায়, শুনতে পাওয়া যায় অদ্ভুত গোঙানি-কেউ যেন কিছু বলতে চাইছে...নাকি মুক্তি চাইছে সেই চিরন্তন মৃত্যুরূপী কারাগার থেকে?

এটা কী সত্যি,নাকি কেবলই গুজব? সুলেমান শাহসাহেব বলেছিলেন বটে, অতীতকে বদলানোর কোন ক্ষমতাই তার এই আওয়ার গ্লাসটার নেই। কিন্তু...

ঠুমরি কী করবে? সেই সময়ে ফিরে গিয়েই বা কী করতে পারবে ও? যা ঘটে গেছে তাকে তো আর বদলাতে পারবে না। তবু..মনের মধ্যে ওর খচ খচ করতে থাকে একটা 'তবু'! কী বলতে চায় লোকটি? আঁচড়

কাটার ভুতুড়ে চেষ্টা কি শুধুই বদ্ধ কালকুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষায়? নাকি অন্য কোন কারণ আছে তার? মনের মধ্যে ওর গুচ্ছের প্রশ্ন,অবাধ্য কৌতূহলের ঢিবি জমতে থাকে।

রেস্টরুমের একাকি অবসরে পকেট হাতড়াতে থাকে ঠুমরি। এই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষাতেই তো ছিল ও! পকেট থেকে আওয়ার গ্লাসটা বার করে চোখ বুঁজে খালি মনে করতে থাকে সেই তারিখহীন,নামহীন,গোত্রহীন অবহেলিত দিনটার কথা। যে দিন... যে দিন...

ঠুংঠাং,খুটখাট,ধুপধাপ-চারিদিকের বিচ্ছিরি সব আওয়াজে ঠুমরির ঘোলাটে চোখের নেশালু ঘোরটা কেটে যায়। চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখে, কী সুবিশাল এক কর্মকান্ডের সাক্ষি হতে চলেছে ও! এটাই কি সাউথ উইং? এই সাউথ উইং-এরই অনেকটা অঞ্চল জুড়ে কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে এখন। ঠুমরি ঘুরে ঘুরে অবাক হয়ে দেখতে থাকে, কী অসাধারণ দক্ষতায় শয়ে শয়ে লোক একমনে কাজ করে চলেছে! এর মাঝে সেই অনামী শ্রমিকটিকে সে পাবে কোথায়? এযে খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতই অবস্থা! নাঃ,এবারটি বোধহয় আর ঠুমরির ইচ্ছেপূরণ হবে না!

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতেই হঠাৎ ওর চোখে পড়ে একটা বিশাল ফাউন্ডেশনের একটা অংশে



স্যান্ডস্টোন দিয়ে ভরাট পর্ব চলছে। বিরাট লিফটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের সাহায্যে বিশাল বিশাল স্যান্ডস্টোনের চাঁই বসানো হচ্ছে বিস্তীর্ণ ফাউন্ডেশন জুড়ে। কিন্তু একী! দড়ি ছিঁড়ে হঠাৎই যে একটা স্যান্ডস্টোনের চাঙর ভেঙে পড়তে শুরু করেছে নীচে, আর ঠিক নীচেই-ও কী? ফাউন্ডেশনের সেই কোণেই পিঁপড়ের মত একটা মানুষের অবয়ব! মানুষটা চাপা পড়ে গেছে স্যান্ডস্টোনের চাঁইয়ের নীচে। এখনো বেঁচে আছে সে,পাথরের নীচ থেকে লিকপিকে হাত একটা বেরিয়ে আছে, থরথরিয়ে কাঁপছে সেটা! এখুনি চাঁইটা সরালে হয়ত বাঁচানো যাবে তাকে। ওই বিশাল স্যান্ডস্টোন কেটে তাকে বার করা-খুব কঠিন হলেও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু কারো মধ্যেই যেন কোন হেলদোল নেই! কয়েকজন শ্রমিক কাজ থামিয়ে বেদম চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলেও কোত্থেকে একজন হুমদোমতন

হোমড়াচোমড়া লোক এসে ঘোষণা করতে শুরু করেছে-"অসাবধানতার ক্ষমা নেই। দুর্ঘটনা যে কোন সময়েই ঘটতে পারে। যারা কাজ করতে চাও,কাজ চালিয়ে যাও। আর যারা করতে চাও না,আজকের হিসেব বুঝে নিয়ে বিদেয় হও। তবে কাল থেকে তারা আর এমুখো হওয়ার স্পর্ধা দেখিও না!"

সব চিৎকার চেঁচামেচি থেমে গেছে। ক্ষমতাবানের নিষ্ঠুর অমানবিকতার তলায় চাপা পড়ে গেছে অতি সাধারণ একটি প্রাণের বেঁচে থাকার আকূতি! ঠুমরি চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল-ওর গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পাবে না এখানে। কিন্তু একটা গোঙানি কানে আসছে যে ওর! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, সেই আটকা পড়া মানুষটি কী যেন বলছে–

"ডাউনটাউনের অস্থায়ী ক্যাম্পে-আমার মা হারা মেয়ে লিন্ডা-ক্যাম্পের পুবকোণে ওক গাছ আর বেড়ার মাঝে মাটির তলায় পুঁতে রেখেছি কিছু টাকা..."

গলার আওয়াজ ফিকে হয়ে আসতে থাকে। ঠুমরি অসহায় আকুতিতে ছুটে বেড়াতে থাকে সাউথ উইংসের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। কীভাবে বাঁচানো যায় লোকটিকে? কীভাবে কিছু করা যায়? কিছুই কি করা যায় না?

নাহ্!এতগুলো লোকের নির্বিকার ব্যস্ততার মাঝে চাপা পড়ে গেছে সেই পাথরচাপা শ্রমিকের গোঙানি! নানা যন্ত্রপাতির আওয়াজ। স্যান্ডস্টোন নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনে কাটার আওয়াজ। কর্মরত মানুষের হইহট্টগোল। উফ,ঠুমরির মাথাটা কেমন যেন ঘুরে যায়! একটা পিলারে কোনমতে বায়বীয় শরীরটাকে ঠেকো দিয়ে নিজেকে সামলে নেয় ঠুমরি। ইশ, কিছুই করা গেল না! কিছুই করতে পারল না ও। তাহলে এই মুহূর্তটায় এসে পৌঁছেই বা কি লাভ হল ওর? আওয়ার গ্লাসটা ওকে ঠিক এমন সময়েই এখানে এনে ফেলল যখন ওর সত্যি কিচ্ছু করার ছিল না। ইতিহাসের অতীত বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলিকে মুছে ফেলতে পারবে না ও জানে। তবু .....তবু কেন মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠছে অক্ষমতার অতৃপ্তি?

হঠাৎ কী মনে হতে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল ঠুমরি। অস্থায়ী ক্যাম্প-ওক গাছের তলা...লিন্ডা। ডাউনটাউনে এখান থেকে কীভাবে যাবে ও?

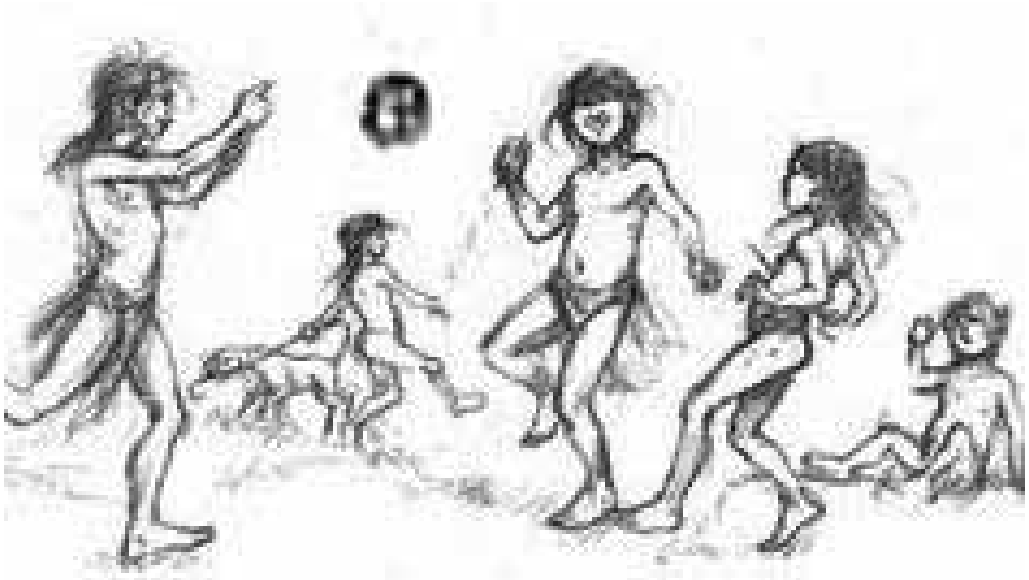
ও বাব্বা! ভাবতে না ভাবতেই দেখে একটা বিশাল ওক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। দূরে ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী ক্যাম্প। কয়েকটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে রৌদ্রজ্জ্বল মাঠে। সময়টা বোধহয় শরতের শুরু। ওক গাছটার কোলজুড়ে তামাটে ঝরা পাতার রাশি গালিচা বিছিয়ে আছে। ওক গাছ আর কাঠের ভাঙাচোরা বেড়াটার মাঝে একটুখানি ফাঁক। তাহলে এখানেই..

"লিন্ডা। কিক দ্য বল!" ছেঁড়া ছেঁড়া কাপড়ের গুটুলি পাকানো একটা পুঁটলিকেই বল করে ওরা মনের আনন্দে খেলে যাচ্ছে। বছরসাতেকের ছোট্ট একটি কালো মেয়ে, কালো কোঁকড়ানো চুল ঝাঁপিয়ে পড়েছে রোগা কাঁধের কোণ বেয়ে,পায়ে বলটা পেয়ে কী খুশি কী খুশি!

ঠুমরি জানে,কেবল হাওয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া ঠুমরির কিচ্ছু করার নেই।হাওয়া!তাইতো! হাওয়ার শক্তিকেই কাজে লাগাতে হবে।এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ!যা করবার এক্ষুণি করতে হবে!ঠুমরি চট করে এক পাক ঘুরে নেয় বলটার চারপাশে।

হঠাৎ দমকা একটা হাওয়ায় বলটা পাক খেয়ে ঘুরে যায় লিন্ডার পায়ের কাছে। লিন্ডা বলটায় কিক মারতেই যাচ্ছিল,আচমকা বলটাকে লাট্টুর মত পাক খেয়ে যেতে দেখে থমকে যায়। কিন্তু সে কয়েক সেকেন্ডমাত্র-চারপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে –"কিক,লিন্ডা কিক!"

লিন্ডা লিকপিকে শরীরে গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে বলটায় একটা শট মারে। কিন্তু অবাক কান্ড, বলটা যে দিকে যাওয়ার কথা সেদিকে না গিয়ে প্রবল এক হাওয়ায় ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে উলটে পড়ে ওক গাছটার গোড়ায়। শুধু পড়েই ক্ষান্ত হয় না, লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে আবার এসে পড়ে লিন্ডার পায়ে। লিন্ডা শট মারার আগেই বলটা আবার গিয়ে লুটোপুটি খেতে থাকে গাছটার গোড়ায়। বাচ্চাগুলো ভয়ে থমকে গেছে। লিন্ডার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। শুধু দুএকটি সাহসী ছেলেমেয়ে, বয়সে খানিক বা বড়ই হবে, কি যেন অনুমান করে –"ম্যাজিক। লিন্ডা ম্যাজিক। বলটা তোর বাধ্য হয়ে গেছে। কিক,লিন্ডা কিক!" একজন আবার দৌড়েছে ক্যাম্পের ভিতরে, পরিবারের বড়োদের ডেকে আনবে বলে।



ঠুমরি প্রবল বেগে পাক খেয়ে যাচ্ছে বলটার চারিদিকে। ঘূর্ণির মত পাকিয়ে ঝড় উঠেছে ওক গাছের তলায়। শুধু এটুকুই তো ওর ক্ষমতা। এই ক্ষমতাটাকে কাজে লাগিয়েই তো অসাধ্যসাধন করতে হবে। ঝরে পড়া শুকনো বাদামী পাতার আড়াল সরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নরম মাটি- মাটিটা খোঁড়া হয়েছে টাটকা টাটকা,ঝুরো মাটির গুঁড়ো,ভেজা সুবাস,উল্টেপাল্টে যাওয়া সবুজ ঘাসের প্রলেপ -ঠিক সেইখানটিতেই বলটাকে ঘিরে প্রাণপণে পাক খেয়ে যাচ্ছে ঠুমরি।

বলের ঘষায় নরম মাটিতে আঁচড় কেটে বসছে বলটার শরীর। পরিবারের বড়োরা অনেকেই দৌড়ে এসেছিলেন মজা দেখবেন বলে। অনেকেই প্রথমে ভয় পেলেও, দু'একজন এগিয়ে এসে মন দিয়ে দেখে যেতে লাগলেন বলটার কান্ডকারখানা। বলটা ঘুরেই যাচ্ছে। মাটি কেটে বসছে। তবে কি এর কোন উদ্দেশ্য আছে? মাটিটা খুব সম্প্রতি খোঁড়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না? একজন হাঁক পাড়েন-"কোকো, ব্রিং মি দ্য শাভেল!"

বলটা থেমে যায়। বাধ্য ছেলের মত একটা কোণায় সরে গিয়ে জায়গা করে দেয় চুপচাপ। মাটি খোঁড়ার ঝুপঝাপ আওয়াজ। কয়েকটা কোপ মারতেই একটা কাপড়ের পুঁটলি ছিটকে উঠে আসে বেলচার কোণার খোঁচা খেয়ে। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পুঁটলিটার ভিতরে একটা কাগজে হিসেব লেখা-লিন্ডার খাইখরচার হিসেব, লিন্ডাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেওয়ার পরেও আর কত থাকবে সেই হিসেব। লিন্ডা একটু বড়ো হলে যাতে অন্নের জন্য ওকে অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে না হয়-তারই প্রস্তুতির গন্ধ যেন লেগে আছে ঝনঝনে পেনি আর এলোমেলো ডলারের গায়ে গায়ে!

ঠুমরি জানে, সে সময়কার অনেক মেয়েরাই সীমসট্রেস অর্থাৎ দর্জির পেশায়, সেলাইএর কাজ করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিজের ও সংসারের প্রতিপালন করতেন। বেটসি রসের কথা ঠুমরি শুনেছে-যিনি আমেরিকার প্রথম পতাকা সেলাই করে দিয়েছিলেন,আজো তিনি বেঁচে আছেন ঐ লাল,সাদা-নীলের উচ্ছ্বাসের মাঝে,আপামর আমেরিকাবাসীর হৃদয়ের গভীরে!

ঠুমরির মাথাটা ঝিমঝিম করছে কেন? তবে কি-তবে কি আওয়ার গ্লাসের সময় ফুরিয়ে এসেছে? ঠুমরি চোখ কচলে তাকায়,লিন্ডার চোখে উপচে পড়েছে হীরের দীপ্তি,গালের কোণে চিক চিক করছে বিকেলের অবাক শিশির! তবে কি লিন্ডা বুঝতে পেরেছে-ওর বাবা আর নেই? আজ রাতে কাজের শেষে যখন সবাই ক্যাম্পে ফিরে আসবে-একা লিন্ডার বাবা তো আর ফিরবে না! কোনদিনই ফিরবে না।

কিন্তু ঠুমরির যে ফেরার সময় হয়ে এসেছে।মাথাটা বেজায় ঘুরছে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে চারপাশের সবকিছু। পকেট থেকে অনেক কষ্টে আওয়ার গ্লাসটা বের করে উল্টে দেয় ও–ইশশ-'আওয়ার গ্লাসে'র ওপরের প্রকোষ্ঠটা প্রায় খালি হয়ে এসেছিল-আর একটু দেরি হলেই.....!

ঠুমরির চটক ভাঙে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজে। --"ঠুমরি,অ্যাই ঠুমরি! এতো দেরি হচ্ছে কেন? দরজা খোল!"

এই রে! ওর দেরি দেখে মা রেস্টরুমে এসে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছেন। সিকিউরিটিও চলে এসেছে মায়ের হাঁকডাক শুনে। ওর রেস্টরুমের দরজায় ধুপধাপ আওয়াজ। ওরে বাব্বা! দরজাটা এরা ভেঙেই ফেলবে নাকি? কী কেলো রে বাবা! ঠুমরি গায়ের সমস্ত শক্তি জোগাড় করে হাতের বালিঘড়িটা পকেটে পোরে,তারপর চিঁচিঁ করে সাড়া দেয়–"এইতো, আমি আছি,ঠিক আছি,দরজা খুলছি। পেটটা কেমন গন্ডগোল করছিল!"

দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখে অত্যন্ত চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে মা,সিকিউরিটি এবং আরো কিছু অজানাঅচেনা মহিলার মুখ। মায়ের চোখে চিন্তার গাঢ় ছায়া ভেদ করে ঝিলিক দিচ্ছে স্বস্তির আশ্বাস। আচ্ছা, ঠিক এমনটিই উজ্জ্বল দীপ্তি ঝলসে উঠেছিল না লিন্ডার চোখে? সারা আকাশ ছেয়ে থাকা অদ্ভুত একটা মনখারাপের মাঝেও কোথায় যেন মেঘ কেটে উঁকি মারতে শুরু করেছে সোনা রোদের ছটা। হঠাৎ কি মনে হতে মায়ের কোমরটা জড়িয়ে ধরে ঠুমরি,এক চির পরিচিত গন্ধ, চিরপরিচিত উষ্ণতার মাঝে ডুবে যেতে থাকে ও। মাথার ওপর মায়ের নরম,আদুরে আঙুলের আঁকিবুঁকি টের পায় সে।

এক নিঝুম,নিশ্চিন্ত,আয়েশি আরামে চোখ বোঁজে ঠুমরি!

বিপাশার বুকে র‍্যাফটের দোলায়



ঊর্মী মুখার্জি

অ্যাডভেঞ্চার আর দেশ দেখার শখটা আমার ছোটোবেলা থেকেই ছিল। তা, কারই বা না হয়! যখন ফেলুদা, তোপসে আর লালমোহনবাবুর গরম গরম অ্যাডভেঞ্চারগুলো পড়তাম, মনে মনে ভাবতাম, ইশ! আমিও যদি এইসব জায়গায় যেতে পারতাম! যদি ওদের মতই রহস্যে-টহস্যে জড়িয়ে পড়তাম! আর 'চাঁদের পাহাড়' পড়ে তো আজও মনে হয়, একদিন অ্যাফ্রিকার সেই রিখটার্সভেল্ড পাহাড় দেখে আসতেই হবে! না-ই বা পেলাম শঙ্করের মত হিরের খনি!

তা যাই হোক, দেশ দেখা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। টিকিট কেটে ট্রেনে কিংবা প্লেনে চড়ে বসলেই হল। কিংবা নিদেনপক্ষে দূরগামী বাসেও। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার করাটা আর একটু কঠিন। লেখকরা তো তাঁদের বইয়ের চরিত্রদের জন্যে অ্যাডভেঞ্চার প্লেটে সাজিয়ে রাখেন। বেড়াতে বেরোলেই কিছু না কিছু ঘটবে! আমাদের তো আর তা হবার জো নেই। সুতরাং অ্যাডভেঞ্চারটা আমাদের একটু খুঁজে পেতে নিতে হয় আর কি। তবে অতটা রহস্যময় সবসময় হয় না।

এই অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজেই বছর তিনেক আগে শুরু করলাম পাহাড়ে পাহাড়ে 'ট্রেকিং' বা 'হাইকিং'। অর্থাৎ পায়ে হেঁটে ঘোরা। প্রথমবার সিকিমে গেলাম ট্রেক করতে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটা গেল আরো বেড়ে। পরের বছর ঠিক করলাম হিমাচল প্রদেশে ট্রেক করতে যাব।

মানালি শহর পৌঁছতে হবে। অনেকভাবেই যাওয়া যায়। দিল্লী বা চণ্ডিগড় গিয়ে সেখান থেকে বাসে যান অনেকেই। কিন্তু আমি কী ঠিক করলাম বলো তো? কালকা মেলে যাব! কারণ? আরে ওই ট্রেনেই যে ফেলুদারা শিমলা গিয়েছিল! সে-ই যে 'বাক্স রহস্যের' সমাধান করতে!

মে মাসের এক সন্ধেবেলা আমরা তিন বান্ধবী কালকা মেলে চড়ে বসলাম। তার পরের পরের দিন খুব ভোরবেলা কালকা পৌঁছলাম। গাড়ি ঠিক করা ছিল। ড্রাইভারের নাম আবার 'কাকু'! বেশ মজার না নামটা? কাকু যদি বাঙালি হত, তাহলে ওর ভাইপো-ভাইঝিরা ওকে কী বলে ডাকত এটা নিয়ে আমরা বেশ মজা করেছিলাম।

যাই হোক, কাকু তো ভোর সাড়ে চারটের সময় গাড়ি নিয়ে কালকায় হাজির। কালকা হরিয়ানার মধ্যে পড়ে। তবে হিমাচল-এ ঢুকতে বেশি সময় লাগে না। নিজের রাজ্যে ঢুকে হাসি-খুসি কাকু বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গুছিয়ে খোশগম্প করতে শুরু করলো। আমরা তিনজন তখন ঢুলছি। রাত আড়াইটে থেকে জেগে!

হঠাত কাকু বলে উঠলো, "আপনারা যখন ট্রেকার তখন নিশ্চয়ই অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন। বিয়াস (বিপাশা) নদীতে র‍্যাফটিং করবেন?" র‍্যাফটিং বলতে এক বিশেষ ধরনের নৌকা, যাকে র‍্যাফ্‌ট্‌ বলা হয়, তাতে চড়ে খরস্রোতা নদীতে পাড়ি দেওয়া।

আমি তো শুনেই কান খাড়া করে উঠে বসেছি! পেছন ফিরে দেখি আমার বান্ধবী ইতির-ও চোখ চকচক করছে। কিন্তু কোথায় করবো র‍্যাফটিং? আর আমাদের মানালি পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে না? কাকু বললে র‍্যাফটিং হয় কুলুতে। এবং আমদের কুলু হয়েই মানালি যেতে হবে। সুতরাং রাস্তায় এক-আধ ঘন্টা দেরি করলে মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "আমরা দুজন নিশ্চই করব র‍্যাফটিং," বলে ইতির আর আমার দিকে দেখালাম। আমার দ্বিতীয় বান্ধবী ঋতা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলো এবার বলে উঠল, "আর আমি কি বসে বসে দেখব নাকি?"

ব্যাস, ঠিক হয়ে গেল প্ল্যান। বেলা একটা নাগাদ কুলু পৌঁছলাম। কাকু গাড়িটা সোজা ঢুকিয়ে দিল একটা রিসর্ট-এ যার নাম দেখলাম লেখা আছে 'নেচার পার্ক, ঝিরি'। টিকিট বিক্রি করছিল যে লোকটি সে প্রথমেই এক বিরাট দর হেঁকে বসল। আমরা তার সঙ্গে অনেক তর্কাতর্কি করে খানিকটা নামালাম। পরে শুনলাম লোকটির নামে নাকি খুনের আভিযোগ আছে! সবে জামিনে ছাড়া পেয়েছে! জানলে দরাদরি করার বদলে বরং কিছু বেশিই দিয়ে আসতাম!


নেচার পার্ক, ঝিরি

তিন কি.মি. আর ছ' কি.মি. র‍্যাফটিং হয়। আমরা ভাবলাম, ধুস! তিন কি.মি. করে আর কী মজা হবে! ছ' কি.মি.-ই করা উচিত। তাই ঠিক হল। রিসর্ট থেকে একটা গাড়িতে করে আমাদের ছ' কি.মি. নদীর উজানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে আমরা র‍্যাফটিং করে রিসর্ট-এ ফিরবো। সঙ্গে আমাদের গাইড টোনি আর অন্য একটি ছেলে। গাড়ির মাথায় দুটো র‍্যাফ্‌ট্।

গাড়ি থেকে নেমে বালি আর কাঁকর-মেশানো জমি দিয়ে একটু হেঁটে আমরা নদীর ধারে পৌঁছলাম। এই সেই বহুবার গল্পে পড়া বিপাশা নদী! সিন্ধু নদের পাঁচটি উপনদী, যার থেকে 'পাঞ্জাব' নামটি এসছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি। 'পাঞ্জাব' অর্থাৎ 'প' অব'। 'অব' মানে 'জল'। এখানে নদী অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং 'পাঞ্জাব' মানে 'পাঁচটি নদীর দেশ'।

বিপাশা ছাড়া বাকিরা হল শতদ্রু (সাতলেজ), ইরাবতী (রাভি), চন্দ্রভাগা (চেনাব) এবং বিতস্তা (ঝিলম)। পাঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর বা হিমাচল-এর বিভিন্ন অ'লে গেলেই সিন্ধু ও তার উপনদীদের দেখা পাবে। ভাবছ নিশ্চই যে পাঞ্জাব গেলেই বা সবার দেখা পাব না কেন? তার কারন 'পাঞ্জাব' নামকরণটি যখন হয় তখন হিমাচল পাঞ্জাব-এর মধ্যেই ছিল। তাছাড়া দেশভাগের পর পাঞ্জাব-এর অনেকটাই চলে গেছে পাকিস্তানে। সেই সঙ্গে অনেকগুলো নদ-নদীর বড় অংশ-ও পাকিস্তানেই চলে গেছে। যেমন ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের দেখা এখন শুধু লাদাখ অঞ্চলেই পাবে। এবং তাতেও র‍্যাফটিং হয়।



যাই হোক, বিপাশা নদী দেখে বেশ দমেই গেলাম। নদীর রূপ নিতান্তই শান্ত। কটকটে দুপুর রোদে ধূসর-বর্ণ জল কিছু কিছু জায়গায় সাদা-সাদা দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে অল্প অল্প ঢেউ উঠছে সেই জায়গাগুলোতে। মনে মনে ভাবছি এই জলে আবার কী র‍্যাফটিং হবে রে বাবা!

গাড়ি থেকে র‍্যাফ্‌ট্ দুটো নামানো হল আর আমাদের পরিয়ে দেওয়া হল লাইফজ্যাকেট। যাতে জলে পড়ে গেলেও কেউ ডুবে না যাই। মাথায় চাপানো হল হেলমেট। এমন শক্ত করে লাইফজ্যাকেট বাঁধা হল যে প্রায় দমবন্ধ



হয়ে আসে। সব মিলিয়ে নিজেকে সেই হাত-পা-ছাড়া মাথা-নাড়া কাঠের পুতুলগুলোর মত মনে হচ্ছিল। এমনকি মাথাটাও নাড়তে পারছি না হেলমেট-এর জন্যে!

আমরা তিনজন ছিলাম বলেই বোধহয় টোনি কাকুকেও ডাকল আমাদের সঙ্গে র‍্যাফটিং করতে। কাকু শিমলার লোক কিন্তু কোনদিন র‍্যাফটিং-ট্যাফটিং করেনি। তার তো মুখ শুকিয়ে আমসি! আমরা সবাই জোরাজুরি করতে শেষপর্যন্ত নিতান্তই ব্যাজার মুখে উঠে এল। র‍্যাফ্‌ট্‌-এর ধারটা একটু পাশবালিশের মতো গোল। তারই ওপর বসা। একদিকে ঋতা আর ইতি, অন্যদিকে কাকু আর আমি। প্যাড্‌ল্‌ (দাঁড়) হাতে মাঝখানে টোনি।

টোনি দেখাল র‍্যাফ্‌ট্‌-এর মেঝে আর আমাদের সিট-এর মাঝখানের ফাঁকে আমাদের পা কী ক'রে আটকে রাখতে হবে। কাজটা মোটেও সহজ না। পা-দুটো বেশ বাজেভাবে বেঁকিয়ে ঢোকাতে হল। একটু পরেই দেখি টনটন করছে।

আমি আর ঋতা সামনের দিকে বসে। র‍্যাফ্‌ট্‌-এর চারপাশ ঘিরে একটা শক্ত দড়ি বাঁধা। সেটা ঠিক আমার সামনে এসে শেষ হয়েছে। আমাকে বলা হল সেটা শক্ত করে ধরতে। ঋতাও টোনির সঙ্গে প্যাড্‌ল্‌ করবে, কিন্তু দরকার হলে ওকেও দড়িটা ধরতে হবে। ঋতাকে টোনি প্যাড্‌ল্‌ করা সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিল। প্রায় আধঘন্টা তৈরি হয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত রওনা দিলাম।



টোনি সোজা নদীর মাঝখানের দিকে এগোতে লাগল। বেশ খানিকটা গিয়েও দেখি জলের কোন তোড় নেই। মনে মনে ভাবছি, দুর ছাই! কেনই বা এলাম!

মাঝনদীতে পৌঁছে টোনি স্রোতের দিকে র‍্যাফটের মুখটা ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গতি হয়ে গেল দ্বিগুণ! আর সেই সঙ্গেই আমি দেখতে পেলাম 'র‍্যাপিড' গুলো! সেই যেগুলো নদীর ধার থেকে ছোট-ছোট ঢেউ মনে হয়েছিল। কাছ থেকে সেগুলোই উন্মত্ত ঘুর্ণির মত দেখাচ্ছে। যেন বিশাল একটা বাটিতে দুধের ফেনার ঘুর্ণি! তার মাঝে মাঝে জলের মধ্যে গর্তের মত। আর তার দিকেই উন্মাদের মতো টলমল করতে করতে ধেয়ে চলেছে আমাদের ছোট্ট র‍্যাফ্ট্!

'র‍্যাপিড' মানে জানো কি? নদীর যে সব জায়গায় জলের নিচে বড়-বড় পাথর থাকে, সেখানে জলটা পাথরগুলো টপকে লাফিয়ে-লাফিয়ে যায়। সেইগুলোকেই 'র‍্যাপিড' বলে। দুর থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে, কিন্তু কাছ থেকে দেখে গলা শুকিয়ে গেল। তবে 'র‍্যাপিড'-এ আমাদের র‍্যাফ্ট-টা পড়ার পর যা হল তার জন্যে আদৌ তৈরি ছিলাম না। একটা বিশাল ঢেউ বয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে সবাই ভিজে চান!

কিন্তু বসে ভয় পাওয়ারও যে সময় নেই! এক মিনিটের মধ্যেই আবার একটা 'র‍্যাপিড'। আবার একটা। আবার। প্রথমে তো আমি ভয়ে পুরো কাঁটা। শক্ত হাতে দড়িটা ধরে জড়ভরতের মত বসে আছি। খালি ভাবছি হাত ফসকে ছিটকে জলে পড়ে যাব। তারপর আস্তে আস্তে ভয়টা কেটে গেল। তখন দেখলাম ব্যাপারটা বেশ মজার।



ঋতা তো আনন্দের আতিশয্যে প্যাড্‌ল্‌ করতে করতে অনর্গল বকবক করছে। কোনো কথারই বিশেষ মানে নেই। দেখি ইতিও ওর সঙ্গ নিয়েছে। হঠাৎ আমাদের পুরো পাগলামির মাত্রাটা আমার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। দুদিন আগে আমরা কোলকাতায় ছিলাম। তারপর একুশ ঘন্টা ট্রেনে, ন' ঘন্টা গাড়িতে, আর এখন মাঝনদীতে বসে আপাদমস্তক ভিজছি। পরদিন থেকে লোকালয়ের বাইরে চলে যাব। অনেক হাঁটা আছে, সুতরাং সবারই বিশ্রাম দরকার। কিন্তু কখন মানালি পৌঁছব কেউই জানি না!

কাকুর দিকে চেয়ে দেখি বেচারি প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি। হঠাৎ টোনিকে বলে বসলো, "এই, পাড়ে লাগাও, আমি নামব। টোনি অনেকটা মগনলাল মেঘরাজের মতই খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসল। ভাবটা যেন, হুঁহুঁ বাবা, এখান থেকে আর পালানোর জো-টি নেই। কাকু বেচারি আরো মুষড়ে পড়লো। আমিও মনে মনে ভাবছি, তিন কি.মি.-টা নিলেই ভালো হোত বোধহয়!

অন্য র‍্যাফ্‌ট্‌-টি আমাদের আগে আগে চলেছে। যদি কেউ জলে পড়ে-টড়ে যাই বাঁচাবে। একটা র‍্যাপিড-এ লেগে তো ছেলেটির হাত থেকে দাঁড়টাই গেল ছিটকে। কোনমতে সেটা জল থেকে উদ্ধার হল। আমরা ভাবলাম, এ দাঁড়টাই সামলাতে পারছে না, আমাদের আর কী সামলাবে!

অনেকটা রাস্তা ঠিকঠাক গেলাম। তারপর একটু শান্ত একটা জায়গায় পৌঁছে টোনি জিগ্যেস করলো কেউ জলে নামতে চাই কিনা। আমি আর ইতি সাঁতার জানি না, তাই আগেই না বললাম। ঋতা কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজি। টোনি বললো ওকে দড়িটা ধরে ঝুলে পড়তে হবে। ঋতা তাই করলো। যতক্ষন জলে ছিল বেশ মজাতেই ছিল। তারপর সামনে ক'য়েকটা র‍্যাপিড দেখে টোনি ওকে উঠে আসতে বলল। আর তখনই হল বিপত্তিটা।

টোনি বললো তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে ও ঋতাকে টানবে আর ঋতাকেও একটা ছোট্ট লাফ দিতে হবে। সেইমতই হল। কিন্তু ঋতা ঠিকমত জল থেকে ওঠার আগেই টোনি ওর জায়গায় ফিরে গিয়ে দাঁড়টা হাতে নিলো। ভাবলো বাকিটা ঋতা নিজেই পারবে। কিন্তু সেটা হল না। আমি তাকিয়ে দেখি ঋতা আবার জলে পড়ে যাচ্ছে। ভয়ের চোটে আমি তো কাঠ। আমার গলা দিয়ে আওয়াজই বেরোলো না। র‍্যাপিডগুলো তখন বেশ কাছে চলে এসছে।

তারপরেই দেখি ভিজে বেড়াল হঠাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, থুড়ি রয়্যাল হিমাচল টাইগার হয়ে উঠেছে! ভয়টয় ভুলে কাকু একলাফে র‍্যাফ্টের উল্টোদিকে পৌঁছে ঋতার লাইফজ্যাকেট-টা খামচে ধরেছে। সেই সঙ্গে টোনিকে হাঁকডাক। ব্যাপার বুঝে টোনিও একলাফে পৌঁছে গেছে। আমি এদিকে ভাবছি র‍্যাফ্ট্ উল্টে না যায়! সবাই একদিকে, শুধু ‘একা কুম্ভর’ মত আমিই এক দিকটা রক্ষা করছি!

দুজনে মিলে ঋতাকে টেনেটুনে তুলল। ওর অবস্থা বেশ কঠিন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জল ঝরছে। র‍্যাফটের মেঝেয় বসে হাঁফাচ্ছে। টানাটানিতে ওর বেল্ট ছিঁড়ে গেছে। তাই নিয়ে কাকুর সঙ্গে একচোট রাগারাগিও হয়ে গেলো। যাই হোক, র‍্যাপিড-এ পড়ার আগেই যে ওকে জল থেকে তোলা হয়েছে তাতেই সবাই নিশ্চিন্ত হলাম।



অভিযান শেষ। টোনি , ঊর্মী, ঋতা আর ইতি

এর একটু পরেই আমরা রিসর্ট-এ পৌঁছে গেলাম। জামাকাপড় পাল্টে আর একটা ধাবায় ভাত-ডাল খেয়ে আবার তিনটে নাগাদ রওনা দিলাম মানালির উদ্দশ্যে। সেখানে পৌঁছেও অবশ্য অ্যাডভেঞ্চার কম হয়নি। তবে সেটা অন্য একটা গপ্পো।

কী? গপ্পোটা পড়ে বিপাশা নদীতে র‍্যাফটিং করার ইচ্ছে হচ্ছে কি? ওখানেই যাও কি অন্য কোথাও, আমাদেরই মত যেও কিন্তু একদিন, কোনও অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে।

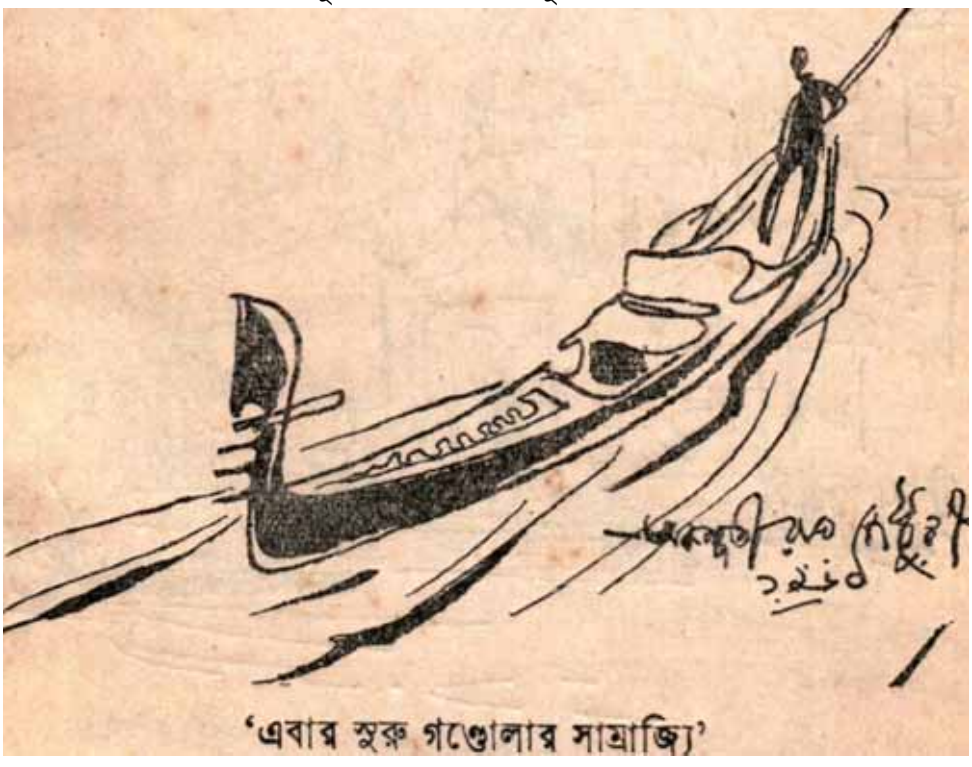
লেবেল দেয়া ছবিগুলো লেখকের ক্যামেরায় তোলা।
বাকিগুলো ইনটারনেট থেকে নেয়া



ভেনিস - 'ভেনিৎসিয়া'! ইতালীয়দের মিষ্টি হাসিভরা মুখে ওর এই আদরের নাম। সুন্দর ভাষা - শৈশবের আধো উচ্চারিত কথার মত। এরা হাসিমুখে যখন বলে - 'গ্রাতসিয়া সিনিওরা', 'গ্রাতসিয়া সিনিয়র', - ধন্যবাদ জানায়, মনে ভারী ফুর্তি আনে। আমাদের ভাষার ধন্যবাদ টুকুতে কি এদের মত আরও একটু আন্তরিকতা মেশানো যেত না!

পয়লা অক্টোবর। ফ্লোরেন্স থেকে আসছি ভেনিসের পথে। উপর থেকে দেখেছিলাম নিচে শুধু জল। - উপকূলবর্তী সমুদ্রের বিস্তার। তার মাঝখানে টুকরো টুকরো ঘাসের জমি খানিকটা ছড়িয়ে পড়ে আছে - ওই ভেনিস। কে জানত তখন ওই ধূসর দ্বীপখন্ডটুকুর মধ্যে যে সৌন্দর্য, তা কত কবির স্মৃতির, - কত শিল্পীর সার্থক স্বপ্নের প্রতীক!

সমুদ্রের ওপর দিয়ে দীর্ঘ সেতু গেছে বিমান-ঘাঁটি থেকে ভেনিসের গায়ে। সেই সেতু পার হতে আমাদের আধঘণ্টার মত লাগল। দুধারে ঢেউ ভেঙে পড়ছে আর দিগন্ত ছাড়িয়ে এড্রিয়াটিকের নীল জলের বিস্তারে চোখের আরাম। দূরে ভেনিসের উপকূলে বন্দরে অগুনতি জাহাজ আর ক্রেইন - কালো কালো রেখায় ছবি যেন আকাশের পটভূমিতে। কুমারিকার সেতু-বন্ধন মনে পড়ল। সেদেশ-এদেশ, একাল আর সেকাল - এমন কত যুগ যুগ ধরে মানুষের অসাধ্য সাধনের প্রয়াস।


'এবার সুরু গণ্ডোলার সাম্রাজ্য'

ভেনিসের প্রান্তে বাসের রাস্তা শেষ হল। এবার শুরু গন্ডোলার সাম্রাজ্য। এরা সব কালো, সরু-লম্বা নৌকা। যতই চেয়ে দেখি, মনে হয় না এরা রক্তমাংসের

শরীরের এত কাছের। যদি কোন হেঁয়ালির রাজ্য থাকে আর থাকে আনাচে কানাচে তার দোত্যি-দানা লুকিয়ে, তবে এই নৌকা ঠেলেই বোধহয় সেই যাদুকর রাজকুমার রাজকন্যার সন্ধান পেয়েছিল।

খালের পরে খাল গেছে বড়ো থেকে ছোটো, আরও ছোটো, - আরও, যেমন আমাদের কলেজ স্ট্রিট, মির্জাপুর অ তারপর ছকু খানসামার গলি। তাদের দুপাশে আছে যেমন সারি সারি দোকানঘর, বাড়ি, এরও তেমনি জল থেকে উঠে গেছে শেওলাধরা উঁচু উঁচু কালো পাথুরে দেওয়াল। এ দৃশ্য কিন্তু অভিনব। মোটর, বাস কি ট্রাকের সন্ধান নেই। বড়ো বড়ো লঞ্চ আমাদের স্টেটবাসের মতই স্টপেজে থামছে আর চাকুরেরা উঠছে নামছে দল বেঁধে। ছোটো লঞ্চ তো আছেই, আরও আছে মোটর বোট আর অসংখ্য গন্ডোলা। এই খুদে গন্ডোলারা ব্যস্ত শহরকে আরও ব্যস্ত করে তোলে। অনবরত ছোটাছুটিতে খালের জল তোলপাড় হয়। শেওলাধরা বাড়ির সুন্দর নেমে আসা সিঁড়ির পৈঠায় ছল্‌ছল্‌ ঢেউ তুলে ভারী মজা পায়।

গ্র্যান্ড-ক্যানাল যেখানে শেষ হল আরম্ভ হল অথৈ সমুদ্র। ছড়ানো ছোটো ছোটো দ্বীপে প্রাসাদে, গির্জা, ছোটো-বড়ো বাড়ি দিয়ে সাজানো এক একটি পল্লী যেন। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় মোটর-বোট আর গন্ডোলারা যাতায়াত করে, যেমন করে আমাদের ট্যাক্সি আর রিক্সাওয়ালারা বর্ষার জল ভেঙে এগোয়!

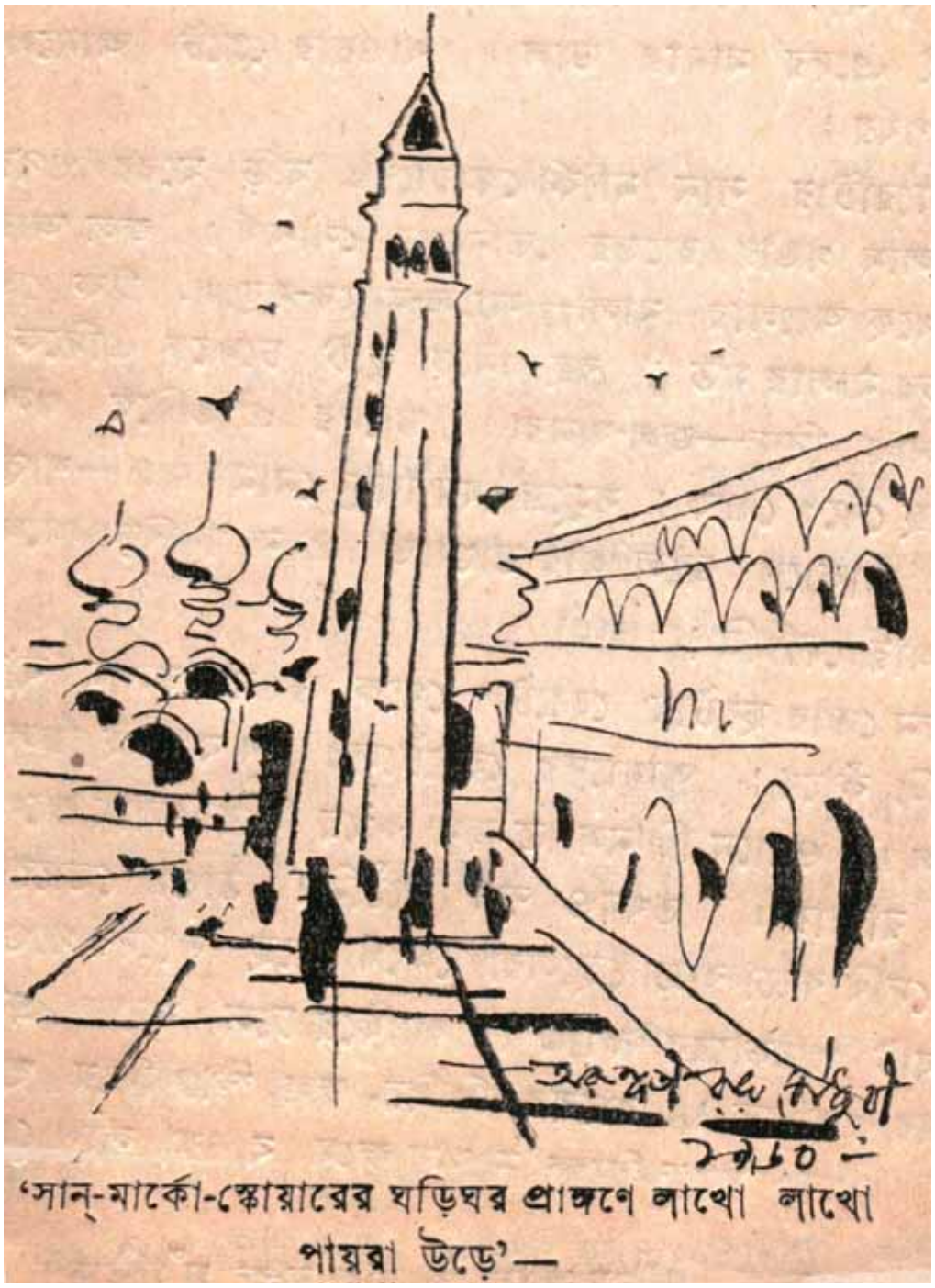
এই সব দ্বীপ-খন্ড ছাড়িয়ে আরও দূরে, বহু দূরে চোখে দিগন্তে আলোর মালা – 'লিডো'। কাছের গির্জা থেকে ভেসে আসা সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনি ঢেউয়ের সঙ্গে কেঁপে মিশে যায়। খালের ওপর যে অসংখ্য সেতু তাদের মনোরম কারুকার্য অতীতকে কাছে আনে। কাঠের আর পাথরের এই সেতুগুলো একভাবে দাঁড়িয়ে আজ বহু যুগ



'খালের উপর যে অসংখ্য সেতু,—তাদের মনোরম কারুকার্য অতীতকে মূর্ত ক'রে তোলে'—

ধরে। আমাদের ইতিহাসের পাতার 'ব্রীজ-অফ-সাইস' আজও তেমনই আছে। কে জানে কারাগারে নিক্ষিপ্ত বন্দির কত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে। হতভাগ্যদের এপার থেকে ওপারের বন্দিশালায় চালান করা হত

যখন, তাদের দৃষ্টি শেষবারের মতই হয়ত মুক্তি খুঁজত এই আকাশে যাকে পেছনে নিয়ে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই সেতু কিভাবে তার অতীত দিনের কথা? নিচের বয়ে চলেছে মন্থর, কালো শেওলা-সবুজ জল। কারাগারের গরাদের ফাঁকে এখন কিন্তু দেখা যায় ঝক্‌ঝকে রঙিন বেলোয়ারি কাঁচের দোকান!



'সান্-মার্কো-স্কোয়ারের ঘড়িঘর প্রাঙ্গণে লাখো লাখো পায়রা উড়ে'—

আমরা উঠেছিলাম হোটেল-কাস্তেল্লোতে ভেনিসের প্রাণকেন্দ্র সান-মার্কো-স্কোয়ারের এক ধারে। আমাদের কিন্তু সত্যিই ভারী সুবিধে হল যখন তখন এই চত্বরটিতে চলে আসার। বহু দূর থেকে নাম শোনা গেছে সান-মার্কো গির্জার – চোখে দেখে ভালো লাগল।

গির্জার সামনে প্রাঙ্গণ – এক ধারে দাঁড়ালে আর এক প্রান্তের মানুষের মুখ চেনা যায় না এত বড়ো। লাখো লাখো পায়রা ওড়ে আর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বাচ্চায় জটলা করে – বাদাম চিবোয়। প্রাঙ্গণ ঘিরে এক প্রাসাদ। এই প্রাসাদের নিচেটা এখন শৌখিন দোকানে দোকানে ছেয়ে গেছে। ভেনিসের কাচের কারুকার্য, ঝালর, ঝাড়-লণ্ঠন আর ঘর সাজাবার অসংখ্য অকল্পনীয় উপকরণ। রাতের বেলা জোরালো আলোয়, রঙিন কাঁচের ঠিকরে পড়া রোশনাইয়ে জমে ওঠে আড্ডার আসর।

খোলা আকাশের তলে 'কাফে' ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। হলুদ-সবুজ-সাদা-নীল হালকা চেয়ার পাতা এলোমেলো। মিষ্টি অর্কেস্ট্রার সুরে দূরদেশের অতিথিদের তৃপ্ত করে। সন্ধে হয়ে এল। প্রাণচঞ্চল ভেনিসে যেন সারাদিনের উৎসব। বিকেলের বিষণ্ণতা তাই স্পর্শ করে না।

লঞ্চে উঠলাম। সমুদ্রের জল একাদশীর চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। বাড়ির কথা মনে পড়ছে থেকে থেকে। কোথায় কোন সুদূরে শ্যামল বাংলার ছেলেমেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের কাছে ধূসর, নোনা জল আছড়ে পড়ছে। ঠান্ডা জলের ছোঁয়ায়, এত অন্তরঙ্গতার মাধুর্য।



'লিডো'তে পৌঁছলাম। চমৎকার রাস্তা গেছে সমুদ্রের ধার দিয়ে 'ক্যাসিনো'র দিকে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সৌধের সামনে নাবলাম বাস থেকে। হেঁটে চললাম জনহীন স্বল্পালোকিত রাস্তা ধরে। একদিকে প্রাসাদ, অন্যদিকে ধুধু বালি। দারুণ হাওয়ায় সমুদ্রের জোলো ভেজা গন্ধে ছুটে এসে ধাক্কা দিচ্ছে অন্ধকার ভূতুড়ে গাছগুলোয়। এ রাস্তাই! কি উন্মাদনা, উত্তেজনা চিত্র-প্রতিযোগিতায়। উঁচু গ্যালারী বাঁধা হয়েছিল রাস্তার ধারের দর্শকদের জন্যে, রাস্তার অপর পারে। আজ সেখানে তার কিছু অংশ এখনও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে আর স্ক্রু-বল্টু। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সত্যজিৎ রায়ের কথা। এখানে এই বাঙালির ছেলে বিরাট এক সম্মানের অধিকারি হয়েছিলেন।

'লিডো' থেকে ফিরে এলাম। ছোটো রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিলাম রাতের খাওয়া। পায়ে হাঁটা গলির আসে-পাশে নিচু নিচু প্রচুর খানাঘর। খাদ্যসম্ভার - সামুদ্রিক মাছের রান্না। অতি বৈচিত্রপূর্ণ! দেড়-ফুট লম্বা আর ইঞ্চি ছয়েক চওড়া বিশালাকার সুসিদ্ধ, লাল টকটকে চিংড়িরা শুয়ে আছে দিব্যি কাঁচের ঘরটিতে। 'ঈল' মাছেরা সাপের মত ওই চিংড়িদের জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। অতিকায় সামুদ্রিক শামুক ও ঝিনুকের শোভা স্যালাড পাতা ও নানান রঙের সব্জির সাজিতে। এ দৃশ্যে আমাদের অবস্থা হল সাংঘাতিক। আজগুবি কাঁকড়া আর ভেটকি মাছেরা যেন আমাদের তাড়া করে এল। মাছ আর মুখে তুলতে পারলাম না। নিছক রুটি-বেগুন ভাজা (এদের এটা প্রিয় খাদ্য) চিবিয়ে সে রাত্তিরে অব্যাহতি পেলাম। এমন রাক্ষুসে খাওয়া কেন, আর অমন বিভীষিকাময় সাজ-সজ্জাই বা কেন? শিল্পীর ক্যানভাসেই এদের মানায় ভালো। খাওয়ার প্লেটে আনলেই কিন্তু ঘটল বিপর্যয়।

রাত বারোটায় সান মার্কো স্কোয়ারের ঘড়ি ঘরের ওপর থেকে দেখতে পেলাম গভীর রাতের ভেনিসের সৌন্দর্য। জল আর জল, তাকে বেঁধেছে আলোর মালা - লালে-হলুদে-সবুজে, ঠিক ভেনিসের রঙিন কাচের মালার মত। বহু নিচে ছুটে চলেছে এদিকে ওদিকে ক্ষুদ্র আলোক বিন্দু - জলযানরা। তাদের প্রতিবিম্বে জল

চঞ্চল হয়ে উঠছে থেকে থেকে। সমুদ্রে যেন বিন্দু নোনা জল – শান্ত, ঘরের মানুষটি। আকাশে জলে আর ডাঙাতে এমন নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধন কোথাও আর দেখিনি।

পরদিন ভোর ছ'টায় হোটেল থেকে রওনা হলাম বাক্স-ব্যাগ, ঝোলা-ঝুলি কাঁধে। আমাদের হোটেলের খুব কাছেই ছিল এয়ার-টারমিনাল। ওখানে জিনিসপত্র জমা করে দিয়ে এলাম জলের ধারের বাঁধানো রাস্তায়। তখনও সূর্য ওঠেনি। ঠান্ডা ভোরের ভেজা হাওয়ায় দেখি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা লেগে গেছে তাদের গন্ডোলা আর মোটর বোট পরিষ্কার কাজে। লাফিয়ে চলে যাচ্ছে এক নৌকো থেকে আর একটিতে। রাত্রের শিশির, জল স্পঞ্জ দিয়ে শুষে নিচ্ছে নিপুণ ক্ষিপ্রতায়। নিংড়ে নিচ্ছে ঠান্ডায় জমে যাওয়া লাল ছোটো ছোটো হাতে।

আটটার মধ্যে পৌঁছলাম উড়োজাহাজ ঘাঁটিতে। ভেনিসের একটি দিন, শিশুর খেলাঘরে যেন হঠাৎ বড়োর ঢুকে পড়া আর আলাদিনের রাজত্বে একটিবার ঘুরে আসা।

অলঙ্করণঃ লেখক

মূল প্রকাশঃ শারদীয় তরুণতীর্থ ১৯৬৩
লেখকের কন্যা শ্রীমতী যশোধরা রায়চৌধুরীর
সৌজন্যে প্রাপ্ত ও অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

ফ্লাইং ডাচম্যান



মানুষ ভূতের গল্প তো অনেক শুনেছি। জাহাজ ভূতের গল্প শুনলে কেমন হয়? সত্যিসত্যিই কিন্তু একটা জাহাজ ভূত আছে। তাকে নিয়ে অনেক গল্পকথা, অনেক লোকশ্রুতি, এবং বিশ শতকে এসে সিনেমাটিনেমাও তৈরি হয়েছে। তার নাম দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান। এবারে ভূতের আড্ডায় সেই উড়ুক্কু ডাচম্যানের কথা। (হল্যান্ডের লোকদের বলা হয় ডাচ।)

আজ থেকে পাঁচ শতাব্দি আগের কথা। সে সময় ইউরোপের লোকজন সব পালতোলা জাহাজে চেপে হইহই করে বেরিয়ে পড়েছে দুনিয়া জয় করবার জন্যে। সেসব জাহাজে ইঞ্জিন নেই। কাঠের তৈরি হালকাপলকা জাহাজ। পালে হাওয়া লাগিয়ে সমুদ্র পেরোয়। পথে ঝড় উঠল তো আর রক্ষা নেই।

১৬৪১ সালের কথা। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির একটা জাহাজ দেশে ফিরছিল দূর প্রাচ্যে বাণিজ্য সেরে। দূর প্রাচ্য মশলার জন্য বিখ্যাত। ইউরোপে সে মশলার তখন বেজায় কদর। ও দিয়ে মাংস আর খাবারদাবার বহুদিন টিকিয়ে রাখা যায়। সে'সময় তো আর ফ্রিজ ছিল না!

জাহাজের ক্যাপ্টেন ভ্যান ডের ডেকেনের মন তখন একেবারে ফুরফুরে হয়ে আছে। ব্যাবসাবাণিজ্য খুব ভালো হয়েছে। কোম্পানির লাভ হবে ভালো। তার ওপর এতদিন পরে ফের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া! তার আনন্দও কম নয়। জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে তখন আফ্রিকার দক্ষিণতম বিন্দুতে উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে। অন্তরীপ ঘুরলেই উত্তরমুখো এগোবে জাহাজ তাঁর স্বদেশের পথে।

উত্তমাশা অন্তরীপ পৌঁছোতে চলেছে সেই আনন্দে সে খানাপিনায় এতই মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল জাহাজিরা যে কেউ খেয়াল করেনি কী ভয়ংকর একটা ঝড় ধেয়ে আসছে জাহাজকে তাক করে। খেয়াল যখন হল তখন দেরি হয়ে গেছে। ভয়ংকর সমুদ্রঝড়ের ধাক্কায় ঢেউ উঠেছে পাহাড়প্রমাণ। তীব্র হাওয়ার ধাক্কায় মাস্তুল ভেঙে পড়বার জো হয়েছে।

গেল গেল রব উঠল জাহাজ জুড়ে। ক্যাপ্টেন ছুটে বের হয়ে গিয়ে দাঁড়াল জাহাজের চাকা ধরে। সবাই তখন ভাবছে এইবার ক্যাপ্টেন জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ঝড়ের এলাকা থেকে দূরে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করবে বুঝি। যদি তাতে প্রাণটা বাঁচে। কিন্তু ও হরি, দেখা গেল ক্যাপ্টেন সে পথে যেতে মোটেই রাজি নয়। নেশা লেগে গেছে তখন তার। ফুলে ওঠা সমুদ্রের তাথৈ তাথৈ নাচ দেখে ভয় পাবার বদলে নাকের পাটা ফুলিয়ে চোখ লাল করে সে চিৎকার জুড়েছে,"ওরে ব্যাটা সমুদ্র, আমায় ভয় দেখাচ্ছিস? ভেবেছিস লেজ গুটিয়ে পালাব তোর ঢেউ আর হাওয়া দেখে। ভ্যান ডের ডেকেন ওতে ভয় পায় না। আজ তোর সঙ্গে আমার যুদ্ধ। দেখ তোর কী হাল করি।"

সমুদ্র জবাবে আরো বড়ো বড়ো ঢেউ ছুঁড়ে মারতে লাগল জাহাজের গায়ে। মোচার খোলার মত তাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল তীব্র সমুদ্র হারিকেন। জাহাজের লোকজন বুঝল পাগলের পাল্লায় পড়ে আজ প্রাণ যেতে পারে। অতএব সবাই মিলে যুক্তি করল পাগলা ক্যাপ্টেনকে আটকে রেখে জাহাজ নিয়ে ঝড়ের হাত থেকে পালাবে।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের মাথায় তখন ভূত সওয়ার হয়েছে। জাহাজের লোকজন যখন তাকে ধরতে এল তখন বিনাবাক্যব্যয়ে সে কোমর থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে এক গুলিতেই শেষ করে দিল বিদ্রোহীদের নেতাকে। তারপর অসুরের শক্তিতে তাকে ছুঁড়ে ফেলল ফুটন্ত সমুদ্রর বুকে। ঝড়ের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে তখন তার অট্টহাসির শব্দ।

মৃত নাবিকের শরীরটা জল ছুঁতেই একটা অদ্ভুত ব্যাআর ঘটল। ডেকের ওপর কোথা থেকে আবির্ভূত হল একটা ছায়ার মত মূর্তি। তার চোখমুখ সবই ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ক্যাপ্টেনের দিকে আঙুল তুলে সে বলল, "গোঁয়ার্তুমি কোরো না। যদি শান্তিতে জাহাজ বাইতে চাও তাহলে-"

জাহাজের বাকি লোকেরা তখন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। পাগল ক্যাপ্টেনের অবশ্য বিশেষ হেলদোল হল না। সদ্য একবিদ্রোহীকে মেরে তার তখন রক্তে যুদ্ধের উন্মাদনা আরো বেরে গেছে। খলখল করে হেসে সে বলল, "কে বলল তোকে আমি শান্তিতে জাহাজ বাইতে চাই, অ্যাঁ? আমি লড়ব। তোর সমুদ্রের সাথে, তার ঝড়ের সাথে, গোটা দুনিয়ার সাথে। যে আমায় বাধা দেবে তাকে এইপিস্তলের মুখে উড়িয়ে দেব। ভালো চাস তো যে নরক থেকে এসেছিস সেইখানেই ফিরে যা শয়তানের দূত।

বলতেবলতেই হাতের পিস্তলটা ছায়ামূর্তির দিকে তাক করে তার ঘোড়া টিপে দিয়েছে সে। এবারে কিন্তু আর গুলি বের হল না তা থেকে। দূরে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা নাবিকেরা দেখল, ক্যাপ্টেনের হাতেই বিকট শব্দ করে ফেটে গেল তার পিস্তল।

ছায়ামূর্তি একচুলও নড়ল না তার জায়গা থেকে। এইবার যখন সে কথা বলল, তখন তার গলায় যেন প্রলয়ের মেঘের গুরুগুরু শব্দ–"ঔদ্ধত্বের শাস্তি তুমি পাবে তুচ্ছ মানুষ। এই জাহাজ আর তার প্রেত নাবিকদের নিয়ে অনন্তকাল ধরে তুমি ঝড়ের সমুদ্রে ভেসে চলবে। এক মুহূর্তের শান্তি জুটবে না তোমার কপালে। একদিনের জন্যও তোমার জাহাজ ভিড়বে না মাটির পৃথিবীর কোন বন্দরে। সমুদ্রে ভাসমান সমস্ত জাহাজের চোখে তুমি হবে সাক্ষাত মৃত্যুর দূত। যে তোমায় নিজের চোখে দেখবে সমুদ্রের বুকেই তার চিরশয্যা পাতা হবে।"



ক্যাপ্টেনের তখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। উদ্দাম ঝড়ের ধাক্কায় প্রলয়নাচন নাচতে থাকা সমুদ্রের বুকে দুলন্ত জাহাজের বুকে তখন তাকে ঘিরে একে একে লুটিয়ে পড়ছে তার সমস্ত মানুষ সঙ্গীর দল। ঘনঘন বিদ্যুতের আঘাত নেমে আসছে তাকে ঘিরে মেঘের বুক থেকে। সেই আলোতে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ খলখল করে হেসে উঠল ক্যাপ্টেন। তারপর আকাশের দিকে দুহাত তুলে চিৎকার করে উঠল, "আমেন।"(খৃস্টানরা তাদের প্রার্থনায় এই শব্দটা বলে। ওর মানে , "তবে তাই হোক হে ঈশ্বর।")

তারপর সেই ঝড়ের সমুদ্রের অন্ধকারে তার অভিশপ্ত জাহাজকে নিয়ে মিলিয়ে গেল সে। একা।

শতাব্দির পর শতাব্দি কেটে গেছে তার পরে। সভ্যতা বদলেছে। পালের জাহাজের জায়গা নিয়েছে বাষ্পীয় পোত। তারপর আরও আধুনিক জাহাজের দল এসে বাষ্পীয় পোতদেরও ইতিহাসের পাতায় ঠেলে দিয়েছে। তবু সব যুগেই কোনো না কোন জাহাজ হঠাৎ হঠাৎ করেই মাঝসমুদ্রে দেখা পেয়ে যায় সেই ডাচ জাহাজের। তুমুল ঝড়ের ধাকায় সে ছুটে চলেছে তার ছেঁড়া পাল, ভাঙা মাস্তুল নিয়ে। তার চকায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অভিশপ্ত ক্যাপ্টেন আকাশের দিকে মুখ তুলে আকুল প্রার্থনা করে চলেছেন যেন এইবার তাঁর অভিশাপের শান্তি হয়, যেন এইবার তিনি ফিরতে পারেন কোন শান্তির বন্দরে, আর তাঁকে ঘিরে অজস্র কঙ্কাল নাবিক বারংবার ঝড়ের হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে নতুন নতুন পাল।

সে জাহাজ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্রে প্রাণ দিয়েছেন। সমুদ্রযাত্রী নাবিকদের জনশ্রুতিতে তার নাম দা ফ্লাইং ডাচম্যান। কোন অজানা সমুদ্রে ঝড়ে মুখে অভিশপ্ত ক্যাপ্টেন আজও ভেসে বেড়াচ্ছে হয়ত। প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে পাঁচ শতাব্দি আগে করে ফেলা কোন পাপের।

ভূতের বাড়ি



চেন্নাইতে গেলে সেখানে গাড়িঘোড়া ঠাসা সেন্ট মেরিজ রোডের কাছাকাছি একটা বিশেষ গলিতে ঢুকে পড়ে যদি দেখ রাস্তাটা বেজায় ফাঁকা তাহলে সেখানে না দাঁড়িয়ে বড়োরাস্তায় ফিরে এস তক্ষুণি। সেখানে সন্ধের পরে ট্যাক্সি ঢোকে না। এমনকি কাগজকুড়ুণির দলও অন্ধকারে জায়গাটাকে এড়িয়ে যায়।

দিনের বেলা সেখানে ফিরে গেলে দেখবে রাস্তায় কাছাকাছি প্রায় একরকম দেখতে দশখানা বাড়ি আছে। ও সেগুলো সবই ফাঁকা। অত ব্যস্ত শহরের মাঝখানে অমন একখানা জায়গাঅথচ সেখানে কেউ থাকে না। এই ! হল দে মন্টে কলোনি। শোনো তার গল্প বলি।

এ কলোনি বহুকালের পুরোনো। উনিশ শতকের শেষের দিকে তৈরি। তখন এর মালিক ছিলেন পণ্ডিচেরির এক পর্তুগিজ সাহেব। তাঁর নাম দে মন্ট। এই কলোনিরই এক বাড়িতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখের সংসার ছিল। আরবুথনট দে মন্টে অ্যান্ড কোম্পানির মালিক ছিলেন তিনি। আমেরিকায় মাদ্রাজি লাল রেশমের রুমাল রফতানি করতেন।

কিন্তু তারপর হঠাৎ দুর্যোগের দিন এল তাঁর জীবনে। দুর্ভাগা মানুষটার কোম্পানি ফেল করল ১৯০৬ সালে। তবুও সামলে উঠছিলেন তাঁরা কিন্তু তারপর এল দ্বিতীয় আঘাত। ,একদিন ফ্রান্স থেকে ভারতে আসবার

পথে সমুদ্রের বুকে জাহাজের ভেতর রহস্যজনকভাবে মারা গেল তাঁর একমাত্র ছেলেটা। দুঃখেশোকে পাগলের মত হয়ে গেলেন দে মন্ট। শোকেদুঃখে তাঁর স্ত্রী হয়ে উঠলেন মানসিক রোগি। রাতদিন বলতেনকোন অশুভ আত্মা , অনুসরণ করছে তাঁদের। পরিবারের কাউকে সে ছাড়বে না।তারপর সালে ১৯২১ ,একদিন সত্যিই দেখা গেল তাঁরাও মরে পড়ে আছেন তাঁদের কলোনিতে।

মৃত্যুর আগে দে মন্ট কলোনি সহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সম্পত্তিটা স্থানীয় গির্জার নামে উইল করে গিয়েছিলেন দে মন্ট। কিন্তু মারা গেলেও তাঁর আত্মার সম্ভবত মুক্তি হয়নি। কলোনির মায়া ছাড়তে পারেননি তিনি।

মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই এলাকার লোকজন রাতের আলো আঁধারিতে কলোনির ফুটপাথে তাঁদের দেখা পেতে শুরু করে। কখনো কখনো কোন ঘরের তালাবন্ধ দরজা নিজে থেকেই খুলে যায় রাত্রে। তারপর অদৃশ্য অতিথিকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েই যেন, বন্ধ হয়ে যায় ফের। চার্চ অনেক চেষ্টা করেও মানবকল্যানের কোন কাজে লাগাতে পারেনি জায়গাটাকে। দে মন্ট তাঁর অধিকার ছাড়তে নারাজ। হতাশ হয়ে চার্চ সে সম্পত্তি, হাউজিং বানাবার জন্য লিজ দেয় এসুন কোম্পানিকে। সে লিজ শেষও হয়ে গেছে। এখানে আর কেউ কখনো থাকতে পারেনি।

মালিকহীন নির্জন বাড়িগুলোকে নিয়ে পড়ে রয়েছে দে মন্ট কলোনি।

আশপাশের মানুষজন অনেক গল্প বলে এ কলোনিকে নিয়ে। কিছুকাল আগে এক পাহারাদার বসানো হয়েছিল সেখানে। তিনরাত্রিও যায়নি তার। তার আগেই তাকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল কলোনির দুখানা রাস্তার মধ্যে একটার ওপরে। পুলিশ বলেছিল, কেউ তাকে খুন করেনি। রাস্তাদুটোয় বারে বারে আলো বসাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে লাগাবার দুচারদিন পরেই সেগুলো নিজেনিজেই খারাপ হয়ে যায়। কয়েকবার তেমন হবার পর সে চেষ্টাও ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আলেয়া আর উইল-ও'-দ্য-উইস্প

সংহিতা



যারা অন্ধকার রাতে ট্রেনে চড়েছে তারা সব্বাই জানে, বনজঙ্গল পেরিয়ে দূরের বাড়িঘরের আলো দেখতে কেমন লাগে। সেগুলো দাঁড়িয়ে নেই যেন, যেন ছুট্টে চলে গেল দূরে। আবার ধীর গতিতে পাহাড়ি রাস্তায় চড়তে থাকলে, একই আলো একেক বাঁকে একেক রকম লাগে, কখনও বেশি উজ্জ্বল, কখনও কম, কখনও কাছে কখনও দূরে।

আবার এই আলোই নাকি বাংলার খাল-বিল-জলায় ঘেরা এলাকায় জেলেদের মৃত্যুর কারণ। সে আলোকে আলেয়া বলে। যা জেলেকে বা নৌকার দাঁড়িকে পথভ্রষ্ট করে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে আর তারপর তাদের শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। জলা জায়গায় আসলে নাকি পচা গাছপালা থেকে দাহ্য মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। বাতাসের ফসফিন বা ডাইফসফিনের সংস্পর্শে এলেই মিথেন জলে ওঠে, আর মশালের শিখার মতো জ্বলতে থাকে মাটির থেকে কিছু ওপরে, যতক্ষণ না সবটা মিথেন জ্বলে ফুরিয়ে যায়। শুকনো ডালপালার ঘষাঘষিতে আগুনের ফুলকি তৈরি হলেও আশেপাশে থাকা মিথেন জ্বলে উঠতে পারে। তাই কখনও কখনও আলেয়া মাঠেও দেখা যায়। মিথেনের মধ্যে মানুষ শ্বাস নিতে পারে না, ফলে মিথেন পরিবৃত এলাকায় থাকলে মানুষ শ্বাসরোধে মারা যায়। অন্ধকার মাঠের পথে বা জলার মধ্যে আলোর দেখা পেয়ে সেদিকে আশ্রয়ের আশায় গেলে, মিথেনের আওতায় পৌঁছে দমবন্ধ হয়ে মরে যাওয়া অস্বভাবিক নয়। কিন্তু মৃত্যু ভূতের ভয় তৈরি করে। বিশেষত যেখানে রাতে আলেয়া দেখা যায়, সেখানে মৃত্যু ঘটলে আলেয়ার জন্যই যে মৃত্যু তা অনুমান করা সহজ হয়ে যায়। মিথেনের গুণ আর ধর্ম না জানা থাকলে, আলেয়াকে ভূত বলেও ভাবা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে আলেয়াকেই বলে উইল-ও'-দ্য-উইস্প। তাছাড়াও একে ঘোস্ট লাইট, স্পুক লাইট, অর্ব এইসবও বলা হয়। কবরখানায় দেখতে পেলে এদেরই বলা হয় ঘোস্ট ক্যান্ডেল। উইস্প হলো কাগজ বা প্যাঁকাটি যা দিয়ে মশাল বানানো যায়। উইল একটা নাম, টম কিংবা জনের মতো। উইল-ও'-দ্য-উইস্প মানে মশালের উইল। পশ্চিমের দেশেও লোকেরা মনে করে যে পথিককে পথ ভ্রষ্ট করে নিয়ে যাওয়া আর তারপর তাকে মেরে ফেলাই উইল-ও'-দ্য-উইস্পের কাজ। পশ্চিমের কোনো দেশে উইল-ও'-দ্য-উইস্প নিয়ে চালু গল্পগুলোর একটা হলো যে উইল বা জ্যাক নামের এক ছোকরা আলো জেলে জলাতে তার অপকর্মের সুলুক সন্ধান করছে। আবার কে এম ব্রিগসের গল্পে আছে উইল নামের এক কামার স্বর্গের দরজায় উপস্থিত হলে সেন্ট পিটার তাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেন। কিন্তু সেই সুযোগেও কামার উইল ভারি অসভ্যতা করে। তার জেরে তাকে পৃথিবীতে চক্কর কাটতে হয় চিরটাকাল। সে যাতে শীতে কষ্ট না পায়, তাই শয়তান তাকে একখন্ড জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়েছিল। সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের আলোই বিদেশে উইল-ও'-দ্য-উইস্প নামে চেনা যায়। দেশে দেশে কাহিনীর বিবরণ বদলে গেলেও তার সাথে মৃত্যু আর ভুতের ভয়টা উইল-ও'-দ্য-উইস্পের সঙ্গে সমান তালে রয়ে গেছে।



দখল



অমিত দেবনাথ

বিকেল পাঁচটায় এড লয়েস তার হাত মুখ ধুয়ে,কোট আর টুপি পরে গাড়ি বার করে চালিয়ে দিল শহরে তার টেলিভিশন বিক্রির দোকানের উদ্দেশ্যে। খুব ক্লান্ত লাগছে। সারাটা দিন বেসমেন্টের ময়লা আর আলগা মাটি সাফ করে তার কাঁধ আর পিঠ একেবারে টনটন করছে। হাজার হোক, বয়সটা তো চল্লিশ ছুঁয়েছে। যাক, এই কাজটা লোক লাগিয়ে করালে যে টাকাটা লাগত, সেই টাকা দিয়ে জ্যানেট বরং একখানা ফুলদানি কিনতে পারবে। লয়েস এইসব ছোটখাটো কাজ নিজে করতে ভালোই বাসে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়ছিল দ্রুত ধাবমান, ক্লান্ত আর বিরসবদন নিত্যযাত্রীদের ওপর। মহিলাদের হাতে আর কাঁধে নানারকম প্যাকেট আর ঝোলা। ইউনিভারসিটি ফেরত ছাত্রছাত্রীর দল মিশে যাচ্ছিল গোমড়ামুখো কেরানি, ব্যবসাদার আর অফিসফেরত সেক্রেটারিদের সঙ্গে। তার গাড়িটা থেমেছিল একটা লাল সিগনাল দেখে,সেটা সবুজ হতে আবার গাড়ি চালু করল সে। তার দোকান এতক্ষন খোলা ছিল তাকে ছাড়াই,এবার সে যাবে খানিকক্ষনের জন্য,বন্ধ করার আগে খানিকক্ষন কাজ করতে হবে,সারাদিনের হিসেবপত্তর বুঝে নিতে হবে,দরকার হলে দুয়েকটা জিনিস বিক্রিও করতে হবে বইকি। রাস্তার মাঝখানের টাউন পার্ক নামের ছোট্ট সবুজ স্কোয়ারটার পাশ দিয়ে আস্তে করে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে এল সে। তার দোকান “লয়েস টিভি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস”-এর সামনে কোনও পার্কিং লট নেই। বিরক্তির একশেষ। বিড়বিড় করে একটা অস্ফুট মন্তব্য করে সে গাড়িটাকে ইউ-টার্ন করিয়ে আবার সেই সবুজ স্কোয়ারটার পাশে নিয়ে এল। স্কোয়ারটাতে রয়েছে একটা নিঃসঙ্গ ফোয়ারা, একটা বেঞ্চ আর একটা ল্যাম্পপোস্ট।

ল্যাম্পপোস্টটা থেকে কিছু একটা ঝুলছিল। জিনিসটা গাঢ় রঙের, আকারহীন, হাওয়ায় অল্পঅল্প দুলছিল সেটা। কোন পুতুল-টুতুল নাকি? লয়েস গাড়ির কাচটা নামিয়ে বাইরে তাকাল। এটা কী? কোন কিছুর বিজ্ঞাপন?মাঝে মাঝে চেম্বার অব কমার্স থেকে এখানে বিজ্ঞাপন ঝোলায় বটে।

আবার গাড়িটাকে একপাক ঘুরিয়ে সে স্কোয়ারের সামনে নিয়ে এল। পার্কের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ভাল করে গাঢ় রঙের জিনিসটাকে দেখল সে। এটা কোন পুতুল নয়। আর এটা যদি কোন কিছুর বিজ্ঞাপন হয়,তাহলে খুবই অদ্ভুত ধরনের বিজ্ঞাপন। ঘাড়ের পেছনটা শিরশির করে উঠল তার,একটা ঢোঁক গিলল সে। মুখ আর হাত দিয়ে গড়িয়ে এল ঘামের ধারা।

এটা একটা মড়া। মানুষের মড়া।

এই! কে আছ! এটা দেখে যাও! চেঁচিয়ে উঠল সে।

ডন ফারগুসন ধীরেসুস্থে দোকান থেকে বেরিয়ে এল কোটের বোতাম আটকাতে আটকাতে। খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে, এড। বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।

"ওটা দেখেছো? এড আঙুল তুলে জিনিসটা দেখাল। আকাশের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্পপোস্টটা। জিনিসটা ঝুলছে পোস্ট থেকে। ওই যে! দেখেছ তো? কতক্ষণ ধরে রয়েছে এটা? এডের গলা ক্রমশ চড়ছিল। কারোর কোন হুঁশ নেই দেখছি। সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

ডন ফারগুসন ধীরেসুস্থে একখানা সিগারেট ধরাল। মাথা ঠান্ডা রাখ, ভাই। কোন কারণ আছে নিশ্চয়, নাহলে ওটা ওখানে থাকত না।

"কারণ? কীসের কারণ?"

ফারগুসন কাঁধ ঝাঁকাল। "ট্রাফিক সেফটি কাউন্সিল যেরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে ভাঙাচোরা গাড়িগুলো ওখানে সাজিয়ে রাখে লোককে দেখানোর জন্য, সেরকমই কিছু একটা হবে নিশ্চয়ই। আমি কী করে জানবো?"

জ্যাক পটার তার জুতোর দোকান থেকে বেরিয়ে এল। "কী হয়েছে বন্ধুগণ?"

"ল্যাম্প পোস্ট থেকে একটা মড়া ঝুলছে," এড বলল, "আমি এক্ষুনি পুলিশকে ফোন করবো, "

"ওরা জানে নিশ্চয়ই," পটার বলল, "নাহলে ওটা ওখানে থাকত না, "

"আমি দোকানে যাচ্ছি,"ফারগুসন পেছন ফিরল, "আগে ব্যাবসা,পরে মজা, "

লয়েসকে দেখে মনে হচ্ছিল তার হিস্টিরিয়া হয়েছে। "দেখতে পাচ্ছ না মূর্খ? দেখতে পাচ্ছ না ওখানে কী ঝুলছে? একটা মানুষের মড়া! একটা ডেডবডি!"

"নিশ্চয়ই,এড। আমি দেখেছি ওটা। এই তো, বিকেলে যখন কফি খেতে বেরোলাম,তখনই দেখেছি, "

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ সারাটা বিকেল ওটা ওখানে ঝুলছে?"

"হ্যাঁ,নিশ্চয়ই। তাতে কী হল?" পটার ঘড়ি দেখল, "দেরি হয়ে গেল। দৌড়তে হবে দেখছি! পরে দেখা হবে, এড, "

পটার ঝটিতি পায়ে ফুটপাথ দিয়ে চলতে থাকা জনস্রোতে মিশে গেল। পার্কের পাশ দিয়ে চলেছে জনতার মিছিল। পুরুষ ও মহিলা। তাদের কেউ কেউ কৌতুহলী চোখে একঝলক তাকাচ্ছিল ঝুলন্ত বস্তুটার দিকে - তারপর আবার এগিয়ে যাচ্ছিল। কেউ থামছিল না, কেউ কোন গুরুত্বও দিচ্ছিল না।

"আমি ওখানে যাচ্ছি,বুঝলে," ফিসফিস করে বলল লয়েস। রাস্তায় বয়ে চলা গাড়ির স্রোতের ফাঁকফোকর দিয়ে সে পার্কের দিকে এগোল। গাড়িগুলো হর্ন বাজাচ্ছিল অসহিষ্ণুভাবে। ওপারে পৌঁছে রেলিং টপকে সে পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লোকটা মাঝবয়সি। জামাকাপড় ছেঁড়া আর কোঁচকানো। পরনে একটা ধূসর স্যুট,যার গায়ে শুকনো কাদা লেগে আছে। ভবঘুরে বোধহয়। লয়েস একে কখনো দেখেনি। স্থানীয় কেউ নয়। মুখটা একপাশে ঘোরানো। বিকেলের হাওয়ায় শরীরটা নিঃশব্দে অল্প অল্প দুলছে। গায়ের চামড়ায় অনেক কাটাছেঁড়ার দাগ। গভীর ক্ষত। রক্ত জমে আছে। একটা চশমা ঝুলে রয়েছে একদিকের কান থেকে। চোখ ফুলে বুঁজে গেছে। মুখটা হাঁ করা,বিশ্রি নীলচে জিভ বেরিয়ে আছে সেখান থেকে।

"বাপরে!"বিড়বিড় করল লয়েস। অসুস্থ বোধ করছিল সে। গা গোলানোর ভাবটা কোনওক্রমে দমন করে সে ফিরে যাচ্ছিল নিজের জায়গায়। তার সারা শরীর কাঁপছিল থরথর করে অদ্ভুত এক অনুভূতি আর আতঙ্কে।

এই লোকটা কে? এখানে ঝুলছে কেন? এসবের মানে কী? আর সবচেয়ে বড় কথা - কেউ খেয়াল করছে না কেন?

ফুটপাথে একটা বেঁটেখাটো লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার।

"দেখে চল হে!" বিরক্ত গলায় বলল লোকটা, "ওহ্!এড যে!"

এড মাথা ঝাঁকাল, "হ্যালো,জেনকিন্স, "

"কী হয়েছে তোমার?"স্টেশনারি দোকানের ক্লার্ক জেনকিন্স জিজ্ঞেস করল এডের হাত ধরে, "শরীর খারাপ নাকি?"

"ঐ মড়াটা। পার্কের, "

"হ্যাঁ,নিশ্চয়ই, "জেনকিন্স তার হাত ধরে তাকে লয়েস টিভি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস-এর সামনে নিয়ে গেল, "শান্ত হও, "

মার্গারেট হেন্ডারসন তার জুয়েলারি দোকান থেকে বেরিয়ে এল, "কিছু হয়েছে নাকি?"

"এডের শরীর ভাল লাগছে না।"

লয়েস একটা ঝাঁকি মেরে সোজা হল, "কী হচ্ছেটা কী এসব? তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? ঈশ্বরের দিব্যি-"

"ও কী বলছে বলতো?" মার্গারেট নার্ভাসভাবে বলল।

"মড়াটা!"এড চিৎকার করল, "ওখানে একটা মড়া ঝুলছে!"

বাইরে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে, "কেউ অসুস্থ নাকি? আরে,এ তো এড লয়েস। তুমি ঠিক আছো,এড?"

"মড়াটা!"চিৎকার করছিল এড, ছটফট করছিল তাদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য। কয়েকটা হাত ধরে রেখেছিল তাকে। সে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল, "ছাড়ো আমাকে! আমি পুলিশের কাছে যাবো!পুলিশ ডাকতে হবে!পুলিশ!"

"এড-"

"একটা ডাক্তার ডাকা দরকার!"

"ও অসুস্থ!"

"নাহলে মদ খেয়েছে, "

লয়েস হাত পা ছুঁড়ে লোকজনের মধ্যে থেকে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ঝাপসাভাবে সে দেখল সামনে সারি সারি কৌতুহলী, উদ্বিগ্ন মুখ। পুরুষ আর মহিলারা যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছিল, দেখছিল এখানে কী গোলমাল হচ্ছে। লোকজনকে ঠেলে সে তার দোকানের দিকে যাচ্ছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল ভেতরে ফারগুসন একজনকে একটা এমার্সন কোম্পানির টিভি সেট দেখাচ্ছে। পেট ফলি সার্ভিস কাউন্টারের পেছনে একটা নতুন ফিলকো সাজিয়ে রাখছে। পাগলের মত চিৎকার করছিল লয়েস তাদের দিকে তাকিয়ে। তার চিৎকার হারিয়ে যাচ্ছিল রাস্তার ট্রাফিক আর আশেপাশের লোকজনের কলরবে।

"কিছু কর!"সে চেঁচাচ্ছিল, "দাঁড়িয়ে থেকো না!কিছু কর!কিছু একটা গন্ডগোল ঘটেছে!বিচ্ছিরি কিছু!"

দুই বিশালদেহী পুলিশকে আসতে দেখে ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল।

"নাম কী?"একজন পুলিশ নোটবই বার করল।

"লয়েস, " এড ক্লান্তভাবে কপালের ঘাম মুছল, "এডওয়ার্ড সি লয়েস। শুনুন। ওদিকে -"

"ঠিকানা?" পুলিশের পরের প্রশ্ন।

পুলিশের গাড়িটা ট্রাফিকের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মসৃণভাবে চলছিল। লয়েস গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিয়েছিল ক্লান্তভাবে,হতভম্ব হয়ে। একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ল সে। কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার শরীরটা।

"১৩৬৮ হার্স্ট রোড, "

"পিকভিলের কাছাকাছি?"

"হ্যাঁ, "লয়েস একটু কষ্ট করে সোজা হয়ে বসল, "আমার কথা শুনুন। ওই ওদিকে - পার্ক স্কোয়ারের ল্যাম্প পোস্টটায় -"

"আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন?" স্টিয়ারিং ধরা পুলিশটা জানতে চাইল।

"সারাদিন?"

"দোকানে ছিলেন না নিশ্চয়ই?"

"না," মাথা নাড়ল সে, "আমি বাড়িতে ছিলাম। বেসমেন্টে, "

"বেসমেন্টে?"

"হ্যাঁ। নতুন তৈরি করেছি। ময়লা পরিস্কার করছিলাম। কেন,তাতে কি -"

"আর কেউ আপনার সঙ্গে ছিল?"

"না। আমার বউ শহরে গেছিল। বাচ্চারা স্কুলে," লয়েস দুই বিশালদেহী পুলিশের দিকে পরপর তাকাল। আচমকা তার মনে একটা আশা জেগে উঠল। "ও - তার মানে - আপনারা বলছেন, আমি যখন নিচে ছিলাম, তখনই ওইসব কান্ড ঘটেছে? আমি জানতে পারিনি? সবাই পেরেছে?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নোটবই হাতে পুলিশটা বলল, "ঠিক। আপনি জানতে পারেননি।"

"তাহলে সব ঠিকই আছে? অফিসিয়াল ব্যাপার? মড়াটা ঝোলানো হয়েছিল?"

"ঝোলানো হয়েছিল। যাতে সবাই দেখতে পায়, "

এড লয়েস দুর্বলভাবে হাসল, "জয় ভগবান। আমি ভেবেছিলাম আমার মাথাটা গেছে। আমি ভেবেছিলাম বিশাল কিছু ঘটেছে। হয়তো ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যানের মতো ব্যাপার। হয়তো কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতা দখল করেছে," সে বুকপকেট থেকে রুমাল বার করে কাঁপা হাতে মুখ মুছলো, "যাক,খুশির খবর, সেরকম কিছু হয়নি, "

"সেরকম কিছু হয়নি," পুলিশের গাড়িটা হল অব জাস্টিসের কাছে এসে গেছিল। সূর্য ডুবে গেছে। ফাঁকা রাস্তায় নেমে এসেছে অন্ধকার। আলো এখনো জ্বলেনি।

"এখন অনেকটা ভাল লাগছে," লয়েস বলল, "খানিকক্ষণের জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম সাংঘাতিক কোন গন্ডগোল হয়েছে। এখন সব বুঝতে পারছি। তাহলে আমাকে আর আপনাদের গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই,কি বলেন?"

পুলিশ দুজন কোন কথা বলল না।

"আমার দোকানে ফেরা দরকার, বুঝলেন। বাচ্চাদুটো খায়নি। আমি তো এখন ঠিক আছি। কোন অসুবিধে নেই। কোন দরকার থাকলে -"

"বেশিক্ষণ লাগবে না," স্টিয়ারিঙের পেছনের পুলিশটা বলল, "সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ। কয়েক মিনিটের ব্যাপার।"

"আশা করি তাই হবে," বিড়বিড় করল লয়েস, "শান্তি পাচ্ছি না। শুধু শুধু উত্তেজনা হলে -"

একটা সিগনাল দেখে গাড়িটার গতি একটু কমতেই লয়েস ঝট করে গাড়ির দরজাটা খুলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল, টাল সামলাতে গিয়ে খানিকটা গড়িয়ে গেল সামনে। তার চারপাশ দিয়ে বয়ে চলছিল গাড়ির স্রোত, সিগনাল সবুজ হতেই গতি বাড়ছিল তাদের। লয়েস মিশে গেল জনতার ভিড়ে। পিছনে শোনা যাচ্ছিল গাড়ির হর্ন, লোকজনের চিৎকার আর দৌড়ে আসার শব্দ।

ওরা পুলিশ নয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। এই পিকভিলের প্রত্যেকটা পুলিশকে সে চেনে। পঁচিশ বছর ধরে কোন ছোট শহরে ব্যাবসা চালাতে গেলে সবকটা পুলিশকে না চিনলে চলে না।

ওরা পুলিশ নয় -আর বিশেষ কোন ঘটনাও ঘটেনি। পটার,ফারগুসন,জেনকিন্স - ওরা কেউ জানে না ওটা এখানে কেন। ওরা জানেও না - আর এটা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার।

লয়েস চট করে একটা হার্ডওয়ারের দোকানে ঢুকে পড়ল। সোজা চলে গেল দোকানের পেছন দিকটায়, চমকে ওঠা কর্মচারী আর খদ্দেরদের পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল স্টোর রুমে, সেখান থেকে পেছনের দরজা দিয়ে

বাইরে চলে এল। দৌড়তে গিয়ে ধাক্কা মেরে উলটে দিল একটা গারবেজ টিন,দ্রুত গতিতে পেরিয়ে গেল কয়েকটা কংক্রিটের সিঁড়ির ধাপ, একটা বেড়া ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ল ওপারে। হাঁফাচ্ছিল সে,মুখ হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল।

পেছনে কোন আওয়াজ নেই। ওদের এড়ানো গেছে বোধহয়।

সে এখন একটা গলির সামনে। গলিটা অন্ধকার - কাগজ,ভাঙাচোরা বাক্স আর বাতিল টায়ারে বোঝাই। সোজা তাকালে ওধারের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার আলোটা দুলছে,এগিয়ে আসছে। আশেপাশে অনেক পথচারী নারী পুরুষ। দোকানপাট। নিয়ন লাইট। গাড়ি।

আর তার ডান দিকে - পুলিশ স্টেশন।

সে কিন্তু এক্কেবারে কাছেই রয়েছে। একটা মুদি দোকানের লোডিং প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে হল অব জাস্টিসের সাদা দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। বন্ধ জানলা। পুলিশ স্টেশনের অ্যান্টেনা। অন্ধকারের মধ্যে জেগে রয়েছে আরেকটা বিরাট কংক্রিটের দেয়াল, কীসের কে জানে। তার পক্ষে খুব খারাপ একটা জায়গা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। সে বড্ড কাছে। তাকে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে,পালাতে হবে ওদের থেকে।

ওদের থেকে?

লয়েস সাবধানে গলিটা দিয়ে এগোতে লাগল। পুলিশ স্টেশন ছাড়িয়ে পুরোন আমলের সিটি হল - হলুদ রঙের,কাঠ,পিতল আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি। সে দেখতে পাচ্ছে সারি সারি অফিস,অন্ধকার জানলা,প্রতিটি অফিসে ঢোকার মুখে ছোট বাগান,ফুলের গাছ।

আর - অন্য একটা জিনিস।

সিটি হলের মাথা ছাড়িয়ে একটা ঘোর অন্ধকার বস্তু। রাতের চেয়েও অন্ধকার। শঙ্কু আকৃতির সেই জিনিসটা ক্রমশ ওপরে ছড়িয়ে গিয়ে মিশে গেছে আকাশে।

তার কানে একটা আওয়াজ আসছে। কিছু একটা শোনা যাচ্ছে। এমন কিছু, যার প্রভাবে সে চাইছে তার কান আর তার সঙ্গে মনটাও বন্ধ করে রাখতে,যাতে ওই শব্দ তার কানে না ঢোকে। একটা গুনগুন আওয়াজ। অনেক দূরের কোন নিঃশব্দ গুঞ্জন,যেন মনে হচ্ছে অনেকগুলো মৌমাছি গুনগুন করছে।

লয়েস তাকিয়ে রইল। ভয়ে শক্ত হয়ে গেছিল সে। গাঢ় অন্ধকার বস্তুটা সিটি হলের ওপর ঝুলে রয়েছে। সেই অন্ধকার এত ঘন যে মনে হচ্ছে জিনিসটা নিরেট কোন কিছু। জিনিসটার মধ্যে কিছু যেন নড়ছে,ঝিকমিক করছে,আকার নিচ্ছে কোন কিছুর। আকাশ থেকে কোন কিছু নামছে,সিটি হলের মাথার ওপর খানিকক্ষণ থামছে,ঝাঁক বেঁধে থাকছে,তারপর নিঃশব্দে নামছে ছাদের ওপর।

কয়েকটা অবয়ব। আকাশ থেকে নামা অদ্ভুত কিছু ঝিকমিকে আকৃতি। সে তাদের দেখতে পাচ্ছে।

একটা পুকুরের ধারের রেলিঙের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে সে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করল।

ওরা নামছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নামছে সিটি হলের ছাদের ওপর,তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ওদের ডানা আছে। দৈত্যাকৃতি পতঙ্গের যেরকম ডানা থাকে। ওরা উড়ছে, ঝটপট করছে, তারপর থেমে থাকছে - তারপর কাঁকড়ার মত গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে ছাদের ওপর দিয়ে, ঢুকে পড়ছে বাড়ির ভেতর।

সে অসুস্থ বোধ করছে, একই সঙ্গে বিস্মিতও। রাতের ঠান্ডা হাওয়া ঝাপটা মারছে তার গায়ে, কেঁপে কেঁপে উঠছে সে সেই হাওয়ার ধাক্কায়। সে ক্লান্ত, আতঙ্কিত। সিটি হলের সামনে অনেক লোক এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। আরো লোক বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে,বেরিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে একটুক্ষণের জন্য, তারপর চলে যাচ্ছে।

ওদের আর কতজন ভেতরে আছে?

এ অসম্ভব। সে যাদের শূন্য থেকে নামতে দেখেছে,তারা মানুষ নয়। ওরা এলিয়েন - গ্রহান্তরের প্রানী। অন্য জগতের,অন্য মাত্রার। মহাকাশ থেকে আসছে,ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ছে পৃথিবীতে।

সিটি হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে কয়েকজন হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে এগোল,একজন আবার ঘুরে ভেতরের দিকে গেল। তার মানে এটা মনস্থির করতে পারছে না,তাই আবার নিজের দলের কাছে ফিরে গেল।

লয়েস ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার মাথা ঘুরছে,শরীর দুলছে। সে শক্ত করে বেড়াটা ধরে আছে। ওই মানুষটা - না,মানুষ নয়, মানুষের মত অবয়ব, হঠাৎ ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে অন্যদের পাশে চলে গেল।

নকল মানুষ। ছদ্ম মানুষ। এরা পোকা, মানুষের আকার নিতে পারে। পৃথিবীর অনেক পতঙ্গ যেমন রঙ পালটাতে পারে।

লয়েস ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বেশ রাত হয়েছে। গলিটা পুরো অন্ধকার। তবে কিছুই বলা যায় না,ওরা হয়ত অন্ধকারেও দেখতে পায়। হয়ত অন্ধকার আর আলোর কোন তফাৎই নেই ওদের কাছে।

সে সাবধানে গলি থেকে রাস্তায় চলে এল। রাস্তায় এখনো লোকজন চলাচল করছে বটে,তবে সংখ্যায় অনেক কম। বাস স্টপে বেশ কিছু লোক অপেক্ষা করছে। একটা বিরাট বাস আসছে হেলতে দুলতে, তার আলোটা জ্বলছে রাতের অন্ধকারে।

ভীড় ঠেলে লয়েস এগিয়ে গেল সামনে। বাসটা স্টপেজে দাঁড়াতেই সে উঠে সামনের দিকের একটা সিটে বসে পড়ল দরজার পাশে। একটু বাদেই ছেড়ে দিল বাস।

লয়েস একটু হাঁফ ছাড়ল। সে বসে বসে দেখছিল তার আশেপাশে বসে থাকা লোকজনদের। বিষণ্ণ, ক্লান্ত সারি সারি সব মুখ। কাজ থেকে বাড়ি ফিরছে সবাই। মামুলি লোকজন। কারোর কোন বিশেষত্ব নেই। সবাই চুপচাপ সিটে বসে বাসের ঝাঁকুনি খাচ্ছে। তার সামনের লোকটা খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে খেলার পাতাটা পড়তে শুরু করল বিড়বিড় করে। মামুলি। নীল স্যুট পরা। ব্যবসাদার,না হলে সেলসম্যান। বাড়ি ফিরছে বউ ছেলেমেয়ের কাছে।

করিডোরের ধারে একজন যুবতী বসে আছে। বয়স কুড়ি টুরি হবে। কালো চোখ,কালো চুল। কোলে একটা প্যাকেট। নাইলনের পোশাক, হিল তোলা জুতো। লাল কোট,সাদা অ্যাঙ্গোরা সোয়েটার। আনমনে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

একটা হাই স্কুলের ছেলে, জিনস আর কালো জ্যাকেট পরা।

তিন থাক চিবুকের এক বিপুলাকায় মহিলা, হাতে বিশাল ব্যাগ,পার্সেল আর প্যাকেটে ভরা। মাথাভর্তি এলোমেলো চুল। ক্লান্ত।

মামুলি লোকজন। প্রত্যেক বিকেলে বাস বোঝাই করে যে সব মানুষ বাড়ি ফেরে আরকি।

বাড়ি ফিরছে সবাই - যদিও মনটা তাদের বশে নেই। তাদের শরীর, মন, তাদের শহর - এ সব কিছুরই দখল নিয়েছে অন্য জগত থেকে আসা প্রাণীরা। শুধু তারই দখল নিতে পারেনি। নিত, যদি সে সেলারে না থেকে তার স্টোরে থাকত। পারেনি, কারণ ওরা তাকে দেখতে পায়নি। সে ওদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তার মানে ওদের অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পুরোপুরি নেই, কিছু ফাঁক আছে।

নড়েচড়ে বসল লয়েস। ওরা তাহলে সর্বশক্তিমান নয়। ওরা তাকে কবজা করতে পারেনি। সে সেলার থেকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই উঠে এসেছে। তার মানে - বোঝা যাচ্ছে ওদের শক্তিক্ষেত্রটা সীমিত।

কিছুটা দূরে - করিডোরের পাশের একটা সিট থেকে একটা লোক তাকে খেয়াল করছে। লয়েসের চিন্তার জাল ছিন্ন হল। লোকটা রোগা,কালো চুল,ছোট গোঁফ। পোশাক-আশাক ভালোই,বাদামি স্যুট পরা,জুতোটা চকচক করছে। হাতে একটা বই। লোকটা একভাবে লয়েসকে দেখে যাচ্ছে। লয়েস চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

লয়েস একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করছে। ওদের কেউ? নাকি - তার মত আরেকজন - যাকে ওরা কবজা করতে পারেনি?

লোকটা আবার তার দিকে তাকাল। ছোট ছোট কালো চোখ,সজাগ এবং ধূর্ত। চালাক। বুদ্ধিমান। ওদের পক্ষে বেশি বুদ্ধিমান - আর না হলে ওদেরই একজন।

বাসটা থামল। একজন বয়স্ক মানুষ বাসে উঠল ধীরে সুস্থে,তার টোকেনটা বাক্সে ফেলল। তারপর এগিয়ে এল করিডোরের দিকে, বসে পড়ল লয়েসের উল্টোদিকের সিটটায়।

বয়স্ক লোকটা এবার সোজা তাকিয়েছে ওই লোকটার দিকে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে কিছু যেন আদানপ্রদান হল তাদের মধ্যে। চাহনি দেখে সেইরকমই মনে হচ্ছে।

লয়েস উঠে দাঁড়াল। বাসটা চলছে। সে দৌড় লাগাল। একটা পা নিচের পাদানিতে। সে হ্যাঁচকা টান মারল এমারজেন্সি গেটটায়। খুলে গেল দরজাটা।

"এই!" চিৎকার করে উঠল ড্রাইভার,ব্রেক কষে, "কী হচ্ছে কী?"

লয়েস লাফিয়ে পড়ল। বাসটার গতি কমে আসছে। চারধারে বাড়িঘর। লোকালয় বোধহয়। চারপাশে বাগান,উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। তার পেছনে,সেই ধূর্ত-চোখো লোকটা লাফিয়ে পড়েছে। সেই বয়স্ক লোকটাও। ওরা দুজন দৌড়ে আসছে তার দিকে। লয়েস লাফ মারতেই প্রচন্ড জোরে হোঁচট খেল পেভমেন্টে,গড়িয়ে গেল রেলিঙের দিকে। অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে,অন্ধকার হয়ে আসছে চোখমুখ। প্রবল মনের জোরে সে উঠে দাঁড়াল, গড়িয়ে পড়ল পরক্ষণেই। বাসটা থেমে গেছে। লোকজন নেমে আসছে সেখান থেকে।

লয়েস হাতড়াচ্ছে চারধার। তার আঙুলে কিছু একটা ঠেকল। একটা পাথর। নর্দমার মুখে চাপা দেওয়া। কোনওক্রমে উঠে দাঁড়াল সে,যন্ত্রনায় গোঙাতে গোঙাতে। তার সামনে একটা ছায়া। একটা লোক। সেই লোকটা,ধূর্ত চোখের,হাতে বই।

লয়েস একটা লাথি কষালো। লোকটা পড়ে গেল মাটিতে, দম আটকে। লয়েস ফেলে দিল পাথরটা তার ওপর। চিৎকার করে উঠল লোকটা, চেষ্টা করল গড়িয়ে অন্য দিকে চলে যাওয়ার, "থামো! ভগবানের দোহাই!শোন -"

লয়েস আরেকটা লাথি হাঁকড়ালো। মড়মড় করে একটা আওয়াজ হল হাড় ভেঙে যাওয়ার। লোকটার গলা দিয়ে একটা বিকট আওয়াজ বেরোল শুধু, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল সবকিছু। লয়েস টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল,তারপর পিছিয়ে এল। ওরা এখনো আছে, তার চারপাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে দৌড়লো পাগলের মত, দিকপাশ না তাকিয়েই। ওরা কেউ তাড়া করে এল না। ওরা এখন সবাই ঝুঁকে পড়েছে সেই উজ্জ্বল চোখের,অসাড় হয়ে যাওয়া লোকটার শরীরের ওপর।

সে কি কোন ভুল করল?

এখন অবশ্য আর কিছু করা যাবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন তাকে পালাতে হবে - পিকভিল থেকে অনেক দূরে, যেখানে ওরা থাকবে না।

"এড," জ্যানেট লয়েস পিছিয়ে গেল খানিকটা চমকে উঠে, "কী হয়েছে? কী -"

এড লয়েস দরজাটা বন্ধ করে দিল দড়াম করে তার পেছনে, চলে এল বসার ঘরে, "জানালার পর্দাগুলো নামিয়ে দাও! এক্ষুনি!"

জ্যানেট জানলার দিকে গেল, "কিন্তু-"

"যা বলছি কর। এখানে আর কে আছে?"

"কই? যমজ বাচ্চারা আছে শুধু। তাও তো ওরা ওপরে,ওদের ঘরে। কী হয়েছে? তোমাকে এরকম লাগছে কেন? তুমি এখন বাড়ি ফিরলে কেন?"

এড সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর খানিকক্ষণ ঘুরে বেরাল সারা বাড়িতে। রান্নাঘরে গেল। সিঙ্কের নিচের ড্রয়ার থেকে বার করে আনল বড় মাংসকাটা ছুরিটা, আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করল তার ধার। তীক্ষ্ণ। অত্যন্ত ধারালো। সে আবার ফিরে এল বসার ঘরে।

"শোন," এড বলল, "হাতে বেশি সময় নেই। আমি যে পালিয়েছি, সেটা ওরা জানে। ওরা আমাকে খুঁজছে।"

"পালিয়েছে?" হতবুদ্ধি হয়ে গেল জ্যানেট, মুখে দেখা দিল একটা ভয়ের ছাপ, "কে?"

"শহর দখল করে নিয়েছে ওরা। আমি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছি। ওরা একেবারে ওপরতলা থেকে শুরু করেছে। সিটি হল আর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ওদের নিয়ন্ত্রণে। ওরা আমাদের - আসল মানুষদের নিয়ে যে কী করবে -"

"এসব কী বলছ?"

"আমরা আক্রান্ত। অন্য জগতের প্রাণীদের হাতে। ওরা একধরনের পোকা। ওরা আমাদের রূপ ধারণ করতে পারে। করেছেও। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, ওরা আমাদের মনের দখল নিতে পারে। আমার। তোমার-"

"আমার?"

"ওরা পিকভিল দিয়ে ঢুকেছে। ওরা সবাইকে নিজেদের দখলে এনেছে - আমি বাদে। ওরা আমাদের শত্রু- আর সাংঘাতিক শক্তিশালী, যদিও ওদের একজায়গায় খুঁত আছে,আর সেটাই আমাদের ভরসা। ওরা ভুল করতেও পারে।"

জ্যানেট মাথা নাড়ল, "কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি পাগল হয়ে গেছ।"

"পাগল হয়ে গেছি? না। কপালজোরে বেঁচেছি। আমি যদি বেসমেন্টে না যেতাম,তাহলে আমার অবস্থাও তোমাদের মত হত," লয়েস জানলা দিয়ে উঁকি মারল বাইরে, "অত কথা বলার দরকার নেই। কোট পরে নাও।"

"কোট?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ - কোট। আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। পিকভিল ছেড়ে। আমাদের সাহায্য চাই। লড়তে হবে। ওদের মারা যায় নিশ্চয়ই। অব্যর্থ নয় ওরা। আর দেরি করা যাবে না। তাড়াতাড়ি কর," সে জ্যানেটের হাত চেপে ধরল রুক্ষভাবে, "কোট পরে নাও। বাচ্চাদের ডাকো। এক্ষুনি বেরোব। না না, জামাকাপড় গোছানোর সময় নেই। তাড়াতাড়ি।"

ফ্যাকাশে মুখে তার স্ত্রী আলমারি থেকে কোটটা বের করল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

এড এর মধ্যেই ডেস্কের ড্রয়ারটা উপুড় করে ভেতর থেকে সব জিনিস ছড়িয়ে ফেলেছে। সেখান থেকে সে তুলে নিল একটা রোড-ম্যাপ, মেলে ধরল সামনে, "ওরা নিশ্চয়ই হাইওয়ে আটকাবে। তার মানে ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে না। পেছন দিকে একটা রাস্তা আছে, যেটা ওক গ্রোভের দিকে যায়। একবার আমি ওই রাস্তা দিয়ে গেছিলাম। ওই রাস্তায় কেউ যায় না। পরিত্যক্ত রাস্তা। ওরা বোধহয় ওই রাস্তার খোঁজ রাখবে না।"

"ওই র‍্যানচ রোডটা? তুমি কি পাগল হয়েছ? ওটা তো ভাঙা। ওখান দিয়ে কেউ গাড়ি চালায় না।"

"জানি, "এড ম্যাপটা দুমড়ে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল, "ওটাই আমাদের সুবিধে। বাচ্চাদের ডেকে এবার চল। তোমার গাড়িতে তেল ভরা আছে তো?"

জ্যানেট হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল।

"শেভ্রলে গাড়িটা? ওটাতে তো কাল বিকেলেই তেল ভরেছি," জ্যানেট সিঁড়ির দিকে এগোল, "এড,আমি বুঝতে পারছি না -"

"বাচ্চাদের ডাকো!"এড দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারল। কেউ নেই। সব শান্ত।

"এই,তোমরা নীচে নেমে এস," জ্যানেট ডাকল কাঁপা কাঁপা গলায়, "আমরা এখনই বেরোব।"

"এখন?" টমের গলা শোনা গেল।

"তাড়াতাড়ি," হুংকার দিয়ে উঠেছে এড,"নীচে নামো এক্ষুনি,দুজনেই।"

টম এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির একেবারে মাথায়, "আমি হোম ওয়ার্ক করছিলাম,বাবা। স্কুলে ভগ্নাংশ শেখাচ্ছে তো,মিস পার্কার বলেছে ভাল করে প্র্যাকটিশ না করলে -"

"চুলোয় যাক ভগ্নাংশ," এড ছেলের হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারল,দাঁড় করিয়ে দিল দরজার সামনে, "জিম কোথায়?"

"আসছে।"

জিম ধীরে ধীরে নামছিল সিঁড়ি দিয়ে, "কি হয়েছে বাবা?"

"আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।"

"বেড়াতে যাচ্ছি?কোথায়?"

এড জ্যানেটের দিকে ঘুরল, "আমরা বেরোব, তবে ঘরের আলোগুলো জ্বালানো থাকবে। টিভি চলবে। চালিয়ে দাও টিভি।" সে একটা ধাক্কা মরল জ্যানেটকে টিভির দিকে, "তাহলে ওরা ভাববে আমরা ঘরেই আছি -"



একটা গুনগুন আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সে লম্বা ধারালো মাংসকাটা ছুরিটা বার করল। ঝিমঝিম করতে লাগল গা হাত পা,সে দেখতে পেল আওয়াজটা নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে, দ্রুতগতিতে নড়ে চলা ডানার ঝাপটানি দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। অবয়বটা জিমির আকার ধারণ করেছে। অবয়বটা ছোট,বাচ্চাদের মত। ওদেরই ছোট কেউ। চোখদুটো একঝলক জ্বলে উঠল না? ঠান্ডা চোখ। পুঞ্জাক্ষি। অমানুষিক। ডানা আছে। শরীরটা এখনও হলুদ টি শার্ট আর জিনস পরে আছে, ঠিক জিমের মত। অবয়বটা অদ্ভুতভাবে ঘুরে গেল তার কাছে এসে। কী করতে চাইছে এটা?

হুল ফোটাবে।

এড উন্মাদের মত ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরটার ওপর। এটা পিছিয়ে গেছে, গুঞ্জন করছে প্রচন্ডভাবে। লয়েস একটা পাক খেয়ে দরজার দিকে চলে গেল। টমি আর জ্যানেট দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত, দেখছে দৃশ্যটা অভিব্যক্তিহীন মুখে। লয়েস ছুরি চালাল আবার। এবার ছুরিটা লেগেছে। তীক্ষ্ণ এক চিৎকার পিছিয়ে গেল বস্তুটা, ধাক্কা খেল দেয়ালের গায়ে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল।

তার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন হচ্ছে। একটা অন্যরকম অনুভূতি। তীক্ষ্ণ। আচমকা অসাড় হয়ে গেল সে। ওরা এবার তার মনের দখল নিতে চাইছে। বস্তুটা তালগোল পাকিয়ে পড়ে যেতেই সেই অনুভূতি জোরদার হয়ে উঠছে।

ওটা এখন মৃত। সে পা দিয়ে জিনিসটা উলটে দিল। জিনিসটা একধরনের পোকাই বটে,কোন ভুল নেই। হলুদ টি-শার্ট আর জিনস পরা। তার ছেলে জিম - লয়েস জোর করে চিন্তাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। ওটা ভাবার পক্ষে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হিংস্রভাবে লয়েস ছুরি থেকে রক্তটা মুছে নিয়েই দরজার দিকে ঘুরল। জ্যানেট আর টমি এখনো দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত স্থির হয়ে।

গাড়িটা বাইরেই আছে বটে,তবে সে গাড়িতে যাবে না। ওরা অপেক্ষা করছে। মাইল দশেক রাস্তা হাঁটতে হবে পরের শহরে যাওয়ার জন্য। অনেকটা পথ। খারাপ রাস্তা,খোলা মাঠ,খানাখন্দ,টিলা,বনবাদাড়। তাকে একাই যেতে হবে।

দরজা খুলে সে ঘুরে দাঁড়াল,কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাকিয়ে রইল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার স্ত্রী আর ছেলের দিকে,তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা,দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে চলে এসেছিল রাস্তায়, দ্রুত হাঁটছিল অন্ধকারের মধ্যে,পরের শহরে যাওয়ার জন্য।

ভোরের আলো ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। লয়েস টলছিল,হাঁফাচ্ছিল,ঘাম গড়িয়ে নামছিল তার সারা শরীর বেয়ে। তার জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে কাঁটাঝোপের খোঁচায় - যে দশ মাইল রাস্তা সে এখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে,বুকে হেঁটে পেরিয়ে এল সারারাত ধরে। তার জুতো কাদামাখা। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। বিদ্ধস্ত। কিন্তু সামনেই আছে ওক গ্রোভ শহর।

সে একটা গভীর শ্বাস ফেলে টিলা থেকে নামতে শুরু করল। দুবার হোঁচট খেয়ে পড়ল,দুবারই উঠে দাঁড়াল,টেনে নিয়ে চলল শরীরটা। তার কান ভোঁভোঁ করছে,চোখের সামনে সবকিছু দুলছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সে এসে উঠতে পেরেছে। পালাতে পেরেছে পিকহিল থেকে।

চাষের ক্ষেত থেকে একটা চাষি তার দিকে তাকাল। একটা বাড়ি থেকে এক তরুণী তার দিকে তাকাল অবাক হয়ে। সামনেই একটা পাকা রাস্তা। লয়েস ধরল সেটা। সামনে একটা গ্যাস স্টেশন। কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা মুরগি খাবার খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। একটা কুকুর বাঁধা আছে চেন দিয়ে।

লয়েস টলতে টলতে সেখানে ঢুকতেই একজন সাদা পোশাকের কর্মচারী ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। দেয়াল ধরে কোনওক্রমে দাঁড়াল লয়েস,বিড়বিড় করে বলল, "ঈশ্বর সহায়,শেষ পর্যন্ত এখানে পৌঁছতে পারলাম। ভেবেছিলাম আর বোধহয় হল না। ওরা প্রায় সারা রাস্তা আমাকে অনুসরণ করেছে। আমি গুনগুন আওয়াজ পেয়েছি। ওরা আমার চারধারে উড়ছিল গুনগুন করতে করতে।"

"কী হয়েছে?" কর্মচারীটি জানতে চাইল, "কেউ মারধোর করেছে নাকি? ডাকাতি হয়েছে?"

লয়েস ক্লান্তভাবে মাথা নাড়ল, "আরো বড় বিপদ। ওরা শহর দখল করেছে। সিটি হল,পুলিশ স্টেশন - সব। ওরা একটা লোককে ল্যাম্পপোস্ট থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওটাই আমি প্রথম দেখেছি। ওরা সব রাস্তা আটকে দিয়েছে। আমি ওদের গাড়ির ওপর ভাসতে দেখেছি। আজ ভোর চারটে নাগাদ বুঝতে পারলাম আমি ওদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি। আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা আর আসছে না। তারপরই সূর্য উঠল।"

কর্মচারী লোকটা ঠোঁট চাটল নার্ভাসভাবে, "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বরং একটা ডাক্তার ডাকি।"

"আমাকে ওক গ্রোভে নিয়ে চল," লয়েস হাঁফাচ্ছিল। তারপর বসে পড়ল নিচের নুড়িপাথরের ওপর, "আমাদের এখনই কাজ শুরু করতে হবে - ওদের তাড়ানোর কাজ। এখনই।"

যতক্ষণ সে কথা বলছিল,ততক্ষনই ওরা টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে রেখেছিল। তারপর কথা শেষ হল তার। কমিশনার টেপটা বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষন চিন্তা করলেন,তারপর ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরালেন,মুখে একটা চিন্তার ছাপ।

"আপনারা আমাকে বিশ্বাস করছেন না," লয়েস বলল।

কমিশনার তাকে একটা সিগারেট দিতে সে ঠেলে সরিয়ে দিল সেটা।

"শান্ত হোন," কমিশনার জানলার ধারে চলে গেলেন,তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ ওক গ্রোভ শহরের দিকে। তারপর আচমকা বললেন, "আপনাকে বিশ্বাস করছি।"

লয়েস বিনীত হল, "ধন্যবাদ।"

"তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে,"কমিশনার মাথা নেড়ে বললেন, "আপনি ওই সময়টায় কাজ করার বদলে সেলারে ছিলেন বলেই বেঁচে গেছেন। জোর কপাল। এরকম লাখে একটা হয়।"

লয়েস কালো কফিতে চুমুক দিচ্ছিল, যে কফি ওরা তাকে দিয়েছিল পান করার জন্য। এবার সে বলল বিড়বিড় করে, "আমার একটা মত আছে।"

"তাই?"

"সেটা ওদের সম্পর্কে। ওরা কারা - সেই সম্পর্কে। ওরা একবারে একটা বিশাল এলাকার দখল নিয়েছে। একেবারে উঁচু মহল থেকে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে বাকি সব লোকের। যখন ওরা দেখেছে সবাই ওদের কবজায় চলে এসেছে,ওরা তখন পরের শহরটায় যাচ্ছে। ওরা ছড়িয়ে পড়ছে,তবে ধীরে ধীরে। খুব আস্তে আস্তে। আমার মনে হয় ওরা অনেক সময় নেবে।"

"অনেক সময়?"

"কয়েক হাজার বছরও লাগতে পারে। এটা নতুন কিছু নয়।"

"কেন বলছেন এ কথা?"

"আমি যখন ছোট ছিলাম - সেই সময় বাইবেল লিগে আমরা একটা ছবি দেখেছিলাম। পুরোন প্রিন্ট। জিহোবার ছবি। মোলোক,শয়তান,বালিন,আশটারথ -"

"তাতে কী হল?"

"ওদের প্রত্যেককেই ছবি দিয়ে বোঝান হয়েছিল," লয়েস কমিশনারের দিকে তাকাল, "তাতে শয়তানকে বোঝান হয়েছিল একটা বিরাট মাছি দিয়ে -"

কমিশনার গম্ভীর মুখে শুনছেন, "তো?"

"ওরা হেরে গেছিল। বাইবেল তো ওদের হার মানারই গল্প। ওরা প্রথমে জেতে - কিন্তু শেষে পরাজিত হয়। হবেই।"

"কেন?"

"ওরা সবাইকে দখল করতে পারেনি। আমাকে পারেনি। ওরা কখনোই ইহুদিদের বিরুদ্ধে জেতেনি। ইহুদিরাই সারা পৃথিবীতে বিপদের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। বাসের ওই লোকদুটো যেমন। আমার মনে হয় ওরাও বুঝতে পেরেছিল বিপদটা। ওরাও পালাতে চেয়েছিল," লয়েসের মুঠো শক্ত হয়ে এল, "আমি ওদের একজনকে মেরে ফেলেছি। ভুল করেছি। বিরাট ভুল। আমি আর এরকম ভুল করতে চাই না।"

কমিশনার মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ,ওরা নিশ্চিতভাবেই পালাচ্ছিল, যেমন আপনি পালাতে পেরেছেন। নিতান্তই বরাতজোরে। কিন্তু শহরের বাকি সবাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আপনি ঠিকই বলেছেন," তিনি এবার জানলা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন ভেতরে, "মিঃ লয়েস,আপনি পুরো ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন।"

"না,পুরো ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার হয়নি। ওই লোকটার লাশ ল্যাম্পপোস্ট থেকে ঝুলছিল কেন? ওরা কেন ওকে ইচ্ছে করে ওখানে ঝুলিয়ে রাখল?"

"খুব সহজ," কমিশনার ফ্যাকাশে মুখে হাসলেন, "টোপ।"

লয়েস শক্ত হয়ে গেল। হৃৎপিন্ডটা মনে হল বন্ধ হয়ে গেছে, "টোপ? কীসের টোপ?"

"বাঃ,টোপ নয়? টোপ দিয়েই তো ওরা আপনাকে বের করে আনল। ওই টোপ দিয়েই তো আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিল যে আপনি এখনও ওদের নিয়ন্ত্রণে আসেননি। ওরা জানতে পারল কারা ওদের দখলে আর কারাই বা নয়,তাই না?"

লয়েস ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, "তার মানে ওরা ব্যর্থ হতে পারে এটাও ভেবে রেখেছিল আগে থেকেই -,"ভেঙে পড়ল লয়েস, "তাই ওরা ফাঁদ পেতেছিল।"

"আর সেই ফাঁদে আপনি পা দিলেন। আপনি নিজেকে চিনিয়ে দিলেন," কমিশনার আচমকা ঘুরলেন দরজার দিকে, "চলে আসুন,লয়েস। আমাদের এখনই বেরোতে হবে। অনেক কাজ আছে। হাতে আর সময় নেই।"

লয়েস কমিশনারের পিছু নিল জড় পদার্থের মত, "কিন্তু লোকটা কে? আমি তো লোকটাকে কখনই দেখিনি। ও এখানকার লোক নয়। অন্য জায়গার। হাতে পায়ে কাদা মাখা,নোংরা। মুখে কাটার দাগ,ক্ষতবিক্ষত -"

একটা অদ্ভুত চাহনি দেখা গেল কমিশনারের মুখে, "হতে পারে," নরম গলায় বললেন তিনি, "আপনিও সেটা বুঝতে পারবেন। আমার সঙ্গে আসুন,মিঃ লয়েস," দরজা খুলে ধরলেন তিনি, তাঁর চোখ এখন অত্যন্ত উজ্জ্বল। রাস্তার সামনের পুলিশ স্টেশনটা নজরে পড়ল লয়েসের। কয়েকটা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। একটা মঞ্চ। একটা টেলিফোনের খুঁটি - আর একটা দড়ি!

"ঠিক এইরকমভাবে,মিঃ লয়েস," কমিশনার বললেন ঠান্ডা গলায়,তাঁর মুখে একটা শীতল হাসি।

ওক গ্রোভ মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসিডেন্ট যখন ভল্ট থেকে বেরোলেন,তখন সূর্য ডুবে গেছে। তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি ভল্টে, টুপি আর কোট পরে বেরিয়ে এলেন ব্যাঙ্ক থেকে। রাস্তায় লোকজন রয়েছে,তারা বাড়ি ফিরছে সবাই ক্লান্ত পায়ে।

তাঁকে শুভরাত্রি জানাল ব্যাঙ্কের গার্ড,তালা লাগিয়ে দিল ব্যাঙ্কের দরজায় তাঁর পেছনে।

"শুভ রাত্রি,"বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক্ল্যারেন্স মেসন,পা চালিয়ে দিলেন তাঁর গাড়ির দিকে। খুব ক্লান্ত লাগছে। আজ সারাদিনটা তাঁর ভল্টেই কেটেছে,পরীক্ষা করতে হয়েছে সব কিছু,দেখেছেন আরো কিছু সেফটি বক্স সেখানে রাখা যায় কিনা। ভাল লাগছে যে কাজটা তিনি শেষ করে উঠতে পেরেছেন।

রাস্তার শেষ মাথায় এসে তিনি থমকে গেলেন। রাস্তার আলো এখনো জ্বলেনি। আশেপাশের সবকিছুই এখন আলো আঁধারিতে ঢাকা। সেই আলো আঁধারিতে তিনি দেখলেন - পুলিশ স্টেশনের সামনের টেলিফোনের খুঁটি থেকে কী যেন একটা ঝুলছে। জিনিসটা দুলছে অল্প অল্প বাতাস লেগে।

কী এটা?

তিনি জিনিসটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তিনি এখন বাড়ি যেতে চাইছেন। তিনি ক্লান্ত,ক্ষুধার্ত। তিনি ভাবছেন বাড়ির কথা,তাঁর স্ত্রীর কথা,ছেলেমেয়েদের কথা। ডিনার টেবিল। গরম গরম খাবার। কিন্তু তাঁর সামনে, আলোআঁধারির মধ্যে ওই বিশ্রি জিনিসটা কী?

অন্ধকারে তিনি বুঝতে পারছেন না জিনিসটার অবয়ব,বুঝতে পারছেন না ওটা কি,তবুও জিনিসটা যেন তাঁকে টানছিল সামনে যাওয়ার জন্য। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল তাঁর। একটা অস্বস্তি। তিনি ভয় পাচ্ছেন। আতঙ্ক। তবুও তিনি তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে।

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়,আর কেউই জিনিসটাকে খেয়াল করছিল না।

[ফিলিপ কে ডিক(Philip K Dick) রচিত দি হ্যাঙ্গিং স্ট্রেঞ্জার অবলম্বনে।]

সাত সিমোনের কথা

ভেরা জেনোফন্টোভনা
ইংরিজি ভাষান্তর থেকে অনুবাদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য



অনেক অনেক দিন আগে, অনেক দূরের এক দেশে থাকত এক রাজা। তার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালএ ঘোড়া এই সবকিছুই ছিল। কোষাগারে সোনারুপো থইথই। শুধু একটাই জিনিসের অভাব। রাজপ্রাসাদে একটা রানি নেই। তেমন ভালো একটা রাজকন্যা না পেলে রাজার বিয়েতে মনও উঠছিল না। এইসব নিয়ে বসে বসে রাজা ভাবছেন এমন সময় দেখেন রাস্তা দিয়ে এক ভিনদেশি সওদাগর যাচ্ছে। দেখেই রাজার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ভিনদেশি সওদাগররা দুনিয়া ঘোরে। তাদের কাছে ভালো রাজকন্যার খবর মিললেও মিলতে পারে। অতএব পেয়াদা তলব নিয়ে গেল সওদাগরের কাছে। সে খানিক বাদে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

খানিক বাদে রাজার মুখে সব শুনে সে ভুরুটুরু কুঁচকে বলে, আছে বটে এক রাজকন্যা। রূপ বটে তার! তার ছটায় সূর্যও অন্ধকার ঠেকে। তার নাম হেলেনা। থাকে অনেক দূরের বুজান নামের এক দ্বীপে।"

"কোথায় সে দ্বীপ?বলো শিগগির।" রাজা বললেন।

"এত ঘুরে বেড়াই! কোথায় সে দ্বীপ সে পথ কি আর মনে আছে রাজা? তবে হ্যাঁ এখান থেকে সে দ্বীপ সমুদ্রে দশ বছরের পথ। আর তাছাড়া সে মেয়েকে তুমি বিয়ে করতেও পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না।" সওদাগর বলল।

"কী ? এতবড়ো কথা? জানিস আমি কে?" রাজা ভীষণ রেগে উঠে বলল। সওদাগর হেসে বলে, "রাগ করো কেন রাজা? ভেবে দেখ। সে দ্বীপ যেতে আসতে বিশ বছর। কন্যেকে নিতে আজ রওনা দিলে কন্যে এসে পৌঁছুবে বিশ বছর বাদে। তদ্দিনে সে বুড়ি হয়ে যাবে। তুমিও বুড়ো হয়ে যাবে। বিয়ে হবে কেমন করে?"

শুনে রাজা মাথা নেড়ে বলল, "সে ঠিক। সে ঠিক। খবরটার জন্যে ধন্যবাদ। তুমি এখন যেতে পারো।"

সওদাগর তো চলে গেল। এদিকে রাজার তো কনের চিন্তায় মাথার ঠিক নেই। কী করে কী করে ভাবতে ভাবতেই একদিন রাজা বেরিয়েছে ঘুরতে।

শিকার খেলতেখেলতে অনেক দূরে এসে দেখে একটা চমৎকার গ্রাম। সেখানে ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার মত ফসল।

"কার খেত রে এগুলো? এত ভালো ফসল হয়েছে? আমার দেশে এমন ভালো চাষী কে? গিয়ে তাদের ডেকে আন তো!" আদেশ দিল রাজা।

অমনি পাইক পেয়াদারা দৌড়ে গিয়ে ধরে আনল সাতটা একরকম দেখতে লোককে।

তারা এসে প্রণাম করে দাঁড়াল রাজার সামনে।

"এই ফসল তোমরা ফলিয়েছ?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ মহারাজ," একসঙ্গে মাথা নাড়ল সাতজন।

"তোমাদের পরিচয়?"

"আমরা হলাম সাত ভাই সাত সিমোন," তারা জবাব দিল, "আমাদের বাপ মা আমাদের সবাইকে একটাই বাড়ি দিয়েছে, সেখানে আমরা একসাথে থাকি, একটাই জমি দিয়েছে, সেখানে আমরা একসঙ্গে চাষ করি আর একটাই নাম দিয়েছে, আমরা তাই সবাই সিমোন।"

"অ্যাঁ? সে কী হে? তোমাদের আলাদা আলাদা কিছুই নেই নাকি?" রাজা হেসে বললেন।

"আজ্ঞে মহারাজ আছে। আমাদের সাতজনের সাতটা আলাদা গুণ আছে" তারা বলল।

“কী কী গুণ?”

তখন তারা যা বলল তা হল এই-

এক ভাই আকাশছোঁয়া মিনার গড়তে জানে। দু নম্বর সে মিনারে চড়ে আকাশে পৌঁছোতে পারে। সেখান থেকে সে দুনিয়াসশুদ্ধু দেখতে পায়। তিন নম্বর এমন জাহাজ গড়তে পারে যা এক বছরের রাস্তা এক সপ্তাহে যায়। চার নম্বর ভাই আবার সে জাহাজ ঝড়ে পড়োলে তাকে জলের তলায় ডুবিয়ে ডুবো জাহাজ বানিয়ে ধাইতে পারে। পাঁচ নম্বর বানাতে পারে জাহাজের জন্য অটোমেটিক কামান। দুনিয়ায় কেউ তার গোলা থেকে বাঁচতে পায় না। ছ নম্বর, সেই কামানের গোলায় ঘা খাওয়া শিকার মাটি ছোঁবার আগে তাকে ছোঁ মেরে ধরে আনতে পারে।

আর সবচেয়ে ছোটো যে সিমোন সে মুচকি হেসে বলল, “আমি খুব ভালো চুরি করতে পারি। সেরা দুর্গের সেরা জিনিসও এমন চুরি করে আনব যে কেউ টেরই পাবে না!” শুনে রাজা রেগে গিয়ে বলে, “এই কে আছিস, এটাকে শেকল বেঁধে নিয়ে চল। আর শোনো হে বাকি সিমোনেরা। তোমরাও চল রাজধানীতে। আমি তোমাদের পরীক্ষা নেব।”

এমনিভাবে সাত সিমোন রাজধানীতে এল। এক সিমোন রইল জেল-এ আর অন্য সিমোনরা কাজে লাগল। তৈরি হল বিরাট মিনার। তাই চেপে আকাশে উঠে আরেক সিমোন দুনিয়ার সব দেশের খবর দিল রাজাকে। তিন নম্বর বানিয়ে ফেলল তার আশ্চর্য জাহাজ। সে জাহাজ জলের ওপর তিরের মত ছুটে যেতেই চার নম্বর তাকে নিয়ে ডুব দিল সাগরের তলায়। ফের ভেসে উঠতে সে রাজাকে উপহার দিল গভীর সাগর থেকে তুলে আনা একটা বিরাট স্টার্জন মাছ। রাজা তাই দিয়ে কুলিবিওকা বানিয়ে যখন খেতে বসেছে তখন পাঁচ নম্বর সিমোন তার তৈরি কামান নিয়ে এসে দূর আকাশে ভাসতে থাকা একটা ঈগলকে তাক করে সেটা ছুঁড়ল। একটুকরো পাথরের মত ঈগলটা মাটির কাছাকাছি নেমে আসতেই ছ নম্বর সিমোন বিদ্যুতের মত একটা থালা নিয়ে ধেয়ে গিয়ে ঈগলটা মাটিতে পড়ার আগেই তাকে থালায় ধরে নিয়ে রাজার সামনে এসে নামিয়ে রাখল।

“বাহবা হে ছয় সিমোন,” রাজা বেজায় খুশি হয়ে বলল, “যাও, এবারে খানিক বিশ্রাম করো গে।”

পরদিন সকালে সভা বসেছে। ছয় সিমোন সেখানে আসতেই রাজা বলেন “ওহে দু’নম্বর। মিনারে চড়ে দেখো দেখি দূরে সমুদ্রের বুকে বুজান দ্বীপটা দেখতে পাও নাকি? খুঁজে পেলে সেখানে দেখো তো হেলেনা নামে এক বেজায় রূপসী রাজকন্যা ঘোরাঘুরি করছে কি না?”

দু নম্বর সিমোন অমনি দৌড়ে গিয়ে মিনারের মাথায় উঠে বসল। খানিক বাদে নেমে এসে সে রাজাকে বলে ,“পেয়েছি মহারাজ। তবে ওখানকার রাজা দেখলাম বেজায় কড়া। শুধু বলে যাচ্ছে ,আমার মেয়ে হেলেনা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। তার যুগ্যি বর কেউ নেই। কোন রাজার ব্যাটা যদি তাকে বিয়ে করতে আসে তাহলে আমি তাকে যুদ্ধ করে শেষ করে ফেলব।”

“তা রাজার সৈন্যসামন্ত কেমন দেখলে? আর জায়গাটা কেমন দূর হবে?”

“আজ্ঞে সাধারণ জাহাজে দশ বছরের রাস্তা হবে বলেই তো মনে হল। আর রাজার সৈন্য যা দেখলাম তাতে লাখ দশেকের কমতো নয়ই। খানিক বেশিই হবে।”

শুনে তিন নম্বর সিমোন বলে, “রাজামশাই , চিন্তা কী? আমার জাহাজে বসলে দশ হপ্তায় বুজান পৌঁছে যাবেন তো। তারপর যুদ্ধ করলেই হল।”

তখন সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, “রক্ষে করুন মহারাজ। আমাদের কুল্লে দু’লাখ সেনা। দশ লাখের সঙ্গে লড়তে গেলে একজনও বেঁচে ফিরবে না যে।”

শুনে রাজার ভাঁড় হঠাৎ একটা ডিগবাজি খেয়ে বলে, “মহারাজ, যুদ্ধটুদ্ধের কী দরকার? এদের সাত



নম্বরকে জেল থেকে বের করে ওখানে পাঠিয়ে দিন। সে দুনিয়ার সবকিছু চুরি করতে পারে। রাজকন্যা চুরি করা তো তার বাঁহাতের খেল। তারপর রাজকন্যা নিয়ে পালিয়ে এলেই হল। ও দেশের রাজার এদেশে আক্রমণ করতে আসতে আসতেই দশ বছর লেগে যাবে। তদ্দিনে রাজকন্যাও বুড়ি, আপনিও বুড়ো , আর রাজকন্যার বাবা মরে ভূত। কেমন, ভালো বুদ্ধি নয়?”

শুনে রাজা বেজায় খুশি। ছোটো সিমোনকে জেল থেকে বের করে এনে বলে, “কীরে, আমার জন্য হেলেনাকে চুরি করে আনতে পারবি? তাহলে তোর সব দোষ মাপ।”

“পারব না কেন মহারাজ?” সে হেসে বলল, “এ তো বেজায় সহজ কাজ। শুধু জাহাজভর্তি কার্পেট, রেশম এইসব নিন আর তিন থেকে ছ নম্বর সিমোনকে সাথে দিন। আমি রাজকন্যা

চুরি করে নিয়ে আসছি।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। পরদিন সকালে দেশের বন্দর থেকে সমুদ্রে ভেসে গেল সেই আশ্চর্য জাহাজ। তারপর পাল উড়িয়ে বিদ্যুতের ঝলকের মত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল সমুদ্রের বুকে। দশ সপ্তাহের মধ্যে তারা বুজানের কাছে গিয়ে পৌঁছে গেল। দেখে সমুদ্রের ধারে হাজার হাজার কামান তাক করে পাহারাদাররা বসে আছে। কোন জাহাজ কাছে এলেই গোলা ছুঁড়বে।

তাদের জাহাজকে আসতে দেখেই কামানওলারা কামানে গোলা ভরতে লেগেছে। তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল, "কে তোরা? এগোলেই গোলা খাবি বলে দিলাম।"

সাত নম্বর সিমোন জাহাজ থেকে হেঁকে জবাব দিল, "আমরা সওদাগর গো, সওদাগর। রাজা আর রাজকন্যার জন্য সওগাত নিয়ে এসেছি। আমাদের পাড়ে আসতে দাও।"

"আয় তবে," বলল গোলন্দাজকের দল। তখন জাহাজ থেকে দামি দামি কার্পেট টার্পেট দিয়ে বোঝাই নৌকা ভাসল জলে। নৌকো বেয়ে পাঁচ সিমোন চলল বুজানের দেশে।

সেরা সুন্দরী হেলেনা বসে ছিল তার প্রাসাদে। সেখান থেকে রাস্তায় পাঁচ নতুন লোক দেখে দাসীদের ডেকে বলল, "দেখে আয় তো কারা আসছে আমাদের প্রাসাদে?"

দাসীরা পথে এসে দাঁড়াতেই সাত নম্বর সিমোন বলল, "আমরা সওদাগর। রাজা আর রাজকন্যার জন্য আজবতাজ্জব সব উপহার নিয়ে এসেছি।"

শুনতে পেয়েই হেলেনা তো তাদের ভেতরে ডাকিয়ে আনল। তাদের কার্পেট, রেশম, হিরেমাণিকের পসরা দেখে রাজকন্যা বেজায় খুশি। দেখে ছোটো সিমোন বলে, "রাজকন্যা, এসব সাধারণ জিনিস তো তোমার দাসীদের জন্যে এনেছি আমরা। ওদের দিয়ে দাও এসব। আসল জিনিস আছে আমাদের জাহাজে। সেসব নামিয়ে আনতে ভরোসা করি না। চাইলে গিয়ে দেখতে পারো।"

শুনে হেলেনা তার বাবাকে গিয়ে বলে ,"ও বাবা। এরা বেজায় বড়োলোক। দাসীদের হিরেমাণিক দিল। বলছে আসল দামি জিনিস জাহাজে আছে। গিয়ে একবারটি দেখে আসি?"

শুনে রাজা বলে ,"তুই যদি তাই চাস তবে তাই হবে মা। ওহে আমার যুদ্ধজাহাজ সাজাও। গোলন্দাজদের তৈরি হতে বলো। হেলেনা সওদাগরের জাহাজে ঘুরতে যাবে। তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাও।"

একটু বাদে রাজার জাহাজ জলে ভাসল। গিয়ে লাগল সিমোনদের জাহাজের গায়ে। রাজার লোক কামান তাক করে রইল সেদিকে। বেচাল দেখলেই গোলা দাগবে। হেলেনা তো নেমে এল সিমোনদের জাহাজে। তার সঙ্গে কেবিনের ভেতরে সাত নম্বর যখন কথা বলছে তখন চার নম্বর সিমোন হঠাৎ জাহাজের হাল ধরে দিয়েছে এক মোচড়, আর অমনি জাহাজ সটান নেমে গেছে সমুদ্রের একেবারে গভীরে। তাই দেখে সবাই ভাবল, হেলেনাকে নিয়ে জাহাজটা ডুবেই গেল বুঝি। খবর পেয়ে রাজা মাথা চাপড়ে কাঁদলেন। কিন্তু তাতে কী লাভ। সমুদ্র যাকে নিয়েছে, তাকে আর ফেরত আনবে কে?

তারপর আর কী? জলের তলা দিয়ে শোঁ সশোঁ করে দশ হপ্তায় দশ বহরের পথ পেরিয়ে এল তারা। রাজা তখন প্রাসাদের মাথায় বসেঅস্থির চোখে সমুদ্র দেখছেন। সময় যে হয়ে এল। এখনো জাহাজ আসে না কেন তবে?

ঠিক তক্ষুণি দিগন্তের কাছে জল ফুঁড়ে মাথা জাগাল একটা মাস্তুল। তারপর চোখের পলকে গোটা জাহাজটা ভেসে উঠে তিরের মত ছুটে এল পাড়ের দিকে। তার ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যা হেলেনা। দেখে দেখে রাজা বেজায় খুশি হয়ে নেচে উঠতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ তার ডেক থেকে রাজকন্যা একটা প্রকাণ্ড সাদা পাখি হয়ে আকাশের দিকে তিরের মতন উড়ে গেল।বিশাল ডানা ঝাপটে সে বুজানের দিকে ফেরার পথ ধরল।

কিন্তু যাবার কি জো আছে? পাঁচ নম্বর সিমোন অমনি তার কামান তাক করেছে পাখির ডানার দিকে। এমন নিখুঁত নিশানা তার যে গোলা লেগেছে পাখির ডানার মাথায়। একফোঁটা রক্ত বেরোয়নি, শুধু ডানাটা অকেজো হয়ে পাখি আছড়ে পড়তে গেছে জলের ভেতর। কিন্তু জলে পড়বার আগেই বিদ্যুতের মত সেদিকে উড়ে গিয়ে তাকে কোলে করে ধরেছে ছ নম্বর সিমোন। তারপর তাকে ফের জাহাজে তুলে আনতেই পাখি রূপ বদলে রাজকন্যা হয়ে

গেল ফের। মুক্তোর মত দাঁতে একগাল হেসে বলল, “এমন যার সেপাই সে রাজা না জানি কেমন হবে। আমি তাঁকে বিয়ে করতে একদম রাজি।”

খানিক জাহাজ এসে পাড়ে ভিড়তে এগিয়ে এল এক সোনার মই। তাতে পা দিয়ে হেলেনা নামলেন রাজার দেশের মাটিতে।

তারপর একদিন ধুমধাম করে রাজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের গল্পও ফুরুল।

ইয়েডোর ওটোকোডেটের একটি গল্প

গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট

অষ্টম পর্ব --সংহিতা



পূর্বপ্রকাশিতের পর

প্রথমে নৃশংস উত্তরে খুব ভয় পেল সেইবেই। কিন্তু তার সঙ্গীর যুক্তিজালে সহজেই ভুলে গেল সে। ফলে যতক্ষণ না সেইবেই ইয়োসিওয়ারার খাদের ধারে কোনো অথর্ব ভিখারি দেখতে পেল ততক্ষণ তারা চলতে লাগল। তাদের পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভিখারির। সে জেগে যেই দেখল যে এক সামুরাই আর তার পেয়াদা তার দিকে আঙুল তুলে কীসব বলাবলি করছে, অমনি তার মনে হল যে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটতে চলেছে তাতে তার ভালো কিছুই হবে না । তাই সে ভান করল যেন সে ঘুমিয়ে আছে, যদিও সে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করতে লাগল সারাক্ষণ।

আর যেই না সেইবেই ছোরাখানা বাগিয়ে তার কাছে পৌঁছোল, অমনি ভিখারি ছোরার কোপ এড়িয়ে পাকড়ে ধরল সেইবেই-এর বাহু, তারপর সেটা মুচকে ধরে সেইবেইকে ঠেলে ফেলে দিল খাদের নিচে।

সঙ্গীর ধরাশায়ী দশা দেখে গোমপাচি খাপ খুলে তরোয়াল বার করে আক্রমণ করল ভিক্ষুককে। যদিও ভিক্ষুক তার পা দুটো নাড়তে অক্ষম, তবুও সে এমন ক্ষিপ্র গতিতে লড়াই করতে লাগল যে গোমপাচি কিছুতেই তাকে কাবু করতে পারল না। এমন সময় খাদের থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল সেইবেই আর সাহায্য করার চেষ্টা করল গোমপাচিকে, কিন্তু ভিক্ষুক বুদ্ধি করে এমনভাবে তার দিকে ধেয়ে আসা আঘাতগুলোকে কাটাল যে সেইবেই-এর কপাল আর হাত কেটে গেল।

এদিকে গোমপাচি চিন্তা করল যে ভিখারির সাথে তার কোনো শত্রুতাই নেই, বরং এখন এই উদ্দেশ্যবিহীন লড়াই চালানোর থেকে বেশি জরুরি সেইবেই-এর শুশ্রূষা শুরু করা। তাই সে সেইবেইকে টেনে নিয়ে ভিখারিকে ছেড়ে চলে গেল। ভিখারিও তাদের পিছু নেওয়ার পক্ষে বেশ দুর্বল।

তারপর গোমপাচি যখন সেইবেই-এর ক্ষত পরীক্ষা করে দেখল, তখন বুঝল তাদের রাতের ফুর্তির পরিকল্পনা মুলতুবি রেখে বাসায় ফিরে যাওয়াই ভালো। তাই তারা চোবেই-এর আশ্রয়ে ফিরে এল। এদিকে মাথার ঘায়ের কথা জানাজানি হওয়ার ভয়ে অসুখের ভান করে সেইবেই শুয়ে পড়ল। পরদিন সকালে চোবেই তাঁর নিজের কাজে লাগানোর জন্য ডেকে পাঠালেন সেইবেইকে এবং জানতে পারলেন যে সে অসুস্থ। তাই সেইবেই যে ঘরে শুয়েছিল বিছানায় সেই ঘরে গেলেন চোবেই। আর দেখে ফেললেন সেইবেই-এর কপালের তরোয়ালের আঘাত।

প্রথমে তো সেইবেই কিছুতেই বলতে চায় না যে কিভাবে কপালে তরোয়ালের কোপ পড়ল, কিন্তু চোবেই-এর চাপাচাপিতে সেইবেই শেষে বলে ফেলল আগের রাতের সব ঘটনা। সব শুনে চোবেই-এর ধারণা হলো যে বীর ভিখারি নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী সামুরাই, হয়তো অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। এমন এক বীরপুরুষের উপকার করার ইচ্ছেতে সন্ধ্যাবেলা চোবেই চললেন ইয়োশিওয়ারার বাইরের বাঁধ বরাবর ভিখারিকে খুঁজতে, সঙ্গে নিলেন তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুচর, টোকেন গোম্বেই আর সিরোবেই, "তরুণ তুর্কি" -কে। ভিখারিও আগের রাতের অভিযানে তিলমাত্র ভয় পাননি বলে শুয়েছিলেন একই জায়গায়, বাঁধের ওপর। চোবেই যখন তাঁর কাছে পৌঁছোলেন, আর বললেন, "মশায়, আমি চোবেই, ওটোকাডেটের সর্দার, উপস্থিত আপনার সেবায়। আমি গভীর অনুতপ্ত কারণ আমার দলের দুজন গতরাতে আপনাকে আক্রমণ করে আপনার অপমান করেছে। যাই হোক, গোমপাচি, যত ওস্তাদ তরোয়ালবাজই হোক না কেন আপনার তুলনায় কিছুই না, তাই তাকে পিছু হটতে হয়েছে। আর তাতেই আমি বুঝলাম যে আপিনি নিশ্চয়ই এক মহান সামুরাই যিনি কোনো দূর্ভাগ্যজনক কারণে ভিখারী ও প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন। দয়া করে আপনি আমাকে আপনার সব কথা খুলে বলুন। আমি সামান্য পেয়াদা, কিন্তু হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারি, যদি আপনি আমাকে অনুমতি করেন তো।"

প্রতিবন্ধীটি প্রথমে চোবেই-এর প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরে চোবেই-এর বক্তব্যের সততা ও দয়ায় অভিভুত হয়ে বললেন, "মশায়, আমার নাম তাকাগি উমানোসুকে। আমি ইয়ামাটোর বাসিন্দা।" তারপর তিনি বললেন কিভাবে দুরাত্মা বানজায়েমনের পাপাচারে তিনি দুর্ভাগ্যের পাকে পাকে জড়িয়ে পড়তে পড়তে বর্তমান দশায় পৌঁছেছেন।

"এই সবই ভারি অদ্ভুত কথা" রাগে ছটফট করতে করতে বললেন চোবেই, "এই বানজায়েমনের কুচক্রী মনের কথা আমি টের পাবার আগে, সে আমার আশ্রয়েই ছিল। সে সানজাকে খুন করার পর এখানে থাকা তারপক্ষে মুশকিল ছিল। আমার এই দুই সাগরেদ তাকে তাড়া করেছিল এবং সেই থেকে সে আমার আশ্রয়ে ফেরেও নি আর।"



তারপর তিনি তাঁর শাগরেদদের সঙ্গে উমানোসুকের আলাপ করিয়ে দিলেন। আর একটা রেশমের পোশাক বার করলেন যা একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের গায়ে ঠিকঠাক পরানো যাবে। ভিক্ষুকের বেশধারী যুবকটিকে স্নান করিয়ে তার চুলের পরিচর্যা করে, তাঁকে পরিয়ে দিলেন পোশাকটা। তারপর টোকেন গোম্বেইকে ডেকে উমানোসুকের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন এক নামী চিকিৎসককে যাতে উমানোসুকের উরুর ক্ষতটা সারানো যায়। পরের দুমাসের চিকিৎসায় আর যত্নে, বিশ্রামে উমানোসুকের যন্ত্রণার উপশম হলো এবং তিনি সহজেই স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াতে পারলেন। তারপরের মাসে উমানোসুকে যখন অল্প অল্প হাঁটতে শুরু করলেন তখন চোবেই তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন আর স্ত্রীর সামনে, শাগরেদদের সামনে ভান করতে লাগলেন যেন উমানোসুকে তাঁর কোনো আত্মীয় যিনি চোবেই-এর সাথে দেখা করতে এসেছেন। আরও কিছু সময় পরে, উমানোসুকে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন, সে একটা দারুণ বিখ্যাত মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন তিনি। ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে তিনি একচোট বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন। তখন একটা বাড়ির চালের নিচে আশ্রয় নিলেন তিনি।

বাড়িটা ছিল ইয়ানাজিওয়ারা শহরের এক প্রান্তে। আর অপেক্ষা করতে লাগলেন আকাশ পরিষ্কার হওয়ার। এদিকে সেই রাতটাই ছিল গোমপাচির রক্তাক্ত অভিযানের রাতগুলির একটি, যার মূলে সে নিজে, তার দারিদ্র্য এবং কোমুরাসাকির প্রতি তার ভালোবাসা। সে যখন দেখল যে একজন সামুরাই বেশ দুরবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সে অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল, একবারও খেয়াল করল না যে সেই সামুরাই আর কেউ নয় তার মালিক চোবেই-এর বন্ধু উমানোসুকে। উমানোসুকে তরোয়াল বাড়িয়ে নিজেকে রক্ষা তো করলেনই, গোমাবাচির কপালটা চিড়েও দিলেন। আর তাতেই নিজের দূর্বলতার আঁচ পেয়ে গোম্পাচি পালিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। সদ্য সেরে ওঠা চোটে আবার আঘাত লাগার আশঙ্কায়, উমানোসুকে তাড়া করলেন না গোম্পাচিকে। বরং চটপট ফিরে গেলেন চোবেই-এর

বাড়িতে। গোম্পাচি ডেরায় ফিরে বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলল চোবেই-কে তার কপালের ক্ষতটার ব্যাখ্যা হিসেবে। তাহলেও, উমানোসুকে যখন গোম্পাচিকে তার অপকর্মের জন্য দুয়েক কথা শোনাচ্ছিলেন, সেসব চোবেই শুনে ফেললেন আর বুঝলেন সত্যি সত্যি কী হয়েছে। একটা খুনে ডাকাতকে তিনি তাঁর চৌহদ্দিতে রাখতে চাইলেন না আর। গোম্পাচিকে ডেকে কিছু টাকাপয়সা উপহার হিসেবে দিয়ে তাকে বলে দিলেন যে সে যেন আর কখনও চোবেই-এর বাড়িমুখো না হয়।

এই সময় চোবেই বুঝলেন যে উমানোসুকে শরীরের বল ফিরে পেয়েছেন। তিনি তাঁর শাগরেদদের নানান দল বানালেন। একেক দলকে একেক দিকে পাঠালেন বানজায়েমনের খোঁজে, যাতে উমানোসুকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারেন। শিগিগিরই খবর এলো চোবেইএর কাছে যে বানজায়েমন আসাকুসার ঠগের দলে ভিড়ে, নানা হাতসাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে রোজগার করছেন। খবরটা চোবেই উমানোসুকেকে দিলেন। উমানোসুকেও উপযুক্ত প্রস্তুতি নিলেন।। পরদিন ভোরে দুজনে রওয়ানা হয়ে গেলেন আসাকুসার দিকে, যেখানে গাঁইয়া ভুতেদের তরোয়ালের অবাক কারসাজি দেখিয়ে দিন কাটাচ্ছিল বানজায়েমন।

সেখানে মঞ্চ ঘিরে চাষাভুসো লোকেদের ভিড়। তারা হাঁ করে বানজায়েমনের কেরামতি দেখতে মশগুল। উমানোসুকে সেই ভিড় ঠেলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, “ওরে ঠগ, খুনে কাপুরুষ, আমাকে চিনতে পারছিস? আমি উমানোসুকে, উমানোজোর পুত্র। তোর ছলের শিকার তিনজন নির্দোষ মানুষ। তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছি আমি। যদি তুই পুরুষ হোস তো নিজেকে রক্ষা কর, কারণ আজই তোর আত্মা নরক দর্শন করবে।”

কথাগুলো শেষ হতে না হতেই সে প্রবল ক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ল বানজায়েমনের ওপর। পালানো অসম্ভব দেখে, বানজায়েমন প্রতিরোধের চেষ্টা করল। কিন্তু তার কাপুরুষ হৃদয় কেঁপে উঠল বারবার তার বিনাশকর্তার বিক্রমে, আর সে অচিরেই লুটিয়ের পড়ল তার বিনাশকের পদতলে, রক্তাক্ত কলেবরে।

বলাই বাহুল্য যে উমানোসুকে চোবেইকে তাঁর সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় পঞ্চমুখ হলো, এমনকি তারপরেও, তার নিজের দেশে ফিরে গিয়েও, তার মনের মণিকোঠায় রেখেছিল চোবেইএর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা। আর চোবেইকে সে দ্বিতীয় পিতার সম্মান করত।

এভাবেই চোবেই তাঁর ক্ষমতা ব্যববহার করতেন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনে। আর নিজের অগাধ সম্পত্তি বিলিয়েছিলেন দরিদ্রদের মধ্যে, দূর্ভাগাদের সহায় হয়েছিলেন যাতে কাছে, দূরে তাঁর নাম মর্যাদা পায়। তাঁর দূর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কথাও বিধৃত আছে।

আমরা তো জেনেইছি যে কিভাবে আমাদের প্রভু মিদজুনো জিউরোজায়েমন, যিনি দলবদ্ধ সম্ভ্রান্তজনদের নেতা ছিলেন, চোবেইকে লজ্জায় ফেলার ষড়যন্ত্র করে ধরা পড়েছিলেন আর কিভাবে ওটোকাডেটের পিতা চোবেই তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে বারবার অহঙ্কারী সম্ভ্রান্তজনদের অস্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। চোবেইকে আহত করার সমস্ত চেষ্টার ব্যর্থতা বড়ো তীব্র হয়ে বেজেছিল জিউরোজায়েমনের বুকে। তিনি চোবেইকে খুবই ঘৃণা করতেন। সারাক্ষণ ফিকির খুঁজতেন যে কিভাবে চোবেইকে পর্যুদস্ত করা যায়।

একদিন তিনি তাঁর এক শাগরেদকে পাঠিয়েছিলেন চোবেইএর বাড়িতে এই খবর দিয়ে যে পরদিন সকালে জিউরোজায়েমন চোবেইএর সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে চান আর এক পাত্র সুরা দিয়ে চোবেইএর সেবা করতে চান, চোবেই ঠাণ্ডা ম্যাকারোনি দিয়ে প্রভু জিউরোজায়েমনের যে সেবা করেছিলেন, তার প্রতিদানে।

চোবেই সন্দেহ করলেন যে এই বন্ধুত্বপূর্ণ নিমন্ত্রণের পিছনে ধূর্ত প্রভুর কোনো চক্রান্ত আছে, তিনি হাসি দিয়ে তরোয়াল ঢাকছেন। যদিও চোবেই জানতেন যে যদি ভয় পেয়ে তিনি এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তাঁর গায়ে বসবে কাপুরুষের তকমা, তিনি নির্বোধদের মধ্যেও হাস্যকর হয়ে উঠবেন। তাই তাঁকে লজ্জিত করার চেষ্টায় জিউরোজায়েমনের সাফল্যের সম্ভাবনাকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, তিনি তাঁর প্রিয় শাগরেদ টোকেন গোম্বেইকে ডেকে পাঠালেন, আর তাকে বললেন, “আমাকে মিদজুনো জিউরোজায়েমন এক পানাসরে নেমন্তন্ন

করেছেন। খুব ভালো করে জেনে রাখো যে এটা একটা ছল, আমি যে তাঁকে বোকা বানিয়েছিলাম তার শোধ তোলার জন্য। হয়ত আমাকে হত্যা না করলে তাঁর ঘৃণা তৃপ্ত হবে না। তাহলেও আমি যাব, আর সুযোগ নেব। যদি কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস পাই তাহলে দুনিয়াকে এক স্বেচ্ছাচারির কবল থেকে মুক্ত করার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। সেই স্বেচ্ছাচারী যার দিন কাটে অসহায় চাষা আর পেয়াদাদের উৎপীড়ন করে। যদিও আমি সফল হই জিউরোজায়েমনকে তাঁর নিজ গৃহে হত্যা করতে, তবুও আমার জীবন বিসর্জন দিতে হবে সেই কৃতকর্মের জন্য। তুমি কাল রাতে জিউরোজায়েমনের বাড়িতে একটা কবর দেওয়ার গামলা নিয়ে হাজির হয়ো, আমার মৃতদেহ তাতে করে ভরে নেওয়ার জন্য।"

"পিতা"-কে এইসব বলতে শুনে টোকেন গোম্বেই খুব ভয় পেল। সে চোবেইকে বোঝাতে চাইল যে তিনি যেন এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু চোবেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন। টোকেন গোম্বেই-এর নিষেধে কর্ণপাত না করে তিনি নির্দেশ দিতে লাগলেন কিভাবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির বন্টন হবে। আরও উদ্যোগী হলেন তাঁর ঐহিক কর্তব্যগুলোকে মিটিয়ে ফেলতে।

পরের দিনে দুপুরের দিকে তিনি তৈরি হলেন জিউরোজায়েমনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। রওয়ানা হওয়ার আগে তাঁর এক চ্যালাকে আদেশ দিলেন যে প্রীতি উপহার নিয়ে তাঁর আগে আগে যাওয়ার জন্য। জিউরোজায়েমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন চোবেই-এর আগমনের। তিনি যেই শুনলেন যে চোবেই পৌঁছেছেন তাঁর বাসায়, অমনি তাঁর শাগরেদদের বললেন যে কালবিলম্ব না করে চোবেইকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। চোবেইও তাঁর শাগরেদদের আদেশ দিলেন যে রাতে তাঁকে যেন শাগরেদরা অবশ্যই নিয়ে যেতে আসে। তারপর প্রবেশ করলেন জিউরোজায়েমনের আবাসে।

যেই তিনি জিউরোজায়েমন যে ঘরে বসেছিলেন সেই ঘরের পাশের ঘরে গেলেন অমনি টের পেলন যে জিউরোজাইয়েমনের চক্রান্ত নিয়ে তাঁর আশঙ্কা মিথ্যে নয়। কারণ দুজন মানুষ খোলা তলোয়ার হাতে তাঁর দিকে ধেয়ে এলো আর তাঁকে কেটে ফেলার চেষ্টা করল। কৌশলের সঙ্গে তিনি তাদের আঘাত এড়িয়ে গেলেন, একজনকে মাটিতে আছড়ে ফেললেন আর অপরজনের পাঁজরে লাথি কষালেন, যার জেরে সে দেওয়ালের দিকে গড়িয়ে গেল। তারপর যেন কিছুই হয় নি এমন ভান করে উপস্থিত হলেন জিউরোজায়েমনের সামনে। এদিকে জিউরোজায়েমন দু ঘরের মধ্যেকার দরজার ঠেলা পাল্লা ফাঁক করে সবই দেখেছিলেন। জিউরোজায়েমন বললেন, "স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম! চোবেই মশাই। আমি তো সারাক্ষণই শুনি আপনার সাহসিকতার কথা। তাই আমার সাংঘাতিক কৌতুহল যে আপনি কোন ধাতুতে গড়া! তাই আমি আমার শাগরেদদের লাগিয়ে পরখ করে দেখলাম আর কি যে আপনি ঠিক কেমন সাহসী। আপনি তো ওস্তাদের মার মারলেন! যা হোক, আপনাকে কিন্তু এই উদ্ধত অভ্যর্থনা মাপ করতে হবে। আসুন আমার পাশে বসুন এখন।"

"সে কথা নাই বা বললেন, প্রভু" বললেন চোবেই বেশ ব্যঙ্গাত্মক স্বরেই, "আমি জানি আমার সামান্য ক্ষমতা কোনো মহান সামুরাই-এর তুলনায় কিছুই নয়। আর যদি এই দুই মহোদয় ভয়ানক কোনো চোট পেয়ে থাকেন এইমাত্র তো তাও নেহাত ভাগ্যের ব্যাপার - এই আরকি।"

সুতরাং, যথারীতি প্রীতি সম্ভাষণ আদানপ্রদানের পর চোবেই বসলেন জিউরোজায়েমনের পাশে। পরিচারকরা সুরা ও মুখোরোচক এনে উপস্থিত করল। পান শুরু করার আগেই জিউরোজায়েমন বললেন, "চোবেই মশাই, আপনি নিশ্চয়ই এই গরমে এতটা পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আমার মনে হলো স্নান করলে আপনার আরাম হবে। তাই আমি আমার লোকেদের বলে দিয়েছি যে আপনার জন্য যেন স্নানের ব্যবস্থা করে। আপনি কি স্নান করবেন না?"

চোবেই সন্দেহ করলেন এটা তাঁকে বিবস্ত্র করার একটা ছল। তাহলে তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করা যাবে স্নানের সময়, যখন তাঁর তরোয়াল খুলে রাখা থাকবে পাশে। যদিও তিনি বেশ সানন্দেই জবাব দিলেন, "প্রভু,

আপনি ভারি ভালো। আমি তো খুবই আনন্দ পাব আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করে। শুধু আমাকে কয়েক মূহুর্তের জন্য মাপ করতে হবে।

তাই তিনি স্নানাগারে গেলেন, নিজের কাপড়-চোপড় বাইরেই ছেড়ে রাখলেন, আর তিনি স্নানে গেলেন মনে স্থির বিশ্বাস নিয়েই যে এই তাঁর মৃত্যুক্ষেত্র। তবুও তিনি অটল, অকম্প রইলেন, যদি তাঁকে মরতেই হয়, কেউ যেন বলতে না পারে যে তিনি কাপুরুষের মৃত্যু বরণ করেছেন। তারপর জিউরোজায়েমন তাঁর পরিচারকদের ডেকে বললেন যে, "জলদি কর!, স্নানঘরটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দে। আমরা এখন ওকে ঝপ করে বন্দি করব। যদি ও বেরিয়ে আসতে পারে, তো তার দাম চোকাতে একাধিক প্রাণ যাবে। সৎযুদ্ধে ও একাই তোদের ছজনের সমান। দরজায় তালা দে। আর স্নানঘরের নিচের আগুনটা জ্বালিয়ে দে। আর আমরা ওকে জলে ফুটিয়ে মারব। আর ওর হাত থেকে ছুটকারা পাব। জলদি কর রে সব, জলদি কর।"

তাই তারা দরজায় তালা দিয়ে দিল। আগুনে ততক্ষণ ইন্ধন দিয়ে গেল যতক্ষণ না জল সোঁ-সোঁ করে ফুটতে শুরু করল আর তাতে বুদবুদ উঠতে লাগল। যন্ত্রণায় কাতর চোবেই, দরজা ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু জিউরোজায়েমন তাঁর লোকেদের আদেশ দিলেন যে দেওয়াল ফুঁড়ে তাদের বর্শা গুঁজে দিতে আর চোবেইকে মেরে ফেলতে। দুটো বর্শা মুঠোয় ধরে সেগুলোকে ভেঙে টুকরো করে দিলেন চোবেই। কিন্তু শেষে তাঁর পাঁজরে গেঁথে গেল প্রাণঘাতি আঘাত। আর এক বীর মারা পড়লেন একদল কাপুরুষের হাতে।

সন্ধেবেলা চোবেই-এর স্ত্রীকে চমকে দিয়ে টোকেন গোম্বেই একটা কবর দেওয়ার পাত্র নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন সাতজন শিক্ষানবিশ। চললেন জিউরোজায়েমনের বাসা থেকে ওটোকাডেটের পিতাকে আনতে। তাদের দেখে জিউরোজায়েমনের শাগরেদরা টিটকিরি দিল, "কী ব্যাপার, তোদের মাতাল প্রভুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ময়লা ফেলার পাত্র এনেছিস?"

"না", উত্তর দিলেন গোম্বেই, "বরং আমরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা কফিন এনেছি, যেমন তিনি আমাদের আদেশ করেছিলেন।"

এ কথা শুনে চোবেই-এর সাহসের আন্দাজ পেয়ে চমকে উঠল শাগরেদরা। তারা অবাক হলো যে, নিজের পরিণতি জেনেবুঝে চোবেই হাসিমুখে তাঁর পরিণতিকে বরণ করেছেন। চোবেই-এর মৃতদেহ কফিনে ভরে তাঁর শিক্ষানবিশদের দিয়ে দেওয়া হল, যাঁরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন চোবেই-এর হত্যার প্রতিশোধ নেবেন বলে। দূরদূরান্তের দুঃস্থ আর নির্বান্ধব মানুষ, তাঁর মৃত্যুতে শোক যাপন করল। তাঁর পুত্র চোমাতসু তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেলেন, তাঁর স্ত্রী সদাচারী বৈধব্য পালন করলেন আমৃত্যু, এই প্রার্থনায় যে তিনি যেন স্বর্গে চোবেই-এর সাথে একই পদ্মের বুকে বসতে পান।

বহুবার চোবেই-এর শিষ্যরা একত্র হলেন তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু জিউরোজায়েমন তাদের কেবল ফাঁকি দিয়ে পালাতে লাগল যতদিন না সরকার তাকে বন্দি করে রাখল উয়েনোর কানিয়েজি মন্দিরে, যেমন বলা আছে "কাজুমার প্রতিশোধ" গল্পে, আর নিস্তার পেল যাবতীয় প্রতিশোধ স্পৃহার নাগাল থেকে।

এইভাবেই বেঁচে ছিলেন এবং মৃত্যু বরণ করেছিলেন ইয়েডোর ওটোকাডেটের পিতা, বান্ডজুইনের চোবেই।

তিনটে রক্ষাকবচ



সোনালী ঘোষাল

কোন এক সুন্দর সকালে একজন বালক সন্ন্যাসী মঠের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। সে মনে মনে বলল, "ওঃ, এই রকম সুন্দর দিনে বাইরে বেরিয়ে বাদাম কুড়োতে কী ইচ্ছাই না করছে!"

প্রার্থনা শেষ করে সে তাড়াতাড়ি প্রাত্যহিক কাজগুলো সেরে ফেলল, তারপর এক ছুটে প্রাচীন মঠটায় পৌঁছে গেল, মঠাধ্যক্ষকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কী আজ বাদাম কুঁড়োতে যেতে পারি?"

সন্ন্যাসী বললেন, "না, না, তোমার বাইরে যাওয়া চলবে না। পর্বতে বসবাসকারী ডাইনী যদি তোমায় ধরে ফেলে তাহলে কী হবে?"

সন্ন্যাসী বালকটি অনেক কাকুতি মিনতি করল। তার আকুলিবিকুলিতে নরম হয়ে সন্ন্যাসী অনুমতি জানিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, যদি একান্তই যেতে ইচ্ছে করে তবে যাও। কিন্তু এই তিনটে কাগজের টুকরো সঙ্গে করে নিয়ে যেও। এইগুলি সৌভাগ্যদায়ী রক্ষাকবচ। যদি কোন সমস্যার মুখোমুখি হও তবে এদের কাছে সাহায্য চেও।"

সন্ন্যাসী বালকটি মহা আনন্দে বেরিয়ে পড়ল। একছুটে পর্বতের ঢালে পৌঁছে ইতস্তত ঘুরল, ফিরল, তারপর এক সময় মঠ থেকে দূরে- বহুদূরে মিলিয়ে গেল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাবতে লাগল, "আজ আমি কত বাদামই না কুড়িয়েছি!"

হঠাৎ তার কানে এলে কে যেন বলছে, "বাছা তুমি তো সন্ন্যাসীদের মঠ থেকে এসেছ, তাই না?" সে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। বৃদ্ধা তাকে বলল, "আমার বাগানে অনেক ভালোজাতের বাদাম আছে। আমি নিজে বেছে বেছে বড় আর রসাল বাদামগুলো তোমার জন্য আগুনে ঝলসাবো আর ছোটগুলো সেদ্ধ করে দেব।"

তার জাদুমাখা কণ্ঠস্বরে বালকটি মোহিত হয়ে গেল। বৃদ্ধা বালকটিকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে প্রতিশ্রুতিমত খাবার তৈরি করল।

খাওয়া সারা হলে বৃদ্ধা তাকে বলল, "তোমার নিশ্চয়ই খুব ঘুম পেয়েছে। রাতে এখানেই শুয়ে পড়। কাল সকালে মঠে ফিরে যেও।" ছোট্ট সন্ন্যাসী বালকটি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ তার ঘুম ভাঙল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি পড়ছে। আবার সে শুয়ে পড়ল। শুয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, বৃষ্টির কণা যেন তাকে ডেকে বলতে চাইছে,

"রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্
চোখ খোল, দেখ
এ বুড়ি মানুষ নয়
জাদুকরী এক"

লেপের তলা থেকে উঁকি মেরে সে বৃদ্ধাকে সেখানেই বসে থাকতে দেখল। ভাবল বুড়িটা এখানে বসে বসে কী করছে?

হঠাৎ সে শুনতে পেল বৃদ্ধা আপনমনে বলে চলেছে, "আমি কত না সুন্দরী, আমার শিংগুলো কী ছুঁচলো আর বড়ো!"

ছেলেটি ভাবতে লাগল, "বুঝেছি, এই তাহলে পর্বতবাসিনী ডাইনী, "এ আমাকে খেয়ে ফেলবে, ভোর হতে না হতেই পালাতে হবে। ভীতসন্ত্রস্ত বালক চুপচাপ পাথরের মত শুয়ে রইল। ভোর হতে সে বলল, "বুড়িমা, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি?"

বৃদ্ধা উত্তর দিল, "না- না, বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা, হাতমুখ ধুতে পারবে না, যেখানে রয়েছ সেখানেই শুয়ে থাকো।"

"কিন্তু আমাকে যে পরিষ্কার হতেই হবে" নাছোড়বান্দা ছেলেটি জানাল।

"বড্ড জ্বালাতন করছ, আমাকে বড়ো সমস্যায় ফেলছ তুমি! ঠিক আছে যেতে দেব, তবে একটি শর্তে। আমি তোমার কোমরে এই দড়িটা বেঁধে দেব।"

এই কথা বলে ডাইনী বুড়ি তার কোমরে দড়ি বেঁধে দিয়ে নিজের হাতে দড়ির খুঁটটা ধরে ঘরের কাজকর্ম সারতে লাগল। বাইরে বেরিয়ে বালক সন্ন্যাসী ভাবল, "চটপট্ আমার কর্তব্য সেরে ফেলতে হবে।" তাই সে যত দ্রুত সম্ভব তার পকেট থেকে রক্ষাকবচের একটি বের করল। অমনি কোমরের দড়ি খুলে পড়ল।

যখন ডাইনী বুড়ি হাঁক পাড়ল, "তুমি কোথায়? উত্তর দাও" ততক্ষণ্ব বালক সন্ন্যাসী নিঃশব্দে পিছনের খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে বাতাসের বেগে ছুটে চলেছে। ওদিকে ডাইনীবুড়ি তো ঘরে অপেক্ষা করছে আর বাড়ি মাত করে বলছে, "তোমার কী এখনও হাতমুখ ধোওয়া হল না? জলদি কর।"

আর বাইরে থেকে জাদু কাগজটা উত্তর দিচ্ছে, "হয়ে এসেছে, আর একটু অপেক্ষা কর।"

বৃদ্ধা তো অপেক্ষা করেই চলেছে। খানিক বাদে অধৈর্য হয়ে সে আবার বলল, "আর কত সময় লাগবে? তাড়াতাড়ি চলে এস।"

প্রত্যুত্তরে জাদু কাগজ জানাল, "আর সামান্যক্ষন অপেক্ষা কর।"



অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত ডাইনী অবশেষে লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলেই বলে, "কী? পাখি পালিয়েছে! আমাকে ঠকিয়েছে? ঠিক আছে, আমি আসছি, এখনই তোমায় ধরে ফেলব।"

ঝড়ের বেগে ছুটে ডাইনী তো ছোট ছেলেটিকে প্রায় ধরে ফেলার উপক্রম করেছে, এমন সময় সে তার দ্বিতীয় রক্ষাকবচের কাগজখানা বের করল। জাদু কাগজ বলল, "উঁচু বালির পাহাড়ে যা।"

অমনি হুশ্ করে একটা শব্দ হল আর ডাইনীটা উঁচু এক বালির পর্বতের ওপরে উঠে গেল। সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়তে থাকে আর চিৎকার করে, দাঁড়া-- আমি আসছি..... তোকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলব!"

সন্ন্যাসী বালকটি তো ছুটে চলেছে। তারপর যখন সে দূরে সন্ন্যাসীদের মঠে দেখতে পেল তখন তার রক্ষাকবচের তৃতীয়টা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "বিশাল নদীতে পরিনত হও।"

কথা শেষ হতে না হতেই ঝপাং করে কী যেন একটা জলের পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। ডাইনী বুড়ি বড়ো নদীটায় হুশ করে ডুবে গেছে। যতই সে তাতে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে চেষ্টা করে ততই ঢেউয়ের প্রচন্ড আঘাত তাকে পেছনে ঠেলে দেয়।

ইতিমধ্যে ছেলেটি তো তাদের মঠে পৌঁছে গেছে। মঠাধ্যক্ষকে দেখে সে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করল, "আমাকে বাঁচান প্রভু। পর্বতবাসিনী ডাইনী আমার পিছনে তাড়া করেছে।"

সন্ন্যাসী বললেন,"চট্ করে এই আলমারির ভিতর ঢুকে পড়।"

বালক যেই না কার্বাডের ভিতর ঢুকছে অমনি সেখানে ডাইনী বুড়ি এসে উপস্থিত। রেগেমেগে বলল, "সেই পাজী, নচ্ছার হতচ্ছাড়া ছেলেটা গেল কোথায়? আজ আমি তাকে দিয়েই সকালের খাওয়া সারব"।

"ওঃ, সেই ছোকরা? সে তো গতকাল সকালে বাদাম কুড়োতে বেরিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে ফেরেনি।" সন্ন্যাসী সবিনয়ে জানালেন।

"মিথ্যা কথা! তুমি ডাহামিথ্যা কথা বলছ। শিগগির বল, সে কোথায়?"

সন্ন্যাসী বললেন, "আমি তো তোমায় বলেছি যে সে এখানে আসেনি।“ বলতেবলতেই সে ফের বলে, “এইরে, আমার চালের পিঠেটা বোধ হয় পুড়ে গেল।”

"হুম্ চালের পিঠে!" লোভী ডাইনী তার বিশাল নাকটাতে মৃদু টান দিল, "আমি চালের পিঠে খেতে খুব ভালবাসি, বাছা, আমায় একটা দাও।”

"যত খুশি খেতে চাও তা পাবে কিন্তু তার আগে তোমার জাদুশক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। কী, রাজি তো?"

ডাইনীবুড়ির জিভ্ তো লোভে লক্ লক্ করছে। সে বলল, তাকে যা করতে বলা হবে তাতেই সে রাজি। সন্ন্যাসী বললে, "ঠিক আছে, তুমি কতটা বড় হতে পার আমি দেখতে চাই। শুনেই বোকা বুড়ি এত বড়ো হয়ে উঠল যে তার মাথা আকাশ ছুঁয়ে ফেলল।

“বাঃ! খুব ভালো। খুব ভালো জাদুপরীক্ষা দিয়েছ। এবার দেখাও তো দেখি কতটা ছোট আকার ধরতে পার?”

যতক্ষণ পর্যন্ত না ডাইনী আগুন তোলার চিমটার মত ছোট হতে পারল ততক্ষণ পর্যন্ত সে ছোটো হতেই লাগল এবারে।

“এর থেকেও ছোট হতে পারবে কী?"

কোন উত্তর না দিয়েই ডাইনী আরও ছোট হতে থাকল।

"বাঃ! তুমি এখন একটা সয়াবিনের দানার মত হয়েছ দেখছি!” বলেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী খুব দ্রুত ডাইনীকে সোনালী রঙের দুটি পিঠের মাঝখানে রেখে মুখে পুরে ফেললেন। ডাইনীবুড়িও অক্কা পেল।

সেই থেকে জাপানের গ্রামবাসী ছেলেমেয়েরা বাদাম কুড়োতে কুড়োতে গায়,

"কী মজা! কী মজা!
ডাইনী পেল উচিত সাজা।
আহা কী আরাম
মুচমুচে খাস্তা, রসালো বাদাম
চল, পেট পুরে খাই।
ডাইনীতো নাই
বুড়োসাধু গিলে খেল তাকে
তবে ভয় আরে কাকে?”

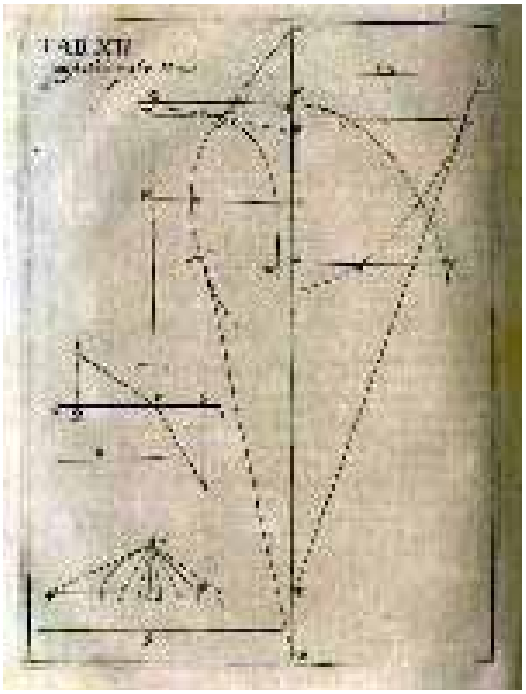
ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা



গণিতশাস্ত্র যত এগোচ্ছিল, ততই তার প্রয়োগও বাড়ছিল সমাজের নানান ক্ষেত্রে। আবার এর পাশাপাশি, মানুষ যত এগোচ্ছিল, ততই ব্যাবসা-বাণিজ্য থেকে শুরুকরে ধর্মাচরণ এই সবকিছুরই নতুন নতুন প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃষ্টি হচ্ছিল গণিতের নতুন নতুন ধারা। উন্নততর হচ্ছিল প্রচলিত গণিতের ধারাগুলোও। গণিতের ইতিহাসের ধারা থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে এইবারে একটু দেখে নেব আমরা কেমন করে সভ্যতার উন্নতি আর গণিতের বিবর্তন হাত ধরাধরি করে চলেছিল ভারতীয় ইতিহাসের সেই সোনালী শতাব্দিগুলোতে।

প্রথমে প্রত্যক্ষ বিনিময় ছিল। তারপর ধীরে ধীরে যখন লেনদেনের পরিমাণ ও ব্যাপ্তি বাড়ল তখন বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা এল। ক্রমে মুদ্রার গুরুত্ব বাড়তে শুরু করল এবং একসময় ব্যাবসার মূলধন হিসেবে বিনিময়ের পণ্যের জায়গায় মুদ্রাই হয়ে উঠল প্রধান। তারপর এল ঋণের এবং বিনিয়োগের ধারণা। সরল ও যৌগিক সুদের বিনিময়ে ঋণ, সঞ্চিত অকার্যকরী ধনকে বাজারে কার্যকরীভাবে ছড়িয়ে দেবার মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ঋণ, বিনিয়োগ ও লেনদেন এই তিনের জন্য মুদ্রার বিভিন্ন ব্যবহার, ও তার হিসেব রাখার প্রয়োজনে পাটিগণিত, এবং তার কিছু বিশিষ্ট শাখা, যেমন সমান্তর ও গুণক শ্রেণী, নিয়ে চর্চা বেড়ে উঠল। আবিষ্কৃত হতে লাগল নতুন নতুন গাণিতিক পদ্ধতি। বাণিজ্য ও গণিতচর্চার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করল ব্রহ্মগুপ্তর ধন ও ঋণরাশির ধারণা।

আমরা আগেই দেখেছি, কেমন করে পুজোপাঠের বিবিধ প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান আর চলাচল অধ্যয়নের বিজ্ঞান। সভ্যতা যখন আরো সামনে এগোল, তখন সেই বিদ্যে পুজারির মন্দির ছেড়ে এসে



আশ্রয় নিল সওদাগরের জাহাজে। পণ্য নিয়ে মরুভূমি ও অরণ্যময় প্রান্তর পেরনো বণিকের সার্থবাহের কিংবা সওদাগরের সমুদ্রপোতের অজানা দুনিয়ায় দিক ঠিক করবার জন্য কাজে আসতে লাগল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও তার ফলে সৃষ্ট গাণিতিক পদ্ধতিগুলো। জলযাত্রায় জোয়ার ভাঁটার আনাগোনার সময়ের হিসেব ও তার সঙ্গে চাঁদসূর্যের গতিপথের গণিত বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠল। এর হাজারো উদাহরণ মিলবে পুরোনো ভারতের জাতক, কথাসরিতসাগর এইসব গল্পমালায়।

বাণিজ্যে বের হবার জন্য তাই অবশ্যই অধিগত করতে হত তাই জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গণিতের প্রথম পাঠ। সে কাজের বিশেষজ্ঞদের গড়ে তোলবার প্রয়োজনে একদিকে যেমন এই শাস্ত্রটা উন্নত হল, অন্যদিকে তেমনই গড়ে উঠল বিশেষজ্ঞ শিক্ষকশ্রেণী এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখনকার বিহারের কুসুমপুরা কিংবা মধ্যভারতের উজ্জয়িনী তেমনই দুটি প্রাচীনকালের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ছিল অজস্র স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও, ইতিহাস যাদের নাম ভুলে গেছে।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্ডিতদের মধ্যে জ্ঞানবিনিময়, সওদাগরদের অধিগত জ্ঞান এক দেশ থেকে অন্যদেশে বাণিজ্যসূত্রে ছড়িয়ে যাওয়া, এবং তাদের ভাষান্তরের মাধ্যমে গড়ে উঠল জ্ঞানবিনিময়ের প্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। আজকের ইনটারনেট যা করে, সেদিনও সেই একই কাজ করত এই প্রাক কমপিউটারযুগের ধীর কিন্তু সুসঙ্গঠিত ইনটারনেট। এখন যেমন ইংরিজি, তখন তেমনই মূলত ভারতকেন্দ্রিক সেই জ্ঞান নেটওয়ার্কের মূল ভাষা ছিল সংস্কৃত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ক্রমেই আরো বেশি করে প্রয়োগ করা হচ্ছিল কৃষিক্ষেত্রেও। জলবায়ুকে ভালো করে বোঝা, বর্ষণের গতিপ্রকৃতি হিসেব করে বীজবপনের কালনির্ধারণ এই সমস্ত প্রয়োজনেও কালপঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার সৃষ্টিতে গণিতের সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর ব্যবহার শুরু হল।

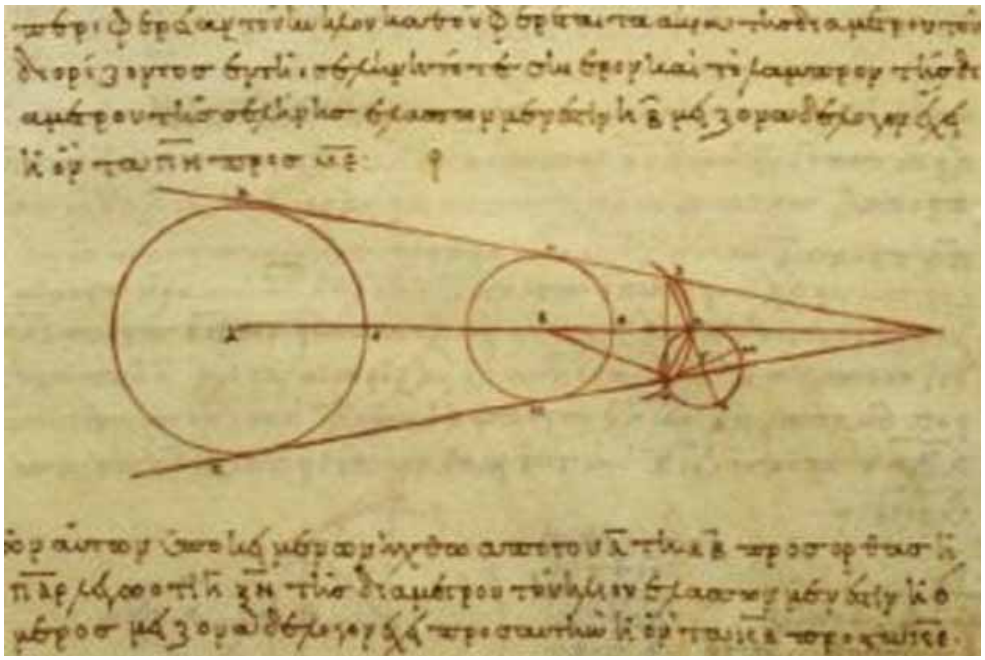
ওদিকে তাত্ত্বিক গণিতজ্ঞরা শুধুমাত্র ব্যবহারিক গণিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে ব্যবহার করছিলেন প্রকৃতিকে আরো গভীরভাবে জানা ও তার মাপজোক করবার কাজটিতে। আর্যভট সৃষ্টি করছিলেন মহাকাশে গ্রহদের অবস্থান নির্ণয়ের গাণিতিক মডেল, পৃথিবীর নিজের অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের হিসেব, গণনা করেছিলেন পাই-এর মান, মোটামুটি নিখুঁতভাবে হিসেব করে ফেলেছিলেন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর এক বছরের সময়ের পরিমাণ। এই অনুসন্ধানগুলো করতে গিয়ে যে বাধাগুলো সামনে এসেছিল সেগুলোকে অতিক্রম করতে গিয়েই আবার আবিষ্কার করেছিলেন নতুন নতুন গণিতের তত্ত্ব। এইভাবেই গড়ে উঠল বীজগণিত আর ত্রিকোণমিতির মতন গণিতের গুরুত্বপূর্ণ শাখাদের ভিত্তি।

তাঁর সে কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভাস্কর(১)গণনা করলেন গ্রহদের উদয় অস্ত, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির অঙ্ক। সে কাজ করতে গিয়ে তিনিও আবিষ্কার করলেন গণিতশাস্ত্রের কিছু নতুন দিগন্ত।

ভাস্করের এমন একটা বিশিষ্ট কাজের কথা এইখানে বলে নি। যারা ত্রিকোণমিতি পড়ছ তাদের মজা লাগবে। ধরো তোমায় বলা হল $\sin 32^0$ র মান নির্ণয় কর। তোমার কাছে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর নেই। ত্রিকোণমিতির মান ছাপানো টেবিলও নেই। তখন তুমি পাশের এই ফরমুলাটা কাজে লাগাতে পারো। এখানে অজানা রাশির মান ৩২ বসালেই উত্তরটা বেরিয়ে আসবে।

$$\sin x^\circ = \frac{4x(180-x)}{40500 - x(180-x)}$$

ষষ্ঠ শতকে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বরাহমিহির অন্যান্য কাজের মধ্যে, পূর্ববর্তী জৈন গণিতজ্ঞদের সৃষ্ট বিন্যাস আর সমবায়ের অংকের প্রভুত উন্নতি ঘটিয়েছিলেন।



এইভাবেই ধীরে ধীরে ব্যবহারিক প্রয়োজন আর গণিতের তাত্ত্বিক গবেষণা একে অন্যকে উৎসাহ দিয়ে ভারতীয় গণিতকে তুলে নিয়ে চলেছিল উন্নতির চূড়ায়। একই সাথে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির উন্নতিসাধনের পাশাপাশি গণিতশাস্ত্রের এক অসীম শক্তিধর শাখার বীজ বোনবার কাজও চলিছিল এই গণিতজ্ঞদের হাতেই। সে হল ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যা। পরের সংখ্যায় আমরা ভারতে তার জন্মকথা পড়ব।

আকাশের তারা গোনা কিংবা গাছের পাতা



সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

যদি প্রশ্ন করা হয়, আকাশে ক'টা তারা আছে কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছে ক'টা পাতা আছে, তার কি কোনও উত্তর হয়? উত্তর তো একটা নিশ্চই আছে কিন্তু চরম ধৈর্যবান মানুষের পক্ষেও সে উত্তর গুণে বার করা সম্ভব নয়।

আজকে দুটো এমন অঙ্ক আলোচনা করতে চাই, যেগুলো শুনলে এইরকমই মনে হবে, এ প্রশ্নের উত্তর কি বার করা সম্ভব? কিন্তু প্রশ্নগুলো যেহেতু অঙ্কের, তাই সরাসরি গণনা ছাড়াও অন্য বিশেষ পদ্ধতি আছে যার দ্বারা এই আপাত-অসম্ভব উত্তরও বার করা সম্ভব।

প্রথম প্রশ্নটি আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছিলেন। অঙ্কের ভাষায় যাবো না, সরল কথায় প্রশ্নটা এইরকম–

একটা পঞ্চাশ অঙ্কের সংখ্যার বাঁদিক থেকে পঁচিশ নম্বর অঙ্কটি ছাড়া আর সবই ১। অর্থাৎ সংখ্যাটি হল–

১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১n১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১ !

এই পুরো সংখ্যাটি ১৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে ঐ n অঙ্কটি কত?

শুনলে একটা অবিশ্বাস আসে– দূর, একি বলা সম্ভব নাকি? কিন্তু অসম্ভবই বা কেন, ঐ n -এর জায়গায় ১,২,৩,... ইত্যাদি অঙ্ক এক এক করে বসিয়ে কষে দেখলেই হয় সংখ্যাটা ১৩ দিয়ে বিভাজ্য কিনা!

এটা একটা পদ্ধতি বটে। এবং নির্ভুল পদ্ধতি, কোনও একটা অঙ্কে নিশ্চই ভাগ মিলে যাবে। সেটাই উত্তর। কিন্তু–

হ্যাঁ, একটা বিরাট 'কিন্তু'। যতটা সহজে বলা গেল, প্রকৃত কাজটা করা কি ততই সহজ? কে করবে ঐ মেহনত? ধরা যাক, কম্পিউটারের সাহায্য পাওয়া যাবে না। তাহলে? মনে হয় কেউ নিশ্চই ও পথে পা বাড়াতে চাইবে না।

বাড়ানো উচিৎও নয়। তাহলে আর কোনও সহজ উপায় কি আছে নাকি? সৌভাগের কথা, আছে। সহজ যুক্তি দিয়ে এই ধাঁধার মত অঙ্কের উত্তর বার করা যায়।

প্রশ্নটা সংখ্যা-তত্ত্বের। কিন্তু জটিল সংখ্যা-তত্ত্বে যাবার দরকার নেই। যুক্তি দিয়েই ভেবে দেখা যেতে পারে। তা যুক্তিগুলো এইভাবে সাজালাম–

[১] সংখ্যাটাকে তিনটে সংখ্যার সমষ্টিতে ভেঙে নাও– (১) ২৪টা ১ এর পিঠে ২৬টা শূণ্য, (২) ঐ অজানা সংখ্যাটা, তারপর ১ ও তারপরে ২৪ টা শূণ্য এবং (৩) ২৪টা ১। সহজেই ধরা যাচ্ছে, এই তিনটে সংখ্যার সমষ্টি হল ঐ সংখ্যাটা।

[২] এখন এটা তো জানা, যে কোনও তিন অঙ্কের সংখ্যার পিঠে ঐ সংখ্যাটাই আবার লিখলে যে ছ'অঙ্কের সংখ্যাটা পাওয়া যায় তা ১৩ দিয়ে বিভাজ্য (খুব সহজ যুক্তি। যেহেতু ঐ ছ'অঙ্কের সংখ্যাটার একটা গুণনীয়ক ১০০১, যেটা কিনা ১৩ দিয়ে বিভাজ্য!)।

[৩] এই যুক্তিতে (১) আর (৩) সংখ্যা দুটোই ১৩ দিয়ে বিভাজ্য। যেহেতু পুরো সংখ্যাটা ১৩ দিয়ে বিভাজ্য, অতএব সংখ্যা (২) টাও ১৩ দিয়ে বিভাজ্য হতে হবে।

[৪] (২)-র ডানদিকে যেহেতু যুগ্মসংখ্যক শূণ্য আছে, সুতরাং ঐ অজানা সংখ্যাটা ও তারপর ১ মিলে যে দু'অঙ্কের সংখ্যাটা সেটা ১৩ দিয়ে বিভাজ্য হওয়া ছাড়া গতি নেই।

[৫] তাই অজানা সংখ্যাটা ৯!

খুব 'পেশাদার' সমাধান বোধহয় হল না। কিন্তু উত্তরটা ঠিক। এবং যুক্তিগুলোও।

এই প্রশ্নের একটা 'এক্সট্রা'ও আছে। ঐ আজানা সংখ্যাটা বাঁদিক থেকে না হয়ে যদি ডানদিক থেকে পঁচিশ নম্বর ঘরে হত, তাহলে?

এটা তোমরাই বার করতে পারবে, প্রায় একইভাবে।

নিশ্চই ভাবছ, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কষা হল না, ফর্মুলা ব্যবহার করা হল না, ইকুয়েশন-ডায়াগ্রাম এল না– এ কী রকম অঙ্ক?

হ্যাঁ, এও অঙ্ক। বস্তুত এইটাই অঙ্ক! ফর্মুলা আর ইকুয়েশন কিন্তু যুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু একইরকম যুক্তি বারবার ব্যবহার করতে ঐগুলো প্রত্যেকবার আর আলাদা করে দেখানো হয় না।

এইরকম আর একটা অঙ্ক(!) যুক্তি দিয়ে সমাধান করা যাক। দ্বিতীয় প্রশ্নটা এই–

এক থেকে এক কোটি পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর অঙ্কগুলোর সমষ্টি কত?

এখানে সংখ্যার অঙ্কের সমষ্টি বলতে সেই সংখ্যায় যে অঙ্কগুলো আছে তাদের সমষ্টি। যেমন, ৮৩৪৯২ এই সংখ্যাটির অঙ্কের সমষ্টি হল ৮+৩+৪+৯+২=২৬। এইরকম সব সংখ্যার জন্য। ওরেব্বাবা! এই ভাবে এক থেকে এক কোটি? সে কি সম্ভব নাকি?

সম্ভব। না, প্রথাগতভাবে কষে সম্ভব নয়। কিন্তু যুক্তির সাহায্যে– একটু চালাকি করে– দেখো না চেষ্টা করে।

ততক্ষণ আর একটা অঙ্কের ধাঁধা দেখে নেওয়া যাক না হয়। মনে কর, একটা ব্যাগে ৭৫টা সাদা বল আর ৮০টা কালো বল আছে। এ ছাড়া ঐ ব্যাগের বাইরে আমাদের কাছে আরও অনেক কালো বল আছে। ঐ ব্যাগ থেকে না দেখে দু'টো করে বল তোলা হবে এই পদ্ধতিতে–

(১) যদি দুটোই কালো বল ওঠে তাহলে একটা বাইরে ফেলে দেওয়া হবে আর একটা আবার ঐ ব্যাগে রেখে দেওয়া হবে।

(২) যদি একটা সাদা আর একটা কালো বল ওঠে তাহলে কালো বলটা বাইরে ফেলে দেওয়া হবে আর সাদা বলটা আবার ঐ ব্যাগে রেখে দেওয়া হবে।

(৩) যদি দুটোই সাদা বল ওঠে তাহলে দুটোই বাইরে ফেলে দেওয়া হবে আর বাইরে থেকে একটা কালো বলে ঐ ব্যাগে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

দেখা যাচ্ছে, এইভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই দুটো করে বল বেরোচ্ছে আর একটা করে বল ভেতরে যাচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতিবার ব্যাগ থেকে একটা করে বল কম হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ, কম হতে হতে একসময়ে ব্যাগে একটামাত্র বল পড়ে থাকবে। প্রশ্ন হল, ঐ শেষ বলটার রং কি?

প্রশ্নটা দেখলেই সেই অবিশ্বাসের অনুভূতি। এ কি বলা সম্ভব নাকি? কি ক্রমে কি রঙের বল উঠবে তার তো কোনও স্থিরতা নেই। তাহলে? নিশ্চই ভাবছ, কোনও ধাঁধার বইয়ে এই প্রশ্ন পেয়েছি। কিন্তু না, এ কোনও ধাঁধা নয়। অস্ট্রেলিয়ার গণিত অলিম্পিয়াডে ১৯৮৩ সালে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেই দেখা যাবে এর একটা সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে এবং তা পাওয়া যায় সহজ বোধগম্য কিছু যুক্তি বিচার করলেই! দেখাই যাক।

প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, প্রতিবারেই কালো বলের সংখ্যা একটা করে বাড়ছে বা কমছে। (১) আর (২)-এ একটা করে কমছে, (৩)-এর ক্ষেত্রে একটা বাড়ছে। তাহলে কোনও না কোনও সময়ে সেটা ১-এ এসে পৌছতেই পারে। কিন্তু তা থেকে সেটাই যে শেষ বল, এটা বলা যাবে না। কেননা তখন সাদা বল অবশিষ্ট থাকতে পারে। অতএব এদিক দিয়ে সুবিধে হচ্ছে না। তাহলে সাদা বলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখা যাক।

দেখা যাচ্ছে (১) ও (২)-এর জন্য সাদা বলের সংখ্যায় কোনও পরিবর্তন নেই। একমাত্র (৩)-এর ক্ষেত্রে দু'টি করে সাদা বল কম হয়ে যাচ্ছে। একটা ক্লু পাওয়া গেল মনে হচ্ছে। যে রঙেরই দুটি বল তোলা হোক না কেন, সাদা বলের সংখ্যায় হয় পরিবর্তন হবে না অথবা দুটি কমে যাবে। অর্থাৎ সাদা বলের সংখ্যা সর্বদাই জোড়সংখ্যায় কম হবে। যেহেতু বিজোড় সংখ্যক সাদা বল আছে (৭৫), তাই অন্তত একটা সাদা বল ব্যাগে থেকেই যাবে। অতএব অন্তিম বলটি সাদা হতেই হবে! কেননা, অন্তিম বলটি কালো হওয়ার অর্থ ৭৫টি সাদা বল বেরিয়ে গেছে, যা সম্ভব নয়।

খুব কঠিন যুক্তি নয় বোধহয়। এবং অবশ্যই চমকপ্রদ, তাই নয় কি? একই যুক্তির বিচারে বলতে পারো, বলের সংখ্যা উল্টো হলে (৭৫টি কালো আর ৮০টি সাদা) উত্তর কি হোতো?

দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান। মনে করো সংখ্যাগুলো দুই স্তম্ভে নীচে দেখানো কায়দায় লেখা হল। দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রথম স্তম্ভের বিপরীতক্রমে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রতি সারির দুটি করে সংখ্যার অঙ্কগুলির যোগফল ৭টি করে ৯-এর সমষ্টি। অর্থাৎ–

১ থেকে ৯৯৯৯৯৯৯ সংখ্যাগুলি	সংখ্যা-জোড়ার অঙ্ক-সমষ্টি
০	৯৯৯৯৯৯৯ ৬৩
১	৯৯৯৯৯৯৮ ৬৩
২	৯৯৯৯৯৯৭ ৬৩
৩	৯৯৯৯৯৯৬ ৬৩

৪৯৯৯৯৯৭	৫০০০০০২ ৬৩
৪৯৯৯৯৯৮	৫০০০০০১ ৬৩
৪৯৯৯৯৯৯	৫০০০০০০ ৬৩

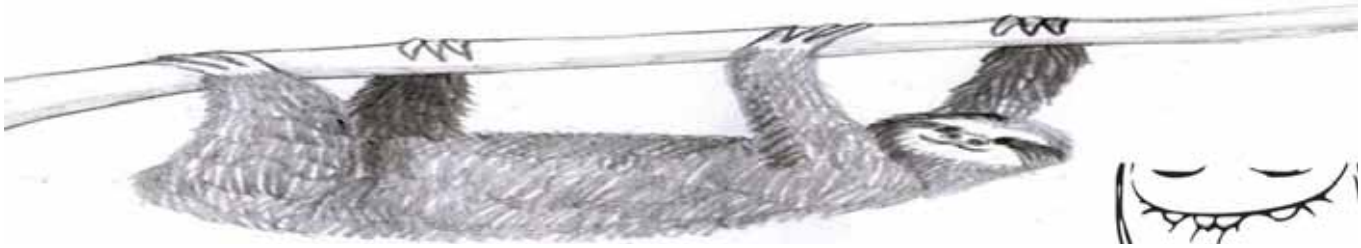
যেহেতু ৫০০০০০০ সারি আছে, অতএব সবকটির অঙ্কসমষ্টি
= ৫০০০০০০ × ৬৩ = ৩১৫০০০০০০ ।

এক কোটি (১০০০০০০০) সংখ্যাটি এর মধ্যে ধরা হয়নি। কিন্তু তার অঙ্ক-সমষ্টি ১।

অতএব নির্ণেয় অঙ্কসমষ্টি = ৩১৫০০০০০১ ।

আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই মনে হয়। চালাকি, তাই না? হলই না হয়, যুক্তি তো আছে!

শ্লথপ্রসারণ সমাচার



সুজিতকুমার নাহা

'শ্লথপ্রসারণ' শব্দটা কোনো অভিধানেই নেই! ইংরেজি 'c r e e p ' নামের বস্তুধর্ম-সূচক কথাটা বাংলা হরফে লিখে পরিভাষা গঠনের হ্যাপা এড়ানোর সহজ রাস্তাটা আমার পছন্দ নয় বলে শব্দটা বানাতে হল! কষ্টদায়ক নতুন জুতো ব্যবহারের সাথে ধীরে ধীরে আরামদায়ক পাদুকায় রূপান্তরিত হওয়া, পুরনো ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটা বেড়ে গিয়ে বেঢপ দেখানো বা টান-টান করে টাঙানো কাপড় শুকানোর দড়ি কিছুদিন ব্যবহারের পরেই ঢিলে হয়ে ঝুলে যাওয়া --- এসব রহস্যময় কাণ্ডের পেছনে আসলে আছে শ্লথপ্রসারণের হাতযশ।

শ্লথপ্রসারণের কারণে ব্যাপক ভুগতে হতো আদ্যিকালের গ্রিসের লোকদের। সেই আমলের একমাত্র যান ছিল ঘোড়ায়-টানা রথ আর প্রধান অস্ত্র ছিল তির-ধনুক। ঠিকভাবে দেখ্ভাল না করলে অদ্ভুত ধরনের সমস্যা দেখা দিত দুটোতেই। রথে শুরু হত বিচিত্র দুলুনি, ধনুকের কার্যকারিতা যেত দারুণ কমে। ব্যাপারগুলো কেমন হত তা একটু খোলসা করে বলি।

প্রাচীন গ্রিসের অমসৃণ , পাথুরে পথে চলার জন্য দরকার হত বিশেষ ধরনের চাকা । ভারী , অনমনীয় (রিজিড) চাকা লাগালে এবরো-খেবরো রাস্তায় সাংঘাতিক ঝাঁকুনিতে রথ ও আরোহী উভয়েরই প্রচন্ড ক্ষতি হত। ঝামেলা কমানোর জন্য উইলো , এলম বা সাইপ্রেস কাঠের নমনীয়, হাল্কা চাকা লাগানোই ছিল দস্তুর । ওজন পড়লে চাকাগুলো ধনুকের মতো সামান্য বেঁকে স্প্রিং-এর ন্যায় আচরণ করে ঝাঁকুনি দিত কমিয়ে । তবে এই ধরনের চাকার একটা অসুবিধে ছিল। স্প্রিং-সুলভ গুণের পাশাপাশি ছিল স্থায়ীভাবে বাঁকবার প্রবণতার দোষ। একভাবে দীর্ঘক্ষণ বেঁকে থাকলে চাকা গোলত্ব খুইয়ে ডিমের মতো আকার নিতে চাইতো। রথ স্থির থাকলে চাকা একভাবেই বেঁকে থাকে। তাই দিনের শেষে চাকার ওপর রথের ভার হঠাতে খুলে ফেলা হত রথচক্র। যতই হ্যাপা হোক না কেন, চাকা খোলা ও পরানো ছিল নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

রথের চাকার যোগ-বিয়োগের মতো ধনুকের ছিলার সংযুক্তি-বিযুক্তিও ছিল অবশ্যকরণীয়। গ্রিকরা দেখেছিল, ছিলা সর্বক্ষণ পরিয়ে রাখলে কমে যায় ধনুকের কার্যকারিতা। হ্রাস পায় ধনুক থেকে ছোঁড়া তিরের পাল্লা (রেঞ্জ)। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই তারা শুধুমাত্র ব্যবহারের সময়ই ধনুকে ছিলা পরাতো। ধনুকের কাজ মিটে গেলে ছিলা খুলে রাখতে ভুলতো না কখনও।

এবার শ্লথপ্রসারণ সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। আমরা জানি, বলপ্রয়োগে পদার্থের আকারগত পরিবর্তন হয়, আবার বল হটালে পদার্থ আগের আকারে ফিরে আসে। অবশ্য বল একটি বিশেষ মান অতিক্রম করলে আকারে স্থায়ী পরিবর্তন আসে, এমনকী পদার্থ ভেঙেও যেতে পারে। এই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হতে দেখা যায় কাঠ , চামড়া , কাপড় , দড়ি এসবের বেলায় । বিশেষ মানের চেয়ে অনেক

কম বলপ্রয়োগেও স্থায়ী প্রসারণের কারণে আকারগত পরিবর্তন আসতে পারে এসব জিনিসে। তবে এটা চটজলদি হয় না , এর জন্য লাগে বেশ কিছুটা সময়। বিচিত্র এই গুণপনাকেই বলা হয় **c r e e p** বা শ্লথপ্রসারণ।

ধাতব বস্তুতে শ্লথপ্রসারণ সচরাচর পরিলক্ষিত না হলেও পরিস্থিতিভেদে (দীর্ঘসময় ধরে অধিক বল প্রযুক্ত হলে, বিশেষত উচ্চ উষ্ণতায়) এটা ঘটতে পারে।

ক্রমপ্রসারণের দরুন আমাদের সুবিধে কিংবা অসুবিধে দুই-ই হতে পারে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে ।

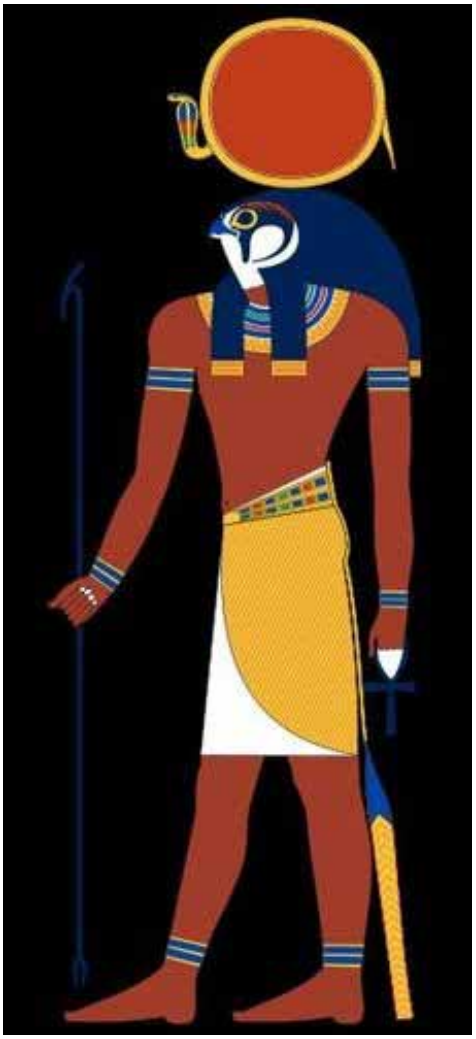
প্রথমে নেওয়া যাক অসুবিধে হওয়ার দৃষ্টান্ত। বহুদিন-ব্যবহার-করা পোশাক ঢিলেঢালা হয়ে নষ্ট হতে পারে 'ফিটিং'। বছর কয়েক চুটিয়ে পরিধানের পর প্রায়শই দেখা যায়, পছন্দের ট্রাউজারের হাঁটুর কাছের কাপড় বেড়ে গিয়ে বেঢপ লাগছে । পুরনো গাড়ির স্প্রিং 'বসে যাওয়ায়' পাল্টাতে হয় ওগুলোকে।

এবার দেওয়া যাক শ্লথপ্রসারণ-জনিত সুবিধের উদাহরণ। পুরনো জুতো আরামপ্রদ হয়ে ওঠার পেছনে আসলে আছে শ্লথপ্রসারণ। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। নতুন জুতো পায়ের কোনও স্থানে আঁট হলে জুতোর চামড়ার সেই অংশে টান পড়ে এবং এর প্রভাবে সেই জায়গার চামড়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে শুরু করে। এভাবে জুতোর চামড়ার আকারগত পরিবর্তনের কারণে নতুন জুতোর অসুবিধেগুলো ক্রমশ দূর হয়ে যায়। কষ্টদায়ক নতুন জুতো সময়ের হাত ধরে তাই কালক্রমে হয়ে ওঠে আরামপ্রদ পাদুকা !



কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ে বা সমুদ্র তীরে বেড়াতে গেলে সূর্যোদয় দেখা অন্যতম আকর্ষণ। গোল চাকতির মতো রক্তাভ সূর্য পূব আকাশে যখন প্রথম দেখা দেয় তখন আকাশে শুরু হয় নানা রঙের আলোর খেলা। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আলোর তেজ। সরে যায় অন্ধকারের কালো আবরণ। ঝলমলে পৃথিবীতে তখন প্রাণের উচ্ছাস। প্রায় বারো ঘন্টা পর আবার রক্তিম বর্ণ ধারণ করে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুব দেবার পর পৃথিবীতে নেমে আসে অন্ধকার। এটাই আমাদের কাছে প্রতিদিনের পরিচিত ঘটনা। সূর্য আছে তাই আমরাও আছি। সূর্য যেদিন থাকবে না আমরাও সেদিন থাকব না। অন্ধকারে ডুবে যাবে সমস্ত সৌরজগত। পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে প্রাণের স্পন্দন। বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীই সেদিন থাকবে না। মৃত্যুর আগে সূর্য ফুলে উঠে বিশাল আকার ধারণ করবে আর সেইসঙ্গে গ্রাস করবে পৃথিবীকে। আমাদের জীবনধারণের মূলে যে সূর্য এই সত্যটা প্রাচীনকালের মানুষেরা বুঝেছিল। কিন্তু সেসময় বিজ্ঞান ততটা উন্নত না থাকায় সুর্য সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। ভয়েই হোক বা অন্য কোনো কারনেই হোক তারা সূর্যকে বসিয়ে ছিল দেবতার আসনে। উন্নত বিজ্ঞানের দৌলতে এই নক্ষত্রটি সম্পর্কে অনেক তথ্যই এখন আমাদের জানা। সেসব আমরা জানব। তবে তার আগে জেনে নেওয়া যাক এই তারাটি সম্পর্কে প্রাচীনকালের মানুষদের ধারণা কেমন ছিল।



প্রাচীন সভ্যতায় সূর্যঃ

সূর্যের ক্ষমতা বা শক্তির কাছে মানুষের ক্ষমতা যে অতি তুচ্ছ সে ধারণা আদিম সভ্যতার মানুষদের মধ্যে ছিল। তাই সূর্যকে তারা দেবতা রূপে পুজো করত। আজটেক সভ্যতায় সূর্যদেবতা ‘হুইটজিলোপক্তলি’ ছিলেন যুদ্ধের দেবতা। হামিংবার্ড বা মাথায় পালক গোজা নীল মানবরূপে তাঁকে কল্পনা করা হত। আজটেকদের কাছে ইনিই ছিলেন সকল দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রাচীন মিশরে সূর্যদেবতার নাম ‘রা’। তাঁরা মনে করতেন মহাকাশ হল এক মহাসমুদ্র। ‘রা’ নৌকায় করে সেখানে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লে দেবী ‘নাট’ তাঁকে গ্রাস করে ফেলতেন কিন্তু প্রতিদিন সকালে ‘গুবরেপোকা’ হয়ে তাঁর পুনর্জন্ম হত। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে ‘গুবরেপোকা’ (Scarab beetle) ছিল অতি পবিত্র। ‘রা’-এর প্রতীক পাখাওয়ালা সূর্যের গোলক

হলেও দেবতারূপে তাঁর বর্ণনা রয়েছে বাজপাখির মাথাযুক্ত মানবদেহ। মিশরের ফারাওরা নিজেদের 'রা'-এর পুত্র বলে প্রচার করতেন। 'রি-হোরাকতি' নামেও দেবতা 'রা' পরিচিত ছিলেন।

গ্রিসে সূর্যের দেবতার নাম 'হেলিয়োস'। প্রাচীন গ্রিসের মানুষেরা বিশ্বাস করতেন যে ঘোরায় টানা রথে চেপে হেলিয়োস প্রতিদিন আকাশ ভ্রমণে বের হতেন। যতক্ষণ তিনি আকাশে থাকতেন ততক্ষণই তাদের দেশ আলোকিত থাকত। প্রাচীন রোমে সূর্যদেবতা 'সোল' নামে পরিচিত ছিলেন।



জাপানিদের কাছে সূর্যদেবতার চেয়ে সূর্যদেবী 'আমাতেরাসু ওমিকামি' অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। সেদেশের এক প্রাচীন গল্প অনুযায়ী পরিবারের কারও সঙ্গে সূর্যদেবীর বনিবনা ছিল না। প্রায়শই ঝগড়াঝাটি হত। শেষে একদিন পরিবার থেকে বিতারিত হলে তিনি মনের দুঃখে এক গুহায় আশ্রয় নেন। পৃথিবীর বুকে নেমে আসে অন্ধকার। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। দুর্ভিক্ষ, মহামারিতে তখন দেশের মানুষের নাজেহাল অবস্থা। দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শুরু হয় দেবীবন্দনা। অবশেষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তাঁর সুন্দরতার প্রতিফলন দেখলে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটে। অন্ধকার সরে গিয়ে পৃথিবী আবার ঝলমল করে ওঠে।

অন্যান্য সভ্যতাগুলির মতো ভারতেও প্রাচীন ঋষিগণ সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন। তাঁরা মনে করতেন সূর্য সর্বশক্তিমান। অথর্ববেদে সূর্যকে 'চক্ষুসমূহের অধিপতি' রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও সমস্ত সন্ধানী শক্তির উৎস। যে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সূর্য বন্দনা করা হয় সেটা হল– "ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং"। দেবতাজ্ঞানে কল্পনা করলেও প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ সূর্যকে অন্য রূপেও দেখেছিলেন। ঋকবেদের অনেক শ্লোকেই সূর্যকে আকাশে দোদুল্যমান একটি মুক্তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এথেকেই বোঝা যায় যে সূর্য যে একটি জড়পদার্থ সে ধারণা প্রাচীন ঋষিদের ছিল। শুধু তাই নয় সৌরবছর, চান্দ্রবছর, মলমাস, সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান ছিল। কথিত আছে অত্রিমুনি ও তাঁর বংশধরেরা গণনা করে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারতেন। সূর্য সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায় আর্যভটের 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রথে। এতে সূর্যের আবর্তন কাল, সূর্যগ্রহণ গণনা, উদয়াস্ত গণনা প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। এটি রচিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। পরবর্তীকালে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামে আরেকটি গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই। এর রচয়িতা ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্করাচার্য। এই প্রামাণ্য গ্রথ দুটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা যথেষ্ট উন্নত মানের ছিল।



সূর্যের উপাদান

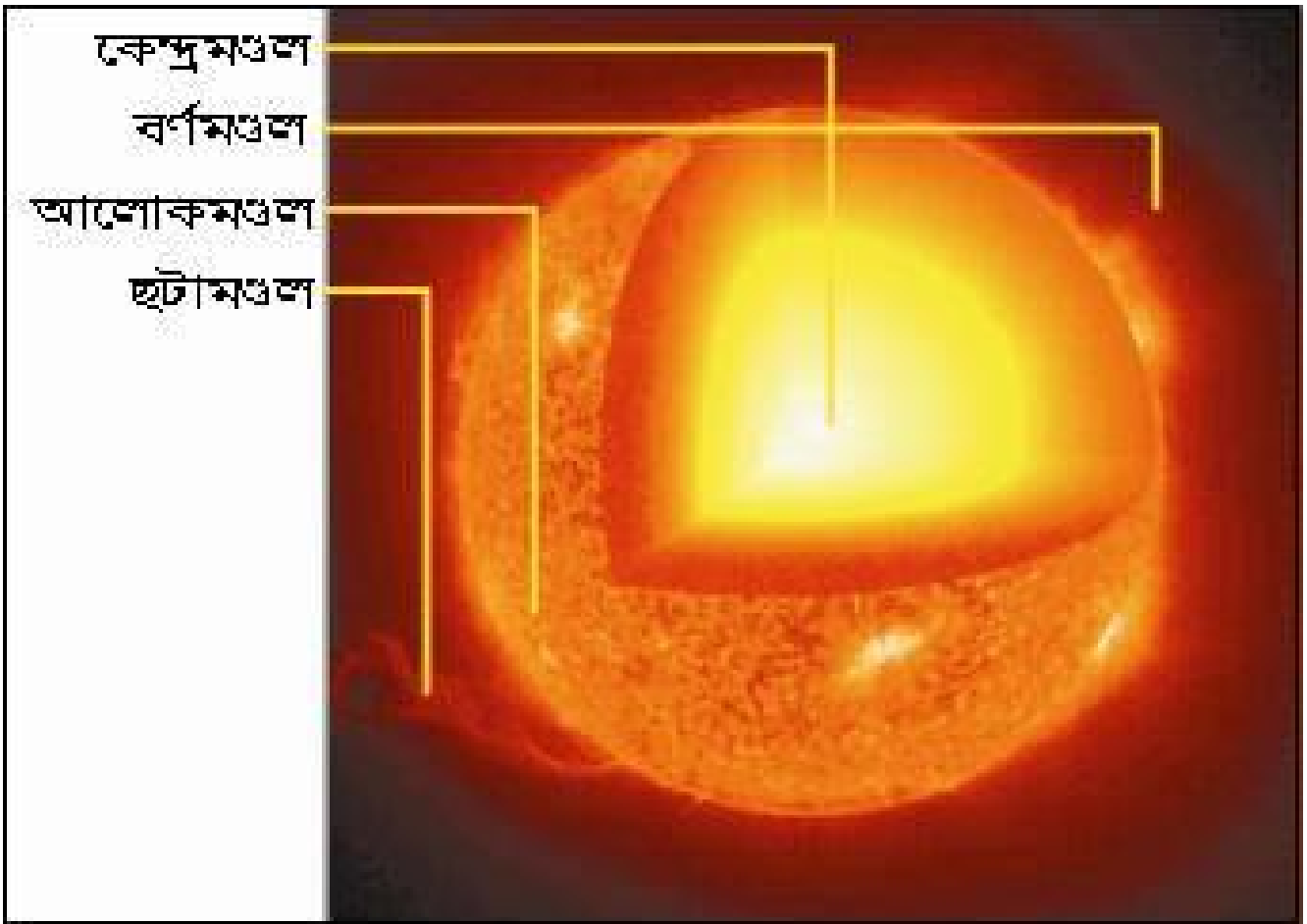
সূর্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। এর কোথাও কঠিন বা তরল পদার্থের অস্তিত্ব নেই। এর উপাদানগুলি হল– হাইড্রোজেন(73.46%), হিলিয়াম (24.85%), অক্সিজেন(**0.77%**), কার্বন (**0.29%**), লোহা (**0.16%**), নিয়ন (**0.12%**), নাইট্রোজেন (**0.09%**), সিলিকন (**0.07%**), ম্যাগনেশিয়াম (**0.05%**), সালফার(**0.04%**)।

সূর্যের সমস্ত শক্তির উৎসস্থল হচ্ছে এর কেন্দ্রীয় অঞ্চল। সেখানে অবিরত ঘটে চলেছে এক বিস্ময়কর বিক্রিয়া। এই নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ার ফলেই হাইড্রোজেন পরমাণু (প্রোটন) রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়ামে। চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হচ্ছে। এই রূপান্তরের সময় **0.07%** ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে সূর্যের কেন্দ্রস্থলে সৃষ্টি হয় অফুরন্ত পারমাণবিক শক্তি ও উত্তাপ। এছাড়াও এই সময় বিকিরিত হয় গামা রশ্মি সহ আরও নানা ধরনের রশ্মি এবং নির্গত হয় আলোককণার সঙ্গে পজিট্রনস্ (**Positrons**) ও নিউট্রিনোস্ (**Neutrinos**) কণা। কেন্দ্রস্থলে উৎপন্ন এই শক্তি সূর্যের পৃষ্ঠদেশে এলে তবেই সূর্যের উপরিদিকের অংশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে প্রচন্ড চাপের দরুন কেন্দ্রে তৈরি হওয়া এই শক্তি আলোকমন্ডলে পৌঁছাতে প্রায় দশ থেকে কুড়ি লক্ষ বহু বছর সময় লাগে। সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে এই আলোকশক্তি পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় মাত্র **8.3** মিনিট।

আলোকমণ্ডলের উপরে থাকে সূর্যের আবহমণ্ডল। এই আবহমণ্ডল তিন ভাগে বিভক্ত– বিশোষকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল এবং সৌরকিরীট বা করোনা। আবহমণ্ডলের এই স্তর সূর্যের পৃষ্ঠদেশে খুব অল্প এলাকা (প্রায় **1000** কিমি) জুড়ে আছে। তুল্পনায় বর্ণমণ্ডলের প্রসার অনেক বেশি (প্রায় **15000** কিমি) এর নয়নাভিরাম লালচে-কমলা রঙ সহজে দেখা যায় না। একমাত্র পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় খুব সামান্য সময়ের জন্য দেখা যায়। বর্ণমণ্ডলের উপরে রয়েছে সৌরকিরীট বা করোনা। এর বিস্তৃতি বহু দূর পর্যন্ত। এই অঞ্চলটি খুবই সুন্দর দেখতে। তবে আলোকমণ্ডলের অত্যাধিক ঔজ্জ্বল্যের জন্য একে আমরা সবসময় দেখতে পাই না।

সূর্যের গঠন

গঠনের বৈচিত্র্য অনুযায়ী সূর্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায়। যেমন– ছটামণ্ডল (করোনা), বর্ণমণ্ডল (ক্রোমোস্ফিয়ার),



আলোকমণ্ডল (ফোটোস্ফিয়ার), কনভেকশন জোন, রেডিয়ো অ্যাকটিভ জোন (তেজস্ক্রিয়মণ্ডল) এবং কেন্দ্র অঞ্চল।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। তেমনই সূর্যকে ঘিরে আছে একটা গ্যাসের (প্লাজমা) আবরণ। এর ঘনত্ব খুবই কম। এই গ্যাসের আবরণকেই বলা হয় সূর্যের আবহমণ্ডল। লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত 'করোনা' সূর্যের আবহমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের অংশ। এর বিস্তৃতি প্রায় **3.6** কোটি মাইল। অর্থাৎ প্রায় বুধগ্রহের সীমানার কাছাকাছি পর্যন্ত। সূর্যের এই অঞ্চলটি এতই উত্তপ্ত যে মনে হয় সর্বদা জ্বলছে। এই অংশের তাপমাত্রা দশ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ত্রিশ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে।

পৃথিবীর মতো সূর্যেরও আহ্নিকগতি আছে। যেহেতু সূর্যের শরীর উত্তপ্ত গ্যাসের তাই তার কোনো অংশ একটু বেশি বেগে ঘুরছে, আবার কোনো অংশ একটু কম বেগে। বিষুবরেখায় ঘুর্ণন বেগ বেশি হওয়ায় সেখানকার আবর্তনকাল **25** দিনে আর মেরুতে **31** দিনে। ফলে সূর্যের গোটা শরীর সবসময় একরকম থাকে না।

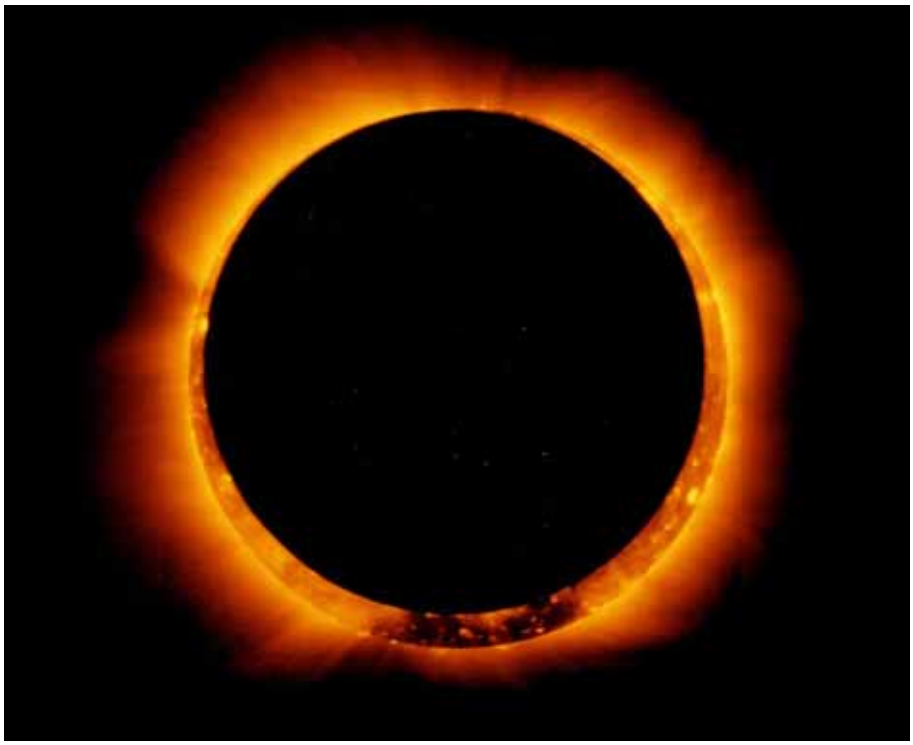
সূর্যকে একটি ডিমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কুসুম অংশটি হল সূর্যের 'কেন্দ্র অঞ্চল' বা 'কোর' (**Core**)। এই অঞ্চলটি সূর্যের মোট আয়তনের **2%** ও মোট ভরের **60%** নিয়ে গঠিত। এখানেই ঘটে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া। এরফলে প্রায় সারে চার লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত এই অঞ্চলে উদ্ভূত হয় প্রচন্ড তাপ– প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি কেলভিনের মতো। আর চাপ থাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় একশো গুণ বেশি। এত উচ্চ তাপে কোনো পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে না, থাকে প্লাজমা অবস্থায়। তাই সূর্যকে জ্বলন্ত গ্যাসের পিন্ড না বলে উচিত হবে জ্বলন্ত প্লাজমার পিন্ড বলা।

কেন্দ্র অঞ্চলের উপরেই থাকে 'রেডিয়েটিভ জোন' (**Radiative Zone**) বা 'তেজস্ক্রিয় মণ্ডল'। কেন্দ্রে উদ্ভুত শক্তি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরবর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ পরিচলন অঞ্চলে (কনভেকশন জোন বা কনভেকটিভ জোন) এসে পৌঁছোয়। এর ব্যাপ্তি প্রায় দু-লক্ষ কিলোমিটারের মতো অর্থাৎ কোর-এর বাইরে কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ এলাকা জুড়ে। এই অঞ্চলে আয়নিত গ্যাসীয় বুদবুদ অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে হালকা হয়ে অজস্রধারায় সূর্যের পৃষ্ঠতলের দিকে চলে যায়। সেখানে অতিরিক্ত শক্তি ছেড়ে ঠান্ডা ও ভারী হয়ে তা আবার পরিচলন অঞ্চলের শেষপ্রান্তে ফিরে আসে। আয়নিত গ্যাসীয় বুদবুদের এই চক্রাকার গতির্ কারণেই সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি।

পরিচলন অঞ্চলের ঠিক উপরেই থাকে আলোকমণ্ডল। এর উপরেই আছে সূর্যের আবহমণ্ডল। এটি তিন ভাগে বিভক্ত– বিশোষকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল এবং করোনা বা সৌর কিরীট।

বিশোষকমণ্ডলের বিস্তার খুব বেশি নয়। মাত্র **1000** কিলোমিটারের মতো। এই মণ্ডলটি সূর্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায় অধিকাংশ পার্থিব মৌল গ্যাসীয় অবস্থায় এই অঞ্চলে থাকে।

বর্ণমণ্ডলকে অনেক সময় বিশ্লেষণমণ্ডলও বলা হয়ে থাকে। এই অঞ্চলটির বিস্তৃতি প্রায় **5000** কিলোমিটার মতো। আলোকমণ্ডলের কাছাকাছি বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় **4000°** সেলসিয়াসের মতো হয়ে থাকে। এখানকার ঘনত্ব সূর্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা কম থাকে। বর্ণমণ্ডলের উপরের দিকের যে অংশটি করোনার কাছাকাছি থাকে সেখানকার তাপমাত্রা থাকে **5,00,000°** সেলসিয়াসের মতো বা তারও বেশি। সূর্যের তীব্র আলোর জন্য বর্ণমণ্ডলের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে বোঝা যায় না।



একমাত্র পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় একে আমরা দেখতে পাই। সেসময় সূর্যের চারপাশে লালচে-কমলা রঙের যে নয়নাভিরাম আলোর ছটা দেখা যায় সেটাই হল বর্ণমণ্ডল। অতীব এই সুন্দর দৃশ্য এই একটি সময় ছাড়া আর কখনই দেখা যায় না। বর্ণমণ্ডলের লালচে-কমলা রঙ **H+** আয়নের আধিক্যের জন্য হয়ে থাকে।

বর্ণমণ্ডলের উপরে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর করোনা বা সৌর কিরিটি। তবে ফটোস্ফিয়ারের আলোর আধিক্যের জন্য বর্ণমণ্ডল এবং করোনা কোনোটাই আমরা দেখতে পাই না। বর্ণমণ্ডল থেকে গ্যাসের স্রোত ঘন্টায় প্রায় **30** লক্ষ কিলোমিটার বেগে নিক্ষিপ্ত হয়ে করোনাতে গিয়ে পড়ে। এই বিশাল আয়তনের গ্যাসের স্রোত বা চাদরকে বলা হয় 'প্রমিনেন্সেস্'

(**Prominences**)। এগুলি সূর্যের পৃষ্ঠতল থেকে সর্বোচ্চ **4,80,000** কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সৌরকলঙ্কের উপর অবস্থিত চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে এগুলি লুপ বা ফাঁসের আকারে আবার সূর্যের পৃষ্ঠতলে ফিরে আসে। তাই করোনার ব্যাপ্তি বহুদূর। সূর্যের ব্যাসের প্রায় **4** গুণ অব্দি। এই প্রসঙ্গে বলি, বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রার তুলনায় করোনার তাপমাত্রা অনেক গুণ বেশি। বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রা যেখানে **10K – 25000 K** সেখানে করোনা বা সৌর-কিরীট-এর তাপমাত্রা প্রায় **10,00,000K**। এখান থেকেই সূর্যের তাপ বিকিরিত হতে থাকে এবং সেই তাপ গ্রহগুলিতে এসে পৌঁছোয়। 'সৌর-ঝটিকা' নামে করোনা প্রবাহের গতিবেগ থাকে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে **400** কিলোমিটারের মতো। এই প্রবাহে থাকে অসংখ্য তড়িতাহিত কণিকা। বর্ণমণ্ডলের তুলনায় করোনা অঞ্চলের তাপমাত্রা(উষ্ণতা) এত বেশি কেন এই প্রশ্নের উত্তর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও খুঁজে পান নি। তবে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, বিকিরণ ক্ষেত্রের কোনো আলোড়নের কারণে তাপের এই হেরফের।

সৌর লক্ষণীয়তা (Solar Prominences)



সৌরঘটনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ঘটনা হল 'সৌর লক্ষণীয়তা'। পৃথিবীর আকাশে যেমন নানা বৈচিত্রের মেঘ দেখা যায় তেমন সূর্যের আকাশে দেখা যায় এই সৌর লক্ষণীয়তা। এগুলি উৎপন্ন হয় মূলত সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে। লক্ষণীয়তা দু'ধরনের হয়ে থাকে– (i) ক্ষণস্থায়ী(**Transient**) এবং (ii) দীর্ঘস্থায়ী (Quiescent)। প্রথমটির কারণ প্রবল উষ্ণতা। আর দ্বিতীয়টির কারণ উচ্চমানের চৌম্বকক্ষেত্র। এগুলির তাপমাত্রা বা উষ্ণতা **30,000 K** থেকে **1,00,000 K** পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরিত হয়। কোনো কোনো সৌর লক্ষণীয়তার উচ্চতা চার লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে থাকে।

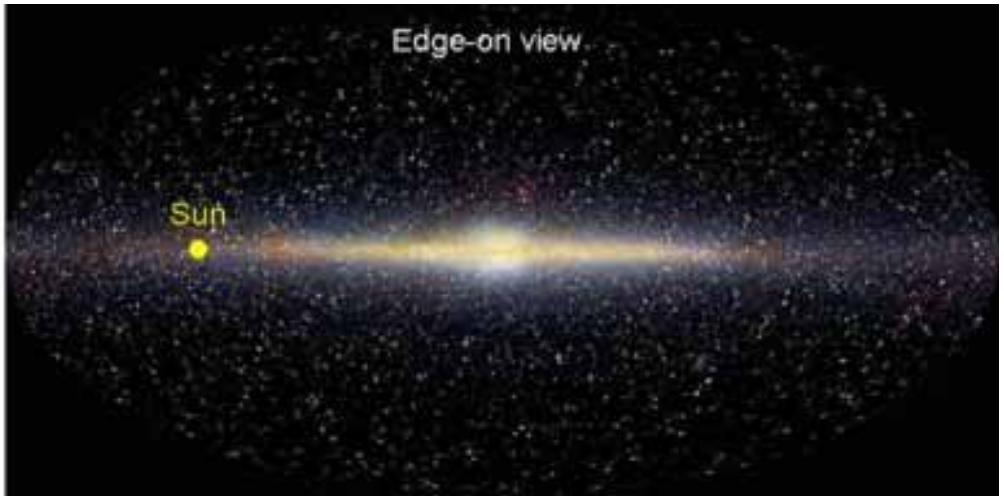
আর একটি অতীব সুন্দর সৌরঘটনা হল 'সৌরশিখা'(Solar Flares)। সৌরশিখার সৃষ্টি সৌরকলঙ্ক থেকে প্রচুর পরিমাণে চৌম্বক শক্তি নিঃসরণের কারণে। সৌরশিখা নানা আয়তনের হয়ে থাকে। কোনো কোনোটার দৈর্ঘ্য পাঁচ লক্ষ কিলোমিটারও ছাড়িয়ে যায়।

মহাকাশে সূর্য কোথায়ঃ

বিগব্যাং-এর পর তৈরি হল মহাবিশ্ব। মহাকাশে জন্ম হল অসংখ্য কোটি নক্ষত্রর। এরা নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধল। তৈরি হল 'গ্যালাক্সি' বা 'তারাজগত'। মহাকাশে কতগুলি তারাজগত আছে? এর সঠিক উত্তর বিজ্ঞানীদেরও জানা নেই। কারণ মহাবিশ্ব বা মহাকাশের খুব সামান্য অংশই আমরা দেখতে পাই। বেশিরভাগটাই চোখের আড়ালে। তাই বলতে হয় অসংখ্য কোটি তারাজগত মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রকমই একটি তারাজগতের নাম 'মিল্কিওয়ে' বা 'ছায়াপথ'। এই ছায়াপথের এক ধারে আছে অতি সাধারণ মানের একটি তারা। নাম সূর্য। এই তারাটিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে সৌরজগত। এখানকারই একটি গ্রহের নাম পৃথিবী। সেটাই আমাদের বাসভূমি।

সূর্য **G2V** শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্র। এর ভর সৌরমণ্ডলের সব গ্রহদের মোট ভরের **743** গুণ এবং পৃথিবীর ভরের **3,30,000** গুণ। সূর্যের শক্তি বিকিরণের হারকে বলা হয় 'সৌর ধ্রুবক' (**Solar Constant**)। এর মান হল **137** আর্গ/বর্গ মিটার/সেকেন্ড(**ergs/m²/sec**)। তবে প্রতি **11** বছর অন্তর যখন সৌরকলঙ্ক দেখা যায় তখন এই বিকিরণের হার অনেকটাই বেড়ে যায়। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের চাপের পরিমাণ হল **3,500** কিলোবার(**Kilobars**)। সূর্যের কেন্দ্রে তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় (**Thermonuclear Reaction**) বা কেন্দ্রকীয় সংযোজন (**Nuclear Fusion**) প্রক্রিয়ায় চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হচ্ছে। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর হল **4x1.0078=4.0312** তড়িৎ-চুম্বকীয় একক। আর একটা হিলিয়াম পরমাণুর ভর হল **4.0026** একক। দুই ভরের পার্থক্য হল **0.0286 (4.0312-4.0026)** একক। আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র মেনে এর থেকেই সূর্যের কেন্দ্রে বিপুল শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। সূর্যের কেন্দ্রে বর্তমানে যে হারে





শক্তি উৎপাদন হচ্ছে তা যদি চালু থাকে তাহলে সূর্যের আয়ু **1000** কোটি বছরের মতো। তার মধ্যে **500** কোটি বছর অতিক্রান্ত। অতএব সূর্য ক্রিয়াশীল থাকবে এখনও আরও **500** কোটি বছর। তাই বলা যায় সূর্যের এখন ভরা যৌবন। এরপর সে ধীরে ধীরে এগোতে থাকবে বৃদ্ধকালের দিকে। তারপর একদিন কেন্দ্রে সঞ্চিত সবটুকু হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাবে। তখন সূর্য 'লাল দানব'-এ পরিণত হবে। এইসময় এর আয়তন বাড়তে বাড়তে পৃথিবী পর্যন্ত তো আসবেই, এমনকী মঙ্গল গ্রহকেও সে গ্রাস করতে পারে। এরপর এর পরিণতি হবে 'সাদা বামন' (**White Dwarf**) নক্ষত্রে। ভয় নেই। এখনও **500** কোটি বছর নিশ্চিন্ত। অবশ্য ততদিনে জীবজগতে অনেক পরিবর্তন আসবে। আর সেই পরিবর্তনের ধাক্কায় পৃথিবীর বুকে মানবজাতি টিকে থাকবে কিনা জানা নেই।

এক নজরে সূর্য

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্বঃ **(i) 1.496x.10^8** কিলোমিটার বা **(ii) 8** মিনিট **19** সেকেন্ড আলোর গতিতে।

ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্যের গড় দূরত্বঃ **(i) 2.7x10^{17}** কিলোমিটার বা **(ii) 27200** আলোক-বর্ষ

সূর্যের বিষুব ব্যাসার্ধঃ **(i) 696342±65** কিলোমিটার বা **(ii) 109x**পৃথিবীর বিষুব ব্যাসার্ধ।

সূর্যের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলঃ **(i) 6.09x 10^{12}** বর্গ কিলোমিটার বা **(ii) 12000x**পৃথিবীর পৃষ্ঠতল।

সূর্যের আয়তনঃ **(i) 1.41x10^{18}** ঘন কিলোমিটার বা **(ii) 13,06,000x**পৃথিবীর আয়তন।

সূর্যের ভরঃ **(i)(1.98855±0.00025)x10^{30}** কিলোগ্রাম বা **(ii)333000x**পৃথিবীর ভর।

সূর্যের গড় ঘনত্বঃ (i) প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে **1.408** গ্রাম বা (ii) **0.255x**পৃথিবীর ঘনত্ব।

সূর্যের মুক্ত বেগ(Escape velocity): **(i) 617.7** কিমি/সে **(ii) 55x**পৃথিবীর মুক্ত বেগ।

সূর্যের করোনার তাপমাত্রা(উষ্ণতা): **10^6 K**(প্রায়)

সূর্যের ঔজ্জ্বল্যঃ **(i) 3.846x10^{26}** W **(ii) 3.75x10^{28}** lm

সূর্যের বিষুব অঞ্চলে ঘূর্ণন বেগঃ **7.189x10^3** কিমি/ঘন্টা

সূর্যের নিজ অক্ষের উপর আবর্তনকালঃ **25** দিন **3** ঘন্টা **21** মিনিট **36** সেকেন্ড।



আবিষ্কারের কাহিনি

রাজীবকুমার সাহা

পর্ব ২

এই নীলগ্রহের জন্মলগ্ন থেকেই ঘটে চলেছে কতই না আজব কাণ্ডকীর্তি। বিশেষত মানুষ বা তার পূর্ব প্রজাতির সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন আবিষ্কার। আদিযুগ থেকে বিভিন্ন খোঁজ আর আবিষ্কারের যথাসম্ভব তথ্য ক্রমানুসারে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই বিভাগে।

বড়শি (Fish Hook) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫,০০০)

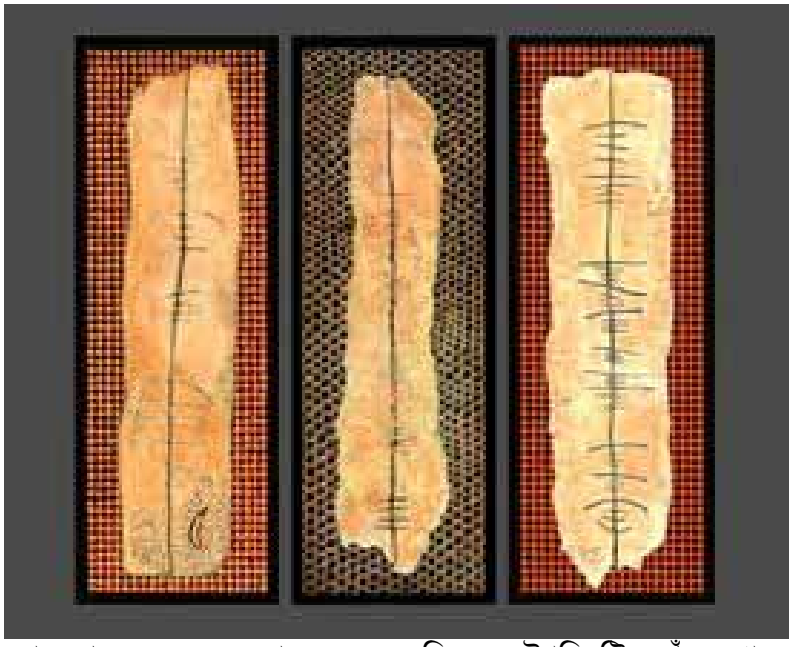


আদিম জাতি যে অচিরেই মাছ শিকার করতে শিখে ফেলেছিল তার বড়সড় প্রমাণ মেলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যখন প্রায় ৩৫,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের বড়শি খোঁজে পান। এগুলো মূলত জীবজন্তুর হাড়, শক্ত ঝিনুক, পশুর শিং আর গাছের শক্ত ডালপালা দিয়েই তৈরি করা হত। প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্য শুধুমাত্র গাছের ডালপালা দিয়েই বড়শি বানিয়ে মাছ ধরতে শিখেছিল আদি মানব। মাছ শিকারের ক্ষেত্রে হয়তো ডালপালার বড়শিই বেশি সুবিধেজনক ছিল। কেননা, সত্তরের দশকেও কাঠনির্মিত বড়শি ব্যবহৃত হত জলজ প্রাণী শিকারের কাজে। ধীরে ধীরে সাধারণ বড়শিকে কাঁটাযুক্ত বড়শিতে পরিণত করে খাবার তালিকায় নিয়মিত মাছের পদ নিশ্চিত করে ফেলে তারা। ক্যানবেরাস্থিত অস্ট্রেলীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ সুসান ও'কনর ও তাঁর দলবল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পূর্ব টিমরে চুনাপাথরে তৈরি জেরিমালাই নামক এক গুহায় এই ধরনের বড়শিসহ বিশালাকৃতির টুনা জাতীয় মাছের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান। প্রথমে ঝিনুকের শক্ত খোলের

তৈরি দুটো ভাঙা বড়শি নজরে এলেও পরে এই গুহা থেকে ৩৮০০০-এরও বেশি মাছের কাঁটা আবিষ্কৃত হয় এবং পরীক্ষাগারে কাঁটাগুলোর বয়স প্রায় ৪২০০০ বছর বলে নির্ণীত হয়। এর ফলে প্রায় চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ হাজার বছর আগেও আদিম মানুষ বড়শি দিয়ে মাছ শিকারে পটু ছিল বলে অনুমিত হয়।

"Opportunities are… everywhere and so you must always let your hook be hanging." - Augustine 'Og' Mandino, writer.

হিসাবরক্ষক লাঠি (Tally Stick) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫,০০০)



১৯৬০ সালে বেলজিয়ান কঙ্গোতে একধরনের বেবুনের উরুর হাড় পাওয়া যায় যেটাতে লম্বভাবে তিনটি দাগের ওপর আড়াআড়িভাবে অসংখ্য দাগ কাটা ছিল। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও সোয়াজিল্যান্ডের মধ্যবর্তী লেবম্বো পর্বতমালায় ঠিক এই ধরনেরই বেবুনের উরুর হাড় আবিষ্কৃত হয় যাতে মোট ২৯টি স্পষ্ট খাঁজের হদিশ মেলে। লেবম্বো পর্বতমালার নামানুসারে এই হাড়ের নামকরণ করা হয় লেবম্বো হাড়। প্রায় দুই ডজন রেডিও কার্বন ডেটিং পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এগুলো প্রায় ৩৫,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কার। তবে হাড়খানার একপ্রান্ত ভাঙা থাকার কারণে ঠিক কতটা খাঁজ তাতে ছিল তা অনুমান করা যায়নি। ধারণা করা হয়, এই জাতীয় হাড় বা কাঠি দ্বারা আদি মানব চান্দ্রকলা বা দশা (লুনার ফেজ) পরিমাপ করত। তবে এর আগে ১৯৩৭ সালে চেকস্লাভাকিয়ায় খননকার্যের ফলে কার্ল অ্যাবসোলন নেকড়ের হাড় বলে অনুমিত যে ট্যালি স্টিক খুঁজে পান তা ৩০,০০০ বছরের পুরনো বলে দাবি করা হয়। এতে মোট ৫৫টা দাগ ছিল যা অনেকে ট্যালি মার্কস বলে মনে করেন।

"… with worn-out, worm-eaten rotten bits of wood… a savage mode of keeping accounts…" - Charles Dickens, novelist.

ছিদ্র (Pierce) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫,০০০)



মনে করা হয়, সুতীক্ষ্ণ বর্শা জাতীয় কোনও অস্ত্রদ্বারা মানুষ একসময় কাঠ, পশুর মোটা চামড়া ইত্যাদি ছিদ্র করতে শিখেছিল উপস্থিত প্রয়োজনে। অনেক পরে প্রাচীন মিশরীয় কাষ্ঠশিল্পীরা আস্তে আস্তে ধনুকের মতো বাঁকানো একধরনের দড়ি প্যাঁচানো যন্ত্রদ্বারা ছোটবড় নানাধরনের ছিদ্র করতে শিখেছিল। ৯,০০০ খ্রিষ্টপূর্বে দাঁত ছিদ্র করার কৌশল মানুষের অবগত ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কালে কালে রোমানরা ছিদ্রের কাজে আগর ব্যবহার করতে শুরু করে।

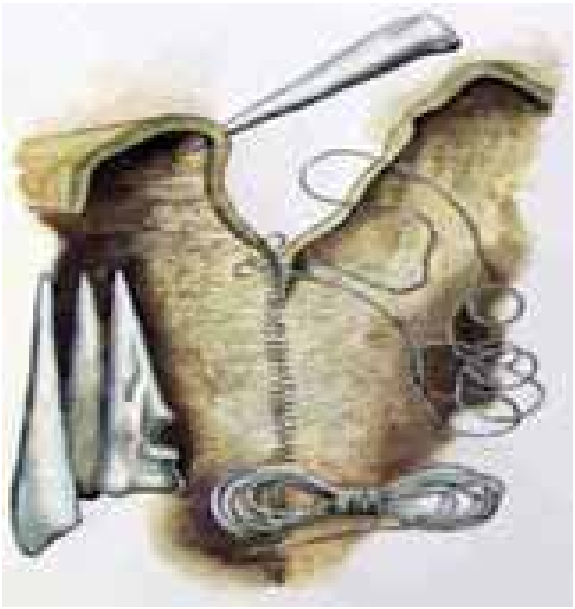
ধারালো পাথর ফলক (Sharp Stone Blade) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০,০০০)



আদিম মানব শিকার করতে শিখল। পাশাপাশি শিকারের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উৎকর্ষতা এবং অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণের দিকে সচেষ্ট হল। মানুষ উপলব্ধি করল, ভোঁতা পাথর বা সাধারণ লাঠিসোঁটার চেয়ে ধারালো বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রই শিকারের পক্ষে আদর্শ। শুরু হল সাধারণ কোনও কঠিন পাথরকে কোনও শক্ত কাঠের টুকরো বা হাড়গোড় বা অপর কোনও অপেক্ষাকৃত শক্ত পাথর দ্বারা আঘাত করে করে ধারালো এবং তীক্ষ্ণ করে তোলা। পাথর থেকে নির্গত প্রচুরসংখ্যক ছোটবড় পাথরকুচিগুলো দিয়ে আবার ছোটখাটো অস্ত্র যেমন, কাস্তে, ছুরি, তির বা বর্শার ফলক ইত্যাদি তৈরি করা হত। নিরীহ পাথরকে ধারালো করে তোলার এই কৌশলকে বর্তমানে ‘লিথিক রিডাকশন’ বলা হয়। যে ধরনের পাথর এ কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে চকমকি পাথর ছিল অন্যতম।

“Regardless of our ancestral heritage, we’re all descended from flintknappers.” - Bert Mathews, sharp stone maker.

সেলাই (Sewing) (খ্রিষ্টপূর্ব ২৫,০০০)



সূচ আর সুতো দিয়ে দুটো জিনিস একত্রে গেঁথে দেওয়া নতুন কোনও ব্যাপার নয়। তবে এই শিল্পটা যে এত প্রাচীন তা হয়তো আমাদের অনেকেই ধারণার বাইরে। আদি প্রস্তরযুগ তথা খ্রিষ্টপূর্ব ২৫,০০০-এর কাছাকাছি সময়ই মানুষ যে সুই-সুতোর সাহায্যে গাছের বড়ো বড়ো মজবুত পাতা, ছাল-বাকল আর পশুর চামড়া সেলাই করে নিজের পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করত তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স আর রাশিয়ার মস্কোর কাছাকাছি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা পশুপাখির হাড়গোড় দ্বারা নির্মিত সূচের সন্ধান পান। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডে বিভিন্ন সুদৃশ্য বীজ আর পশুপাখির দন্ত-খচিত আদিম মানবের কিছু পরিধেয় বস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। তাছাড়া সাধারণ সূচ হিসেবে আমেরিকার আদিবাসীরা গাছ-গাছড়ার কাঁটাযুক্ত পাতাও ব্যবহার করত।

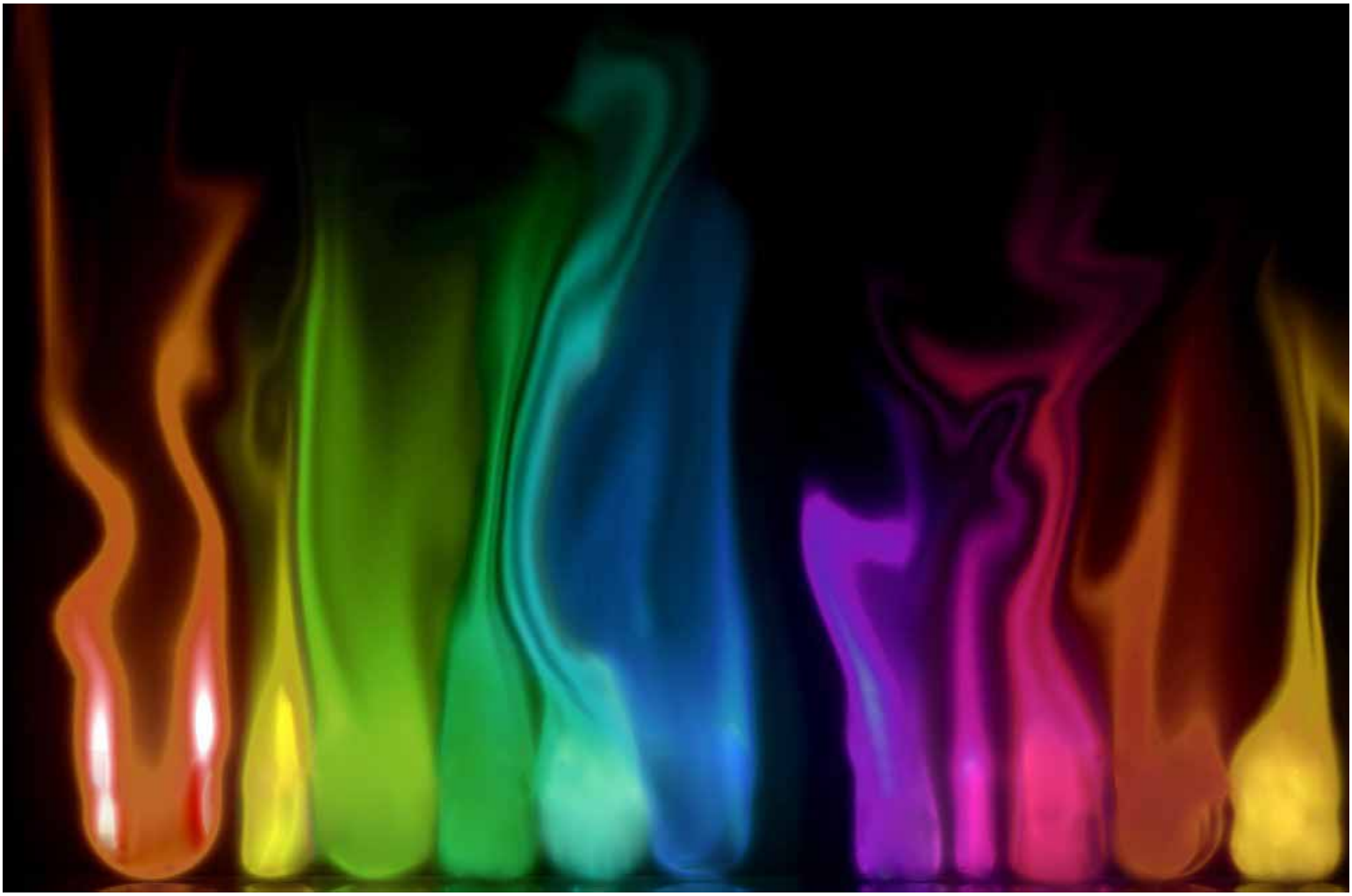
এর পর আগামী সংখ্যায়



রংবেরঙের অগ্নিশিখায় অপরূপ দীপাবলি

“ওস্তাদ, দেওয়ালির রাতে তারাবাতি, তুবড়ি, রংবেরঙের রকেট জ্বালিয়ে সবাই কত আনন্দ করে। আমরাও কিছু একটা করে দীপাবলি উৎসব করতে পারি না?”
“কী করবি? তারাবাতিটাতি জ্বালিয়ে নে, সঙ্গে কয়েকটা কালিপটকাও ফুটিয়ে দে।
“উঁহু। আপনি রংবেরঙের অগ্নিশিখা দিয়ে চতুর্দিক আলোয় আলোময় করে দিন।”
“বেশ।
নিয়ে আয় দেখি সব যন্ত্র
গেয়ে দেব ঘ্যাচাং ফু মন্ত্র
হয়ে যাবে দীপাবলিতন্ত্র”
শাগরেদ দুজন চটপট চারটে চায়ের প্লেট এনে টেবিলের ওপর রাখল। জাদুকর যথারীতি অংবং মন্ত্র পড়তে পড়তে কাচদণ্ডটা হাতে নিয়েটেবিলের ওপর-নীচ করতে করতে একসময় একটা প্লেটের গায়েসেটা ছুঁইয়ে দিতেই ওখানে পাতলা বেগুনি রঙের আগুন জ্বলতে শুরু করে দিল। হাত দিয়ে বাতাস উড়িয়ে যেই তিনি আগুনের শিখাকে অন্য প্লেটের দিকে উড়িয়ে দিলেন, ওমনি সেটা উজ্জ্বল লাল রঙের শিখা নিয়ে আগুন জ্বলে উঠল। একই প্রক্রিয়ায় তৃতীয় এবং চতুর্থ প্লেটেও আগুন ধরাবার পর দেখা গেল, বেগুনি, লাল, হলদে, সবুজ আগুন চারটে প্লেটে জ্বলে পুরো হলঘরটাকে আলোয় আলোময় করে দিয়েছে। শাগরেদরা আনন্দে ডগোমগো।

ঐ চার প্লেটে কী ছিল?



প্রথম আর চতুর্থ প্লেটে কী ছিল সেটা নিশ্চয় ধরতে পেরেছ। ঠিকই ধরেছ। প্রথম প্লেটে ছিল কার্বন ডাই সালফাইড আর চতুর্থ প্লেটে মিথাইল বোরেটের মিথানল দ্রবণ। দ্বিতীয় প্লেটে ৩০ মিলি মিথানল, অল্প স্ট্রনশিয়াম ক্লোরাইড আর কয়েক ফোঁটা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ৭ কি ৮ মিলি কার্বন ডাই সালফাইড। তৃতীয় প্লেটে ৩০ মিলি মিথানল, অল্প সোডিয়াম ক্লোরাইড, কয়েক ফোঁটা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর ৭ কি ৮ মিলি কার্বন ডাই সালফাইড। স্ট্রনসিয়াম সিঁদুরে লাল আর সোডিয়াম সোনারঙের উজ্জ্বল হলুদ শিখা তৈরি করে।

সাবধানতা

জাদু ঘরে না দেখিয়ে বাইরে খোলা জায়গায় দেখানো ভালো।

প্রতিবেশী গাছ



তু ল সী

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

আমাদের গ্রামের বাড়িতে গৃহদেবতা রঘুনাথ রয়েছেন। তাঁর নিত্যপূজা হয়। তুলসীপাতা ছাড়া নারায়ণের পূজা হয় না। গ্রামের বাড়ি গেলে ঠাকুর পুজোর চরণামৃতর সঙ্গে তুলসী পাতাটি আমার জন্য বরাদ্দ থাকে।

সাম্প্রতিক কালের একটি গবেষণাপত্রে দেখেছিলাম তুলসী পাতা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। আমাদের দেশে শত শত বছর ধরে এই তুলসী পাতার ব্যবহার চলে আসছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলসী পাতার ব্যবহারকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথা নত হয়ে আসে সেকালের অসাধারণ মেধাবী মুনি ঋষিদের জন্য যাঁরা সর্বজনহিতার্থে এই প্রথা চালু করেছিলেন।

মনে পড়ছে আর একটি ঘটনা। স্থান দেওঘর। রয়েছি রামকৃষ্ণ মিশন গেস্ট হাউসে। সকালে সুখেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। উনি একজনকে বললেন আমাকে চা দিতে। চা'য়ে অনীহা রয়েছে আমার। বললেন, 'চা খান, কোন অসুবিধা হবে না।' চা পান করতে করতে মনে হল, এই চায়ের স্বাদ এবং গন্ধ আলাদা। আর চা পান করে পরে কোন অসুবিধা বোধ করিনি আমি। তাই একটু অবাকই হয়েছিলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম, এটি তুলসী পাতার চা। এর সুগন্ধটি আজও ভুলতে পারিনি।

তুলসী একটি ঔষধী গাছ। এটি একটি ঘন শাখা বিশিষ্ট ২-৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চিরহরিৎ গুল্ম। এর কাণ্ডটি কাষ্ঠল, শক্ত এবং চতুষ্কোণাকার। কাণ্ড থেকে শাখা বের হয়। শাখাগুলি পত্র বিশিষ্ট। পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা খাঁজকাটা। পত্র রোঁয়া বিশিষ্ট। শাখা প্রশাখার অগ্রভাগহতে পুষ্পদণ্ড বের হয়। পুষ্পদণ্ডের চারদিক (আবর্ত আকারে) থেকে ফুলগুলি বের হয় এবং বিভিন্ন স্তরে ফুলগুলি সজ্জিত থাকে। পাতা ও ফুলগুলি একটি বিশেষ গন্ধযুক্ত।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়। পূজা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তুলসী পাতা ব্যবহার হয়। সনাতন ধর্মালম্বীদের কাছে তুলসী নারায়ণের প্রতীক। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে তুলসীব্যবহার হয় বলে বাড়িতে, মন্দিরে এই গাছ লাগানো হয়। এদেশে কয়েক ধরণের তুলসী গাছ দেখা যায় যেমন, রাম তুলসী, বন তুলসী, কর্পূর তুলসী, বাবুই তুলসী, রক্ত তুলসী, ভূতুলসী,কৃষ্ণ তুলসী ইত্যাদি। এক গাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম Oci mumsanctum। সর্দি কাশির ঔষধ হিসাবে সর্বত্র এটির ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের আদা মধু এবং তুলসী পাতা বেটে খাওয়ানোর প্রচলন রয়েছে।

এই গাছের বহুল প্রচলন এবং ব্যবহার রয়েছে। সেগুলির কয়েকটি উল্লেখিত হল -

- জ্বরে - তুলসী পাতা গোল মরিচ এবং মিছরি জলে ফুটিয়ে খাওয়ানোর নিদান রয়েছে।
- পেট খারাপ - তুলসী পাতা এবং জিরা বেটে রসটি খাওয়ালে এই রোগ ভাল হয়।
- ঘা - তুলসী পাতা এবং ফটকিরি মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।
- পোড়াতে - তুলসী পাতার রস এবং নারিকেল তেলের মিশ্রণ পোড়া জায়গায় দিলে উপকার পাওয়া যায়।
- ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে - তুলসী পাতার রস উপকারী।
- বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধিতে - ৫-৭টি তুলসী পাতা প্রতিদিন খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- ক্যান্সার প্রতিরোধে - তুলসী পাতা এবং পুদিনা পাতা ক্যান্সার প্রতিরোধী।
- এই গাছ ক্রিমিনাশক, বায়ুনাশক, হজমকারক এবং রুচিবর্ধক।

- চর্ম রোগে - তুলসী পাতা এবং দূর্বা ঘাসের ডগা একসঙ্গে বেঁটে লাগালে চর্ম রোগ ভালো হয়। তিলের তেলের মধ্যে তুলসী পাতা ফেলে হাল্কা গরম করে সেই তেল ত্বকে লাগালে ত্বকের যে কোন সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়।
- তুলসী পাতায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে।
- নার্ভ টনিক - তুলসী পাতার রস মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
- তুলসী পাতার চা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত।



লক্ষ করি পক্ষিকে

হাঁড়িচাঁচার হাঁড়িমুখ

মনস্বিনী ঘোষাল

সুকুমার রায়ের ‘সঙ্গীহারা’ কবিতাটির দৌলতে, এই পাখিটির নাম বোধহয় আমরা সকলেই শুনেছি। তবে মুখখানা হাঁড়ির মত হলেই বা কী? এদের দেখতে কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর।



কাকের গোষ্ঠিভুক্ত এই পাখিদের গায়ে বাদামী। ইংরিজিতে এদের Ruf Treepie বলে। আকারে মোটামুটি শালিকে মত হলেও এদের লেজটি বেশ বড়ো। কালে লেজের তলার দিকে সাদা বলয় আছে। এরা কাকের মতই সর্বভুক।

লক্ষ্য করে দেখেছি এরা একেক সময় একেক রকম ভাবে ডাকে। সকালের দিকে যখন দল বেঁধে খাবার খোঁজে, তখন আমাদের বারান্দার সামনের বটগাছটায় “ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা” করে রেগেমেগে ঝগড়া করে। আবার শান্ত দুপু নারকেলগাছের পাতার আড়ালে আরাম করে লুকিয়ে বলে - “টুক্‌লি-টুক্‌লি”।

কলকাতার গাছ-বহুল এলাকায় সহজেই এদের হাঁড়িমুখের দেখা মেলে।

প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা ও ডঃ বীরবল সাহনী

সংহিতা



পৃথিবী বহু পরিবর্তনের পর আজকের অবস্থায় এসেছে। সেইসব পরিবর্তনের কথা জানা যায় পৃথিবীর মাটিতে আর তার নিচে থাকা পাথরগুলো থেকে। এই পাথরগুলোর মধ্যে যেগুলো পলি থেকে তৈরি, কিংবা যেগুলো আকরিক কয়লা, সেগুলোতে ছাপ রয়ে গেছে সুপ্রাচীন জীবজগতের। সেইসব ছাপ থেকে জানা যায় পৃথিবীর কোন ভূভাগ কোন ভূভাগের সাথে ছিল। পাথরে, বালিতে, পলিতে এবং জলে থাকা প্রাচীন জীবজগৎ নিয়ে পঠনপাঠনের বিষয়কে বলা হয় প্যালিঅনটোলজি (Paleontology) বা জীবাশ্মবিজ্ঞান। এই বিষয়ের যে শাখায় গাছ এবং গাছের নানান অঙ্গের এবং অংশের বিষয়ে পঠনপাঠন করা হয়, তাকে বলা হয় প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা বা প্যালিওবটানি (Paleobotany)।

ভারতবর্ষে প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা চর্চার পথিকৃত ছিলেন ডঃ বীরবল সাহনী। ডঃ সাহনী কিন্তু শুরুতে উদ্ভিদবিদ্যাই পড়েছিলেন। পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সময়ে তিনি গন্ডোয়ানার উদ্ভিদ নিয়ে চর্চা শুরু করেন। গন্ডোয়ানা নামে পরিচিত ভূখন্ডটি পঞ্চান্ন কোটি থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছিল। নানান ভঙ্গিল পর্বত তৈরি হওয়ার পদ্ধতিতে, নানান ভূভাগ জুড়ে আর তাদের মধ্যেকার জলভাগ সংক্ষিপ্তাকার ধারণ করে এক বিশাল মহাদেশ হয়ে জেগে উঠেছিল। আবার সাড়েও আঠার কোটি বছর আগে থেকে প্রবল লাভা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায় নানান খন্ডে। ভাঙন চলে প্রায় তের কোটি বছর আগে পর্যন্ত। তার মানে চারশো কুড়ি কোটি বছর ধরে সেই মহাদেশে নদী নালা বয়েছে, গাছপালা, পশু থেকেছে। সে সবের চিহ্ন জমা হয়েছিল সে সময়ের তৈরি হওয়া পলিতে। যেগুলো কালক্রমে তৈরি হওয়া ভারতবর্ষের কয়লাখনিগুলোতে মাঝেমধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সেই সময়ের যেসব গাছপালা ভারতে পাওয়া যায় তাদের নিয়েই চর্চা করেছিলেন ডঃ সাহনী।

ডঃ সাহনী জন্মেছিলেন ১৮৯১ সালের ১৪ই নভেম্বর, তখনকার পশ্চিম পাঞ্জাবের সালপুর জেলার ভীরা গ্রামে। মায়ের নাম ঈশ্বর দেবী, আর বাবার নাম লালা রুচি রাম সাহনী। তিনি ইস্কুলের পাঠ পেরিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন লাহোরের সরকারী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে ১৯১১ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। যদিও তাঁর দাদামশায়ের প্রভাবে তিনি বিজ্ঞান পড়া শুরু করেন, তবে দাদামশায়ের চর্চার বিষয়

রসায়নকে মুখ্য পাঠের বিষয় না করে, তিনি পড়েছিলেন উদ্ভিদবিদ্যা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমানুয়েল কলেজ থেক তিনি স্নাতক হন ১৯১৪ সালে। অধ্যাপক এ সি সেওয়ার্ড-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পান ১৯১৯ সালে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই গবেষণার সময়েই তিনি ১৯১৭ সালে ভারতের গন্ডোয়ানা যুগের গাছেদের বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন।

ভারতে ফেরার পর তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। অধ্যাপণা করেছিলেন পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়েও। পরে তিনিই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন, ১৯২১ সালে। পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি গন্ডোয়ানা যুগের নানান গাছের বিবরণ দেন। বহু প্রজাতিকে তিনি সংজ্ঞাত করেন। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উইলিয়ামসোনিয়া সেওয়ারদি (*Williamsonia sewardi*)। এই গবেষণার গুরুত্বের কারণে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেয় ১৯২৯ সালে এবং ১৯৩২ সালে তাঁর লেখা বিবরণগুলি প্রকাশিত হয় প্যালিঅন্টোলজিকা ইন্ডিকা জার্নালে।

এরপরেও বহুকাল তিনি গন্ডোয়ানা যুগের উদ্ভিদদের বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান চালিয়ে যান। তাঁর পৌরহিত্যে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা চর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি ভারতের প্রথম প্যালিওবটানিক সোসাইটি স্থাপণ করেছিলেন যেটি পরে ১৯৪৬ সালে ইন্সটিটিউট অফ প্যালিওবটানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গন্ডোয়ানা যুগের গাছেদের সম্পর্কে ডঃ সাহনীর গবেষণা এতো সুদূরপ্রসারী ছিল যে তিনি দেশে বিদেশে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এমনকি তিনি ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৩৬ সালে। তাঁর গবেষণার সুত্র আজও উল্লেখিত হয় গন্ডোয়ানা যুগের উদ্ভিদদের বিষয়ে গবেষণার সময়ে।



কিশোর ঘোষাল

প্রথম পর্ব

আগুন, আগুন, দাউ দাউ আগুন জ্বলছে পাহাড়তলিতে। আগুনের হল্কা, ধোঁয়া, আর ছাই উড়ছে হাওয়ায়। গাছের মোটা মোটা ডাল আর গুঁড়ি ফাটছে ফট ফট শব্দে। বড়ো বড়ো গাছের ডাল দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়ছে মাটিতে, তীব্র আগুনের শিখা লক লক করে উঠছে থেকে থেকে। জঙ্গলের মধ্যে বাস করা পশুর দল দৌড়ে চলেছে দিগ্বিদিকে। এখন হিংস্র বাঘের পাশে পাশে দৌড়চ্ছে হরিণের পাল। বুনো শুয়োরের সঙ্গে দৌড়চ্ছে বুনো মহিষের দল। কেউ কেউ দিশাহারা হয়ে ঢুকে পড়ছে আগুনের মধ্যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলতে জ্বলতে পড়ে যাচ্ছে আগুনের মধ্যে আর উঠে দাঁড়াচ্ছে না।

গুহার মুখে বসে এক বৃদ্ধ মানুষ দেখছিলেন, দলের যুবক যুবতী, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠছিল বারবার, পাহাড়তলিতে ওই আগুনের দৃশ্য দেখে, তাদের চোখে, তাদের আচরণে প্রচণ্ড আতঙ্ক। এই গুহাতে থাকা কী উচিৎ হবে? ওই আগুন যদি উঠে আসে এই পাহাড়ের চূড়াতেও, যদি গ্রাস করে নেয় আদিম মানুষের এই নিশ্চিন্ত আবাসটুকু? দিনের বেলায় আগুনের প্রকোপটা খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই আগুনের তীব্র উজ্জ্বল রঙের প্রবাহে মুগ্ধ হয়ে গেল্ সেই মানুষগুলো। কী অপূর্ব সুন্দর রং, কি অপূর্ব তার আভা, আগুনের উজ্জ্বল গোলাপী আভায় উদ্ভাসিত হয়ে রইল সারা আকাশ। সেই ভয়ংকর অথচ সুন্দর অগ্নিকাণ্ডের দিকে নেশাগ্রস্তের মতো তাকিয়ে থেকে তারা সকলেই সারারাত কাটিয়ে দিল। ভোরের দিকে সে আগুন স্তিমিত হয়ে এল অনেকটাই, অজস্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে, ধোঁয়ার আবরণে আচ্ছন্ন জঙ্গল। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। বিনিদ্র দুই চোখ জ্বালা করছে ধোঁয়ার স্পর্শে।

এক প্রৌঢ়া মহিলা বৃদ্ধের পাশেই বসেছিলেন, বললেন, "বাবা, মনে হচ্ছে, আগুন নিভে গেছে।" অশক্ত জরাগ্রস্ত শরীরের ভারে দুই হাঁটুর উপর নত হয়ে আসা মাথা তুলে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, "ও ভাবে বোলো না, ও ভাবে বোলো না, বলো অগ্নিদেব। করজোড়ে, নতজানু হয়ে বলো, হে অগ্নিদেব, তুমি শান্ত হও। হে প্রভু, শান্ত করো তোমার রোষ। হে দেবতা, তোমার ক্রোধের প্রচণ্ড তেজ জগতে কেউই সহ্য করতে পারে না। তুমি নিরস্ত হও। প্রসন্ন হও, হে অগ্নিদেব, তুমি প্রশমিত হয়ে আমাদের কল্যাণ দাও।"

প্রৌঢ়া মহিলা নতজানু হয়ে, করজোড়ে কণ্ঠ মেলালো বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে। তাদের ওই মন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখে দলের অন্য সকলেও এসে বসল তাদের ঘিরে। গুহার সামনের চাতালে বসে তারা দেখল, গত পরশুও যে জঙ্গল থেকে তারা পশু শিকার করে আনত, সংগ্রহ করে আনত গাছের ফল, ক্ষত সারানোর ওষধি, সেই জঙ্গল আজ নিঃস্ব, পড়ে আছে শুধু ছাই আর জ্বলন্ত অঙ্গারের স্তূপ।

প্রৌঢ়া মহিলাই এই দলের নেত্রী। তার কাছাকাছি এসে বসেছিল তার থেকে একটু কমবয়সের আরো চারপাঁচজন মহিলা। তাদের একজন বললেন,

“গুহায় সঞ্চিত সব খাবার দাবার প্রায় শেষ, এতগুলো লোক এখন কী খাবে? গত পরশুদিন শিকার করে আনা পশুমাংসে কাল সারাটাদিন চলে গেছে। টেনেটুনে আজকের দিনটাও হয়তো চলে যাবে। কিন্তু আজ রাত্রে, কিংবা কাল সকাল থেকে কি খাবে এতগুলো মানুষ? এখনই শিকারে যাওয়া দরকার, তা না হলে এতগুলো লোকের অনাহার অনিবার্য।” সে কথা প্রৌঢ় মহিলার বুঝতে অসুবিধে হল না, বড়দের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু ১১২ জনের এই দলে আছে অন্ততঃ চোদ্দ জন বালক বালিকা, তাদের ক্ষুধা কিভাবে শান্ত হবে? অসহায় চোখে তিনি উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। বৃদ্ধ মানুষটির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আশার কথা যেন শুনতে চাইলেন প্রৌঢ়া মহিলা। বৃদ্ধ মানুষটি শ্লেষ্মা জড়িত ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন,

“দেবতার রোষ, এর থেকে মুক্তি দেখাতে পারেন একমাত্র দেবতাই। তাঁকে প্রসন্ন করো, তাঁকে সন্তুষ্ট করো। কিছু একটা উপায় তিনি ঠিক করে রেখেছেন। এতগুলো অসহায় মানুষকে তিনি অনাহারে মরতে দেবেন না নিশ্চয়ই।” বৃদ্ধ মানুষটির এই কথার থেকে, এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের কোন উপায় পাওয়া গেল না, সকলেই অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল ধোঁয়া ওঠা জঙ্গলের দিকে। অনেকক্ষণ পর একটি যুবক হঠাৎ কথা বলে উঠল,

“আজ খুব ভোরে আমি নিচেয় গিয়েছিলাম”, অজানা আশঙ্কায় সবাই শিউরে উঠল, সবাই ফিরে তাকাল সেই যুবকের দিকে। সকলের চোখেই একই জিজ্ঞাসা, কেন গিয়েছিলি? কি দেখলি সেখানে? সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল,

“দেখলাম, চারিদিকে ছাইয়ের স্তূপ, তারমধ্যে পড়ে আছে অনেক অনেক পশুর দগ্ধ দেহ। আশে পাশে জীবনের কোন অস্তিত্বই নেই আর। একটা পাখির ডাকও শুনতে পেলাম না। এমন নিঃশব্দ প্রাণহীন জায়গা আগে কোনদিন দেখিনি আমি। আমার খুব খিদে পেয়েছিল, গতকাল প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি আমার।” যুবক এই পর্যন্ত বলে একটু থামল। প্রৌঢ়া মহিলারা নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন, প্রায় সকলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এই যুবক প্রৌঢ়া নেত্রীর এক বোনের ছেলে। সবার থেকে আলাদা। একটু দুর্বল, অন্য ভাইয়েরা যেমন বলিষ্ঠ শক্তিমান, এ ততটা নয়, কেমন যেন ভাবুক ধরনের। অন্য সব যুবকেরা খাবার সময় যেমন হামলে পড়ে, ও তেমন নয়, ও অপেক্ষা করে। সকলে খাওয়ার ভাগ তুলে নেওয়ার পর, যেটুকু বাঁচে, তাতেই ও খুশি থাকে। তার মা সেটা লক্ষ্য করে, প্রয়োজনে নিজের ভাগের থেকে তুলে দেন ছেলেকে। কাল নিচের দাবানলের আতঙ্কে খেয়াল করেননি, তাই গতকাল যুবক ছেলেটি অভুক্ত থেকেছে! যুবক আবার বলতে শুরু করল,

“কিচ্ছু পেলাম না, না ফল, না মূল, না কন্দ। এক জায়গায় বেশ বড়োসড়ো কয়েকটা হরিণ মরে পড়ে আছে দেখলাম, চামড়াহীন অর্ধদগ্ধ, মাথার শিং ছাড়া তাদের চেনবার উপায় নেই। পাথরের ছুরি দিয়ে কেটে সামনের পা থেকে অনেকটা মাংস কেটে নিলাম। আধপোড়া মাংস এতই নরম কাটতে কোন অসুবিধে হল না, অসুবিধে হল না, দাঁতে ছিঁড়ে চিবোতে। একটু পোড়া পোড়া গন্ধ, কিন্তু কাঁচা রক্ত মাংসের গন্ধ নেই, আর কি নরম, তুলতুলে, চিবোতেই যেন মিলিয়ে যেতে লাগল মুখের ভিতর। অনেকটা মাংস খেয়ে ফেললাম। ফিরে এসে দেখি, দাদু অগ্নিদেবের মন্ত্র পড়ছেন।” প্রৌঢ়া মাসীমার দিকে তাকিয়ে যুবক বলল,

“মাসীমা, আমরা কয়েকজন মিলে যদি ওই আধপোড়া পশুদের ওপরে বয়ে আনতে পারি, আমাদের বেশ কয়েকদিনের খাবারের সমস্যা মিটে যাবে। আর তার মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই কোন বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে নিতে পারবো।” যুবকের কথা শেষ হবার আগেই, বৃদ্ধ শিউরে উঠলেন, ভীষণ উত্তেজিত হয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বললেন, “মূর্খ, উদ্ধত যুবক, তুই জানিস না কী ভয়ানক পাপ তুই করেছিস। ওই পশু প্রভু অগ্নিদেবের শিকার, তাঁর অগ্নিপ্রভায় ওইসকল পশু দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। অগ্নিদেবের খাবার তুই চুরি করেছিস, এর পরিণাম মোটেই ভালো

হবে না।" তারপর নিজের পুত্রকন্যাপৌত্রপৌত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাবধান হ, সাবধান হ। লোভের বশে এমন পাপ করিস না। ওই অজ্ঞান ছোকরার কথায় ভুলেও অগ্নিদেবের আহারে ভাগ বসাতে যাস না। মরবি, সকলে একসঙ্গে মরবি, দেবতার রোষে কেউ পরিত্রাণ পাবি না।" বৃদ্ধের কথা যুবকের মনঃপূত হল না, সে অধৈর্য হয়ে বলে উঠল,

"কিন্তু দাদু, অগ্নিদেব তাঁর একার আহারের জন্য এতগুলি পশুকে কেন পুড়িয়ে মেরে ফেললেন? তিনি কেমন দেবতা? আর মেরেই যখন ফেলেছেন, আমাদের আহারের জন্য, তার থেকে দশ-বিশ খানা যদি আমরা সরিয়েই আনি, তাতেই বা তিনি ক্রুদ্ধ হবেন কেন? তিনি না আমাদের দেবতা, আমরা যদি সুস্থ শরীরে বেঁচেই না থাকি - যদি অনাহারে মারাই যাই, তাঁকে দেবতা বলে কে মনে রাখবে?"

বৃদ্ধ প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন, তাঁর আর সেই শক্তি নেই, না হলে এক ঘুঁষিতে ভেঙে দিতে পারতেন এই উদ্ধত যুবকের নাক। তিনি নিজের মেয়েদের বললেন,

"তোদের আশ্কারা পেয়েই, ওর এই দশা। ওকে সংযত কর, নয়তো অগ্নিদেবের রোষে আমরা সবাই ধ্বংস হবো।"

প্রৌঢ়া নেত্রী গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন,"আপনি শান্ত হোন বাবা, আমি দেখছি কী করা যায়। আপনি বরং গুহার ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। কাল সারারাত আপনার এতটুকুও বিশ্রাম হয়নি।" ঈশারা পেয়ে দুই পুত্রের কাঁধে ভর দিয়ে, তিনি গুহার দিকে চলে গেলেন।

বৃদ্ধের গুহায় ঢোকা অবধি অপেক্ষা করে, যুবক বোনপোর দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়া নেত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই ওই পোড়া মাংস খেলি? তোর ভালো লাগল? কাঁচা টাটকা মাংস ছাড়া অন্য কোন মাংস খাবার কথা আমি তো ভাবতেই পারি না।"

প্রৌঢ়া নেত্রীর কথা প্রায় সবাই সমর্থন করল, অনেকে সেই যুবককে উপহাস করে বলল, "ছিঃ, পোড়া মাংস আবার কেউ খায় নাকি? থুঃ থুঃ। তোর কি কোন রুচি অরুচি নেই, রে? কোন পশুকেও কোনদিন পোড়া মাংস খেতে দেখিনি। তুই তো পশুরও অধম।" প্রৌঢ়া নেত্রী হাত তুলে সবাইকে চুপ করার আদেশ দিলেন, সবাই থামলে তিনি বললেন, "আমি অবশ্য অতটা বিরুদ্ধে যেতে চাইছি না। কারণ, আমরা এখন ভীষণ সংকটে, জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, জ্যান্ত পশুরা পালিয়ে গেছে দূরের অন্য কোন জঙ্গলে। নতুন জঙ্গল খুঁজে আমাদের সকলের বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট শিকার যোগাড় করতে বেশ কদিন সময় লাগবে। ততদিন, যদি একদম অখাদ্য না হয়, আমরা সবাই নিচেয় গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসতেই পারি।"

বৃদ্ধ বাবার এবং তাঁর অগ্নিদেবের রোষের কথা দু একজন বলল, কিন্তু প্রৌঢ়া নেত্রী সে কথায় কান দিলেন না। তিনি জানেন এই পরিস্থিতিতে এত বড়ো দলটাকে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়ে রাখাটা অনেক বেশি জরুরি, অনাহারে যদি সবাই মারাই যায়, তখন প্রভু অগ্নিদেবের রোষে কী আর এমন এসে যাবে? যুবক বোনপোর কথাগুলো পুরোটা মেনে নিতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়ার জোরও পাচ্ছেন না। শিশু আর দু একজন অসুস্থদের দেখা শোনার জন্যে কয়েকজন মহিলা থেকে গেল, দলের বাকিরা চলল পাহাড়তলির দিকে, সকলের সামনে সেই যুবক আর নেত্রী মহিলা। তাদের সকলের হাতে পাথরের তৈরি নানান আকারের ফলা।

ফেলে যাওয়া সেই হরিণের পা থেকে পাথরের ফলা দিয়ে কেটে কেটে বেশ কয়েকটা টুকরো মাংস কেটে তুলল সেই যুবক, বাড়িয়ে দিল প্রৌঢ়া নেত্রী, তার মা ও অন্যান্য মাসীদের দিকে। অধীর আগ্রহে অন্য সকলে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। সকলেই জিভে ঠেকিয়ে স্বাদ নিলেন, গন্ধ নিলেন, তারপর দাঁতে কেটে চিবোতে লাগলেন মাংসের টুকরো। একদম অন্য রকম স্বাদ। একটু পোড়া পোড়া গন্ধ, কিন্তু তাতে পশুর নিজস্ব গন্ধ নেই বললেই চলে। অনেক সময় কিছু কিছু পশুর গায়ে খুব উৎকট গন্ধ হয়, সে গন্ধ অনেকটাই কম লাগছে। আর সব থেকে আশ্চর্য এত নরম মাংস, পূর্ণবয়স্ক হরিণের মাংস বলে মনেই হচ্ছে না, মনে হচ্ছে খুব বাচ্চা কোন হরিণের। তাঁদের আচরণে দলের অন্য সকলেই কিছুটা ভরসা পেল, তারাও সবাই নিজেদের পাথরের ফলা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাংস কেটে কেটে তুলতে।

পোড়া মাংসের অভিনব স্বাদ নিতে নিতে প্রৌঢ়া নেত্রী এবং তাঁর বোনেরা, দলের অন্য সকলের দিকেই লক্ষ রাখছিলেন। তাঁরা দেখলেন, শিকার করে আনা বড়ো একটা হরিণকে শেষ করতে যে সময় লাগে, তার অর্ধেক

সময়েই দু দুটো প্রমাণ সাইজের আধপোড়া হরিণ শেষ করে দিয়েছে তাঁর দলটা। তার মানে ঝলসে যাওয়া এই পশুর মাংস ছাড়িয়ে খেতে অনেক কম সময় লাগছে। এই মাংস শিশু এবং নড়বড়ে দাঁত বৃদ্ধদের পক্ষেও অসুবিধের হবে না।

প্রৌঢ়া নেত্রী সবাইকে নির্দেশ দিলেন, যতগুলো সম্ভব এমন ঝলসানো পশু নিয়ে উপরে গুহার মধ্যে সংগ্রহ করতে, তারপর যুবক বোনপোর কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন, "তোর থেকে আমরা এক নতুন বিষয় শিখলাম। আগুনে ঝলসানো পশু খাবার পক্ষে খুব সুবিধের। বাবা বলেছিলেন, এ অগ্নিদেবের রোষ, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ তাঁর আশীর্বাদ। কিন্তু এমন তো রোজ রোজ হতে পারে না! জঙ্গলে তো আর নিয়মিত আগুন লাগবে না, আর একবার আগুন লাগলে জঙ্গলই তো সাফ হয়ে যাবে! কাজেই এমন সুবিধে রোজ রোজ আমাদের ভাগ্যে জোটার কোন আশা নেই।"

"কিন্তু, আম্মা, আগুন যদি জ্বালানো যেত, আমরা তো শিকার করে এনে, ঝলসে নিতে পারতাম, আমাদের দরকার মতো!" যুবকের এই কথায় প্রৌঢ়া নেত্রী খুব বিরক্ত হলেন, রূঢ়ভাবে বললেন,

"মূর্খ বাচালের মতো কথা বলিস না। প্রকৃতিতে ঝড়, বৃষ্টি, সূর্য, চন্দ্রের মতো, আগুনও দেবতার দান। এই আগুন নিজেই অগ্নিদেবতা। সেই আগুন তুই দরকার মতো জ্বালাবি, নেভাবি? তোর স্পর্ধার তো সীমা নেই, দেখছি। আমরা সবাই দেবতার অধীন, সেই দেবতাকে তুই বশে আনতে চাস? বাবা, ঠিকই বলেছেন, আমরাই আদর দিয়ে দিয়ে তোকে মাথায় তুলে দিয়েছি। এমন কথা আর কক্ষণো যেন না শুনি, এমন অমঙ্গলের কথা চিন্তা করলে, এই দলে আর তোর জায়গা হবে না, বলে দিলাম।"

যুবক মাথা নিচু করে রইল, আর কিছু বলল না, তবে তার মাথার মধ্যে চিন্তাটা ঘুরতেই লাগল। তার মনে হল অগ্নিদেবতার কী এমন গরজ পড়ল, যে তিনি আমাদের জন্য অজস্র পশু ঝলসে রেখে দিলেন? আর তার জন্যে তিনি, গোটা জঙ্গলটাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন! কাল কী খাব সেটা একবারও ভাবলেন না? এটা কি সত্যিই অগ্নিদেবতার আশীর্বাদ, নাকি নিছক একটা দুর্ঘটনা?

দ্বিতীয় পর্ব

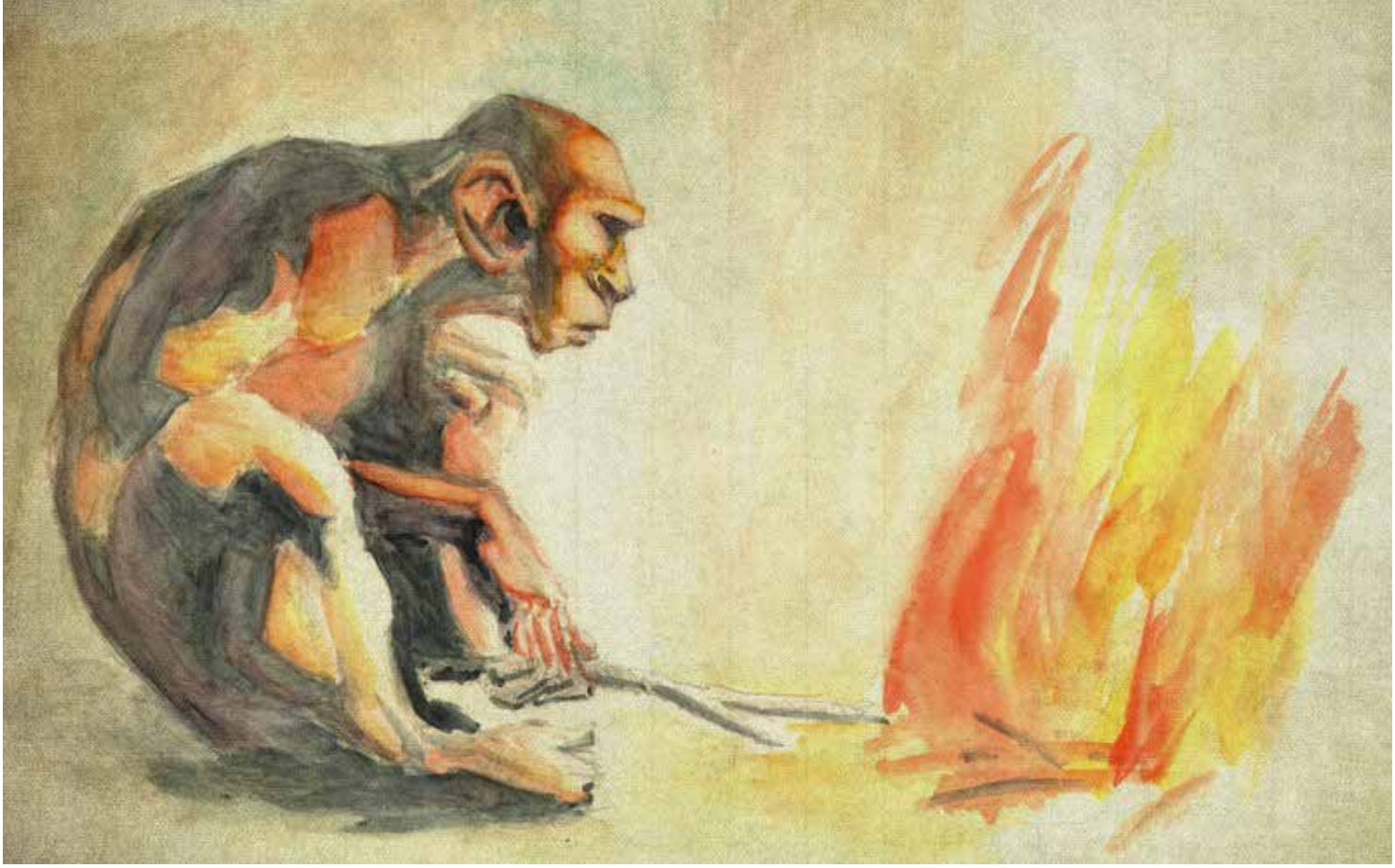
ঝলসানো পশু শুধু যে খাওয়ার সুবিধে তাই নয়, কাঁচা মাংসের থেকে অনেক বেশিদিন রাখাও যায়। অতএব গুহাবাসী এই দলটি বেশ কটাদিন সময় পেয়ে গেল, বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত জঙ্গলের সন্ধান করার এবং পেয়েও গেল মনোমত পশু এবং পর্যাপ্ত ফলমূল ভরা গভীর এক জঙ্গল। সেদিন ভোর ভোর তাদের একটা বড়দল পাথরের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, সেই জঙ্গলে শিকার করতে। জঙ্গলের সবই ভালো, কিন্তু খুব পাথুরে, যেখানে সেখানে গভীর গাছপালার ভিতরে হাতির পিঠের মতো বড়ো বড়ো পাথর মাথা তুলে পড়ে আছে। এই পাথরের সুবিধে, অসুবিধে দুইই আছে। শিকারীর সুবিধে লুকিয়ে থাকতে, অসুবিধে শিকার খুঁজতে, কারণ পাথরের আড়ালে পশুরা লুকিয়ে থাকলে, চট করে দেখতে পাওয়া যায় না। এমনই এক বড়ো পাথরের আড়ালে শুকনো ঘাসপাতা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল দলছুট একটা বয়স্ক বুনো শুয়োর লুকিয়ে আছে। দলের লোক এবং মহিলারা অর্ধচন্দ্রের মতো গোল হয়ে, অস্ত্র বাগিয়ে নিচু হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল ঘন ঘাসের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে। তাকে ঘিরে শিকারী মানুষগুলোর অস্তিত্ব পশুটা বুঝে ফেলেছে, সে এখন সতর্ক, তার শরীর টানটান উত্তেজনায়, স্থির চোখে সে লক্ষ্য রাখছে, মানুষগুলোর গতিবিধি। শিকারী মানুষগুলোর বৃত্তটা যতো ছোট হয়ে আসতে লাগল, দুপক্ষের উত্তেজনার পারদ ততই চড়ছে। হঠাৎ শিকারীদের সঙ্গে শিকারের চোখাচোখি হতেই, মূহুর্তের জন্য সমস্ত কিছু থেমে গেল। মানুষগুলো একসঙ্গে বিকট চিৎকার করে, একইসঙ্গে ছুঁড়ে দিল পাথরের তীক্ষ্ণ ফলকগুলি। পশুটা আহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গুরুতর নয়, বরং তীব্র গতি ও শক্তিতে একজন মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতে চিরে দিল পেট, তারপর দৌড়ে পালাতে লাগল, বনের অন্য দিকে। পশুটার সারা গায়ে তো বটেই, নাকে আর চোখেও পাথরের ফলায় গভীর ক্ষত, তীব্র রক্তপাত হচ্ছে। আহত এই শিকার কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কমে আসবে তার পালাবার গতি, লড়াইয়ের শক্তি। শিকারী মানুষগুলো পেয়ে গেছে

সাফল্যের স্বাদ, এত বড়ো শূকরের মাংস, তাদের গোটা দলের পক্ষে যথেষ্ট। তারা পিছনের দিকে তাকাল না, আহত সঙ্গীকে ফেলে রেখেই দৌড়ে গেল আহত শিকারের দিকে।

না সকলে গেল না, রয়ে গেল সেই যুবক, সে অতি দ্রুত সেই সঙ্গীকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে, জোগাড় করে আনল নানান গাছের পাতা, শেকড়। পাথরে ঘষে সবুজ পাতার রস আর প্রলেপ করে দিল সঙ্গীর ক্ষতে। সঙ্গী এখন অনেকটাই শান্ত, সুস্থ; তার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। যুবক সেই সঙ্গীর পাশে এসে বসল। এতক্ষণের ব্যস্ততায় সে খেয়াল করেনি, হঠাৎ তার নাকে এল গাছের শুকনো পাতা ডালাপালা পোড়ার গন্ধ। চমকে উঠল যুবক, আবার কী অরণ্যে আগুন ধরল? সর্বনাশ, তা যদি হয়, তাহলে তারা সকলেই তো পুড়ে মরবে এই জঙ্গলের মধ্যে। তার দলের অন্য লোকেরা কোথায়, অরণ্যের কত ভিতরে? চারপাশে তাকিয়ে দেখল, যে বড় পাথরটাকে পিছনে রেখে শূকরটা দাঁড়িয়েছিল, সেই পাথরের কোলে শুকনো পাতা, শুকনো ঝোপঝাড়ের ডালপালায় আগুন জ্বলছে, খুব বড়ো সড়ো নয়, ধিকি ধিকি। এই কী তবে অগ্নিদেবের অভিশাপ? সেদিন সে এবং তার দলের লোকেরা তাঁর মাংস চুরি করেছিল বলেই, দেবতা প্রতিশোধের আয়োজন করছেন। যুবক ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বড়ো পাথরটার দিকে। যে পাতাগুলো জ্বলছিল, যে ডালপালাগুলো জ্বলছিল, তার ওপর পাথর ছুড়তে লাগল, বেশ কিছুটা ভয়ে, অনেকটা আক্রোশে। এভাবে কোন দেবতাই পারেন না, মানুষের বেঁচে থাকার উপর খবরদারি করতে। কিছুক্ষণ পর পাথরে চাপা পড়ে নিভে গেল আগুন, সামান্য ধোঁয়া উঠতে লাগল পাথরের স্তূপের ভিতর থেকে। যুবক আশ্চর্য হল, তাহলে আগুনকে নিভিয়ে ফেলাও যায়? সেক্ষেত্রে আগুন জ্বালানো যাবে না কেন?

আগুন নিভে যাবার পর, সেই যুবক বড়ো পাথরের খুব কাছে গিয়ে দেখল তাদের ছোঁড়া পাঁচ ছটা পাথরের ফলক এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে একটা ফলক তার। এর অর্থ তার ছোঁড়া পাথরের ফলক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, এত কাছে থেকে এত বড়ো শিকারকে সে আহত করতে পারে নি বুঝে, যুবক লজ্জা পেল যেন। ওই বড়ো পাথরটাই যেন তার শিকার, হাতের শক্তি আর লক্ষ্যবেধের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে সে পাথরের টুকরো ছুড়তে লাগল বারবার। হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে পাথর ছুঁড়তেই লাগল, ছুঁড়তেই লাগল। কিছুক্ষণ পরে, হঠাৎ লক্ষ্য করল, তার ছোঁড়া পাথরের আঘাতে, বড়ো পাথরটার গায়ে বার বার আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে। সে আবার ভয় পেল, ওই পাথরের বুকে কী আগুন আছে? তার দাদু, মা, মাসীরা যে অগ্নি দেবতার কথা বলেন, ওই পাথরের মধ্যেই কী তাঁর নিবাস? নাকি ওই পাথর তাঁর আশীর্বাদে পবিত্র?

আর সে পাথর ছুঁড়ল না, ধীরে ধীরে বড়ো পাথরটার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে বসল। তার মনে হল, তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া পাথরের আঘাতে যে আগুনের ফুলকি তৈরি হয়েছিল, তার থেকেই শুকনো ঘাস পাতায় আগুন ধরে যায়নি তো? তারা তখন শূকর শিকারের উত্তেজনায় কেউ লক্ষ্যই করেনি। আগুন আশে পাশে ছড়িয়ে যাওয়ার পরই তার নাকে গন্ধ এসেছিল, সে লক্ষ্য করেছিল। সেই যুবক হাতে একটা ছোট্ট পাথর তুলে, বড়ো পাথরের গায়ে ঠুকল এবং প্রত্যেকবার ঠিকরে উঠতে লাগল ফুলকি । এবার সে নিশ্চিত হল, ওই বড় পাথরটা অন্য পাথরের থেকে আলাদা, ওই পাথরের বুকে আগুন আছে। এবার সে বড়ো সেই পাথরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে, এক জায়গায় একটা ফাটল দেখতে পেল। সেই ফাটলের মধ্যে পাথরের ফলক ঢুকিয়ে বেশ কয়েকবার ঠুকতেই ভেঙে বেরিয়ে এল মাঝারি সাইজের কয়েকটা পাথর। সেই আগুনে পাথরের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ঘষতেই বেরিয়ে এল



আগুনের ফুলকি। এবার সে শুকনো পাতা কাঠকুটো যোগাড় করে, একটা স্তূপ বানালো, তার খুব কাছে দুটো আগুনে পাথর ঘষে ঘষে বার কয়েক ফুলকি দিতেই দপ করে শুকনো পাতায় আগুন জ্বলে উঠল। একবার আগুন ধরে যেতেই তার ওপর কাঠকুটো ধরে বেশ ছোট্ট একটা আগুনের কুণ্ড বানিয়ে ফেলতেও অসুবিধে হল না। আনন্দে সেই যুবক অদ্ভূত চিৎকার করে উঠল, তার সঙ্গী ওষধির গুণে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যুবকের চিৎকারে সে ভয় পেয়ে গেল। আরো ভয় পেয়ে গেল যুবকের সামনে জ্বলতে থাকা আগুন দেখে। বন্যশূকরের দাঁতের আঘাতের যন্ত্রণায় সে যে চিৎকার করেছিল, তার থেকে অনেক বেশি চিৎকার করে উঠল আগুনের ভয়ে। যুবক প্রথমে তাকে শান্ত করল, তারপর পাথর দিয়ে চেপে চেপে নিভিয়ে ফেলল তার জ্বালিয়ে তোলা আগুনের কুণ্ড। আহত সঙ্গী আশ্বস্ত হল, যুবকের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হল অনেক বেশি।

সেই প্রকাণ্ড শূকর, তারসঙ্গে ছোট খাটো আরো কিছু পশু শিকার করে এবং আহত সঙ্গীকে মাচায় শুইয়ে নিয়ে, পুরো দলটি যখন তাদের গুহার আবাসে ফিরল, সূর্য ডুবতে তখন আর দেরি নেই। দলের অধিকাংশই তখন ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত। ঠিক হল, সঞ্চিত খাবার গুহায় যা আছে, আর ছোটখাটো পশুগুলো খেয়েই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক। কাল সকালে উঠে বুনো শুয়োরের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে যা ব্যবস্থা করার করা যাবে। সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনায় হাক্লান্ত সেই দলের মানুষগুলো, সন্ধে নামার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল গুহার ভিতর।

প্রৌঢ়া মহিলার ঘুম খুব পাতলা, তার ওপর তাঁর খুব ভোরে ওঠার অভ্যেস। পরদিন ভোরে উঠে, গুহার বাইরে এসে দেখলেন, তাঁর বোনপো, সেই যুবক, গুহার বাইরে শুকনো পাতার একটা বড়সড় স্তূপ বানিয়েছে, আর যোগাড় করেছে, এক বোঝা শুকনো গাছের ডালপালা। অবাক হয়ে তিনি কিছুক্ষণ তার ব্যস্ততা লক্ষ্য করলেন, কিছুই বুঝতে না পেরে তিনি জিগ্যেস করলেন, "কী ব্যাপার বলতো, এই কাক ভোরে উঠে কী করছিস কি, ডালপালা দিয়ে?"

"কালকে যে বুনো শুয়োরটা শিকার করে নিয়ে এসেছ, ওটাকে ঝলসাব।" সন্দিগ্ধ চোখে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে প্রৌঢ়া মহিলা বললেন,

"তার মানে? আগুন পাবি কোথায়?" যুবক দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলল, "আগুন পেয়েছি, দেখ না কী করি! তুমি শুধু ওদের কয়েকজনকে বলো না শুয়োরটাকে এখানে এনে, এই যে এইখানে ঝুলিয়ে দেবে।" হাত বাড়িয়ে শুকনো

পাতার স্তূপের দুপাশে খাড়া করা মোটা মোটা গাছের ডাল দুটো দেখিয়ে দিল যুবক। অবিশ্বাস আর বিরক্তিতে প্রৌঢ়া মহিলার ভুরু কুঁচকে উঠল। কিন্তু কিছু বললেন না, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন যুবকের চোখের দিকে। তাঁদের কথার আওয়াজে আরো কয়েকজন গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিল, প্রৌঢ়া তাদের বললেন, গত দিনের শিকার করা মরা শুয়োরটাকে যুবকের কথা মতো ঝুলিয়ে দিতে। আগুন নিয়ে এই ছেলে খেলা তাঁর পছন্দ না হলেও, তাঁর মনে একটা কৌতূহলও হচ্ছিল, কী করে দেখাই যাক না।

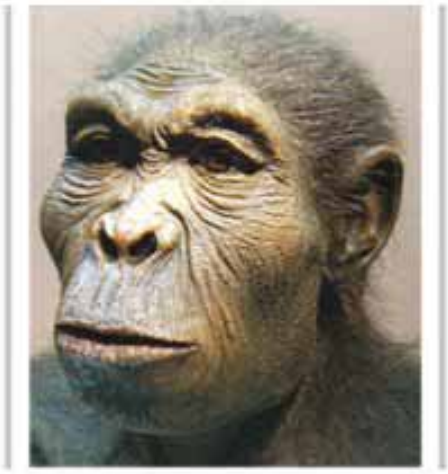
জনা ছয়েক সবল পুরুষ ধরাধরি করে পশুটাকে ঝুলিয়ে দিল, দু পাশের খাড়া করা মোটা মোটা দুই ডালের মাথায়। তারপর সেই যুবক উবু হয়ে বসে, গত কাল দূরের জঙ্গল থেকে যোগাড় করে আনা পাথরের টুকরোর গায়ে, তার পাথরের অস্ত্র-ফলক ঠুকতে শুরু করল। ঝিলিক দিয়ে উঠল স্ফুলিঙ্গ। যারা যুবকের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, তারা ভয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল অনেকটা দূরে। যুবক নিবিষ্ট মনে বার কয়েক পাথরে পাথর ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল শুকনো পাতার স্তূপ। জ্বলে উঠল আগুন। শুকনো পাতার মধ্যে কয়েকটা শুকনো গাছের ডাল গুঁজে দিতে, সেগুলোও ধরে উঠল, আগুনের শিখা বড়ো হয়ে, ছুঁয়ে ফেলল মরা পশুর শরীর, পুড়তে লাগল তার রোম, চামড়া।

পশুটার সামনের দুই পা আর পেছনের দুই পা বাঁধা অবস্থায়, গাছের একটা মোটা ডালে ঝুলছিল। তার ফলে, আগুনের শিখার স্পর্শে দগ্ধ হচ্ছিল তার পিঠ, কাঁধ। বেশ কিছুক্ষণ দগ্ধ হবার পর, সেই যুবক লম্বা পাথরের ফলা নিয়ে কেটে নিল কাঁধের কিছুটা অংশ। তারপর তপ্ত, নরম সেই মাংস গাছের বড়ো একটা পাতার ওপর নিয়ে, প্রৌঢ়া মহিলার কাছে নিয়ে গেল যুবক। বলল, "আম্মা, খেয়ে দেখ তো সেদ্ধ হল কিনা?"

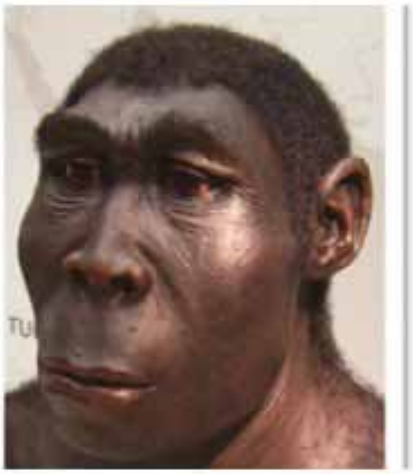
গরম গরম এবং নরম মাংসের স্বাদ ও গন্ধে নেত্রী আশ্চর্য হলেন, তিনি যুবকের দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে বললেন, "সত্যিই অপূর্ব, তুই অগ্নিদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিস।" সেদিন শিশু থেকে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, দলের সকলেই, সেই দগ্ধ মাংসের স্বাদ নিয়ে তৃপ্ত হল।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব যে মানব সভ্যতাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে, সে কথা সেদিনের সেই মানুষগুলির বোঝার সাধ্য ছিল না। কিন্তু এই ঘটনা যে মানব সভ্যতার আদিতে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল, আজ সে কথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই ।

তৃতীয় পর্ব



হোমো হ্যাবিলিস



হোমো ইরেক্টাস



হোমো স্যাপিয়েন্স।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর মতবিরোধ থাকলেও, সকলে একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে প্রায় ১,২৫,০০০ বছর আগে মানুষ আগুনের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ বলেন ৪,০০,০০০ বছর আগে। যাঁরা এই আগুনের ব্যবহার শুরু করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন আমাদের এই বর্তমান মানবশ্রেণীর পূর্বপুরুষ। আমাদের এই মানবশ্রেণীকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে হোমো-স্যাপিয়েন (Homo-Sapien), আর যাঁরা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন হোমো-ইরেক্টাস (Homo-erectus)। ইরেক্ট কথার মানে খাড়া বা ঋজু, মানবজাতির যে

গোষ্ঠী প্রথম দুইপায়ে সোজা দাঁড়িয়ে চলাফেরা থেকে শুরু করে সব কাজ করতে পারত তাদের হোমো ইরেক্টাস বলা হত। এই প্রজাতির মানবগোষ্ঠী বহু বছর আগেই এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জার্মানির ল্যান্ডিস মিউজিয়মের বিজ্ঞানীরা হোমো-ইরেক্টাসদের চেহারা কেমন হতে পারে, তার একটি ছবি বানিয়েছেন। নিচের ছবিতে দেখে নিতে পারো, আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের চেহারা।

আজ আমাদের রোজকার জীবনে আগুনের ব্যবহার এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, আগুন যে আমাদের কতো বড়ো বন্ধু, সে কথা আমরা ভাবিই না। আগুন থেকে কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা হলেই, আমরা যেন টের পাই তার ভয়ংকর ক্ষমতার কথা। এই আগুনের ব্যবহার কেন মানবসভ্যতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ, সেইকথাই এখন তোমাদের বলব।

বদলে দিল মানুষের স্বভাবঃ

দেড়-দু লাখ বছর আগে মানুষেরা বেঁচে থাকত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে কিন্তু প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ, ঝড়ঝঞ্ঝা, আলো-অন্ধকার, নানান কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে প্রবল বন্যপ্রাণীদের আক্রমণ সমস্ত দিক দিয়েই প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই চলত, সেই মানবজাতির জীবনযাত্রা। আগুন এনে দিল উত্তাপ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আলো। আগুন এবং তার ধোঁয়াকে অধিকাংশ প্রাণী এবং কীটপতঙ্গই ভয় করে, গুহার মুখে কিংবা চারদিকে আগুনের বলয় জ্বেলে রাখলে সারা রাত তাদের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্তে ঘুমোন যায়। প্রচণ্ড শীতের রাতে আগুনের উত্তাপ মানুষকে নিরাপদ স্বস্তি দিল। দিন-রাত এবং শীত-গ্রীষ্মের পরিবেশে, আবহাওয়ায় যে তাপের (Ambient temperature) তারতম্য ঘটে, তার সঙ্গে শরীরের উত্তাপের (Body temperature) সামঞ্জস্য রাখার জন্যেই স্তন্যপায়ী প্রাণিদের শরীরে লোমের বাহুল্য। আগুনের ব্যবহার মানুষের শরীরের সেই তাপমাত্রার ওঠাপড়া অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করল, তার ফলে মানুষের শরীরে লোমের পরিমাণও কমতে লাগল। কোন কোন বিজ্ঞানীরা বলেন, যে সব মানবগোষ্ঠী গোরিলা বা শিম্পাঞ্জীদের মতো গাছের ওপর বাস করত, আগুনের ব্যবহার শিখে তারা মাটিতে ডালপালা দিয়ে ঘর বানিয়ে থাকা শুরু করেছিল। এই সব পরিবর্তন দু এক বছরে হয়েছিল, তা নয়, কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে হোমো ইরেক্টাসরা আজকের হোমোস্যাপিয়েন হবার দিকে এগোতে লাগল।

বদলে দিল খাদ্যঃ

সেই যুগে মানুষের খাদ্য ছিল জঙ্গলের কাঁচা ফল, মূল, শিকড় আর শিকার করা পশুর কাঁচা মাংস। কয়েকটা মাত্র ফল ছাড়া কাঁচা শাকসব্জি মূল, কন্দের সেলুলোজ ও স্টার্চ আমাদের হজম হয় না। আগুনে সেদ্ধ হয়ে, সেই সব সব্জি খেতেও যেমন সুবিধে হল, হজম হয়ে শরীরে সহজ পুষ্টিও সরবরাহ করতে লাগল। আগে যে সব কন্দ, বা শস্য দানা খাওয়ার কথা মানুষ ভাবতেই পারত না, সেই রকম অজস্র খাদ্য ঢুকে পড়ল তার খাদ্য তালিকায়। তার মধ্যে রয়েছে চাল, গম, যব, ভুট্টা, নানান ডাল – যা আজও সারা বিশ্বের মানব জাতির প্রধান খাদ্য। শস্যের খাদ্য রহস্য বুঝে ফেলার পর মানুষ ধীরে ধীরে শিখে ফেলতে লাগল চাষবাস। রান্না করা শস্যদানা, সব্জি, মাংস সহজে হজম হওয়ার জন্য, অনেক কম পরিমাণ খাদ্য থেকেও শরীরে অনেক বেশি পুষ্টির যোগান হতে লাগল। বিজ্ঞানীরা বলেন, শুধুমাত্র কাঁচা শাকসব্জি খেয়ে, শরীরকে তাজা আর কর্মক্ষম রাখতে হলে, মানুষকে দিনে অন্ততঃ সাড়ে নঘন্টা খেতে হত। শীতকালে চিড়িয়াখানায় গেলে দেখবে, জলহস্তী, গণ্ডার, হাতি, জিরাফ এই সব প্রাণীরা সারাদিনই মুখ নাড়িয়ে খেয়ে চলেছে।

তীক্ষ্ণ হতে থাকল মগজাস্ত্রঃ

আগুনের ব্যবহার শিখে রান্না করা খাবার গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়ায় মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র অনেক হাল্কা হতে লাগল; সেদ্ধ খাবার চিবোনো অনেক সহজ হয়ে যাওয়ায়, চোয়ালের পেশী এবং দাঁতের গঠন বদলে গিয়ে, মানুষের মুখ ও মাথার গঠনও বদলাতে লাগল। খাবার সময় কমে গিয়ে এবং খাবারের বৈচিত্র্য বেড়ে যাওয়ার ফলে, শুধু খাওয়া, ঘুম আর বেঁচে থাকার চিন্তা ছাড়াও মানুষের হাতে অনেকটা সময় বেঁচে রইল। সেই সময়টা ব্যবহার হতে লাগল নানান চিন্তা ভাবনায়, অতএব বেড়ে গেল মস্তিষ্কের ব্যবহার। সেই চিন্তাভাবনা যত সুসংহত

হল, মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ হতে লাগল দ্রুত। আগে শুধু কাঁচা খাদ্য খেতে এবং হজম করতে যে পরিমাণ পুষ্টি-শক্তি ক্ষয় হত, এখন সেই উদ্বৃত্ত পুষ্টি মস্তিষ্কের শক্তি বাড়িয়ে চলল। অভিনব চিন্তা ভাবনা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল আরো উন্নতির দিকে; আরো সুস্থ, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত জীবনের দিকে।

নিচের প্রথম ছবিটি হোমো হ্যাবিলিস যারা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছিল, দ্বিতীয় হোমো ইরেক্টাস যারা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল, আর তৃতীয়টি আমাদের অত্যন্ত নিকট আত্মীয় হোমো স্যাপিয়েন্স। এদের নাক, মুখ, চোয়াল, ভুরু এবং মাথার গঠনের পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো নয় কী?

(পরের সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্ব)



ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প

জন লকউড কিপলিং
অনুবাদ পিয়ালী চক্রবর্তী

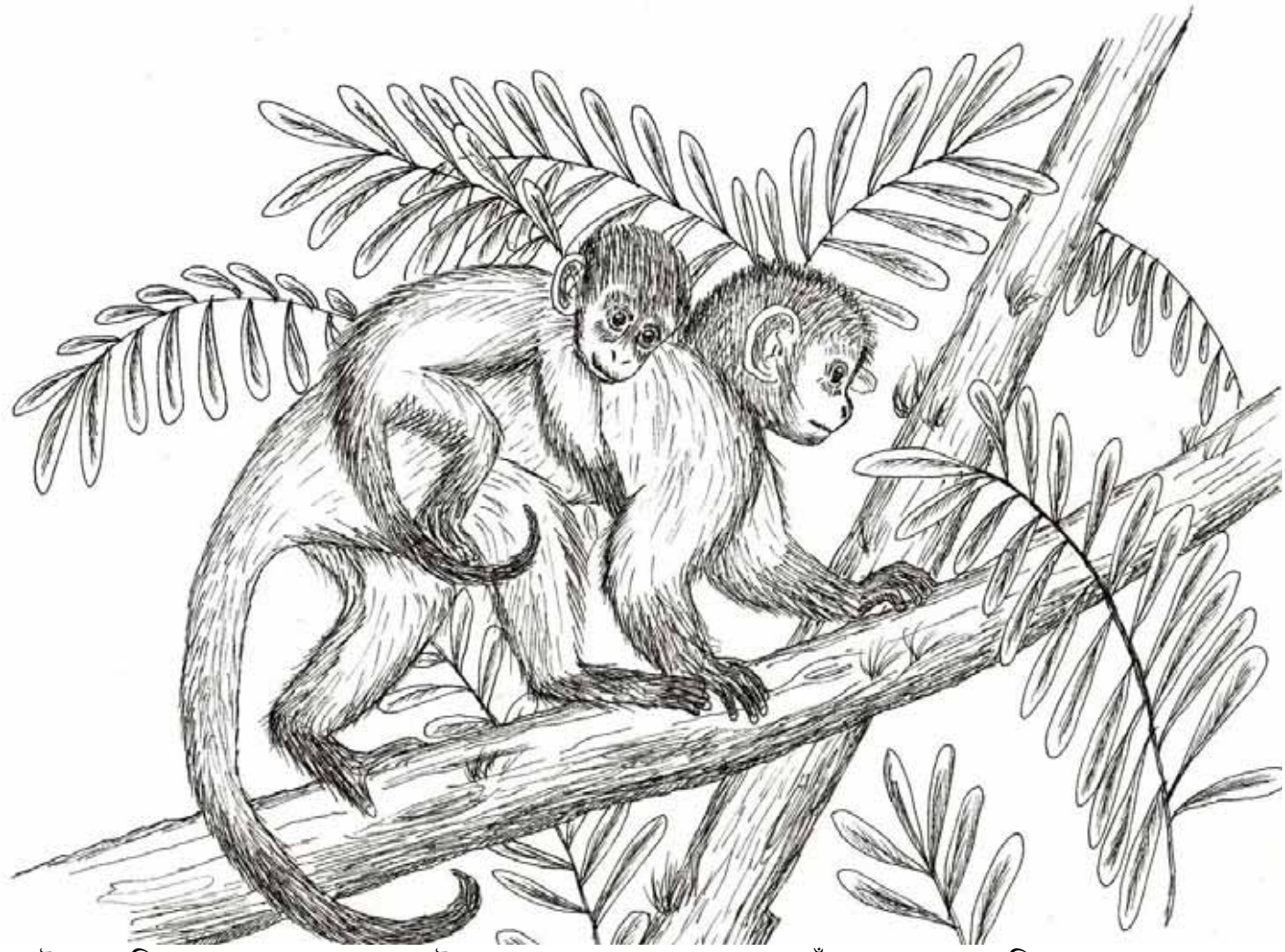
ওদের দৈনন্দিন জীবনটাও একটা দেখার মত ব্যাপার। ওদেরও বেশ একটা পিতৃশাসিত সংগঠন থাকে,কিছুটা সেনাদের আদবকায়দায়। আসলে ওরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যায়, আর প্রত্যেকটা দলের যে সেনাধ্যক্ষ থাকে, সে দেখতে বেশ বড় আকারের, চওড়া কাঁধ, কুকুরের মত দাঁত গজায়, আর এই কারণেই কিছু হিন্দু চিত্রকার এদেরকে হনুমান বলে থাকে। এরা দলের অল্পবয়স্ক পুরুষদের সাথে নিষ্ঠুরভাবে লড়াই করে দলে নিজেদের জায়গা পাকা করার জন্য, আর অবাধ্য মেয়ে বাঁদরদের নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য। এইরকম নেতাদের আমরা 'দানব'বলে জানি। এরা সবসময় রেগে থাকে, আর কিছু হলেই এদের রাগবর্ষণ শুরু হয়ে যায়, আর এরা জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে। এরা দলের মধ্যে যেকোন কিছুর সিংহভাগটাই নেয় যাতে উঠতি তরুণ সদস্যরা বেশি করে বিরক্ত হয়। মা আর বাচ্চাদের একটুখানি ভাগ দেয়, আর সবসময় মারপিট করে অন্যদের সাথে যারা ওর প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠতে পারে। পাহাড়ি জায়গায় প্রায়ই এরকম মারপিট দেখা যায়। মানুষেরা তাই এদেরকে 'মহারাজা' বলে ডাকে। কারণ এইরকম অসভ্য, স্বৈরতান্ত্রিক, লালমুখো হনুমানদের দেখলে অনেকটা সেই পুরাকালের নিষ্ঠুর রাজাদের কথা মনে পড়ে।

আর এইসব মহারাজাদের মত, এদেরও খুব দুঃখের কাহিনীও থাকে কিছুটা প্রেম,ভালবাসা সম্পর্কিত। এই যেমন এক সকালে এক হনুমান এসে হাজির হল, দেখেই বোঝা যায় খুব আহত হয়েছে। খোঁড়াচ্ছে, একটা হাত একপাশে ঝুলে রয়েছে, নাড়ানোর শক্তি নেই, চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে ভীষণ মারামারি করে আহত হয়েছে। এমনকি সে নিজেও হাঁটাচলা করতে পারছে না। একটি মেয়ে বাঁদর, ওর স্ত্রী, তার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে। এই অবস্থা দেখে আমরা ওদের কিছু পাঁউরুটি আর খাবার ছুঁড়ে দিলাম। অমনি হনুমানটা তার বড় ভাগটা নিয়ে, যে হাতে জোর পাচ্ছে সেটা দিয়ে মুখে পুরতে যাচ্ছিল।

কিন্তু জান তো, সক্কলের দিন আসে। তা মেয়ে বাঁদরটা করল কি, হনুমানটার হাত শক্ত করে চেপে ধরে, খাবারের টুকরোটা কেড়ে নিয়ে একটা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল। আর তারপর হনুমানটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে লাগল। বেচারা হনুমান, তার এমন অবস্থা যে বৌয়ের সাহায্য না পেলে সে বাড়িও যেতে পারবে না। তাই সে ধৈর্য ধরে বসে রইল যতক্ষণ না তার বৌয়ের খাওয়া শেষ হয়। আমি দেখলাম মেয়ে বাঁদরটা এই ব্যাপারটায় দারুণ মজা পেল,হয়ত তার জীবনে প্রথমবার এমন সুযোগ পেল, আর প্রতিশোধও নেওয়া হল। তারপর আবার সে হনুমানটাকে ছেড়েও চলে গেল। হয়ত তাকে শেখাতে চাইল, যে সে যাতে একটু নম্র স্বভাবের হতে পারে।

মা বাঁদরেরা বাচ্চাদের ব্যাপারে খুব নরম হয়, খুব যত্নশীল,যতটা একজন মা, বাচ্চাদের জন্য হতে পারে। আসলে ওদের বাচ্চাগুলো জন্মায় খুব ছোট, বাদামী লোমে ঢাকা, ওদের মুখগুলো ছোট,ভাঁজ খাওয়া চামড়া, আর ভয়ার্ত অসহায় দুটো চোখ, আর তারা যখন কাঁদে, মনে হয় হারিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করছে। এমনকি বনেও তারা বাচ্চাদের চোখে চোখে রাখে। একবার আমি দেখেছিলাম একটা মা বাঁদর মাটিতে খেলছিল,আর তার বাচ্চাটা পাশের গাছটাতে অর্ধেকটা বেয়ে উঠে, বাকিটা আর পারছিল না, সমানে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। শেষ অব্দি মাটা বিরক্ত হয়ে, গাছে চড়ে, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে একদম গাছের মাথায় চড়ল, তারপর বাচ্চাটাকে রেখে, একটু বকে দিয়ে, আবার নিচে নেমে খেলতে লাগল।

লোকেরা বলে যে, যখন নাকি বাঁদরের বাচ্চা মারা যায়, ওদের মায়েরা একপ্রকার পাগল হয়ে যায়, আর ওই মৃত বাচ্চাটাকে বুকে আটকে রাখে। এমনও হয় যে ওরা কয়েক সপ্তাহ অব্দি ওই মৃতদেহ নিয়েই ঘোরে, আর



দেহটাকে শুকিয়ে নেয়। ওরা মৃত বাচ্চাটারও এমন যত্ন করে যেন সে বেঁচে আছে। এরা নিজেদের বাচ্চাকে রক্ষা করতে সাঙ্ঘাতিক লড়াই করতে পারে। আমার একটা টেরিয়র কুকুর ছিল, যাদের স্বপ্নই হয় বাঁদরকে ধরা। একবার আমি বাড়ির ভিতরে ছিলাম, পরে একজন লোক যে দেখেছিল ঘটনাটা, তার মুখে শুনেছিলাম, যে কুকুরটা আধ মিনিটের জন্য একটা বাচ্চা বাঁদরকে ধরেছিল। এরপর কুকুরটা বাড়িতে পালিয়ে আসে, আর চেয়ারের তলায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। ওর চুপ করে থাকা দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওর সাথে কিছু হয়েছে, আসলে মা বাঁদরটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনবার এমন কামড়ে দেয়, যে ছুরি দিয়ে কাটার মত ধারালো ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস সেলাই করার সরঞ্জাম ছিল বলে, বব সে যাত্রা বেঁচে গেল আর বাকি জীবন বাঁদরদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকত।

আর একবার এই বাঁদরদেরকে কাছ থেকে দেখেছিলাম, যখন কিছু পোষা বাঁদর আর একটা ছাগল নিয়ে এক বাঁদরওয়ালা এসেছিল নাচ দেখাতে। ছাগলটা এই বাঁদরগুলোকে নাচতে উতসাহিত করত। এদের দেখে প্রথমে বন্য বাঁদরগুলো খুব সন্দেহজনক ভাব দেখিয়ে দূর থেকে দেখতে লাগল, তারপর যেই বাঁদরওয়ালা একটা ডুগডুগি বাজিয়ে অদ্ভুত ভাবভঙ্গী করতে শুরু করল ছাগলটাকে সামনে রেখে, আর অমনি পোষা বাঁদরগুলো নাচতে শুরু করল। আর এই বন্য বাঁদরগুলোর তখন কি কৌতূহল। তারা একটু একটু করে এগিয়ে দেখতে লাগল। অবশ্য এই পোষা বাঁদরগুলোও ওদের নাচের শেষে, ওদের মালিকটাকে আর পাত্তাও দিল না। যদিও নাচের সময় ওদের মালিকও ওদের দিকে তাকায় না, আর ওরা এমন হিংস্র আর রাগী চোখে দেখতে থাকে, যেন ধর্মঘটের সময় যে শ্রমিক কাজ করে, তাকে বাকিরা যেমন করে দেখে, ঠিক তেমন।

শীতের সময় একটা বাঁদরদের আচরণে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ওরা মুদি দোকানে চুরি করার বদলে, সকলে মিলে একসাথে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাত পেতে ভিক্ষা করে। এটা সিমলাতে দেখেছিলাম। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, আর ওরা বাধ্য হয় এমনটা করতে। কারণ এরকম বন্য আর দুষ্টু প্রাণীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার কল্পনা করা যায়না। কিছু দোকানদার অবশ্য অভ্যাসবশত ওদের খেতে দেয়, তবুও ওরা দল বেঁধে ঘুরতে থাকে ভিক্ষা পাবার আশায়। একটা শান্ত, করুণ, সতৃষ্ণ ভাব দেখা যায় এই বড়, পরিণত বাঁদরগুলোর মধ্যে। যদিও হঠাত করে নতুন কিছু ঘটলে এরা বেশ চেগে যায়, আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেক

প্রাণীকে দেখা যায়,অনেকক্ষণ বসে এদের দিকে তাকিয়ে থাকতে, কিন্তু একমাত্র পাখিই উঁচু থেকে এদের অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করতে পারে। মানুষের মধ্যে মাঝি-মাল্লা বা কিছু পুরোন মানুষের মধ্যে এইরকম শান্ত একটা চেহারা দেখা যায়। কিন্তু বাঁদরদেরতো খুব কঠিন জীবন, ক্ষুধার্তের জীবন,ওরা অসহায়ভাবে বৃষ্টিতে ভেজে, গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে, ওরা ঝড়ের হাত থেকে বাঁচে। ওদেরও ঠান্ডা লাগে, কষ্ট হয়। বৃষ্টিভেজা রাতে,ঘন বনের অন্ধকার থেকে ওদের কাশির আওয়াজ আসে। আবার যখন সূর্য ওঠে,বাচ্চাগুলো খুব খেলে অনেকটা স্কুলের বাচ্চাদের মত। ওদের খেলাগুলো সেই ইংরেজ বাচ্চাদের মুরগি ধরা, বা প্রাসাদের রাজার খেলার মত। তবে এখানে একজনকে পাহাড়ের টিলা, বা নোংরার স্তূপের ওপর থেকে ফেলা নয়, একটা ফলভরা ডাল, যেটা দুলছে,তার ওপর বসে ঠেলাঠেলি করে একে অন্যকে। যে পড়ে যায়, সে আবার উঠে তরতরিয়ে গাছে চড়ে। এই দারুণ মজার খেলা প্রায় একঘন্টা ধরে চলে, আর সবচেয়ে দ্রুত যে কাজটা করে, সে সবচেয়ে আনন্দ পায়।

ক্রমশ



পূর্ব হিমালয়ের বায়োডায়ভার্সিটি হটস্পটে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের কিছু বনাঞ্চল পূর্ব হিমালয়ের বায়োডায়ভার্সিটি হটস্পটের আওতায় পড়ে। তার মধ্যে অন্যতম সংরক্ষিত এলাকা হলো নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। তাছাড়াও অন্যান্য এলাকার মধ্যে রয়েছে জোড়পোখরি অভয়ারণ্য, সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান এবং মহানন্দা অভয়ারণ্য।

এই সমস্ত সংরক্ষিত এলাকার একে অপরের থেকে ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক নয়। কিন্তু সমুদ্রতল থেকে এদের উচ্চতার তারতম্য অনেক। সেই কারণে আবহাওয়ার তারতম্যও প্রচুর। ফলে মাটির ধরণ এবং জঙ্গলের ধরণও অনেক আলাদা। ফলে জীববৈচিত্র্য প্রচুর কিন্তু তা সংকীর্ণ ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ।

যেমন ধরা যাক জোড়োপোখরি অভয়ারণ্যের কথা। এখানে মূলতঃ আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। তার মধ্যে সদ্য জেগে ওঠা নদী চরে যেমন দেখা যায় খয়ের গাছ, তেমনই গভীর মৃত্তিকাস্তরের বুকে দেখা যায় শাল গাছের বন। শালের সাথে পাওয়া যায় হলদু আর গামারও। জল বেশি যেখানে সেখানে দেখা যায় সিধা, জারুলও। আর দেখা যায় ভীষণ মোটা থেকে ভীষণ সরু নানা জাতের বাঁশ ঝাড়। এখানে বনে হাতির সংখ্যা প্রচুর। এই বনের হাতিরা মেচি নদী পেরিয়ে প্রায়শয়ই নেপাল থেকে ভারতে আসে বা ভারত থেকে নেপালে যায়। যখন যেখানে খাবার পাবে বলে আশা করে, তখনই সেখানে যায়। যাওয়ার পথে পড়ে চা বাগান। ফলে চা বাগানের মানুষজনের সাথে হাতির বিরোধ এখানে নিত্য অশান্তি। তাছাড়া এখানে নানান প্রজাতির প্রজাপতি, তাহ্‌র, চিতল এসবও দেখা যায়।

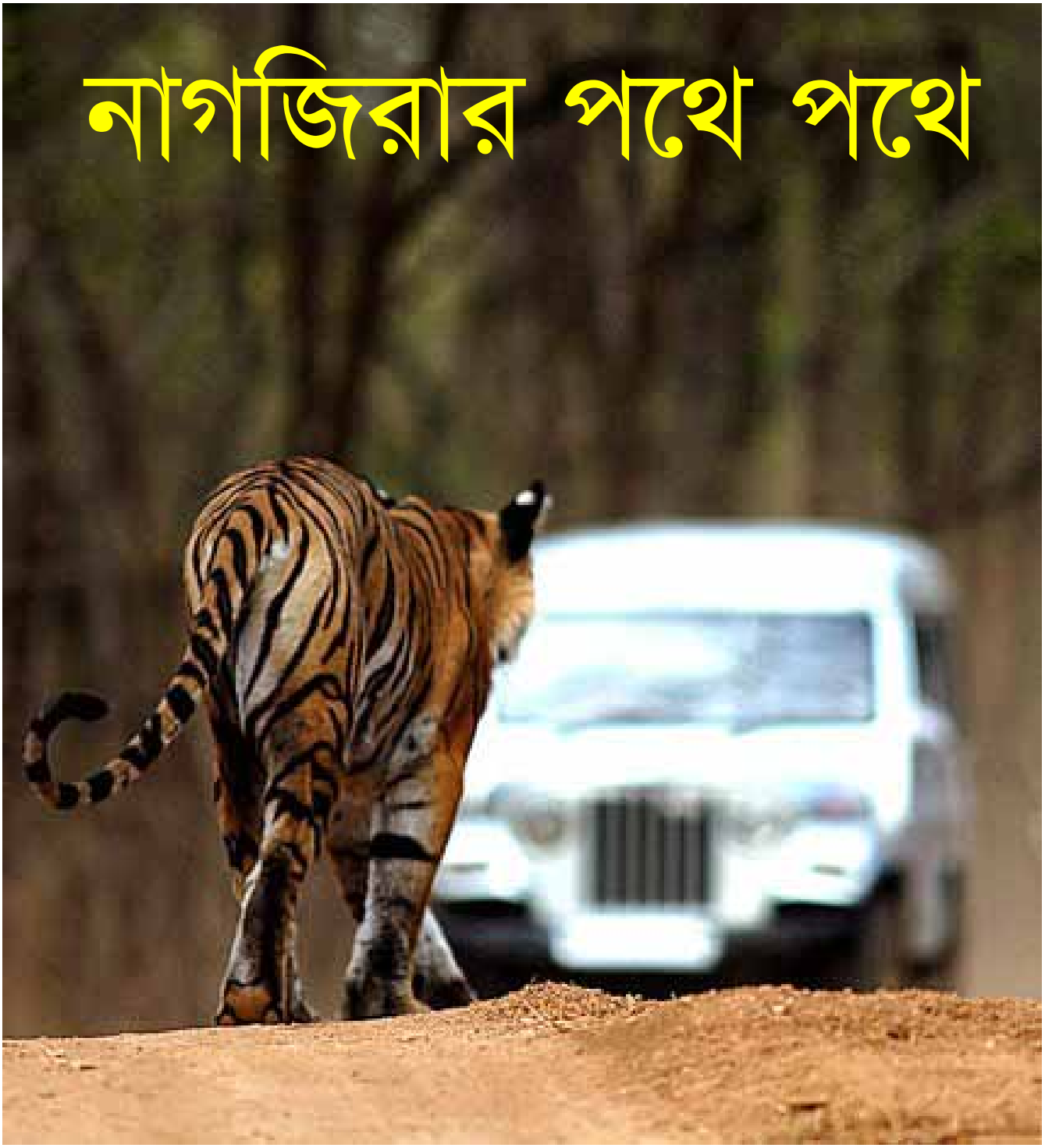
আবার সিঙ্গালীলা জাতীয় উদ্যান হলো রডোডেনড্রনের অভয়ারণ্য। নানান প্রজাতির রডোডেনড্রন ফোটে এখানে মার্চ, এপ্রিল মাসে। মূলতঃ লাল রডোডেনড্রেন বেশি চোখে পড়লেও, সাদা বা বেগুনীর দেখা পাওয়া দুষ্কর নয়। অর্থাৎ এই জাতীয় উদ্যান ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের আবহাওয়ার উপযুক্ত। তার কারণ সমুদ্রসমতল থেকে এর উচ্চতা। রডোডেনড্রন ছাড়াও এখানে মাঝে মাঝেই দেখা যায় ঘাসে ঢাকা উপত্যকা। অন্যান্য গাছেদের মধ্যে ওক, চাঁপা আর ম্যাগনোলিয়া দেখা যায় অনেক পরিমাণে। ঘনবনের মধ্যে প্রচুর রঙীন লাইকেনের দেখাও পাওয়া যায়। তাছাড়া এখানেই বাস ছিল রেড পান্ডাদের। কিন্তু চিতার আক্রমণে সিঙ্গালীলার বুক থেকে হারিয়ে গেছে এই প্রজাতির শেষ প্রাণীটিও। এখন দেশে, বিদেশের চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডা থাকলেও, তাদের আদত বাসস্থল সিঙ্গালীলার বনে আর তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী বৈচিত্র্যে জোড়পোখরির থেকে সিঙ্গালীলা একদমই আলাদা।

তবে মহানন্দা অভয়ারণ্যের সাথে জোড়পোখরির বেশ মিল আছে। মহানন্দাতে প্রাণী বৈচিত্র্য জোড়পোখরির প্রাণী বৈচিত্র্যের তুলনায় অনেক বেশি। এখানে হাতি ছাড়াও প্রচুর, ভালুক, চিতা, গাউর, চিতল, মুন্টজ্যাক, সম্বর, আর বাঁদর দেখ যায়। দেখা যায় ভাম জাতীয় বনবিড়ালও।

নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান আবার উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে অন্য তিনটি সংরক্ষিত এলাকার সংকলনের মতো। এই উদ্যান্যের সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা নানান অংশে এত আলাদা যে এখানে যেমন ক্রান্তীয় রডোডেনড্রেন দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় পর্ণমোচী শাল। বাঁশ ঝাড়, ফার্ণ আবার ওক গাছও। জীবজন্তুর মধ্যেও যেমন আছে রেড পান্ডা, তেমনই আছে গাউর, চিতল, মুন্টজ্যাক, সম্বর, তাহ্‌র, ভাম জাতীয় বনবিড়াল। আবার নানান প্রজাতির ভালুক, উড়ন্ত কাঠবেড়ালী, বুনো শুয়োর এসবই নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের নিজস্ব বৈচিত্র। এখানে পাখির বৈচিত্র্যও প্রবল। নানান প্রজাতির কাঠঠোকরা, প্যাঁচা, কোকিল, পায়রা বাজ, ছাতারে, বাঁশপাতি, বুলবুল, ফিন্‌চ ছাড়াও আরও অনেক রকম পাখি দেখা যায়।

এই সব বায়োডায়ভার্সিটি হটস্পটের বাইরেও আরও বিচিত্র বন আছে ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের ম্যানগ্রোভ বন হলো পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন যেখানে বাঘ থাকে। জানা যায় না যে অন্যত্র ম্যানগ্রোভ বনে বাঘ ছিল কিন্তু লুপ্ত হয়ে গেছে কিনা। প্রকৃতির আরও অনেক খবর জানতে এখনও অনেক বাকি। এক প্রজাতির লোপ যেমন হয়েছে তেমনই এক বছরে পনের হাজার নতুন প্রজাতির সন্ধানও পাওয়া গেছে এই সহস্রাব্দেই। প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল। সেখানে পরিবর্তনের সাথে খাপ না খাওয়াতে পারলে অবলুপ্তি অনিবার্য। সেই অনিবার্যকে স্বীকৃতি না দিতে পারলে প্রকৃতি পাঠ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

নাগজিরার পথে পথে



স্বপ্না লাহিড়ী

গোন্দিয়া স্টেশন থেকে নাগজ়িরা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার । আমাদের গন্তব্য আপাতত নাগজ়িরা উদ্যানের চোরখামারা গেট। নাগপুর যাবার রাস্তায়(NH 6) সাকোলি থেকে কেটে গেছে নাগজিরার পথ, প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের মত হবে।

সদলবলে নাগজ়িরা যাবার প্রস্তাবটা এসেছিল ছোটোছেলের কাছ থেকে। আমাদের বেড়াতে যাবার ব্যাপারে সমস্ত প্ল্যানিং সাধারণত সেই করে থাকে। তার প্ল্যানে কোনও খুঁত থাকে না। আমার এই ছেলেটির পায়ের তলায় সর্ষে আছে,সারা বছরই সে কোন না কোন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কাজেই তার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। ইন্টারনেটে সাফারি বুকিং থেকে নিয়ে কোথায় থাকা হবে, কোন পথে যাওয়া হবে, সব তার দায়িত্বে।

একটু সময় পেলেই আমরা সদলবলে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই । স্যাঙ্কচুয়ারিগুলো আমাদের বেশি টানে কারণ সেখানে পাহাড়, অপরূপ জঙ্গল আর তার সাথে নানা রকমের পাখি, প্রকৃতির কোলে স্বচ্ছন্দ ঘুরে বেড়ানো বন্য প্রাণী আর জঙ্গলের গন্ধ একসঙ্গে আর কোথায় পাওয়া যায় ?

বিলাসপুর থেকে গোন্দিয়ার দূরত্ব রেলপথে মাত্র ২৮৭ কিলোমিটারের মত । সাধারণত আমরা গাড়ি করেই ঘুরে বেড়াই তাতে নিজেদের মন মর্জি মত ঘোরা যায় কিন্তু এবার ঠিক হল ট্রেনে করে সবাই মিলে হৈ হৈ করে যাওয়া হবে। দলের সদস্য সংখ্যা ন'জন যাদের বয়েস ছয় থেকে ছিয়াত্তর।

নির্দিষ্ট দিনে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সকাল সকাল উঠে পড়লাম ট্রেনে। ডিসেম্বর মাস, ঠাণ্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে কাজেই ব্যাগ এর আকার একটু বড়ো। অবশ্য ছোটোবড়ো সবাইকার নিজের নিজের ব্যাগ বইবার অভ্যেস আছে।

ট্রেন ছাড়তেই দলের সিনিয়রমোস্ট সদস্য , আমার দিদি, বললেন "কী রে চা কই?" আমার পুত্রবধূর স্পেশাল ব্যাগ থেকে বেরতে শুরু করল চা, বিস্কিট, কেক ও ডিমসেদ্ধ। তাঁর ভাণ্ডারে মুড়ি চানাচুর ,শুকনো মিষ্টি, ফল থেকে গাজরের হালুয়া পর্যন্ত সব আছে, এমনকি চা কফি চিনি দুধ এর স্যাশেও বাদ যায়নি। যদিও সেগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য ছিল।

বেলা বারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম গোন্দিয়া। গাড়ি আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। জিনিসপত্র তুলে আমরা এক এক করে গাড়িতে উঠছি, ও মা দিদি কই ? আমাদের সঙ্গেসঙ্গেই তো নিজের ব্যাকপ্যাকটি পিঠে বেঁধে আসছিলেন হঠাৎ কোথায় গেলেন?

ছোটো বোন বলল, " দ্যাখ কোন কুকুরের বাচ্চা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছে কি না!" দিদির কুকুর বিড়াল প্রীতি বিখ্যাত।

একটু পরেই দিদি এক বড়ো ঠোঙাভর্তি গরম গরম শিঙাড়া নিয়ে উপস্থিত। এক গাল হেসে বললেন, "এতখানি রাস্তা যেতে হবে একটু স্বাস্থ্যকর খাবার না হলে চলে?"

ঘণ্টা দুয়েক পরে আমরা পৌঁছে গেলাম চোরখামারা গেট-এ। সাকোলি থেকে প্যাকড লাঞ্চ নিয়ে নেয়া হয়েছিল। আমরা সোজা চলে গেলাম জঙ্গলের মধ্যে ফরেস্ট গেস্ট হাউসে , যেখানে আমাদের জন্যে চারখানি রুম রিজার্ভড ছিল। বাথরুম সহ দুটো দুটো প্রশস্ত রুমের এক একটা ইউনিট । সামনে লন, যেখানে পাথরের তৈরি বেঞ্চ রয়েছে বসার জন্য, তাছাড়া আছে বাচ্চাদের জন্যে দোলনা প্রভৃতি খেলাধুলার ব্যবস্থা । খানিকটা দূরে ক্যান্টিনে চা থেকে শুরু করে জলখাবার লাঞ্চ, ডিনার সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। হাঁটাপথে খানিকটা দূরে একটা বেশ বড়ো পুকুর জলে টই টুম্বুর , ভারি মনোরম পরিবেশ ।

আমাদের বিকেলের সাফারি বুকড ছিল । তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারতে সারতেই জিপসির হর্ন শুনতে পেলাম । একটা জিপসি তে গাইড সমেত ছ'জন এর বেশি বসতে পারে না । আমার ছোটো ছেলে দুই ক্ষুদে নাতি ও আমি একটা জিপসিতে চড়ে বসলাম আর দ্বিতীয়টিতে আমার দুই বোন, বড়ো ছেলে, পুত্রবধূ ও আমার পতিদেবতা বসলেন । আমার পুঁচকে নাতিরাও গলায় দুরবিন ও ক্যামেরা নিয়ে উঠে বসল আমার পাশে। আমাদের দুটো গাড়ির রুট আলাদা তাই একটুখানি যাবার পর আমরা আলাদা হয়ে গেলাম ।

মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা ও গোন্দিয়া জেলার মাঝা মাঝি প্রায় 152 sq.km বিস্তৃত নাগজ়িরার জঙ্গলটি অসাধারণ সুন্দর ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । বনের মাঝখানে একটি নাগ দেবতা ও একটি মহাদেবের মন্দির আছে। এ ছাড়া আছে আর একটি মন্দির ঈরা বা জ়ারার। মারাঠি ভাষায় জ়ারা মানে হচ্ছে বারোমাসি জলস্রোত। একটি পাহাড়ি নদী পঙ্গেজ়ারা পাহাড়ের কোল থেকে বেরিয়েছে। এর ধারা কখনও শুকোয় না। নাগজ়িরা নামটি আমি যত দূর জানি, এই জ়ারার নাম থেকেই এসেছে ।

গাইড এর কাছ থেকে জানতে পারলাম , এখানে প্রায় ১৬৬ টি প্রজাতির পাখি, ৩৬ টি প্রজাতির রেপটাইল পাওয়া যায় । এ ছাড়া আছে শ্লথ বিয়ার,বারকিং ডিয়ার, মাউস ডিয়ার, জংলি কুকুর, বনের রাজা বাঘ,প্যান্থার বাইসন , হরিণ চিতল, বন্যশূকর, জংলি বিড়াল, ইন্ডিয়ান সিভেট, পাম সিভেট, নেকড়ে, শিয়াল, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি আর আছে প্যাঙ্গোলিন। এত কিছু অবশ্য আমরা দেখতে পাইনি। এর কিছুটা দেখতে হলেও এখানে বেশ কিছু দিনের জন্যে ডেরা বাঁধতে হত। যা দেখেছি তার কথায় পরে আসছি ।

আমরা চলেছি আমাদের রুট ধরে,ধীরে সুস্থে। মেঠো রাস্তার দু'ধারে সবুজ পাতা ঘেরা বড়ো বড়ো গাছ আকাশ ছুঁতে চেষ্টা করছে, তাদের ছায়ায় ছোটো মাঝারি গাছ বেড়ে উঠেছে আর নানারকম লতা উঠছে তাদের গা বেয়ে। রাস্তার ধারে ধারে ফুলে ভরা ছোটো ছোটো গাছ যা সাধারণত জঙ্গলে দেখা যায় না। এখানে সাল মহুয়া আমলকী দেখতে পেলাম না, তবে গগনচুম্বি টিক-এর পাতা এত ঘন যে রোদ কষ্ট করেই নিচে নেমে আসে। সপ্তপর্ণি গাছও অনেক দেখলাম। সেদিন বিকেলে চিতল আর কয়েকটা নিলগাই ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখা হয়নি । নাতিরা যা দেখছে তারই ছবি মহানন্দে তুলে যাচ্ছে ।

সন্ধের মুখে আকাশ তখন সূর্যাস্তের রঙে রাঙা, পাখিরা যে যার ঘরে ফিরছে আমাদেরও ফেরার পালা। ছ'বছরের ছোটো নাতি ঘুমে ঢলে পড়েছে আমার কোলে । ভোর পাঁচটা থেকে একটুও বিশ্রাম নেয় নি বাচ্চাটা, আর পারেনি। লাল ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যখন গেস্ট হাউস এর ক্যান্টিন এর সামনে নামলাম তখন আর কারুকে চেনা যায় না । চা বিস্কিট খেতে খেতে গল্প হতে থাকল বাকি টুরিস্টদের সঙ্গে। এই একটা জায়গায় সবাই সবাইকার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। বাঘ দেখা কারুরই কপালে জোটে নি। অতএব দেখা যাক কাল কী হয়। ছোটো ছেলে রিশলু বলে দিল, সকাল পাঁচটায় চা দেবে আর ছ'টায় জিপসি আসবে। সেই মত ছোটোবড়ো সবাই তৈরি থাকবে ।

পরদিন ভোরবেলা তৈরি হয়ে বেরিয়ে দেখি বড়ো নাতি মেহেল (আমার রুম মেট) দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনছে। আমি কাছে আসতেই ইশারায় চুপ করে শুনতে বলল । একটু পরেই পরিষ্কার অ্যালার্ম কল শোনা গেল হরিণের। ততক্ষণে আর সবাই বেরিয়ে এসেছে, সবাই শুনেছে অ্যালার্ম কল। মনে একটু আশা হল হয়ত বাঘের দেখা মিলবে। চা দিতে এসেছিলো যে ছেলে দুটি তারা বলল ক'দিন ধরে একটা বড়ো জংলি কুকুরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা বাঘের থেকে কম হিংস্র নয়। বাঘও এদের ভয় পায়। এদের দেখেও অ্যালার্ম কলটা দিয়ে থাকতে পারে হরিণ ।

তাড়াতাড়ি সবাই মিলে যে যার জিপসিতে চড়ে বসলাম। আগের দিন রাত্রে জলখাবারের কথা ক্যান্টিনে বলা ছিল। একটা গাড়িতে সেই প্যাকড খাবার তোলা হল। সেন্ট্রাল পয়েন্ট এ বেলা নটা নাগাদ সব গাড়িগুলো এক জায়গায় হয়। এখানে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার বেরনো ।

গেট-এ সব ফরম্যালিটি শেষ করে আমরা গাইডসহ ঢুকলাম জঙ্গলে। কুয়াশার চাদর মোড়া জঙ্গলের ঘুম তখনও ভাল করে ভাঙেনি, রোদের ছোঁয়া পড়েনি ভিজে মাটির পথের ওপর, গাছের পাতা থেকে এখনও শিশির পড়ছে টুপটাপ, পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে ঘন পাতার আড়াল থেকে । জিপসি চলছে নিজের রুট ধরে হালকা গতিতে। রঙবেরঙের পালকে সাজা কয়েকটা বুনো মুর্গি রাস্তার ধারে ধারে ঘুরে মাটি থেকে খুঁটে পোকামাকড় খাচ্ছে। খানিকটা দূরে যাবার পরে দেখলাম অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একদল চিতল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ ঘাস খেতে খেতে মুখ তুলে আমাদের দেখে নিয়ে আবার খেতে থাকল, জিপসিভর্তি মানুষ দেখা ওদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

জিপসি হাল্কা চালে চলছিল, যাতে আশেপাশের কিছুই মিস না করি । এক রাশ সোনালি রোদ্দুর এসে পড়েছে গাছের মাথায়, একটা দুটো করে পাখি মগডালে বসে রোদের উষ্ণতা শুষে নিচ্ছে তাদের পাখনায় । ঝাঁক ঝাঁক টিয়া পাখি কলরব করতে করতে আকাশের গায়ে উড়ে বেড়াচ্ছে । কিছু ড্রংগো , ম্যাগপাই, স্টারলিং দেখলাম । কালো মাথা, লম্বা সাদা ল্যাজ পারাডাইস ফ্লাই ক্যাচার পাখিটা গাছের ডাল থেকে সাদা ঢেউ খেলিয়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল । আরও অনেক নাম না জানা পাখির সাথেও দেখা হল ।

একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা পাহাড়ি নালা রাস্তার এ পাশ থেকে ও পাশে বয়ে যাচ্ছে, ওপরে পুল বানানো । ড্রাইভার পুল এর একটু আগেই গাড়ি দাঁড় করে জানালেন এ নালাটির ধারে ধারে প্রায়ই বাঘ ঘুরে বেড়ায় । এখন অবশ্য কেউ নেই শুধু দুটো পানকৌড়ি গলা ডুবিয়ে খাবার খুঁজছে । জঙ্গল একবারে নিস্তব্ধ, পাখিরাও দূরে কোথাও চলে গেছে ।

পুল পেরিয়ে ড্রাইভার ডানদিকে রাস্তার ধারে বাঘের পায়ের ছাপ দেখালেন। তখনও হালকা ভিজে। রিশলু বলল ছাপ দেখে মনে হচ্ছে বাঘটা আধঘণ্টা মত আগে এখান থেকে গেছে। গাইডও তাই বললেন । বাঘ খানিকটা রাস্তার ধার দিয়ে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেছে । কোনও অ্যালার্ম কল শোনা যায়নি তাই মনে হয় সে কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে । আমরা সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে এগিয়ে গেলাম।

সেন্ট্রাল পয়েন্ট-এ একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বেরোন হল। এখন আর রুট বাঁধা নেই, ঘুরে বেরানোর স্বাধীনতা রয়েছে । গাড়ি চলল ওপরের দিকে । ঘন গাছপালা কম হতে থাকলো ক্রমশ । এক স্বচ্ছতোয়া পাহাড়ি নদী এঁকে বেঁকে চলছে আর তাকে ঘিরে ঘন বাঁশ ঝাড় হাওয়ায় দুলছে। এখনও কোথাও কোন আওয়াজ নেই । বাঁশঝাড় পেরিয়ে গিয়ে পড়লাম ঘাসের জঙ্গলে। সরু রাস্তার দুপাশে বড়ো বড়ো এলিফ্যান্ট গ্রাস, বাঘের প্রিয় চারণভূমি । কয়েকটা নীলকণ্ঠ পাখি বসেছিল গাছের শুকনো ডালে । আমাদের দুটো গাড়ি আগে পেছনে চলছিল । আমাদের গাইড একটা বড়ো গাছের কোটর দেখিয়ে বলল, "ওই দেখ হর্নড প্যাঁচা" ,



আমি তো কিছুই দেখতে পাই নি। শুনতে পেলাম পেছনের গাড়ির গাইড বলছেন ক্যামেরা জুম করে দেখুন। সত্যিই জুম করে কোটরে দেখা গেলো হর্নড প্যাঁচার বাচ্চা মাঝে মাঝে মাথা বার করে ঘাড় ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখছে আবার মাথা ঢুকিয়ে নিচ্ছে । এই প্যাঁচাগুলো আকারে বেশ বড়ো হয় আর মাথায় দুটো "টাফ্ট" থাকে যার জন্যে এই নাম। এছাড়া আর কারোই দেখা পেলাম না। ঘন গাছ দিয়ে ঢাকা বনটা এত সুন্দর যে বাঘ দেখতে না পাওয়ার জন্যে মন খারাপ করার অবকাশই নেই ।

জিপসি থেকে নেমে আমি বললাম আমি ঘরে যাচ্ছি, কার কী নিয়ে যেতে হবে দাও । সবার গরম জামাকাপড় নিয়ে আমি ও ছেলে মিতুন গল্প করতে করতে যাচ্ছি ঘরের দিকে, হঠাৎ চিৎকার চ্যাঁচামেচির আওয়াজে ফিরলাম ক্যান্টিনের দিকে । যা দেখলাম তাতে হো হো করে হাসা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ক্যান্টিন এর সামনে আমাদের বাড়ির সবাই ও আন্যান্য টুরিস্টরা গোল করে চেয়ারে বসে চা আর পোহার আনন্দ নিচ্ছিলেন নরম গরম রোদ্দুরে। সেই ফাঁকে একদল বাঁদর এসে গেছে তাদের সঙ্গে পোহার ভাগ বসাতে । একটা বাঁদর ছোটো বোন জয় এর ঘাড়ে বসে তার হাতে ধরা প্লেট থেকে এক খাবলা পোহা নিতেই এই বিপত্তি । সে তো হাউমাউ করে লাফিয়ে চেঁচিয়ে একাকার। আরও অনেকেরই এক অবস্থা, ফলে এই অর্কেস্ট্রা । সবাই দুদ্দাড় করে ক্যান্টিন এর ভেতরে ঢুকছে । আমাকে হাসতে দেখে জয় বলল, "তোর ওপরে তো আর হামলা হয়নি! তাই হাসছিস। রিশলুটা আবার ছবি নিচ্ছিল।"

ওকে ঠাণ্ডা করতে বললাম চল পুকুরটা দেখে আসি। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ক্যান্টিনের একটি ছেলে দৌড়ে এসে বলল, "ওদিকে এখন যাবেন না ম্যাডাম, ঘণ্টাখানেক আগে জংলি



কুকুরের একটা দল ওখানে হরিণ শিকার করেছে ,এখনও ওরা ওখানে আছে।"

এই জংলি কুকুর বা ঢোল (dhole, Cuon alpinus) আমাদের সাধারণ কুকুরেরই মতই দেখতে কিন্তু ল্যাজটা বেশ মোটা , শিয়ালের মত। গায়ের রং ঘন বাদামি হয় সাধারণত, তবে কিছু শেড এর পার্থক্য থাকতে পারে । এরা দলবদ্ধভাবে থাকে এবং দলবদ্ধভাবে শিকার করে। এক একটা দলে আট দশটা থেকে

কুড়ি তিরিশটা ঢোল থাকতে পারে, তবে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এরা কুকুরের মত ডাকতে পারে না, তীক্ষ্ণ শিসের মত আওয়াজ করে দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে । অনেক সময় এদের অ্যালফা মেল বা অ্যালফা ফিমেল এর নেতৃত্বে শিকার করতে দেখা যায়। এরা খুব হিংস্র হয়। তেমন বুঝলে বাঘকেও ছাড়ে না । তবে বাঘ বা লেপার্ডকে ওরা যথাসাধ্য এড়িয়েই চলে। এ হেন ঢোলদের ধারে কাছে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । দেখা যাক বিকেলের দিকে পুকুরটা দেখে আসা যায় কী না ।

বিকেলের সাফারিটাই এবারের মত আমাদের শেষ সাফারি। পরদিন সকালে ফিরতে হবে । একেবারে কোর এরিয়াতে খোদ বাঘের রাজত্ব টাইগার ট্রেলএ যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে যেতে যেতে পর পর কয়েকবার হনুমানের অ্যালার্ম কল শোনা গেল । গাড়ি দৌড়ুল কল লক্ষ্য করে।

মোড় ঘুরতেই দেখা গেল একটা জিপসি দাঁড়িয়ে আছে আর বাঁ দিকের জঙ্গলে কিছু একটা দেখছে । আমরা ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই রিশলু হাত তুলে একটা গাছ দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, লেপার্ড। লেপার্ডটা তখন নিচে নামছে, আমি শুধু তার ল্যাজটাই দেখতে পেলাম। আমি মুদুমালাই এর জঙ্গলে ব্ল্যাক প্যান্থার দেখেছি কিন্তু লেপার্ড সবসময়ে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে। মনে মনে ঠিক করলাম এবার রাজস্থান এর “বেড়া” লেপার্ড স্যাঙ্কচুয়ারিতে যাবই যাব।

গাড়ি ঘুরিয়ে টাইগার ট্রেল এর রাস্তা ধরা হল । টাইগার ট্রেল, চারদিকে মাটির রাস্তা দিয়ে ঘেরা বেশ বড়ো একটা ঘন জঙ্গলের টুকরো। ট্রেল-এ ঢোকার মুখেই শুনতে পেলাম খক খক করে অ্যালার্ম কল দিচ্ছে হনুমান। সামনের রাস্তা দিয়ে চারপাঁচটা ঢোল জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। আমদের পেছনেই আর একটা জিপসিতে ছেলে মিতুন, বৌমা ,দুই বোন ও অরূপ ছিলেন। রিশলু ঐ গাড়ির গাইডকে বলল, “তোমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো একেবারে নড়বে না , আমি ট্রেলটা একবার ঘুরে আসছি , বাঘ বেরোবে।”

আমরা তাড়াতাড়ি ঘুরে যখন ফিরছি, দেখি মিতুন জিপসিতে দাঁড়িয়ে ডান পাশের রাস্তার দিকে ইশারা করছে। বাঘটা তখন ওদের গাড়ির পাশ দিয়ে নেমে জঙ্গলের গাছ পালার আড়ালে চলে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়ি ঘুরিয়ে ডানদিকে কেটে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল, সঙ্গে পেছনের



গাড়িটাও। অ্যালার্ম কল তখনও শোনা যাচ্ছে । গাইড বললেন বাঘটা এদিকেই আসছে । আমরা প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বসে আছি । খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রিশলু নিঃশব্দে ডান হাত তুলে ইশারা করল, গাছের ফাঁক দিয়ে বাঘটাকে দেখা যাচ্ছে তখন । নাগজিরার রাজা ধীরে সুস্থে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমাদের দুটো গাড়ির একেবারে পাশ ঘেঁসে প্রায় গাড়ির বনেট ছুঁয়ে রাস্তা পেরিয়ে ও পাশের গাছগুলোর ভেতর মিলিয়ে গেল । যাবার আগে একটু দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদেরকে ভালো করে দেখে নিল, ভাবটা যেন নাও “পোজ” দিলাম ছবি তোল । বাঘটা এত কাছ দিয়ে গিয়েছিল যে হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যেত । শমীক একেবারে ধারে ছিল।

আমি শুধু তাকে হালকা করে ধরেছিলাম । সে কিন্তু স্থির হয়ে বসেছিল । এদিকে সবাই তখন ছবি তুলতে ব্যস্ত, মেহেল সুদ্ধু বাদ যায় নি, একমাত্র আমি আর ছোটো নাতি ছাড়া । এত বড়ো ,এত সুন্দর বাঘ, ঝকঝক করছে গায়ের লোম, আমরা স্তব্ধ হয়ে তার সৌন্দর্য দেখছিলাম । তবে এটা বাঘ নয় বাঘিনী ছিল,সন্তানসম্ভবা। গাইড বললেন এই বাঘিনীটি এই জঙ্গলের "মায়ী" T2। বোধ হয় ঢোলগুলোকে stalk করছে । আমরা সবাই এত উত্তেজিত ছিলাম যে খেয়ালই ছিল না যে আমরা খোদ নাগজ়িরার সাম্রাজ্ঞী মায়ীর রাজত্বে বসে আছি ।

সাফারি থেকে ফিরে ক্যান্টিনে চায়ের কাপ নিয়ে গাইডকে ঘীরে গোল হয়ে বসে মায়ীর ইতিহাস শুনলাম। ২০০০ সালে এই বাঘিনীটিকে প্রথম নাগজ়িরার জঙ্গলে দেখা যায়, তখন তার নাম দেয়া হয় T2 । ক্রমে সে এই টাইগার রিজার্ভটিতে নিজের আধিপত্য জমিয়ে বসে ও এগারোটি ব্যাঘ্রশাবক প্রদান করে। সে মায়ী নামেই বেশি পরিচিত। শেষ দুটি শাবক "জয় ও বীরুর" ২০১১ সালে জন্ম হয় ও তারা ২০১৩ সালে মায়ীর থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের এলাকা খুঁজতে বেরিয়ে যায় । জয়, উমরেড-কাড়াগুলা টাইগার রিজার্ভ এ migrate করে যায়, কিন্তু বীরুর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মুগ্ধ হয়ে গল্প শুনতে শুনতে কত রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন কারুর খেয়ালই ছিল না।

মায়ী এটা প্রমাণ করেছিল সেদিন যে বাঘ সত্যই অত্যন্ত ভদ্র ও সহৃদয় প্রাণী । ছোটো নাতি শমীকও অমলেট খেতে খেতে বলল বাঘ খুব ভালো, কিচ্ছু করে না, কিন্তু বাঁদররা খুব খারাপ। ঘাড়ে উঠে পোহা খেয়ে নেয় । ক্যানটিনে সবাই হো হো করে হেসে উঠে তার কথায় সায় দিল ।

পুনশ্চ-

১। ফরেস্ট গেস্ট হাউসটি কোর এরিয়ায় থাকার দরুন ফরেস্ট এর নতুন নীতি অনুযায়ী এখন টুরিস্ট দের ওখানে থাকতে দেয়া হয় না ।

২ । মাসখানেক আগে একটি দুঃখের খবর পেলাম। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মুম্বাই সংস্করণে(৮ মে ২০১৬) শ্রী বিবেক দেশপাণ্ডের লেখা পড়ে জানতে পারলাম , মায়ীকে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে একটি জলাশয়ের পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায় । কিছু টুরিস্ট ও বন কর্মচারি তাকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে । সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা শুরু হয় , কিন্তু জখম এত গুরুতর ছিল যে তাকে বাঁচানো যায়নি । তার পিছনের পায়ে একটা গভীর ক্ষত ছিল, খুব সম্ভবত "গৌর" জাতীয় বন্য মহিষের সঙ্গে তার লড়াই করতে গিয়েই সে মৃত্যুবরণ করল । আমরা স্তব্ধ হয়ে গেছি। মৃত্যুর সময় মায়ীর বয়স হয়েছিল ১৭ বছর।

মায়ীর ছবিটি লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত

মরুভূমির পথে



নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

উ:! আর একদিনের পথ! তারপরেই এই ভয়ানক মরুভূমির কবল থেকে বেরোনো যাবে। এ পথ তো যে সে নয়! পথে না পাওয়া যায় জল,না খাবার, না জ্বালানী কাঠ। পাঁচশোটা গাড়ি নিয়ে বণিক যখন পথ চলা শুরু করেছিলেন তখন কত না উত্তেজনা সবার মধ্যে। আজ এতদিন ধরে ধূ ধূ বালিরাশির মধ্যে দিয়ে পথ চলে চলে সবাই ক্লান্ত।

বণিক এর আগে অন্য অন্য দিকে গেছেন বাণিজ্য করতে। কখনো কোনো শহরে ,কখনো বন্দরে। সঙ্গে থাকে পাঁচশো গাড়ি জিনিসপত্র। মরুভূমির দিকে এই প্রথম।

ঊনষাট দিন ধরে চলছে এই ক্লান্তিকর পথ চলা। দিনে কোনো জায়গায় শিবির করে গাড়ি গুলো একজায়গায় গোল করে দাঁড় করে তার ছায়ায় রান্না-খাওয়া সারতে হয়।তারপর তাঁবুর নীচে সমস্ত দিন বিশ্রাম।আর রাত হলে তারা দেখে দেখে পথ চলা ।আজ সবার মনে ভারী আনন্দ।কাল সকালেই পৌঁছনো যাবে শহরে।

যখনকার কথা বলছি,তখন যানবাহন বলতে ডাঙায় ছিলো গরুর গাড়ি,আর জলপথে নৌকো।পথ চেনানোর জন্যে সব যাত্রীদলেই একজন করে লোক থাকতেন,যিনি আকাশের তারা দেখে পথ চেনাতেন।

বণিক তাঁর দলের লোকজনদের বললেন," বাড়তি জল, জ্বালানী সব ফেলে দাও। আর তো বেশি পথ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শহরে পৌঁছে যাব।"

কারণ এটা তিনি আগেও দেখেছেন গাড়ি যত হাল্কা হবে বলদ ততো জোরে তা টানবে। আর তাহলে সূর্যোদয়ের আগেই দলবল নিয়ে তিনি শহরে ঢুকতে পারবেন।

নিস্তব্ধ রাত্রি। চাঁদের আলোয় ধূ ধূ বালি চিকচিক করছে। গাড়ি চলছে ঢিমে তালে। গরুর গলার ঘন্টার টুংটাং শব্দ,গাড়ির মিঠে দুলুনি। ছই-এর নীচে সওয়ারিরা সব ঘুমে বিভোর। শুধুমাত্র পাঁচশো গাড়ির গাড়োয়ান একদম সামনের গাড়ির দিকে টানটান দৃষ্টি রেখে চলেছে। ওই গাড়িতেই তো রয়েছে তাদের পথ প্রদর্শক।

সারারাত পথ চলে চাঁদ যখন প্রায় ডুবুডুবু ,চারদিকটা আলো -আলো হয়ে উঠেছে, তখন কয়েকজন গাড়োয়ানের একটু সন্দেহ হল। কোথায় কী? কোনোদিকে কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন তো দেখা যায় না? এমন সময় সামনের গাড়ি থেকে পথ প্রদর্শকের চিৎকার শোনা গেল--"গাড়ি ফেরাও,গাড়ি ফেরাও...”

প্রবল শোরগোলে সবার ঘুম ভাঙল। ব্যাপারখানা কী? ব্যাপার শুনে তো সকলের আক্কেল গুড়ুম! সামনের গাড়ির পথপ্রদর্শকের কখন চোখটা একটু লেগে এসেছিলো,আর সেই অবকাশে গাড়িগুলো একদম ভুল পথে চলে এসেছে। মরুভূমিতে এমনি তো কোনো চিহ্ন থাকে না, তবুও ভালো করো আকাশটাকে দেখেশুনে বোঝা গেলো গাড়িগুলো ঘুরেফিরে আবার গত দিনের জায়গাতেই ফিরে এসেছে।

হায় হায়! এখন উপায়? বণিকের সঙ্গের লোকজন কপাল চাপড়াতে লাগল। কেউ বা পথপ্রদর্শককে এই মারে তো সেই মারে, "একজনের ভুলে আজ আমরা এতোগুলো লোক বুঝি বেঘোরেই মারা পড়লাম।" আর কেউ ভাগ্যের হাতে সবটুকু সঁপে দিয়ে কাঁদতে লাগল, "হায়রে! আমরা কেন খাওয়ার জল,জ্বালানী কাঠ স--ব রাস্তায় ফেলে এলাম গো? এমন হবে কে জানত? বাঁচার আর কোনো উপায় নেই....."

বণিক মহা বিপদে পড়লেন। কিন্তু হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার লোক তিনি নন। চিন্তিত মুখে তিনি এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন।সূর্য উঠে গেছে।পায়ের নীচের বালি তাততে শুরু করেছে।আর খানিকক্ষণের মধ্যেই তা আগুন হয়ে উঠবে।

এমন সময়--ওটা কী? বণিক সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন এক জায়গায় দু-চার গাছি বড়ো বড়ো ঘাস জন্মেছে। বণিকের মনে একটু আশা দেখা দিল,"এখানে নিশ্চয়ই মাটির নীচে জল আছে, না হলে ঘাস কী করে হলো এই বালির মধ্যে?"

সঙ্গের লোকজনদের ডেকে বললেন,"শিগগির এখানটা খোঁড়। মনে হচ্ছে জল পাওয়া যাবে।"

যদিও সূর্যদেব এখন আগুন ছড়ানো শুরু করেছেন,তবুও জলের আশায় সবাই মিলে শাবল, কোদাল, গাঁইতি নিয়ে প্রবল উদ্যমে বালি খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়তে খুঁড়তে বিরাট গর্ত হয়ে গেল। কিন্তু জল কোথায়? এদিকে সুর্যের তাপ চড়চড় করে বাড়ছে। খিদে,তেষ্টায় সবার অবস্থা কাহিল। এইসময় কোদালের ঘা শক্ত কিছুতে পড়ল।বিরাট বড়ো একটা পাথর! আর আশা নেই! সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বণিক তখন গর্তে নেমে পাথরে কান পাতলেন। কী আশ্চর্য! কুলু কুলু জলের শব্দ! তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু পাথরটা ভাঙবে কে? সঙ্গের লোকজনের যা অবস্থা তাদের দিয়ে কি একাজ হবে? তিনি তখন তাঁর খাস চাকরকে বললেন, "দেখ বাবা,পাথরটা ভাঙতে পারলে এতগুলো প্রাণীর প্রাণ বাঁচে।"



অল্পবয়সি ছেলে, কাজে তার প্রচুর উৎসাহ। সর্বোপরি মালিক তাকে বলেছেন। অতএব চালাও গাঁইতি। ঘায়ের পর ঘা পড়তে লাগল পাথরে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে সমস্ত শরীর থেকে কিন্তু থামা চলবে না তার। একসময় পাথরের একটা কোণা ভেঙে গেল। কলকল করে জল বেরিয়ে আসতে লাগল সেখান থেকে। আ----! কী শান্তি! রান্নার জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাল গরুর গাড়ির ছই এর বাড়তি খড়গুলো।

সেদিন আনন্দে সকলের চান খাওয়া হল।

বিশ্রাম নিয়ে আবার রাতের পথ চলা।

তবে আজ আর পথপ্রদর্শকের ভুল হয়নি। সকাল হওয়ার আগেই বণিক তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছে গেলেন শহরে।

******

এই গল্প বলে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের কী শিক্ষা দিলেন?----তাঁর শিক্ষা হল কখনো কোনো অবস্থাতেই নিরুৎসাহ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে নেই। তাহলেই যে কোনো কাজে সফল হওয়া যাবে।

ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা



বরফঝড়ের রাত

নাতালিয়া ইউরকোভা
অনুবাদঃ ইন্দ্রশেখর

রাত্রে কে যেন বাইরে--উঠোন থেকে
উঠছিল হেঁকে হেঁকে?
সিংহেরা যেন মেতেছিল তরজায়?
দুমদুম করে থাবার ধাক্কা
দিয়েছিল দরজায়?

সকালে শহর হয়ে গেল কেন সাদা?
উঁচুউঁচু সব বরফের ঢিবি
দেখিয়ে বলেছে দাদা
এটা বাঘ আর এইটে ভালুক
ঐ যে ঢিবিটা? হাতি
কাল সারারাত করেছিল মাতামাতি
দোর ধরে নাড়া হাঁকহাকানির ধুম
সকাল হতেই বরফের বিছানাতে
দিয়েছে কেমন ঘুম!

ছবিঃ নাতালিয়া জৈইৎসেভা







বিল্লিনামা

টি এস এলিয়ট

অনুবাদঃ দেবজ্যোতি

বেজায় কঠিন জেনো রাখা বেড়ালের নাম
আলসের কাজ সেটা এক্কেবারেই নয়
ভাবতেই পারো আমি উদ্ভুটি, খ্যাপারাম
যদি বলি বেড়ালের তিনখানা নাম হয়

এক নং, যে নামেতে বাড়ির লোকেরা ডাকে
মঙ্গন, পুষি, ভুষি, উলিবল, খিল্লি
হনুমতি, প্যারেলাল,বংকুবিহারী, বাঁকে
উষিমন, খুশিমন, বেঁড়েপাকা, বিল্লি

এরা সব কেজো নাম হররোজ ডাকবার
তবে আরো ভালো নাম যদি লাগে মিষ্টি
ছোঁড়াক্যাট ছুঁড়িক্যাট নাম হলে রাখবার
দিতে পারো ঘনশ্যাম, দিতে পারো কৃষ্টি

এগুলোও কেজো নাম রোজ লাগে ডাকতে
একটি বাহারি নাম আরো হবে লাগাতে
আহ্লাদে লেজখানা খাড়া করে রাখতে
ডাক শুনে গোঁফগুলো গর্বেতে চাগাতে

সেরকম নাম চাই? দিতে পারি গোটাকয়
ধরো গিয়ে ইলবিলা, সিনিবালি, ট্রুবেনা
জাজাপিলি, হারুগথ, আনুবিস, বরাভয়
সেই নাম এক ছাড়া দুজনের হবে না।

তিন নং নাম? ভারী গড়বড়ে কেসটা
সেই নাম মানুষের বুদ্ধির বাইরে
জানবার সাধ হলে, যত করো চেষ্টা
সে নামের খোঁজ তুমি পাবে না গো ভাই রে

সে নাম কেবল নিজে জানে সেই দস্যি
বলবে না কিছুতেই যত করো যত্ন
যখন সে ধ্যানে বসে, মৌনি তপস্বী
জেনে রেখো জপে শুধু সেই নামরত্ন

একোমেবদ্বিতীয়ম আদিনাম মহানাম
মন তার ডুবে যায় খোঁজে তার মানে কী?
একোমেবদ্বিতীয়ম আদিনাম মহানাম
কে তাকে সে নামে ডাকে মার্জারও জানে কী?



ছবিঃ মৌসুমী

আমার আছে

রওশন মতিন



আমার আছে মুক্ত আকাশ, দূর দিগন্ত
আকাশ ভরা নীল
আমার আছে স্বপ্ন–সবুজ মাঠের ছন্দ
শাপলা ফোটা বিল



আমার আছে স্বপ্ন অশেষ সম্ভাবনা
বই,খাতা, ইস্কুল
আমার আছে বাংলা ভাষার গর্বগাথা
রবীন্দ্র–নজরুল।

আমার আছে স্বদেশ–মাটি, মায়ের আঁচল
বৈশাখী–রেল কুটুম বাড়ি,
আমার আছে বাবার আদর, মাটির পুতুল–
মেলায় কেনা মিষ্টি হাঁড়ি।



মহাকাশ অভিযান



অরুণাচল দত্তচৌধুরী

শহরে সবাই জানে,
মহাকাশ অভিযানে
যাবে আজ হারাধন মাস্টার।
আয়োজন প্রায় পুরো,
রকেট আর ধড়াচূড়ো,
কাঁধে বাঁধা অ্যাটমিক ব্লাস্টার।

কিছুটা সময় লাগে
যাত্রার আগে আগে
যাবে মহাজাগতিক অফিসে
মস্তিষ্কের স্মৃতি
ঘৃণা প্রেম সম্প্রীতি
সব কিছু করে দিল কপি সে

ক্লোন ছেলে দশখান
সবাই সুসন্তান
স্মৃতি পেলে আলো দেবে বংশে।
হারাধন জানত না
তাতে নেই সান্ত্বনা
আসলে নিজেই এক ক্লোন সে!

কম্পিউটার স্টেডি,
যন্ত্রপাতিও রেডি ...
সঙ্কেত ধরা ছিপ আঁকশি
অ্যান্ড্রোমিডার পাকে
তারই মাঝে এক ফাঁকে
ঘুরে নেবে পাশের গ্যালাক্সি!

হাইপারস্পেসএ ঢুকে
লাফ দেবে সম্মুখে।
ভাঁজ হবে সময় আর মাত্রা।
নতুন রিঅ্যাকটরে
জ্বালানি দিয়েছে ভরে।
এই বার শুরু হবে যাত্রা।

যাবে আলোকের বেগে।
হারাধন উদ্বেগে
বলে, "পারমানবিক বর্জ্য!
খুবই ক্ষতিকর ভাই,
অন্য জ্বালানি চাই,
তাতে হলে হোক ধারকর্জ!

শোনো শোনো ভাই সব
পরিবেশবান্ধব
জ্বালানির কারও নেই ধারণা।
অ্যান্টিম্যাটার পেলে
যাওয়া যায় হেসে খেলে
এর মত এত গুণ কারও না।

দূর নক্ষত্রের দেশে
পবিত্র পরিবেশে
মনে রাখা চাই কর্তব্য।
নইলে ভাববে তারা,
বড় পাজি এ ব্যাটারা।
মানুষেরা নয় মোটে সভ্য!"

অ্যান্টিম্যাটার খোঁজা
ততটা যে নয় সোজা
সেইটাই পৃথিবীর ভাবনা
খুঁতখুঁতে হারাধন
বড় দুঃখিত মন
জানিয়েছে, "তবে আর যাবো না"।

লোকটা

দেবাশিস বসু



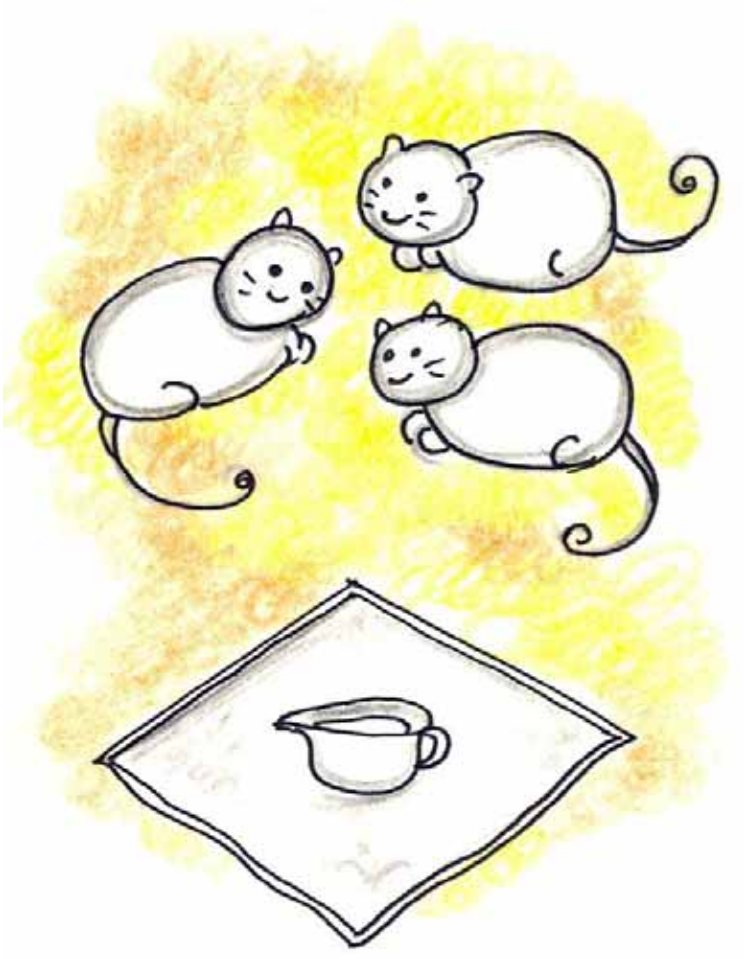
আছে এক পদ্যলেখক
বেচারা নয় মোটে ঠক
ছড়াতার লেখার যে শখ
লেখে খুব বিচ্ছিরি সে
বাড়ি তার বারাকপুরে
স্বভাবে ভবঘুরে
গান গায় বিকট সুরে
খেয়ে রোজ মিচ্ছিরি সে।
লেখা তার হয় না ছাপা
বুকে সেই দুঃখ চাপা
প্রাণে গান গা-মা-গা-পা
সকলে তুচ্ছ করে

প্রতিদিন গ্রীষ্ম-শীতে
নিঃস্ব নীল নিশীথে
বোতলে আর শিশিতে
জোছনার গুচ্ছ ভরে
ফি বছর চোত-বোশেখে
সাহারায় ক'দিন থেকে
সকালে জানায় ডেকে
এখানে ঠান্ডা কী যে!
লোকটার নাম কী জানো?
আনো এক আয়না আনো
হয়নি চুল আঁচড়ানো
লোকটা আমিই নিজে।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

ম্যাওবাচ্চা

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়



ছাদের ঘরে চিলেকোঠায়
ঢাউস চাদর বালিশ
বরফ বলের মতন সাদা
ম্যাওবাচ্চা আদর করে

হঠাৎ গিয়ে দেখি
তলায় নড়ছে ওটা একি!
ছোট্ট দু-তিনখানি,
চিবোয় কাঁথাকানি।

ভাইপো আমায় বলল,পিসি
নার্সিংহোম নেই যে ওদের
গেলাশ ভরে দুধ এনে তাই
খাইয়ে দিচ্ছি মুখ মুছিয়ে

কোথায় ওরা যাবে?
ওষুধ-বিষুধ পাবে।
ফিডিংকাপে ঢেলে,
নতুন রুমাল পেলে।

অবাক হয়ে বলি বাঃ বাঃ
নতুন রুমাল ভ্যানিশ্ ফিনিশ্
মুচকি হেসে ভাইপো বলে
‘ম্যাও’এ প্রেম করেই আমি

এ কীরকম ঠাট্টা?
মারব মাথায় গাঁট্টা।
করছি না ভয় ডর,
সেবিব ঈশ্বর!

ছবিঃ মৌসুমী

ছুটির গপ্‌পো

তাপসশংকর ব্রহ্মচারী



নকুড় মামার ইচ্ছে হল পাওনা ছুটি নিয়ে ,
কাটিয়ে আসেন বেশ কিছুদিন বিদেশেতে গিয়ে।
অবাক হল বাড়ির লোকে যারা তাঁকে জানে -
বাড়ি ছাড়া যাননি যিনি কোথাও কোনখানে ।
গোটা দশেক লাগেজেতে পোশাকআশাক ভরে -
সাজিয়ে মামা রাখেন গিয়ে নিজের শোবার ঘরে ।
ভাবেন মামা আপনমনে কোনখানেতে যাবেন -
যেখানেতে গেলে তিনি মনের খোরাক পাবেন ।
ইংল্যান্ড বা আমেরিকা, দেশ তো খারাপ নয় ,
অনেকটা দূর - এটাই বেজায় অসুবিধা হয় ।
মন্দ তেমন হয়না কিছু - চীনে গেলে পরে ,
ওরা কেমন পাঁচিল বানায় - দেখতে ইচ্ছে করে ।
জাপানেতেও যাওয়া ত যায় - সূর্যোদয়ের দেশ -
সানরাইজিং দেখে দেখে সময় কাটে বেশ ।
রাশিয়া তাঁর বড়ো প্রিয় - যেতে ত মন চায় -
মুশকিল ঐ সাইবেরিয়া - ঠাণ্ডাটা বেজায় ।
ভাবতে গিয়ে এসব কথা ছুটির আধখানা ,
কেটে গেছে কেমন করে ছিলই নাকো জানা ।
তার ওপরে বিদেশ যাওয়ার নিয়ম যেসব আছে ,
সারতে সেসব দ্যাখেন মামা পুরো ছুটিই গেছে ।
কী আর করেন , বিদেশ যাবার স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে -
সেজেগুজে বসেন মামা ছাদের ওপর গিয়ে ।

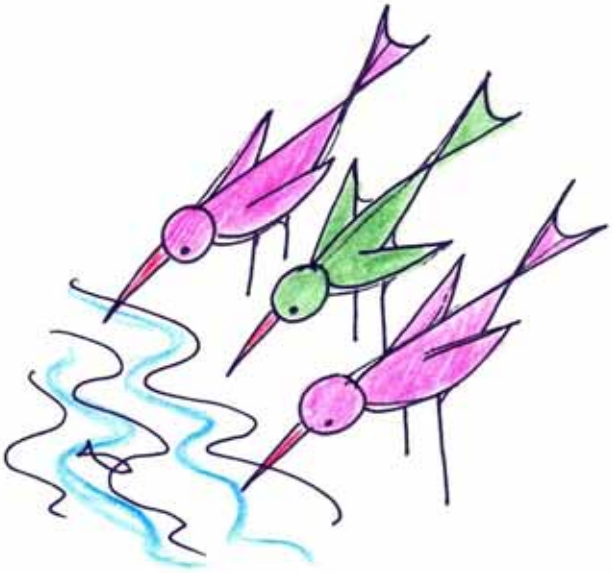
ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

পাখির গল্প

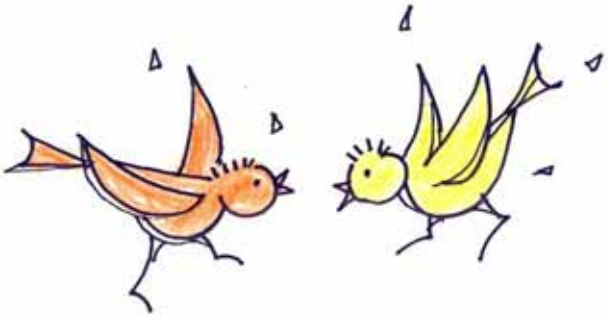
প্রসেনজিত চক্রবর্তী



চারটে পাখি একটা ছাতে
মাছ মারেনি, খাচ্ছে ভাতে
আলু সেদ্ধ, ইলশেগুঁড়ি
ভাতের পাতে ছড়িয়ে মুড়ি।



তিনটে পাখি, জলের ধারে
মাছ ধরবে, ছোঁ মারে
বেগুনপোড়া, ব্যাঙের মাসি
কলকে ধরায় হুক্কা-কাশি।



দুটোই পাখি, ঝগড়া করে
মাছ ধরবে কেমন করে
ঝিঙ্গে-পোস্তো কড়ায় পোড়া
জাবনা দেবো, হাতটা জোড়া।

রইলো বাকি একটা পাখি
জাবনা-টাবনা শুধুই ফাঁকি
মাছের গল্প বলাই খালি
পদ্য খতম, চোখের বালি।।



ছবিঃ মৌসুমী

ও চাঁদ

প্রিন্স মাহমুদ হাসান



ও চাঁদ তুমি কোথায় থাকো
সূর্য ওঠার দিনে
আমার মতো পড়ার ফাঁকে
পড়ছো কি বই কিনে?

তোমারও কি স্কুল ছুটি হয়
বাজলে ছুটির ঘণ্টা
জানো পড়ায় মন বসে না
নদীর কাছে মনটা।

জানো আমার বন্ধু হবার
সময় তো নেই কারো;
তোমার যখন স্কুল ছুটি হয়
বন্ধু হতে পারো?

বন্ধু হয়ে চলো না যাই
রূপকথার সেই বনে,
যেখানে কেউ পর নয় কারো
সবাই সবার মনে।

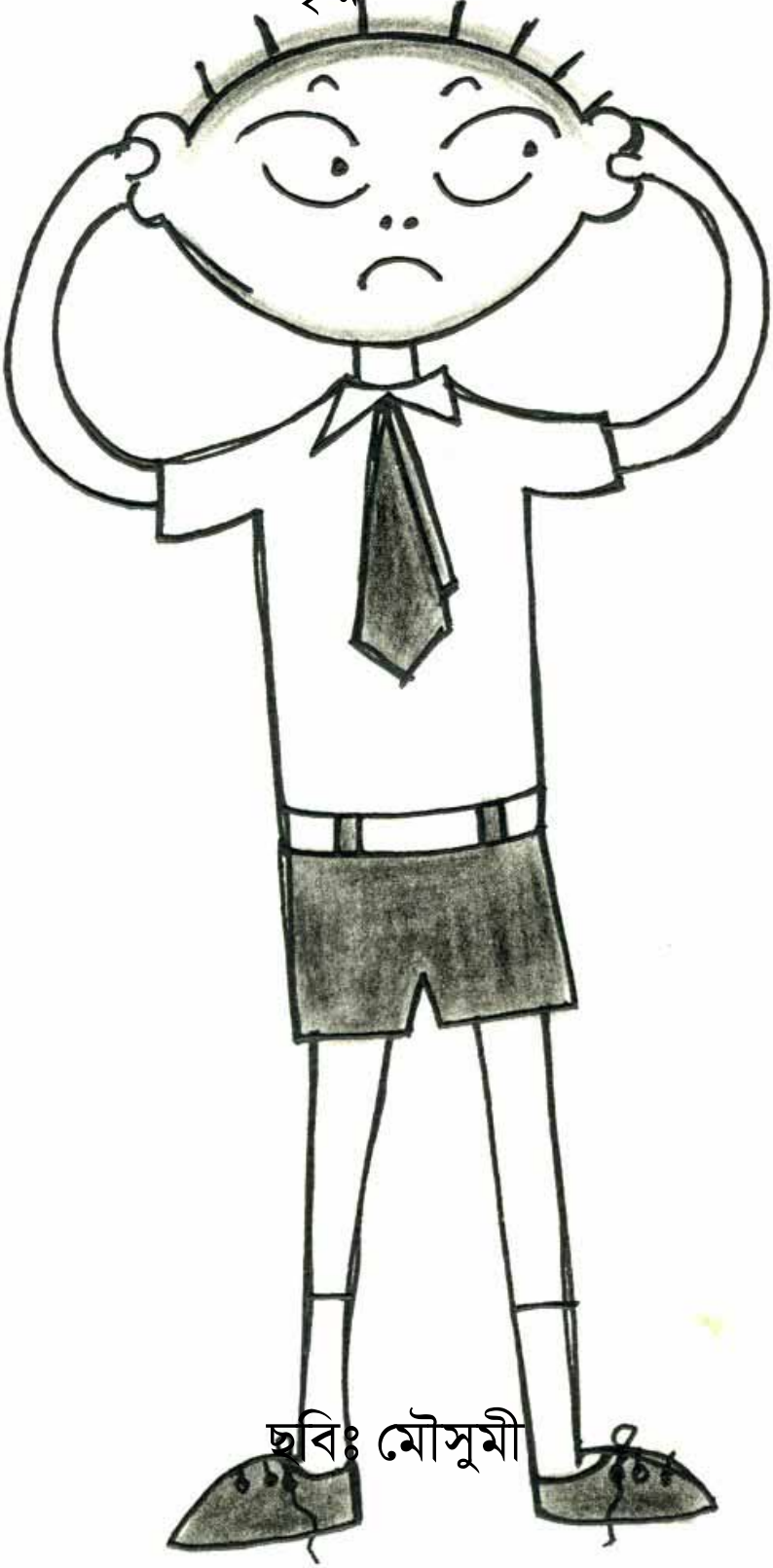
ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা

ইস্কুলে মুস্কিল

মৃন্ময় ঘোষ

ইস্কুলে মুস্কিল
আস্কিং পড়া,
দেয় হোমটাস্কিং
মিস খুব কড়া।
পড়াং না পারলে
অ্যানসার ভুললে,
ম্যাম বলে কান ধরে
বেঞ্চিং দাঁড়া।
গেট আউট, গেট আউট
স্যারেদের কী শাউট!
করিডোরে একা একা
স্ট্যান্ডিং খাড়া।

আমি টুক বড়ো হলে
সবকটা ইস্কুলে,
পিরিওড থাকবে না,
টিফিং-টা ছাড়া।

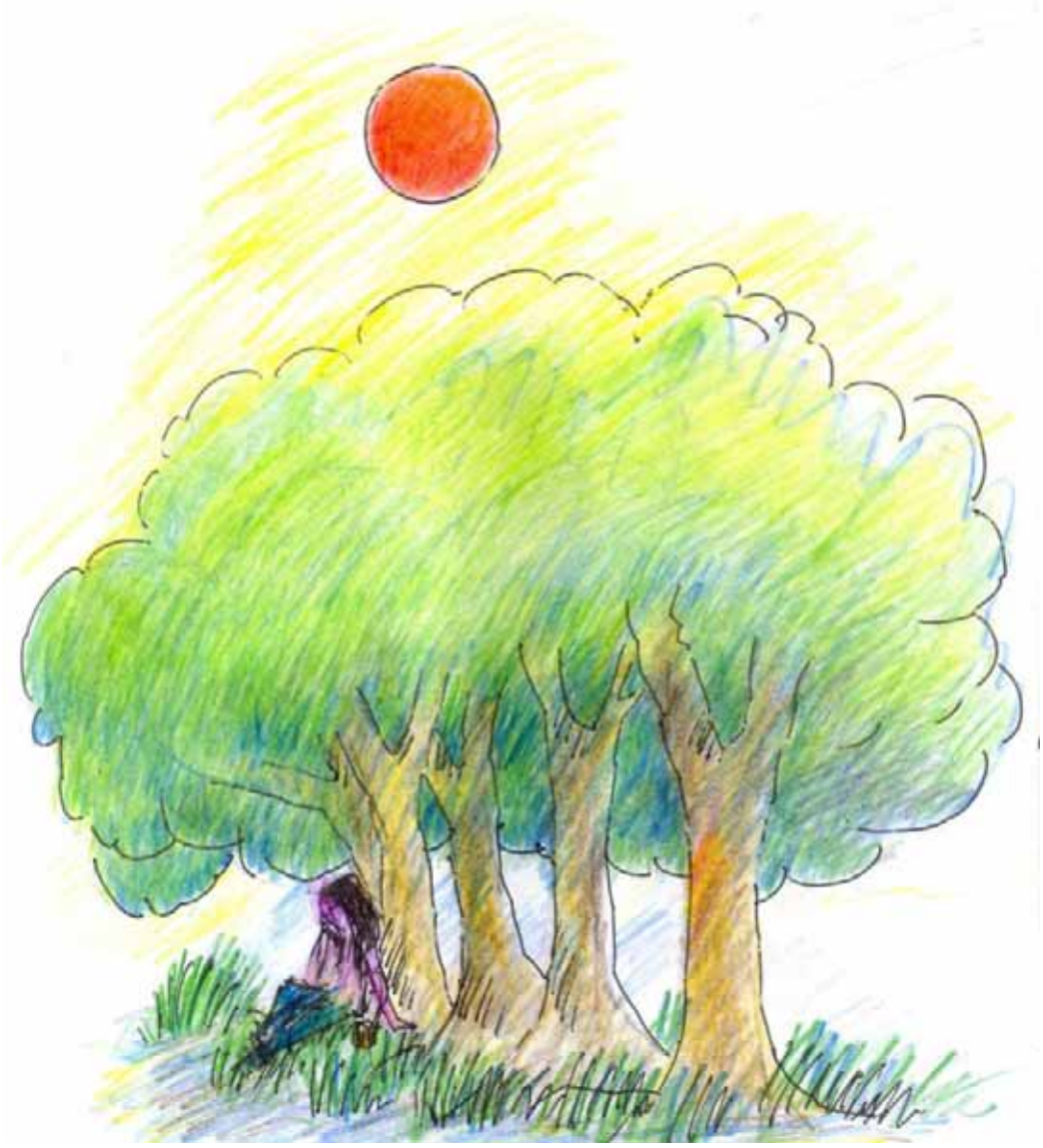


ছবিঃ মৌসুমী

দুরন্ত দুপুরে

রুচিস্মিতা ঘোষ

গ্রীষ্মের দুরন্ত দুপুরে
মাঠ-ঘাট মন যায় পুড়ে
খাঁ-খাঁ রোদ নিঃশেষে
শুষে নেয় প্রাণের শিশির
কান পেতে শুনি চারদিকে
ব্যথাশ্বাস বাতাসে নিবিড়।
তবু আমি ফিরি খুঁজে খুঁজে
কোনোখানে যদি মুখ গুঁজে
থাকে একটুও প্রাণের আবেগ
একটু ছায়ার মতন।
গ্রীষ্মের দুরন্ত দুপুরে
অবসাদ যদি মন জুড়ে
স্তব্ধতা শিকল পড়ায়
সাথীহীন পাখির গানের
সুর যদি ভেসে ভেসে যায়
দূর হয় সেই অবসাদ।
সন্ধ্যার শীতল বাতাসে
তাপে পোড়া মন যদি কাঁপে
হাওয়া হয়ে, হয়ে উষ্ণ শ্বাস
খুঁজে পাই রাত্রির আভায়
প্রশান্ত আঁধার একরাশ
প্রাণ পাই তারই ইশারায়।



ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা

নীলখামে আঁধারের কথা

মনসুর আজিজ

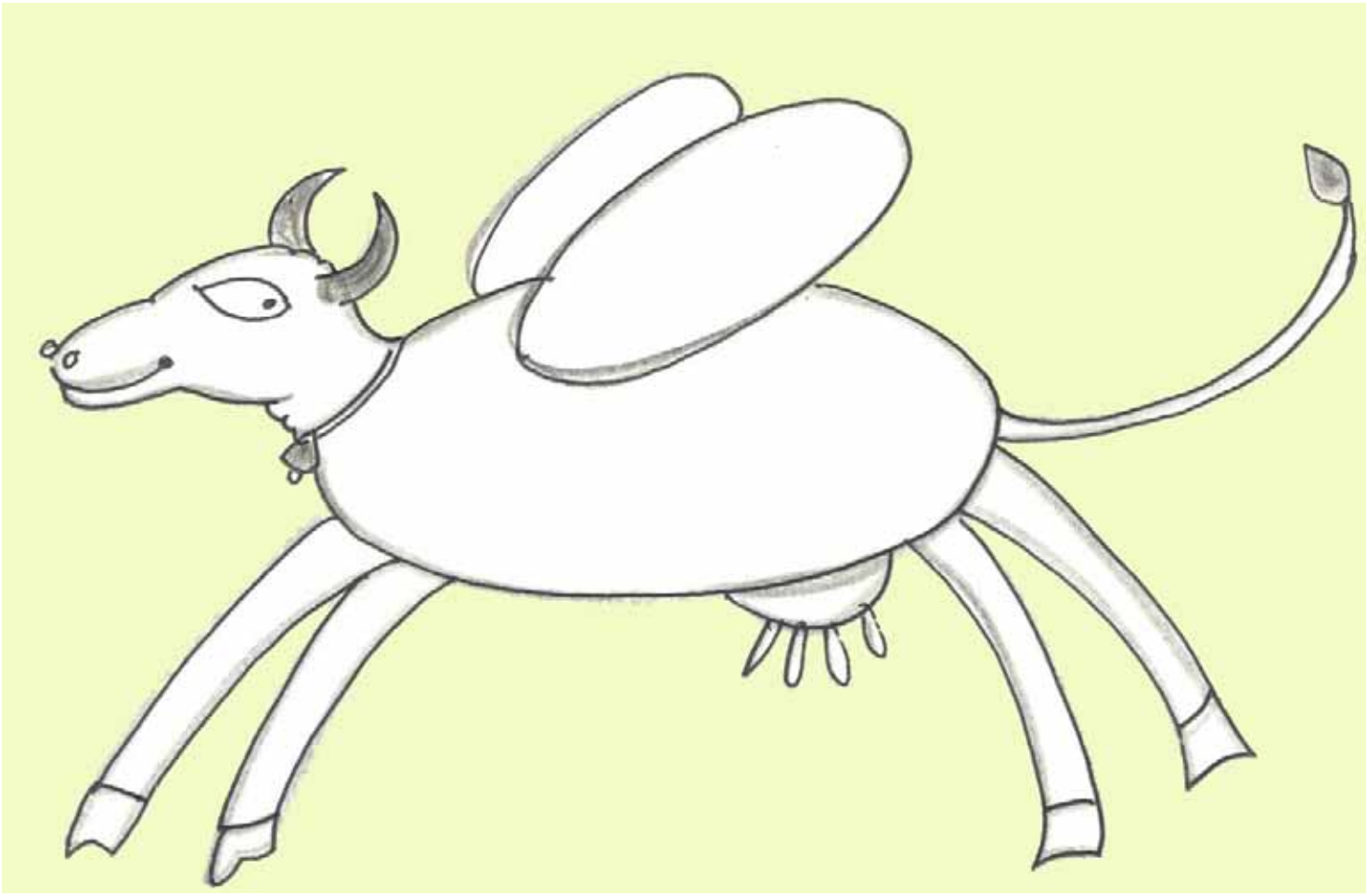
গাছে গাছে নাচে পাখি ডাল ভরা ফল
আম জাম কাঁঠালের সাথে আতাফল
খালবিল নদীতীর চিক রোদ্দুর
সেই দেশে যেতে আর বাকি কদ্দুর।
ডালে ডালে থোকা থোকা ফোটে কতো ফুল
শনপাতা বনপথে হৃদয় আকুল
ডুব দিতে খুব যদি মন চায় কারো
নতুন পানির খালে ঝাপ দিতে পারো।
জোসনা চাঁদের ফেনা দুই হাতে তুলে
ঝিঝিদের ডাক শুনে পথ চলে ভুলে
তরমুজ ক্ষেতে যদি ডানপিটে হও
নীলখামে আঁধারের কথা কিছু কও।
সূর্যের সাথে সাথে জাগে যেই দেশ
বাংলাদেশের বুকে সুখে আছি বেশ।



পক্ষীরাজ গোরু

কৌশিক ভট্টাচার্য

Roald Dahl *এর* The Cow *অবলম্বনে*



একটি গোরুর গল্প বলি মন দিয়ে তা শোন
এমনি গোরু ইতিহাসে আর পাবে না কোন।
নামটি ছিল পুঁটুরানি,বাচ্চা ছিল ভারি,
সাতমাসেতে যখন এল আমাদের এই বাড়ি।

ছোট্ট থেকেই পুঁটুরানির ইচ্ছে ছিল ঠিক
যৌবনে সে গোরু-ই হবে, সুস্থ-স্বাভাবিক!
ইচ্ছে এমন সক্কলেরই হতেই পারে, তবে
তাই বলে কি চেয়েছ কেউ গোরু-র মত হবে?
চাইলে পরে, দেখবে শেষে, ব্যাপারটা অদ্ভুত
গোরু হওয়া অতই সোজা? থাকবে কোন খুঁত!
ওর বেলাতেও বলতে গেলে ঘটেই গেলো তাই
পুঁটুরানি বনল না আর ঠিক সাধারণ গাই।

এমনি তো সব ঠিকই ছিল,গোরুর যা যা হয়
যেমন ধর, চারখানি পা,পাঁচটা-ছ'টা নয়।
ছোট্ট থেকেই লেজ ছিল তার একটি শুধু মোটে
তোমরা বল, কোনো গোরু-র এর বেশি কি জোটে?
চোখ ছিল ঠিক চোখের মত,নাকের মতো নাক
শুদ্ধ গোরু হবার পথে একটি শুধু ফাঁক।
মস্ত দুটো পিন্ড ছিলো পিঠের দুটো ধারে
যত-ই পুঁটু হচ্ছে বড়ো,শরীর যত বাড়ে
পিন্ডদুটো চললো বেড়ে কী ভয়ানক rate-এ!
বেলুন হয়ে দুটো-ই বুঝি এবার যাবে ফেটে!

এমনি করে দিন কেটে যায়, এগার মাস পরে
পুঁটুরানির জাবনা নিয়ে গেছি গোয়ালঘরে,
চোখের পরে ঘটল এটা, বোঝো ব্যাপারখানা!
পিন্ড ফেটে বেরিয়ে এলো মস্ত দুটো ডানা!
সোনালী আর রুপালি রং, দেখতে অপরূপ
কান্ড দেখে আমি তো ভাই বিস্ময়েতে চুপ!
সারাজীবন আজগুবি সব গল্প শুনি কত

এমন গোরু কেউ দেখেছে পক্ষীরাজের মত!
আমায় আরও অবাক করে পাখনাদুটো ঝেড়ে
উঠল পুঁটু নীল আকাশে মাটির মায়া ছেড়ে
পাক লাগাল,গোঁত্তা খেল, চর্কি দিয়ে ঘুরে
স্পিড বাড়াল,গোলার মত উঠল গিয়ে দূরে!

এক নিমেষে মুখেমুখেই খবর গেল ছুটে
হাজার লোকে,সাংবাদিকে,সবাই গেল জুটে
যারাই দেখে পুঁটুরানির পক্ষী হয়ে ওড়া
তারাই বলে,"অদ্বিতীয়,আর পাবে না জোড়া!"
টিভির বিশেষজ্ঞ যারা,জ্ঞান দেওয়া-টা কাজ
বলল তারা,"ঘোড়া তো নয়,গোরুই পক্ষীরাজ।"
সবাই বলে "অসাধারণ!",চতুর্দিকে খালি
সবাই তোলে ভিডিও আর বাজায় হাতে তালি।

একটি শুধু বেঁড়েপাকা, মুখটি থেলো হাঁড়ি,
বাঙালি নয়, বিদেশী, উজ-বেকিস্তানে বাড়ি।

লোকের ভিড়ে পাকামি তার হঠাৎ গেল চড়ে
দাঁত খিঁচিয়ে সবাইকে সে শুনিয়ে বলে জোরে,
"উড়ছে দ্যাখো ! শখ বেড়েছে! মরবে শুধু ঘেমে!
পাঁঠামি ছাড় বলছি পুঁটু, আয় এখানে নেমে!"

মাটির থেকে অনেক দূরে, লোকের কলরব,
সব ছাপিয়ে পুঁটুরানি শুনতে পেল সব।
যদিও তার রংটি সাদা,লাল হল সে রেগে
নামল নীচে,ঘন্টাতে তা মাইল ষাটেক বেগে
দর্শকেদের মাথার উপর একটি দিয়ে পাক
চরকি খেয়ে,"হাম্বা" বলে গর্জে দিল হাঁক,
"তাই নাকি রে,সাহস এত,আমায় করা মুখ!
কে ব্যাটা তুই হতচ্ছাড়া বিদেশী উজবুক?
বড্ড বেশি বাড় বেড়েছে,তাই না এত গলা!
গোরুর রানি পুঁটুরানি -- আমায় পাঁঠা বলা!
দেখবি মজা? বোঝ এবারে! বোম দিয়েছি ফেলে!"
এই না বলে মুন্ডুতে তার গোবর দিল ঢেলে!!

(মূল লেখাতে গোরুর নাম Milky Daisy । অনুবাদে পুঁটুরাণী নামটির আইডিয়া রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার থেকে নেওয়া। Dahl এর মুল লেখাতে বেঁড়েপাকা ব্যক্তিটির বাড়ি হলো আফগানিস্তানে। আমি সেটিকে পাল্টে উজবেকিস্তান রেখেছি শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতে উজবুক শব্দটির বিশেষ ব্যঞ্জনার জন্য। "পক্ষীরাজ" আমার সংযোজন। (

ছবিঃ মৌসুমী



ধাঁধা

প্রথম ধাঁধা

তুমি আর তোমার চার বন্ধু মিলে প্যারামাউন্টে শরবত খেতে গেছ। মেনুকার্ডে দেখা গেল নটা নতুন ধরণের বিদেশি শরবত আছে। তাদের কোনটা কী দিয়ে তৈরি সেসব রেসিপি গোপন ব্যাপার। প্রত্যেকের রঙ আলাদা। তাদের নাম কেলুরাম, পিণ্ডারি, হৈহয় , গারুন্টাক, আইলিম, ডুন্ডুভ, দুন্দুভি, রামরাজত্ব আর প্যাঁদানি। দোকানদার বললেন, শোনো হে ছোকরারা, প্রতি রাউন্ডে একেকজন একটা করে শরবতের অর্ডার দিতে পারবে। তবে হ্যাঁ, পাঁচজনের অর্ডারি শরবত একটা ট্রেতে করে এনে দেয়া হবে। কোনটার নাম কী বলে দেয়া হবে না। তিন রাউন্ডের পর পাঁচটা শরবতের একটা করে গেলাস সামনে এনে সাজিয়ে দেব। কোনটার কী নাম যদি বলে দিতে পার তবে তোমাদের শরবত উৎসব ফ্রি।
পারবে নাকি?

দ্বিতীয় ধাঁধা

অনাথ আশ্রমে থাকে অসীম। সেখানে রোববারে যতখুশি কাপকেক খেতে দেয়। প্রত্যেকটা কাপকেক খেলে বাটিতে তাতে খানিক অবশিষ্ট পড়ে থাকে। দেখা গেছে, তিনটে কাপ কেকের অবশিষ্টাংশ চেঁছেমুছে একত্র করলে একটা গোটা কাপকেক হয়। সেইটেকে খেলে আবার বাটিতে একটা কাপকেকের অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে।
এক সোমবার অসীম বসে বসে দেখছে তার কাছে দশটা অবশিষ্টাংশের বাটি পড়ে আছে। তার ইচ্ছে সে পাঁচটা গোটা কাপকেক খায়।
এতে তো পাঁচটা গোটা কাপকেক হবে না! পাশের বেডের সুশান্ত ভারী গুণ্ডা। তার কাছে অনেকগুলো কাপকেকের অবশিষ্টাংশ আছে। অসীম বলল, “আমায় কটা দিবি রে?”
“আমার থেকে একটাও যদি কমে তাহলে এমন পেটাবো না!” সুশান্ত বাঁকা হেসে বলল।
অসীম তাও তার থেকে ধার নিল, কিন্তু খাওয়ার শেষে দেখা গেল সুশান্তর ভাগের একটাও কমেনি। কী করে হল?

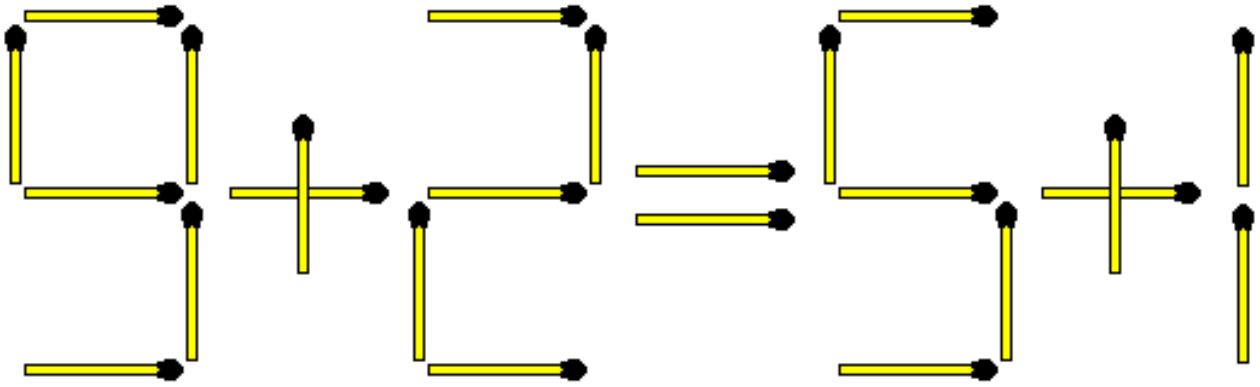
তৃতীয় ধাঁধা

তোমায় তোমার আট সৈনিকের সঙ্গে রাজা গ্রেফতার করেছেন। তারপর জানিয়েছেন, আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তোমাদের মরুভূমির মধ্যে একটা চৌরাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসবেন। সেখান থেকে উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিমে চারটে রাস্তা যায়। চারটেতেই আট ঘন্টা হাঁটলে একটা করে গ্রামে পৌঁছোবে। ওর মধ্যে একটা গ্রামের নাম জীবনগ্রাম। সেখানে যদি পৌঁছোও তাহলে তোমরা বাঁচবে, আর বাকি গ্রামগুলোয় পৌঁছোলে হয় তোমাদের ফের ফিরে আসতে হবে চৌরাস্তায় আর নাহয় ফাঁসি যেতে হবে। রাস্তা ছেড়ে এলোমেলো ঘুরলে মৃত্যু। তোমাদের হাতে সময় চব্বিশ ঘন্টা। এর মধ্যে সঠিক গ্রামে না পৌঁছোলে ফাঁসি। চৌরাস্তায় জ্ঞান ফিরতে দেখলে রাজা তোমার পকেটে একটা স্লিপ দিয়ে রেখেছেন। তাতে লেখা, তোমার দলের দুটো লোক আমার হয়ে স্পাইগিরি করছে। তারা তোমায় ঠিকও বলতে পারে, ভুলও বলতে পারে।সত্যি বা মিথ্যে কথা বলবার ব্যাপারটা ছাড়া তারা তোমার আর সব আদেশ মানবে কিন্তু তারা চায় তুমি জীবনগ্রাম খুঁজে না পাও।

তুমি কী করবে এবারে? বাঁচবে কেমন করে?

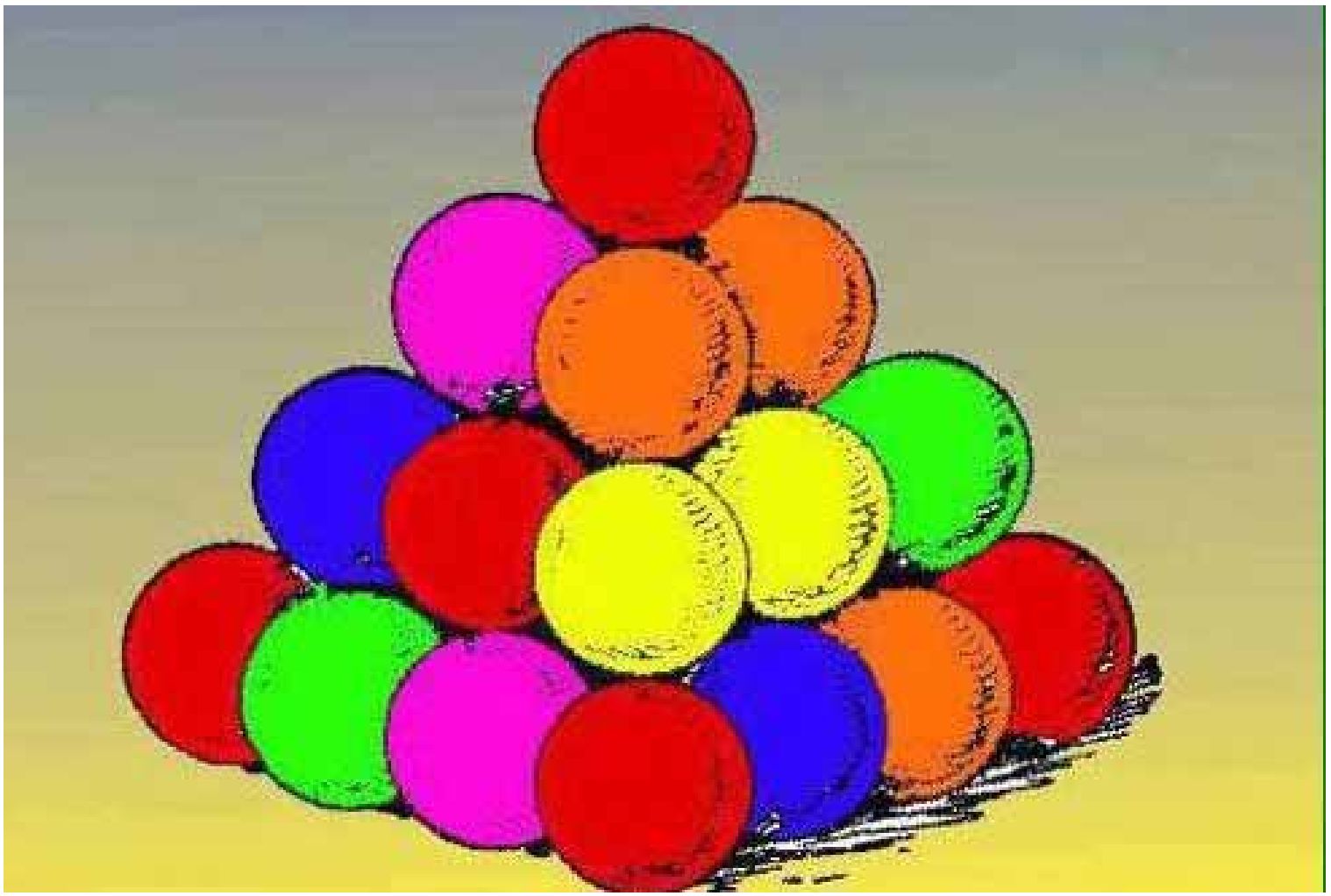
চতুর্থ ধাঁধা

নীচের অংকটা ভুল।একটা কাঠি সরিয়ে সেটাকে ঠিক অংকে বদলে দাও (তিনটে উত্তর হতে পারে।)



পঞ্চম ধাঁধাঃ

এখানে কটা বল আছে?



ষষ্ঠ ধাঁধাঃ

লম্বা গলা পেটটা বিশাল
মুখের ছিদ্র সুচি
দাঁত জিভ নেই রাতের বেলা
তরল খাবার রুচি।
খাবার হলে বন্ধ তার
রাতের বেলায় অন্ধকার

সপ্তম ধাঁধা

ফল আছে জল আছে পাতা?
আছে তাও
ধোঁয়া কি আগুন, জল যা চাবে
তা পাও

দোতলাটা খাড়া ভারী একতলা গোল
মুখে মুখ রেখে বলে একটাই বোল

অষ্টম ধাঁধা

এসে দেখি তোরা নেই,
এলি খেলি নাওয়ালাম
ধোয়ালাম
তবু ফের চলে গেলি
যাবার সময় আবার দেখি
তোরা কেউ নেই

নবম ধাঁধা

খালেবিলে তোর বাসা
মোর বাসা গাছে
মরণে মিলন হবে
ভাগ্যে লেখা আছে
হস্ত নাই পদ নাই
তোমার আমার
দোঁহে বিয়া দিয়ে খায়
দ্বিপদ চামার

দশম ধাঁধা

তুমিও যেমন আমিও তাই
দেখতে দুটি যমজ ভাই
আমার জন্ম, তোমার নাই
তোমার মুখে বাক্য নাই
আমার আছে জনম মরণ
হস্তপদ পেট
তোমার কেবল বদনখানি
তাও হয় না হেঁট



কিছু অবিশ্বাস্য অগ্ন্যুৎপাতঃ

পুয়েহুই-
চিলি ২০১১



মাউন্ট অগাস্টিন
আলাস্কা ২০০৬

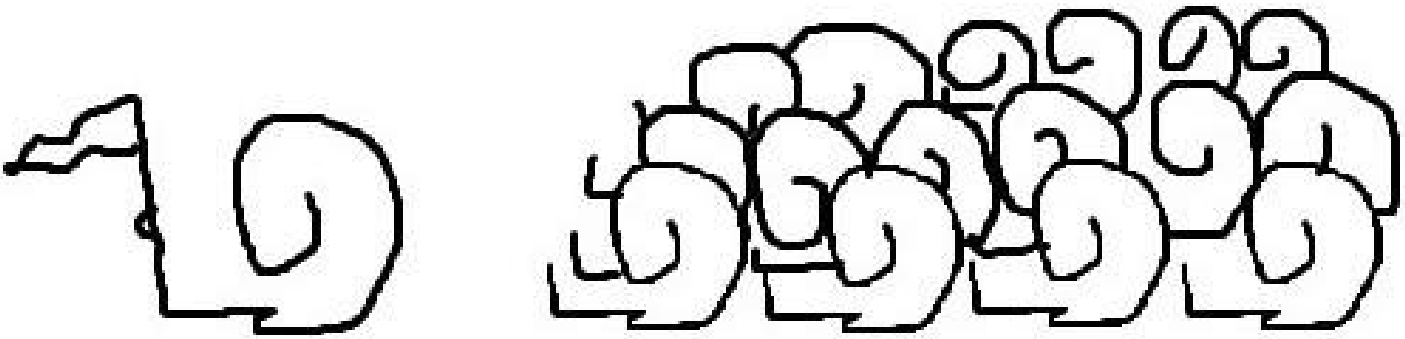


ইয়াফাজালোকুল
(Eyjafjallajoku)l
আইসল্যান্ড ২০১০



পুয়েহুই-
চিলি ২০১১

ড্রুডল -এটা কী হতে পারে?



মগজ ধোলাই

রণিত পাল

১) ২০০১ সাল থেকে চালু হওয়া এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক ছিলেন শৈলেন মান্না।চলতি বছরে, এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সৈয়দ নঈমউদ্দিন।কোন পুরস্কারের কথা বলছি,যা প্রতিবছর সাধারণভাবে ২৯শে জুলাই প্রদান করা হয়ে থাকে।

২) পেশায় চিকিৎসক এই ভদ্রলোক, রুগীদের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে লেখালিখি করতেন।১৮৮৭ সালে তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং তা এতটাই সাড়া ফেলে দেয় যে তাকে বাধ্য হয়ে প্র্যাকটিস্ বন্ধ করতে হয়।অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তার ফার্স্ট-ক্লাস ক্রিকেট কেরিয়ার দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, ঝুলিতে থাকা একমাত্র উইকেটটি মহামান্য ডব্লিউ জি গ্রেসের।কার কথা বলছি?

৩) যদি চাচা চৌধুরী=রকেট হয়, তবে বাঁটুল দি গ্রেট=?

৪) কার আত্মজীবনীর নাম ‘যত দিন বাঁচি’?

৫) আকাশবাণী কলকাতা, একবার মহালয়াতে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠান, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বদলে সেই সময়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা একজন মানুষকে দিয়ে করিয়েছিল।এর ফলস্বরূপ আকাশবাণী কলকাতার দপ্তর ভাঙচুর হয় এবং কর্তৃপক্ষ তার পরের বছর থেকে অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য পুনরায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।হতভাগ্য মানুষটি কে ছিলেন?

৬) কোন বিখ্যাত লেখকের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল, ইংরাজী উপন্যাস রাজমোহন’স ওয়াইফ দিয়ে?

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

প্রথম ধাঁধা

আগুনজ্বলা একটা ডাল নিয়ে তার পুবদিকের ঘাসে আগুন দেবে। পশ্চিমের হাওয়া তাকে তাড়িয়ে নিয়ে তার পুবদিকের জঙ্গল সাফ করে দিলে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াবে। অপশ্চিমের আগুন আর এগোতে পারবে না।

দ্বিতীয় ধাঁধা

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ
হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ
হ্যাপি বার্থ ডে টু আন্নাকালী
হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ

তৃতীয় ধাঁধা

দারোয়ানের প্রশ্নের শব্দে অক্ষরের সংখ্যা ছিল পাসওয়ার্ড। উত্তর হবে পাঁচ।

চতুর্থ ধাঁধা

দারোয়ান কুঠুরিতে ঢুকতেই লোকটা ব্রিজের ওপর দিয়ে চার মিনিট বাইরের দিকে হাঁটবে। তারপর পেছন ঘুরে দুর্গের দিকে ফিরে আসবে। পাঁচ মিনিটের মাথায় দারোয়ানবেরোলে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইবে। দারোয়ান কাগজ চাইলে বলবে নেই। তখন দারোয়ান তাকে ব্রিজ পার করে বাইরে পাঠিয়ে দেবে।

পঞ্চম ধাঁধাঃ দুটো। কারণটা নিজে ভাবো।

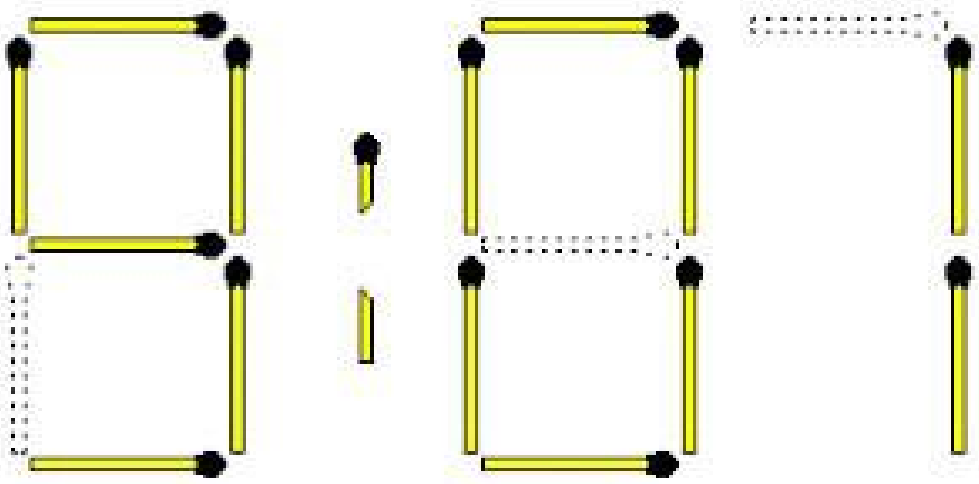
ষষ্ঠ ধাঁধাঃ পাসওয়ার্ড ছিল, "একেবারে অন্যরকমের"।

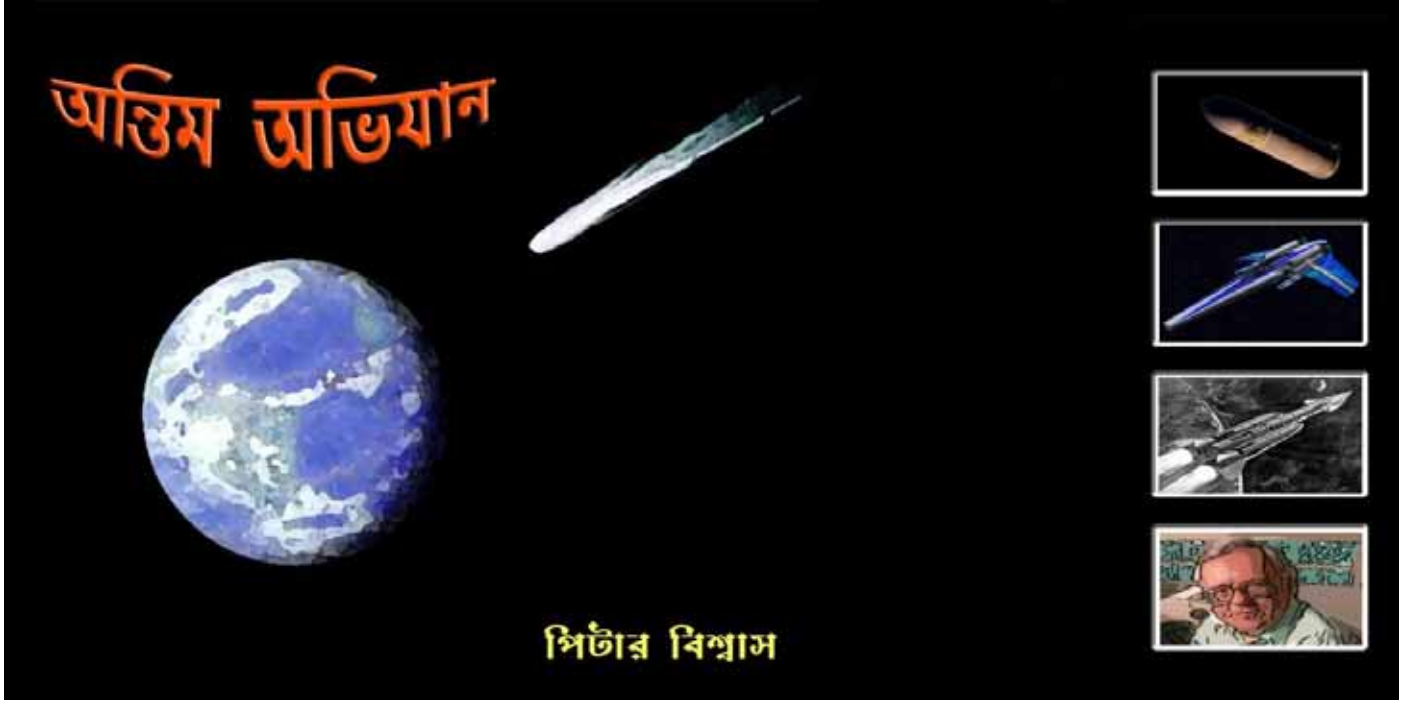
মগজ ধোলাইঃ

১)'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' ২)রোয়িংটন-ব্যারিয়ার ট্রফি ৩)নীল ৪)সিধু জ্যাঠা ৫)'লন্ডনে ফেলুদা' ৬)সন্দেশ ৭)গ্রিক ৮)প্রখর রুদ্র ৯)তপেশরঞ্জন দত্ত ১০)'সোনার কেল্লা'

ড্রুডলের উত্তরঃ ললিপপ ফ্যামিলি হাওয়া খেতে যাচ্ছে।

দেশলাইকাঠির খেলঃ





"যানে স্বাগত জুনিয়র পোন," টাইকো ফের একবার কথা বলে উঠেছে।

"জবাব দে ক্রিস্টোফার। তোকে বলছে।" কা পোন ছেলেটার মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে দিলেন একবার। দুর্ভাগা ছেলেটা জানে না যে আজ ও সত্যিই অনাথ হয়েছে। প্রফেসর বোসের ধুলো হয়ে যাওয়া শরীরটা এখন মিশে আছে কয়েক মাইল দূরের ওই পাহাড়ের মাটিপাথরের গায়ে।

কথাটা মনে হতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল কা পোনের। ছেলেটা জানে না, কত কঠিন কাজ রয়েছে তার সামনে। ওই কিশোর মানুষটার ওপরেই পৃথিবীকে রক্ষা করবার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন প্রফেসর। আর তাকে দিয়ে গিয়েছেন ওকে বড়ো করে তুলে নির্দিষ্ট সময়ে তার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেবার কাজ প্রফেসর তার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। ওর পকেট থেকে পাওয়া কাগজের টুকরোটায় প্রফেসরের চিঠির শেষ লাইনগুলো তার চোখের সামনে ভাসছিল-

"– মহাকাশবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা যেন পায় ও। তারপর নির্দিষ্ট সময় এসে হাজির হলে ওর গলার তাবিজে সংরক্ষিত প্রতিষেধক খাইয়ে ওর স্মৃতি ফিরিয়ে দেবে তুমি। মনে রেখো তারপর ওকে যে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে তার ওপরে পৃথিবীর ভবিষ্যত নির্ভর করছে। জিষ্ণু আমাদের শেষ অস্ত্র। তাকে রক্ষা করবার, গড়ে তোলবার সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম–"

"আ-আমাকে?"

"হ্যাঁ রে ব্যাটা। তোকে। কোন দুর্ঘটনায় কীভাবে তুই নিজের পরিচয় খুইয়েছিস কে জানে। আজ থেকে তুই আমার ছেলে ক্রিস্টোফার। এই পরিচয়েই তোকে সবাই জানবে এখন থেকে।"

ছেলেটা চুপ করে বসে রইল। ওর মনের মধ্যে কী চলছে তার আন্দাজ করতে পারছিলেন কা পোন। হঠাৎ খোলা গলায় ফের হেসেউঠে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে তিনি বললেন, "আরে এত গোমড়া মুখে বসে থাকলে হবে? জীবনটা তো একটা খেলা রে! নতুন জীবন, নতুন কাজ! তবে হ্যাঁ। বসে থাকা চলবে না তোর। সব তো ভুলে বসেছিস। তাহলে চলবে কী করে? পড়াশোনা করতে হবে তোকে নতুন করে। আয় দেখা যাক কতটুকু কী জানিস তুই। টাইকো কিন্তু কুকুর হলেও খুব ভালো শিক্ষক। ওর হাতেই শুরু হোক তবে। টাইকো–"

৭
২১২৪ খ্রিস্টাব্দ

টেবিলের ওপরে ছোটো বাক্সটা মৃদু সিঁ-ই-ই করে একটা আওয়াজ করে উঠল একবার। বাবার কল নিশ্চয়। সেই কলেজে যাবার পর থেকে এতগুলো বছর কেটে গেল, কিন্তু আজও সকালবেলা এই ঘুম ভাঙানোর

কাজটা বাবা করবেই। পৃথিবীর যেখানে থাকুক না কেন, এ ফোনের বিরতি নেই। একবার সকালে ডাকল, তখন ক্রিস্টোফার দেখে কমিউনিকেটরের পর্দায় গভীর জঙ্গল। জিজ্ঞাস করতে বাবা বলে, "আমাজনে ক্র্যাশল্যান্ড করেছি আজ ভোরে।" তবু ভোরবেলা তাকে ডাকার রুটিনে অদলবদল হয়নি।

ঘুম চোখে হাত বাড়িয়ে সেটাকে কাছে টেনে আনতেআনতেই ক্রিস্টোফার সটান উঠে বসল এবারে। মৃদু বিকর্ষণক্ষেত্রের অদৃশ্য গদিটা নিজের অবস্থান বদলে তার পিঠের কাছে হেলে উঠেছে।

আরাম করে তাতে হেলান দিয়ে বসে চারপাশে একবার ভালো করে চেয়ে দেখল সে। সুনীলের ঘুমন্ত শরীরটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে এদিকওদিক দুলছে। সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসল ক্রিস্টোফার। ঘুমের মধ্যে দোল খাওয়াটা সুনীলের অনেককালের অভ্যাস। কলেজের হস্টেল থেকেই তারা চিরকালের রুমমেট। সেখানেও সেই একই অভ্যাস দেখেছে। তারপর, এতটা বড়ো হয়ে, যশপাল মহাকাশগবেষণাকেন্দ্রের একজন নামি বিজ্ঞানি হয়েও সে অভ্যেসটা গেল না তার। যেখানে যাবে, সবার আগে নিজের বিকর্ষণ শক্তিক্ষেত্রের গদিটাকে আগে রিপ্রোগ্রাম করবে ঘুমের মধ্যে দোল খাবার জন্য।

আওয়াজটা পেয়ে সুনীলও জেগে উঠেছিল। ভাসতে ভাসতে তার কাছে এসে বলে, "মাঝরাত্তিরে অ্যালার্ম বাজাচ্ছিস কেন রে?"

"মাঝরাত? মানে?" বলতেবলতেই কমিউনিকেটরের এক কোণে জ্বলতে থাকা ঘড়িটার দিকে চোখ গিয়েছে ক্রিস্টোফারের। সেখানে দেখাচ্ছিল রাত দুটো। বাবার আজ হল কী? কোন অ্যাক্সিডেন্ট টেন্ট-

একটু বিরক্ত হয়েই বাক্সের গায়ের বোতামটা টিপে ধরল জিষ্ণু, "কী হল বাবা? এত রাতে-" পর্দায় ততক্ষণে টাইকোর কুকুরের মুখটা ভেসে উঠেছে। গম্ভীর হয়ে তাকিয়েছিল সে জিষ্ণুর দিকে।

"নে। তোর মাস্টারমশাই এসেছেন। কথা বলতে থাক। আমি ঘুমুই গিয়ে-"

মুচকি হেসে হাতের একটা ইশারা করতেই বিছানাটা সুনীলকে নিয়ে ভেসে গিয়ে একেবারে ছাদের কাছাকাছি ঝুলে রইল। সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসল ক্রিস্টোফার। ছোটোবেলায় সে যে কোন স্কুলে যায়নি সেকথা সকলেই জানে। বছরচারেক আগে,বর্ধমানের মহাকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাবার সময় ফর্মে এ তথ্যটা দেবার পর তার বাবাকে ডাকাও হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফে। কোনদিন স্কুলের শিক্ষা না পাওয়া কোন ছাত্র নিজের চেষ্টায় পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন প্রবেশিকা পরীক্ষাটায় একশো শতাংশ নম্বর পেয়েছে তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মিস্টার কা পোন নিজে এসেও সে তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে গিয়েছেন।

তার পড়াশোনাটা যে ঠিক কার কাছে হয়েছে সে খবরটা জিষ্ণু শুধু সুনীলকেই জানিয়েছে। সুনীল তার প্রাণের বন্ধু। কিন্তু তবু খবরটা শুনে সে অনেকক্ষণ হো হো করে হেসেছিল। বলে, "একটা যন্ত্রকুকুরের প্রোগ্রাম তোকে পড়িয়েছে? ধুস!"

তবে তার পর এতগুলো বছর ধরে আস্তে আস্তে টাইকোর কাছ থেকে বেশ কিছু মুশকিল আসান হবার পর সে-ও টাইকোকে একটু সমীহই করে চলে। বিশেষ করে পরীক্ষাগুলোর আগে তার কাছে টাইকোর খাতির যথেষ্টই বেড়ে ওঠে। তবে মজাটা সে এখনো করতে ছাড়ে না।

"এত রাত্রে আমায় ডাকলে কেন টাইকো?"

পর্দায় টাইকো মৃদু গরগর করে উঠল একবার, "কয়েকটা জরুরি কথা তোমাকে জানানো দরকার জুনিয়র পোন। তোমার কালকের ইনটারভিউয়ের ব্যাপারে। মালিকের একটা ইচ্ছে তিনি তোমাকে জানাতে বলেছেন।"

"বাবার? কী ইচ্ছে?"

"তুমি সুইফট টাটল ধূমকেতুর বিষয়ে কী জান?"

ক্রিস্টোফার মৃদু হাসল। গত বছরদুয়েক ধরেই এই গুজবটা চলছে। সুইফট টাটল নাকি পৃথিবীর সঙ্গে সরাসরি ধাক্কার গতিপথে রয়েছে। ব্যাপারটা অবশ্য গুজব, কারণ–"

"তুমি কী ভাবছ আমি জানি ক্রিস। তব জেনে রাখো, বিষয়টা গুজব নয়।"

ক্রিস্টোফার একটু অবাক হচ্ছিল। কা পোন নিজের ব্যাবসাবাণিজ্য নিয়ে থাকেন। মহাকাশবিদ্যা তাঁর এলাকা নয়। তবুও তিনি তাকে একরকম জোর করেই বর্ধমানে পাঠিয়েছিলেন বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনার জন্য। হয়ত কোন অধরা স্বপ্ন ছিল তাঁর, তাই পূরণের চেষ্টা করছেন পালিত ছেলেটিকে দিয়ে। কথাটা ভেবে ক্রিস্টোফার তাঁর ইচ্ছেয় কোন বাধা দেয়নি। সেখান থেকে এই যশপালে পিএইচ ডি করতে আসাটা অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। তার আর সুনীলের রেজাল্ট দেখে এখান থেকেই অফারটা যায়।

কিন্তু আজ হঠাৎ একটা গুজব নিয়ে কী ইচ্ছে জানাতে বসলেন তিনি? সে মাথা নেড়ে বলল, "ভুল করছ টাইকো। গ্লোবাল কমপিউটার বুদ্ধকে দিয়ে সমস্ত তথ্য বারেবারে পরীক্ষা করা হয়েছে। ওটা গুজব। পৃথিবীর এক মিলিয়ান মাইল দূর দিয়ে ভেসে যাবে সুইফট টাটল।

টাইকো কোন কথা বলল না। পৃথিবীর প্রধান গণকযন্ত্রগুলোর নেটওয়ার্কে ক্রমাগত গোয়েন্দাগিরি করে চলা তার একটা প্রধান কাজ। তথ্যের চোরাচালান আজকাল কা পোনের প্রধান রোজগার হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো সে তথ্য যথেষ্টই দাম দিয়ে কেনে। সে কাজটা করতে গিয়েই বুদ্ধর নেটওয়ার্কে কিছু সন্দেহজনক প্রোগ্রাম প্যাচ এর সন্ধান পেয়েছিল টাইকো।

কা পোনের প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল সেগুলো সরকারী গুপ্তচর প্রোগ্রাম কি না। কিন্তু সেগুলোকে নিয়ে অনুসন্ধান করে যখন সে টের পায় প্রোগ্রামগুলো নিয়মিত মঙ্গল উপনিবেশের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলেছে তখন সে বিষয়টা নিয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, এবং বুদ্ধ-র স্মৃতিতে সুইফট টাটল সংক্রান্ত গণনামডিউলটিকে পরীক্ষা করে সে। উচ্চ নিরাপত্তার এই মডিউলে গোপনে ঢোকবার জন্য যথেষ্ট খরচ করতে



হয়েছে তাকে। তবে কা পোন তার পরোয়া করেনি, এবং ফলও এসেছে হাতেনাতে। সুইফট টাটল নিয়ে পাওয়া তথ্যগুলোকে বুদ্ধ প্রসেসিং করবার আগেই তাদের মধ্যে সামান্য, প্রায় অদৃশ্য কিছু বদল ঘটানো হচ্ছে নিয়মিত।

তবে এত কথা এই ছেলেটিকে খুলে বলা এ মুহূর্তে উচিত নয়। ওকে নিজেকে বিষয়টা বের করতে দিতে হবে।

"কী হল টাইকো? চুপ করে গেলে যে!" ক্রিস্টোফার তার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

টাইকো গম্ভীর গলায় বলল, "আমি শুধু তোমার বাবার ইচ্ছের কথাটুকু জানাতে এসেছি। আগামীকাল তুমি ডিফেন্স মিসাইল রিসার্চ অর্গানাইজেশনে ইন্টারভ্যু দিতে চলেছ। কাজটা যে তুমি পাবে তার ব্যাপারে তোমার শিক্ষক হিসেবে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমার ছাত্রকে আমি চিনি। তোমার বাবার ইচ্ছা, সেখানে তুমি আন্তর্গ্রহ ক্ষেপণাস্ত্র বিভাগে যোগ দেবার চেষ্টা করবে। সফল হলে, বুদ্ধর স্মৃতিতে জমা থাকা সুইফট টাটলের গতিপথের তথ্য ও পূর্বাভাষের সঙ্গে নজরদার উপগ্রহের থেকে পাওয়া মূল তথ্যগুলো কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া নিজেহাতে মিলিয়ে দেখবে।"

"হাতে? কাগজকলম দিয়ে?"

“হ্যাঁ। সেটাই তোমার বাবার ইচ্ছা। বুদ্ধর কেন্দ্রিয় নেটওয়ার্কে থাকা কোন যন্ত্রগণক ব্যবহার করলে চলবে না।”

“এরকম পাগলামোর কারণ?”

“ক্রিস, তিনি আমার মালিক। তোমার পালকপিতা। তাঁর বিষয়ে এমন অসম্মানকর মন্তব্য করাটা আমি ভালোভাবে নিচ্ছি না। এ-ও জেনে নাও, তোমার শিক্ষক হিসেবে আমারও ইচ্ছা তুমি এ কাজটা করে দেখ। আমার বিশ্বাস তুমি চমকে উঠবে।”

ক্রিস্টোফার একটু অবিশ্বাসের গলায় বলল, “কিন্তু বাবা এসব বিষয়ে কী করে--”

“একসময়ে তুমি সবই জানবে ক্রিস। তবে আজ নয়। উপস্থিত আমার কাজ ছিল তোমাকে এই কথাগুলো



জানানো। আমার কাজ শেষ। তুমি তা মানবে কি মানবে না তা তোমার ইচ্ছে।”

ক্রিস্টোফার মাথা নাড়ল। সুইফট টাটলের বিষয়টা পণ্ডিতমহলে গুজবের জায়গাই নিয়ে রেখেছে এখন। এমন কিছু গোপন বিষয় নয় তার গতিপথের তথ্যগুলো। এ কাজটুকু সহজেই করে ফেলতে পারবে সে।

ক্রমশ

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

পূর্বপ্রকাশিতের পর



তৃতীয় অধ্যায়

বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন লম্বা পুষ্পক বৃক্ষগুলো (এঞ্জিওসস্পার্ম) ডায়নোসরের বিলুপ্তির জন্য অনেকাংশে দায়ী। দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য হঠাৎ করেই এরকম উদ্ভিদের সংখ্যা পৃথিবীতে বেড়ে যেতে লাগল। আমরা জানি, এই গাছেরা অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। এই দ্রুত বেড়ে যাওয়া পুষ্পক উদ্ভিদদের জন্য তৃণভোজী ডায়নোসরদের বিপাক এত বেড়ে গেল যে তারা সেই হারে খাদ্য পেল না। ফলশ্রুতিতে তাদের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়।

এখন কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারে বিপাক কী?

বিপাকের ইংরেজি নাম মেটাবোলিজম। শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ মেটাবোলি থেকে যার অর্থ পরিবর্তন। জীবের দেহে সংঘটিত সব রাসায়নিক বিক্রিয়ার নামই বিপাক। এর মাধ্যমেই খাদ্য বস্তু পরিবর্তিত হয়ে জীবদেহের কাজে লাগে।

রাতুল চকলেটের গাছের ছবি আঁকতে আঁকতে এসব কথা ভাবছিল। গাছেরা যদিও নিরীহ এবং উপকারী কিন্তু কিছু গাছ হতে পারে ভয়ংকর। ক্যারিবিয়ান এবং মেক্সিকো উপসাগরীয় এলাকায় এক ধরনের গাছ পাওয়া যায় যার নাম মাঞ্চিনিল। একে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর গাছ। এর বাকলে থাকে এক ধরনের রস যা গায়ে লাগলে ফোস্কা পড়ে যায়। চোখে লাগলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এর ফল হয়। ফলের নাম বীচ আপেল বা ডেথ আপেল।

রাতুল যখন এসব ভাবতে ভাবতে চকলেট গাছের ছবি আঁকছিল তখন আকাশ তার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী আঁকছ?"

রাতুল আঁকা থামিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। চকলেট গাছ এবং সেই জাদুকরের কথা একে বলা যেতে পারে। আসলে ঘটনাটা কাউকে না বলে রাতুল শান্তি পাচ্ছিল না।

রাতুল বলল, "এটা একটা জাদুর গাছ। নাম চকলেট বৃক্ষ। জাদুর চকলেটের বীজ থেকে এই গাছ হয়।"

আকাশ রাতুলের খাটে বসে বলল, "চকলেট কি গাছে ধরে নাকি?"

রাতুল বলল, "হ্যাঁ, তবে এই গাছ পৃথিবীতে কখনো হয়নি।"

আকাশ বলল, "তাহলে তুমি এর কথা কীভাবে জানতে পারলে?"

রাতুল বলল, "জানতে পেরেছি জাদুকরের কাছ থেকে। তিনি আমাকে জাদুর চকলেট দিয়েছিলেন। সে চকলেটের বীজ থেকে চকলেটের গাছ হবে। তবে বীজটি এখন হস্টেলের সামনে ঘাসে পড়ে আছে।"

আকাশ বলল, "কেন? হস্টেলের সামনে কি চকলেটের গাছ হবে?"

রাতুল বলল, "না। আমি বীজটি নিয়ে আসছিলাম। ম্যাডাম ভেবেছেন হয়ত কোন পাথর বা মাটি নিয়ে এসেছি। তাই ফেলে দিতে বলেছেন। এজন্য ফেলে দিতে হয়েছে। কাল সকালে গিয়ে বীজটি খোঁজে বের করব। তারপর আরেক জায়গায় রোপন করতে হবে।"

আকাশ কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু এত বড় জায়গায়, ঘাসের মধ্যে তুমি সেটি খুঁজে পাবে কীভাবে?"

রাতুল বলল, "আমি চকচকে একটি কাগজে মুড়ে ফেলেছি। কাগজটা সহজেই পাওয়া যাবে।"

আকাশ বলল, "কোথায় রোপন করবে?"

রাতুল বলল, "এখনো ঠিক করিনি। কাল বীজটি পেলে ঠিক করব। তুই এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবি না।"

আকাশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তারপর বলল, "চকলেটের গাছে যদি বেশি চকলেট ধরে তাহলে তুমি কী করবে?"

রাতুল বলল, "কী করব আবার? খাব। কিন্তু আসল কথা হল গাছ হয় কি না।"

আকাশ বলল, "জাদুর গাছের কথা আমি আগে শুনেছি।"

রাতুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় শুনেছ?"

"আমার বাবার কাছে। খুব ছোটবেলায় বাবা আমার সাথে অদ্ভুত জাদুর গাছের গল্প করেছিলেন। আমার কিছুটা মনে আছে। অবশ্য মা বলেছেন ওগুলো মিথ্যা গল্প।"

রাতুল বলল, "হতে পারে। আমাদের হেডস্যারও অনেক গল্প বলেন। জাদু রাজ্যের অদ্ভুত সব গল্প। তার ক্লাস করলে হয়ত শুনতে পারবি। তিনি খুব দারুণ গল্প বলেন।"

চকলেটের বীজটি নিয়ে কথা বলার পর রাতুলের কিছুটা ভালো লাগল। মনের মধ্যে চেপে রাখা কথা বন্ধুদের সাথে বলতে পারলে ভালো লাগে। দুশ্চিন্তা কিছুটা দূর হতেই অন্য এক দুশ্চিন্তা চলে এল তার মাথায়। কাল হোমওয়ার্ক আছে জটিল কয়েকটা অংক। এর মধ্যে একটি সে বুঝতে পারে নি। এটা নিয়ে ম্যাডামের কাছে যেতে হবে।

হস্টেলের প্রতিটি ফ্লোরের দায়িত্বে একজন করে স্যার বা ম্যাডাম রয়েছেন। তারা সেই ফ্লোরে বসবাসরত ছাত্রদের লেখাপড়া থেকে যাবতীয় খোঁজখবর নেন। হস্টেলের কোন ছাত্র হোমওয়ার্ক না পারলে বা পরীক্ষায় খারাপ করলে সেই ফ্লোরের দায়িত্বে থাকা শিক্ষককে ক্লাস টিচার ডেকে নিয়ে দেখান। ফলে ফ্লোরের দায়িট্বে থাকা শিক্ষকেরা কখনোই চান না তার ফ্লোরের কোন ছাত্র হোমওয়ার্ক না নিয়ে যাক কিংবা পরীক্ষায় খারাপ করুক। কোন ছাত্র কোন কিছু না বুঝলে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত যেকোন সময় গিয়ে সে ফ্লোরের শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারে।

রাতুল খাতা এবং বই নিয়ে অংকটা বুঝতে কোরেশী ম্যাডামের রুমে গেল। ম্যাডাম তখন আরো দুজনকে একই অংক বুঝাচ্ছিলেন।

রাতুল বলল, "আসতে পারি ম্যাম?"

ম্যাডাম বললেন, "আসো। তোমারো কি এই অংকে সমস্যা?"

রাতুল বলল, "জি ম্যাডাম।"

ম্যাডাম বললেন, "তোমরা ক্লাসে কী কর আমি বুঝি না। বসে পড় এখানে।"

রাতুল তার ক্লাসমেট আরো দুজনের পাশে বসে পড়ল। ম্যাডাম অংক বুঝিয়ে দিলেন দশ মিনিটের মধ্যে। তারপর রাতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও? আজ সবাই হস্টেলে চলে আসল আর তুমি আসলে এক ঘন্টা পড়ে। আর মুখের অবস্থা এমন কেন? শরীর খারাপ নাকি?"

রাতুল আস্তে করে বলল, "জি না ম্যাডাম।"

ম্যাডাম রাতুলের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর আছে কি না। বললেন, "ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করবে না। বেশ শীত পড়েছে। জ্বর আসতে পারে। আর তোমার রুমে যে নতুন ছেলেটা এসেছে...কী যেন নাম?"



রাতুল বলল, "আকাশ।"

ম্যাডাম বললেন, "হ্যাঁ, ঐ আকাশ, ওর কোন অসুবিধা হয় কিনা দেখো।"

রাতুলের একবার মনে হল রিমনদের কথা বলবে কি না। কিন্তু সে বলল না কারণ ম্যাডামকে বললে কী করবেন তার ঠিক নেই। হয়ত টিসিও দিয়ে দিতে পারেন। ম্যাডামের রুম থেকে বের হয়ে নিজের রুমের দিকে পা বাড়াল।

রুমে এসে সে দেখতে পেল রুম খালি। আকাশ তার চেয়ারে নেই। রাতুল বাথরুমের দরজা খুলে দেখল বাথরুমও খালি। ব্যাপার কী! ছেলেটা গেল কোথায়? পাশের দুই রুমে গিয়ে সে খোঁজ নিল। কিন্তু না পেয়ে আবার ফিরে এল রুমে। চেয়ারে বসে ম্যাডামের বুঝিয়ে দেয়া অংকটি হোমওয়ার্কের খাতায় অর্ধেক করেছে এমন সময় আকাশ রুমে এসে ঢুকল।

রাতুল তার দিকে ঘুরে বলল, "কোথায় গিয়েছিলি?

আকাশ কিছু বলল না। মুখ কাঁদো কাঁদো করে তার চেয়ারে বসে রইল। অদ্ভুত অনুভূতি হল রাতুলের। সে চেয়ার থেকে উঠে আকাশে পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? আমাকে বল।"

এবার আকাশ কেঁদেই দিল। কেঁদে কেঁদে বলল, "আমি কিছু বলতে পারব না। তুমি চলে যাবার পর ঐ ছেলেরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে। বলেছে তাদের কথা না শুনলে খালি একটা রুমে বন্দি করে রাখবে।"

রাতুল বলল, "আমি না তোকে ভয় না পেতে বললাম। তোকে কি ভয় দেখিয়েছে না মেরেছে? আমি এখনি ম্যাডামের কাছে যাচ্ছি।"

আকাশ তার কাঁদার শব্দ বাড়িয়ে বলল, "না, ওরা বলেছে ম্যাডামকে বললে আমাকে আজ রাতেই ধরে নিয়ে যাবে।"

রাতুল বলল, "ঠিক আছে। তোকে নিয়ে কী করেছে আমাকে বল। তারপর দেখ আমি কী করি।"

আকাশ কান্না থামিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "তুমি রাগ করো না। আমি প্রথমে বলতে চাইনি। ওরা আমাকে খালি রুমে নিয়ে যেতে চাইল। যে রুমে ভূত আছে। তাই আমি বলে দিয়েছি।"

রাতুলের বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল।

সে জিজ্ঞেস করল, "কী বলে দিয়েছিস?"

আকাশ বলল, "তারা জিজ্ঞেস করেছিল তোমার আর আমার মধ্যে কী কী কথা হয়েছে। আমি সব বলে দিয়েছি ভয়ে।"

রাতুল কোনভাবে নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করল, "চকলেটের বীজের কথাও বলেছিস?"

আকাশ মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ।"

রাতুলের তখন ইচ্ছে হচ্ছিল ভীতু এই ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে। রাগে তার সারা শরীর কাঁপছিল। সে উঠে গিয়ে তার চেয়ারে বসল। আর একটা কথাও বলল না।

এমনিতেই তার দুশ্চিন্তা ছিল বীজটা কাল পাওয়া যায় কি না। এর উপর রিমন, সিয়ামি, মুস্তাফিজেরা জেনে গেছে। এখন কাল নিশ্চয়ই তারা এটি নেবার চেষ্টা করবে। রাগে দুঃখে রাতুলের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। বোকা এই ছেলেটাকে তার বীজটির বিষয়ে বলা ঠিক হয় নি।

রাতুল গম্ভীর হয়ে আছে দেখে আকাশ একবার এসে বলল, "আমি সরি। ভয়ে বুঝতে পারিনি।"

রাতুল গর্জে উঠল, "তুই আমার সাথে আর কখনো কথা বলবি না।"

চতুর্থ অধ্যায়

রাতে রাতুলের ভালো ঘুম হল না। সে স্বপ্নে দেখল কিছু ভয়ংকর সাপ তাকে তাড়া করেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় সে দেখল একটি গাছ। যেমনটি সে খাতায় এঁকেছিল ঠিক তেমন গাছ। চকলেট বৃক্ষ। রাতুল প্রাণের ভয়ে সে গাছে উঠে গেল। নিচে জড়ো হল বিকটদর্শন সাপেরা। তারা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করল। সে নিঃশ্বাসের উত্তাপে চকলেট বৃক্ষ গলে যাচ্ছে। রাতুল গাছের উপরে থেকে এ দৃশ্য দেখছিল। গাছ ভেঙে পড়ার ঠিক আগমুহূর্তে তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন ঘড়িতে বাজে ছ'টা। সাড়ে সাতটার সময় এসেম্বলি শুরু হয়। সুতরাং সাতটা পনেরোতে সবাইকে একসাথে স্কুলের দিকে রওনা হতে হয়। এর আগে হস্টেলের গেট খোলা হয় না। কিন্তু তবুও রাতুল উঠে হাতমুখ ধুয়ে নীচে চলল।

দারোয়ান সাজু ভাই হস্টেলের দরজায় বসে আছে। রাতুল তাকে গিয়ে বলল, "সাজু ভাই, আমি একটু বাইরে যেতে চাই।"

সাজু ভাই বলল, "বাইরে যাবে কেন? বাইরে কোল্ড।"

সাজু ভাইয়ের বয়স ত্রিশের মত হবে। হাসিখুশি লোক। সে প্রায় প্রতিটি কথায় একটা করে ইংরেজি শব্দ জুড়ে দেয়।

রাতুল বলল, "আমার একটু জরুরি দরকার।"

সাজু মিয়া হয়ত জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কী দরকার। কিন্তু তার আগেই কোরেশী ম্যাডামের কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি প্রায় চিৎকার করে বললেন, "রাতুল তুমি এখানে কী করছ এত সকালে?" বলতে বলতে ম্যাডাম এগিয়ে এলেন। সাজু মিয়ার উপস্থিত বুদ্ধি ভালো। সে রাতুলের বিপদ আঁচ করতে পারল। সে হাসিমুখে বলল, "না ম্যাডাম রাতুল এসেছিল একটু বাইরে যাবে বলে। কুয়াশা দেখার জন্য।"

ম্যাডাম বললেন, "কুয়াশা! এই ঠান্ডার মধ্যে! এই ছেলেদের নিয়ে আমি আর পারছি না। এই তুমি রুমে যাও।"

রাতুল দ্রুত উপরে উঠতে শুরু করল। উঠতে উঠতে সে শুনল ম্যাডাম সাজু মিয়াকে বলছেন, "৪৭ নাম্বার রুমে বাথরুমের লাইট আনতে বললাম তোমাকে পরশু। আজো লাইট লাগানো হয় নাই। এসব কী?"

সাজু মিয়া বলছে, "ম্যাডাম হয়েছে কী, লাইট এনেছিলাম। কিন্তু লাগানোর ব্যাপারটা ঠিক মাইন্ডে ছিল না। আজই লাগাব ম্যাডাম।"

রাতুল রুমে গিয়ে স্কুলের জন্য তৈরি হল। সাতটা পনেরোতে যখন সবাই গেট দিয়ে বের হচ্ছিল তখন কিন্তু অন্যদিকে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। দু'পাশে দু'জন শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে প্রায় লাইন বেঁধে সবাই স্কুলের দিকে হাটা দেয়। স্কুল বিল্ডিং এ যেতে এক মিনিটের মত লাগে।

রিমন সিয়ামি মুস্তাফিজ বি সেকশনে। রাতুল এ সেকশনে। রাতুলের রুমমেট আকাশও বি সেকশনে। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে ক্লাস শুরু হল রাতুলের। সে ভাবছিল ১২ টার ব্রেকে হস্টেলের দিকে যেতে পারবে কি না। মাত্র পনের মিনিটের মত ব্রেক হয়। এ সময় হস্টেলে যাওয়ারও কোন নিয়ম নেই।

ব্রেকের সময় দেখা গেল যাওয়া সম্ভবও না। রাতুল বিমর্ষ মুখে ক্যান্টিনে বসে টিফিন খাচ্ছিল। তার রুমমেট কিংবা রিমনদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ক্লাসের বন্ধুদের সাথেও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তাই রাতুল একা একা বসে ছিল। হঠাৎ তার পাশে এসে একটি মেয়ে বসল। মেয়েটির নাম উর্মি। রাতুল একে চেনে। বি সেকশনে আছে মেয়েটি কিন্তু যেহেতু কিছু কম্বাইন্ড ক্লাস হয় তাই সবাই সবাইকে চেনে।

মেয়েটি বসে রাতুলকে বলল, "তুমি কি আমাকে চকলেট দিতে পারবে?"

রাতুল বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মানে?"

উর্মি বলল, "আমি শুনেছি তোমার চকলেটের গাছ আছে। আমাকে চকলেট দেবে?"

রাতুল জিজ্ঞেস করল, "কে বলেছে আমার চকলেটের গাছ আছে?"

উর্মি বলল, "রিমন বলেছে। আমার আব্বু আমাকে চকলেট খেতে দেন না। আমাকে চকলেট দেবে?"

রাতুল বিরক্ত হয়ে বলল, "কিন্তু আমি যে কয়েকদিন আগে টিফিনের সময় দেখলাম তুমি চকলেট খাচ্ছ?"

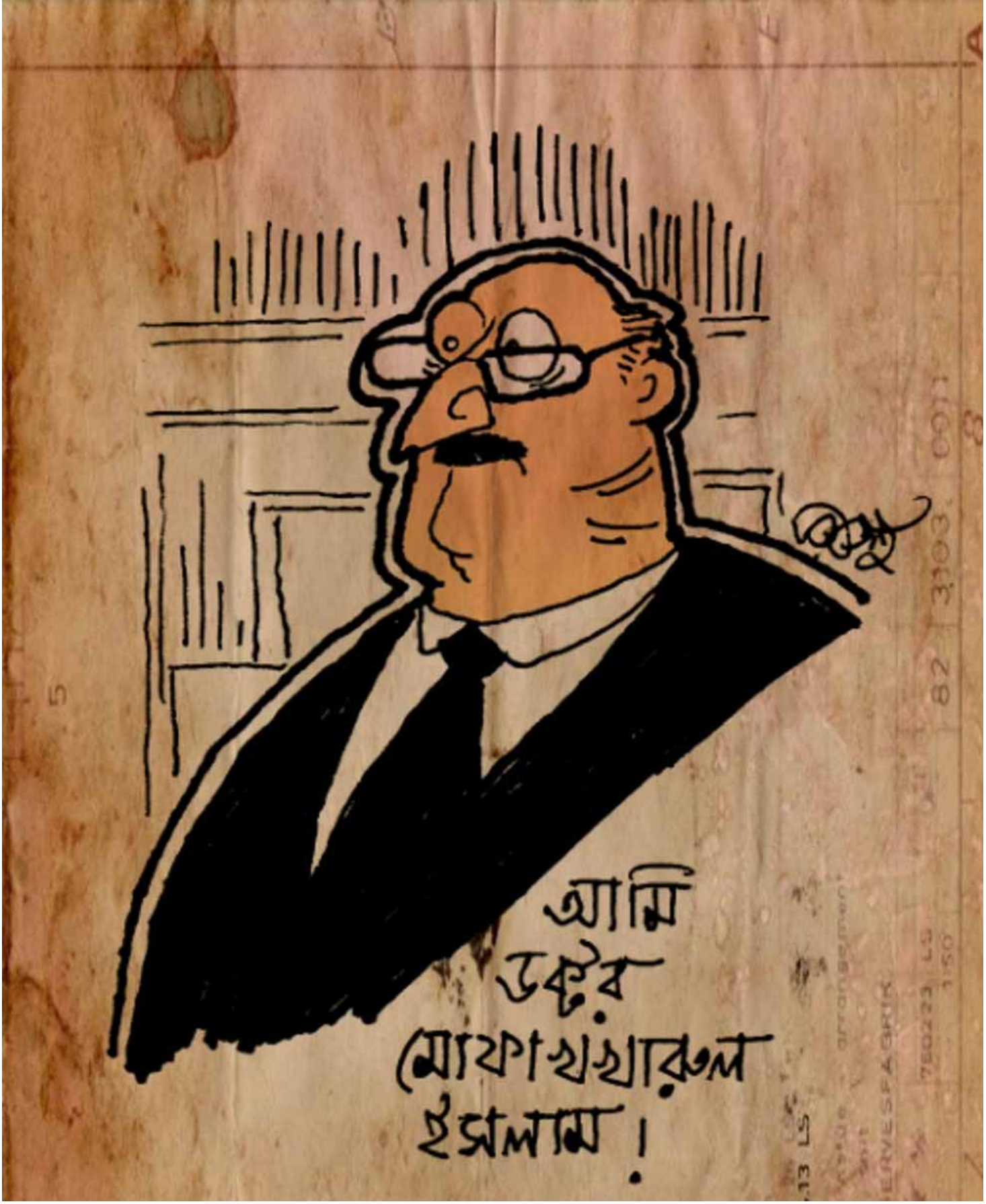
উর্মি বলল, "হ্যাঁ। মাত্র তিনটে খেয়েছি। আব্বু বলেছে সপ্তাহে মাত্র সাতটা খাওয়া যাবে। কিন্তু আমি আরো চাই।"

রাতুল এমনিতেই দুশ্চিন্তায় ছিল। এই মেয়ের কথা শোনে তার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। সে ঝট করে উঠে ক্লাসের দিকে হাঁটা দিল। উর্মি মন খারাপ করে বসে রইল। ক্লাসে যেতে যেতে সে ভাবছিল হয়ত রিমন ক্লাসের সবাইকে বলে ফেলেছে চকলেটের গাছের কথা। হয়ত সবাই এখন তাকে নিয়ে মজা করা শুরু করবে। সে ভয়ে ভয়ে ক্লাসে গেল। কিন্তু দেখা গেল কেউ এ নিয়ে কোন কথা বলছে। অর্থাৎ রিমন সবাইকে বলেনি।

দেড়টায় ক্লাস ছুটি হয়। আর মাত্র দেড় ঘন্টা। ছুটি হলেই দৌড়ে যেতে হবে। রিমনদের আগে। উত্তেজনায় রাতুল ক্লাসে মন দিতে পারল না। একসময় সর্বশেষ ক্লাস শেষ হল। অর্থাৎ এবার ছুটি। কিন্তু স্যার বললেন, "তোমরা একটু বসো। সভাপতি সাহেব আজ এসেছেন তোমাদের সাথে দেখা করতে।"

চশমা চোখে ভুঁড়িওয়ালা এক লোক প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, "কেমন আছ তোমরা? আমি ডক্টর মোফাখখারুল ইসলাম। তোমাদের স্কুলের নতুন সভাপতি।"

ক্লাসের শিক্ষক বললেন, "সভাপতি স্যার কিন্তু একজন বিজ্ঞানী। যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিতে তিনি গবেষণা করেছেন।"



সভাপতি বললেন, "আজ আমি তোমাদের দেখতে এলাম। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোন অফিসার এলে একই দিনে সব ক্লাস ঘুরে ঘুরে দেখতেন। আধ ঘন্টায় সাত আটটা ক্লাসের সাথে পরিচিত হওয়া শেষ হয়ে যেত তার। কিন্তু এ কি সম্ভব? তাই আমি করেছি অন্য নিয়ম। প্রতিদিন একটা করে ক্লাসে যাবো। এক ক্লাসের সাথে পরিচিত হব। আজ পড়েছে তোমাদের ক্লাস। আগামী আধঘন্টা আমরা আলাপ করব। তা তোমরা কেমন আছ?"

ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে বলল, "ভালো। আপনি কেমন আছেন স্যার?"

মোফাখখারুল ইসলাম বললেন, "আমি ভালো আছি। তবে হয়েছে কি ইদানীং শরীরে বল পাই না আগের মত। রবীন্দ্রনাথের গান গাই "বল দাও মোরে বল দাও"। তোমরা কি রবীন্দ্রনাথকে চেন?"

ছাত্রছাত্রীরা বলল, "জি স্যার। তিনি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা।"

মোফাখখারুল ইসলাম বললেন, "শাবাশ! রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে ছোটবেলায় আমি পুরস্কার পেয়েছিলাম।"

রাতুল দেখল বি সেকশনের ছাত্ররা বেরিয়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ব্যাগ তুলে সভাপতির মুখে ছুঁড়ে মারতে।

সভাপতি সাহেব আরো আধঘন্টার মত বক বক করে চলে গেলেন। এ সেকশনের মুক্তি মিলল।

রাতুল ক্লাস থেকে বের হয়েই দৌড় লাগাল। এক দৌড়ে পৌছে গেল হস্টেলের সামনে। উঁচুনিচু ঘাসের মধ্যে সে খুঁজতে লাগল সেই জাদুর চকলেটের আবরণ। কিন্তু কোথায় সেই চকচকে কাগজ? শুধু সবুজ ঘাস।

রাতুল দেখল একটু দূরে বসে আছে রিমন, সিয়ামি, মুস্তাফিজ এবং আরো দুয়েকজন। রিমনের হাতে চকচকে কী একটা দেখে সে প্রায় দৌড়ে গেল। রিমন তাকে দেখে কাগজটি লুকানোর চেষ্টা করল না। বরং সে সবাইকে দেখাতে দেখাতে বলল, "এটা হচ্ছে জাপানি চকলেটের মোড়ক। আমার ছোটমামা জাপান থেকে পাঠিয়েছেন। সুন্দর না?"

রাতুল গর্জে উঠল, "এটা আমার। আমি ফেলে রেখে গিয়েছিলাম।"

রিমন ব্যঙ্গাত্বক ভাবে বলল, "বললেই হল? এটা আমার। সাক্ষি সিয়ামি, মুস্তাফিজ। কী রে তোরা দেখিস নি ঐদিন যে আমার ছোটমামা এসে চকলেট দিয়ে গেল? তোদেরও তো দিয়েছিলাম।"

সিয়ামি বলল, "ঠিক বলেছিস। এমন চকলেট আমি আগে কখনো খাইনি।"

মুস্তাফিজ বলল, "দারুণ টেস্ট। এখনো মুখে লেগে আছে।"

রাতুল আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সে রিমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক হাতে চকলেটের মোড়কটি কেড়ে নিয়ে আরেক হাতে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিচে ফেলে দিল।

রিমন উঠে দাঁড়িয়ে রাতুলকে পালটা ধাক্কা দিল।

হস্টেলে মারামারি করা ভয়ংকর অপরাধ। এর জন্য টিসি পাওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার। তাই উপস্থিত অন্য ছাত্ররা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। এমনকী রিমনের দু বন্ধু মুস্তাফিজ এবং সিয়ামিও পিছিয়ে গেল। রাতুলের মুখে ঘুষি মারল রিমন। রাতুল মারল পালটা ঘুষি। দুজনেরই ঠোট কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তারপর শুরু হল মাটিতে পড়ে কুস্তি। হইচই শুনে সাজু মিয়া এগিয়ে এসে বলল, "এই, এই কী হয়েছে এখানে?"

রাতুল ও রিমন একে অন্যকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মারামারি করার অপরাধে কী শাস্তি হতে পারে এখন সে চিন্তা এল তাদের মাথায়। সাজু ভাই দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে! মেরে ব্লাড বের করে দিয়েছে! কী নিয়ে মারামারি?"

রাতুল বলল, "ও আমার চকলেটের মোড়ক নিয়ে গেছে।"

সাজু মিয়া বলল, "এই জন্যে মারামারি? ম্যাডাম জানতে পারলে মেরে তোমাদের তক্তা বানাবে। তারপর সেই তক্তা টিসি দিয়ে বাড়িতে সেন্ড করবে।"

রিমন বলল, "ভুল হয়ে গেছে সাজু ভাই। ম্যাডামকে বলবেন না প্লিজ।"

সাজু মিয়া রাতুলের দিকে তাকাল। রাতুলও বলল, "ম্যাডামকে বলবেন না, সাজু ভাই।"

সাজু মিয়া বলল, "আচ্ছা যাও যাও! সে দেখা যাবে। এখন রুমে যাও। বলব কি বলব না আমি বিবেচনা করে দেখব।"

রিমনসহ বাকিরা একে একে রুমের দিকে পা বাড়াল। রাতুলের হাতে চকলেটের মোড়কটি ছিল। সে তা হাতে নিয়ে রুমে চলে এল। রুমে এসে মোড়কটি খুলে তার চক্ষুস্থির! ভেতরে একদলা মাটি কেবল। বীজটি হয়ত হারিয়ে গেছে। অথবা রিমনদের কাছে। ভীষণ মন খারাপ হল রাতুলের। নিজের দুর্ভাগ্যকে মনে মনে দোষারোপ করতে করতে সে বাথরুমে গেল। বাথরুমে গিয়ে দেখল ঠোট সামান্য কেটে গেছে। পানি লাগতেই জ্বালা করল খুব। মুখ ধোয়ে স্কুল ড্রেস বদলে সে এসে খাটে শুয়ে রইল। তার কিছুই ভালো লাগছে না। শুনতে পেল পাশের

খাটে বসা আকাশ ডাকছে, "রাতুল, রাতুল।" রাতুলের ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে কষে দুটো চড় দিতে। এই ছেলেটার জন্যই সে সব হারাল। সে জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

হঠাৎ সে দেখতে পেল তার ঠিক মুখের সামনে একটি হাত। সেই হাতের উপরে গতকালের সেই কালো চকলেটের বীজ।

রাতুল প্রায় লাফিয়ে উঠে বসল। দেখল আকাশই হাত বাড়িয়ে আছে এদিকে এসে। হাতের মধ্যে চকলেটের বীজ। রাতুল বীজটি হাতে নিয়ে বলল, "এটি তুই কোথায় পেলি?"

আকাশ বলল, "আমি আজ সবার আগে এসে কাগজটি কুড়িয়ে পাই। তারপর বুদ্ধি করে বীজটি নিয়ে ওর ভিতর মাটি ভরে আসি।"

রাতুল আকাশের আগের সব নির্বুদ্ধিতা মুহূর্তেই ভুলে গেল। তার মনে হল ছেলেটাকে যত বোকা সে মনে করেছিল অতটা বোকা সে নয়। বীজটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বীজটি দেখতে লাগল সে। চকচকে কালো বীজ। গায়ে চকলেটের গন্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়

পরদিন একটা অদ্ভুত কান্ড হল। রাতুলের ঘুম ভাঙল প্রচন্ড হইচই এর শব্দে। হস্টেলে সচরাচর এমন হয় না। ইতিমধ্যে তার রুমমেট আকাশও ঘুম থেকে উঠে ভয়ার্ত মুখে তাকাচ্ছে। রাতুল দেখল পাশের রুম থেকে রাকিব এবং অন্তু ছুটে যাচ্ছে। রাতুল তাদের জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? এত চিৎকার কেন?"

অন্তু পেছনে ফিরে বলল, "তুই জানিস না? ৩৪ নাম্বার রুমে যে নতুন ছেলেটি এসেছিল তাকে ভূতে ধরেছে। স্যারেরা হস্টেলে এসেছেন।"

রাতুল বেশ অবাক হল। কারণ এর আগে এখানে কাউকে ভুতে ধরেনি। সেও অন্তুদের সাথে গেল ম্যাডামের রুমে। সেখানে সবাই জড়ো হয়েছে। আরো তিনজন স্যার এসেছেন। নতুন ছেলেটি, যার নাম বিনয় সে নিশ্চুপভাবে একটি চেয়ারে বসে আছে। ম্যাডাম তার দিকে ঝুঁকে এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন। বলছেন, "তুমি ঐ রুমে গিয়েছিলে কেন? সত্যি করে বল, কেন গিয়েছিলে?"

ছেলেটি কোন উত্তর করছে না।

স্যারেরা প্রশ্ন করছেন, "সারারাত তুমি ওখানে ছিলে কেন? তোমার সমস্যাটা কী?"

ছেলেটি হস্টেলে এসেছে তিন চারদিন হল। প্রথম থেকেই সে সবার চেয়ে আলাদা। কারো সাথে কোন কথা বলে না। গতকাল মধ্যরাতে তার রুমমেট ঘুম ভেঙে দেখে সে রুমে নেই। ছেলেটি ভয় পেয়ে যায় এবং পাশের রুমের বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে ম্যাডামকে খবর দেয়। তারপরই শুরু হয় নতুন ছেলেটাকে খোঁজা। খুঁজতে খুঁজতে তাকে শেষরাতের দিকে পাওয়া যায় একটি খালি রুমে।

কিন্তু খালি রুমে কারো পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। কারণ রুমগুলো তালাবদ্ধ থাকে। ঢুকতে হলে চাবির দরকার। নতুন ছেলেটি অর্থাৎ বিনয়ের কাছে সে চাবি থাকার কথা না। কিন্তু তবুও তাকে পাওয়া যায় সেই খালি রুমে। অন্ধকারের মধ্যে বসে কী যেন বিড়বিড় করছিল সে।

বিনয়কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে কেন ওখানে গিয়েছিল, কীভাবে গিয়েছিল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিচ্ছে না। পাথরের মূর্তির মত চুপ হয়ে বসে আছে। হস্টেলে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, "শারীরিক কোন সমস্যা দেখা যাচ্ছে না। ছেলেটা সুস্থ। হয়ত আপনাদের ঐ রুমটা খোলাই ছিল।"

ম্যাডাম সিদ্ধান্ত নিলেন এর অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করবেন। বন্ধ রুমগুলোর সত্যি সত্যি তালাবদ্ধ আছে কি না স্যার ম্যাডামরা আরেকবার দেখে নিলেন। ইতিমধ্যে সারা হস্টেলে ছড়িয়ে পড়েছে ভুতের গল্প। ভুত নিয়ে অনেক গল্প এখানে এমনিতেই প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে আরো একটি যোগ হল।

রাতুল দেখল এক জায়গায় সেভেনের কয়েকজন ছাত্র জড়ো হয়েছে সাজু ভাইকে ঘিরে। সাজু ভাই গল্প করে যাচ্ছেন। তাঁর গল্পগুলোতে নিজের বাহাদুরির বর্ণনা যেমন থাকে তেমন হাস্যরসও থাকে অনেক।



সাজু ভাই বলছিলেন, "এই স্কুলে আমি যতদিন ধরে আছি আর কোন স্টাফ ততদিন থাকেনি। এখানকার মানুষ ভুত প্রেত সব আমার চেনা।"

অন্তু নামের নাক খাড়া একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, "সাজু ভাই, আপনি হস্টেলে কখনো ভুত দেখেছেন?"

সাজু ভাই বললেন, "দেখেছি মানে? তাহলে তোমাদের গল্পটা বলেই ফেলি। তখন এই স্কুল সবে ওপেন হয়েছে। স্কুলের চেয়ারম্যান তখন সরয়ার্দি বেগ সাহেব। উনি ছিলেন সরকারের অবসরপ্রাপ্ত একজন বড় কর্মকর্তা। আমাকে অনেক পছন্দ করতেন। সব কাজেই আমাকে ডাকতেন, 'এই সাজু, এটা কীভাবে হবে? এই সাজু, ওটা কীভাবে হবে?' দারুণ লোক ছিলেন।"

নাক খাড়া অন্তু বলল, "তারপর?"

সাজু ভাই বললেন, "ওঁর সাথে আমার এত ভালো সম্পর্ক ছিল যে ওঁর বাজারহাটও আমিই করে দিতাম। তিনি স্কুলের টিচার্স বিল্ডিংয়েই থাকতেন। এলাকায় নতুন। জায়গা চেনেন না। তাই আমাকেই তাঁর কাজ করে দিতে হত। বাজার করতে গিয়ে আমি সরয়ার্দি বেগ স্যারের বউকে বলতাম, "ম্যাডাম, বাজারে যাব, ব্যাগ দেন।"

নাক খাড়া অন্তু বলল, "তারপর?"

সাজু ভাই বলতে লাগলেন, "তারপর একদিন বাজারে গেলাম। গিয়ে শুনলাম পাশের বাজারে নাকি বেজায় মাছ উঠেছে। আমি ভাবলাম সরয়ার্দি স্যার বড়ো মাছ পেলে খুশি হবেন। চললাম পাশের বাজারে। কিন্তু এত যে দূরে তা আমি বুঝতে পারিনি। যেতে যেতে রাত হয়ে এল। ফিরতে ফিরতে আরো রাত। আর ফিরতে হয় এই হস্টেলের জায়গাটা দিয়ে। তখন এই হস্টেল ছিল না। ছিল শুনশান এক নীরব মাঠ। আমি যখন ঠিক মাঠের মধ্যখানে..."

সাজু ভাই আর গল্প শেষ করতে পারলেন না। ম্যাডাম তার বাজখাঁই গলায় ডাকছেন, "সাজু, সাজু।"

সাজু ভাই হতদন্ত হয়ে উঠে গেলেন। গল্প শ্রোতারা হতাশ হল।

রাতুল এগিয়ে গিয়ে অন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "বিনয় ছেলেটা কী করছে রে?"

অন্তু কিছু বলার আগেই মোটকু সোহেল বলল, "সে তার রুমে বসে আছে। আমি কথা বলতে গিয়েছিলাম। কোন কথা বলে না।"

রাতুল বলল, "তোরা কি আমার সাথে যাবি? আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই।"

সবাই উৎসাহিত হয়ে বলল, "চল।"

সাকিব নামের চশমাপড়া একটা ছেলে বলল, "কিন্তু ম্যাডাম বলেছেন ওকে বিরক্ত না করতে।"

রাতুল বলল, "আমরা বিরক্ত করতে যাচ্ছি নাকি, পন্ডিত? আমরা কথা বলতে যাচ্ছি।"

অন্তু বলল, "আচ্ছা তুই কি সত্যি মনে করিস ওকে ভূতে নিয়ে আটকে রেখেছিল ঐ রুমে?"

রাতুল বলল, "সেটা তার সাথে কথা বললেই বোঝা যাবে।"

রাতুল এবং অন্যরা হেঁটে বিনয়ের রুমের সামনে এল। রাতুল ঢোকবার করার পর অন্যরা ঢুকল। রাতুল এগিয়ে গিয়ে বিনয়ের খাটে বসল। বিনয় তখন চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

"কেমন আছো বিনয়?"

বিনয় ফিরে তার দিকে তাকাল। চোখে উদাস দৃষ্টি। কোন উত্তর না দিয়ে সে আবার ফিরে তাকাল জানালার দিকে।

রাতুল বলল, "তুমি আমাদের সাথে কথা বলতে পারো। আমরা তোমার বন্ধু। তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

বিনয় রাতুলের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিছুটা হেসে শান্তভাবে বলল, "তোমরা আমার ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা এখানে কীজন্য এসেছ আমি জানি।"

অন্তু জিজ্ঞেস করল, "কীজন্য?"

বিনয় শান্তভাবে বলল, "আমি ঐ তালাবদ্ধ অন্ধকার রুমে কী করে গিয়েছিলাম তা জানার জন্য।"

রাতুল বলল, "হ্যাঁ। সেখানে তুমি কী করে গিয়েছিলে? কেউ কি তোমাকে নিয়ে রেখেছিল? আমাকে বলতে পার। আমি ম্যাডামকে বলব এবং যে তোমাকে নিয়ে রেখেছিল সে টিসি খাবে।"

বিনয় এবার শব্দ করে হাসল, "তোমরা খুব বোকা।"

এভাবে সরাসরি "বোকা" বলে অপমান, তাও অবলীলায় একসাথে এতজনকে আর কেউ কখনো করেছে কি না কে জানে! রাতুল অবাক হয়ে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না। ইতিমধ্যে বিনয় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

একটু পর রাতুল বলল, "তুমি আমাদের বোকা কেন বললে?"

বিনয় জানালার দিক থেকে মুখ না সরিয়েই বলল, "বোকা তাই বোকা বলেছি। আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এখন তোমরা যাও।"

রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, “আর তুমি যে জিনিসটা কাগজে মুড়িয়ে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছ তা রাতের চাঁদের আলোতে কিছুক্ষণ রেখো। চাঁদের আলো গায়ে না লাগলে এই বীজ মরে যাবে।”

রাতুল যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ছেলেটা কীভাবে জানলো সেই বীজের কথা!

বিস্মিত অবস্থায় কোনরকমে আমতা আমতা করে রাতুল জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু তুমি কীভাবে জানলে...?”

বিনয় তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “এখন যাও। এসব নিয়ে পরে কথা হবে। বিকেলে মাঠের ধারে বেঞ্চিতে বসে থাকলেই আমাকে পাবে।”

এমনভাবে বিনয় কথাটা বলেছিল যে রাতুল আর দাঁড়াল না। ছেলেটার শান্ত চেহারা এবং কালো চোখের মধ্যে যেন সম্মোহনী শক্তি আছে। রাতুল ওর রুম থেকে বের হয়ে এল। সাথে অন্য সবাই। অন্যরা অবশ্য বেশ বিভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু রাতুল বুঝতে পেরেছে এই ছেলেটা আসলে অনেক কিছুই জানে।

ক্রমশ

ছবিঃ অতনু দেব



মানুষ খাওয়ার পদ্ধতি

মা হাঙরঃ শোন বাছারা, জলের মধ্যে মানুষ দেখলে প্রথমে তার দিকে সোজা এগোবি। কাছে গিয়ে হাঁ করবি তারপর তাকে ঘিরে একটা পাক খেয়ে দূরে যাবি। তারপর ফের একবার ওই করবি। তারপর ফের একবার ওই করবি। তারপরের বার কছে এসে তাকে খাবি।

ছানা হাঙরঃ কেন মা? প্রথমবারেই তো খেয়ে ফেলতে পারি?

মা হাঙরঃ না বাবা। ওদের পেটের ভেতর অনেক ময়লা জিনিস থাকে তো! তাই প্রথমবারেই খেতে নেই।

জার্মান-ইহুদি সংবাদঃ

২০১২ সালে এক তালবুড়ো জার্মান ভদ্রলোক একটা টিভি সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন। সেটা এইরকমঃ

তালবুড়োঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি এক ইহুদি খোকাকে আমার চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রেখে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম।

টিভিওলাঃ জার্মান হয়ে আপনি ইহুদিকে বাঁচিয়েছিলেন? এযে বেজায় মহৎ কাজ মশায়। আপনি তো নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন! কোন প্রমাণ আছে?



তালবুড়োঃ হুঁ হুঁ। প্রমাণ নিয়ে এসেছি। এই দেখুন। ওঁকে লুকিয়ে রাখবার দাম হিসেবে মাসে মাসে ১০০ মার্ক করে ভাড়া নিয়েছি তার সমস্ত রসিদ।

টিভিওলা (রসিদগুলো দেখে) একী? এখানে তো ১৯৩৯ সাল থেকে গতমাস অবধি রসিদ রয়েছে। ব্যাপারখানা কী?

তালবুড়োঃ মানে–যুদ্ধ যে থেমে গেছে সেইটে আর ওকে বলা হয়ে ওঠেনি কি না!

প্রাকৃতিক নিরাপত্তাব্যবস্থা

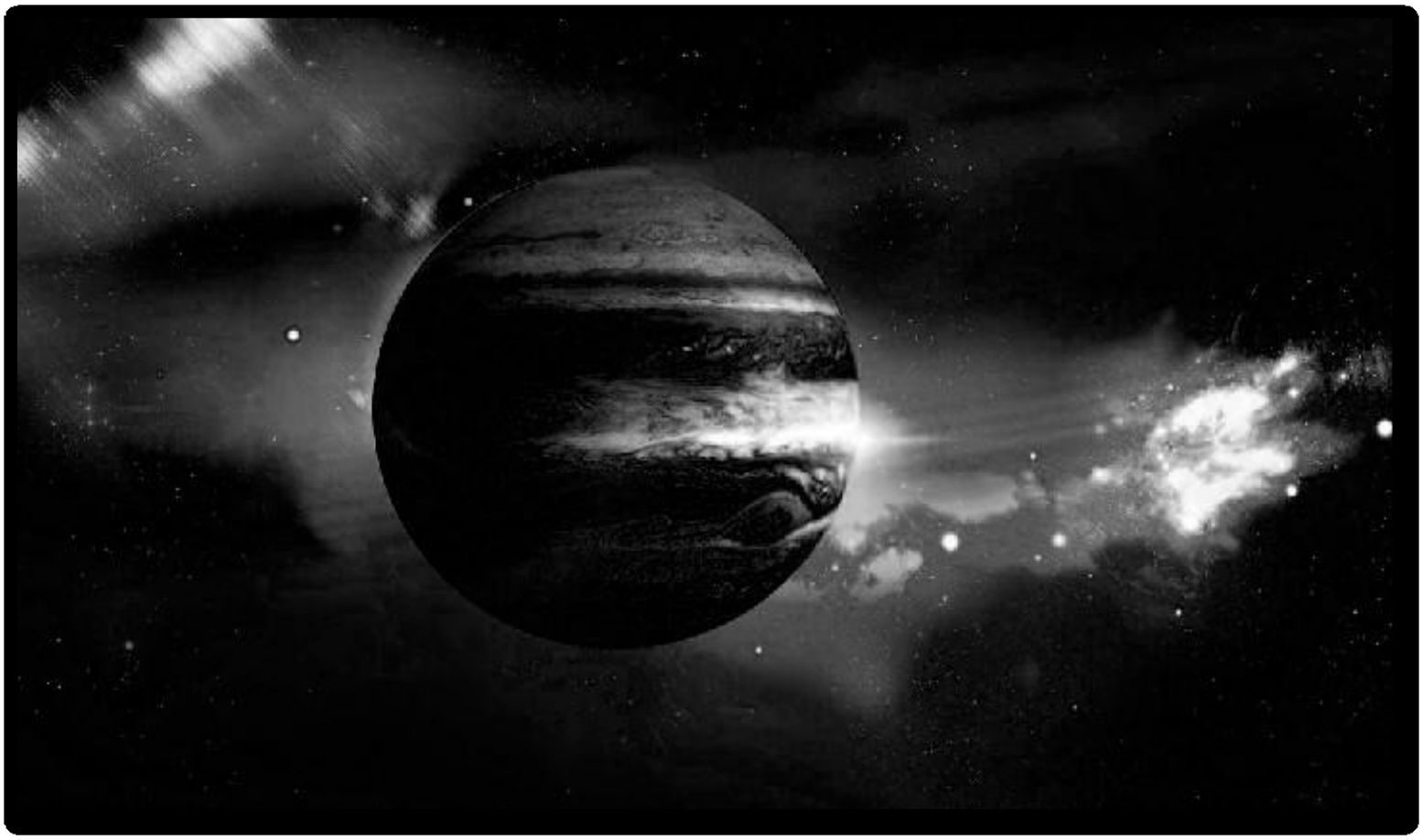
বেড়াতে যাবার আগে বাড়ির সদর দরজায় একই তালা দিন। তারপর তার গায়ে কিছুটা খাঁটি পদ্মমধু মাখিয়ে দিন এবং নিশ্চিন্তে ঘুরতে যান


স্বর্গ না নরক,
কোথায় যেতে চাস?
ইয়ে–মানে--৪জি কানেকশানটা
কোথায় বেশি স্পিড স্যার?

জুপিটারের গভীরে

ঋত্বিক প্রিয়দর্শী

সপ্তম শ্রেণী
এপিজে স্কুল, কলকাতা



১২.৩.২০১৫

আজকাল মশা আর মাকড়রা বড্ড শয়তান হয়ে গেছে। সেইদিন আমায় একটা মাকড় পিঠে চেটেও দিল। আর মশার কথা তো ছেড়েই দাও, রোজ কানের কাছে এসে ভন ভন করে আর কামড়ায়।

২৫.১১.২০১৬

আজকে সুইমিং ক্লাস ছিল।

স্কুল থেকে ফেরার সময় আমার একটা দোকান থেকে বাড়ির জন্য ডিম কেনার কথা। কাছে গিয়ে দেখি, দোকানটা উধাও, ওটার জায়গায় একটা বাঁশবন।

দুপাশ দিয়ে যদি দুটো ট্রাক না আসত, তাহলে নিশ্চই এই ঘটনাটা ঘটত না।

বাঁশবনটার মধ্যে যেই হুমড়িয়ে গিয়ে পড়েছি, পিছন ফিরে যখন জায়গাটা থেকে বের হতে যাব, বুঝলাম যে আমি একটা বিশাল জঙ্গলের মধ্যে ফেঁসে গেছি।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা বিশাল পুকুর দেখতে পেলাম, জলটা একদম ঘুট-ঘুট্টে কালো ছিল, পুকুরটার মধ্যে কিছু ছিল না, একদম খালি ছিল।

হঠাৎ ওটার মধ্যে কিছু একটা ভীষণ তীব্র নীল আলোওয়ালা জিনিস জ্বলে উঠল। কমিকসে যেমন চাইনিজ ড্রাগন দেখেছিলাম, জিনিসটাকে তেমনি প্রায় দেখতে। আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যেই দৌড়োতে গেছি, একটা ভীষণ শক্ত শেকড়ের সাথে ধাক্কা খেলাম, পা'টার ছাল ছিঁড়ে গেল।

ধাক্কা খেতেই পুরো পুকুরটার থেকে একটা সাদা আলো বেরোতে লাগল। পুকুরটা দেখতে না দেখতেই চোখের সামনে কালো থেকে সবুজ হয়ে গেল আর ড্রাগনটা একটা তিমির থেকেও বিশাল বিড়াল হয়ে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল।

"তুমি আমায় এল্কফটর এর অভিশাপ থেকে বাঁচিয়েছ। আমি এই পুকুরটার মধ্যে সাত হাজার বছর থেকে জোনাকি খেয়ে যাচ্ছি... জলের তলার জোনাকি," বিশাল জন্তুটা আমায় বলল।

"জলের তলায় জোনাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যখন একটা মানুষ মরে যায়, তখন সে জীবনে যত ভাল কাজ করে, সেরকম ১০০০ টা ভাল কাজ করলে জলের তলায় একটা জোনাকি জন্মায়। আমি সেই জোনাকি খেয়ে বেঁচে থাকি। কিন্তু আজকাল এতো লোক বাজে হয়ে গেছে যে আমি আর বেশি জোনাকি পাইনা," হাসতে হাসতে বিড়ালটা উত্তর দিল।

"এবার যেহেতু তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, পুরনো গল্পে যেরকম হয়ে থাকে। আমি তোমার একটা ইচ্ছা পুরণ করব।"

আমি ভাবতে বসলাম, "কী ইচ্ছে? কী ইচ্ছে?"

তারপর অনেকক্ষণ পরে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। বিড়ালটাকে বললাম, "একটা কাজ কর। দুনিয়াতে যত মাকড় আর মশা আছে আর তাদের ডিমদের জুপিটারে টেলিপোর্ট করে দাও।"

বিড়ালটার চোখদুটোর মণি হারিয়ে গিয়ে সারা চোখ সাদা হয়ে গেল, লোম খাড়া হয়ে গেল, তারপর কিছু একটা ফাটার শব্দের সাথে বিড়ালটা বলল, "যা! হয়ে গেছে।" বলে লাফ দিয়ে দুটো ডানা মেলে উড়ে চলে গেল। সেই মুহূর্তে সব দিক কেমন ধেবড়ে যেতে লাগল... পুকুরটার থেকে ৬-৭ টা হাত বেরিয়ে আসতে লাগল।
তারপর দেখি বাঁশবন কি, আমি স্কুলের সুইমিং পুলের বেঞ্চে শুয়ে আছি। স্যর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এতক্ষণ পুলের তলায় কী করছিলে?"

ভাবলাম নিশ্চয়ই ওটা একটা স্বপ্ন ছিল, কিন্তু আমার পায়ে নতুন-নতুন কাঁটাছেড়া দেখে ভাবনাটা একদম পালটে গেল।

পরের দিন...

মশা-মাকড় উধাও হয়ে গেছে, একটারও কোন চিহ্ন নেই।

নিউজে দেখলাম যে কেনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক বলছে যে সে তার নতুন "ইরালমাসাফার" গ্যাসটার পরীক্ষা করছিল, তাতে নাকি ফল হয়েছে। কিন্তু আমি তো ঠিক বুঝে গেছিলাম যে আসলে কী হয়েছিল।

২০ বছর পর

বাড়িতে সবাই খুব উত্তেজিত, কেন কি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলে প্রথম জুপিটারে যাচ্ছে।

টিভির সামনে জড়ো হয়ে যেই বসেছি, খবর এলো যে লোকগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের থেকে যে শেষ ছবিটা এসেছে সেটা হল, একটা কালো জিনিস আর তার দুটো লাল জ্বলন্ত চোখ।

আমার বন্ধু ওয়েন স্পেস কমান্ডো হয়ে যাচ্ছে জুপিটারে জন্তুটার খোঁজে। আমাকেও ডেকেছিল।

কিন্তু আমি ভাবলাম, না গিয়ে আমি এখানে বসে পুরো ব্যাপারটা ওদের ক্যামেরা থেকে দেখি। তাই হেড সায়েন্টিস্টদের চেয়ারে বসলাম আমি। কিন্তু অভিযানটা শুরু করার পর কুড়ি বছর ক্রায়োস্লিপ-এর সময়টা খুব বিরক্তিকর ছিল। মজাটা এল যখন ওরা জুপিটারকে প্রথম দেখল, তারপর ওখান থেকে চারজনকে একটা এক্সপ্লোরার ড্রোনে জুপিটারের পৃষ্ঠতলের দিকে পাঠিয়ে দিল। সেইখানে আমার মনিটারও ছিল।

একবার মনে হয়েছিল যে যানটার এয়ারশিল্ডটা পুরো ভেঙে যাবে। কিন্তু এয়ারশিল্ডটা বেশ শক্ত ছিল, তাই ভাঙল না।

মনিটারটা চালু করলাম, চালু করতেই দেখি সেই বিশাল গ্রহটাকে, হলুদ! মনিটারটার মধ্যে থেকে স্ক্যান করে দেখি যে বাইরের আবহাওয়াতে ভীষণ হিলিয়াম আর ভীষণ হাইড্রোজেন। যখন নামলাম, মনিটারটা কেঁপে উঠল ল্যান্ডিং-এর প্রভাবে। তারপর সবার মুখগুলো দেখলাম ২০ বছর পর!

আমার মনিটারটা যখন প্রথম জুপিটারের আবহাওয়া তে ঢুকল, তখন একটু কেঁপে উঠেছিল কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

চার দিন পর...

এতোদিন তো ঘুরলাম জুপিটারে, কোন কিছু চিহ্ন নেই কোন জন্তুর!

আমাদের যানের দিকে আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তখনি কাণ্ডটা ঘটল। যাওয়ার সময় রাস্তায় কয়েকটা বিশাল পায়ের চিহ্ন দেখেছিলাম, মানুষের নয়, কোন বিশাল জন্তুর।

যানটা উধাও, কোন চিহ্ন নেই! যানটার জিপিএস চিপটাকে স্ক্যান করে দেখি যে সেই জায়গাটা থেকে যানটা এক মাইল দূর।

হাঁটতে হাঁটতে তো দু'দিন লাগল। ওখানে পৌঁছে একটা বড়ো গুহা দেখতে পেলাম। পাথরের নয়, কিছু চকচকে জিনিস দিয়ে তৈরি। যানটা দেখতে পেলাম কিন্তু সেটা কোন কাজের ছিল না। উপরে ঝুলছিল ওই চকচকে জিনিসটা দিয়ে জড়ানো জাল। চকচকে জিনিসটাকে স্ক্যান করে দেখা গেল যে ওটা হল প্রোটিন ফাইবার, হিলিয়াম আর হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত। এরকম জিনিস তো আগে কখন দেখিনি। জিনিসটাকে টেস্ট করার জন্য একটা টিউবে ভরছিলাম আমরা, তখনি গুহার মধ্যে থেকে একটা আওয়াজ এল, দুটো দানবিক পা বেরিয়ে এল। আমরা পালাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পিছনের রাস্তা তখন ওই চকচকে জিনিস দিয়ে আটকানো। কী করব এবার?

(এই অবধি গল্প লিখে ঋত্বিক পালিয়েছে। তারপর কী হল জিজ্ঞেস করতে নীচের জিনিসটা মেল করেছে। আমরাও চিন্তায় আছি, বুঝলে! -সম্পাঃ)



সাসপেন্স



ছবি পাঠিয়েছে বারাকপুর থেকে চার বছরের অধিরাজ দেবনাথ

রাজা সীতারাম রায়



উমা ভট্টাচার্য

বারোভুঁইয়া নামে খ্যাত বাংলার বিখ্যাত বারোজন সামন্ত রাজার কথা প্রায় সব বাঙালিই জানি। মোগল সম্রাট আকবরের সময় থেকেই বাংলায় মোগলের অধিকার বিস্তারের শুরু।সেই সময়,ও তার কিছু আগে থেকেই বাংলার গৌড় ,রাজমহল,বা ঢাকা যেখানেই রাজধানী স্থাপিত হোক না কেন,বাস্তবে বাংলাদেশের নানা স্থানেই ভুঁইয়া বা ভৌমিকরাই ছিলেন শাসক।এঁরা ছিলেন সামন্ত রাজা বা জমিদার শ্রেণীর শাসক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এঁরা স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার চেষ্টায়, বাংলার মুসলমান নবাব বা মোগল সম্রাটের বিরাগভাজন হয়েছিলেন,যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে স্বাধীনতার আশা ও জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। বীরত্বে তাঁরা কেউ কম ছিলেন না। এঁদের অনেকেই বংশগতভাবে সামন্ত পরিবারের উত্তরসুরী ছিলেন।পুরো বাংলাদেশ নয়, নিজের অধিকৃত অঞ্চলটুকুর স্বাধীনতা রক্ষা করা আর নিজের
অধিকারের সীমানা বৃদ্ধি করাই ছিল এঁদের লক্ষ। এঁদের আধিপত্যের কারণে দক্ষিণবঙ্গ তখন "বারভুঁইয়ার মুলুক'বলে পরিচিত ছিল।

এই মুলুকেই নিজের শৌর্যে রাজা হয়েছিলেন সীতারাম। তিনি কোন সামন্ত বা জমিদার পরিবারের ছিলেন না। দিল্লীর শাসকদের সঙ্গে নিজে থেকে বিবাদে নামেননি। এমন স্বাধীনচেতা মানুষ যিনি নিজের সাহস,বীরত্ব আর রণকুশলতার গুণে দিল্লীর মোগল সম্রাটের কাছ থেকে রাজা উপাধি ও বিরাট এলাকার জায়গীর লাভ করেছিলেন।

বিখ্যাত দানবীর রামদাস খাঁ গজদানী ছিলেন তাঁদের পরিবারের দ্বাদশ উর্ধতম পুরুষ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। থাকতেন বর্তমানের মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার খড়গ্রামে।

মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি একটি সোনার হাতি তৈরি করে পুরোহিতদের দান করেছিলেন। মিথিলা,বারাণসী প্রভৃতি স্থান থেকে বিখ্যাত পন্ডিতদের আনিয়েছিলেন, অনেক দানধ্যান করেছিলেন। সেই থেকে তিনি "রামদাস গজদানী' নামে পরিচিত হন। রায়তদের সুবিধার জন্য তিনি এক বিরাট দীঘি খনন করিয়েছিলেন।

তাঁর বড়োছেলে অনন্তরাম ছিলেন দিল্লীর রাজসরকারে একজন কানুনগো। তিনিও খুব জনসেবা পছন্দ করতেন। শোনা যায় দিল্লী থেকে কটক পর্যন্ত বাদশাহি সড়কের বাংলাদেশের অংশটুকু তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে ভালোভাবে তৈরি করিয়েছিলেন। অনন্তরামের দুই ছেলের মধ্যে ছোটছেলে ধরাধরের বংশের দশম পুরুষ সীতারাম।

সীতারাম রায়ের বাবা উদয়নারায়ণ অবশ্য ছিলেন ভূষণার ফৌজদারের অধীনস্থ একজন তহশীলদার মাত্র। তখন ভূষণা ছিল বারোভূঁইয়ার একজন মুকুন্দরাম রায়ের রাজ্য। তাঁর পুত্র সত্রাজিৎ ছিলেন মোগলের অধীন এক সামন্ত রাজা। কোন শাসকবিরোধী কাজের জন্য মোগল কর্তৃক সত্রাজিতের মৃত্যুদণ্ড হয়,এরপর ভূষণা চলে যায় সুবাদার সংগ্রাম সিংহের হাতে। শাহজাহানের রাজত্বকাল তখন। এরপরই সীতারামের উত্থান।

সীতারামের বাল্যকাল কেটেছিল কাটোয়ায় মামার বাড়িতে।সীতারামের মা দয়াময়ী দেবী নাকি অসম্ভব সাহসী ছিলেন। জানা যায়,তাঁদের কাটোয়ার বাড়িতে এক কালীপুজোর রাতে ডাকাত পড়েছিল। টের পেয়ে ষোড়শী দয়াময়ী একাই বেড়িয়ে এসে পাঁঠাবলির খাঁড়া হাতে ডাকাতদের তাড়া করে একজনকে আহত করেছিলেন। বাকিরা পালিয়ে গিয়েছিল।।মায়ের দুঃসাহসিকতার খানিকটা বোধ হয় পুত্র সীতারামের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

আওরংজেবের জমানার শুরুতে,বাংলার নবনিযুক্ত সুবাদার মীরজুমলা রাজধানীকে রাজমহল থেকে আবার ঢাকায় স্থানান্তরিত করলেন ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে।সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণকে ঢাকায় আসতে হল।। তিনি মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগরে নিজের বাসস্থান নির্মাণ করবার পর যখন পরিবারকে নিয়ে আসেন তখন পুত্র সীতারামের বয়স দশ কি এগারো। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়েছে সে সময়। সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে মোগল রাজপরিবার বিপর্যস্ত। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা।সেই অরাজকতার সুযোগে আরাকানের মগ দস্যু,পর্তুগিজ হার্মাদ আর ডাকাতদের রাজত্ব হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ।এদের উপদ্রবে বাংলার জনজীবন ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।বাংলার সুবাদার হিসাবে মীরজুমলার পুরো সুবেদারি কেটে যায় দস্যুদমনের প্রচেষ্টায়। এরপর ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন শায়েস্তা খাঁ । শায়েস্তা খাঁর সময়েই সীতারাম হরিহরপুরে আসেন।

ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকা যুবক সীতারাম ভূষণার সামাজিক অবস্থা লক্ষ করছিলেন। শৈশবে মামার বাড়িতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনা করেছিলেন। হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। চণ্ডীদাস,জয়দেবের কাব্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তখনকার চলিত বাংলা শিখেছিলেন বাড়িতে।আবৃত্তির প্রতি তাঁর সারা জীবন ভালোবাসা ছিল।ভূষণায় এসে শিখলেন প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ খেলা-লাঠি খেলা। লাঠি ছিল বাংলার মানুষের ধন,মান ও আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন।চোরডাকাতের আক্রমণ ঠেকানো থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য পাইকের কাজ,এই দুটি প্রধান কাজেরই অবলম্বন ছিল পাকা বাঁশের তেলমাখানো পোক্ত লাঠি।

লাঠি খেলার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, ঘোড়ায় চড়া আর তলোয়ার চালানোতেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন সীতারাম। শিখেছিলেন আরবি আর ফারসি ভাষা,রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য। ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন ভবিষ্যতে স্বাধীন রাজা হবার বাসনা নিয়ে।মনে হয় শিবাজীর মত স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তাঁর। নিজের ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। শুধু যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্রচালনায় দক্ষতাই ছিলনা তাঁর,বিভিন্ন নান্দনিক গুণ ও ছিল তাঁর, ভালোবাসতেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষকেই।যে কোন ধর্মের সাহসী ,গুণী মানুষকেই নিজের সঙ্গে ভিড়িয়ে নিতেন। রাজা হবার পর প্রজানুরঞ্জন সব গুণই কাজে এসেছিল তাঁর।সে সময় মুঘলের হাতে পর্যুদস্ত পাঠানরা তাঁর শৌর্যে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে তাঁর মিত্র হচ্ছিল।প্রাপ্তবয়স্ক যুবক সীতারাম মাঝে মাঝেই চলে যেতেন রাজধানী ঢাকায়।সেখানে যেতেন রাজপুরুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে,রাজ্যের পরিস্থিতি বুঝতে।রাজদরবারেও যাতায়াত ছিল তাঁর। তহশীলদারের পুত্রকে চিনতেন শায়েস্তা খাঁ। তাঁর বলিষ্ঠ,সুঠাম দেহ দেখে ও নানা গুণের কথা শুনে শায়েস্তা খাঁও তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন।যুবক সীতারাম ঢাকাতেও বিভিন্ন

এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন,সেখানকার মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতেন, দেখতেন অত্যাচারী জমিদার বা তহশীলদারদের শোষণে,আর দস্যু-তস্করের উপদ্রবে সাধারণ মানুষদের দুরবস্থা,মেয়েদের জীবনও নিরাপদ ছিল না।

এই সময় হঠাৎই নিজের রণনৈপুণ্য আর কর্ম কৌশলের পরিচয় দেবার সুযোগ মিলে গেল। বাংলাদেশে দস্যু,ডাকাতের উপদ্রব ছিলই, সঙ্গে আর এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হল।মোগলের হাতে পরাজিত পাঠানরা বিক্ষুব্ধ ছিল। সুযোগ পেলেই মোগলদের আক্রমণ করত, নানা ভাবে বিব্রত করত। এই সময় ভূষণার কাছেই সাতৈর পরগণাতে করিম খাঁ নামে এক পাঠান বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।তাঁকে দমনের জন্য প্রচুর সৈন্যসামন্ত পাঠিয়েও ফৌজদার তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারেননি।

কাকে নিযুক্ত করা যায় এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ভেবে সুবাদার শায়েস্তা খাঁও চিন্তায় পড়লেন।বিপর্যস্ত শায়েস্তা খাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন যুবক সীতারাম ।
করিম খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করার আগ্রহ প্রকাশ করতেই রাজি হয়ে গেলেন শায়েস্তা খাঁ।কয়েক হাজার অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্য দিয়ে তাঁকে করিম খাঁর বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালেন। জীবনের প্রথম পরীক্ষাতেই চুড়ান্ত সফল হলেন তিনি।করিম খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে, বিদ্রোহ দমন করে ঢাকায় ফিরলেন।শায়েস্তা খাঁর নিকট থেকে প্রচুর প্রশংসা আর সম্মান পেলেন; আর পেলেন নল্‌দী পরগণার জায়গীররদারি।দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক দ্বীপ ছিল, এগুলির মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ দ্বীপ জুড়ে ছিল নল্‌দী পরগণা। ভাগীরথী আর মধুমতী নদীর মোহনার মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে অবস্থান ছিল এটির, পুরো ভাটির দেশ এসে গেল তাঁর আওতায়।চোর, ডাকাত, দুর্বৃত্ত আর পাঠানদের হাত থেকে ভূষণাসমেত বিস্তীর্ণ অঞ্চল রক্ষা করার দায়িত্বসহ জায়গীর পেলেন তিনি। জায়গীরলাভ করে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে দিলেন। আজীবনের সাথী হিসাবে সঙ্গে পেলেন শক্তিশালী আর প্রখর বুদ্ধিমান দুই বীরকে।

একজন ছিলেন রামরূপ ঘোষ। ছেলেবেলা থেকেই বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী রামরূপ পালোয়ানের কাছে লাঠিখেলা,কুস্তি এসব শিখেছিলেন অর্থ উপার্জনের জন্য। গরিব মানুষেরাই সাধারণত ধনী ও জমিদার বাড়িতে পাইক, দারোয়ান,বেহারার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাই লাঠিখেলা তাঁদের শিখতেই হত। যৌবনে হাতীর মত বিশাল দেহের অধিকারী রামরূপকে লোকে ও সীতারামের সেনাবাহিনীতে সহকর্মীরা 'মেনাহাতী' বলে ডাকতে শুরু করেছিল। দস্যুরাও মেনাহাতীর নাম শুনলেই পিঠটান দিত। মেনাহাতী হলেন তাঁর সেনাপতি। সীতারামের আর এক সাথী ছিলেন কুটকৌশলী,ও মন্ত্রণাদাতা মুনিরাম রায়। সীতারাম,মুনিরাম,আর রামরূপ এই তিন 'রাম' মিলে এক শান্তিপূর্ণ, স্বাধীন রাজ্যগঠনের কাজে এগোলেন।বাংলার ডাকাতদের মধ্যে সবাই ছিল অভাবী,দরিদ্র শ্রেণির মানুষ,বাধ্য হয়ে ডাকাতিকে পেশা করেছিল। সীতারাম গরিব,ডাকাত, আর নিম্নশ্রেণীর লাঠিয়াল,পাইক, আর কোনঠাসা কিছু পাঠানদের নিয়ে তাঁর নিজস্ব বাহিনী গড়তে শুরু করলেন। এইসব সাহসী ডাকাত আর দস্যুরা সেনাদলে থেকে মাইনে পেত। জীবিকার সুস্থ আর নিশ্চিত রাস্তা পেয়ে তারা সীতারামের হয়ে জান প্রাণ লড়িয়ে কাজ করত।এইসব দস্যু আর ডাকাতরা ডাকাতদের কৌশল জানত। ডাকাত দিয়ে ডাকাত ধরা সহজ হত।

হিন্দু,মুসলমান, পাঠান,ডাকাত,লাঠিয়ালরা তাঁর আহ্বানে দলে দলে এসে তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। এঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান ছিল ডাকাত বক্তার খাঁ, যে নিজের দলবল নিয়ে সীতারামের সৈন্যদলে এসে সামিল হয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিল মোগল সেনাবাহিনীর এক বিতাড়িত সেনা আমল বেগ। আমল বেগ এত দুর্ধর্ষ বেগে বাঘের মত আক্রমণ করত যে লোকে নাম দিয়েছিল 'হামলা বাঘা" বলে। এছাড়া ছিল লাঠি সড়কিতে পারদর্শী রূপচাদ ঢালী, নিকারী ফকিরা। মাছের বিক্রেতা(নিকারী)ছিল বলে একে লোকে মাছকাটা ফকিরা বলে চিনত। এঁদের সাহায্যেই তিনি দস্যু আর ডাকাতের উপদ্রব বন্ধ করে সাধারণ মানুষের জান-প্রাণ-মান রক্ষা করে যশোহর ,খুলনা,ভূষনা,নল্‌দীসমেত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। পর্তুগিজ আর আরাকানি জলদস্যুদের ঠেকাবার জন্য রাতে জলপথে পাহারার জন্য জল সেনাবাহিনী গড়েছিলেন। এক গুপ্তচর বাহিনীও তৈরি করেছিলেন দস্যুতস্কর আর পরগনার নানা অঞ্চলের গোপন খবর সংগ্রহের জন্য।

দস্যুতস্করের উপদ্রবে যে পরগণা জনশূন্য হয়ে যাচ্ছিল তিনি এইভাবে সেখানকার শ্রী ফিরিয়ে আনলেন। বহু লোক এসে নল্‌দী পরগণায় নিরাপদে বাস করতে শুরু করল।

সীতারাম একটু একটু করে শক্তি বাড়াচ্ছিলেন, গোপনে নিজস্ব এক সেনাদল তৈরি করছিলেন ।এজন্য এক উপায় বার করেছিলেন। প্রজাদের ব্যবহারের জন্য নিজের এলাকায় তিনি অনেক জলাশয় ও দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এই কাজের শ্রমিক সংগ্রহের অছিলায় তিনি সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। প্রকাশ্যে সৈন্য সংগ্রহ করলে নবাবের নজর পড়তে পারে,সেই আশঙ্কায় দীঘি খননের কাজে যে হাজার হাজার শ্রমজীবি মানুষদের নিয়োগ করতেন, রাতের বেলা তাদের সামরিক শিক্ষা দিতেন।একদলের শিক্ষা শেষ হলে তাদের কিছু টাকাপয়সা দিয়ে বিদায় করে নতুন শ্রমিক নিযুক্ত করতেন। আবার তাদের শিক্ষা চলত। এভাবে রাজ্যের প্রচুর খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। এরাই যুদ্ধের সময় তাঁর হয়ে যুদ্ধে যোগ দিত।

এইভাবে সীতারাম অরাজক অবস্থা থেকে নিজের জায়গীর ও আশেপাশের অঞ্চলকে মুক্ত করলেন। দেশের মানুষ শান্তি ফিরে পেল। তাঁর শাসনে রাজত্বের আয়ও খুব বেড়েছিল। আয় বাড়ার ফলে মোগল কোষাগারেও রাজস্ব বেড়েছিল। তাঁর কৃতিত্ত্বের খবর শায়েস্তা খাঁর কাছে পৌঁছেছিল। শায়েস্তা খাঁ তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। সেই সুযোগই কাজে লাগিয়েছিলেন সীতারাম।

জায়গীরদার সীতারাম নলদীতে থাকলেও পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যবোধ ছিল প্রখর। প্রতি সপ্তাহেই তাঁদের দেখতে যেতেন হরিহরপুরে। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মাতাপিতা দুজনেরই দেহান্ত হয়। পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি প্রচুর খরচ করে পূর্বপুরুষ রামদাস গজদানীর ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। সোনার হাতী দান না করলেও,এখনকার দিনের হিসাবে প্রায় দুলক্ষ টাকারও বেশি খরচ করেছিলেন। শ্রাদ্ধের পর তিনি পিতৃপুরুষের পিন্ডদান করতে গয়ায় যান। ফেরার পথে মোগল দরবার ঘুরে আসার পরিকল্পনা নিয়েই গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সেনাপতি মেনাহাতী আর মন্ত্রণাদাতা মুনিরাম। দেখা করলেন শায়েস্তা খাঁর সাথে। তাঁর কৃতিত্বে খুশি শায়েস্তা খাঁ সীতারামের ইচ্ছানুসারে,সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধির সনন্দ আনিয়ে দিলেন।আনুমানিক ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের কথা।'রাজা' উপাধি দেওয়ার সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ সীমার এলাকাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চলই তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

দেশে ফিরে নিজেকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন,আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে নলদী,সাতৈর,এবং সমগ্র ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করলেন।

রাজা হলেন, কিন্তু রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ কিছুই ছিল না। মুঘল রাজস্ব দপ্তরের কার্যালয়ের কাছেই সূর্যকুন্ড গ্রামে অস্থায়ী আবাস স্থাপন করলেন।। সূর্যকুন্ড আর তাঁর পৈতৃক আবাস হরিহরপাড়া দু-জায়গাতেই সেনাদল রাখলেন। এরপর কাছেই মহম্মদপুরে দুর্গসহ এক রাজধানী স্থাপন করলেন। প্রাকৃতিক পরিখা দ্বারা বেষ্টিত মহম্মদপুরের তিনদিকে ছিল প্রশস্ত আর গভীর বিল, পুবদিক দিয়ে বইত প্রবল বেগবতী নদী মধুমতী। বর্গাকার দুর্গের প্রাচীর ছিল এক এক দিকে প্রায় ৪০০ মিটার। নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে দুর্গের দক্ষিণ দিক বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, এক মাইল দীর্ঘ আর ২০০ফুট প্রশস্ত গভীর গড়খাই কাটালেন। দুর্গের মধ্যে স্থায়ী দুর্গরক্ষী সেনাবাস, আর শাসন কার্যের প্রয়োজনীয় মানুষদের জন্য আবাস স্থাপন করলেন। পুকুর,দেবালয় স্থাপন করলেন। সেনাদলে সুদক্ষ সেনা ভর্তি করে চললেন,অনেক পাঠান যোদ্ধারাও যোগ দিচ্ছিল। গড়ে তুললেন একটি গোলন্দাজ বাহিনী। কামান তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন দুর্গের ভিতরে। অনেক কামানের সঙ্গে তাঁর দুই বিখ্যাত কামান,'কালে খান' আর 'ঝুমঝুম খান' এখানেই তৈরি করিয়েছিলেন।(১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের জাহানকোষা নির্মাণের প্রায় ৫০ বছর পরে)

শিল্পী, কারিগর আর ব্যবসায়ীদের মহম্মদপুরে এসে বাস করার আহ্বান জানালেন। ঢাকা থেকে কামারদের এনে দুর্গের পাশে বসতি করিয়েছিলেন। এছাড়া মালাকর (যারা গুলি বারুদ তৈরি করত), তাঁতী ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর কারিগরদের এনে বসালেন রাজধানীতে। কিছুদিনের মধ্যেই মহম্মদপুর এক জনবহুল, বানিজ্যসমৃদ্ধ জমজমাট শহরে পরিণত হল। এইবার শুরু করলেন নিজের রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি। তিনি আবাদি সনন্দ পেয়েছিলেন। ফলে নবাবের অধীনস্থ অন্য কোন বড় জমিদারের সঙ্গে বিবাদ না করে যতদূর পর্যন্ত খুশি

খালি জমিতে রাজ্য বিস্তার করে প্রজা বসাতে পারতেন। কোন বাধা ছিল না । তেমনি প্রথম কয়েক বৎসর সেইসব নতুন আবাদী মহলের জন্য তাঁকে মোগল কোষাগারে রাজস্ব দিতে হত না। এই সুযোগে তিনি এলাকার উন্নতি করে নিজের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু প্রজাশোষণ করে নয়।

তাঁর সময়ে বিদ্যাচর্চা আর শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছিল। তিনি মহম্মদপুরে অনেক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়েছিলেন। দেশের মানুষের স্বাস্থের কথা চিন্তা করে সেখানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও পড়ানো হত। তাঁর সভায় বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়েছিল। জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। পন্ডিত ও অধ্যাপকেরা নিয়মিত বৃত্তি পেতেন, ছাত্রদের বিদ্যাদান করতেন। মুসলমান প্রজাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য অনেক মক্তব খুলেছিলেন। মৌলবীরা সেখানে পাঠ দিতেন। তাঁরাও বৃত্তি পেতেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য যে পাঠশালা স্থাপন করিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব বিদ্বান মানুষই শিক্ষকতা করতে পারতেন। উপযুক্ত মুসলমান ব্যক্তিকেও তিনি শাসন কার্যে নিয়োগ করতেন।

রাজ্যবিস্তারে নজর দিয়ে তিনি প্রথমেই দখল করলেন বারোভুঁইয়ার অন্যতম মুকুন্দরায়ের বংশধর কৃষ্ণপ্রসাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের জমিদারী। প্রজাদের অবস্থাও খুবই খারাপ ছিল। এই জমিদারীর অন্তর্গত রূপাপাট,রুকনুপুর,কচুবেড়িয়া, পোক্তানি নামে অঞ্চলগুলি ছিল রাজা সীতারামের জমিদারীর এলাকায়, ভূষণা চাকলার নলদী পরগনার একটি তরফ।

এরপর আক্রমণ করলেন মামুদশাহী পরগনা।এই পরগনার নলডাঙ্গার জমিদার বাধ্য হলেন জমিদারি তাঁর হাতে তুলে দিতে। উত্তর দিকের ছোট ছোট জমিদারিগুলো জয় করে নিয়ে রাজ্যসীমা উত্তর দিকে পদ্মানদী পর্যন্ত বাড়িয়ে পদ্মার ওপারে পাবনা জেলার খানিকটাও দখল করে নিলেন। এইসব ক্ষুদ্র জমিদারিগুলি ছিল পাঠান সুলতানদের দখলে।

দু'বছরের মধ্যেই পাঠান অধিকৃত সামন্ত অঞ্চলগুলি চলে এল রাজা সীতারামের অধিকারে। তিনি যখন রাজ্যাভিযানে মহম্মদপুরের বাইরে তখন মীর্জানগরের ফৌজদার নুরুল্লাখান আর চাঁচড়ার জমিদার একযোগে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন ।কিন্তু সীতারামের সুদক্ষ দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের কৌশলী প্রতিরোধের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন চাঁচড়ার জমিদার,সন্ধি করে পিছু হটলেন। প্রতিআক্রমণ করে রাজা সীতারাম চাঁচড়ার জমিদারি দখল করলেন।

এরপর, দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে রাজ্যের মধ্যে, বর্তমানের বাগেরহাট অঞ্চলে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল কৃষক বিদ্রোহ। কিছু স্বার্থান্বেসী জমিদারদের প্ররোচনায় তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য , ছোট ছোট ছিপ নৌকায় ছোট ছোট সেনাদল নিয়ে নিজে এগিয়ে চললেন মধুমতী নদী বেয়ে বাগেরহাটের দিকে। রামপাল নামক স্থানের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা দমিত হল। এইসঙ্গে তিনি চুরুলিয়া আর মধুদিয়া পরগণা দখল করে নিলেন। নতুন রাজ্যসীমাকে ভাগ করলেন দুটি অঞ্চলে। দুটি প্রধান জেলা নিয়ে ভৈরব নদের উত্তরাংশে গঠিত হল ধনজনবহুল সমৃদ্ধ শহুরেবসতি অঞ্চল। ভৈরব নদের দক্ষিণ অংশে রইল স্বল্প জনবহুল কৃষিনির্ভর গ্রামাঞ্চল। পদ্মানদীর উত্তরে পাবনা থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন,আর পূর্বে তেলিহাটি থাকে পশ্চিমে মামুদশাহি পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর রাজ্যের মধ্যে ছিল ৪৪টি পরগনা আর তাঁর সুশাসনে এলাকার বাৎসরিক রাজস্ব ছিল দশ লক্ষ টাকারও বেশি।

এইবার এই ক্ষমতাশালী রাজার দিকে নজর পড়লো নুতন মোগল শাসকদের। আজিম-ওস-শান বাংলার সুবাদার হয়ে এসেই তাঁর আত্মীয় মীর আবু তোরাপকে ভূষণার ফৌজদার করলেন। তোরাপের প্রধান কাজ ছিল রাজা সীতারামের ওপর নজরদারি করা, তাঁকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা। তোরাপ লাগামছাড়া কাজ শুরু করলেন। শান্তিপূর্ণ ভূষনাতে আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম করলেন। যারা তোরাপের জুলুমমত কর দিতে পারছিল না,তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করলেন।

স্বাধীনচেতা প্রাজানুরঞ্জক রাজা সীতারাম এই অন্যায়ের কথা শুনে নিজে মুঘল কোষাগারে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করলেন। তোরাপ এই কাজের ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে, রাজা সীতারামকে রাজস্ব জমা দেবার নির্দেশনামা পাঠালেন। তোরাপের বারংবার আক্রমণ প্রতিহত করছিল রাজার সেনাদল। বারাসিয়া নামে এক নদীর

ধারের যুদ্ধে তোরাপ বাহিনী পরাজিত হল, সেনাপতির মেনাহাতীর হাতে নিহত হলেন তোরাপ। সীতারামের সেনা ভূষণায় তোরাপের দুর্গের দখল নিল। সীতারাম সেই দুর্গে থাকলেন। নিজের দুর্গের ভার রইল মেনাহাতীর ওপর।

এইবার সীতারাম বুঝলেন মুঘলের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই সুযোগে উঠতি রাজা সীতারামকে হারিয়ে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার অধিকার লাভ করার লোভে বাংলার তৎকালীন দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ বিশ্বাসী বক্স আলি খানকে পাঠালেন সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযানে। সঙ্গে যোগ দিলেন অনেক সীতারাম বিরোধী জমিদারের দল। নাটোর এস্টেটের সহকারী দয়ারাম রায় যোগ দিলেন এঁদের সঙ্গে।

যুদ্ধে প্রথমে মুঘল বাহিনী পরাজিত হল সীতারামের বাহিনীর কাছে। দুর্গ দখল করতে না পারলেও ভূষণার দুর্গ অবরোধ করে রইল শত্রুবাহিনী। রাজা সীতারাম বুঝতে পারলেন যে দু'টি দুর্গ একসঙ্গে রক্ষা করা অসম্ভব।

মহম্মদপুর দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে দয়ারাম বুঝতে পারলেন যে এই অভেদ্য দুর্গ দখল বাহুবলে সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য নিলেন। অন্তর্ঘাতের সাহায্যে তিনি দুর্গে প্রবেশ করে মেনাহাতীকে হত্যা করলেন। এই খবর পেয়ে সীতারাম গোপনে অবরুদ্ধ ভূষণা দুর্গ থেকে বেড়িয়ে ঘুরপথে চললেন মহম্মদপুর দুর্গের দিকে। বক্স আলিও ভূষণা ছেড়ে গোপনে সীতারামকে অনুসরণ করতে লাগলেন বাহিনী নিয়ে। মহম্মদপুর দুর্গে প্রবেশ করে রাজা সীতারাম দ্রুত দুর্গের ভিতরের বাসিন্দা অসামরিক মানুষদের দুর্গ থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিলেন। নিজের পরিবারকে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বক্স আলি আর নাটোরের জমিদারের সহকারী দয়ারাম রায় দুজন দুদিক থেকে দুর্গ আক্রমণ করলেন। দীর্ঘদিন দুর্গরক্ষার পর রাজা সীতারামের পরাজয় হল। বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় রাজা সীতারামকে বন্দি করলেন তাঁরা। শৃংখলিত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে মুর্শিদাবাদে। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হল। ১৭৫২ সালে হত্যা করা হল তাঁকে। গঙ্গাতীরে তাঁর শেষকৃত্য করার পর তাঁর আত্মীয়দের চিরকালের জন্য বন্দি করে রাখলেন মুর্শিদকুলি খাঁ।

মুসলিম অধিকারের বাইরে স্বাধীন রাজার মত থাকতে চাওয়ার অপরাধে,আর মুঘল ফৌজদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করার ফলে বাংলার এক দক্ষ প্রশাসক, প্রজাবৎসল বীর নায়ককে মূল্য চোকাতে হল প্রাণ দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর বাংলা পুরোপুরি মুসলিম অধিকারে চলে গেল।

বাংলার সুবাদার মানসিংহের আমলে, প্রতাপাদিত্য মুঘলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এর প্রায় একশো বছর পরে সীতারাম রায় নিজ ক্ষমতায় মোগলের কাছ থেকে রাজ্যলাভ করে,বিশাল এলাকায় নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন রাজার মত থাকতে শুরু করেন। সীতারামের উত্থান ও পতনের সময় বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ।

সীতারামের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ বছর পর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতাসুর্য অস্তমিত হল প্রায় ২০০ বছরের জন্য। এরপর ধীরে ধীরে সারা ভারতই হয়ে গেল এক পরাধীন দেশ,ব্রিটিশ উপনিবেশ। কে জানে পলাশীর প্রান্তরে সীতারাম যদি সসৈন্যে সগৌরবে হাজির থাকতেন তাহলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস এক নতুন পথে বইত কী না!

অলংকরণঃ ইন্দ্রশেখর



।২৮।

জব্বলপুর পৌঁছোন অবধি আর নতুন কোন ঘটনা ঘটল না। সেখানে পৌঁছে আমি, পীর খান আর মোতিরাম দিনদুয়েক ধরে জব্বলপুরের দোকানবাজারে ঘোরাফেরা করেও কোন শাঁসালো শিকারের খোঁজ না পেয়ে শেষে সময় নষ্ট না করে তিন দিনের দিন আমরা ফের জব্বলপুর ছেড়ে রওনা হলাম। জব্বলপুর থেকে নাগপুর অবধি রাস্তাটা একেবারে বনজঙ্গলে ঢাকা। মাইলের পর মাইল রাস্তা একটা মানুষের মুখ দেখা যায় না। রাস্তাটা ঠগিদের কাজকর্মের পক্ষে একেবারে আদর্শ। এমন একটা রাস্তায় কোন কাজকর্ম ছাড়া দিনের পর দিন চলতে চলতে শেষমেষ যখন একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি এমন সময় একদিন যাত্রার শেষে একটা গ্রামে পৌঁছে মোতি্রাম খবর আনল, সেখানে সে এক ব্যবসায়ীর বাড়ির দরজায় একটা পালকি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তাকে ঘিরে বেশ ক'জন চাকরবাকর আর সেপাই দাঁড়িয়েছিল।

"মনে হচ্ছে লোকটা বেশ ভালো দরেরই হবে, বুঝলেন মীরসাহেব," মোতি বলছিল, "আমি বলি কি, আপনি একবার গিয়ে খবরটবর নিয়ে দেখুন না, ব্যাটাকে যদি পাকড়ানো যায়!"

অতএব খানিক বাদে আমি পথের পোশাক খুলে ভালো জামাকাপড় গায়ে চাপিয়ে দলের আর এক ঠগিকে হুঁকোবরদার সাজিয়ে নিয়ে গ্রামে গিয়ে ঢুকলাম। পালকিটা যেখানে ছিল তার কাছেই একটা পানের দোকানে গিয়ে বসে কথায় কথায় দোকানদারকে বললাম, "আপনাদের দেশটা কিন্তু বেশ বুনো।"

সে বলল, " তা যা বলেছেন। আপনাদের মতন পথিকরা এ পথে যাতায়াত করেন বলে পানতামাক বেচে খেয়েপরে আছি।"

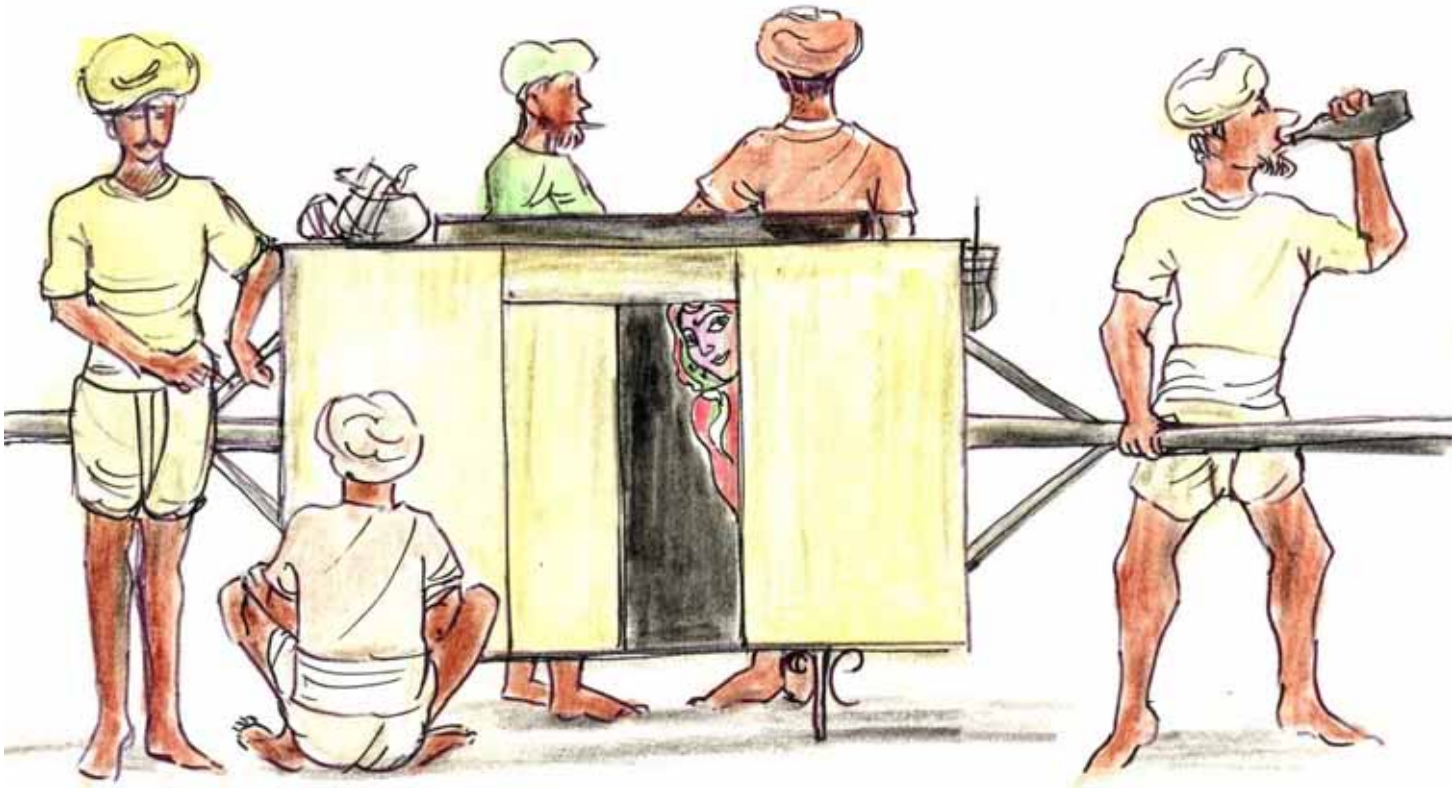
"কিন্তু সেরকম খদ্দেরও তো বেশি পাও বলে মনে হয় না। রাস্তায় আসতে আসতে কই লোকজন তো বিশেষ চোখে পড়ল না! "

"হ্যাঁ। এখনো সময় হয় নি। তবে আর ক'টা দিন যেতে দিন, দেখবেন শয়ে শয়ে লোক চলছে। এখন তো সবে লোক আসতে শুরু করেছে। ঐ যে ওইখানে দেখুন না একটা দল এসেছে--" এই বলে সে খানিক দূরে দাঁড়ানো পালকিটার দিকে দেখাল।

"লোকটা কে বলুন তো? পথে আসতে চোখে পড়েনি!"

"সে সব অতশত কিছু আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি লোকটার কাছ থেকে বেশ খানিক তামাক জোগাড় হয়েছে। আর বেশ কিছুদিন পর একটা রুপোর টাকা হাতে পেয়েছি ওর কল্যানে।"

পানওয়ালাকে ছেড়ে খানিক দূরে আর এক দোকানদারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেও লাভ হল না কিছু। সে বলল, সম্ভবত কোন রইস মানুষ কোন হইচই না বাধিয়ে ব্যক্তিগত কোন কাজে চলেছেন, তবে তার বেশি সে আর কিছু জানে না। ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য লাগছিলো আমার। একটা রঙচঙে আট বেহারার পালকি, সঙ্গে সেপাই সান্ত্রী নিয়ে চলেছে অথচ কাকপক্ষিতেও টের পাচ্ছে না কে যায়! ঠিক করলাম, এর ব্যাপারে কিছু খবর না জেনে এখান থেকে নড়ছি না। ফের সেই পানওয়ালার কাছে ফিরে গিয়ে আমি আমার হুঁকোবরদারকে ডেকে হুঁকোটুকো সাজিয়ে নিয়ে বসে বসে গেলাম। খানিক দূরেই সেই ব্যবসায়ীর বাড়ির সামনে পালকি দাঁড়িয়ে আছে।



বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না অবশ্য।পালকির পর্দার আড়াল থেকে মনে হল দুটো ঝকমকে চোখ আমায় দেখছে। খানিক বাদে পর্দাটা একটু ফাঁক হয়ে একটা ভারি সুন্দর মুখ আমার দিকে উঁকি মেরে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফের পর্দা বন্ধ করে দিল। আমার সব আগ্রহ উবে গেল। আমি তো ঠিকই করে নিয়েছি মেয়ে বুনিজের শিকার আমি আর করবই না কখনো। তাহলে এর ব্যাপারে আর খোঁজখবর নিয়ে কী লাভ! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আমি আমার ঘাঁটির দিকে রওনা দিলাম। ঠিক করে নিলাম পরদিন সকাল সকাল সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। মেয়েটা হয়ত কোন ভালো ঘরের বউ। শ্বশুরবাড়িতে চলেছে একা একা। আহা এমন অসহায় মানুষের ওপর হাত তোলবার কথা ভাবাও অন্যায়। তার মুখটা মনে পড়লেই আমার আজিমার কথা মনে পড়ে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠছিল একেকবার। আমার আজিমাকে যদি পথের মধ্যে এমনিভাবে কোন ঠগির দল ধরে, তাহলে? আমার মত মেয়েদের গায়ে হাত না দেবার প্রতিজ্ঞা তো তারা আর করে বসবে না!

কিন্তু মুখটা কিন্তু আমি ভুলতে পারছিলাম না কিছুতেই। বারবার সেই পর্দার ফাঁক দিয়ে একঝলকের জন্য উঁকি দেয়া ধারালো মুখ আর ঝকমকে চোখদুটো ফিরে আসছিল চোখের সামনে। একবার মনে হয় ফিরে গিয়ে আর একবার দেখে আসি মেয়েটাকে, আবার নিজেই নিজেকে শান্ত করি।

এমনি করে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল যখন তখন হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে আমাদের ঘাঁটির দিকেই আসছে। এই অবেলায় একটা মেয়ে একলা একলা এদিকে কেন আসছে ভাবতে ভাবতে আমি তার কাছাকাছি এগিয়ে যেতে খেয়াল করলাম সে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। আমার কাছে এসে একটু ইতস্তত করে সে বলল, ‘‘গোস্তাকি মাফ করবেন সাহেব, আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি এখানে। যাঁকে খুঁজছি তাঁর যা চেহারার কথা শুনেছি সেটা আপনার সঙ্গে মেলে।’’

‘‘বলো , কী বলতে চাইছো?’’

‘‘আপনিই সে কি না আমি আমি জানিনা। আচ্ছা বলুন তো আপনি কি আজ সকালে পানওয়ালার দোকানের সামনে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন?’’

‘‘খাচ্ছিলাম তো। কিন্তু তাতে কী হল? তার জন্য আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছো নাকি?’’

‘‘না না, আমি নই, অন্য একজন আপনাকে তখন দেখেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। আপনি কি একবার আমার সঙ্গে আসবেন?’’

‘‘হুঁ। তা এই একজনটি কে? আমার সঙ্গে তাঁর কাজটাই বা কী?’’

"প্রথম প্রশ্নটার জবাব দেবার অনুমতি আমার নেই সাহেব। আর দ্বিতীয়টার উত্তর আমি সত্যিই জানি না। চলুন, গিয়ে নিজেই জানতে পারবেন সব।"

বললাম, "চলো।"

"তাহলে খানিক দূর থেকে আমার পেছন পেছন আসুন, আর বাড়ির কাছে এসে এমন দাপটের সঙ্গে ভেতর ঢুকে আসবেন, যেন আপনিই মালিক।"

সেদিন মেয়েটার কথা শুনে আমি তার সঙ্গে আসতে না-ই পারতাম। কিন্তু নিয়তিকে কে ঠেকাবে। কপালে যা লেখা আছে তার অন্যথা করবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই! আমি মন্ত্রমুগদ্ধের মতো মেয়েটার সঙ্গ নিলাম।

সকালবেলার সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে আমি চটিদুটো বাইরে খুলে রেখে সটান ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঘররের পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যাবো তখন সেই মেয়েটা বলে, "একটু দাঁড়ান আমি ভেতরে গিয়ে একবার বলে নিই।" এই বলে সে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। খানিক বাদেই ফের বের হয়ে এসে বলল, "আসুন।"

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে আপাদমস্তক ঢাকা একটি মেয়ে বসে আছে। তার মুখ দেয়ালের দিকে ফেরানো। বললাম, "বান্দা হাজির। এখন হুকুম করুন সাহেবা।"

মৃদু আওয়াজে উত্তর ভেসে এল, "বসুন, আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

আমি খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে মেঝের কার্পেটের ওপরে গিয়ে বসলাম।

"এভাবে আপনাকে আমার ঘরের ভেতর ডেকে আনায় আপনি হয়তো আমাকে নির্লজ্জ ভাবছেন, কিন্তু আর কোন উপায় নেই। আমি একা বিধবা পথে চলেছি। সঙ্গে বিপদে আপদে বাঁচাবার কেউ নেই। আপনারা কোনদিকে চলেছেন জানতে পারি কি?"

বললাম, "আমরা জব্বলপুর থেকে আসছি। যাব নাগপুরে। কাল সকালে রওনা দেবার কথা।"

"আমিও সেখান থেকেই আসছি," সে বলল, "যাবোও নাগপুরেই। মনে হচ্ছে স্বয়ং ভগবানই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার সহায় হবার জন্য।"

"আচ্ছা, পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়নি কেন বলুন তো?" আমি একটু অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

"দেখা হয়নি কারণ আমি আপনাদের থেকে খানিক পিছিয়ে ছিলাম। সামনে আপনার দলটা চলেছে সে খবর পাবার পর খুব তাড়াতাড়ি এসে এইখানে আপনাদের নাগাল পেয়েছি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে এখন থেকে আপনার দলটার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চাই। তাহলে বিপদ-আপদের ভয় থাকবে না।"

"আমি রাজি সাহেবা। কথা দিচ্ছি পথে আপনার কোন বিপদ হতে দেব না। কাল ভোরবেলা আমি আপনাকে ডাকবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেব।"

মেয়েটা আমায় সালাম দিল, আর সেই করতে গিয়ে হঠাৎ করে তার মুখের সামনে থেকে কাপড়টা একমুহূর্তের জন্য সরে যেতে ফের আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এমন আগুনের মত রূপ আমি বেশি দেখিনি। এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে চোখ তুলে ধরেই সে ফের মুখের ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে দেয়ালের দিকে ঘুরে বসল।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "এবারে তবে আমি চলি।"

"আপনার নামটা জানা হল না যে!"

বললাম, "বান্দার নাম আমীর আলি। আমি হিন্দুস্তানের একজন নগণ্য সৈয়দ।"

"সে আমি আপনার মুখের মার্জিত ভাষা শুনেই অনুমান করেছিলাম যে আপনি বড়োঘরের মানুষ। ফজিল, পান আর আতর নিয়ে এস।"

আমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসা দাসীটি তাড়াতাড়ি সেইমত সবকিছু সাজিয়ে নিয়ে এল। তার থালা থেকে একখিলি পান তুলে নিয়ে, বুকে আর দাড়িতে আতর বুলিয়ে নিয়ে আমি বিদায় নিলাম।

ব্যাপারটা আমি সে রাতে কারো কাছে ভাঙিনি। পরদিন সকালে একটু দেরি করে রওনা হয়ে যখন মেয়েটার পালকি আর লোকজকে আমার দলে ডেকে নিলাম তখন একজন সুন্দরী মহিলা আমাদের সঙ্গে নাগপুর অবধি যাবে শুনে দলের সবাই উত্তেজিত। পীর খান আর মোতিরাম আমায় নিয়ে নানান রঙ্গরসিকতা জুড়ল। আমি যত প্রতিবাদ করি, বলি ওসব কিছু নয়, ততই তারা আরো বেশি করে ঠিসিঠাট্টা করে আমায় নিয়ে। খানিক পরে

একটু রেগে গিয়ে আমি বললাম, "দেখো হে, এসব কথার কোন মানে নেই। আমি সেধে গিয়ে কাউকে ডেকে আনিনি। এ মেয়েটাকে আমি চিনিও না। আমাদের এ ভেবেছে সাধারণ পথচলা লোকজন। তাই একসাথে যেতে চেয়েছে। আমিও রাজি হয়ে গেছি। তাতে মেয়েটা সুন্দর না কুচ্ছিত, বুড়ি না ছুঁড়ি সেসব আমি কিছু বিচার করে দেখিনি। চলতে চলতে হয়ত এর সব কথাই জানতে পারব। কিন্তু সে পরিচয় যা-ই হোক না কেন, আমি একে আশ্রয় দিয়েছি। অতএব এর কোন ক্ষতি আমি হতে দেব না।"

"আরে বন্ধু রাগ করেন কেন? বন্ধুদের মধ্যে এমন একটু আধটু ঠাট্টা তামাশা তো চলেই থাকে।" হাসতে হাসতে মোতিরাম বলল, "আপনি হলেন গিয়ে দলের মালিক। আপনার দয়া হলে দলে যত খুশি মেয়ে এসে ঢুকুক না কেন, একজকেও আমরা বুনিজ বানাব না।"

অতএব আমাদের পথ চলা শুরু হল। মাঝে মাঝে আমি পালকির কাছটায় গিয়ে ঘোরাঘুরি করতাম। শুরুতে তাতে সাড়া না মিললেও আস্তে আস্তে পালকির দরজা খুলে একটা দুটো কটাক্ষ হানাও শুরু হয়ে গেল ওপক্ষের দিক থেকে।

কদিন বাদে একদিন দুপুরে খাবার জন্য থামা হয়েছে এমন সময় ফজিল নামে সেই দাসী মেয়েটা ফের এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। তার কাছে যেতেই দেখি আমি আমার বাড়ির কথা, আজিমার কথা সব ভুলে যেতে বসেছি। অনেকক্ষণ আমার সামনে চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ কাপড়ের আড়াল থেকে চোখদুটো বের করে সে তার দাসীকে বলল, "বাইরে গিয়ে বোস। সাহেবের সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।"

ফজিল চলে গেলে আবার খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। খানিক বাদে সে আস্তে আস্তে বলল, "এইভাবে নিজের মুখ আপনাকে দেখিয়েছি, নির্লজ্জের মত ডেকে এনে কথা বলছি সেটা অশোভন, তা আমি জানি মীর সাহেব। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না! আমার কথা বলি। আমি আগ্রার কাছের এক নবাবের বেগম। আমার স্বামী হায়দরাবাদ থেকে ফেরবার পথে নাগপুরে মারা গিয়েছেন। আগ্রার ওদিকে তাঁর অঢেল সম্পত্তি। আমার কাছে খবর এসেছিল, আমার বাপের বাড়ি লোকজনও আমার স্বামীর পরিবারের মতই নামজাদা। তাঁরা সেইসব সম্পত্তির দখল নিয়ে আমার জন্য রেখে দিয়েছেন। এখন আমার ফিরে গিয়ে সম্পত্তির দখল নিতে বাধা নেই। ফিরে গিয়ে উপযুক্ত কোন মানুষের সঙ্গে নিকাহ করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর জন্ম দেয়াই এখন আমার কাজ। তাই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম নাগপুর থেকে আগ্রার দিকে। কিন্তু তারপর---আমীর আলি—কী লজ্জা—কেমন করে আমি আমার বাকি কথাটা বলব আপনাকে? লজ্জায় আমার জিভ চলছে না।"

"না না সাহেবা, আপনি বলুন। কথাটা শেষ করুন," আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

"হ্যাঁ। বলতে তো আমাকে হবেই। যতই লজ্জা হোক, কথাটা না বলে আমি পারব না। আপনার কথা আমি প্রথম শুনি ফজিলের কাছে। বাইরে থেকে আপনাকে দেখে এসে সে-ই আমার কাছে আপনার বর্ণনা দিয়েছিল প্রথমে। কেমন সুন্দর আপনার চেহারা, ঘোড়ায় চড়ে কেমন বীরের মতন ছুটে যান সেইসব কথা। তার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। আমার স্বামী ছিলেন বুড়োমানুষ। আমাকে সন্দেহ করতেন। ওই এক দাসী ফজিল ছাড়া আর কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলাও মানা ছিল আমার। কিন্তু মনের ভেতর বড় ইচ্ছা হত জানেন, কোন সুপুরুষ জওয়ানের সঙ্গে কথা বলি, তাকে দেখি। সাহস হত না। ভদ্রতায় বাধত। কিন্তু তারপর সেদিন যখন আমি আপনাকে পানওয়ালার দোকানে বসে থাকতে দেখলাম, আর চোখ সরাতে পারি না। আপনি চলে যাবার পর কার্পেটে লুটিয়ে পড়ে অনেক কেঁদেছিলাম সেদিন। ওই ফজিল আমায় তখন বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করে। তারপর আমার অবস্থা দেখে ও-ই গিয়ে আপনাকে খুঁজেপেতে নিয়ে এসেছিল সেদিন বিকেলে।

প্রথম যখন এসে ঢুকলেন, তখন আমার ইচ্ছে হয়েছিল আপনার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি। তারপর আপনার সঙ্গে যখন কথা বললাম, বুকের ভেতর আগুন জ্বলে গেল আমার। সঙ্গের লোকজনকে ডেকে বললাম, নাগপুরে কিছু দামি রত্ন বন্ধক রাখা রয়ে গেছে, সেগুলো ছাড়িয়ে আনবার জন্য আমায় নাগপুরেই ফিরে যেতে হবে আবার। আগ্রায় এখন আমার ফেরা হবে না। তারা আমায় বিশ্বাস করল, আমীর আলি-- "

বলতে বলতে একটানে মুখের ওপর থেকে ওড়নাটা পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে আমার কোলে এসে মুখ গুঁজল সে—"আমীর আলি। এই আমার লজ্জার কথা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমায় তুমি তোমার দাসী করে রাখো।

যেখানে তুমি যাবে আমি সঙ্গে যাবো। তুমি যে-ই হও, যা-ই হও, আমি তোমার হয়ে থাকব চিরকাল! তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না। আমি তোমার—আমি তোমার—ওঃ আমীর আলি, কেন তুমি এলে আমার জীবনে?"

।২৯।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল ওভাবে। বাড়ির কথা , আমার আজিমার কথা, বাচ্চাদের কথা, সব আমি ভুলে গেছিলাম তখন। মেয়েটার নাম শুরফুন। জোরা সুন্দরী ছিল আজিমা তার চেয়েও সুন্দরী। কিন্তু শুরফুনের তুলনা শুধু সে নিজে। আমি কখনো স্বপ্নেও এমন রূপের কথা ভাবিনি। আমার সঙ্গে অনেক কথা সে বলল। আমি শুধু মন্ত্রমুগদ্ধের মত সব ভুলে তার কথা শুনে চলেছি তখন।

সে বলছিল, "আমীর আলি, কেন শুধু শুধু সৈনিকের জীবন নিয়ে এত লড়াই করে জীবন কাটাতে চাও? আমি থাকতে তোমার জীবন বিপন্ন করবার কোন দরকার হবে না। টাকার আমার অভাব নেই। যখন চাইব, যত চাইব পেয়ে যাব। আর সব ভুলে তুমি শুধু আমার কাছে থাকো। আমায় ছেড়ে যেও না কখনো।"

সে মুহূর্তে কী যে হয়ে গিয়েছিল আমার, আমি প্রতিজ্ঞাও করে ফেললাম সব ছেড়েছুড়ে তার সঙ্গেই চলে যাবো। তারপর, পরদিন ফের ফিরে এসে কীভাবে কী করা হবে সেসব ঠিকঠাক করব সেই প্রতিজ্ঞা করবার পর সেদিনের মত ছাড়া পেলাম আমি।

তাঁবুতে ফিরে সেদিন আমি খাওয়াদাওয়া কিছু করতে পারলাম না। একদিকে আমার আজিমা, আমার ঘরবাড়ি, পরিবার, আমার দলবল, কাজকর্ম, আর অন্যদিকে এই হঠাৎ এসে জুড়ে বসা মেয়েটা। কোনটা যে ঠিক আর কোনটা নয় সেই দ্বন্দ্বে পড়ে মাটিতে শুয়ে ছটফট করছিলাম আমি। অবস্থা দেখে জংলি গিয়ে পীর খানকে ডেকে আনল। তাকে গালাগাল দিয়ে বিদেয় করলাম। তারপর একবার ভাবলাম দিই নিজের বুকে ছুরি গেঁথে সব কষ্টের অবসান করে। কিন্তু করতে পারলাম না। বহুক্ষণ এইভাবে কষ্ট পাবার পর একসময় অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে মাথাটা একটু ঠান্ডা হলে পরে পীর খানকে ফের ডাকিয়ে এনে সব কথা তাকে খুলে বললাম।

সব শুনে পীর খান বলল, "এ বড় সমস্যার ব্যাপার আমীর খান। কাল মেয়েটার কাছে গিয়ে বাচ্চাছেলের মত আচরণ না করে একটু পুরুষমানুষের মত ব্যবহার কর। ঠান্ডা মাথায় বোঝাও যে তোমার ঘরে বিবি আর দুটো বাচ্চা আছে, জীবনে অন্য কাজকর্ম আছে। এইভাবে তুমি সব ছেড়ে তার সঙ্গে যেতে পারবে না। দেখবে শুনেই সে তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসবে। তখন তুমিও তার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে সব চুকিয়েচুকিয়ে দিয়ে চলে এসো। আর এতে যদি কাজ না হয় তাহলে একে রাস্তার মধ্যে রেখে আমাদের দলটা রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গিয়ে একেবারে বেরারে গিয়ে উঠতে পারি। কোনদিন আর ও মেয়ে আমাদের খুঁজে পাবে না তাহলে।"

পরদিন শুরফুনের তলব আসতে পীর খানের কথায় বুক বেঁধে গিয়ে হাজির হলাম তার তাঁবুতে। তখন বিকেলবেলা। তার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকতেই সব লজ্জার মাথাটাথা খেয়ে সে এসে আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরে বসল। ঠেলেঠুলেও তাকে সরাতে না পেরে মরীয়া হয়েই আমি তাকে এবার আমার বউবাচ্চার কথা খুলে বললাম। দেখা গেল পীর খান একেবারে সঠিক কথা বলেছিল। একেবারে হাতেনাতে ফল হল। রেগে আগুন হয়ে উঠে দাঁড়াল শুরফুন। তার চোখ যেন জ্বলছে। খোলা চুল উড়ছে মুখের চারপাশে। গলার শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে রাগের চোটে। বলে, "শয়তান, দুশ্চরিত্র কোথাকার—আর একবার নিজের মুখে বল, তোর বউবাচ্চা আছে--"

এইবার আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি হলাম। বেশ কড়া গলায় বললাম, "হ্যাঁ শুরফুন। আমি সত্যিকথাই বলছি। সে-ও তোমার মতই সুন্দরী। সে আমাকে বিশ্বাস করে। আমিও তার বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারব না। আমায় তুমি তাদের কথা বলবার সুযোগটাই তো দাওনি কখনো। তোমার রূপ দেখে আমার চোখও ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো সেটা ঠিক, কিন্তু আল্লাহ এখন আমায় নতুন শক্তি দিয়েছেন। তোমায় আমি আবার বলছি, শান্ত হয়ে আমার কথাটা শোনো-- "

কিন্তু কে শোনে কার কথা। শুরফুন তখন মাটিতে বসে গলা ছেড়ে কাঁদছে, নিজের চুল ছিঁড়ছে, বুক চাপড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে কান্না থামিয়ে আমায় ঠগ, জোচ্চোর বলে যা মুখে আসে তাই গালাগালি দিচ্ছে। আমি একটা কথা বলছিলাম না। ভয় হচ্ছিল একটাও নরম কথা বললে সে আবার সব ভুলে এসে আমায় জড়িয়ে ধরবে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেঁদেকেটে গাল দিয়ে শেষে একটু ঠান্ডা হল শুরফুন। আমার দিকে ফিরে বলল, ''দূর হও তুমি আমীর আলি। সারাজীবন আমি তোমায় ভালোবাসা দিতে পারতাম কিন্তু সে সবের যোগ্য তুমি নও। সবই আল্লার ইচ্ছা। নইলে যাকে আমি ভালোবেসে সবকিছু দিতে তৈরি ছিলাম সে একটা মিথ্যেবাদি জোচ্চোর হবে কেন? শুরফুন এখনো এতটা নিচে নেমে যায়নি যে একজন মানুষের হৃদয়কে অন্য একজনের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে বাঁচবে। সে যদি স্বয়ং দিল্লির বাদশা হয় তা হলেও নয়। যাও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে। তোমায় আমি সহ্য করতে পারছি না। যাও। আল্লাহ আমাদের দুজনকেই ক্ষমা করুন।''

তার তাঁবু থেকে বের হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি আমি পীর খানকে সব খুলে বলতে সে তো বেজায় খুশি। বলে, ''এইবার আর দেরি নয়। চলো ফির যাই। নাগপুরে গিয়ে আয়-রোজগার বিশেষ কিছুই হবে না। তার চেয়ে তুমি চাইলে চলো বেরারের দিকটা ঘুরে খান্দেশ হয়ে ফিরে যাই।''

সেইমত পরদিন সকালে আমরা শুরফুনকে ছেড়ে ফিরতি পথ ধরলাম। বেশ কিছুদূর এসে যে গ্রামে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল তার চেয়ে কয়েক ক্রোশ দূরে অন্য একটা গ্রামে ঘাঁটি গাড়লাম সেদিন আমরা। কিন্তু শুরফুনের অত সহজে আমায় ছাড়বার মতলব ছিল না। বিকেল হবার আগেই দেখি তার পালকি সেখানেও এসে হাজির। এখন কী করি? আমার ইচ্ছে ছিল তখনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাই। কিন্তু মোতি্রাম আর পীর খান সে কথা মানতে রাজি নয়। বলে একটা মেয়েমানুষের ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে বুনো জন্তুর খপ্পরে পড়ব,এমন কাপুরুষ আমরা নই। মোতি্রাম আবার আর এক কাঠি এগিয়ে বলে, ''ভয় পাচ্ছ কেন? এমনও তো হতে পারে যে তোমার ব্যাপারটা চুকেবুকে যেতে মেয়েটা হয়তো আবার আগ্রায় ফেরবার পথ ধরেছে? ''

বললাম, ''হতে পারে,'' কিন্তু মনে মনে ভয় হচ্ছিল এ আবার আমাকে ধাওয়া করছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল আমার সন্দেহটা ঠিক। দেখি ফজিল দুধওয়ালির ছদ্মবেশ ধরে আমার তাঁবুতে এসে হাজির। বলে তার মালকিন আমায় ডেকেছে। আমি কাউকে কিছু না বলে ফের তার পিছুপিছু শুরফুনের কাছে গিয়ে উঠলাম। তারপর যা শুরু হল সে বলার কথা নয়। একবার সে কেঁদেকেটে আমার কোলে এসে পড়ে আবার পরের মুহূর্তেই রেগে উঠে যা নয় তাই বলে গাল দিয়ে আমায় তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আমি ঘুরে দাঁড়াতেই ফের এসে পায়ের ওপর লুটিয়ে কান্না জোরে। বলে, ''অভাগিনীকে দয়া করো সাহেব। আমার কথা শোন। চলো আমার সঙ্গে সব ছেড়ে।''

শেষমেষ তিতিবিরক্ত হয়ে আমি তার আস্তানা ছেড়ে বের হয়ে যেতে সে আর্তনাদ করে বলে ''একটিবার ফিরে এসো।'' আমি তখন ফের ভেতরে ঢুকে এসে বললাম, ''শুরফুন, এমন ছেলেমানুষী কোরো না। আমি তো তোমায় বুঝিয়ে বলেছি বারবার যে দিল্লির মসনদটাও আমি তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয়ের ভাগ তুমি কোনদিন পাবে না। ওখানে যার অধিকার তারই থাকবে। তাহলে কেন জোর করছ শুধু শুধু? ''

শুনে সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ''আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা। আমায় স্বীকার না করলে তোমার ভালো হবে না আমীর খান। আমাদের ধর্মে তোমার চারজন বিবি থাকতে পারে। তাহলে আমায় বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায়? কথা দিচ্ছি আজিমাকে আমি নিজের বোনের মত দেখব। তার সন্তানদের নিজের সন্তানের মত ভালোবাসব। আমার ধনদৌলত তাদেরও হবে। সব মেনে নিচ্ছি আমি। তাহলে আর তোমার আপত্তি কীসের? এই দেখ, আমি আর পাগলামো করছি না। যা বলছি ঠান্ডা মাথায় বলছি। তোমার যদি একটা সহোদর বোন থাকত তাহলে সে তোমায় যেভাবে বোঝাত সেইভাবে তোমায় বোঝাচ্ছি। কথা শোন আমীর খান।''

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ''যদি আল্লা তোমায় আমার বোন করতেন শুরফুন, তাহলে আমার মত সুখী আর কেউ হত না। কিন্তু যা তুমি চাইছো সেটা বড় লজ্জার। আচ্ছা ভেবে দেখ, কত বড় পরিবারের মেয়ে তুমি। আর আমার না আছে বংশমর্যাদা, না আছে ধনদৌলত। তাঁরা কি আমার মত একটা নামধামহীন রাস্তা থেকে তুলে আনা লোককে তোমার স্বামী হিসেবে মেনে নেবেন? কক্ষনো না। তার চেয়ে বরং নিজের বাড়িতে ফিরে যাও। পরে একসময় আমি আজিমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, সে গিয়ে তোমায়, তার স্বামীকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আসবে।''



এইবারে সে দেখি একটু চুপ করেছে। কিন্তু একটু পরেই আবার সে রাগে একেবারে ফেটে পড়ে আমায় দুরদূর করে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু ঘন্টাখানেক যেতে না যেতে আমার তাঁবুতে ফের ফজিল এসে হাজির। বলে, "আল্লাহর কিরে মীর সাহেব, মালকিনের জন্য কিছু একটা করুন। খানিক আগে আমায় ডেকে বলল, খানিকটা আফিং জোগাড় করে আনতে। আমি মানা করতে রেগেমেগে আমায় যা নয় তাই গালি দিয়ে বলে তুই না পারিস তো আমি নিজেই গিয়ে আফিং জোগাড় করে আনব। কী আর করি, এই যে আফিং জোগাড় করে নিয়ে যাচ্ছি। জানি এ দিয়ে মালকিন কী করবেন। আপনাদের সব কথাবার্তা আমি নিজে কানে শুনেছি। আপনি ভালো মানুষ। সৎ মানুষ। কিন্তু মালকিনের প্রাণটা বাঁচাবার জন্য অন্তত মিথ্যে করে হলেও তাঁকে একটু আশা দিন। বলে দিন যে তাঁর জায়গিরে পৌঁছে আপনি তাঁকে বিয়ে করবেন। আপনাদের সঙ্গেসঙ্গেই নিয়ে চলুন তাঁকে। কথা দিচ্ছি পথে তিনি আর কখনো আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন না। শুনেছি আপনি বলছিলেন মালকিনকে আল্লাহ আপনার বোন বানালে আপনি ধন্য হয়ে যেতেন। তাঁর প্রাণটা বাঁচাবার জন্য ভাইয়ের এই কর্তব্যটুকু আপনি করবেন না?"

আমি নিমরাজি হয়ে বললাম, "ঠিক আছে। বাঁচামরার প্রশ্ন উঠে গেছে যখন, তখন এইটুকু করতে আমি রাজি।" এই বলে আমি ফজিলের সঙ্গে গিয়ে শুরফুনকে সেইমতো সান্ত্বনাটুকু দিতে সে যে কী উল্লাস তার! আমার গলা জড়িয়ে ধরে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর ফজিল যখন তাকে খুলে বলল সে কেমন করে আমায় রাজি করয়েছে তখন আনন্দে ফজিলকে জড়িয়ে ধরে তার দ'গালে চুমুর বন্যা বইয়ে দিলো। দেখে আমি রেগে উঠে বললাম, "আমি যা বলেছি, যা করেছি সব তোমার প্রাণটা বাঁচাবার জন্য শুধু। তবে হ্যাঁ। কথা যখন দিয়েছি তখন আমার সঙ্গেসঙ্গেই তুমি পথ চলবে। কিন্তু সাবধান। আমার সঙ্গে খুব দরকার না হলে দেখা করবার চেষ্টা কোরো না।"

শুরফুন ফজিলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আমার কাছ ঘেঁষে এসে গলা নামিয়ে বলল, "আমায় মিছে কথা বলে ফাঁকি দিতে চাইছ বুঝি? সাবধান। তুমি যদি কথা না রাখো তাহলে তোমার সব গোপন কথা কিন্তু আমি ফাঁস করে দেব। আমি কিন্তু জানি তুমি আসলে কী।"

"কী জানো তুমি?"

"আমি জানি যে তুমি পেশায় একজন ঠগি। ফজিল তোমার লোকেদের ঠগিদের পুজোআর্চা করতে দেখে আমায় এসে বলেছে। সেইসঙ্গে, তোমরা যেভাবে ঘাঁটি গাড়ো, যেভাবে চলাফেরা কর, কথাবার্তা বল সেইসব মিলিয়ে দেখে আমার আর কোন সন্দেহই নেই এ নিয়ে। কাজেই, সাবধান আমীর আলি। যাদের তুমি খুন করেছ

তাদের সব লুঠ করা জিনিসপত্র এখনো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে। আর, এই কথা শুনে তোমার মুখের ভাব বলে দিচ্ছি এ কথাগুলোর একবর্ণও মিথ্যে নয়, তাই না?''

দাসীটার ওপরে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। আমাদের দলের একটা লোকের সঙ্গে ওর কদ্দিন ধরেই মাখামাখি চলছিল সেটা আমি খেয়াল করলেও গুরুত্ব দিইনি বিশেষ এতদিন। লোকটাকে মরতে হবে এইজন্য। কিন্তু তখন সেইসব কথা ভাববার সময় নেই আমার। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছি আমি তখন। বললাম, ''শুরফুন, জেনেই যখন গিয়েছ, তখন আর তোমার আলাদা থাকা চলবে না। আমার দলের লোকেদের বাঁচাবার জন্য বিয়ে আমাদের করতেই হবে। কিন্তু এ বাঁধন বড় ভয়ংকর। তুমি জীবন্ত থাকতে কখনো তা ঘুচবে না এ কথা জেনে রেখো।''

সে বিচিত্র একটা হাসি হেসে বলল, ''যাক। রাজি হলে শেষপর্যন্ত। কথাগুলো আমার আরো আগেই বলে দেয়া উচিত ছিল তোমায়। তাহলে এত দুঃখ পেতে হত না। এইবার আমি তোমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। তুমি এখন যাও। রোজ একবার অরে আমার খবর নিয়ে যেও।''

ফিরে যেতে যেতে আমার মনের ভেতর ঝড় উঠেছিল একটা। শুরফুন যে আমাদের আসল পরিচয় জেনে গেছে সে কথা আমাকে আমার দলের কাছে খুলে বলতে হবে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু তার ফল কী হবে কে জানে! তাঁবুতে ফিরে এই নিয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করলাম আমি। দলের পঞ্চাশটা তাজা জওয়ানের জীবন ওই একটা মেয়ের খেয়ালখুশির সুতোয় ঝুলে রয়েছে। এটা হতে দেয়া যায় না। আমাদের পেশার নিয়ম বড় কড়া। সবাইকে জানাতেই হবে ব্যাপারটা। তার একটাই ফল হতে পারে। কিন্তু আমার তাতে কিছু করবার নেই। শুরফুন নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছে। এখন আর তাকে এড়াবার কোন পথ নেই আমাদের।

****

দেখা গেল যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে। আমার দলের লোকজন খবরটা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। শুরফুনকে যদি কোনখানে ফেলে রেখে পালাই তাহলে সে আর কিছু না পারুক কাছাকাছি গ্রামগুলোতে খবরটা দিয়ে দিলেই যথেষ্ট। শিকারী কুকুরের মত তারা ঠিক গন্ধ ধুঁকে শুঁকে আমাদের খুঁজে বের করে ফেলবে।

সে যাই হোক, আমাদের হাতে উপস্থিত একটা কাজ ছিল; যে লোকটা ফজিলকে খবরটবর দিয়েছে তাকে উপযুক্ত একটা শাস্তি দেয়া। ছেলেটার বয়স বেশি নয়। পীর খানের দলে ছিল আগের যাত্রায়। পেশায় লুগাই। হাতের কাজ ভালো। তাকে এর আগে বেশ কদিন ফজিলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে সকলেই। ছেলেটাকে ডেকে সটান জিজ্ঞাসা করলাম, ''ফজিলকে তুই আমাদের কথা বলে দিয়েছিস?'' তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। বললাম ''দুর্ভাগা কুকুর, এমন কাজ তুই কেন করলি? এর শাস্তি কী তা তুই জানিস না?''

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''জেমাদার, আমি অপরাধ করেছি। শাস্তিও পাবো। আমাদের আইন কত কড়া সে আমি জানি , তাই শুধু শুধু মার্জনা ভিক্ষা আমি করব না। দাসীটাকে আমি সব কথা বলেছিলাম একটাই কারণে। সে আমাকে বলেছিল আপনি তার মালকিনকে বিয়ে করতে চলেছেন, আমরা আসলে কী কাজ করি সে ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে আগেই জেনে গেছে সে। এখন আমাদের বীরত্বের কিছু গল্প বললে সে চিরতরে আমার হয়ে যাবে। আমি বোকার মত তার কথায় বিশ্বাস করে আমাদের নানা অভিযানের গল্প করেছি তার কাছে কয়েকদিন আগেই। ক্ষমা আমি চাই না, শুধু একটাই অনুরোধ করব, আমার বন্ধু গুরু দত্তের হাতে যেন আমি মরি। ওর হাতটা খুব ভালো। বেশি কষ্ট দেয় না।''

আমি গুরু দত্তকে ডাকতে সে এগিয়ে এসে তাকে বলল, ''আমার দোষ নিও না ভাই। আমি আমার কর্তব্য পালন করছি কেবল।''

সে উত্তর দিল, ''আমি তোমায় মাপ করে দিলাম। দেখো হাত যেন না কাঁপে। আমি কোন বাধা দেব না। তাড়াতাড়ি কোরো।''

গুরু দত্ত আমার দিকে তাকাতে আমি ঝিরনি দিয়ে দিলাম। পরের মুহূর্তেই তার হাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুরো হয়ে গেল বেচারা বিশ্বাসঘাতকের।

এর পর একটাই কাজ বাকি ছিল। পরের দিনের সাংঘাতিক কর্তব্যটার জন্য দলের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া। সে কাজটা ঠিকঠাকভাবে করবার পর বুকের ভেতরটা বেশ হালকা হল আমার। একজন দায়িত্বশীল ঠগির মতই আমি দয়ামায়ার চেয়ে কর্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দিতে পেরেছি। সে কাজটা করতে করতে ভারী আশ্চর্য লাগছিল আমার। শুরফুন আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানবার পরেও কেন পালিয়ে না গিয়ে ফের আমাকে খুঁজতে এল? ভাগ্যের লিখন। কপালে ওর যা লেখা ছিল তাকে খন্ডাবে কে? আমি কে তা জেনেও সে পালিয়ে না গিয়ে সেই আমারই কাছে ফিরে এল আবার! পালাবার সুযোগ সে তো কম পায়নি! তবু সব জেনেশুনেও সেধে এসে নিয়তির পাতা ফাঁদে ধরা দিল মেয়েটা!

পরদিন সকালে শুরুফুনদের দলটাকে নিয়ে আমরা রওনা হয়ে গেলাম। ঠিক করেছিলাম, তাকে আমি নিজে হাতে মারব না। যে হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি সে হাতে তার শ্বাস বন্ধ করে দিতে আমার বাধবে। সে দায়িত্বটা দিয়েছিলাম মোতি আর পীর খানকে। আমার ভাগে পড়েছিল তার এক চাকর।

শুরফুনদের দলটা বেশ বড়। আটজন পালকি বেহারা, চারজন সেপাই আর ফজিলের একজন চাকর মিলে কুল্লে পনেরোজনের দল। তাদের নিকেশ করবার জন্য আমাদের দলের পঁয়ত্রিশজন লোককে বাছা হয়েছিল। অপেক্ষা ছিল শুধু এতবড়ো একটা কাজের উপযুক্ত জায়গা বেছে নেয়ার। আসবার পথে এই এলাকায় একটা জঙ্গুলে পথ আমি দেখে গিয়েছিলাম। ওর ভেতরে একটা জায়গায় জঙ্গল খুব ঘন। মানুষের একেবারেই কোন যাতায়াত নেই তার আশেপাশে। যে মোড় থেকে সেই রাস্তাটা শুরু হয়েছে তার মুখে এসে একটা সমস্যা দেখা দিল। নির্জন, জঙ্গলে ভরা রাস্তাটা দেখে শুরফুনের দলবল সেদিক দিয়ে যেতে নারাজ। বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাদের সে পথে যেতে রাজি করাতে বেশ বেগই পেতে হল আমাদের।

কয়েক ঘন্টা যাবার পর একটা ছোট নদী দেখে আমরা সেখানে থামলাম। আমার দলটা শুরফুনের দলকে ঘিরে সংকেতের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু আমি চাইছিলাম, দলের ওপর আক্রমণটা হবার আগেই শুরফুন চলে যাক। অতগুলো মৃতদেহ যেন তাকে দেখতে না হয়। তার পালকির কাছে গিয়ে বললাম, ‘‘খাবে এসো। খানিকটা দূরে আমি গছের ডাল থেকে পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছি। ওখানে বসে একসঙ্গে খাব।’’

সে সাবধানে পালকি থেকে নেমে দাঁড়াতেই মোতিরাম তার গলায় রুমালটা জড়িয়ে দিল। সঙ্গেসঙ্গেই মারা গেল শুরফুন, কিন্তু পীর খান তার হাত ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো যাতে দূর থেকে কিছু বোঝা না যায়। সেই অবস্থাতেই তাকে ফের পালকির মধ্যে ভরে দিয়ে তার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পীর খান বলল, ‘‘বিসমিল্লা। এইবার ঝিরনিটা দিয়ে দিন মীর সাহেব।’’

আক্রমণের সংকেতটা দিতে আমি আর দেরি করলাম না। দু এক মুহূর্তের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে গেল। শুধু ফজিল মেয়েটা যার হাতে পড়েছিল সে তত দক্ষ নয়। মরবার আগে বড় চিৎকার করছিল সে। একটু দুঃখই হচ্ছিল আমার। একটা মেয়ের অর্থহীন কৌতুহলের জন্য পনেরোটা জীবন চলে গেল। শুরুফুনের শরীরটা গোর দিতে নিয়ে গেল যখন, আমি তার সঙ্গে যাইনি। তার পালকিটাকেও ভেঙেচুরে তার সঙ্গেই কবরে পাঠিয়ে দেয়া হল। বুকের ভেতর একটা মোচড় লাগছিল আমার। কিন্তু আগের দিনই নিজের দলের একজনকে মৃত্যুদন্ড দেবার স্মৃতি তখনো আমার মনের ভেতর তাজা হয়ে আছে। তাছাড়া, টুপুনির গুড় খেয়েছি আমি, ঠগিধর্মে যা যা কর্তব্য সেসব তো আমায় পালন করতেই হবে!

ক্রমশ

অলঙ্করণঃ মৌসুমী

সীমান্তের অন্তরালে



সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী

কাবুলে দোস্ত মোহম্মদ বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন ও আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁকে এক বৃটিশ রক্ষিদলের তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মনে হয় তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না । তিনি ব্রিটিশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু সাহায্য দিতে অসম্মত হলেও তারা যে তাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করবে সে কথা সম্ভবত তিনি ভাবতে পারেননি ।

কাবুলে খুব ঘটা করে, রাজপোশাক পরে সুন্দর আরবি ঘোড়ায় চড়ে শাহ সুজা প্রবেশ করলেন বালা হিসার রাজ প্রাসাদে এবং সেই সিংহাসনে বসলেন, যে সিংহাসন দোস্ত মোহম্মদ প্রায় উনত্রিশ বছর পূর্বে কেড়ে নিয়েছিলেন। শাহ সুজার এক পাশে স্যর বার্নস ও আর এক পাশে স্যর ম্যাকনাটন ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে এবং বৃটিশ মিলটারি ব্যান্ড বাজাচ্ছিল হর্ষোল্লাসভরা সুরে। জেনারেল সেল এক সৈন্যদল নিয়ে চলে গেলেন জালালাবাদ জয় করতে। বৃটিশ বাহিনীর একটা বড় অংশ কাবুলে ক্যানটুনমেন্ট নির্মাণ করে জমে বসল। বিবাহিত অফিসাররা তাঁদের স্ত্রী পরিবার হিন্দুস্তান থেকে কাবুলে আনালেন। পোলো, ঘোড়দৌড়, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা হল ইংরাজদের মনোরঞ্জনের জন্য। তাঁদের জীবন বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠলো কাবুলে।

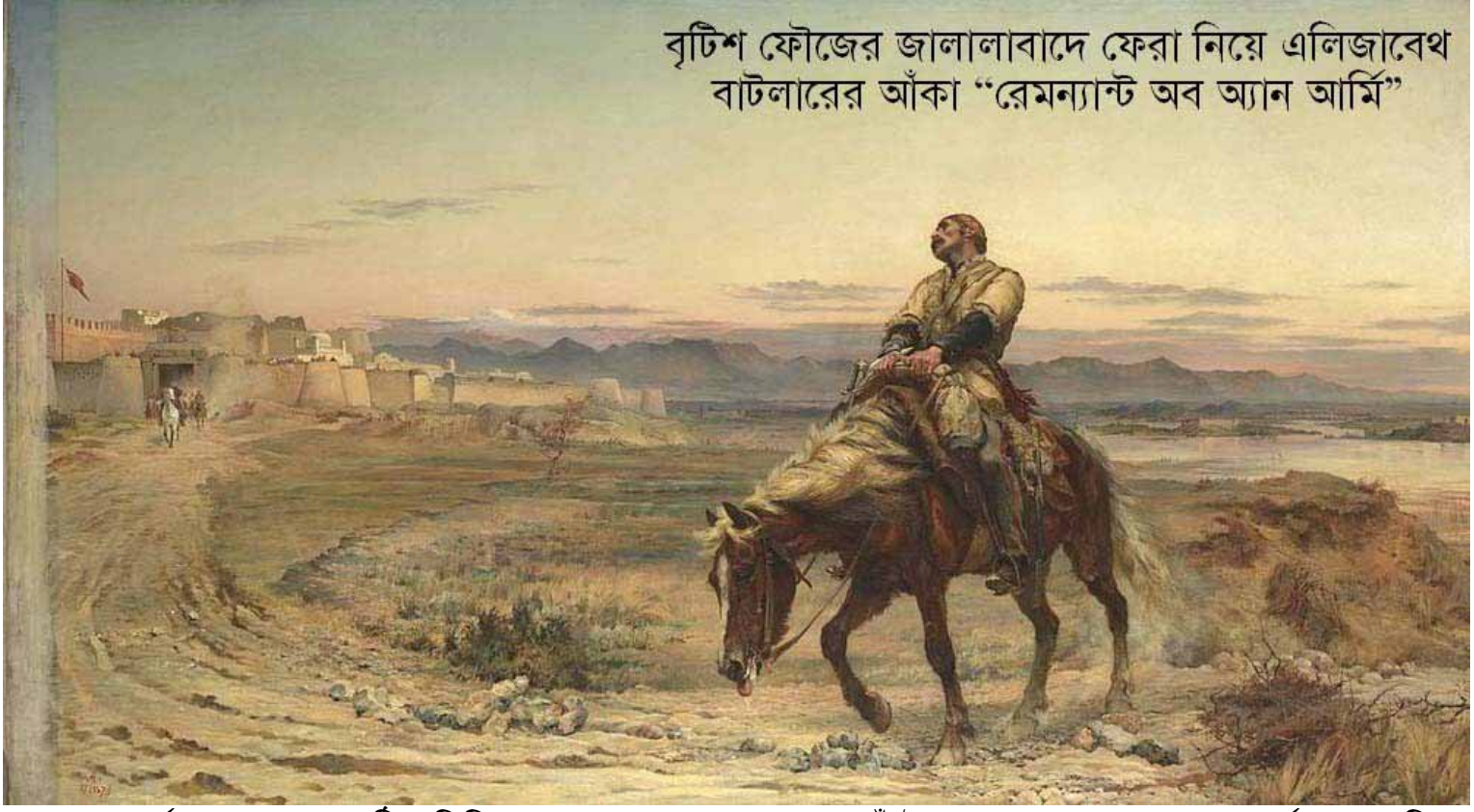
তবে কথায় বলে মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে" জ়ন, জ়র ও জ়মিন' অর্থাৎ নারী,জহরত ও জমি । কাবুলে বৃটিশ বাহিনীর তাই হল। দোস্ত মোহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ তাঁর পিতার সঙ্গে শঠতার জন্য ইংরাজের ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। আফগান মেয়েদের সঙ্গে বৃটিশ অফিসারদের খারাপ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে তিনি গোটা আফগানিস্তানের সর্দারদের খেপিয়ে তুললেন, বললেন যে আফগানদের মান ইজ্জত ডুবিয়ে দিচ্ছে ইংরাজরা। গোটা আফগানিস্তানে ইংরাজবিরোধী আগুন জ্বলে উঠল। আফগান সর্দাররা নিজের নিজের লশকর(ফৌজ) নিয়ে আকবর খাঁর ঝাণ্ডার তলে দাঁড়ালেন ও ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

ইতিমধ্যে জেনারেল জন কিন হিন্দুস্তানে ফিরে গিয়েছিলেন ও কাবুলে স্থলাভিষিক্ত হয়ে ছিলেন জেনারেল এলফিনস্টন। তিনি একে বৃদ্ধ, তাঁর বয়স তখন ষাট তার ওপর তাঁর শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না, কাজেই তাঁর পক্ষে সুস্থভাবে সৈন্যপরিচালনা করা সম্ভব ছিল না । আফগানদের প্রবল আক্রমণ ইংরাজবাহিনী ঠেকাতে পারল না। প্রতিটি যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনী প্রচণ্ড মার খেতে লাগল। বাহিনীর রসদাগার বেহাত হয়ে গেল, স্যর বার্নস খুন হয়ে গেলেন, বালা হিসার প্রাসাদের মধ্যেই শাহ সুজা সেই হত্যা কাণ্ড নিবারণ করতে পারলেন না। স্যর ম্যাকনাটন আকবর খাঁর পিস্তলের গুলিতে নিহত হলেন ক্যানটুনমেন্টের বাইরে। তখন বৃটিশবাহিনীর পক্ষে আর কাবুলে টিকে থাকা সম্ভব হল না, জেনারেল এলফিনস্টন নিজের ফৌজ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করে ভারতের দিকে রওনা হলেন ।

সেটা ১৮৪২ সালের জানুয়ারি মাস এবং আফগানিস্তানে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে, কাবুল ও আশেপাশের ক্ষেত্র বরফে ঢেকে গেছে । জালালাবাদ যাবার রাস্তায় এক ফুট মতন বরফ জমে গেছে । ইতিমধ্যে আফগান উপজাতীয় লশকর চলমান ফৌজের ওপর হানা দিয়ে অনেক টেন্ট লুট করে নিয়ে গেল। রাতের বেলা টেন্টের অভাবে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে বাধ্য হল অনেকে। রাতে শীতের প্রকোপে অনেক হিন্দুস্তানি সিপাই, গোরা (ইংরাজ) সোলজার ও ফলোয়ার এবং কিছু স্ত্রীলোক মারা পড়ল। অনেকে কম্বল জড়িয়ে বরফের শয্যাতেই শুয়েছিল, সকাল বেলায় দেখা গেল যে তারা ঠাণ্ডায় জমে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে । মৃত লোকেদের সেইখানেই ফেলে রেখে বাদবাকি ফৌজ আবার চলল জালালাবাদের দিকে, আশা যে জালালাবাদে পৌঁছতে পারলে সেখানে জেনারেল সেল এর সৈন্যর কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে ও সেখান থেকে খাইবার পাস দিয়ে হিন্দুস্তান পৌঁছতে সময় অনেকটা কম লাগবে।

বন্ধুর ও সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে যে পথের দু ধারে পাহাড়ের মাথায় আফগান উপজাতীয় লোক তাদের জাজ়য়েল (দূর পাল্লার গাদা রাইফেল)নিয়ে বসে আছে। রাস্তায় অনেক অফিসার ,সোলজার ও সিপাই জাজ়য়েলের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল।

এমনি করে দিনের পর দিন অনাহারে,শীতে ও আক্রমণকারীদের গুলিতে বা তলোয়ারের আঘাতে মরতে লাগল বৃটিশ বাহিনীর লোক । যারা একদিন বাঁচল তারা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল ক্ষীণ আশা নিয়ে যে জালালাবাদে পৌঁছতে পারলে প্রাণে বাঁচা হয়তো সম্ভব হবে । পরের দিন সেই একই অবস্থা ,তবুও জীবিত


বৃটিশ ফৌজের জালালাবাদে ফেরা নিয়ে এলিজাবেথ বাটলারের আঁকা "রেমন্যান্ট অব অ্যান আর্মি"

লোকেরা অর্ধমৃত অবস্থায় কঠিন গিরিপথ হয়ে মৃতদেহের ওপর হোঁচট খেতে খেতে, অনাহারে দুর্বল দেহ নিয়ে এগিয়ে চলল জালালাবাদের দিকে ।

যখন জালালাবাদে পৌঁছল তখন ফৌজের মাত্র জনাকয়েক জীবিত। যে বাহিনী তিন বছর পূর্বে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল আক্রমনকারী রূপে, মেদিনী কাঁপিয়ে, রণহুঙ্কার দিয়ে, যে বাহিনী গর্বভরে গোটা আফগানিস্তানকে পদানত করেছিল তার কী বিপর্যয়, কী করুণ আর নিষ্ঠুর পরিণতি!

বিপর্যয়ের খবর পৌঁছল বড়লাটের কাছে। ইংরাজমহলে কালিমা ছেয়ে গেল। সেই দুঃসংবাদের ওপর আরও একটা দুঃসংবাদ এল, বৃটিশ প্রতিনিধি আমির শাহ সুজাও ইতিমধ্যে ইংরাজ বিদ্বেষী আফগানদের হাতে নিহত হয়েছেন।

কিন্তু ইংরাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ আফগানিস্তানকে রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে পারে না। বৃটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে ব্রিটিশের একছত্র প্রভাব যে কোনও মুল্য দিয়েও চালাতে হবে। ইংরাজ গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা (লর্ড অকল্যান্ড অবসর গ্রহন করে বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন সেই সময়) হুকুম দিলেন আর একটি শক্তিশালী বাহিনী এক জন বিচক্ষণ জেনারেলের অধীনে আফগানিস্তান পাঠাতে। সে জেনারেলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে আফগানিস্তান চূড়ান্তভাবে জয় করা ও সেখানে এক জন বৃটিশ অনুগত সুশাসক রাজা জোগাড় করে তাকে গদিতে বসিয়ে সত্বর ভারতে ফিরে আসা।

রণপারদর্শী ও বিচক্ষণ জেনারেল পোলাক এক সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন আফগানিস্তানের দিকে ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে। তিনি সহজ ও সুদীর্ঘ পথে কালক্ষেপ না করে সরাসরি খাইবার পাস দিয়ে এগোলেন এবং সমস্ত বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করলেন। বিরাট সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ফৌজ ও তাঁর রণকৌশলে আফগানিস্তান পরাজিত হল চূড়ান্তভাবে। কাবুলে যে বাজারের ভিতর দিয়ে স্যর ম্যাকনাটন এর মৃতদেহ ঘৃণিতভাবে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল আফগানরা সে বাজারকে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। জেনারেল এলফিনস্টনের শোচনীয় পরাজয়ের ও তাঁর বাহিনীর চরম দুর্দশার গ্লানি ও কলঙ্ক মুছে গেল।

কিন্তু গোল বাধল ব্রিটিশের মাপকাঠি অনুযায়ী আফগান রাজা পেতে। ফাহৎ জঙ্গ নামে রাজবংশের এক জনকে জেনারেল পোলাক সিংহাসনে বসালেন, কিন্তু বৃটিশ বাহিনী ফিরে যাচ্ছে শুনে তিনিও বাহিনীর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কারণ বৃটিশ ফৌজের অনুপস্থিতে তাঁর পক্ষে রাজ্য শাসন করা অসম্ভব। অতএব অনন্যোপায়

হয়ে শেষ পর্যন্ত বন্দী দোস্ত মোহম্মদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ১৮৪৪ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকেই বসান হল আফগানিস্তানের সিংহাসনে ।

****

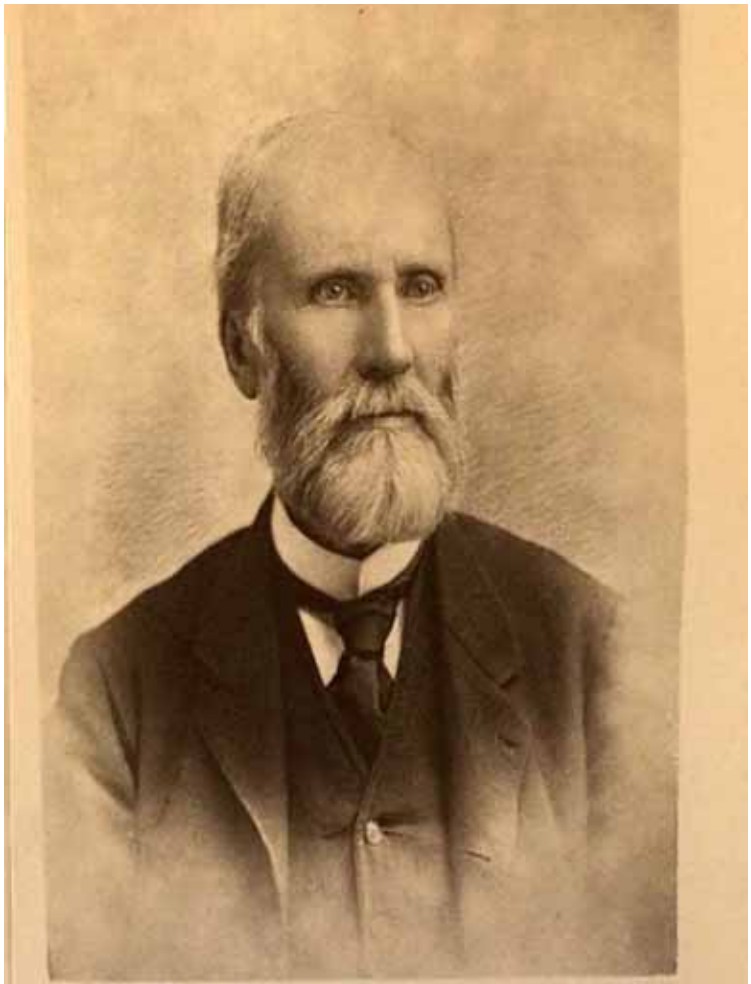
প্রথম এ্যাংলো আফগান যুদ্ধের (১৮৩৮-১৮৪২) অভিজ্ঞতা খতিয়ে ইংরাজ দেখল যে আফগানিস্তানের ওপর একছত্র প্রভাব বজায় রাখতে হলে দক্ষিণ পূর্ব আফগান উপজাতি - আফ্রিদি, ওয়াজিরি, মোমান্দ ইত্যাদি ও তাদের গোষ্ঠীগুলিকে আফগানিস্তানের আওতা থেকে সরিয়ে নিজের আয়ত্তে আনা অনিবার্য এবং খাইবার ও কুরাম অঞ্চল তথা গিরিবর্ত্মের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার কায়েম করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাই আরম্ভ হল পররাজ্য অপহরণের কাজ। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও আফগানিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। বৃটিশ কর্তারা দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে যে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেদের সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে চলেছিলেন, সে সব এলাকাগুলিতে যে কার শাসন চলছে তা স্থানীয় লোকের কাছে অস্পষ্ট, এমন কি কাবুলের আমিরের কাছেও ছিল অস্পষ্ট। আমীর মনে করলেন যে কতকগুলি ঘাঁটি যদিও বৃটিশ এখানে সেখানে তৈরি করছে কিন্তু তথাপি সে এলাকাগুলি কাবুলের শাসনাধীন। বৃটিশ কর্তারা জানতেন যে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে তাঁরা কাবুল শাসনতন্ত্রের ছায়াও পড়তে দেবেন না । তবে ইংরাজরা একটা কথা তখনও জানত না যে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা চিরকালই স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী। কাবুলের আমীরের বশ্যতা স্বীকার করত এরা নামে মাত্র, কাজের বেলায় প্রত্যেক উপজাতি বা খণ্ড জাতিগুলির শাসনকার্য চালাত এদের জির্গা (নির্বাচিত সদস্যদের সভা)। প্রত্যেক খণ্ডজাতি ও উপজাতির একজন করে মালেক আছে কিন্তু তারা জির্গার মীমাংসা অমান্য করতে পারে না। ইংরাজের আবির্ভাবে কাবুলের যেটুকু আধিপত্য এদের ওপর ছিল সেটুকুও লোপ পেয়ে গেল। অবশ্য মূল দেশের সঙ্গে এদের নাড়ির টান ও রক্তের সম্বন্ধ যেতে পারে না ।

উপরোক্ত সময় থেকে খণ্ডিত দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানকে পাখতূনিস্তান ও অধিবাসিদের পাখতূন বলে আখ্যাত করা যেতে পারে। পাখতূনরা কাবুলের শাসন যদিবা কিছুটা মেনে চলত, ইংরাজের শাসন মোটেই মেনে নিল না। প্রথম অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুদ্ধের সময় থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ দিন পর্যন্ত পাখতূনরা ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। গোটা পাখতূনিস্তান কার্যত নো-ম্যানস ল্যান্ড হয়ে থেকে গেল ব্রিটিশের কাছে । কিন্তু এই নো ম্যানস ল্যান্ডের গুরুত্ব ছিল অনেক । পাখতূনিস্তান সম্বন্ধে স্যর উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন "As long as the border could remain a no-mans'land ,all was well but if any power to be supreme, that power must neither be Russia nor Afganistan." (The story of the Malakhnd field force by WinstonChurchill).

****

মাঝে দু'দিনের জন্য আমি কোহাট ক্যান্টুনমেন্টে গিয়েছিলাম, ফিরে সেই রাতেই খাবার টেবিলে বসে বন্ধু রশীদ খাঁ কে বললাম 'রশীদ তোমার ইতিহাসের ঝুলিটা একটু ঝাড়ো , পাখতূনিস্থানের গল্প শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে।'

খাঁ সাহেব স্কচের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমাদের দেশের গল্প তো শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ , বলে শেষ করা যায় না তবে যদি তোমার শুনতে ভাল লাগে তাহলে সংক্ষেপে বলে যাব যখনই সময় ও সুবিধা পাব। ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই পাখতূনরা রুখে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে । এই থাল অঞ্চলেই ১৮৫১ সালে যুদ্ধ হয়েছিল পাখতূন ও ইংরাজের মধ্যে যার উল্লেখ একদিন করেছি, সে যুদ্ধে ইংরাজ উপজাতীয় লশকরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল যদিও, তবু যাকে বলে ডিসাইসিভ ব্যাটল তা হয়নি।



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেল

সেই যুদ্ধের পর ইংরাজ ভেবেছিল যে আপাতত পাখতূনিস্থানে ইংরাজকে কোনও উপজাতি আর ঘাঁটাবে না, কিন্তু পাখতূনরা ইংরাজকে নিশ্চিন্ত হতে দিল না। সোয়াত উপত্যকার রানিজাই উপজাতির একটি লশকর একদিন মালাকান্দের কাছে একটি বৃটিশ রক্ষিদলের ওপর হামলা করে তাদের পরাস্ত করল । রক্ষিদলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল। রানিজাই এলাকায় কয়েকটা গুরুত্তপূর্ণ জায়গায় ব্রিটিশের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের পরিণামস্বরূপ সে অঞ্চলের পাখতুনদের আক্রোশ দিনদিন পুঞ্জীভূত হয়ে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল ।

উত্তর পাখতূনিস্থানের শানদূর গিরি সংকটের কাছ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে নেমে গিয়ে পেশাওয়ারের প্রায় সত্তর কিলোমিটার উত্তরে পাঁজ কোড়া নদীর সঙ্গে মিলেছে সোয়াত নদী। এই দুই নদীর সঙ্গমের কাছেই মালাকান্দ পাস। রানিজাই উপজাতির গ্রামগুলি ছড়িয়ে আছে এই মালাকান্দ উপত্যকা অঞ্চলে। সংখ্যায় এরা আশপাশের অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় দুর্বল , কিন্তু মনোবলে দুর্বল নয়।

মালাকান্দে বৃটিশ রক্ষিদলের ওপর হামলার খবর পেশাওয়ারে পৌঁছন মাত্রই সত্বর দু হাজার সৈন্যের একটি বৃটিশ বাহিনী গঠন করে পাঠানো হল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যর ক্যাম্বেল এর অধিনায়কত্বে রানিজাই উপজাতির ঔদ্ধত্বের জবাবে । স্যর ক্যাম্বেলের গোলন্দাজপদাতিক ও অশ্বারোহি সৈন্য রানিজাই এলাক ,োয় পৌঁছেই তাদের দুটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম ঘিরে ফেলল। স্যর ক্যাম্বেল উপজাতীয় নেতাদের কাছে চরমবার্তা পাঠিয়ে দাবি জানালেন যে হয় তারা আত্মসমর্পণ করে ব্রিটিশের বশ্যতা স্বীকার করুক আর বৃটিশ রক্ষি দলের ওপর হামলা করার খেসারতস্বরূপ মোটা জরিমানা দিক নয়ত গোটা রানিজাই উপজাতিকে নির্মূল করে দেওয়া হবে।

রানিজাই পাখতূনরা ধারণা করতে পারেনি যে বৃটিশ বাহিনী এত অল্প সময়ের মধ্যে পেশাওয়ার থেকে মালাকান্দ অঞ্চলে পৌঁছে যাবেতাই তারা কোন বড় রকম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না । , রানিজাই সর্দাররা দেখলেন যে বৃটিশ বাহিনীর কামান গুলি তাদের গ্রাম ধ্বংস করে দিতে পারে নিমেষে। সে অবস্থায় জেনারেল ক্যাম্বেল এর ফৌজ এর মোকাবেলা করার চেষ্টা করলে ইংরাজ বাহিনীর অতি অল্পই ক্ষতি হবেকিন্তু রানিজাই , উপজাতি তাদের শিশু ও স্ত্রীলোক সমেত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সর্দার স্যর ক্যাম্বেল এর দাবি মেনে নিলেন এই শর্তে যে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী রানিজাই অঞ্চল থেকে অচিরে অপসারণ করবেন আর জরিমানা আদায়ের জন্য কিছু সময় দেবেন। স্যর ক্যাম্বেল সে প্রস্তাবে খুশি হলেন কারণ বিনা যুদ্ধেই রানিজাই উপজাতিকে পদানত করতে পারলেন তিনি।

হরিনাথ

বাসুদেব দাস



এ এক অদ্ভুত ছেলে। চার বছর বয়সও তখন তার হয় নি। বাবা প্রথম ভাগের বই এনে দিয়েছেন। ছেলের কিন্তু সবুর সয় না। সে বইটা পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। রান্না ঘরে কাজে ব্যস্ত এলোকেশী ছেলের পীড়াপীড়িতে গোটা বইটা একবার ছেলেকে পড়িয়ে দিলেন। সন্ধেবেলা পিতা ভূতনাথ দে বাড়ি ফিরে এলে ছেলেটি বইটি বিস্মিত পিতার হাতে তুলে দিয়ে গড়গড় করে আগাগোড়া মুখস্থ বলে গেল। শুধু তা-ই নয়, স্লেটের উপর অ,আ,ক,খ, সবগুলি অক্ষর অনায়াসে লিখে ফেলল। সবাইকে চমকে দেওয়া এই অসাধারণ মেধাবী ছেলেটিই হলেন পরবর্তীকালের পৃথিবী বিখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে।

বিখ্যাত রাশিয়ান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ কোরবাভস্কি কলকাতায় এসে হরিনাথের সঙ্গে আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে হরিনাথকে সেন্ট পিটাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পদ গ্রহন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। রাশিয়ান এবং সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান এবং বৌদ্ধ দর্শনে হরিনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য কোরবাভস্কিকে বিস্মিত করেছিল। সুপরিচিত জাপানি পণ্ডিত ওটানি কোজুই হরিনাথের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অনেকগুলি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি উপহার দেন। প্রখ্যাত জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ রিচার্ড ফন পিশেল হরিনাথের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ ও সংস্কৃতের ওপর তিনি বক্তৃতা দেন।

হরিনাথ দে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অদূরে আড়িয়াদহে ১৮৭৭ সালের ১২ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত আইনজীবি ছিলেন। রায়পুরের সরকারি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে হরিনাথের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৮৯৬ সনে লাতিন ও ইংরেজিতে ডাবল অনার্স সহ কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করে স্কলারশিপ পান। একই বছরে লাতিন ভাষা ও সাহিত্যে শতকরা ৭৭ ভাগ নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ পাশ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপোস-এর দুর্লভ সম্মান অর্জন হরিনাথের শিক্ষা জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে হরিনাথ পাঠগ্রহন করেন। বিভিন্ন ভাষায় হরিনাথের অসাধারণ কৃতিত্ব ও বিস্ময়কর প্রতিভা বিদেশী অধ্যাপকদের চমৎকৃত করে। গ্রিক, লাতিন, মধ্যযুগীয় জার্মান ভাষা, মধ্যযুগীয় ফরাসি ভাষা, আধুনিক জার্মান ও ফরাসি, ইতালিয়ান স্পেনিস ও পর্তুগিজ প্রভৃতি প্রাচীন ও ইউরোপীয় ভাষায় হরিনাথের বিশেষ দখল ছিল। তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রাপ্ত স্বর্ণপদক, পুরস্কার ও স্কলারশিপের তালিকা বেশ দীর্ঘ। ইউরোপে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময় ভারতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।১৯০৫ সালে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচয়িতা ও পরীক্ষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে হরিনাথ অনেক গ্রন্থাদি রচনা করেন। এই অনন্য সাধারণ প্রতিভা মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে অকালে ঝরে যাওয়ায় ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

পাহাড়ি মেয়ে দীপালি সিনহা

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়



মাউন্টেনিয়ার হিসেবে মেয়েদের কৃতিত্বের কথা বললেই মনে পড়ে ‘বাচেন্দ্রী পাল’ এর কথা। ১৯৮৪ সামে উত্তরাখন্ড নিবাসী এই মেয়ে অর্জন করেছিল প্রথম মহিলা এভারেস্ট বিজয়িনীর শিরোপা। কিন্তু এক বাঙালী মেয়ে দীপালী সিনহার নাম অনেকেই ভুলে গেছে, যে আরো কুড়ি বছর আগেই প্রথম মহিলা মাউন্টেনিয়ার হিসেবে ১৯৬০ সালের ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজকে চমকে দিয়েছিলেন। শহর কোলকাতার মধ্যবিত্ত বাড়ির এক মেয়ে বাড়ির কোন অভিভাবক ছাড়াই হিমালয় পর্বতারোহণে যাবে, এই ব্যাপারটাই ছিল বাঙালি রক্ষণশীল সমাজের কাছে বড় একটা বিস্ময় এবং নানা বাধার উদ্রেককারী।

কিন্তু সারা পরিবার ও সমাজের বিপরীতে গিয়ে বাবা ডাঃ দেবেন্দ্র চন্দ্র সিনহা মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সব বাধা পেরিয়ে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং এর এক কোর্স এর সূত্রে যেদিন প্রথম হিমালয়ের বুকে পা রেখেছিলেন দীপালি, বুঝতে পেরেছিলেন, এই হল তাঁর জীবনের গন্তব্য। তীব্র ঠান্ডা, তাঁবু-বাস, আর কঠিন পরিশ্রমের এই পথ চলাই তাকে আর পেছনে তাকাতে দেয়নি। কোন

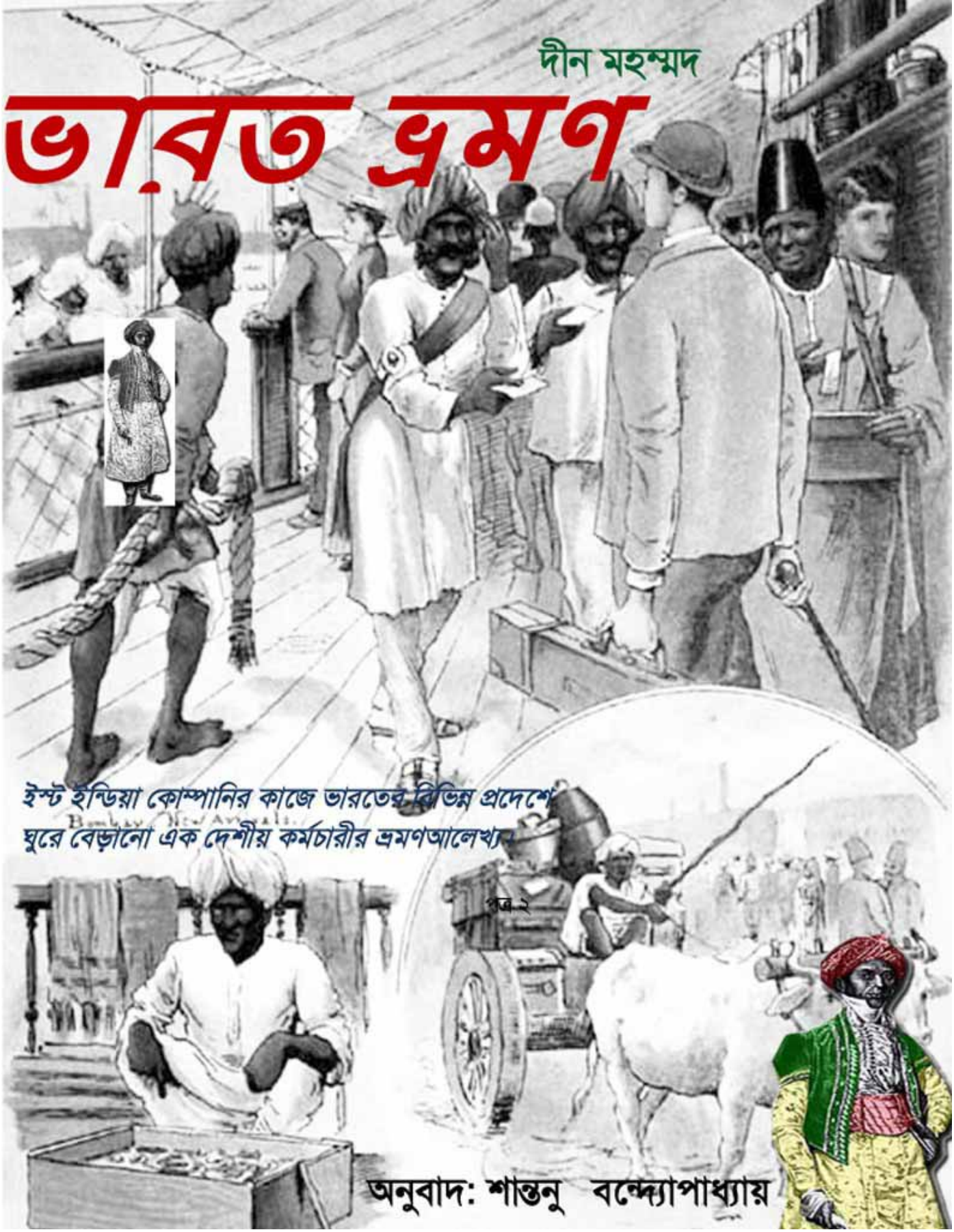


S INTRODUCING THE SU ER TO MRS. INDIRA GANDH

বাধা আর মানেননি দীপালি। তাঁর এই হার না মানা জেদই তাঁকে কাছাকাছি এনে দিয়েছিল এডমন্ড হিলারি, তেনজিং নোরগে, ক্রিস বনিংটন... আরো এমন অনেক মাউন্টেনারিং জগতের সব নক্ষত্রদের। ১৯৬৭ সালে নন্দা ঘাঁটি পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ থেকে শুরু করে জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই উনি কাটিয়ে দিয়েছেন মেয়েদের উৎসাহ দিয়ে ও সংগঠিত করে পর্বতের আহ্বানে সাড়া দিতে।



গুরুস্থানীয় বৃটিশ পর্বতারোহী ক্রিস বনিংটনের সঙ্গে



পত্র ২৫

ব্যাবসা কেন্দ্র হিসেবে কোন জায়গার সমৃদ্ধি কী পরিমাণে হয়,এবারে সে কথাই জানাব আপনাকে। জায়গাটা লন্ডনের সাপেক্ষে ২১ডিগ্রি ৩০মিনিট উত্তর অক্ষাংশ আর ৭২ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। গত শতকের মাঝামাঝি হাতে গোনা ব্যবসায়ীদের কর্মস্থল ছিল। তাদেরই কর্মক্ষমতায় ব্যবসার সুবাদে বহু



মানুষকে এখানে এসে থাকতে উৎসাহিত করলেন। ফলে শিল্পকলার উন্নতির সাথে সাথে ব্যাবসা ও জনসংখ্যা দুইই বেড়ে উঠল। কয়েক বছরের মধ্যেই সুরাত সারা পৃথিবীতে অন্যতম বিশিষ্ট শহর হিসেবে গণ্য হয়ে উঠল।

প্রতিরক্ষার কারণে শহরের চারপাশে গড়ে উঠল দেওয়াল ও মিনার। দক্ষিণ পশ্চিমদিকে একখানা দুর্গ যার চার কোণাতে চারটে মিনার ছিল জলপথ ও স্থলপথে শহরে ঢোকার রাস্তাগুলিতে নজরদারি চালানোর জন্য। যদ্দুর জানা আছে শহরে দু লাখ লোক বসবাস করেন। মুঘল দরবার যখন শক্তিশালী ছিল, ছোটো বড়ো যে কোন ধর্মের ব্যবসায়ীরাই ঠাঁই পেতেন এখানে। আর ব্যবসায়ীদের সততাও ছিল তেমনি। টাকার থলেতে মার্কা করে পরিমাণ বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কেউ তা খুলে গুণেগেঁথে নিত না। হিন্দু দেশীয়দের সংখ্যাই বেশি, বিশেষত বানিয়াদের মধ্যে। সারা পৃথিবীতে সকলের মধ্যে সুব্যবসাদার এরা। সততা, নিষ্ঠা, ব্যবহার এবং ব্যবসায়িক আদান প্রদানে এদের জুড়ি মেলা ভার। এদের মধ্যে অত্যধিক আবেগ জাগিয়ে তোলা অসম্ভব, এবং যখন অন্যরা আবেগে জর্জর, এরা চুপটি করে অপেক্ষায় থাকবেন, ততক্ষণ, যতক্ষণ সামনের লোকের ওপর এর প্রভাব কেটে যায়। ফলে বাকিদের তুলনায় যে একটু বাড়তি সুবিধের দিকেই থাকেন এঁরা তা বলাই বাহুল্য।

সুরাতের লাটসাহেব দরবারেই তার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালান। ফৌজদারি হোক কিংবা দেওয়ানি, তার দরবারে আনা হলে তৎক্ষণাৎ তার চালান হয়। হিন্দু ও মুসলমান দুই রীতিতেই এখানকার বাড়িগুলি তৈরি। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উচ্চবর্গীয়দের বাড়িগুলির দরজা। সেগুলো ইচ্ছে করেই এমনভাবে বানানো হয় যেন একদল আক্রমণকারী হামলা করলো চট করে ঢুকতে না পারে। রোখা যায়। থাকার ঘরগুলো পেছনের দিকে, মহিলাদের একটু বাড়তি সুরক্ষার জন্য। মুর সম্প্রদায়ের লোকেরা, বলতে গেলে বেশ পরশ্রীকাতর, হিংসুটে। তাদের আবার অন্তত একখানা ঘর চাইই চাই, যার মাঝমধ্যিখানে থাকবে একটা ফোয়ারা, যাতে ঘরে বেশ একটা ঠান্ডা ভাব থাকে আর জল পড়ার শব্দে বেশ ভাল ঘুমও হয়। দিওয়ানখানার একদিকে উন্মুক্ত বাগান, সেখানে ঝরনা, ফোয়ারা, আঁকাবাঁকা জলধারা, রঙবেরঙের ফুলের বাগিচা সব মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনুপম রচনা। গ্রীষ্মে, শহরের বাইরে বাগানবাড়িতে দলবেঁধে গিয়ে আনন্দ-ফুর্তি – প্রায়শই হয়ে থাকে। জলাশয়ের পাশে, ঠান্ডা ছায়াঘন এলাকায় সেসব বাবুদের বাগানবাড়ি। ইংরেজদেরও বাগানবাড়ি আছে এখানে। কলকারখানার সাহেবদের আরাম করার জন্য।

সুরাতের রাস্তাঘাটগুলি অপরিকল্পিত, আর বাড়ির একতলার ওপর দোতলা, তারপর তিনতলা এমনভাবে বানানো যে একটার ওপর আরেকটা প্রায় হুমড়ি খেয়ে আছে যেন। পাশাপাশি দুটি বাড়ির একেবারে ওপরের তলা দুটো প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে। ফলে নিচের রাস্তা প্রায়ান্ধকার, হাওয়াবাতাস চলার অবধি জায়গা নেই। অথচ সুযোগসুবিধের কথা বললে কিন্তু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুরাতের চেয়ে ভালো জায়গার কথা আমি ভাবতেই পারি না। সমস্ত জিনিসপত্রের অঢেল জোগান বাজারে, খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা, বনমুরগি বা ওই জাতীয় শিকার বেশ ন্যায্য দামেই বাজারে মিলবে। ফলমূল-সবজির কথা তো ছেড়েই দিলাম। প্রাচ্যের অন্যান্য জায়গার মতো, শৌখিন জিনিসও মেলে এখানে। গণস্নানাগারও রয়েছে যাকে বলে গোসলখানা। যেখানে হাত পা ঘসে দেবার মতো নানারকম পরিষেবা পাওয়ার সুযোগও আছে। আগে মালিশ টালিশের রেওয়াজ থাকলেও এখন সেসব নেই। পুরোনো লেখাজোখায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

দাস বা চাকরবাকরদের দিয়ে এমন ম্যাসাজের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন সেনেকা (*গ্রিক দার্শনিকঃ অনুবাদক*) তার চিঠির ছত্রে। " আমরা কি টানটান হয়ে এলিয়ে শুয়ে থাকব আর আমাদের দাসেরা এসে খালি মালিশ টালিশ করে দেবে, হাত পায়ের আঙুল মটকে দেবে, এই কি বাসনা আমাদের?"

বাস্তবিক যাকে দলাই মলাই করা হয়, তিনি টানটান হয়ে সোফায় বা কৌচে শুয়ে থাকেন, আর তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘসে দেয়া হয়, হাত পায়ের আঙুল টেনে, মটকে, ঝরঝরে করে তোলা হয়। এতে করে জোড়গুলো নমনীয় হয় শুধু তাইই না, দেহের সংবহনতন্ত্রটাকে আরো সচল করে তোলা হয়। নইলেই গাঁটে গাঁটে তরল জমে যাবার সম্ভাবনা। এই গরমের দেশে, দলাই মলাই করবার সপক্ষে এটাই সবচেয়ে জোরালো যুক্তি।

পত্র ২৬



সুরাতের কাছেই বোম্বাই, দ্বীপশহরই বলা যায় তাকে। সারা পৃথিবীতে এমন চওড়া সমুদ্র-খাড়ির উদাহরণ দুটি নেই। পর্তুগিজ শব্দের অপভ্রংশ বুয়ন বাহিয়া (*বুয়ন বাহিয়া মানে ভাল বন্দর অথবা ভালো সমুদ্রঃ অনুবাদক*) থেকেই বোম্বে শহরের নাম।* বন্দরটা এত বড়ো যে অসংখ্য জাহাজ নোঙর করে থাকতে পারে। চমৎকার নোঙরের সুবিধে, আর অর্ধবৃত্তাকার আকারের ফলে খোলামুখের দিকে সমুদ্র-বাতাসের ঝাপটা থেকেও ডাঙার আড়াল পাওয়া যায়। দুর্গগুলিও যথারিতী চতুষ্কোন, শক্ত পাথরে তৈরি এবং প্রকৃতপক্ষে সারাটা দ্বীপভূমি জুড়েই ছোটোখাটো এমন দুর্গ দেখা যায়। বোম্বের ইংলিশ চার্চ বেশ পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা; বিশাল জমির ওপর সবুজের মাঝে দাঁড়িয়ে চার্চটি, ভেতরে পায়ে চলার রাস্তা, তার ধার দিয়ে সারিবাঁধা গাছ আর চারপাশে মূলত ইংরেজ অধিবাসীদেরই বাড়িঘর। একতলা বাড়ি সব, রোমান ধাঁচের, বাড়ির সামনে পেছনে একখন্ড করে উঠোন, অফিসঘর আর আউটহাউস। চুন আর পাথর দিয়ে মজবুত করে বানানো, বাইরেটা চুনকাম করা; দেখতে শালীন, কিন্তু সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসে যায়। কয়েকজনের বাড়িতে কাচের জানালা লাগানো, শার্সি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ চৌকো করে কাটা ঝিনুকের খোলা দিয়ে বানানো হত যাতে আলোও ঢোকে আবার চোখ ঝলসানো রোদ্দুরের থেকে বাঁচা যায়। সমুদ্রতীর থেকে বেশ খানিকটা ভেতরকার প্রদেশে বেশ কদিনের জন্য হাট বসে, এই নয় কি দশদিন। এখানেই ছোট ছোট চালাঘরে বানিয়ারা তাদের পসরা নিয়ে



বসেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে কম্পানির লোকেরা বা দালালেরা অগ্রিম টাকা দিয়ে সেসব জিনিসের বন্দোবস্ত ঢের আগেই করে নেয়। এখানকার মাটির জন্য উপযুক্ত নারকেল, পাম প্রভৃতি গাছই বেশি পরিমাণে চাষ হয়। ধরুন নারকেল গাছ, এর সম্পর্কে অত খুঁটিনাটি তথ্য জানা নেই, কিন্তু যা আমি দেখেছি বা বুঝেছি এর গুণাবলী আর ব্যবহারের জন্য এককথায় অনবদ্য। এই গাছের গুণাগুণ দেখে এর অসাধারণত্বের কথাই মনে জাগে। অর্থকরীভাবেও যথেষ্ট ফলদায়ী আর মানুষের খুবই উপকারী ফল এটা। অনেকটা পাম গাছের মতোই, হতে পারে একই গোত্রের উদ্ভিদ। নারকেলের পাতা ঘর ছাইতে লাগে, ছোবড়া দিয়ে মজবুত, জাহাজ বাঁধার মতো অবধি দড়ি বানানো হয়। শাঁস শুকিয়ে নিয়ে তেল বার করা হয়, যা আবার নানান ব্যবহারে লাগে। শুকনো শাঁসও চালান যায় এদিক সেদিক। এ ছাড়াও আরক, গুড় ইত্যাদি আরও নানানরকম জিনিস নারকেলের শাঁস থেকে তৈরি হয়, সব মনে করে করে লেখাও দুষ্কর। নারকেলচাষ অত্যন্ত সহজ। খাঁড়ি কেটে জল এনে ফেল গাছের গোড়ায়, আর চারধারে সার ছড়িয়ে দাও। সার বলতে মাছের দেহাবশেষ, লোকেরা সাধারণভাবে বাক-শ সার বলে। এখানে ওখানে ছড়ানো ছেটানো আরো পাম গাছের মতো গাছ, বুনো পাম গাছই ধরুন। চলতি কথায় বলে ব্রাব, (পর্তুগীজ শব্দ ব্রাবো থেকে এসেছে, যার মানে বুনো।) বিস্বাদ একধরনের ফল জন্মায় এতে, আকারে ন্যাশপাতির মতো, গাছের একেবারে ডগায় হয়। আর এ থেকে বা বলা ভালো এর রস থেকে যে আরক তৈরি হয়, নারকেল থেকে প্রস্তুত আরকের তুলনায় তা ঢের ভালো। সমুদ্রের পাড়েই সাধারণত এর চাষাবাদ হয়ে থাকে, কেননা বেলেমাটি এর জন্য আদর্শ। এই গাছই বাবুই পাখিরা বেশ পছন্দ করে, আর এর ডালেই বাসা বাঁধে। বাসাগুলি অভিনব, ডালের সরু আঁশ ও ঘাস থেকে তৈরি করা সে সব বাসা অননুকরণীয় সৃষ্টি। পাখিগুলি তিতিরের মতো, তবে না পালকের জন্য, না ভালো শিস দেবার জন্য, বা নিদেন খাবার টেবিলের জন্যও এদের হিসেবে আনা হয় না।

এখানে খুব দেখতে পাবেন, বটগাছ। বিশাল বিশাল, খুব লম্বা, ডুমুরের আরেকটা প্রজাতিই ধরুন। গাছের মূল কান্ড থেকে কিছু কিছু ডাল সোজা জমির সমান্তরালেই বেরোয়, আর তা থেকে বহু ঝুরি নামে।

সেগুলি মাটিতে পৌছে শেকড় চারিয়ে দেয়, যেন একেকটা স্তম্ভ, মোটা মোটা ডালগুলির ভার এরাই বহন করে। এর ফলে একটা গাছ থেকে কুড়ি তিরিশটা এরকম ঝুরি নেমে বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে ফেলে। বেশ বড়সড়ো এলাকা জুড়েই বিছিয়ে থাকে। প্রায় জনা পাঁচশ লোক তার তলায় অক্লেশেই আশ্রয় নিতে পারে। শুধু বটই নয়, কোনো ভারতীয় গাছই কোনসময়েই একেবারে পাতা ঝরিয়ে ফেলে না। এরা চিরহরিত। বটগাছের তলায় হিন্দুরা যেমন প্রায়শই দেখা যায়, দেবতার মূর্তি স্থাপন করে উৎসব পালন করেন, ফকিরেরাও নানান কেরামতি করেন, নিজেদের স্ব স্ব ধর্ম পালন করে। বিখ্যাত কবি মিলটন তার প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে এর একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন-

বটের ফলের নেই তো পরিচিতি
কিন্তু যেমন ভারতবাসী জানি
মালাবার কি দাক্ষিণাত্য ভূমি
হাত বাড়িয়ে থাকাটাই তো রীতি।
লম্বা চওড়া শাখায় ভরা গাছে,
জমির দিকে নামিয়ে দেয়া ঝুরি
সেখান থেকেই ফুটছে দেদার কুঁড়ি
মায়ের মতোই পাখ ছড়িয়ে আছে।
ঝুরিনামা জমির পরে ছায়া
বিছিয়ে দেয়া আকাশতলের মায়া।

---

*এ শহরের এখনকার নাম হয়েছে মুম্বই। নতুন নামকরণের উৎস স্থানীয় মুম্বা (মহা অম্বা) দেবীর মন্দির। প্রাচীনতম যে নাম পাওয়া যায় তা হল কাকামুচি এবং গালাজুংকজা। ১৫০৭ সালে সালে লেখা মিরাট ই আহ্‌মেদি নামের বইতে আলি মহম্মদ একে "মানবাই" নামে ডেকেছেন। আবার ১৫০৮ সালে পোর্তুগিজ লেখক গ্যাসপার করেয়া তাঁর লেনডাস ডা ইন্ডিয়া বইতে একে ডেকেছেন "বোম্বাইম" নামে। (বম বাইম=ভালো ছোটো উপসাগর) ১৫১৬ সালে পোর্তুগিজ পরিব্রাজক দুয়ার্তে বারবোসা থানে আর মুম্বইকে একত্রে টানা-মায়াম্বু নামে অভিহিত করেছিলেন। বোম্বাই আর মুবই এই দুই নামেরই খবর একই সময়ের ইতিহাসে এইভাবে পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল বোম্বে নামটা চালু ছিল। এখন নতুন করে মুম্বই নামটা চালু হয়েছে–সম্পাদক

সারস পাখির পালক

মৌসুমী রায়



অনেক দিন আগে ইউজান নামে এক ভারি সুন্দর ছেলে ছিল।তার ছিল এক ছোট ভাই, হজুগুর। তাদের বাবা-মা অনেকদিন আগে মারা গেছিল,তাই ইউজান একাধারে ছিল হজুগুরের বাবা আর মা।ইউজান সারাদিন বনে বনে শিকার করে বেড়াত আর ছোট্ট হজুগুর ঘর সামলাত।

একদিন হয়েছে কী, অন্যদিনের মতন ইউজান বনে গেছে আর হজুগুর উঠোন ঝাঁট দিতে বেরিয়েছে। হঠাৎ মাথার উপরে সারসের তীব্র আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখে বাড়ির ঠিক উপরেই বিশাল সাদা রঙের সাতখানা সারস পাক দিয়ে উড়ছে। কী অপূর্ব সে দৃশ্য ! হজুগুর হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল।

একে একে নেমে এল সেই বিশাল সারসেরা। উঠোন জুড়ে ধবধবে সাদা ডানা ছড়িয়ে তারা হেঁটে বেড়াতে লাগল। তারপর হঠাৎ তাদের পালক ভরা চামড়াগুলো এক এক করে খসিয়ে দিয়ে হয়ে গেল সাতখানি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। শুরু হল হাসি, আনন্দ, নাচ-গান আর ফূর্তির ফোয়ারা। সারাদিন কোথা দিয়ে যে চলে গেল, বোঝা গেল না। সুয্যি গেল পাটে আর সেই সাত সুন্দরী চুপচাপ পালক ভরা চামড়া গায়ে দিয়ে ফের সাতখানা সারস হয়ে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল।

ইউজান ফিরে দেখে উঠোনে ঝাঁট পড়েনি, বালতিতে জল ভরা হয়নি, কাঠ কাটা হয়নি, উনুনে আগুন জ্বলেনি।

“ভাইয়া তো কাজে ফাঁকি দেয় না ! আজ কী যে হল ওর! নিশ্চয় এর পিছনে কোন রহস্য আছে !”

এই ভেবে ইউজান আর পরেরদিন বনে গেল না। বনে যাবার ভান করে , বেড়ার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে রইল। পরেরদিন আবার আকাশ থেকে নেমে এল সাত সারস তাদের ধবধবে সাদা বিশাল বিশাল ডানা

উড়িয়ে। উঠোনে নেমে চামড়া খসিয়ে হয়ে গেল এক একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা...আর ছোট্ট হজুগুরকে নিয়ে মেতে উঠল খেলায়। বেড়ার আড়াল থেকে ইউজান সব দেখছিল। সবার মধ্যে একটি কন্যা,যে নাকি সব চাইতে সুন্দর,তাকে তার ভারি পছন্দ হল। সারাদিন হেসে খেলে কেটে গেল আর সুয্যি যেই না পাটে উঠল, অমনি তড়িঘড়ি করে কন্যারা গায়ে পালকের চামড়া চাপাতে গেল। ইউজান এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সঙ্গেসঙ্গে সে তার পছন্দের কন্যার পালকের চামড়া লুকিয়ে ফেলল।

পরের মুহূর্তেই ছয় সারস চীৎকার করে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল। পড়ে রইল সেই সুন্দরী; ভয়ে তখন সে কাঁপছে,চোখে তার জল এসে গেছে। হাতজোড় করে সে তার পালকের চামড়া ফেরত চাইল ইউজানের কাছে। ইউজান কী বলল তাকে,জানো ?

“সারাদিন লুকিয়ে দমবন্ধ হয়ে শুধু তোমাকেই দেখেছি সুন্দরী, তুমি কি ফিরে আমাকে একবার দেখবে না ? যদি ঘুরে দেখ আর আমাকে তোমার ভাল লাগে,তাহলে থেকে যেও আমার সাথে আমার বৌ হয়ে।”

কন্যা একবারটি তার ভেজা চোখে ইউজানের সুন্দর হাসিমুখখানার দিকে তাকাতেই তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল।ফিসফিস করে বলল, “আমি থাকব।”

“তাহলে তোমার পালকের চামড়াটার কী করি ? টাঙিয়ে রাখি না পুড়িয়ে ফেলি ?”

শিউরে উঠে কন্যা বলে, “না না,পুড়িয়ো না...তাহলে মহা সর্বনাশ!আবার,সামনাসামনিও রেখো না...তাতেও ঝামেলা।”

অতএব ইউজান করল কী, পালকভরা চামড়াটা একটা লোহার সিন্দুকে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনখানা শক্তপোক্ত তালা ঝুলিয়ে দিল তাতে। তারপর সারস কন্যা আর ইউজান বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।সারস কন্যার মতন ভাল বৌ আর হয় না, ইউজান আর মাতৃহীন ছোট্ট হজুগুরের আর আনন্দের শেষ রইল না।

কিন্তু গল্প এখানে ফুরলো না। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে তারপর।হজুগুরের খুব ইচ্ছে সেও দাদার মতন শিকারি হয় আর দাদাকে সাহায্য করে।একদিন যখন ইউজান ঘরে নেই বালক হজুগুর দাদার পুরনো এক তীরধনুক খুঁজতে গেল। সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে সে অবশেষে সেই সিন্দুকের তালা ভেঙে ফেলল, যেখানে সারস-কন্যার পালকের চামড়াখানা লুকানো ছিল। বোকা হজুগুর তখন টেরও পায়নি যে বৌদিদি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সারস কন্যার কী যে হয়ে গেল! সে বলল, “আমায় ওটা দে না ভাই,তার বদলে তোকে আমার এই ছোরাটা দেব।”

ছোট্ট হজুগুর আর ছোরার লোভ সামলাতে পারল না,পালকভরা চামড়াখানা বের করে দিয়ে দিল।

সারস-কন্যার কী যে হল, ডানাজোড়া সে গায়ে চড়িয়ে বাইরের উঠোনে গিয়ে টলমল করে যেই না দাঁড়াল, অমনি হয়ে গেল এক বিশাল সাদা ডানাওয়ালা সারস। আর তখনই মাথার উপর চক্কর দিতে দিতে উড়ে এল আরো ছয় সারস, তার বোনেরা। সারস-কন্যা ক্ষীণ একটা চেষ্টা করল পালকভরা চামড়াটা ফেলে দিতে। কিন্তু আর পারল না, একটা আর্ত চীৎকার করে ধপধপে সাদা ডানাগুলো ছড়িয়ে তার ছয় বোনের সঙ্গে উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল সুদূর আকাশে।

হজুগুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সাত সারসের দল চিরকালের মতন বিদায় জানিয়ে চলে গেল আকাশের বুকে আর পড়ে রইল একখানি সারসের পালক। ইউজান শিকার থেকে ফিরে এসে সব দেখল,সব শুনল। তারপর যা বোঝার তা বুঝে নিয়ে তার বাদামি রঙের ঘোড়াটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুনিয়ার পথে।

বুকের মধ্যে তার একখানি ধবধবে সাদা সারসের পালক। দরকার হলে সারা দুনিয়া ঘুরে তার বৌকে সে ফিরিয়ে আনবে,এই তার পণ।

ঘুরতে ঘুরতে মাস কেটে গেল,বছর ঘুরে গেল। অবশেষে এক আকাশছোঁয়া পাহাড়ের মাথায় বরফের মুকুট,তার তলায় এসে একদিন হাজির হল ইউজান। খানিক উপরেই এক বরফ সাদা বাড়ি, চুপচাপ তাতে গিয়ে ঢুকে পড়ল সে। ভারি সুন্দর আর আরামের সেই ঘরবাড়ি,আর ঘরের মধ্যে আগুনের পাশে বসে আছে এক প্রকান্ড ঈগল আর সোনার দোলায় করে কাকে যেন দুলিয়ে চলেছে। ইউজানকে ঢুকতে দেখে সে ঈগল মানুষের গলায় বলে উঠলো, "তুমি কি ইউজান ? বৌকে খুঁজতে এসেছো ?"

অবাক হয়ে ইউজান বলল,"হ্যাঁ,ঠিক তাই। আমার প্রিয়তমার খোঁজে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছি।তুমি তার খোঁজ জানো ?"

"বলছি। তার আগে দোলায় তোমার ছেলেকে দেখ!"

অবাক হয়ে ইউজান দোলার মধ্যে দেখে এক ফুটফুটে সুন্দর খোকা;ইউজানকে দেখে খোকা হাসিমুখে তার ফোলাফোলা দুই হাত বাড়িয়ে দিল দেখে ঈগল তারিফ করে বলে ফেলল, "ছোট্ট ঝর্ণাও চিনে ফেলেছে বিশাল নদীকে। খোকা, তোমার বাবাকে দেখ। আর ইউজান বাছা ,ছেলের সঙ্গে একটু খেল। দোলা দিয়ে দিয়ে আমি থকে গেছি।"

খোকাকে নিয়ে ইউজান খেলছে আর মজে গেছে;খোকার হাসি আর শেষ হয় না, এমন সময়ে দোরগোড়ায় পায়ের শব্দ হল শুনে ঈগল বলে উঠল, "তোমার বৌ কি তোমাকে দেখে খুশি হবে ...কে জানে ? আপাততঃ চটপট লুকিয়ে পড়।"

ঘরের এক কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে ইউজান দেখতে পেল যে,সারস-কন্যা ঘরে ঢুকেই তার পালকের চামড়া খুলে ফেলে আবার সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল। খোকা বাবাকে না দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কাঁদছিল, তার সারস-কন্যা মা খোকাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতেই তার কান্না থেমে গেল । মা আর ছেলেকে একসঙ্গে দেখে ইউজান আর অপেক্ষা করতে পারল না। সোজা বেরিয়ে এসে পালকের চামড়াখানা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"এ কী করলে? এ কী করলে প্রিয় আমার?" বলতে বলতে সারস-কন্যার চোখ বুঁজে এল, শরীর ঢলে পড়ল, শ্বাস গেল নিভে। হায় হায় করতে করতে ইউজান প্রিয়তমার নিথর দেহখানি তুলে ধরে শুইয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, "যেভাবেই পারি,আমাকে তোমার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনব।"

প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ইউজান কীই না করল এরপর...

খোকাকে ঈগলের কাছে রেখে আকাশগঙ্গা পেরিয়ে প্রথমে গেল তারার দেশে, তারপরে চাঁদের দেশে আর অবশেষে সুয্যির দেশে। তারার কন্যা, চাঁদের কন্যা আর সুয্যির কন্যার সাহায্যে বৌয়ের প্রাণ ফিরিয়ে আনল। সে আর এক গল্প বটে।

তারপর ? তারপর আর কী ? দিগ্বিজয়ী বীরের মতন ইউজান ফিরে এল তার গ্রামের বাড়িতে,সঙ্গে সুন্দরী বৌ,ফুটফুটে ছেলে,প্রকান্ড ঈগল আর ধনসম্পত্তি।

বাড়ির দরজায় এক সুপুরুষ যুবক তাদের দেখে হাসিমুখে দৌড়ে এল। ইউজান অবাক হয়ে বলে, "আরে, আমার সেই ছোট্ট ভাইটি না?"

হজুগুর হাসতে হাসতে বলে, “দাদা,আমি সত্যি এত বড়ো হয়ে গেছি যে আমায় চিনতে পারছো না ? আর, বৌদি তুমি ফিরে এসেছো বলে যে কি আনন্দ হচ্ছে! আমার সেই ভুলের কথা কি আমি আর ভুলতে পেরেছি কখনো? এসো,সবাই ঘরে এসো।”

ব্যস,গল্প এখানেই শেষ।এরপর তারা সত্যি সত্যিই সুখে সংসার করতে লাগলো।

(ইয়াকুত লোককথা)

শ্রীমতি ইংবোর্গ র‍্যাপোপোর্ট



উমা ভট্টাচার্য

তিনি একজন জার্মান চিকিৎসক। তাঁর দীর্ঘ জীবনের লড়াই ছিল নাজি জার্মানির এক অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানি-নাজি আতঙ্কমুক্ত জার্মানিতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিকিৎসক ব্যক্তিত্ব। তিনি বিশ্বের জ্যেষ্ঠতম ডক্টরেট উপাধিপ্রাপক। তাঁর নাম গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ অমর হয়ে থাকবে।

যে সময়ে সারা ইউরোপ জুড়ে সংক্রামক ডিপথিরিয়া রোগ অতিরিক্ত শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ ছিল, সেই সময়েই ডিপথেরিয়ার মত মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে তিনি গবেষণা করে থিসিস লিখেছিলেন। ১৯৩৮ সালে জমা দেওয়া তাঁর সেই থিসিসকে আর্যত্বের গর্বে গর্বিত জার্মান নেতারা স্বীকৃতি দিলেন না। সেটা ছিল নাজি জার্মানির উত্থানের সময়। হিটলারের ক্ষমতাসীন হওয়ার ৫ বছর পরের ঘটনা। ইহুদি জাতির সঙ্গে ন্যুনতম সংস্রব আছে এমন সব মানুষকেই তখন নাজি 'জাতিবৈর আইনের' আতস কাঁচের নীচে ফেলে বিচার করা হ'ত যে, তার শরীরে কতটুকু আর্যরক্ত আছে। 'ক-পোয়া আর্য' সে। সেই ইহুদি সংস্রবযুক্ত মানুষদের শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা,চাকুরি, অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করাই ছিল আইন। ইহুদি নিধন তখনও পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়নি,তাই হয়ত তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখা থিসিস, তা যতই মানুষের কল্যানের জন্য হোক না কেন তা গৃহীত হয়নি সে সময়।

সেই থিসিস অবশেষে গৃহীত হল তাঁর ১০২ বছর বয়সে। ৭৭ বছর অপেক্ষা করতে হল হামবুর্গের মেডিক্যাল একাডেমিক ফ্যাকাল্টির অনুমোদন পেতে। 'বেটার লেট দ্যান নেভার' প্রবচনটি সত্য হল তাঁর জীবনে। সেই ২৫ কি ২৬ বছর বয়সে লেখা থিসিসের হাত ধরে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি মিলল জীবনের উপান্তে এসে, ২০১৫ সালে। যা তাঁর একান্ত প্রাপ্য ছিল তা থেকে কেউ তাঁকে বঞ্চিত করতে পারেনি । হয়ত এই স্বীকৃতির অপেক্ষাই তাঁকে আজীবন কর্মক্ষম রেখেছিল,আর জীবিত রেখেছিল।

বালিকা ইংগিবোর্গ স্যিল্‌ম বা সাইলেম (Syllm or Sillem) ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট জার্মান পিতামাতার সন্তান।তাঁর পিতা পল ফ্রেডারিক সাইলেম, আর মা মারিয়া সাইলেম ছিলেন প্র্যোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী। পিতা ছিলেন হামবুর্গের বিখ্যাত, ঐতিহ্যশালী ও উল্লেখযোগ্য 'সাইলেম প্র্যোটেস্ট্যান্ট পরিবার'-এর উত্তরসূরী। জার্মান জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, রক্ষণশীল মানুষটি ছিলেন পেশায় একজন ব্যবসায়ী। বাস ছিল ক্যামেরুনের ক্রিবি নামে এক জার্মান কলোনিতে।

১৯১২ সালের সেপ্টেম্বরে ইংগিবোর্গের জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁদের পরিবার চলে যায় হামবুর্গে,সেখানেই তাঁর পড়াশুনা আর বেড়ে ওঠা। মেধাবী ছাত্রী ইংগিবোর্গের ডাক্তারি পড়ার প্রেরণা ছিলেন ডাক্তার অ্যালবার্ট সোয়েৎজার (Schweitzer),একজন জার্মান লুথেরান থিওলজিয়ান ও একজন সহৃদয় চিকিৎসক। ইংগিবোর্গ ১৯৩৭ সালে হামবুর্গ ইউনিভার্সিটি থেকে স্টেট এগজামিনেশন পাশ করলেন একজন চিকিৎসক হিসাবে। পরের বছরেই ১৯৩৮ সালে তিনি পেশ করলেন ডিপথেরিয়া নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্র। তাঁর গবেষণাপত্র বাতিল হল, ডিগ্রিও দেওয়া হলনা তাঁকে,কারণ নাজি জার্মানির 'জাতি বিদ্বেশী আইন' অনুসারে তিনি ছিলেন একজন 'মিসক্লিং'(Mischling) ।

নাজি সমাজকর্তারা সেইসব নাগরিককে 'মিসক্লিং' বলে অভিহিত করত যাদের বাবা-মায়ের মধ্যে কেউ একজন আর্য অর্থাৎ খাঁটি জার্মান আর অন্যজন ইহুদি বা কোনওভাবে ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্কিত। জার্মানিতে তখন এক ঘৃণ্য সামাজিক পরিস্থিতি, যথেষ্ট উপযুক্ত হলেও কেউ নিজেকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলে, ডিগ্রি লাভ করতে হলে তাকে ব্লাড রিপোর্টও জমা দিয়ে প্রমাণ দিতে হত তার খাঁটি জার্মানত্ব। ইংগিবোর্গের গবেষণাপত্রের উৎকর্ষ দেখে তাঁর গবেষণার গাইড অধ্যাপক রুডলফ ডেঘউইট্‌ৎজ, তাঁর কাজের প্রশংসা করেছিলেন,কিন্তু স্বীকৃতি দিতে পারেননি। আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, তিনি ইংগিবোরের থিসিসটি গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু সেটা করতে পারেননি জার্মানিতে চালু রেসিয়াল আইনের জন্য। তাঁকেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল মানবদরদি নানা মত প্রকাশের জন্য।

জার্মান কর্মকর্তারা খুঁজে বের করেছিল যে ইংগিবোর্গের মা মারিয়া খ্রিষ্টান হলেও রক্তসম্পর্কে ইহুদি জাতি উদ্ভুত। ইহুদি মায়ের সন্তান হিসাবে তাঁকে 'দ্বিতীয় শ্রেণির মিসক্লিং' বলে চিহ্নিত করে,উচ্চতর শিক্ষার অনুপযুক্ত ঘোষণা করে। তাঁর থিসিস পেপারটি বাতিলের ঝুড়িতে চলে গিয়েছিল,তাঁকে মৌখিক পরীক্ষাও দিতে দেওয়া হয়নি। উন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই সময় হাজারে হাজারে অনার্য বলে চিহ্নিত ছাত্র ও শিক্ষককে(ইহুদিদের) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল, অনেকের ঠাঁই হয়েছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নামক মৃত্যুপুরীতে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খানিকটা আলাদা হয়েছিল।

তাঁর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার আগেই, তিনি ঠিক করলেন এমন অপমানকর পরিস্থিতিতে জার্মানিতে থাকার কোনও অর্থই নেই। ১৯৩৮ সালেই চলে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নতুনভাবে শুরু করলেন জীবন। ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওহিও প্রভৃতি মেডিকেল স্কুলে ইনটার্নশিপ করলেন। গ্র্যাজুয়েশন করলেন ফিলাডেলফিয়াস্থিত 'উইমেনস্ মেডিকেল কলেজ অফ পেনসিলভানিয়া' থেকে, এম ডি ডিগ্রিও পেলেন।

কর্মজীবন শুরু করলেন সিনসিনাটি হসপিটালে। ১৯৪৬ সালে বিয়ের পর যুগ্মভাবে অনেক সাফল্য লাভ করলেন। তাঁর স্বামী স্যামুয়েল মিটজা র‍্যাপাপোর্ট ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসক ও বায়োকেমিস্ট। জাতিতে তিনিও ছিলেন ভিয়েনার একজন ইহুদি উদ্বাস্তু। 'রক্ত স্ংরক্ষণ' নিয়ে অভূতপুর্ব কাজের সাফল্যের জন্য প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের কাছ থেকে স্যামুয়েল 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' পেলেন।

এর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই স্ত্রী ইংগিবোর্গ সিনসিনাটি চিলড্রেন হাসপাতালের শিশুবিভাগের প্রধান পদে উন্নীত হলেন। মানবদরদি ইংগিবোর্গ সেখানে কাজ করতে করতেই প্রত্যক্ষ করলেন দরিদ্র, কালো মানুষদের দীনতম অবস্থা। তাদের অধিকার আর অবস্থার পরিবর্তনের কাজ করতে গিয়ে পরোক্ষে জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতিতে। স্বামী ছিলেন কমিউনিস্ট। তাঁরা দুজনে প্রতি রবিবার সকালটা কাটাতেন সিনসিনাটির দরিদ্র দিনমজুরদের বস্তিতে,অভাবী এই মানুষদের মধ্যে তাঁরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করতেন।

সিনসিনাটির গোয়েন্দারা শীঘ্রই তাঁদের কাজের খোঁজ পেয়ে গেলেন। 'আন-আমেরিকান অ্যাকটিভিটিস কমিটি' ইংগিবোর্গ আর তাঁর স্বামী, দুজনের বিরুদ্ধেই কমিউনিস্টসুলভ কার্যকলাপে যুক্ত থাকার প্রমাণ অনুসন্ধান শুরু করল।

সে'সময় মিষ্টার র‍্যাপোপোর্ট গিয়েছিলেন জ্যুরিখে এক কনফারেন্সে, বিপদের আঁচ পেয়ে তিনি ইউরোপেই রয়ে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সন্তানসম্ভবা ইংগিবোর্গে, তিন সন্তানকে নিয়েই পাড়ি দিলেন ইউরোপে। ১৯৫০ সালে তাঁরা আমেরিকা ছাড়লেন। প্রথমে গেলেন অষ্ট্রিয়ায়, সেখানে কাজকর্ম পাওয়ার সুযোগ কম ছিল। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে ১৯৫২ সালে চলে গেলেন পূর্ব জার্মানিতে। সেখানে তিনি নবজাতকদের জন্য একটি ক্লিনিক খুললেন। বার্লিনের চ্যারিটি হাসপাতালে খুললেন নিওন্যাটোলজি ক্লিনিক, বার্লিনে সেই প্রথম এই ধরনের ক্লিনিক স্থাপিত হল তাঁর প্রচেষ্টায়। সেখানেই তার চার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হল। আজ তারা প্রত্যকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বড়োছেলে টম র‍্যাপোপোর্ট হাভার্ডের মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক। অপর ছেলে মাইকেল র‍্যাপোপোর্ট বন ইউনিভারসিটিতে গণিতবিদ।

এই সময় তাঁর অপ্রাপ্ত ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার ক্ষীণ আশা দেখা দিল পুত্র টমের চেষ্টায়। হার্ভার্ডে কর্মরত টম একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মায়ের থিসিস অগ্রাহ্য হবার কাহিনীটি গল্প করলেন হামবুর্গ ইউনিভার্সিটির মেডিকাল ফ্যাকাল্টির তৎকালীন ডিন-এর সঙ্গে। ডিন ডক্টর ইউ কখ-গ্রোমাস বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলেন।

অনেক বাধা অতিক্রম করে ডিন সফল হলেন। তাঁর দাখিল করা থিসিসটি নাজি কর্মকর্তারা নিশ্চয় নষ্ট করে ফেলেছিল,সেটি খুঁজে পাওয়া গেল না। এছাড়া তাঁর মৌখিক পরীক্ষারও রেকর্ড ছিল না। তাঁকে একটি মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে ঠিক হল। এজন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। তখন তার দৃষ্টিশক্তি প্রায় শূন্য। তিনি চোখে না দেখলেও প্রতিবেশী বা বন্ধুদের কারো সাহায্যে ইন্টারনেট থেকে সব নতুন আবিষ্কারের বিষয়ে বিশদে জেনে নিতেন। এমনই ছিল তাঁর অধ্যবসায়।

হামবুর্গ ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি থেকে তিনজন অধ্যাপক এলেন তাঁর বাড়িতে,বার্লিনে। মৌখিক পরীক্ষা নিতে। অনেক সময় ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন তাঁরা, যুদ্ধপূর্বোত্তর জার্মানিতে তাঁর লেখা থিসিসের বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করলেন। সাক্ষাৎকার নিতে আসা তিনজনের দলের অধ্যাপকেরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর থিসিসের হুবহু বর্ণনা পেলেন আর ডিপথেরিয়া বিষয়ে আধুনিক আবিষ্কারের বিষয়ে সব তথ্যই তিনি তাঁদের জানালেন। পরিদর্শনকারী দল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করে অত্যন্ত প্রীত হলেন, ও তাঁকে ন্যায্য পাওনা পি এইচ ডি ডিগ্রি দেওয়া হবে স্থির করলেন। হামবুর্গের মেডিকেল ফ্যাকাল্টি নাজি জমানায় তাঁর প্রতি হওয়া অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করল। হামবুর্গ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে এক অনুষ্ঠান করে তাঁর হাতে ডিগ্রি তুলে দেওয়া হল।

২০১৫ সালের জুন মাসে তিনি হলেন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া মানুষ। ডিগ্রি পেয়ে খুশি হয়ে তিনি বলেছেন " ১০২ বছর বয়সে পরীক্ষা দেওয়াটা খুব সহজ নয়।আর এই ডিগ্রি তেমন কোনও কাজে আসবে না। তবু এটা গ্রহণ করলাম, কারণ এটা একটা নীতির প্রশ্ন। আমি আমার থিসিসের মর্যাদা চাইনি। আমি এটা নিয়েছি নাজিদের হাতে লাঞ্ছিত,নিপীড়িত অজস্র গুণী ও সাধারণ মানুষের পক্ষে।"

পুর্ব জার্মানিতে তাঁকে দেওয়া পুরষ্কারের মধ্যে আছে প্যাট্রিওটিক অর্ডার অফ মেরিট,ন্যাশন্যাল প্রাইজ অফ জার্মানি। শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনাতে তাঁর কৃতিত্বের জন্য তাকে এইসব সম্মান দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সালে অবসর নেওয়ার পর তিনি একজম বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করে গেছেন ৮০ ছর বয়স পর্যন্ত। তারপর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে ধীরে। ২০০৪ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি বার্লিনেই আছেন।



স্থাপত্যের ছবি

বন্ধুরা,তোমরা যখন এই সংখ্যা পড়ছ তখন পুজো একদম দরজায় কড়া নাড়ছে।পুজোর ছুটিতে অনেকেরই বেড়াতে যাবার প্ল্যান করছ! অনেকেই দিল্লী,জয়পুর ও আগ্রা হয়তো বেড়াতে যাচ্ছ। পুরো রাজস্থান বেড়ানোরও টিকিট কাটা হয়ে গেছে। দশ,পনেরোদিনের মধ্যে রাজস্থান,দিল্লী অনেকেই বেড়াতে যান। সেইভাবে দেখতে গেলে ভাল করে রাজস্থান বেড়াতে হলে এক মাসের বেশি সময় লেগে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তো এতদিন থাকা খুবই মুশকিল,কারণ অফিস,স্কুল অ্যাবসেন্ট করে বেশিদিন তো আর থাকা যায় না।ওদিকে দিল্লী আমরা নানা কাজের জন্য যেমন যাই, আবার সেটি পৃথিবীবিখ্যাত একটি টুরিস্ট স্পটও তো বটে। এবারে একটু দিল্লীর গল্পই করি।

দিল্লী বলতেই কুতুব মিনার,লাল কেল্লা,জামা মসজিদ,হুমায়ুনের সমাধি এবং ন্যাশনাল মিউজিয়াম,রাষ্ট্রপতি ভবন,ইন্ডিয়া গেট এইসব দ্রষ্টব্য স্পটকেই বুঝি। একদিন বা দুদিনের সিটি ট্যুরে বেশিরভাগ লোকই ঘুরে থাকেন। কিন্তু দিল্লী খুঁটিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু এক মাসেও কুলাবে না। বেশিরভাগ মানুষই দুই কি তিনদিন দিল্লী ঘুরে জয়পুর বা আগ্রা চলে যান। হাতে সময় কম থাকলে এইভাবেই বেড়াতে হবে।

আবার তিনচার দিনেও কিন্তু একটু অন্যভাবে জায়গাটাকে চেনা যায়। এর জন্য কিছু প্রস্তুতি বেড়াতে যাবার আগেই সারতে হবে। যেখানে যাব,সেই জায়গাটি সম্পর্কে খুব ভাল করে পড়ে নিতে হবে। যেহেতু ফোটোগ্রাফিটা তোমার হবি তাই অন্য ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ফোটোগ্রাফারের তফাত তো থাকবেই! দিল্লী যাবার আগে তোমাকে ভাবতে হবে কী ধরণের ফোটো তুলবে। ট্রাভেল, স্ট্রিট বা ডকুমেন্টারি। চল ,তাহলে দিল্লীর ঐতিহাসিক সৌধগুলির ফোটো তোলা যাক।

দিল্লী একটি ঐতিহাসিক শহর। বহু বছরের ইতিহাস এই শহরে লুকিয়ে আছে। দিল্লীর ইতিহাস পাওয়া যায় খ্রীঃপূঃ ৩৫০০ সাল থেকে,অর্থাৎ আজ থেকে ৫৫০০ বছর আগেই দিল্লী শহরের গোড়াপত্তন ঘটে। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থই সম্ভবত আজকের দিল্লী। তোমর রাজবংশীয়রা ৭৩৬ খ্রীঃ মেহেরৌলির লালকোটে যে রাজ্যস্থাপন করেন,তাই এখনকার দিল্লী।

একটু বেশি ইতিহাস বলে ফেললাম কি? আসলে তোমাদের আগেও বলেছি যে কোথাও বেড়াতে যাবার আগে বা কোনো উৎসবের ছবি তোলার আগে বিখ্যাত আলোকচিত্রীদের তোলা ঐসব জায়গার ফোটোগুলো খুব ভাল করে দেখে নিতে হবে। কোনো ঐতিহাসিক জায়গার ফোটো তোলার আগে সেখানকার ইতিহাসটাও ভাল করে জানতে হবে...তাই এত কথা বলা।

মনে রাখতে হবে আমরা যেসব বিশ্ববিখ্যাত আলোকচিত্রীদের তোলা ফোটো দেখেছি, মানে এই নয় যে আমিও সেরকম একটা ফোটো তোলার চেষ্টা করব।ভাল ছবি আমাদের মনে ও চিন্তনে একটি ছাপ ফেলে যায়।এবার নিজের নিজস্বতা দিয়ে একই জায়গার অন্য ধরণের ফোটো তোলার চেষ্টা করতে হবে। যেমন,তাজমহলের এত সুন্দর ও বিখ্যাত সব ছবি আছে, যেগুলি হয়তো আমাদের পক্ষে তোলা সম্ভব হবে না। একটি ভাল ছবি তোলার জন্য হয়ত ফোটোগ্রাফার বহুবার,নানান ঋতুতে নানান সময়ে গেছেন এবং অশেষ পরিশ্রমের পরেই হয়তো সূর্যাস্তের একটি অসাধারণ রঙিন আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে তাজমহলের ফোটো তোলা সম্ভব হয়েছে। এদিকে তুমি যখন তাজমহলে গেলে তখন ধূসর আকাশ। তাহলে মনের দুঃখে কি তুমি ফোটো তুলবে না? অবশ্যই তুলবে। কিন্তু একটু অন্যভাবে তোলো। অন্য একটি গল্প ছবিটিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা যেতেই পারে। তাজমহলের ব্যাকগ্রাউন্ডে এক গ্রাম্য দম্পতির বসে থাকার সাদা কাল বিখ্যাত ছবিটি কিন্তু মুন্সীয়ানার প্রেক্ষিতে আগের বলা ছবিটির চেয়ে অনেক বাঙময়। আবার কাঁটাতারের মধ্যে ধুসর তাজমহলের বেদনা যেন এত বেশি প্রাণ পায় অথবা তাজমহলের পেছনের যমুনা নদীর ধারে আবর্জনা আর তাজমহলের শ্বেতশুভ্র সৌন্দর্যের বৈপরীত্য একেকটি ছবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে।



এখানে সম্রাট আলাউদ্দিন খলজির সমাধির একটি ছবি আছে। একটু চিন্তা করলেই মনে পড়ে যাবে সম্রাট আলাউদ্দিনের কাহিনি। অত্যন্ত উন্নাসিক ও দাম্ভিক এই সম্রাট নিজের কাকাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন ও এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সফল হন। শেষ বয়েসটা ওঁর খুবই বেদনাদায়ক। এক কঠিন রোগে ভোগার পর ওঁর মৃত্যু হয়। আবার কথিত আছে যে ওঁর সেনাপতি মালিক কাফুর ওঁকে হত্যা করেন।তাই

এই দীনহীন অনাড়ম্বর সমাধিতে দাঁড়িয়ে যে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয় এবং ফোটোর মধ্যে আলাউদ্দিনের বর্ণাঢ্য জীবন ও সমাধিক্ষেত্রের দীনতার যে বৈপরীত্য,তা মূর্ত হয়ে ওঠে। ইতিহাসটা জানলে তবেই ছবির মধ্যে এই বৈপরীত্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা সম্ভব হবে।

আরো যে কথাটি বলব তা হল বাড়িতে গিয়ে ভোরবেলা উঠতেই হবে। আগেই বলেছি সুর্য যত নিচের দিকে থাকবে,তখন মোলায়েম আলো ছায়াকে দীর্ঘায়িত করবে। বিকেলের আলোও ছবির পক্ষে খুবই সুন্দর। এখানে ইমান জামিনের যে স্মৃতিসৌধটির ফোটো দিয়েছি, এটি সেভাবে বিখ্যাত নয়। সুবিশাল কুতবমিনারের পাশে অতি ক্ষুদ্র একটি সমাধি। অনেক পর্যটকই এটি না দেখে চলে যান। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এটি বিখ্যাত নয়। তাহলে এই ছবিটাকে কী করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করা যাবে? এই ছবিটি যদি বেলা বারোটার সময়



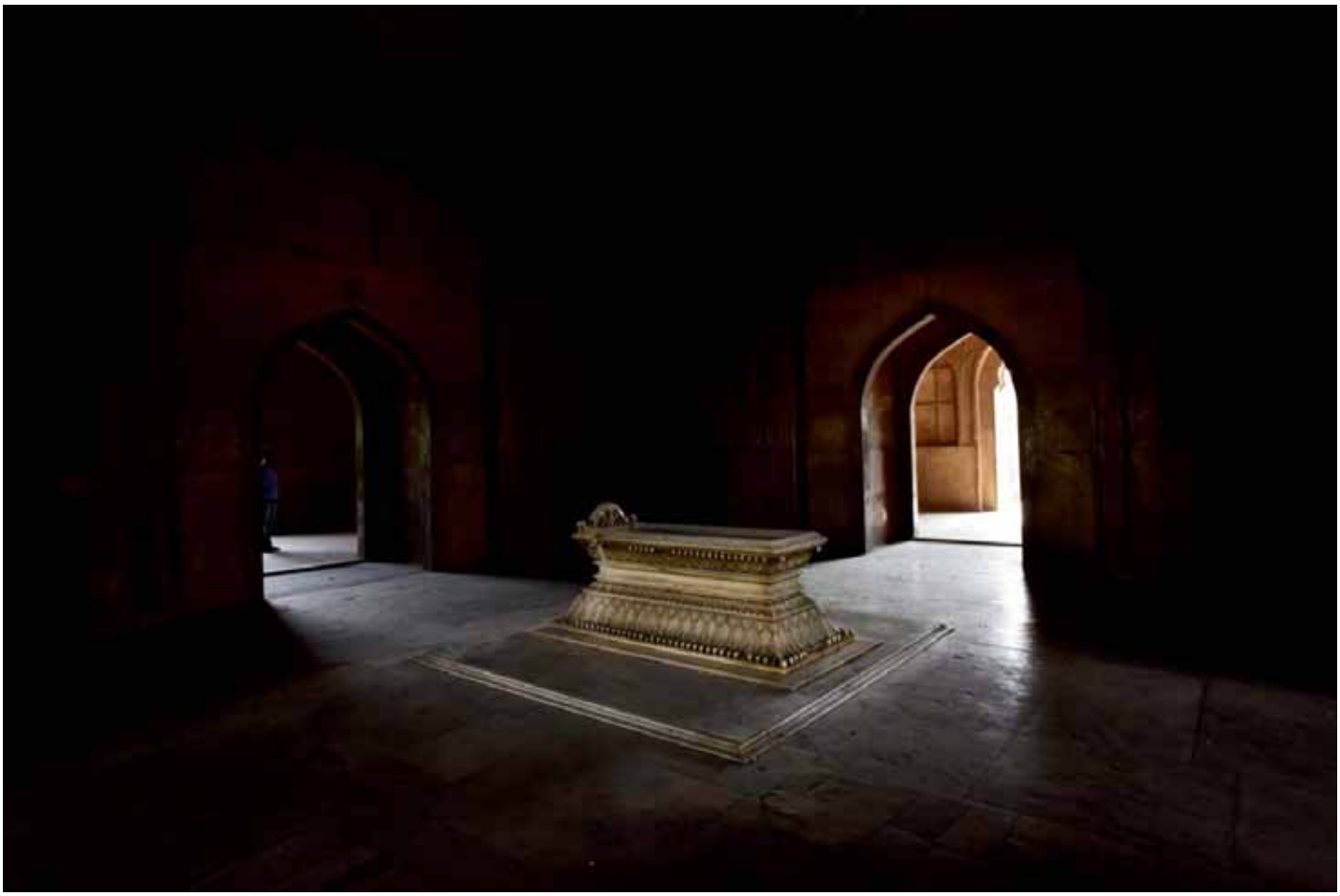
তোলা হত,তবে সাধারণ একটি ফোটো হত। একমাত্র ভোরবেলাতেই সমাধিটিকে ঘিরে যে জাফরি লাগানো আছে,তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের নরম আলো সমাধিবেদির উপর এসে পড়ে। সেই আলোছায়াতেই ঠিক এইসময়টাতেই সাধারণ সমাধিটি অসাধারণ হয়ে ওঠে।

ইলতুৎমিসের সমাধিক্ষেত্রটি খুবই শৈল্পিক কারুকার্যখচিত। দিনের অন্য সময়ে এর ছবি খুব সুন্দর উঠবে। কিন্তু সকালের সূর্যের একফালি আলো সমাধিবেদিতে এসে পড়াতে ছবিতে একটি অন্য মাত্রা যোগ হয়েছে।



রজোঁ কি বাওলির প্রাঙ্গনে খুপরি খুপরি আলো পড়ে ছবির কিছুটা আকর্ষণ বাড়িয়েছে।





একই কথা সফদারজং সমাধিবেদির ক্ষেত্রেও। আর আকাশের নীল রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরতে হলে ভোরবেলা কি বিকালবেলা। অবশ্য নানা ঋতুতে আকাশের রঙেরও পরিবর্তন ঘটে। লোদি গার্ডেনে বড়া গম্বুজের ভেতর থেকে শিশা গম্বুজের ছবিটা তোলা হয়েছে। অনেকেই এই তোরণটিকে ফ্রেম করে শিশা গম্বুজের ফোটো নেবেন।



এই একটি কমন অ্যাঙ্গেল। তাহলে সবাই যা তুলছে,তার থেকে একটু অন্যরকম কীভাবে করা যাবে? পুরনো এই সৌধগুলোতে পায়রা থাকবেই। একটু ধৈর্য ধরে এদের গতিবিধি লক্ষ করলেই পায়রার উড়ন্ত ভঙ্গিমা ফ্রেমবন্দি করা সম্ভব। সত্যিকারের ছবি তোলাকে ভালবাসলেই এই পরিশ্রম করা কোন কষ্টের ব্যাপার নয়।

আচ্ছা,তোমাদের পুজো খুব ভাল কাটুক।অনেক জায়গাতে বেড়াতে যাও আর প্রাণভরে ছবি তোলো।



হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের দশটি ঠাটের মধ্যে আমরা বিলাবল, কল্যাণ, খম্বাজ, ভৈরব আর পূর্বী ঠাটগুলির জনক রাগ বা ঠাট -নামের রাগগুলো নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছি। এবার মারোয়া বা মারওয়া ঠাট এর রাগ মারোয়া।

তীবর গ ম ধ ন সুর
মেলন সজত মধুর
বকরত রিখব ভীতর
মরুব কহত চতুর।

রাগ গাওত সুকর, পঞ্চম বিবাদী সুর
সম্বাদ রি ধ বিচর, অস্ত দিন অতি রুচির।

পূর্বীর মতই মারোয়ার পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে'র 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি - ক্রমিক পুস্তক মালিকা'র এই মধ্যলয়ের বন্দিশটি থেকেই মারোয়া রাগটির একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তবে বন্দীশটি ঝাঁপতালে বলে এই তালটি নিয়ে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক, কারণ এই তালটি দাদরা, কাহারবা বা ত্রিতালের মত তেমন বেশি শোনা যায় না।

ঝাঁপতাল - দশ মাত্রা

১		২			০		৩			*বিভাগ*
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	*মাত্রা*
ধী	না	ধী	ধী	না	তি	না	ধী	ধী	না	*ঠেকা*

DAW সফ্টওয়্যারে তালটির ঠেকা বাজিয়ে লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লেখাটির সাথে।

এই রাগে স্বরগুলো খাড়া খাড়া লাগানো হয়, অর্থাৎ মীড় না দিয়ে সোজাসুজি লাগবে। পূরিয়াতে একই স্বর মীড় দিয়ে একটু নরম করে লাগানো হয়।

রাগসঙ্গীতে বাদী, সম্বাদী আর বিবাদী স্বরসঙ্গতির কথা আগে বলা হয়েছে। বাদী হল রাজা স্বর, যে স্বরটি কোন রাগে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়, সম্বাদী মানে যে স্বরটি বাদী থেকে কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের (অনুবাদী) চেয়ে বেশী ব্যবহার হয়, আর বিবাদী স্বর প্রয়োগে রাগের ক্ষতি হয়। যেমন, ভাতখন্ডেজীর বই থেকে এই রাগের যে বর্ণনা ওপরে দেওয়া আছে, তাতেই দেখা যাচ্ছে পঞ্চম স্বরটি এই রাগের বিবাদী স্বর। আবার তেমন তেমন উস্তাদ রাগের অঙ্গহানি না করেও বিবাদী স্বর লাগাতে পারেন।

শুদ্ধ ধা আর কোমল রে স্বরদুটির আশ্চর্য মেলবন্ধন এই রাগটির বিশেষত্ব। এই স্বরসঙ্গতিকে অপবাদী সঙ্গতি বলে।

পূর্বাঙ্গে মানে সা এর থেকে নীচের দিকের স্বর লাগে এইভাবে -

ধ	ন	র	গ	র,		ন	ধ	ম	ধ,	স	ন	র	স	
`	`					`	`	`	`		`			

এখানে ন্যাস বা ঘুরে এসে দাঁড়নো হচ্ছে রে ও ধা স্বরের ওপর। নি স্বরটি কম লাগছে। আরোহণ ও অবরোহণ দুদিকেই সা স্বরটিকে টপকে যাওয়া বা লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

মধ্যসপ্তকের চলন -

	|				|		|		
ধ,	ম	গ	র	গ	ম	ধ,	ধ	ম	গ	র

আর উত্তরাঙ্গ বা চড়া সা থেকে চলন হবে -

		`			|				`
ধ,	ন	র	ন	ধ,	ম	ধ	ন	ধ	স

উত্তরাঙ্গে চড়ার সা তে যাবার সময় নি কে প্রায়ই লঙ্ঘন করা হয় - এই লক্ষণটি পুরিয়ার সাথে মেলে, কিন্তু সোহিনীর সাথে মেলে না।

DAW সফ্টওয়্যারে বাজিয়ে তালটির ঠেকার পর এই চলনগুলি দেওয়া আছে লেখাটির সাথে।

মারোয়া রাগের আরোহণ -

			|			`	`
ন	র	গ	ম,	ধ	ন	র	স
`							

অবরোহণ-

`		`			|			
স	ন	র	ন	ধ	ম	গ	র	স

পকড় -

		|					`	
র,	ধ	ম	গ	র,	ন	ধ,	র	স

বাদী - রে, সম্বাদী -ধা জাতি - ষাড়ব - ষাড়ব, সময় - বেলা ৩টে থেকে ৬টা

হিন্দুস্তানি রাগ সঙ্গীতকে টোনাল বলা হয় কারণ এই সঙ্গীতে স্বরের বুনন হয় সা কে ঘিরে। বিভিন্ন স্বরের খেলা যেখানেই হোক, ভরকেন্দ্র থাকে সা। এই পদ্ধতির সঙ্গীতে তাই সা এর গুরুত্বহীনতা অকল্পনীয়। কিন্তু এই অদ্ভুত কান্ডটাই মারোয়া রাগের বিশেষত্ব। সা কে প্রায় উহ্য রেখে এর রূপ ফোটাতে পারলে এই রাগের পরিবেশন তাই অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়। আবার বাদী-সম্বাদী স্বরসঙ্গতির দিক থেকেও এই রাগটি ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ বাদী-সম্বাদী স্বর দুটিতে ষড়জ-পঞ্চম বা সা-পা সঙ্গতি থাকে, মারোয়ার ক্ষেত্রে কোমল রে -শুদ্ধ ধা স্বরদুটির তা নেই। থাকত, যদি ধা স্বরটি কোমল হত।

গুণীজনদের অনেকেই বলেন রাগটি পঞ্চম বর্জিত বলে এর কোমল রে স্বরটিকে শ্রী রাগের কোমল রে স্বরটির মত গুরুত্ব দিয়ে সাজালে শ্রোতা সেই বাঞ্ছিত স্তরে পৌছয়, যেখানে মনে জাগে সেই পরম অপ্রাপনীয় কে পাওয়ার আকাঙ্খা।

আবার পূরিয়া, সোহিনী, হিন্দোল, পঞ্চম এই রাগগুলির ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে হয় এর পরিবেশনে। এইসব নানা বৈশিষ্টের জন্যই এই রাগটির রূপায়ণে চাই সত্যিকারের উঁচুস্তরের মুন্সিয়ানা।

নওসাদজীর সুরে মারোয়া আধারিত 'সাজ ঔর আওয়াজ' সিনেমায় লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'পায়লিয়া বাওরি' গানটির অংশ শুনলে খানিকটা বোঝা যাব রাগটির চলন। দ্বিতীয় লিঙ্কে বড়ে গোলাম আলি খান সাহেবের গাওয়া 'ননদি চাওয়ানা মোরিরে' (ভাতখন্ডেজীর সংকলনেও আছে প্রাচীন এই বিলম্বিত খেয়ালটি) ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজানো মারোয়ার কিছু অংশ । স্বনামধন্য তবলিয়া পণ্ডিত কানাই দত্তের বাজনা শোনা যাবে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারের সাথে। দ্বিতীয় লিঙ্কটির সবশেষে আভাস দেওয়া আছে আমার এবং আরও

অনেকের মতে মারোয়ার অপার্থিব রূপকার আমীর খান সাহেবের সেই বিখ্যাত খেয়াল 'গুরু বিনা জ্ঞান' -এর অংশবিশেষের।

লিঙ্ক-১ - পায়লিয়া বাবরি - লতা মঙ্গেশকর।
লিঙ্ক-২ - বড়ে গোলাম আলি খান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমীর খান।
লিঙ্ক-৩ - DAW সফ্টওয়্যারে বাজানো (i) ঝাঁপতালের ঠেকা, (ii) পূর্বাঙ্গ-মধ্যসপ্তক ও উত্তরাঙ্গের চলন, (iii) ভাতখন্ডেজীর 'তীবর গ ম ধ নি সুর' মধ্যলয় খেয়ালটি (iv) শেষে ৩ ও ৪ পাতায় দেওয়া চলনগুলি বাজিয়ে দেওয়া হল।

গানের লিংকগুলো এইখানে

স্বরলিপি - তীবর গ ম ধ নি সুর (মধ্যলয় ঝাঁপতাল) - পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে

স্থায়ী

১		২			০		৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধী	*না*	*ধী*	*ধী*	*না*	*তি*	*না*	*ধী*	*ধী*	*না*
		|	|		|		|		
সধ	-	ম	ম	ধ	ম	ধ	ম	গ	র
তী		**ব**	র	গ	**ম**	ধ	**নি**	সু	র
				|					
সর	গ	রগ	গ	ম	গ	র	গ	র	স
মে		**ল**	ন	স	**জ**	ত	**ম**	ধু	র
							|		
নস	সন	র	র	র	রন	ধ	মধ	স	স
`	`				`	`	` `		
বি	ক	**র**	ত	রি	**খা**	ব	**ভি**	ত	র
				|					
সর	গ	রগ	গ	ম	গ	র	গ	র	স
মা	-	**রু**	ব	ক	**হ্**	ত	**চ**	তু	র

অন্তরা

		|	|		|	`	`	`	`
গ	-	ধম	ধম	ধ	ধম	স	স	স	স
রা		**গ**	গা	-	**ব**	ত	**সু**	ক	র
`		`	`	`	`	`			
নস	-	র	র	র	রন	র	ন	ধ	ধ
প	ন্	**চ**	ম	বি	**বা**	-	**দি**	সু	র
|		|			|			
ধম	ধ	ম	গ	র	ম	গ	র	র	স
স	ম্	**বা**	-	দ	**রি**	ধ	**বি**	চ	র
সর	-	র	র	র	র	র	গ	র	স
অ	স্	**ত**	দি	ন	**অ**	তি	**রু**	চি	র

ওপরে মধ্যলয় গানটির স্বরলিপিতে গানের কথার শব্দ যেখান যেখানে বোল্ড করে দেওয়া আছে, সেই শব্দগুলোর ওপর জোর দিয়ে তালের সাথে আগে কয়েকবার পড়ে নিলে বুঝতে সুবিধে হবে।

নিচে রাগটির আরও কিছু চলন দেওয়া হল।*

স,	ন	র,	ন	ধ,	ধ	ন	র,	ন	র,	ন	ধ,	স,			
	`		`	`	`	`		`		`	`				

ধ	ন	র	ন	ধ	ম	ধ,	ম	ধ	ন	র,	ধ	ন	ধ	র	ন	ধ,	স
`	`		`	`	`	`	`	`			`	`	`		`	`	

মারোয়া - চলন

ধ	ন	র,	গ	র	ন	ধ,	ধ	গ	র	ন	র	ন	ধ,	ম	ধ	ন	র,
`	`				`	`	`			`		`	`	`	`	`	
ন	র	গ	র	ন	ধ	ন	র	স									
`				`	`	`											

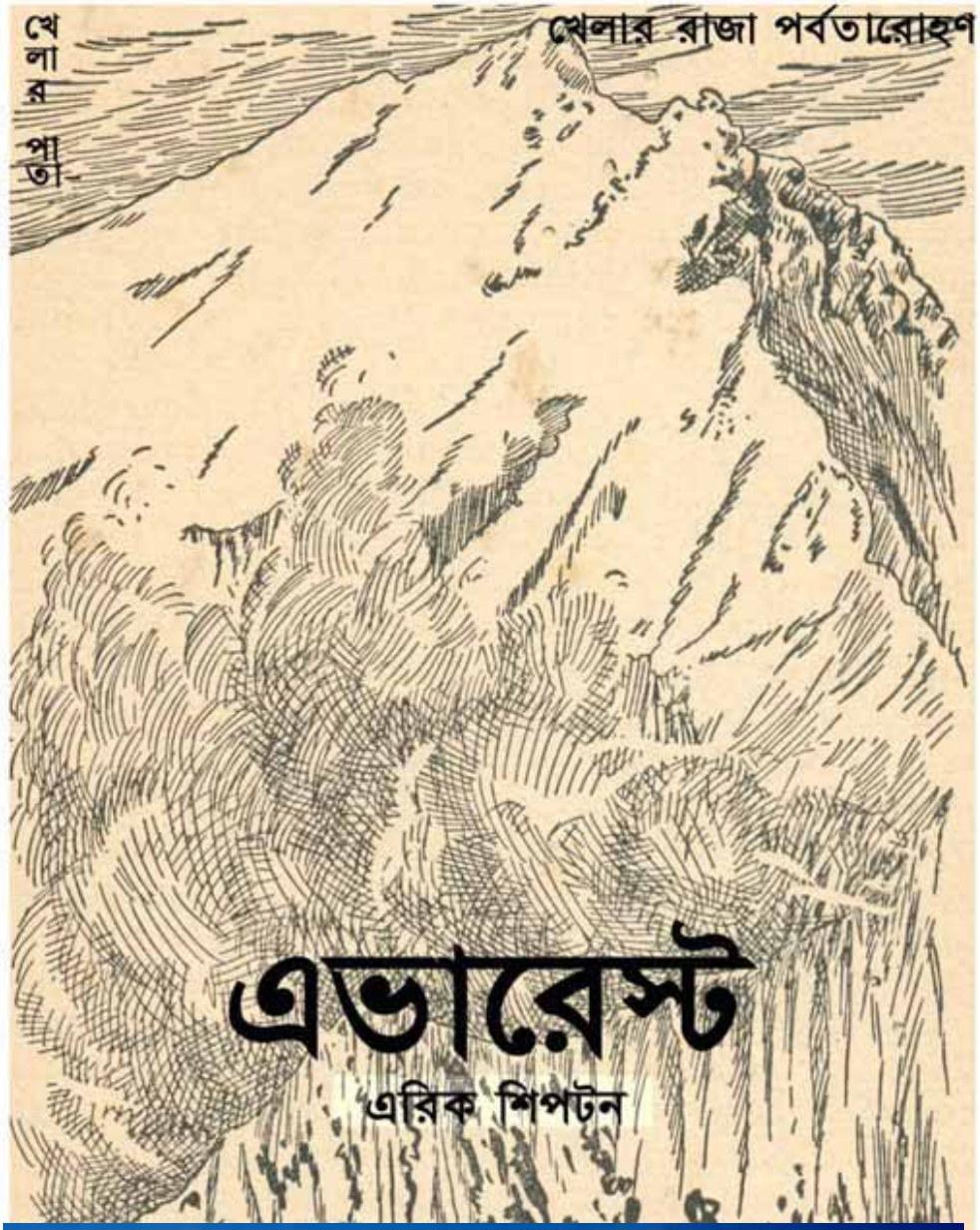
ধ	ন	র-	ন	র-	র	গ	ম-	গ	ম-	গ	র-	ন	র-	ন	ধ,	ধ	ন	র-	গ
`	`		`									`		`	`	`	`		
র,	ন	র	গ	ম	গ,	র	ম	গ	র,	ধ	র	ন	ধ	ম	ধ	স			
	`									`		`	`	`	`	`			

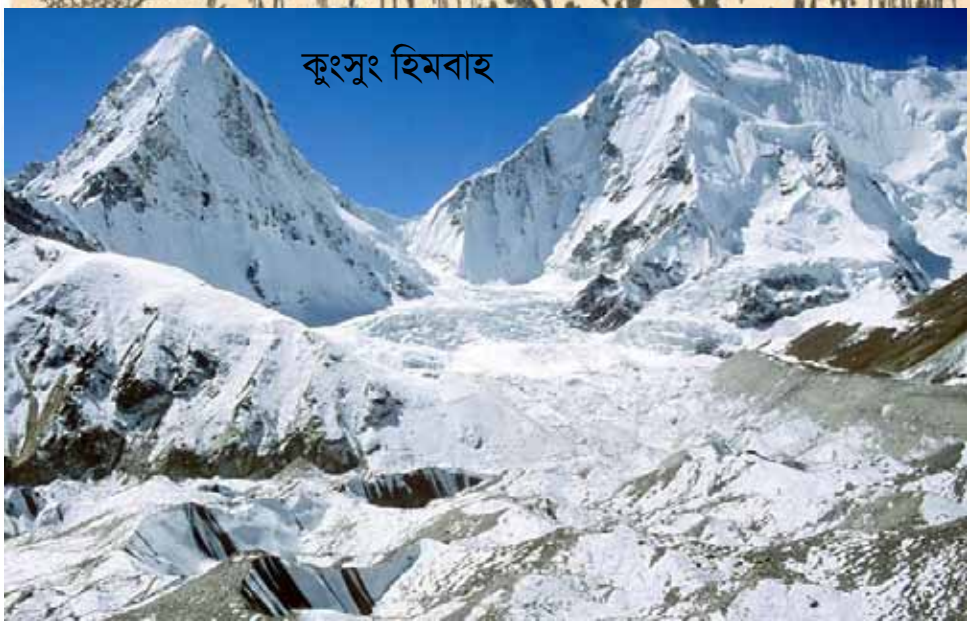
র-	গ	ম	ধ-	ম	ধ-	ধ	ম	গ	র	ন	ধ,	ধ	ন	র-	গ	ম	ধ-	ম	ধ
										`	`	`	`					
ম	গ	র-	র	ধ	ম	ধ-	ম	গ	র	ন	ধ-	ন	র-	স					
										`	`	`						

ন	র	গ	ম	ধ,	ম	ন	ধ-	ম	ধ	ন	ধ	ম	ধ	ম	গ	র-	র	ম	গ
`																			
				`															
ম	ন	ধ,	ন	র	ন	ধ,	ধ	ম	গ	র,	ন	ধ-	ম	ধ	র-	-	স		
											`	`							

*কৃতজ্ঞতা -চৈতন্য কুন্তে

এই চলনগুলিও D A W সফ্টওয়্যারে বাজিয়ে দেওয়া আছে 'তীবর গমধন সুর' - মধ্যলয় গৎটির পর ।



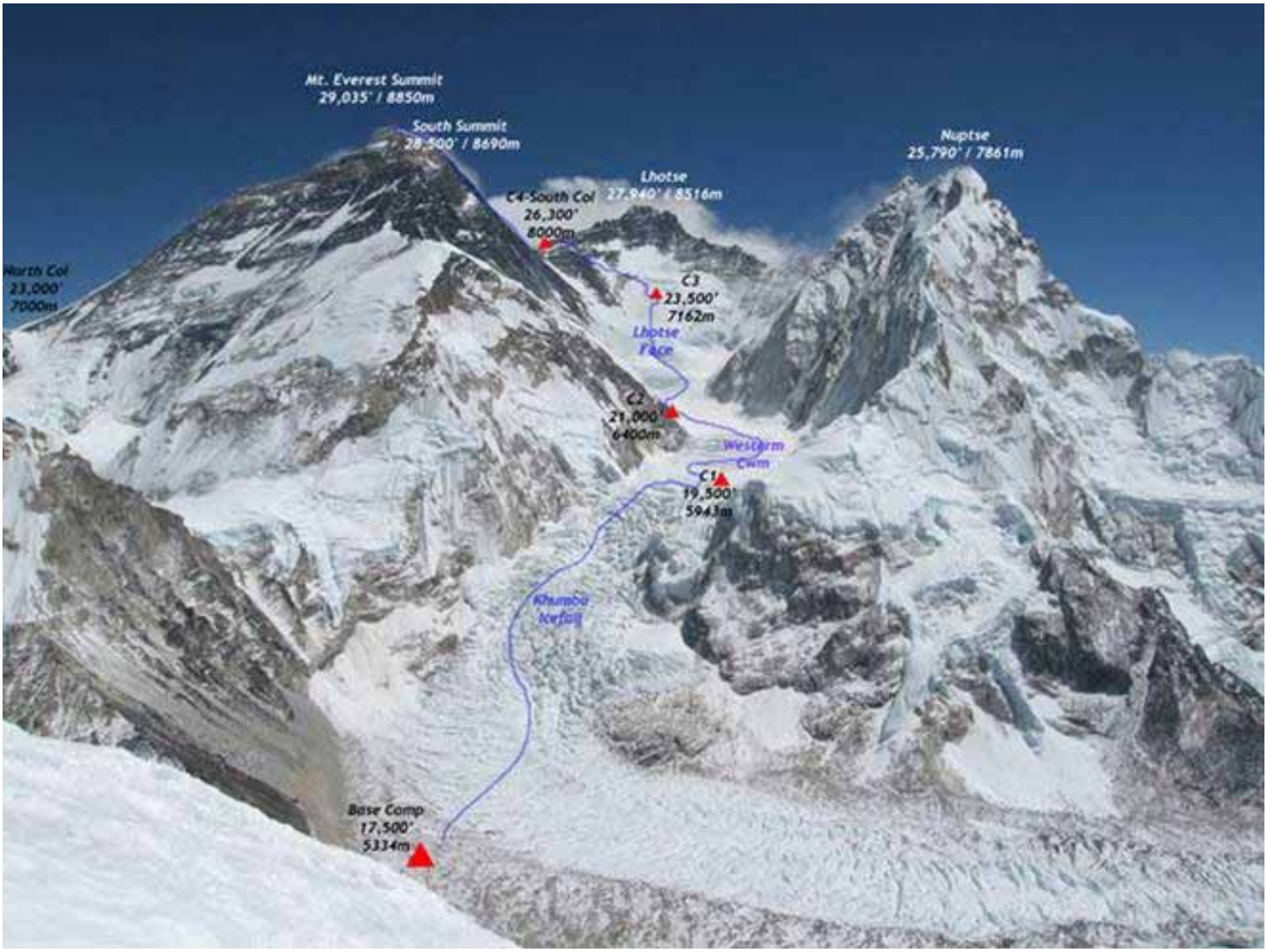


দক্ষিণাভিমুখী পদক্ষেপ

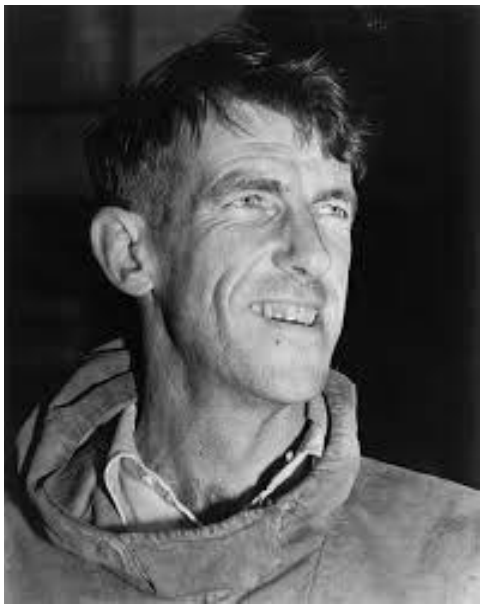
যুদ্ধ সমাপ্ত হবার প্রথম কিছু বছর এভারেস্ট অভিযানের উদ্যোগে আসতে থাকল নানা রকম সমস্যা। তিব্বত সরকারের পাঠানো আবেদন ব্যর্থ হল। অগত্যা পরিত্যাগ করতে হল পুরনো জনপ্রিয় পথ। ১৯৫০ সালে চিনা কমিউনিস্ট আর্মির তিব্বত দখলের পরিণতি হিসেবে দীর্ঘদিনের জন্য পশ্চিমযাত্রীদের সে দেশে অনায়াস যাতায়াত বন্ধ হল।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে অনেক আগে অর্থাৎ ১৯৩৫-এ শৃঙ্গ আরোহণের বিকল্প পথের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু সে পথ আমরা এড়িয়ে গেছি বিশেষ কারণে। অধিক উচ্চতায় একের পর এক বিন্যস্ত পাথুরে এবং বরফের বিশাল স্ল্যাবের উপস্থিতি উত্তর গাত্র দিয়ে সংগঠিত বহু অভিযানই ব্যর্থ করেছে।

কুংসুং হিমবাহের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত একটি রিজ আমাদের দৃষ্টি গোচর হল। আমরা দেখলাম এভারেস্ট এবং লোৎসের অন্তর্বর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে পথটি সোজা শৃঙ্গের দিকে চলে গেছে। সেই পথ অর্থাৎ সাউথ কল, যা পিরামিডাকৃতি উচ্চতম শৃঙ্গের দিকের পৌঁছনোর পক্ষে সম্ভাবনাময়। এ পথ অনেকটাই ছড়ানো। ধীরে ধীরে উচ্চতা বৃদ্ধি হয়ে শৃঙ্গের দিকে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ অভিযানে খাড়াই পথ এড়িয়ে আরোহণের সম্ভাবনা থাকায় অভিযাত্রীদের কাছে গ্রহণীয়। কিন্তু কোন পথ ধরে অভিযাত্রীরা ঐ সহজতম আরোহণের পথ সাউথ কল পৌঁছবেন? দুর্গমতার কারণে পূর্ব দিক দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব, পশ্চিম দিকের পথ অজানা।



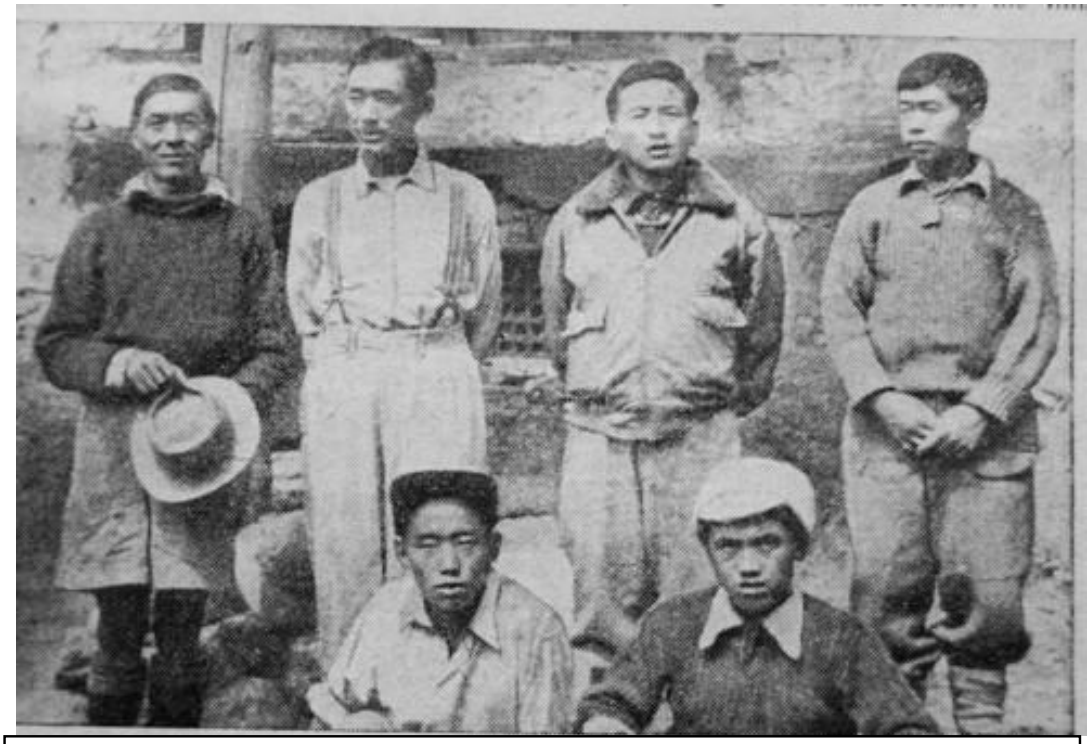
১৯২১ সালে এভারেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বিস্তৃত ভৌগোলিক সীমারেখা আবিষ্কৃত হয়। একে অপরের সাথে বিশাল রিজ সংলগ্ন প্রধান তিনটি শৃঙ্গ এভারেস্ট, লোৎসে, নাপৎসে। পর্বতারোহী ম্যালোরি ঐ তিন শৃঙ্গ সংযুক্ত বেসিনটির নাম দিয়েছিলেন West CWM. সাউথ কল অভিমুখী যে কোনো পথ লুকিয়ে আছে এই উপত্যকায়।



এভারেস্টের সম্পুর্ণ দক্ষিণ দিক বরাবর যা বিস্তৃত। কিন্তু কোন অভিযাত্রী অবগত ছিলেন না প্রকৃত CWM-এর অবস্থান। ১৯৩৫ সালের অভিযানে উত্তর দিক দিয়ে আমরা CWM-এর পৌঁছবার পথ অন্বেষণের চেষ্টা করেছিলাম। ব্যর্থ হয়ে বুঝলাম নেপালের পথ দিয়েই লক্ষ্যে পোঁছনো সম্ভব। কিন্তু সে'সময় নেপাল এবং তিব্বতের পথ ছিল ইউরোপীয়ানদের কাছে নিষিদ্ধ।

যুদ্ধ সমাপ্ত। নেপালে সরকারের নীতির শিথিলতায় বিদেশী ভ্রমণার্থীদের প্রবেশে আর বাধা রইল না। ১৯৫১ সালে জুন মাসে ব্রিটিশ অভিযাত্রীদের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে এভারেস্ট অভিযানের অনুমতি এল। হাতে এল অভিযানের নেতৃত্বের আমন্ত্রণ।

খুব কম সময়ে অভিযানের ন্যূনতম সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আমরা ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। W.H.Murry, M Ward, T.D.Burdillon এবং আমি অভিযানের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। ঠিক হল প্রথম দুজন জাহাজে যাবেন অভিযানের খাদ্য সামগ্রীর দায়িত্ব নিয়ে। আমি এবং Bundillon তাঁদের যাত্রার পনেরো দিন



অভিযাত্রীদের সঙ্গী শেরপারা

পরে উড়ে গেলাম ভারতে। ইংল্যান্ড ছাড়ার কয়েকদিন আগে আমার হাতে নিউজিল্যান্ড আলপাইন ক্লাবের প্রেসিডেন্টের চিঠি এল। চিঠিতে অনুরোধ করেছেন দুজন নিউজিল্যান্ডের পর্বতারোহী হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গে অভিযানের অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে আমাদের অভিযানে যোগ দিতে চান। ১৯৩৫-এর সামরিক কারণে এই বিশেষ অঞ্চল পরিদর্শন এবং গবেষণার জন্য ছিলেন এমনই নিউজিল্যান্ডীয় অভিযাত্রী। আমি এই দেশের পর্বতারোহীদের সম্পূর্ণ উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাব আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হল। কিন্তু নেপাল পৌঁছনোর পূর্বে আমি সেই পর্বতারোহীর নামও জানতাম না। নিউজিল্যান্ডের দুজন প্রখ্যাত পর্বতারোহীর নাম তখন আমার মস্তিষ্কে। একজন H.E.Rediferd এবং অন্যজন Edmund Hillary। অবশেষে কৌতূহলের অবসান হল। অভিযানের সাথী হিসাবে ভবিষ্যতের প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহী তখন আমাদের সামনে।



অভিযাত্রীদলঃ দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে শিপটন, মারে,বার্দিলোঁ, রেডিফার্ড । বসে বাঁদিক থেকে ওয়ার্ড ও হিলারি



উত্তর ভারত থেকে পদব্রজে পূর্ব নেপালের নামচেবাজার পোঁছলাম। এভারেস্টের দক্ষিণ পূর্ব পাদদেশে কুম্বু জেলার অন্তগর্ত ঐ অঞ্চলেই শেরপাদের বাসস্থান। সম্পূর্ণ পথই রেইন ফরেস্ট পরিবৃত। প্রায় অনতিক্রম্য এ পথ তিব্বতের দিক দিয়ে পুরনো পথের তুলনায় কঠিনতর। গভীর অরণ্যে সম্পূর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে পথের আধিক্যে পথ হারানোর সমূহ সম্ভাবনা।

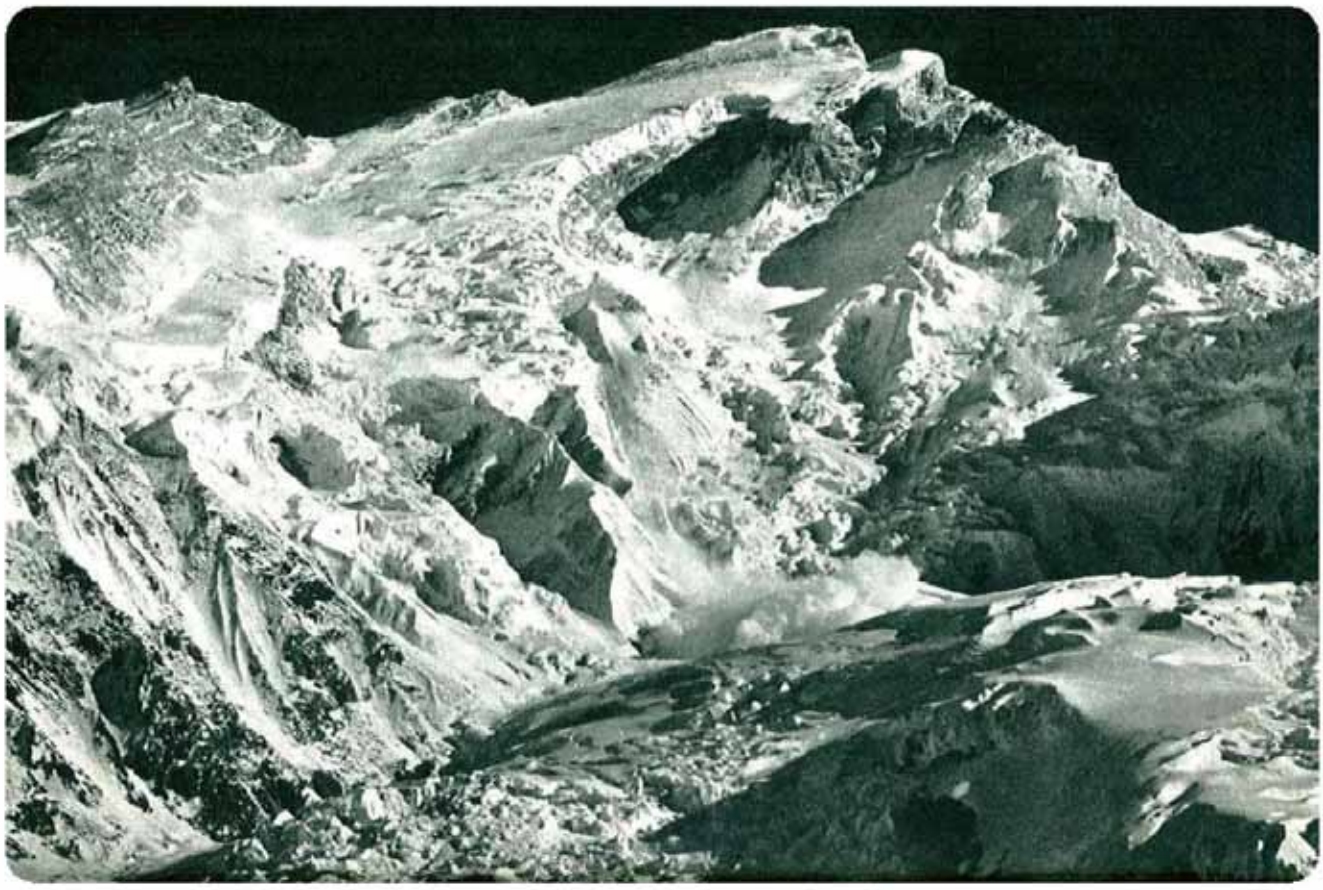
২২ সেপ্টেম্বর নামচেবাজার পোঁছলাম। ততদিনে সে বছরের মত বর্ষার মরসুম শেষ। বিশাল আইস ফলের পাদদেশ দিয়ে চারদিনের চেষ্টায় পথ নির্মিত হল। পশ্চিম CWM. ২০০০ ফুট উঁচু এই সংকীর্ণ প্রবেশ পথ চোদ্দো বছর আগেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সাউথ কল অভিমুখী পথ অতিক্রমে প্রথম অন্তরায় ঐ বিস্তৃত আইস ফল। ঐ আইসফল অঞ্চলেই শায়িত পশ্চিম CWM পৌঁছনোর পথ। অটল ধৈর্যেই ঐ ভয়ংকর পথ অতিক্রম সম্ভব। পশ্চিম CWM সংকীর্ণ পথে উপরের ঝুলন্ত হিমবাহ গলে যে কোনো মুহূর্তে তুষার ধ্বস নেমে আসতে পারে।

৩০ সেপ্টেম্বর যখন দলের সদস্যরা আইসফলের নীচের অংশের প্রকৃতি অন্বেষণে ব্যস্ত, তখন হিলারি এবং আমি উপত্যকার বিপরীতের ২০০০০ ফুট উচ্চতার শৃঙ্গ আরোহণের সময় উপলব্ধি করলাম তুষার ধ্বসের সম্ভাবনার ভয়াবহতা। শৃঙ্গের উপর থেকে ডানদিকে তাকানো মাত্র আমি উত্তেজিত। পশ্চিম CWM শীর্ষস্থল তখন আমার দৃষ্টিগোচরে। South Call-এর দিকে প্রসারিত। চিন্তা করলাম ডান দিকে CWM উপরোক্ত অংশে আরোহণ সম্ভব না হলে পার্শ্ববর্তী শৃঙ্গগুলি দৃশ্যমান হবে না। অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধানও তখন আমাদের সামনে। লোৎসে আরোহণের পথ ২৫০০০ ফুট থেকে সরলরেখা বরাবর প্রসারিত। এবং আড়াআড়িভাবে যেন



সাউথ কলের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত।

অকস্মাৎ এই পথ আবিষ্কার করে আমাদের উত্তেজনার পারদ উর্ধগামী। বহু বছর ধরে নিজেদের উদ্দেশ্যে করা অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান হল এক লহমায়। কিন্তু আইসফলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম অগ্রসরমান ঐ বিস্তৃত পথের দুধারের প্রতি মুহূর্তে বিপুল তুষারধ্বসের ভয়াবহতা। সুতরাং অভিযানের বিপুল সাজসরঞ্জাম বহন করে অভিযাত্রীদের এই পথ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ দুর্ঘটনাকে আমন্ত্রণ জানানো। ফলত অভিষ্ট শৃঙ্গের চূড়ায় পৌঁছতে বিপুল সামগ্রী CWM-এ সরবরাহ প্রয়োজন।



অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করেন মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। জয়ঢাকে ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অভিযান নিয়ে হারজগের লেখা রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবার নবম পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ অন্নপূর্ণা উত্তরগাত্র, ফোটোঃ মার্সেল আইজ্যাক



৮

উপগিরিশিরার পথে

পরদিন ১৯শে মে ভোরের আলো ফোটার আগেই উঠে পড়লাম। উত্তর-পশ্চিম উপগিরিশিরার পায়ের কাছে আমাদের বেস ক্যাম্পের চারপাশে তখনও ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শেরপারা খুব অবাক। অন্যান্য অভিযানে কখনও সূর্য ওঠার আগে রওনা হয়নি ওরা। ঘুমজড়ানো চোখে ওরা জলখাবার তৈরি করল, আর আমরা স্যাক-ট্যাক গুছিয়ে একে একে রওনা দিলাম। প্রথমে বেরোল রেবুফত, টেরে আর শ্যাজ; নুড়িপাথরে ঢাকা বিস্তীর্ণ মোরেন অঞ্চলে নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমিও একটু পরেই বেরোলাম, ঘুমে আধবোজা চোখে অন্ধকার রাস্তার প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, নুড়িপাথরে হোঁচট খেতে খেতে কোনওরকমে এগিয়ে চললাম। গিরিশিরার নিচে পৌঁছে পাথরে আইস অ্যাক্সের ঠোকাঠুকির টুংটাং আওয়াজ শুনে বুঝলাম, খুব একটা পিছিয়ে নেই আমি।

আমাদের সবারই পিঠে আজ প্রচুর বোঝা; মোট তিনটে তাঁবু, পাহাড় চড়ার সমস্ত সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি আর বেশ কয়েকদিনের খাবারদাবার। শেরপারা বোঝা নিয়ে যতদূর সম্ভব ওপরে উঠবে, তারপর বোঝা নামিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বেস ক্যাম্পে ফিরে আসবে, যাতে বয়ে নিয়ে চলা রসদ ওদের জন্য খরচ না হয়। তুষার অঞ্চলে যখন পৌঁছলাম তখন দিনের আলো ফুটেছে। বরফ তখনও শক্ত। বোঝার ভারে ন্যুব্জ হয়ে ধীরে কিন্তু না থেমে ওপরে উঠে চলেছিলাম আমরা।

এ যাত্রা আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে! তুকুচা ছাড়ার পরে একবারের জন্যও নীল আকাশের দেখা পেয়েছি কিনা সন্দেহ! শক্ত বরফের খাড়াই ঢালে উঠতে উঠতে ঝুঁকি আছে জেনেও তাই ভোরের ঝকঝকে আবহাওয়ায় চারপাশের দৃশ্য দেখার লোভে বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছিলাম। আমাদের দৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্নপূর্ণা পর্বতপুঞ্জের সেই দানবাকৃতি পর্বতপ্রাচীর। তার গড় উচ্চতা প্রায় ২৩০০০ ফিট। দু'পাশের অপেক্ষাকৃত নিচু শৃঙ্গগুলি একের পর এক উঁচু হয়ে হয়ে মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু একটা দৈত্যাকার ও অগম্য শৃঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেন্দ্রের সেই শৃঙ্গটার খাড়া দেওয়াল আমাদের বেস ক্যাম্পের ওপরে সটান ১০০০০ ফিট উঠে গেছে; তার গা একেবারে মসৃণ, কোথাও কোনও ফাটল বা খাঁজখোঁজ নেই। শৃঙ্গে ওঠার সম্ভাব্য রাস্তার খোঁজে সদা-উৎসুক অভিজ্ঞ পর্বতারোহীর চোখও সে দেওয়ালের রক্ষণে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাবে না। অন্নপূর্ণা পর্বতপুঞ্জ এক অভাবনীয় সুবিশাল দুর্গ; আমরা সবে তার বাইরের প্রাকারে এসে উপস্থিত হয়েছি।

তুষারপর্বত পরিবেষ্টিত প্রাণশূন্য আদিম এক চক্রব্যূহে যেন আমরা প্রবেশ করেছি। কখনও এখানে মানুষের পা পড়েনি। কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদের পক্ষে এ পরিবেশে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ভোরের নরম আলোয় সেই প্রাণহীন স্তব্ধতা, প্রকৃতির সেই রিক্ত রুক্ষ রূপ আমাদের মানসিক শক্তি যেন আরও বাড়িয়ে দিল। এরকম দুর্গম জনপ্রাণীশূন্য তুষারাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে এলে আমাদের মনে কেন যে এমন উল্লাস হয় তা সাধারণ লোককে বুঝিয়ে বলা খুব শক্ত। তারা তো সব ফুল, পাখি, চাঁদ আর ঝরনার সৌন্দর্য দেখেই ব্যাকুল! প্রকৃতি যেখানে তার অফুরন্ত সম্ভার অকৃপণভাবে উপুড় করে দিয়েছে মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে সেদিকেই ছুটে যায়। সাধ করে কে আর এসব জায়গায় আসে!

আমরা প্রায় মঁ ব্লা-র সমান উচ্চতায় পৌঁছে গেছি। প্রচন্ড ঠাণ্ডা। দমের বেশ ঘাটতি হচ্ছে, হাঁপাচ্ছে সবাই। যে যার নিজের মতো ধীরে ধীরে ওপরে উঠে চলেছিলাম, যে গতিতে যে স্বচ্ছন্দ। টেরে বর্ণিত সেই চত্বরটায় যখন পৌঁছলাম আমরা, তখন সূর্য উঠে গেছে। একটু আগেই যে বরফঢাকা পাহাড়ের দেওয়ালগুলো অন্ধকার আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, এখন সেগুলো রোদ্দুরে ঝলমল করছে।

এখান থেকেই আসল আরোহণ শুরু। গতকালের দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি সত্ত্বেও টেরে আজ আমাদের সঙ্গে এসেছে, রাস্তা দেখাবে বলে। স্যাক থেকে দড়িদড়া সব বার করলাম আমরা। গতকাল টেরেরা এখানে চড়াইয়ের শুরুতেই একটা স্থায়ী রোপ লাগিয়ে রেখে গেছে। সেই রোপ ধরে পাথুরে ঢাল বেয়ে আমাদের ওঠা শুরু হল। ঢালটা চূনাপাথরের হলেও বেশ শক্তপোক্ত। নিরাপত্তার জন্য আমরা তিনটে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিলাম। একটা দড়িতে বাঁধা রইলাম আমি আর সরকি, রেবুফত রইল আজীবার সঙ্গে, আর তৃতীয় দড়িতে টেরের সঙ্গে বাঁধা রইল শ্যাজ আর আয়লা।

এই রাস্তায় সত্যিই সটান শৃঙ্গ অবধি ওঠা যাবে কিনা জানতে হলে আমাদের উপগিরিশিরাটার মাথায় পৌঁছতে হবে। তাই ঠিক করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগোব। ঠিক হল, যে মুহূর্তে মনে হবে শেরপাদের স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে, সেখানেই ওরা ওদের পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে নিচে ফিরে যাবে। তারপরে এগোব শুধু আমরা চারজন। আজ যতটা সম্ভব উঁচুতে উঠে আমরা তাঁবু ফেলব। সেই তাঁবুতে আমি আর রেবুফত রাত কাটাব, টেরে আর শ্যাজ নিচের সেই চত্বরটায় নেমে আসবে। সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি-টান্তি দূর করে আজ সন্ধ্যেবেলা ল্যাচেনাল বেস ক্যাম্প থেকে ওই চত্বরে উঠে আসবে, তাঁবু ফেলে টেরের সঙ্গে রাত কাটাবে। শ্যাজ ওই চত্বরে না থেমে নেমে যাবে সোজা বেস ক্যাম্পে, আগামীকাল কোজিকে নিয়ে ফের চত্বরে উঠে এসে আরেকটা তাঁবু ফেলবে। অর্থাৎ, আমি আর রেবুফত রইলাম একেবারে প্রথমে, দ্বিতীয় দলে টেরে আর ল্যাচেনাল পেছন পেছন উঠবে, আর শ্যাজ এবং কোজি তৈরি করবে তৃতীয় দল।

পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়টা কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা হয়ে গেল; শেরপারা মালপত্র রেখে নেমে গেল নিচে। খাড়াই পাথুরে ঢালটায় ওঠা বেশ শক্ত, ওদের জন্য বরং সময় নষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, রক ক্লাইম্বিং-এর এত কঠিন রুটে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ওরা খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। বিশেষ করে সরকি-কে যা দেখলাম, খুব কঠিন পাথুরে রুটেও ও একটা দলকে রীতিমতো নেতৃত্ব দিতে পারে। শেরপারা ফিরে যাবার পর আমাদের গতি বাড়ল। এখান থেকে উপগিরিশিরার রুটটা তো বেশ আকর্ষণীয়ই মনে হচ্ছে! গিরিশিরার দু'পাশে হিমবাহের ঢাল নেমে গেছে। চারদিকের পর্বতশৃঙ্গগুলি অবশ্য আর দেখা যাচ্ছে না, কেননা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের মতো আজও মেঘ নিচে নেমে এসেছে।

গিরিশিরাটা ধীরে ধীরে সরু আর ধারালো হয়ে এল। আল্পসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বেশ মজবুত পাথর, আলগা হয়ে খুলে আসার ভয় নেই। পিঠে বিশাল বোঝাটা না থাকলে আর উচ্চতার জন্য হাঁপ না ধরলে রুটটা বেশ উপভোগ করা যেত! হঠাৎ তুষারপাত শুরু হল। আবহাওয়া প্রচন্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমরা নিশ্চিতভাবে ১৮০০০ ফিটের ওপরে আছি। গিরিশিরা বরাবর ওপরে তাকিয়ে তন্নতন্ন করে তাঁবু ফেলার একটা সুবিধেজনক জায়গা খুঁজছিলাম আমি। এখানে সেখানে দূরে দূরে পাহাড়ের গা থেকে ব্যালকনির মতো বেরিয়ে থাকা কয়েকটা পাথর ছাড়া কোনও জায়গা চোখে পড়ল না। আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে, খুব দ্রুত কিছু একটা ঠিক করতে হবে। শ্যাজ আর টেরেকে এর মধ্যে আবার ফিরে যেতে হবে সেই চত্বরে! ওদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ব্লেডের মতো ধারালো একটা পাথরের শিরাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আমরা তখন ঝুলছিলাম, পা'গুলো পাথরের খাড়া দেওয়ালে ঠেস দেওয়া, নিচে অতল খাদ। এই পাহাড়গুলোর মতো এত খাড়াই ঢাল আল্পসে দেখেছি কিনা মনে করতে পারলাম না। মসৃণ ঢাল থেকে খোঁচার মতো বেরিয়ে থাকা পাথরগুলোর ওপর বরফ জমে আছে। এত খাড়া ঢালে কী করে যে বরফ জমে থাকে কে জানে! এই জন্যই এত ঘন ঘন তুষারধ্বস নামে এখানে!

গিরিশিরার ওই বিপজ্জনক অংশটা পেরিয়ে একটা ছোট্ট ত্রিভুজাকৃতি বরফাবৃত চাতাল পেলাম আমরা। আবহাওয়া খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আর কিচ্ছু না ভেবে ওখানেই আমাদের তাঁবু ফেলব ঠিক করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়লাম সবাই। আইস অ্যাক্স দিয়ে আলগা তুষার সরিয়ে সরিয়ে গিরিশিরার দু'পাশে ফেলছিলাম আমরা, তা থেকে দু'পাশেই ছোটখাটো তুষারধ্বস শুরু হয়ে গেল, বরফে ঢাকা কিছু বোল্ডারও সেই ধ্বসে যোগ দিল। কিন্তু ওভাবে সাফাই করার পরও চাতালটায় স্রেফ কোনওরকমে দু'জনের বসার জায়গা বার করা গেল। আইস অ্যাক্স দিয়ে চাগাড় দিয়ে বরফে গেঁথে থাকা কিছু পাথর উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। টেরে আমার আইস অ্যাক্সটা নিয়ে রেগেমেগে একটা পাথরের গায়ে এমন কতক ঘা কষাল যে ভাবলাম পাথরটা এই বোধহয় ফেটে দু'টুকরো হয়ে গেল। হা ভগবান! দেখি আইস অ্যাক্সের ফলাটাই বেঁকে দুমড়ে গেছে! তাও ভাগ্যি, টেরে ফের ফলাটা সোজা করতে পেরেছিল। অনেক কষ্টে একটা তাঁবু ফেলার মতো জায়গা বার করা গেল। টেরে আর শ্যাজ এবার ফেরার রাস্তা ধরল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল ওদের জন্য, তুষারপাতের মধ্যে এই রাস্তায় নামা যথেষ্ট বিপজ্জনক।

এবার রেবুফত আর আমি একা। একটু পরিশ্রম করলেই হাঁপ ধরে যাচ্ছিল, সে অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁবু খাটানোর তোড়জোড় শুরু করলাম আমরা। একটা বিশাল বড় বোল্ডার চাগাড় দিয়ে তুলে সরিয়ে সাবধানে খাদের ধারে রাখার পর জায়গাটা বেশ বড় হয়ে গেল। পুরো জায়গাটায় আলগা তুষার বিছিয়ে পা দিয়ে দাবিয়ে দাবিয়ে সমতল করার পর টেন্ট খাটানো গেল। তাঁবুর সামনের দড়ি দুটো পাথরের গায়ে গাঁথা দুটো রক পিটনে বাঁধা হল, আর পেছনের দুটো দড়ি আমাদের আইস অ্যাক্স দুটোর মাথায় বেঁধে সেগুলো পুরোটা বরফে গেঁথে দেওয়া হল; দু'পাশের টানা দেওয়ার দড়িগুলো খুঁটির বদলে বড় বড় পাথরে বেঁধে রাখা হল। হাওয়ার ঝাপটা থেকে কিছুটা বাঁচার জন্য রেবুফত আবার একপাশে খাদের কিনারায় বরফ দিয়ে নিচু একটা দেওয়াল মতো তৈরি করল। তারপর নিরাপত্তার জন্য অভিজ্ঞ পর্বতারোহীর মতোই একটা পিটন পাথরের গায়ে শক্ত করে গেঁথে তার সঙ্গে আমাদের কোমরের দড়িদুটো বেঁধে রাখল, যাতে কোনও কারণে চাতাল থেকে পড়ে গেলেও দড়িতে ঝুলতে থাকি। সারারাত গরুর মতো আমরা সেই খোঁটায় বাঁধা রইলাম!

অবিরাম তুষারপাত হয়ে চলল, অসহ্য ঠাণ্ডা। এরকম সাংঘাতিক ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে এমন বেখাপ্পা জায়গায় কখনও তাঁবুতে রাত কাটিয়েছি কিনা মনে করতে পারলাম না। চা খাওয়ার পর ধড়ে যেন প্রাণ এল। দু'জনের কারও খিদে নেই একদমই, তবে ডাক্তারের নির্দেশ তো আর অমান্য করা যায় না! তাই বাধ্য ছেলের মতো ভিটামিন বি টু-র বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। হাহাহাহা করে সারাক্ষণ হাওয়া বয়ে চলেছে, টেন্টটা থরথর করে কাঁপছে, আবোলতাবোল নানা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বহুক্ষণ পরে চোখে ঘুম এল।

ভোর হল। তখনও হালকা বরফ পড়ছে। পাথুরে জায়গাগুলোর ওপর আলগা তুষারের পুরু আস্তরণ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে এগোনো প্রায় অসম্ভব। ভাবলাম আবহাওয়া ভালো হয় কিনা দেখি, নইলে দুপুরে নিচে নেমে যাব। এখানে সব যেরকম আছে থাক, ফিরে এলে কাজে লাগবে। এর পরের অংশটাই সবচেয়ে শক্ত। আমাদের তাঁবুর ঠিক ওপরেই একটা খাড়াই বিশাল পাথরের চাঁই, তার মাথার কাছে একটা সরু ফাটল আছে। কিন্তু সেই ফাটল অবধি পৌঁছব কী করে ভগবান জানে! ওই পর্যন্ত পুরো চাঁইটাই আলগা তুষারে ঢাকা পড়েছে, নিচে কী আছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। রেবুফত বলল, এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না আর, এক্ষুনি নিচে নেমে যাওয়া যাক। আমি ভাবলাম, দেখাই যাক না শেষ অবধি! এসেছি যখন একেবারে শেষ দেখে ছাড়ব। নইলে পরে হয়ত আক্ষেপ থেকে যাবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলে এই তুষার হয়ত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গলে যাবে, তখন ভালোই এগোনো যাবে।

"ওই ওরা আসছে, আইস অ্যাক্সের আওয়াজ শোনো।"

দেখা গেল ল্যাচেনাল আর টেরে গিরিশিরা ধরে ওপরে উঠে আসছে।

"তোমরা এখনও তাঁবুর ভেতরে কী করছ? ভ্যারেন্ডা ভাজছ?" চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল ওরা।

"বরফ দেখতে পাচ্ছ না!"

"দেখেছি। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি দেখেছি। ভোরবেলা থেকে এর মধ্যে ক্লাইম্ব করেই এখানে পৌঁছলাম বন্ধুরা!"

"তোমাদের দেখি একেবারে পিপুফিশু অবস্থা!" ল্যাচেনাল ফোড়ন কাটল।

"আরে, পাগল নাকি এরমধ্যে বেরোব?" রেবুফত বলল, "আমি বাবা তাঁবু থেকে নড়ছি না।"

"হুমম, দেখা যাক কে বেরোয় আর কে না বেরোয়!" বিদ্রুপের সুরে বলল ল্যাচেনাল। তারপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওপরে উঠতে শুরু করল। এই রাস্তায় ও দু'দিন আগে উঠেছে। প্রথমে আলগা তুষারের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে বাঁ দিকে এগোতে আরম্ভ করল সে। ঝুরো বরফ খাড়া পাথরের ঢালে স্রেফ আলগাভাবে পড়ে আছে, কিন্তু ল্যাচেনাল যখন তার ওপর পা ফেলল, পায়ের চাপে সেই তুষার পাথরের গায়ে মোটামুটি দৃঢ়ভাবে সেঁটে গেল। বাঁ দিকে কিছুটা এগোনোর পরে ফিট দশেক ওপরে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছিল, ল্যাচেনাল সেই অবধি পৌঁছে গেল। রক ক্লাইম্বিং করার জন্য হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার কিম্বা পা রাখার যত খাঁজখোঁজ বা 'হোল্ড' সবই শক্ত বরফে ঢেকে আছে। টেরে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, ল্যাচেনালের কোমরে বাঁধা দড়িটার এক প্রান্ত টেরের হাতে ধরা, একটু একটু করে সে দড়ি ছাড়ছিল, যাকে বলে 'বিলে' (belay) করা। ল্যাচেনাল এবারে একটা তাকের মতো জায়গায় পৌঁছতে চাইছে, সে জন্য একটা ফাটল ব্যবহার করবে বলে আইস অ্যাক্স দিয়ে ভেতরটা সাফ করছিল। হঠাৎ ওর পা পিছলে গেল। প্রায় অলৌকিকভাবে হাতে একটা হোল্ড পেয়ে যাওয়ায় সে ঝুলতে লাগল। সামলে নিয়ে কিছুটা নেমে এল সে, পাথরের গায়ে একটা 'পিটন' বা গজাল পুঁতল। পিটনটা দেখে মোটেই ভরসা হচ্ছিল না, নড়বড় করছিল। ল্যাচেনাল কিন্তু নির্দ্বিধায় ওটার ওপর পা রেখে উঠে পড়ল। এবার? এরপর কী করে ওঠে সে দেখা যাক! ওর আইস অ্যাক্সের ফলাটা সেই ফাটলটার ভেতরে ইঞ্চিখানেক ঢুকিয়ে দিল ল্যাচেনাল, তারপর অ্যাক্সের ভেজা হাতলটা ধরে টানাটানি করতে লাগল, দেখছে অ্যাক্সটা ঠিকমত ফেঁসেছে কিনা। ফলাটা প্রথমে ফাটল বরাবর ওপরনিচে ওঠানামা করছিল, কিন্তু ল্যাচেনালের টানাহেঁচড়ায় সেটা দিব্যি পোক্তভাবে ফেঁসে গেল। এরপর সে দু'হাতে অ্যাক্সের হাতলটা শক্ত করে ধরে ঝুলে পড়ে পিটন থেকে পা সরিয়ে নিল, প্রাণপণ চেষ্টায় শরীরটা ওপরদিকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছিল না আমার। অভিযানের এই পর্বে এরকম মারাত্মক ঝুঁকি নেবার কোনও যুক্তি নেই। আমি টেরের দিকে এগিয়ে গেলাম, যাতে ল্যাচেনাল পড়ে গেলে দড়ি ধরে টেরেকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখি ল্যাচেনাল উঠে পড়েছে, পৌঁছে গেছে সেই তাকটায়। এলেম আছে বটে! এক সেকেন্ডও দেরি না করে টেরে একই রাস্তায় রওনা দিল, রুটের সবচেয়ে কঠিন অংশটার ওপরে আরেকটা পিটন পুঁতে তার থেকে আমাদের জন্য দড়ি ঝুলিয়ে দিল।

অগত্যা তাঁবু গুটিয়ে স্যাক কাঁধে নিয়ে আমি আর রেবুফতও রওনা দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই টেরে আর ল্যাচেনালের কাছে পৌঁছে গেলাম। তাকটা বেশ নিরাপদ জায়গা। একটা বড় পাথরের চাঁই জায়গাটাকে হাওয়া থেকে আড়াল করে রেখেছে। গতকাল আমাদের এখানেই তাঁবু ফেলা উচিত ছিল, খারাপ আবহাওয়ায় সব গুবলেট হয়ে গেছে। আজও আকাশে মেঘ আছে, তবে মেঘের ফাঁক দিয়ে বাঁ দিকে দূরে অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহের একেবারে ওপরের অংশের হিমানী প্রপাতটা দেখা যাচ্ছে। এর আগে হিমবাহটা পরিষ্কার দেখতে পাইনি।



লায়োনেল টেরে



লুই ল্যাচেনাল



মরিস হারজগ

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম আমরা। এই রুটের ব্যাপারে একমাত্র আশাবাদী মনে হল টেরেকে। সকালে যে অমন চনমনে ছিল, সেই ল্যাচেনালও এখন বলছে এ রাস্তা ফুরোবার নয়, বড্ড লম্বা রুট। রেবুফতও সেই দলে। আমার মন বলছে, অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে পৌঁছতে হলে খুব সম্ভবত এটা সঠিক রাস্তা নয়। যদি পরে দেখাও যায় যে গিরিশিরাটা সটান চূড়ো অবধি উঠে গেছে, তাও পুরো দল নিয়ে এ রাস্তায় আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। রুটটা এত লম্বা আর এতটাই কঠিন যে বেশ কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ থাকলে বা তাড়াতাড়ি বর্ষা চলে এলে, কিম্বা কোনও আহত অভিযাত্রীকে নিচে নামিয়ে আনার প্রয়োজন হলে আমরা সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাব। এই একই কারণে আমরা ধৌলাগিরি ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু টেরেকে বোঝায় কার সাধ্য! সে যথারীতি উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে। এসব সাবধানী যুক্তিতে সে মোটেও দমবার পাত্র নয়। ওর এই প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস, এই হাল না ছাড়া জেদ; সর্বোপরি ওর অদম্য ইচ্ছা, সর্বস্ব পণ করে চূড়ান্ত লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রাসী মনোভাব দেখে ওকে নিরাশ করতে মন চায় না। অন্যদিকে অভিযানের একটা দিনও বাজে খরচ করতে চাই না আমি।

অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহ আর তার তলার বিশাল হিমানী প্রপাতটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল, অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে ওঠার যদি সত্যিই কোনও রাস্তা থেকে থাকে তবে সেটা ওখানে। আরেকটা পরিকল্পনা ধীরে ধীরে আমার মনে দানা বাঁধতে শুরু করল। এই রুটে রেবুফত আর ল্যাচেনালের এগোনোর আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। ওরা যত শীঘ্র সম্ভব গিরিশিরার নিচে বেস ক্যাম্পে ফিরে যাক। সেখান থেকে একজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক ওই হিমানী প্রপাতটার উদ্দেশে, ওটা ধরে উঠে দেখুক উত্তর হিমবাহের উচ্চতর উপত্যকায় পৌঁছনো যায় কিনা। এখান থেকে দেখে যা আন্দাজ করা যাচ্ছে, হিমবাহের ডান তীর (true right bank) ধরে এগোতে হবে ওদের। হিমবাহের ওপরের অংশে পৌঁছতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে নিচে খবর পাঠাবে ওরা। এদিকে টেরের সঙ্গে আমি এই উপগিরিশিরা ধরে কতটা এগোনো যায় দেখি। সেইমতো ল্যাচেনাল আর রেবুফত নেমে গেল। কোজি আর শ্যাজকে ওরা বলে যাবে তারা যেন আগামীকাল এখানে উঠে আসে। আমরা আরও এগিয়ে গেলে পেছনে কোজি আর শ্যাজ আছে জেনে ভরসা পাব, ফিরে যেতে হলেও তাঁবু আর মালপত্র নিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য ওদের সাহায্য লাগবে।

টেরে আর আমি তাঁবু খাটালাম। এই প্রথম ওর সঙ্গে এক তাঁবুতে রাত কাটাব। আবহাওয়া ফের খারাপ হয়ে এল, তা সত্ত্বেও নিঃসাড়ে ঘুমোলাম দু'জনে। টেরে প্রতিদিন ঠিক সময়মত উঠে পড়ে। ভোর হওয়ার একটু পরেই উঠে সে চায়ের জল বসাল। আমি স্লিপিং ব্যাগের ভেতর গুটিসুটি মেরে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। 'বড়া সাহিব' হওয়ার এই সুবিধে! শেষে জলখাবার বানানোর পর টেরে আমায় তুলে চা আর খাবার দিল।

ঠিক হল যথাসম্ভব কম মালপত্র নিয়ে হালকা হয়ে আজ বেরোব দু'জনে, যাতে তাড়াতাড়ি এগোতে পারি। গিরিশিরাটার শেষ দেখতে হবে! গত রাতেও প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। টাটকা ঝুরো বরফের ওপর দিয়ে রওনা দিলাম আমরা। এত উচ্চতায় দমের বেশ ঘাটতি হচ্ছে। ঠান্ডায় হাত-পা জমে আছে তখনও। খুব কম মালপত্র নিয়ে রওনা হলেও প্রথম প্রথম চড়াই ভাঙতে দম বেরিয়ে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বিশ্রাম না নিয়ে এগিয়ে চললাম তাও, নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। একটা সহজ চিমনি ক্লাইম্বিং-এর পর উপগিরিশিরাটার পিঠের ওপর উঠে এলাম ফের। গিরিশিরাটা ক্রমশ এত সরু আর তীক্ষ্ণ হয়ে এল যে ভারসাম্য বজায় রেখে ওর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোনো অসম্ভব। বাধ্য হয়ে গিরিশিরার ফলাটা দু'হাতে ধরে, খাড়াই পাথরের ঢালের খাঁজেখোঁজে পা রেখে, প্রায় ঝুলে ঝুলে এগোতে হল। আমাদের পায়ের নিচে একটা বরফের নালা প্রায় ছ'সাত হাজার ফিট নেমে গেছে। ক্রমশ ল্যাচেনাল আর টেরে বর্ণিত অন্নপূর্ণার সেই বিখ্যাত তুষারাবৃত মূল গিরিশিরাটার কাছাকাছি চলে এলাম। ওদের কথাবার্তার ধরন শুনে প্রথম থেকেই এই রাস্তাটা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বাস্তবে, যত কাছে এগোলাম তত পরিস্কার হল গিরিশিরাটা প্রচন্ড খাড়াই আর উঁচু। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে টেরে এগিয়ে চলল, একটু পেছনে থেকে আমি ওকে অনুসরণ করলাম। প্রথমে একফালি চাঁদের মতো দেখতে একটা সুন্দর খাঁজ পড়ল, তারপর রাস্তা সত্যিই খুব খাড়াই হয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, জুতোয় বাঁধা ক্র্যাম্পনের নিচে শুধু আলগা তুষার নেই আর, রয়েছে শক্ত বরফ। টেরে বেপরোয়া আইস অ্যাক্স চালিয়ে ধাপ কেটে চলেছে, আমি আইস-পিটন পুঁতে পুঁতে তার ভেতর দিয়ে টেরের কোমরে বাঁধা দড়িটা গলিয়ে বিলে করে গেলাম, ওকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। ভাগ্য ভাল বরফের আস্তরণটা প্রচন্ড শক্ত, তাই খুব বড় বড় ধাপ কাটার দরকার হচ্ছিল না। একটা খাড়াই বরফের দেওয়াল পড়ল সামনে, বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে সেটা এড়ানো গেল। টেরে আইস-পিটন গেঁথে গেঁথে তার ভেতর দড়ি গলিয়ে এগিয়ে চলল, আমি পেছন পেছন সেগুলো খুলতে খুলতে এগোলাম। খুব বেশি পিটন নেই সঙ্গে, তাই এই কিপটেমি। রাস্তা এত খাড়াই যে আমাদের প্রায় নাকের সামনে বরফের দেওয়াল। অনবরত হাতে ধরার আর পা রাখার জন্য বরফে ধাপ কেটে উঠতে হচ্ছে। এবারে সামনে পড়ল উপগিরিশিরার পিঠের ওপর কুঁজের মতো কতগুলো পাথরের স্তূপ; প্রথম স্তূপের সামনের পাথরের

দেওয়ালটা আমাদের দিকে ঝুঁকে আছে, অর্থাৎ খাড়াই নব্বই ডিগ্রীরও বেশি, যাকে বলে ওভারহ্যাং। উফ, রাস্তা বটে একখানা!

টেরে তরতর করে ডানদিকে কিছুটা এগিয়ে পাথরের গায়ে একটা ফাটলে দুটো গজাল পুঁতে দড়ি লাগিয়ে দিল। তারপর দড়িতে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে প্রায় মাকড়শার মতো ওভারহ্যাং রকটা বেয়ে উঠে গেল, নিচে ওই অতল খাদ। এরপর সে আমায় টেনে তুলল। এদিকটায় ছায়া হওয়াতে ঠাণ্ডায় কাঁপছিলাম দুজনে। পাথরের কুঁজগুলো এড়ানোর জন্য এবার টেরে ডানদিকের বরফের ঢালে নেমে এগোতে শুরু করল, আমি দড়ি ধরে ওকে বিলে করে গেলাম। অংশটা খুবই বিপজ্জনক, মোটেই ভালো লাগছিল না ব্যাপারটা। ফের রোদ্দুরের এলাকায় চলে আসায় আর অত ঠাণ্ডা লাগছিল না বটে, কিন্তু রোদের তাপে শক্ত বরফ গলে প্রায় মাখনের মতো হয়ে আছে, এগোতে আরও অসুবিধে হচ্ছিল। কোনওরকমে শেষ চড়াইটা পেরিয়ে উপগিরিশিরার মাথায় পৌঁছে গেলাম আমরা, জায়গাটার উচ্চতা প্রায় ২০০০০ ফিট। আবহাওয়া একদম পরিস্কার এখন; ছবি তুললাম কয়েকটা। অন্নপূর্ণার শৃঙ্গ মনে হচ্ছে যেন ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে।

আমাদের উপগিরিশিরাটা মূল গিরিশিরার সঙ্গে মিলিত হয়ে একেবারে অন্নপূর্ণার শৃঙ্গ অবধি পৌঁছে গেছে ঠিকই, তবে যা দেখলাম, মূল গিরিশিরাটা বেজায় ভাঙাচোরা! আর উপগিরিশিরার নিচ থেকে শৃঙ্গ যতটা দূরে মনে হচ্ছিল, এখান থেকেও যেন ততটাই দূরে লাগছে। খুবই দীর্ঘ আর কঠিন ওই গিরিশিরার রাস্তা। এত পরিস্কার আবহাওয়ায় ঠিকঠাক দূরত্ব আন্দাজ করা মুশকিল, নিচ থেকে দেখে তাই ঠিক বুঝতে পারিনি আমরা। সামনের দিকে তাকিয়ে আমি আর টেরে চুপচাপ রুটটা জরিপ করে যাচ্ছিলাম, এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝার মতো জায়গায় পৌঁছেছি। এ রুটে শৃঙ্গে পৌঁছতে দীর্ঘদিন লেগে যাবে, এতদূর আমরা যে গতিতে এগিয়েছি সেভাবে এগোলেও। হায়, প্রকৃতির এই বিশালত্বের কাছে আমাদের ক্ষমতা কত তুচ্ছ! আলোচনা করার কোনও দরকার ছিল না আর। এ পথে পুরো অভিযান চালনা করা পাগলামিরই নামান্তর। মূল গিরিশিরার পথে এখান থেকে অদৃশ্য আর কোনও ফাঁক বা বাধাবিপত্তি যদি নাও থাকে, তাও এ রুটে যাবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আল্পসের কোনও রুটের সঙ্গে এর কোনও তুলনাই হয় না। প্রার্থনা করছিলাম, ল্যাচেনাল আর রেবুফত যেন উত্তর হিমবাহের ওপরের ঢাল অবধি পৌঁছতে পারে। এখান থেকে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে ঢালটা, মনে হল পরিকল্পনামাফিক হিমানী প্রপাতের পথে ওদের ওখানে পৌঁছতে পারার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আর ওরা যদি বিফল হয়, তাহলে আমাদের শেষ আশাও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই বিপুল কর্মকাণ্ড, এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত কষ্ট – সবই কি শেষমেশ বেকার হয়ে যাবে? হলে খুবই দুঃখের কথা!

আর দেরি না করে নামতে শুরু করলাম; নামাটা যে একইরকম কঠিন হবে জানি। যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে পিটন পুঁতে দড়ির সাহায্যে বিলে করতে করতে দুজনে পালা করে নামছিলাম। যেখানে রোদ সেখানে প্রচন্ড গরম, আবার ছায়ায় গেলেই কনকনে ঠাণ্ডা। দেখা গেল বরফের ঢালের রৌদ্রালোকিত অংশগুলির উপরিভাগের তুষারস্তর আর আমাদের ভার বইতে পারছে না, গলে আলগা হয়ে গেছে। শক্ত বরফে চলা এর চেয়ে ঢের সোজা। খুব সাবধানে বিলে করে করে নামতে হচ্ছিল। উপগিরিশিরার ওপরে পৌঁছে কিছুটা এগোনোর পর পিটন গেল ফুরিয়ে, সীমিতসংখ্যক পিটন নিয়ে বেরিয়েছিলাম আমরা। এরপর আর পিটনে গলানো দড়ির নিরাপত্তাও রইল না। দু'জনে একে অন্যের সঙ্গে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এমনিই নামতে শুরু করলাম। আমি যখন নামি, টেরে দড়িটা ধরে খুব মন দিয়ে আমায় দেখে; টেরে নামার সময় দেখি আমি। খুব ভালো করেই জানি, একজন পড়ে গেলে পিটনের সাহায্য ছাড়া দ্বিতীয়জনের পক্ষে শুধু দড়ি ধরে প্রথমজনকে সামলানো সম্ভব নয়, সেও দড়ির হ্যাঁচকা টানে ঢালে গড়িয়ে পড়বে। টেরে অদ্ভুত কায়দায় ঢালের দিকে পেছন ফিরে বরফে জুতোর গোড়ালি দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে ধাপ বানিয়ে খুব সন্তর্পণে ভারসাম্য বজায় রেখে নামছিল। ও আমায় পরে বলেছিল, দুবার ও পিছলে যেতে যেতে কোনওরকমে সামলে নিয়েছে। আমি অবশ্য ঢালের দিকে মুখ করে দু'পায়ের ক্র্যাম্পনের সামনের কাঁটা আর আইস অ্যাক্সের ফলা বরফে গেঁথে গেঁথে সনাতন 'থ্রি পয়েন্ট ক্লাইম্বিং' টেকনিকেই নামছিলাম।

"হ্যালো, খবর কী?" দূর থেকে শ্যাজের গলা শোনা গেল। ও আমাদের সাহায্য করতে ওপরে উঠে আসছে। টেরে চিৎকার করে ঘোষণা করে দিল এই রুট বাতিল।

"শ্যাজ, তাঁবু গোটাও, বেস ক্যাম্পে ফেরত চল সব।"

শুনে শ্যাজ দাঁড়িয়ে পড়ল, কিছুক্ষণ আমাদের নামা লক্ষ্য করল, তারপর ফিরে চলল নিচে। আকাশে ফের মেঘ ঘিরে এসেছে, কুয়াশা আর তুষারে মিলেমিশে চারপাশ ধূসর হয়ে আছে। খাড়াই বরফের ঢাল আর কতটা বাকি আছে আন্দাজ করে আমি স্যাক থেকে একটা দড়ি আর শেষ পিটনটা বার করলাম, ওগুলো আপৎকালীন সহায় হিসেবে রাখা ছিল। গজালটা গেঁথে দড়িটা দু'পাল্লা করে ঝুলিয়ে দিলাম, র‍্যাপেলিং করে নামব। প্রথমে টেরে নেমে গেল। পিটনটার দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম আমি; ঝাঁকুনির চোটে ওটা বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিল, তবে টেরে পুরোপুরি নেমে যাওয়ার পর ফের সোজা হয়ে গেল দেখে আশ্বস্ত হলাম। নির্ভয়ে আমিও নেমে গেলাম দড়ি ধরে। নেমে যেখানে পা রাখব, টেরে সে জায়গাটা আইস অ্যাক্স দিয়ে সমান করে রেখেছিল। একটা প্রান্ত ধরে টেনে টেনে দড়িটাও উদ্ধার করা গেল। একটু

পরেই পাথুরে ঢালে পৌঁছে গেলাম; ক্র্যাম্পন খুলতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম দু'জনে। আজ সন্ধ্যেবেলার মধ্যে যদি অন্তত এ রুটে আমাদের প্রথম ক্যাম্প, ঘাসে ঢাকা সেই চত্বরটা অবধি নেমে যেতে পারি তো বেশ হয়। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে প্রবল উৎসাহে আমরা গিরিশিরার সেই তীক্ষ্ণ ধারালো বিপজ্জনক অংশটা ধরে ঝুলে ঝুলে এগোতে শুরু করলাম। সকালে যে রাস্তা আধঘণ্টা লেগেছিল এখন তা কয়েক মিনিটেই পেরিয়ে গেলাম।

সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু হল। চিমনি বেয়ে ঘষটে, তুষারাবৃত নালা দিয়ে পিছলে সোজা অংশগুলো হুড়মুড় করে নেমে গেলাম। অত ঠান্ডাতেও দরদর করে ঘামছিলাম দুজনে। রেকর্ড সময়ে সকালের ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। দেখি শ্যাজ আর সরকি মিলে সবে তাঁবুটা গোটাতে পেরেছে। টেরে চটপট দুর্দান্ত চা বানিয়ে ফেলল। চায়ের সঙ্গে খাবারের টিন খুলে টম্যাটো সসে ডোবানো মাংস আর সয়াবিন খেতে খেতে সংক্ষেপে শ্যাজদের আজকের অভিজ্ঞতা বললাম। অভিযানটা বেশ রোমাঞ্চকর হয়েছে সন্দেহ নেই, ক্লান্তিকরও বটে, তবে এত কাণ্ডের পর আমরা একটা সামান্য উপগিরিশিরার মাথায় উঠতে পেরেছি মাত্র। টেরে অবশ্য পরে বলেছিল, এই যাত্রার মত আর কখনও সে পাহাড়ে এরকম সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। এতেই যেটুকু সার্থকতা।

আকাশটা থম মেরে আছে, তবে দেখে মনে হল বিকেল অবধি এরকমই থাকবে। রওনা হয়ে টেরে আর ল্যাচেনালের খাটানো দড়িটা ধরে একে একে সেই ত্রিভুজাকৃতি জায়গাটায় নেমে এলাম সবাই, যেখানে আমি আর রেবুফত গত পরশু রাত্রে তাঁবু ফেলেছিলাম। চারজনেরই পিঠে প্রচুর বোঝা, দুটো তাঁবু আর আনুষঙ্গিক সমস্ত মালপত্র, রাস্তাও যথেষ্ট কঠিন আর বিপজ্জনক, তবে তাতে আমাদের গতি কমল না। আমাদের নামার স্পিড দেখে সরকি প্রথমে ঘাবড়ে গেল, কিন্তু একটু পরেই দেখি সেও বেশ তাল মিলিয়ে চলেছে। পুরু হয়ে তুষার জমে আছে রাস্তায়, বেশ সাবধানে চলতে হচ্ছিল। কঠিন অংশটুকু পেরিয়ে যেতেই ফের হুড়মুড় করে নামা শুরু হল। ঘাসের চত্বরটা দেখা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে কাছে আসছে সেটা। চত্বরে পৌঁছনোর ঘাসের ঢালগুলো সব এখন তুষারে ঢাকা। প্রায় দৌড়ে সে ঢাল বেয়ে নেমে পৌঁছে গেলাম ক্যাম্পে। এই অস্থায়ী প্রথম ক্যাম্প থেকে উপগিরিশিরার মাথায় উঠতে আড়াই দিন লেগেছিল আমাদের, ফেরার সময় মাত্র কয়েক ঘন্টাতেই নেমে এলাম।

নিচে বেস ক্যাম্প পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, আলগা নুড়িপাথরের বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরে উজ্জ্বল হলুদ রঙের তাঁবুগুলো দাঁড়িয়ে আছে। হালকা তুষারপাত থেমে তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টেরে আর আমার মধ্যে একবার শুধু চোখ চাওয়াচাওয়ি হল; মুহূর্তের মধ্যে ক্যাম্প থেকে যতটা পারি মালপত্র স্যাকে ভরে আমরা দু'জন ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম। শ্যাজ আর সরকি প্রাণপণে আমাদের নাগাল পাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা তখন উল্কার বেগে নেমে চলেছি। ওই ভারি রুকস্যাক পিঠে নিয়েও বোল্ডারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে, তুষারজমা ঢাল বেয়ে তুলির মসৃণ টানের মতো স্লিপ খেয়ে কয়েক মিনিটের ভেতরেই আমরা নুড়িপাথরের মোরেনে নেমে এলাম। শ্যাজ নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছিল, এত তড়িঘড়ি নামার কারণটা কী! সত্যি কথা বলতে কি তেমন কোনও কারণ ছিল না। পনেরো মিনিটের বদলে ধীরেসুস্থে এক ঘণ্টায়ও দিব্যি নামতে পারতাম আমরা। বিপজ্জনক ও কঠিন এক অভিযান শেষে নিরাপদে নেমে আসার আনন্দই হয়ত এই উত্তেজনার কারণ।

বেস ক্যাম্প পৌঁছে দারুণ খবর পাওয়া গেল। ল্যাচেনাল আর রেবুফত তাদের শেরপাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে উত্তর হিমবাহের সেই হিমানী প্রপাতের ডান তীর ধরে ওপরে ওঠা সম্ভব। হিমবাহের ওপরের ঢালটা ওরা এখনও দেখতে পাচ্ছে না, তবে নিশ্চিত যে ওখানে পৌঁছন যাবে। ওরা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছে না, আমি আর টেরে উপগিরিশিরার মাথায় উঠে প্রায় ২০,০০০ ফিট উচ্চতা থেকে সে অংশটা সম্পূর্ণ দেখেছি। জানতাম যে একবার ওপরে পৌঁছতে পারলে আর তেমন বাধাবিঘ্ন নেই।

অভিযানে এই প্রথম একটু আশার আলো দেখা গেল। তবে কি শেষমেশ আমাদের জেদ আর বিশ্বাসের পুরস্কার মিলতে চলেছে? দেখা যাক! আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

তুষারপাত, বৃষ্টি আর ঘামে ভিজে আমি আর টেরে পুরো ভূত হয়ে গেছি। জামাকাপড় বদলে একটু পরিস্কার হচ্ছিলাম। এমন সময় সরকির সঙ্গে পৌঁছেই শ্যাজ ঘোষণা করল, "শৃঙ্গে ওঠার রাস্তা আমি পেয়ে গেছি, আমার দু'জন শেরপা চাই..."

"মাত্র দু'জন শেরপা! আর?" টেরে ফোড়ন কাটল।

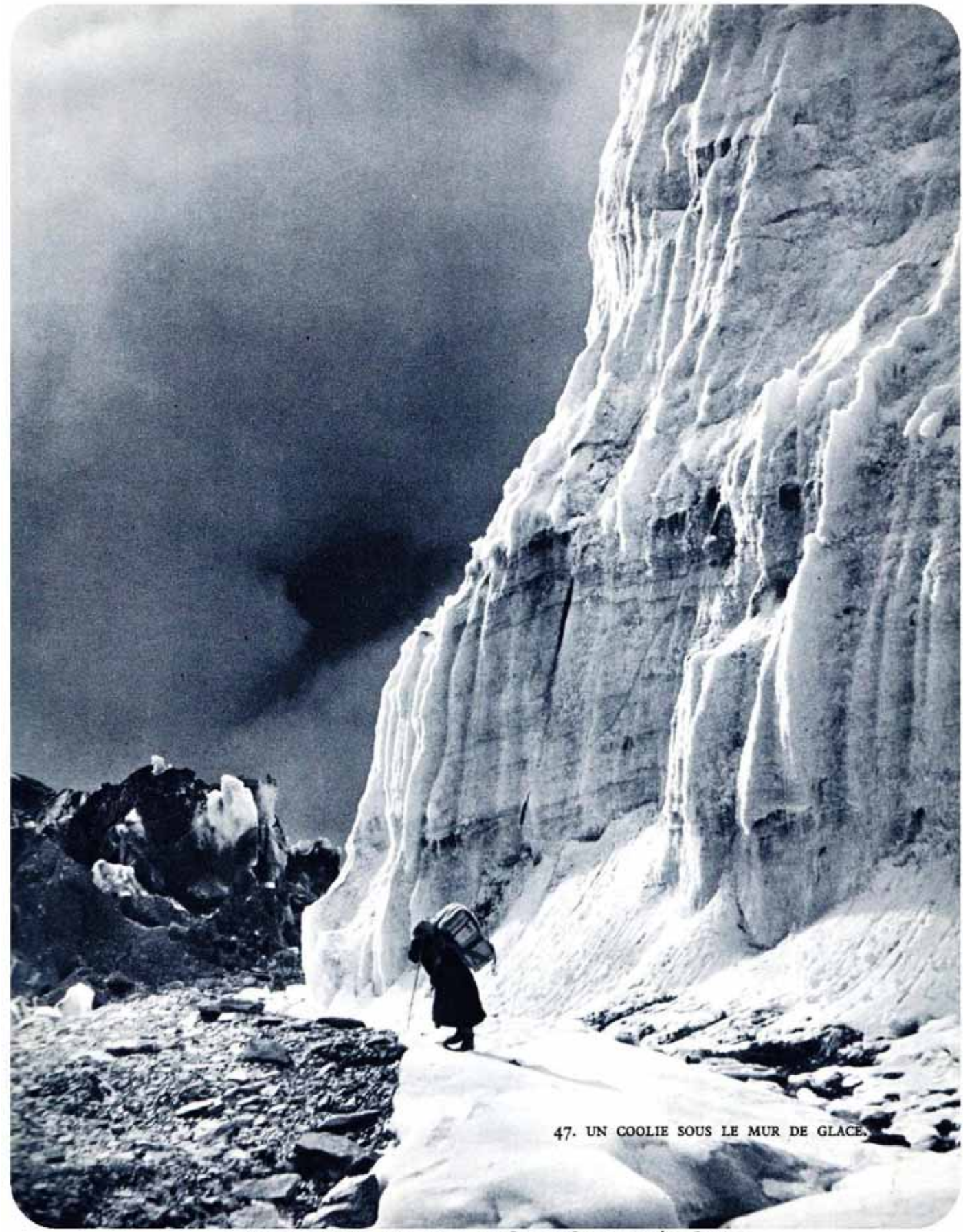
"দুটো হাই অল্টিচিউড তাঁবু, সরঞ্জাম, আর তিনদিনের খাবার।"

"চিফ এবার একাই যেতে চান অভিযানে! আমাদের ওপর আর ভরসা নেই!" কোজি ফুট কাটে। নিখুঁত ব্যবস্থাপনার ভক্ত বলে আল্পসের পাহাড়ি এলাকায় শ্যাজকে সবাই 'চিফ' বলে ডাকে।

"আহা, বলতে দাও না ওকে! বল শ্যাজ, তোমার প্ল্যানটা কী?"

“উত্তর হিমবাহের ওপরের ঢালে পৌঁছনর জন্য একটা সহজ গিরিশিরা আবিস্কার করেছি। এ পথে হিমানী প্রপাতের ডানদিকের ভাঙ্গাচোরা অংশটা এড়ানো যাবে।”

“শ্যাজ ঠিকই বলছে,” বললাম আমি, “ধরো যদি ল্যাচেনাল আর রেবুফত ব্যর্থ হয়, তখন কী করব আমরা? তূণে আরেকটা তীর থাকা ভালো।”



ওপরের ক্যাম্পের পথে একজন কুলি।। ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

ঠিক হল পরদিন সকালেই শ্যাজ বেরিয়ে যাবে। কোজি ও অডটের সঙ্গে মিলে শ্যাজই মিরিস্তি খোলা ধরে এই বেস ক্যাম্প অবধি রাস্তা আবিস্কার করেছে, এখন অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে ওঠার চূড়ান্ত রুটটা খুঁজে বার করার ব্যাপারেও সে যথেষ্ট আশাবাদী। টেরে, আমি আর সরকি ভয়ানক ক্লান্ত; তাই ঠিক করলাম পরদিন সকালটা বিশ্রাম নেব; দুপুরে আজীবাকে সঙ্গে নিয়ে ল্যাচেনালদের রাস্তায় বেরোব। সময় এখন এতটাই মূল্যবান যে এক ঘন্টা নষ্ট করতেও ইচ্ছে করে না। তবে মন বলছে এবারে ঠিক দিকে এগোচ্ছি আমরা, একটা সকাল তাই বিশ্রাম নেওয়াই যায়।

"কোজি, তোমায় একটা বাজে কাজ দেব..."

"কী কাজ?"

"প্রথমে উপগিরিশিরার রুটে ঘাসের চত্বরে বসানো ক্যাম্পটা গুটিয়ে নামাতে হবে। তারপর এই বেস ক্যাম্পটা আরও এগিয়ে নিয়ে বসাতে হবে। কোথায় বসাবে বলে দেব আমি।"

"বাজে কাজই বটে! তবে যদি করতেই হয়..."

"করতেই হবে, কোজি। শেষ যে জায়গা অবধি সাধারণ কুলিরা মাল বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, সেখানেই হবে আমাদের স্থায়ী বেস ক্যাম্প। সেরকমটাই হওয়া উচিত। ও, আরেকটা মুশকিল আছে! এ দুটো কাজের জন্য সঙ্গে মাত্র একজন শেরপা পাবে তুমি, নিজেকেও মাল বইতে হবে আর কি!"

"হুম! বোঝা গেল! এ তো রীতিমত পিকনিক! বেশ।"

আমাদের দলের সবচেয়ে কমবয়েসি সদস্য কোজি। খুব ভালো একজন পর্বতারোহী, যথেষ্ট চনমনেও বটে। তাও দিনের পর দিন ওকে নিচে ঘাঁটি গেড়ে বসে এইসব জরুরি কিন্তু কম দেখনদারি কাজ করে যেতে হয়েছে। কখনও কোনও অনুযোগ করেনি সে। সমস্ত দায়িত্বই নিখুঁতভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করে গেছে। কোজি ভালমতোই জানত, শৃঙ্গ অভিযানের চূড়ান্ত লক্ষ্যে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা, তখন দেখা যাবে সে নিজে অতি উচ্চতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার যথেষ্ট সুযোগ পায়নি, তাই শৃঙ্গে ওঠার চূড়ান্ত দলে ওর ঠাঁই হবে না। সেটা জেনেও সে নিঃস্বার্থভাবে চুপচাপ কাজ করে গেছে। এই হল টিম স্পিরিট, একেই বলে দলগত সংহতি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, বাইরে যথেষ্ট খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও ক্যাম্পের ভেতরের পরিবেশ দিব্যি ফুরফুরে। আশার একটা আলো দেখা দেওয়ায় সবাই বেশ খোশমেজাজে। হাসিঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড় আর আড্ডা চলল অনেকক্ষণ। তারপর তাঁবুর ওপরের ক্যানভাসের কাপড়ে অঝোরধারায় বৃষ্টি পড়ার কানে তালা লাগানো আওয়াজের মধ্যেও গরম স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে শুনি কারা যেন জোরে জোরে কথা বলছে, পিটনের ঠুংঠাং শব্দ, স্টোভের সোঁ সোঁ আওয়াজ, খাবারের টিন খোলা হল যেন – শ্যাজ, পানসি আর আয়লা বেরনোর জন্য তৈরি হচ্ছে। বাইরে তখনও অন্ধকার, আমার তাঁবুর ভেতর মাথা গলিয়ে শ্যাজ বলল, "মরিস, চললাম।"

"আবহাওয়া কেমন?"

"আকাশ ভরা কোটি কোটি তারা।"

"বাঃ, দারুণ! ঠিক আছে শ্যাজ, সাবধানে যেও।"

তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে বাইরের নুড়িপাথরের প্রান্তরে ওদের পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুনলাম। সকাল সকাল ওঠার তাড়া না থাকলে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর সেঁধিয়ে থাকার যে কী আরাম! মটকা মেরে পড়ে থাকো, চোখ বন্ধ করে আকাশপাতাল ভাবো। অভিযানের শুরু থেকে এক মুহূর্তও ফুরসৎ পাইনি, আজ সকালের বিশ্রামটা তাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলাম। ধীরেসুস্থে উঠে একে একে অন্যদের তাঁবুতে ঢুঁ মারলাম। টেরের সবকিছু পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখার অভ্যেস। সে সারাক্ষণ তার রুকস্যাক আর সরঞ্জাম গুছিয়েই চলেছে। সামনে কঠিন সময়, কখনওই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে চায় না ও। আমাকেও অবশ্য গোছগাছ শুরু করতে হবে। তার আগে বাইরে রোদে গিয়ে দাঁড়ালাম। সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে গেছে, বেশ আরামদায়ক তাপমাত্রা, চারপাশে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলি ঝকঝক করছে, সুন্দর পরিস্কার দিন।

তবে বেশিক্ষণ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করব কি, মাথায় ঘুরছে নানান চিন্তা! দু'দিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল, খাবারদাবার বোধহয় কম পড়ে যাবে আমাদের। মেস টেন্টে ঢুকে তাই সমস্ত জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে হিসেবনিকেশ করতে বসলাম। সব আলাদা আলাদা ভাগে গুছিয়ে রেখে গুণেগেঁথে দেখলাম, নাঃ, ঠিকই আছে। দুশ্চিন্তার তেমন কোনও কারণ নেই। দুপুরবেলা পিঠে মস্ত মস্ত বোঝা নিয়ে রওনা দিলাম আমরা। আটদিন টানা পরিশ্রমের পর একটা সকাল বিশ্রাম পেয়েই শরীর যেন বেশ তরতাজা হয়ে উঠেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াও আজ আর মেঘলা হয়ে এল না, আকাশ পরিষ্কারই রইল। নুড়িপাথরে ঢাকা একঘেয়ে মোরেন প্রান্তর মাইলের পর মাইল চলেছে, তার ওপর দিয়ে হাঁটা যথেষ্ট ক্লান্তিকর। কোথাও কোথাও আলগা নুড়ির নিচে লুকিয়ে রয়েছে শক্ত কালো বরফ, বুঝতে না পেরে সবাই বেশ কয়েকবার আছাড় খেলাম।



ক্যাম্প ওয়ানে সন্ধ্যা।। ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

কিছুক্ষণ পর দেখি উল্টোদিক থেকে আজীবা আসছে। দারুণ খবর! ল্যাচেনাল আর রেবুফত উত্তর হিমবাহের ওপরের ঢালে পৌঁছে গেছে। রেবুফত তার মেসেজে আরও লিখেছে, হিমানীপ্রপাতের ডানতীরের রাস্তা পুরোটাই পাথুরে, বরফ নেই, ওঠাও বেশ সোজা। অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহের প্রকান্ড হিমানীপ্রপাতের বাধাটা তাহলে জয় করা গেল! আশায় বুক বেঁধে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম আমরা। বেশি ঠান্ডা নেই আজ, আবহাওয়া বেশ মনোরম। অন্নপূর্ণা পর্বতপুঞ্জের দানবীয় সেই তুষারপ্রাচীর ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে, ধূসর মসৃণ এক উত্তুঙ্গ দেওয়াল, কোনও মানুষের সাধ্য নেই ওটা বেয়ে ওঠে। হিমবাহের ডান তীর (true right bank) ধরে রাস্তা বেশ সহজ। আজীবা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বিকেলবেলা সেই তুষারপ্রাচীরের একদম পায়ের গোড়ায় এসে উপস্থিত হলাম আমরা, অন্নপূর্ণা হিমবাহের মোরেনের ঢালটা যেন উত্তর থেকে নেমে ওই দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে গেছে, বেশ একটা সমতল মাঠের মতো তৈরি হয়েছে।

এরপর হিমানীপ্রপাতের ডানতীরের খাড়াই পাথুরে ঢাল বেয়ে উঠতে হবে। সাধারণ কুলিরা এর পরে আর এগোতে পারবে না। বুঝলাম এই মাঠটাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ স্থায়ী বেস ক্যাম্পের উপযুক্ত জায়গা। দেরি হয়ে যাচ্ছে, আজ সন্ধেবেলাই হিমানীপ্রপাতের ওপরে হিমবাহের ঢালে পৌঁছতে চাইছিলাম আমরা। তাও বসে তাড়াতাড়ি জায়গাটার একটা স্কেচ করে নিলাম, যাতে পরে বেস ক্যাম্প বসাতে সুবিধে হয়। অতঃপর আজীবার নেতৃত্বে দ্রুতগতিতে এগোতে শুরু করলাম। তুষারপ্রাচীরের গোড়া থেকে একের পর এক খাড়াই চিমনি আর নালা ধরে ধাপে ধাপে নেমে আসা হিমানীপ্রপাতটার ওপরে পৌঁছে গেলাম। এই এত উচ্চতায় পিঠে ওই ভারি বোঝা নিয়ে তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে একেবারে দম বেরিয়ে গেল। ভরসন্ধেবেলা অবশেষে একটা বরফের উঁচু দেওয়ালের পায়ের কাছে হাজির হলাম যেখানে ল্যাচেনাল আর রেবুফত তাঁবু গেড়েছে। জায়গাটার উচ্চতা প্রায় ১৬,৭০০ ফিট। এটাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ ক্যাম্প ওয়ান।

ল্যাচেনাল আর রেবুফত আমাদের সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানাল। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় তখন আর আমাদের পক্ষে চারদিকে কিছু দেখা সম্ভব হল না, তবে ওরা জানাল, "আর কোনও চিন্তা নেই, বস্! অন্নপূর্ণার চূড়ায় আমরা উঠছিই, বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই আর।"

———————

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

কন-টিকি অভিযান



থর হেয়ারডাল

(অনুবাদঃ ইন্দ্রনাথ)

কন-টিকি অভিযান শুধুমাত্র অ্যাডভেঞ্চার নয়, সেটা ছিল একটা বিশ্বাসের পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধান। ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর কাল্লাও বন্দর থেকে প্রাচীন পদ্ধতিতে বানানো কাঠ (বালসা লগ) ও বাঁশের তৈরী ভেলায় চড়ে থর হেয়ারডাল ও তার পাঁচজন সাথী রওনা হন। প্রশান্ত মহাসাগরে সামুদ্রিক স্রোতের গতি ও হাওয়ায় ভর করে ১০১ দিন যাত্রার পর তারা পৌঁছতে সক্ষম হন তাদের লক্ষ্যে, পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। পূর্ণ হয় অভিযান, প্রমানিত হয় একটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

একটি সিদ্ধান্ত

কখোনো কখোনো এমন বেকায়দায় যে পড়তে হয়! হয়তো জীবনের স্বাভাবিক গতিতেই ঘটল আর সেটা যখন বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে, আপনি তাজ্জব হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করবেন, "একী? আমি এখানে কেন?"

ধরুন আপনি একটা কাঠের ভেলায় মাঝ সমুদ্রে একটা তোতাপাখি আর পাঁচটা সঙ্গী নিয়ে ভেসে চলেছেন, আর একদিন ভালোমতো ঘুম টুম দিয়ে সক্কালে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আপনার মনে ওই প্রশ্নটাই এল।

এরকমই এক সকালে আমি শিশিরভেজা লগবুকটাতে লিখেছিলুমঃ-

> *মে ১৭। নরওয়ের স্বাধীনতা দিবস। গভীর সমুদ্র। চমৎকার বাতাস। আজকে আমার রান্নার পালা, আর সকালেই ডেক-এ সাতটা উড়ুক্কু মাছ পেয়েছি, আর পেয়েছি আমাদের কেবিনের ছাতে একটা ফ্লুইড আর টরস্টাইনের স্লিপিংব্যাগের মধ্যে একটা অচেনা মাছ .....*

এইখানে এসে পেন্সিল থেমে গেছে। আর অবশ্যম্ভাবী চিন্তাটা ঘিরে ধরেছে। সত্যি, আশ্চর্য এই ১৭ মে, আর আমাদের হাল হকিকত। কী করে শুরু হল এইসব?

বাঁদিকে তাকালে বিশাল সমুদ্র, অনবরত ঢেউ উঠছে, অসীম, দিগন্ত পর্যন্ত। ডানদিকে তাকিয়ে দেখছি, আবছায়া কেবিনের মধ্যে দাড়িওলা একটা লোক হেলান দিয়ে বসে বাঁশের বেড়ায় সাবধানে পা তুলে দিয়ে একমনে গ্যেটে[১] পড়ছে। এই কেবিনটাই এখন আমাদের কজনের ঘরবাড়ি।

"বেঙ্গট!" আমি ডাকলাম। তোতাটা লগবুকের ওপর বসার চেষ্টা করছিল, ওটাকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, "বলতে পার, এখানে কী করছি? কেনই বা ..."

সোনালি দাড়ির তলায় গ্যেটে অদৃশ্য হলেন।

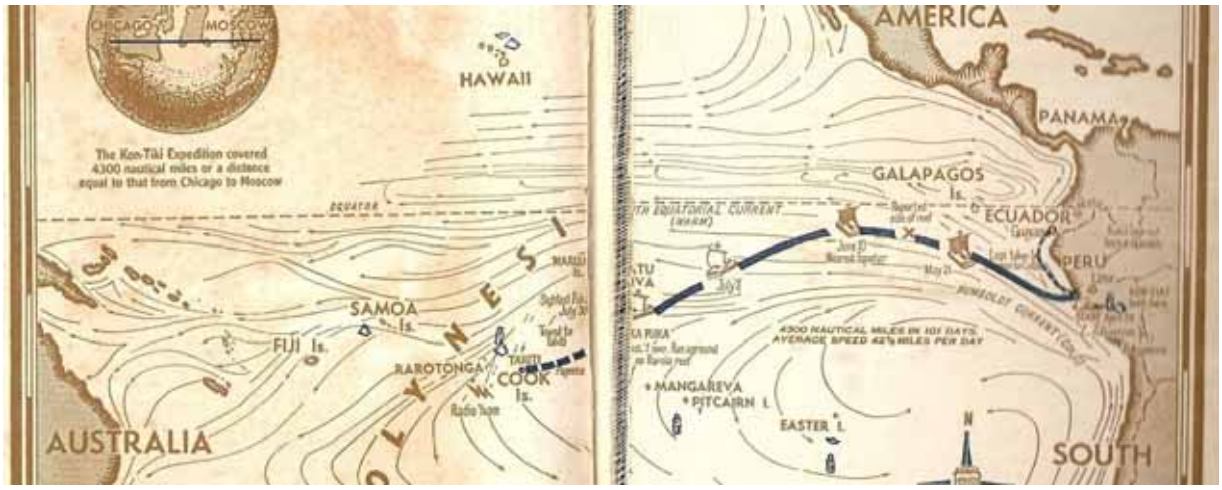


“শয়তানটাকে জানি। অবিশ্যি তুমিই সবচেয়ে ভালো চেনো। উদ্ভট পরিকল্পনটা তোমারই। কিন্তু আমার মতে ফন্দিটা খাসা।” বলে, বাঁশের বেড়ায় আরো খানিকটা পা ওপরে তুলে, অবিচলিতভাবে গ্যেটেতে ডুবে গেল ও। কেবিনের বাইরে, বাঁশের তৈরি ডেকে বসে তিন বন্ধু কড়া রোদ্দুরের মধ্যেই কাজ করছিল। তাদের খালি গা, বাদামি চামড়া, ঘন দাড়ি, পিঠে ঘাম শুকিয়ে লবনের সাদা দাগ। তাদের দেখে মনে হয় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভেলা ভাসিয়ে পশ্চিমে যাওয়া ছাড়া তারা আর কোনো কাজ কোনোকালে করেইনি। এরিক হামাগুড়ি দিয়ে কেবিন থেকে বেড়িয়ে এল। হাতে একতাড়া কাগজ আর সেক্সট্যান্ট যন্ত্রটা।

“৯৮ ডিগ্রি ৪৬ মিনিট পশ্চিম আর ৮ ডিগ্রি ২ মিনিট দক্ষিণ – এই আমাদের অবস্থান। কালকের চেয়ে আজকে অনেক ভালো এসেছি বন্ধুরা!”

ও আমার পেন্সিলটা নিয়ে কেবিনের দেয়ালে ঝোলানো চার্টে একটা ছোট্টো গোল আঁকল। উনিশটা ছোট্টো গোল দাগের পর আজকের গোলটা। শুরু হয়েছে পেরুর কাল্লাও বন্দর থেকে। হারম্যান, নুট আর টরস্টাইন, ওরাও এসে ভিড় করল, দেখবে বলে; ছোট্টো গোল দাগটা আমাদের আরো ৪০ মাইল এগিয়ে দিল দক্ষিণ সাগরের দ্বীপমালার দিকে।

“দেখছ নাকি! বন্ধুরা!” হারম্যান বেশ গর্ব গর্ব করে বলল, “তার মানে হল আমরা ইতিমধ্যে পেরুর সৈকত ছেড়ে ৮৫০ মাইল পাড়ি দিয়ে ফেলেছি।”



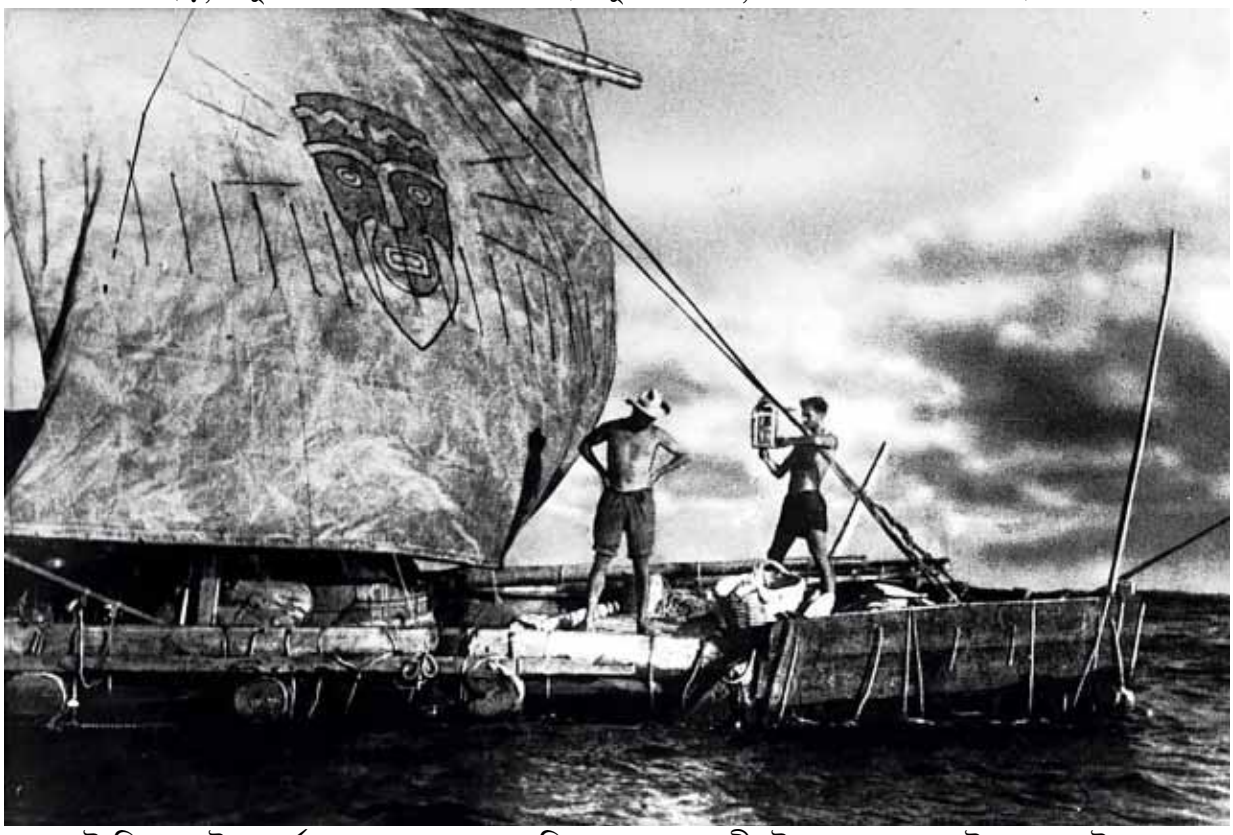
“হ্যাঁ। আর মাত্রই ৩৫০০ মাইল পাড়ি দিতে হবে সবচেয়ে কাছাকাছি দ্বীপটিতে পৌঁছনোর জন্য।” নুট যোগ করে।

“সত্যি বলতে কি,” টরস্টাইন ফুট কাটে, “ আমরা সমুদ্রের তলদেশ থেকে স্রেফ ১৫০০০ ফুট উপরে আর চাঁদের থেকে কয়েক ফ্যাদম নীচে আছি, এই যা।”

মোদ্দা কথাটা এই যে আমরা সক্কলেই জানলাম আমরা ঠিক কোথায় আছি আর আমি এবারে ভাবতে শুরু করতে পারি, “কেন?” তোতাটার এতে কিছু যায় আসে না, ওটার তো খালি কাঠের ওপরে বসে থাকতে পারলেই হল। আর সমুদ্র, একই রকম, গোলাকার, আকাশঘেরা, অন্তহীন নীল শুধু নীল।

যদ্দুর মনে পড়ে গত শীতে নিউ ইয়র্কের এক মিউজিয়ামে ঘটেছিল ব্যাপারটা। অথবা আরো পেছনে, দশ বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে মার্কোয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপে। হতে পারে এবারে আমরা সেখানেই গিয়ে ভিড়ব হয়তো। যদি না উত্তরপূর্ব বাতাস আমাদের আরেকটু ঠেলে দক্ষিণে

তাহিতি বা টুয়ামোটু দ্বীপপুঞ্জের দিকে পাঠিয়ে দেয়! আমি মনে মনে বেশ দেখতে পাচ্ছি ছোট্টো দ্বীপটাকে। মেটে-লাল পাহাড়, সবুজ ঘাসের ঢাল নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে, তীর বরাবর পাম গাছের সারি। দ্বীপটার



নাম ফাটু-হিভা। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে ভাসছি সেখান থেকে দ্বীপটার মধ্যে কোনোই ভূখন্ড নেই। সে কত হাজার মাইল সমুদ্রের পর! আমি সরু ওইয়া উপত্যকাটাও দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্রের দিকে ক্রমশ চওড়া হয়ে এসেছে। স্পষ্ট মনে আছে সমুদ্রের পাড়ে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা এই অনন্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম আমরা। আমার সাথে তখন আমার স্ত্রী ছিলেন। এখনকার মতো দাড়িওয়ালা বোম্বেটেরা না। আমরা নানান জীবজন্তুর নমুনা সংগ্রহ করতাম আর সংগ্রহ করতাম লুপ্ত সভ্যতার ছবি বা প্রত্ন জিনিস।

একটা সন্ধ্যার কথা বেশ মনে আছে। তথাকথিত সভ্যজগৎ তখন প্রায় অবাস্তব সুদূরের ব্যাপার আমাদের কাছে। প্রায় এক বছর থাকা হয়ে গেছে দ্বীপে। এখানে একমাত্র সাদা চামড়া আমরাই। স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছি সভ্যতার ভালো আর মন্দ দুটোই। সমুদ্রের তীরে নিজেরাই নিজেদের ছোট্টো ঘর বানিয়েছি, পাম গাছের ছায়ায় কাঠের পিলারের ওপর, সেখানেই থাকি। জংগলের ফলমূল আর সামুদ্রিক মাছ যা যা কিছু পাই তাই খেয়েই কাটে আমাদের।

সেই সন্ধ্যায়ও আর পাঁচটা দিনের মতো সৈকতেই বসে আছি; চাঁদের আলো, সামনে সমুদ্র। আমাদের চারপাশ ভালোলাগা আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে ছিল আর তার প্রতিটা মুহূর্ত আমরা চেটেপুটে নিচ্ছিলাম। সারিবাঁধা জঙ্গলের গন্ধ, সমুদ্রের নোনা গন্ধ ভরে নিচ্ছি বুকে; পামগাছের পাতায় বাতাসের শিরশিরানি শুনছি। আর একটু পরপরই সমস্ত ছাপিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের আছড়ে পড়া। ফেনার মুকুটপড়া ঢেউ ধেয়ে এসে ভেঙে পড়ছে ডাঙার পাথরগুলোর ওপরে। ঢেউয়ের ঝাপটায় খানিক শোরগোল উঠছে, জলে চিকচিক করে উঠছে পাথরগুলো। জল সরে যেতেই আবার সব চুপচাপ। আবার পরের ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়া অবধি।

"আশ্চর্য", আমার স্ত্রী বলল, "দ্বীপের অন্যপাশে কিন্তু এমন বড়ো বড়ো ঢেউ ভাঙে না।

"না", আমি উত্তরে বল্লাম, "তার কারণ এদিকটা বাতাসের গতির মুখোমুখি কিনা তাই এদিকেই ঢেউ বেশি।"

আমরা সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। মনে হল সমুদ্রও বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত যে সে ঢেউ বয়ে আনছে পুবদিক থেকে, পুব থেকে, হ্যা পুর্বদিক থেকেই। এটা চিরকালের পুবের বাতাস, বাণিজ্য-বায়ু (ট্রেড উইন্ড)। এই বাতাসই সমুদ্রের ওপরে বইতে থাকে, ঢেউ বানায়, ঢেউগুলি পুবের দিক থেকে ভেসে ভেসে এসে ভেঙে পড়ে দ্বীপের বুকে। ঢেউগুলি থমকে যায় পাহাড়ে, প্রবালের প্রাচীরে; পুবের বাতাস কিন্তু সৈকত পেরিয়ে জঙ্গলের, পাহাড়ের, দ্বীপের মাথার ওপর দিয়ে অনায়াসে বয়ে যায় আরো পশ্চিমে, এ দ্বীপ থেকে ওই দ্বীপ, সূর্যাস্তের দিকে।

সুতরাং সেই কবে থেকেই, সমুদ্র ফুঁসে উঠছে পুবের দিক থেকে, মেঘ ঘনিয়ে আসছে পুব আকাশেই, পুব দিগন্ত থেকেই তার আনাগোনা। প্রথম যে মানুষ এখানে এসেছিল তারা গোড়া থেকেই এটা জানত, এখন

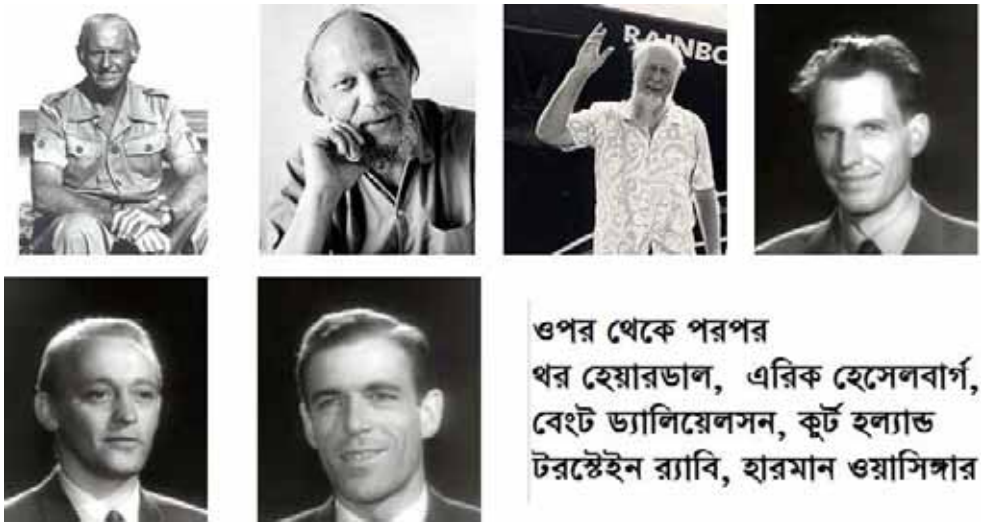
যারা থাকে তারাও এটা জানে। সামুদ্রিক পাখিরাও জানে, তারা ভোরবেলা খাবারের খোঁজে পুবদিকেই উড়ে যায় যাতে বেলা শেষে ডানা ভার হয়ে এলে ভরা পেটে পুবের বাতাসে ভর করে ফিরে আসা যায়। গাছেরা, ফুলেরাও এই পুবের বাতাসের বয়ে আনা বর্ষার ওপরে নির্ভর করে বাড়ে। আর ওইখানে বসে বসে আমরাও জেনে ফেললাম, ওই দূর পূর্বদিগন্তের নীচে যেখানে মেঘ জড়ো হয়, তারও ওপাশে দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমি। মাঝে অপার সমুদ্র, চার হাজার মাইলের বিস্তৃত মহাসাগর, আর কিচ্ছুটি না।

আমরা ভেসে আসা মেঘের দিকে চেয়েছিলাম, জ্যোৎস্নাধোয়া সমুদ্রের ঢেউ দেখছিলাম, আর বসে বসে শুনছিলাম বৃদ্ধ মানুষটির কথা। আমাদের কাছেই খালি গায়ে বালির ওপর বসেছিলেন, কাঠকুটো দিয়ে সামনের নিভুনিভু আগুনের দিকে তাকিয়ে।

"টিকি", শান্ত স্বরে বললেন মানুষটি, "তিনি ছিলেন একাধারে দেবতা ও সর্দার। আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনিই প্রথম এই দ্বীপে আনেন। তার আগে আমরা সাগরের ওপারে একটা বিশাল মহাদেশে থাকতাম।"

বলতে বলতে আগুনটাকে একটু উসকে দিলেন। বসে বসে ভাবছিলেন বৃদ্ধ। প্রাচীন সময়ে বাঁধা পড়ে থাকা এক মানুষ, চিরাচরিতভাবে পূর্বপুরুষ আর তাদের কাজকর্মের প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা তার মনে। মনে বিশ্বাস আবার তিনি মিলিত হতে পারবেন পূর্বপুরুষদের সাথে। ফাটু হিভার পূর্ব উপকূলের সমস্ত লুপ্ত উপজাতীয় মানুষের মধ্যে বৃদ্ধ টেই টেটুয়া একমাত্র জীবিত মানুষ। ওঁর কতো বয়েস নিজেও সেটা জানতেন না। কিন্তু তার কুঁচকে যাওয়া চামড়া, চামড়ার বাদামি রঙ দেখে মনে হত প্রায় একশ বছর ধরে রোদে পুড়ে পুড়ে এমনটা হয়েছে। এই দ্বীপপুঞ্জে তখনও টিকে থাকা অল্প লোকেদের মতো উনিও বিশ্বাস করতেন বাপ দাদাদের মুখে মুখে শোনা পলিনেশিয়ার প্রধান দেবতা "টিকি"-র গল্পকথা। সূর্যের ছেলে টিকি।

সেদিন যখন আমাদের কুঁড়েঘরে শুতে গেলাম বৃদ্ধ টেই টেটুয়ার "টিকি" র গল্প আর সমুদ্রের ওপারে দ্বীপবাসীদের প্রাচীন ভূখন্ডের কথাটা আমার মাথায় কেবলই ঘুরপাক খেতে লাগল। আর থেকে থেকেই সমুদ্রের গর্জন। মনে হল অন্ধকার রাত্রির মধ্য থেকে একটা স্বর, কিছু একটা বলতে চাইছে, সেই কবে থেকে! আমি ঘুমোতে পারলাম না। মনে হল যেন সময়ের কোনো অস্তিত্বই নেই আর "টিকি", এইমাত্র তার দলবল নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে নীচের বেলাভূমিতে এসে নামলেন। হঠাৎ একটা কথা মাথায় খেলে গেল আর আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে বললাম, "একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো? জঙ্গলে "টিকি"-র যে পাথরের মূর্তিগুলো আছে সেগুলোর সাথে দক্ষিণ আমেরিকার লুপ্ত সভ্যতার মূর্তিগুলোর কি আশ্চর্য রকম মিল!"



ওপর থেকে পরপর
থর হেয়ারডাল, এরিক হেসেলবার্গ,
বেংট ড্যালিয়েলসন, কুর্ট হল্যান্ড
টরস্টেইন র‍্যাবি, হারমান ওয়াসিঙ্গার

আমি নিশ্চিত সমুদ্রের দিক থেকে ঢেউগুলিও আমার কথার সমর্থনে বেশ জোরালো আওয়াজে ভেঙে পড়ল আর তারপর ক্রমে সেটা থিতিয়ে এলে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

১ - প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক যোহান উলফগ্যাং (ভন) গ্যেটে।

ক্রমশ

পুজোর গল্প

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

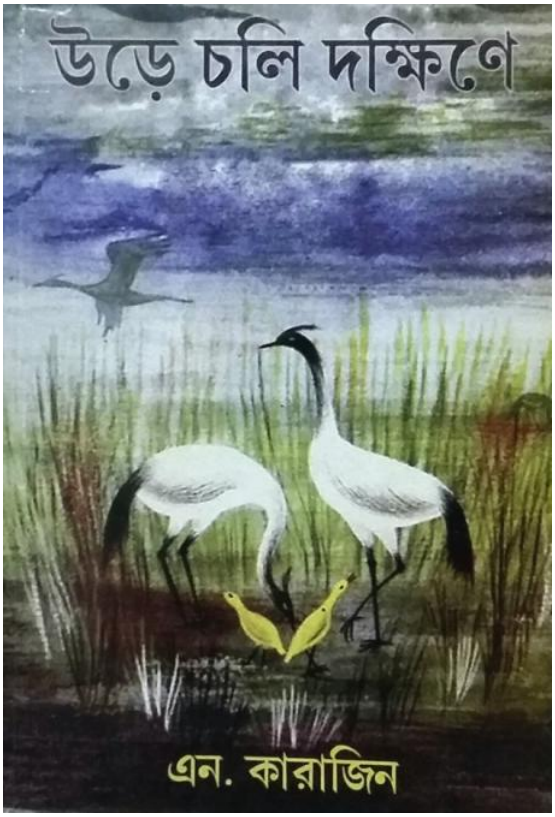


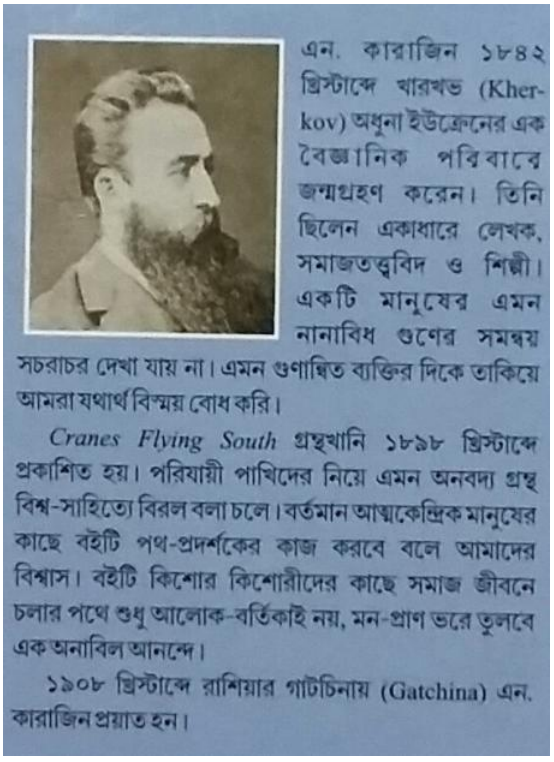
আজ থেকে বিশ বছর আগে বলছি হিসেবে ছাড়াই
রমরমিয়ে আসতো পুজো আমাদের এই পাড়ায়
বড়বাড়ি, ছোট বাড়ি, বর্ষা গেলে পর
নতুন রঙের গন্ধে ম ম খান পঁচিশেক ঘর
পুজোর দিনে আদর করে ফুলপিসিমা ডেকে
নাড়ু দিতেন , দই কলাতে চিঁড়ে দিতেন মেখে
সকাল থেকে বড় জেঠুর মেজাজ থাকতো চড়া
চেয়ার গুলো এইদিকে আন ওই দিকটায় সরা
বড় জেঠি আনতো যত পুজোর সরঞ্জাম
ছোটকাকু হিসেব দিত কিসের কত দাম
আমি তখন উৎসাহে খুব ঢাকি দাদার কাছে
শিখে নিতাম কোন ঢাকে বোল কেমন করে বাজে
ঢ্যাম কুড়াকুড় ঢ্যাম কুড়াকুড় তাকুর তাকুর তাক

বলত মিঠাই ঠাকুর আরও কয়েকটা দিন থাক
ঠাকুর গেলে আবার তো সেই পড়াশোনার জ্বালা
আর কিছুদিন বইয়ের বাক্সে ঝুলুক নাহয় তালা
আলতো হাতে বেলত কাকী সোনালী রং লুচি
বলতো এসে- "আর দুটো দাও" পাশের পাড়ার বুঁচি
ওদের ছিল বড়ই অভাব তাই তো ছোট মামা
ওদের জন্যে নিয়ে আসতো নতুন ছিটের জামা
সত্যিকারের পুজো মোটেই হয়না একা একা
এসবকিছু আমার অনেক ছোট্টবেলায় শেখা
এখন কেউ বা বেঙ্গালুরু কেউ বা থাকি দুবাই
মিঠাই থাকে জয়পুরে আর ঢাকায় থাকে টুবাই
তবু বাড়ি ফেরার জন্যে সবাই তো দিন গোনে
জয়ঢাকি সুর বেজে ওঠে সক্কলেরই মনে

ছবিঃ তমোদীপ আইচ

পুরোনো বই





পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সারস আর তার বোন জন্মালো রাশিয়ার উত্তরের এক বিরাট জলাভূমি “দ্য গ্রেট ওস্তাস্কোভো মার্শেস’ এ।সেই মুহূর্ত থেকে সবকিছুই তার মনে আছে,আর তাই নিয়েই স্মৃতিকথা ১০৪ পাতার বইটায়।ভাবছ ,সারস কি লিখতে পারে নাকি!সে কথাও সে বলে গেছে,পড়েই দেখ না কেন।

বইটা যদিও সাদাকালো কিন্তু কখখনো তা মনে হবে না। পাতার পর পাতা জুড়ে খালি রঙ ।প্রথম জন্মেই সে দেখল ফুটিফাটা ডিমের টুকরোগুলো সবুজ সবুজ,গায়ে কটা দাগ।তারপর চারপাশ শ্যাওলা হলুদ সাদা ফুলে ঢাকা পাহাড়,ঘাস এ ঢাকা চত্বর। জানতে পারি বাচ্চা সারসের হলদে মুখ,তারা পোকা আর সবজে ব্যাং খায় আর খায় শস্যদানা। তাদের গায়ে ছাই ছাই পালক,সাদা বুক,চকচকে কালো গলা আর লেজ। ভুরুর ওপর উজ্জ্বল লাল দাগ আর মাথায় ঝুঁটি। আঁকিয়ে বন্ধুরা বেশ এঁকে ফেলতে পার এই ছবি আর বানিয়ে ফেলতে পার ছবি গল্পের বই, অন্তত বইটা পড়তে গিয়ে আমার সেই ইচ্ছেই করছিল।

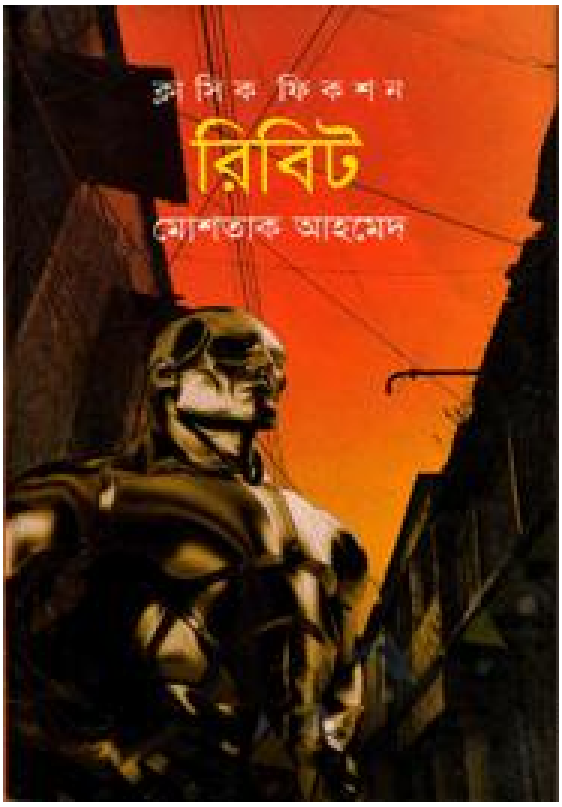
সারসদের ঠিক যেন আমাদেরই মত পরিবার,সমাজ। বাবা,মা ,দাদু,প্রতিবেশী খুড়ো,ব্যচেলর ঠাকুর্দা। সন্ধে হলেই ওঁরা নাচেন। দলের কেউ পন্ডিত কেউ গুলবাজ ‘হামবড়া’ সেইসব নিয়ে জমে ওঠে গপ্পো। বাচ্চারা বড়ো হতে থাকে।

শীতের মুখে শুরু হয় দক্ষিণে ওড়ার প্রস্তুতি। সেই চলার পথের ছবি এমনই যে ওদের সঙ্গে আমরাও যেন উড়ে চলি ।

এই কাহিনীর রাচয়িতা এন কারাজিন আর সাবলীল অনুবাদ শ্রী শশিশেখর মজুমদারের। সঙ্গে চমৎকার স্কেচ । রাশিয়া থেকে উড়ে আসছে আফ্রিকায় ভিক্টোরিয়া লেকে,পথে যেন রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ। পথের ভূগোল ইতিহাস সদ্য যুবক সারস নায়ক জানছে, চিনছে। মানছে দলের নিয়মকানুন, শিখছে জীবনবোধ ,ভুল ঠিক দোষ গুণ, প্রেম ও ভালোবাসা। হয়ে উঠছে নায়ক।

মূল বইটির নাম ‘Cranes Flying South” প্রথম প্রকাশ ১৮৯৮। বাংলা অনুবাদ ‘উড়ে চলি দক্ষিণে” বইটি ২০১১-এ চিরায়ত প্রকাশনা থেকে। দাম ৫০ টাকা মাত্র। কী অনায়াসে লেখক ভারী ভারী সমাজতত্ত্বকে সহজ করে দিয়েছেন যে পড়তে গিয়ে ভার বোধ ত হয় ই না বরং মজা পেয়ে হেসেই ফেলি বেশিরভাগ সময়। হই হই করে পড়া হয়ে যায়-“জনম নিলাম,আমরা শিখলাম অনেক,মস্ত এক শহর কিয়েভ,সতর্ক প্রহরী,মটর কলাইয়ের দেশে,সে এক কাহিনি,প্রাচুর্যের দেশে,শিকারী শিকারী.....ইত্যাদি অনুচ্ছেদগুলো।

এই বই যদিও ছোটদের কথা ভেবে লেখা তবু আমার মতে এ সবার পড়ার মত।



রিভিউ করলেনঃ মীম নোশিন নাওয়াল খান

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। কথাটা শুনলেই রোমাঞ্চিত হতে হয়। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী মানেই আকর্ষণীয় কোনো গল্প, যেখানে থাকে একটুখানি বিজ্ঞান আর একটুখানি কল্পকাহিনী। তবে সায়েন্স ফিকশনে নতুন ধারা তৈরি করেছে "রিবিট।"

রিবিট একটি উচ্চমাত্রার বুদ্ধিসম্পন্ন রোবট। বাংলাদেশের সেরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তৈরি করেছেন রিবিটকে। তার কাজ মানুষের কল্যাণ সাধন করা। রিবিটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার মধ্যে মানুষের মতোই আবেগ-অনুভূতি আছে। সবচেয়ে বেশি আছে যেই অনুভূতি সেটা হচ্ছে শিশুদের জন্য ভালোবাসা।

রিবিটকে প্রফেসর মুক্ত করে ছেড়ে দেন ঢাকার রাস্তায়। তার কাজ হবে সবসময় মানুষের উপকার করা। ঢাকার রাস্তায় নেমে নানা রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় রিবিট। সে কুড়িয়ে পায় দুটি সংযুক্ত যমজ শিশুকে, যাদেরকে কেউ ফেলে রেখে গেছে। ক্ষুধায় কাতর ও অসুস্থ শিশু দুটিকে নিয়ে শুরু হয় তার ছোটাছুটি। অপারেশন না করলে তাদেরকে বাঁচানো যাবে না- ডাক্তারের এমন কথা শোনার পর অপারেশনের টাকা জোগাড় করতে নেমে পড়ে রিবিট। কী হল তারপর?

উঁহু। সেকথা তো আমি বলব না। সেটা জানতে হলে "রিবিট" বইটা পড়তে হবে। মোশতাক আহমেদের লেখা এই বইটা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর চেয়ে একদমই আলাদা। এখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে আছে অনেকটা মানবতা আর বাস্তবতা। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ভবিষ্যৎ সময় নিয়ে লেখা হলেও এই কাহিনীটা আবর্তিত হয়েছে বর্তমানের ঢাকার প্রেক্ষাপটে। ফলে বইটা অনেক বেশি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনে হবে যেন তুমিও রিবিটের সঙ্গে দাপিয়ে বেড়াচ্ছ ঢাকার অলিগলি।

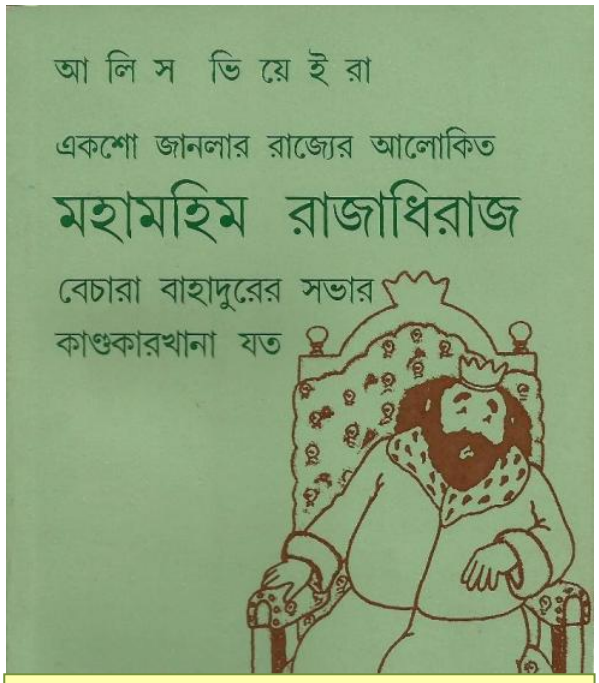
সায়েন্স ফিকশনের জগতে রিবিট অবশ্যই ভিন্ন ধারা তৈরি করেছে। আর সেজন্যই বইটা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য। বইটা এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে লেখক রিবিটকে নিয়ে একটা-দুটো নয়, এখনও পর্যন্ত নয়টা বইয়ের একটা সিরিজ লিখে ফেলেছেন। প্রতিটা বই-ই খুব উপভোগ্য, গল্প বলার ঢং সহজ, সাবলীল ও প্রাণবন্ত। ফলে বই পড়তে পড়তে তুমিও হয়ে উঠবে বইয়েরই কোনো চরিত্র।

"রিবিট"-এর ধাতব শরীরের একটা চমৎকার ছবি এঁকে বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন বিপ্লব দেব। এই সিরিজের বইগুলো প্রকাশ করেছে অনিন্দ্য প্রকাশ। "রিবিট" বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ১৫০ টাকা।

লেখাপড়ার ফাঁকে ক্লান্তি দূর করতে যদি নতুন কোনো বই হাতে নেয়ার কথা ভাব, তবে তালিকায় রাখতে পার "রিবিট।" সিরিজের প্রথম বইটি পড়েই বাকিগুলো পড়ার জন্য তর সইবে না আর- এ কথা আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি।

একশো জানলার রাজ্যের আলোকিত মহামহিম রাজাধিরাজ বেচারা বাহাদুরের সভার কাণ্ডকারখানা যত
-আলিস ভিয়েইরা

বাপ রে! কী বিরাট নাম বইয়ের! নামেই এগারোটা শব্দ! বাংলা বইয়ের এতবড় নাম আমি অন্তত দেখিনি এর আগে। মূল বইটা অবশ্য বাংলা নয়, পর্তুগিজ ভাষায় লেখা। সে ভাষায় বইটার নাম হল 'গ্রাসাশ্ ই দিশগ্রাসাশ্ দা কর্ত দ্য এল-রেই তাদিন্যিউ মনার্কা ইলুমিনাদু দু রেইনু দাশ্ সেঁই জানেলাশ্'। পনেরোটা শব্দ। মূল পর্তুগিজ থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় অনুবাদক ঋতা রায় সেটা এগারোটা শব্দে নামিয়ে এনেছেন! পর্তুগিজ ভাষা আমি মোটেই জানি না, আর তোমরা জানো না বলে সুযোগ বুঝে গুলও মারছি না, মূল পর্তুগিজ নামটা বাংলা বইটাতেই লেখা আছে। বললাম একটা কারণে; শেষের ওই পর্তুগিজ শব্দটা – 'জানেলাশ্' – বেশ ইন্টারেস্টিং লাগল। তার মানে আমরা যাকে জানালা বলি পর্তুগিজরা তাকে 'জানেলা' বলে! যাক, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে যদি কোনওদিন দেখা হয়ে যায়, তাহলে একটা শব্দ অন্তত বলতে পারব!



বইঃ একশো জানলার রাজ্যের আলোকিত মহামহিম রাজাধিরাজ বেচারা বাহাদুরের সভার কাণ্ডকারখানা যত
লেখকঃ আলিস ভিয়েইরা
মূল পর্তুগিজ থেকে অনুবাদঃ ঋতা রায়
প্রকাশকঃ মনফকিরা
ওয়েবসাইটঃ www.monfakira.com
প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০০৯
পৃষ্ঠাসংখ্যাঃ ৬৪; দামঃ ৪৫ টাকা

বড়ো বড়ো লম্বাচওড়া নামের প্রতি ছোটো থেকেই আমার একটা আকর্ষণ আছে। আমি যে স্কুলে পড়তাম তার নাম ছিল 'কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী বহুমুখী সর্বার্থসাধক উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। মনে হয় আকর্ষণের মূলে সেই স্কুলের নাম। পি টি ঊষার পুরো নাম যে পিলাভুল্লাকান্দি থেক্কেপরমবিল ঊষা, কিম্বা এ বি এ গণী খান চৌধুরী যে আবু বারকাত আতাউর গণী খান চৌধুরী সেটা ছোটবেলায় মুখস্থ ছিল। তাই বইমেলায় এ বইটার নাম দেখেই খপাৎ করে কিনে ফেললাম, আর তারপর চটপট পড়েও ফেললাম। ও বাবা! পড়ে দেখি, শুধু নাম কেন, এ বইয়ের পাতায় পাতায় প্রতিটা লাইনে ছড়িয়ে আছে দুর্ধর্ষ দারুণ সব মজা! একবার ধরলে ছাড়ে কার সাধ্যি!

তবে বইটার কথায় যাওয়ার আগে লেখিকার কথা একটু বলে নি। আলিস ভিয়েইরার জন্ম ১৯৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবনে। বেশ কিছু বছর সাংবাদিকতা করার পর ১৯৭৯ সালে মেয়ে কাতারিনার জন্য নতুন-নতুন গল্প তৈরি করার তাগিদে শুরু করলেন ছোটোদের জন্য লেখালেখি। সে বছরই বই হয়ে বেরোল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রজা, মিন্যিয়া ইরমাঁ রজা' বা 'রজা, আমার বোন রজা', আর সে বই ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের পুরস্কার পেল। তারপর গড়গড়িয়ে চলল লেখালিখি। এখন অবধি তিনি আট ডজনের ওপর বই লিখে ফেলেছেন। এ বইটা আলিসের ছ'নম্বর বই, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালে।

বইয়ের ভূমিকায় অনুবাদক বলছেন, 'গল্পটা কবে কোথায় ঠিক ঘটেছে বা ঘটছে, জানার উপায় নেই। একদিকে রূপকথার গল্প মনে পড়ে, অন্য দিকে বর্তমানের নানান ছাপও গল্পে পরিষ্কার। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত রূপকথা। বইটিকে শুধু ছোটদের বলে মনে করলে ভুল করা হবে।'

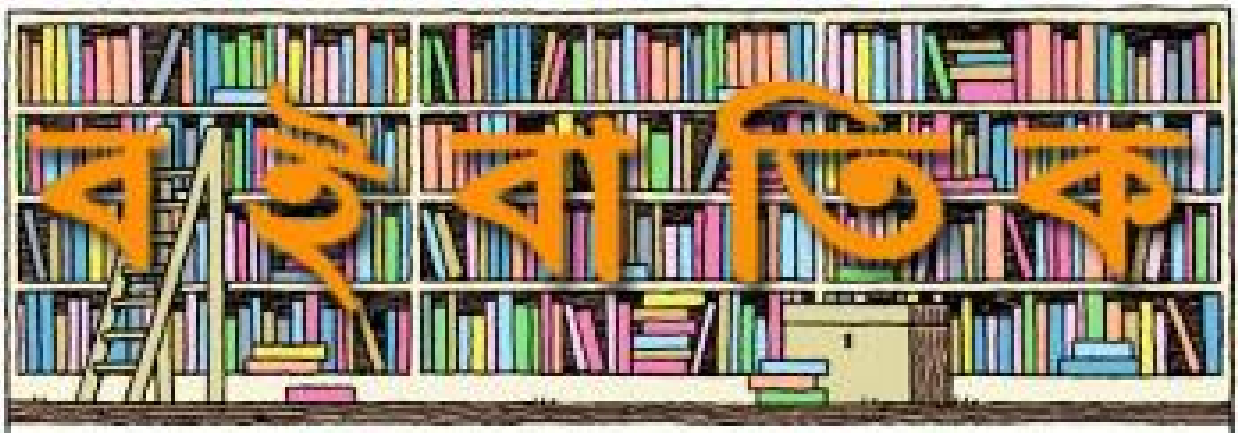
একশো জানলার রাজ্যটা যে ঠিক কোথায় কেউ জানে না। আমাদের অ্যাটলাসে যেমন সে রাজ্যের কথা নেই, ওদের ম্যাপেও তেমনি আমাদের দেশ দেখানো নেই, শুধু ওদের নিজেদের রাজ্যটাই আছে। সে রাজ্যের রাজা, মহারাজ বেচারা বাহাদুর হলেন এক আলোকিত রাজা, অর্থাৎ কিনা তাঁর মাথায় মাঝে মাঝেই ১২০ কিম্বা তারও বেশি ভোল্টের বুদ্ধি খেলে যায়। সে রাজ্যের সব মন্ত্রী সারাক্ষণ নতুন নতুন ডিক্রি সই করার জন্য ব্যাকুল, কেননা প্রতিটা ডিক্রি সই করলে তারা মাইনের ওপর ২.৮% বেশি পায়। সব রাজ্যেই যেমন থাকে, তেমন একশো জানলার রাজ্যেও ছিল এক

ড্রাগন, আর এক ডাইনি। ডিক্রি সই করতে করতে করতে করতে যখন আর কোনও নতুন ডিক্রির আইডিয়া মাথায় আসছে না, তখন মহামন্ত্রী করলেন কী – ভেবে ভেবে ছোটবেলায় পড়া গল্প থেকে আইডিয়া নিয়ে এক ডিক্রি জারি করলেন – ঐ ড্রাগনকে যে মারতে পারবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হবে। খবর পেয়ে ড্রাগন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পাঁচটা মাথার নাক-চোখ-মুখ দিয়ে আগুন ঝরাতে ঝরাতে চড়াও হল রাজসভায়। কী? তার সাপ্লাই করা বিদ্যুতেই এই রাজ্য চলে, তার জন্যই এই রাজ্য খেয়ে-পরে বেঁচে আছে, আর তাকেই কিনা বধ করার প্ল্যান? এক্ষুনি এর একটা হেস্তনেস্ত চাই। এদিকে রাজা তো ডিক্রির ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানেন না, তিনি পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। ড্রাগনের রোষ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য শেষমেশ মরিয়া হয়ে প্রস্তাব দিলেন, ড্রাগনের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হবে। হঠাৎ তাঁর মাথায় এক ২০০ ভোল্টের আলোকিত বুদ্ধি খেলে গেল কিনা! অবশেষে ড্রাগন শান্ত হল, প্রস্তাব স্বীকার করল, বলল ঠিক এক সপ্তাহ পরে এসে রাজকন্যেকে নিয়ে যাবে। তারপর ভালোয় ভালোয় বিদেয় নিল সে। তখন কিনা রাজার মনে পড়ল – আরে! তাঁর তো এখনও বিয়েই হয়নি, আর কোনও ছেলেমেয়েও নেই! এইবারে জমে উঠল গল্প, আসরে নামল ডাইনি, শুরু হল নানা শলাপরামর্শ... সবটা বলে দিলে কি ভালো হবে? বইটা জোগাড় করে বাকিটা নয় পড়ে নিও তোমরা।

আমাদের সুকুমার রায় চলে গেছেন প্রায় একশো বছর হতে চলল। তারপর 'ননসেন্স' অর্থাৎ উদ্ভট রসের বেদম হাসির গপ্পো লেখকরা কেউ আর তেমন লিখলেন কই? তাই বিদেশি বইয়ের অনুবাদই ভরসা। তবে 'হ য ব র ল' পড়তে পড়তে যেমন বারবার হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়, তাড়াতাড়ি গুণসুতো দিয়ে পেট সেলাই করে নিয়ে ফের পড়তে হয়, এ বইটার হাসি সেরকম নয়। এ হাসি সারাক্ষণ পেটের মধ্যে গজগজ করে, ফসফস করে, সোডার বোতলের মতো ভসভসিয়ে ওঠে; আর তার রেশ চলতে থাকে, চলতেই থাকে - বহুক্ষণ, যতক্ষণ না ফের একটা রদ্দি গোয়েন্দা গল্প পড়ার দুর্ভাগ্য হবে।

বইটার মলাটটা ভালোই হয়েছে, ছাপাও ঝকঝকে, অনুবাদও দিব্যি ঝরঝরে মজাদার, তবে কিনা ভেতরে কোনও ছবিছাপা নেই। ছোটদের বইয়ে কোনও ছবি থাকবে না? তাও আবার এরকম একটা অসাধারণ উপভোগ্য বইয়ে? ছবি-টবি না থাকলে ছোটরা পড়বে? এ বইয়ের গল্পে রাজকন্যা নয় সত্যিসত্যিই কম পড়িয়াছিল, তাই বলিয়া বঙ্গদেশে চিত্রশিল্পীও কি কম পড়িয়াছে?

তাপস মৌলিক



৬

কোনও প্রাণী যে জীবন্ত তা প্রমাণ করার যে ক'টি উপায় আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার বৃদ্ধি ও পরিবর্তন আছে কিনা নির্ণয় করা। জীবন্ত মানুষ পশুপক্ষী গাছপালা- সকলেরই এই ক্ষমতা আছে। কোনও জীবের বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন থেমে গিয়ে যেমন তা ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যায়, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও তার ভবিষ্যৎ একই রকম। এই বৃদ্ধি বহুমাত্রিক- শুধু আকারে নয়, প্রকারেও। জীবিত মানুষের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি দু'রকমের- শৈশবের বৃদ্ধি এবং বয়স হবার পরের বৃদ্ধি। কোনও শিশুর জন্মের পর থেকে তার শৈশব কৈশোর যৌবনের একটা সময় (প্রায় পঁচিশ বছর) পর্যন্ত বৃদ্ধি চলতেই থাকে। তারপরে যা বাড়ে তা শুধু গোঁফ দাড়ি বা চর্বি নয়, বুদ্ধিও এবং পরিবর্তন হতে থাকে হাড় অস্থি পঞ্জর ও ত্বকের।

একটা জীবন্ত গ্রন্থাগারেরও অন্যতম বৈশিষ্ট তার বৃদ্ধি। সেই বৃদ্ধি প্রকাশিত হয় তার সংগ্রহ, কর্মী, পাঠক ও অন্যান উপাদানগুলির বিকাশের মধ্য দিয়ে। প্রাথমিক বৃদ্ধির পর্যায়টাকে সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়, যেমন এক শ' বই দেড় শ' হল বা সদস্য দশ থেকে পনেরো হল, কিংবা পড়বার টেবিল দুটো থেকে চারটে হল। কিন্তু পরিণত একটা গ্রন্থাগারে সব সময় বৃদ্ধিটা এরকম নাও হতে পারে। অর্থাৎ আকারে না বেড়ে হয়ত গুণগত পরিবর্তন হল। মোটা খাতায় লিখে বই ধার দেওয়ার পুরনো পদ্ধতি বদল করে এমন একটা নতুন পদ্ধতি চালু করা হল যাতে অল্প সময়ে অনেক বেশি বই ধার দেওয়া যায়। এটাও বৃদ্ধি- তবে পরিমাণগত নয়, গুণগত।



জীবিত মানুষের বৃদ্ধি

আর সেটাই রঙ্গনাথন প্রকাশ করলেন তাঁর পঞ্চম সূত্রে। গত এক বছর ধরে আমরা রঙ্গনাথনের চারটে সূত্র দেখেছি। এক বছর ভুলে যাওয়ার পক্ষে অনেকটা সময়। তাই সেগুলো আর একবার মনে করা যাক :

প্রথম : বই ব্যবহারের জন্য।

দ্বিতীয় : (সংগ্রহে) প্রত্যেক পাঠক তাঁর বই পাবেন।

তৃতীয় : (সংগ্রহে) প্রত্যেক বই তার পাঠক পাবে।

চতুর্থ : পাঠকের সময় সাশ্রয় করতে হবে।

এবার এই বৃদ্ধি ও পরিবর্তনকে ভিত্তি করে তাঁর 'গোল্ডেন রুল'-এর পঞ্চম এবং শেষ সূত্র হল :

গ্রন্থাগার এক ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান

মনে রাখতে হবে যে রঙ্গনাথন যখন 'পঞ্চসূত্র' আবিষ্কার করেন তখন ডিজিটাল জগতের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। পার্সোনাল কম্পিউটার তো দূরের কথা মেন-ফ্রেম কী- সেটা খায় না মাথায় দেয়, সে সবও লোকে জানত না। জ্ঞানের প্রধান উৎসই ছিল বই।



জেনিস জেনিস মেন ফ্রেম কম্পিউটার

'লাইব্রেরি' শব্দের সঙ্গে বই (book) শব্দটা জড়িয়ে আছে আজন্ম কাল থেকে। 'বই' জ্ঞানের একটা বাস্তব রূপ। তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত রঙ্গনাথনের সব কটা সূত্রেই তখন বই-এর কথা এসেছে। একই ভাবে প্রলেখ (document)-ও আর একটা বাস্তব রূপ। বই বা প্রলেখ- যাই হোক না কেন, দু'টোর মধ্যেই ভরা আছে তথ্য (data)। তোমরা লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই সারা জগৎ জুড়ে এক অন্তহীন তথ্য বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে। ফলত যে সমাজ যত বেশি এইসব তথ্য ব্যবহার করতে পারে, তাদের তত বেশি উন্নত বলে মনে করা হয়। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার, পি.সি-র আবিষ্কার, সর্বোপরি ইন্টারনেটের বিশ্বজালে পৃথিবীটা মুড়ে ফেলতে পারায় যে পরিমান তথ্যের সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই আছড়ে পড়েছে সমগ্র আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ওপর। নতুন ব্যবস্থায় লাইব্রেরি এখন তথ্যকেন্দ্রও। সেই হিসাবে রঙ্গনাথনের সূত্রগুলোর পরিবর্তিত রূপ দাঁড়াল:

প্রথম : তথ্য ব্যবহারের জন্য।

দ্বিতীয় : (সংগ্রহে) ব্যবহারকারী তাঁর উপযোগী তথ্য পাবেন।

তৃতীয় : (সংগ্রহের) তথ্য তার ব্যবহারকারী পাবে।

চতুর্থ : ব্যবহারকারীর সময় সাশ্রয় করতে হবে।

পঞ্চম : তথ্য ব্যবস্থা এক ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান।

পঞ্চম সূত্রটির ব্যাখ্যা করার আগে বলে নেওয়া ভাল যে ইতিপূর্বে আলোচনা করা প্রথম চারটে সূত্রের সঙ্গে এই সূত্রের একটু তফাৎ আছে। ওই চারটে নীতি প্রধানত বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারকে কীভাবে পরিচালনা করা হবে, তার উপায় দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এই পঞ্চম নীতিটি ভবিষ্যতে লাইব্রেরি কী রূপ নেবে, তার সম্পর্কে নির্দেশ করে। মনে রাখতে হবে, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগার কখনই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না- ক্রমাগত বড় ও পরিবর্তিত হতে থাকবে। আর এই কথা মনে রেখেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও সেই ভাবে করতে হবে।

এই বড় হওয়া ব্যাপারটা কেমন ? সব গ্রন্থাগারে প্রথমেই যেটা বাড়ে, সেটা সংগ্রহ (stock)- বইএর গ্রন্থাগার হলে বইএর সংগ্রহ। হাজার খানেক বই নিয়ে একটা সংগ্রহ শুরু হলে পাঠকের পছন্দমতো এইসব বই পড়া শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না। তার পরে তারা লাইব্রেরিতে কেন আসবে যদি না তাদের জন্য নতুন বইএর ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ বইএর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এক হাজার দু' হাজার হবে, দু' হাজার চার হাজার, তারপর পাঁচ- এভাবে বাড়তেই থাকবে।



ব্রিটেনে পরিত্যক্ত টেলিফোন বুথে তৈরি হওয়া ছোট্ট লাইব্রেরি।

আর বই বাড়ার অর্থ শুধু বইএর সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, সেগুলো রাখারও ব্যবস্থা করা। যদি হাজার বই রাখতে পাঁচটা বুক শেলফ লাগে, তবে পাঁচ হাজার বইএর জন্য পঁচিশটা শেলফ লাগবে। সেগুলো থাকবে কোথায়? নিশ্চয় হাওয়ায় নয়। অর্থাৎ সেগুলো রাখার জন্যও আলাদা জায়গা, মানে ঘর দরকার। আবার ঘর হলেই সেখানে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। লাইব্রেরিতে পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে বইকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত ওষুধ ছিটোতে হয়। এখন একটার জায়গায় তিনটে ঘরে পেস্টিসাইড স্প্রে করতে হবে। আর নতুন শেলফ, ঘর, আলো, ওষুধ, ইত্যাদি সবগুলোর জন্যই বেশি খরচ হবে। বোঝা যাচ্ছে সংগ্রহ কিভাবে আকারে বাড়ছে ?



মোটামুটিভাবে বড় লাইব্রেরির একটা অংশ।

আবার আকারে না হলেও গ্রন্থাগার পরিষেবা (service)-এর দিক দিয়েও বাড়তে পারে। ধরা যাক, এতদিন পাঠকদের শুধু বই ধার দেওয়া হত। এবার ঠিক হল, বইএর সঙ্গে পত্র-পত্রিকার পুরনো সংখ্যাও ধার দেওয়া হবে। এটা একটা নতুন পরিষেবা। এই নতুন পরিষেবার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করা থেকে শুরু করে, সেগুলিকে আলাদা করে গুছিয়ে রাখা, ধার দেবার জন্য তৈরি করা, ইত্যাদি অনেক নতুন কাজ করতে হবে। এমনি ভাবেই আরও অনেক পরিষেবা যোগ হতে পারে, যেমন আলোকপ্রতিলিপি (photocopying) সেবা।



ফটোকপিইং, যাকে ভুল ভাবে সবাই জেরক্স করা বলেন।

সি.ডি (Compact Disc) অথবা ডি.ভি.ডি (Digital Video Disc অথবা digital versatile disc) সেবা, সম্প্রতি চালু হওয়া ওয়াইফাই (WiFi) সেবা, ইত্যাদি। এগুলো বাড়তেই থাকবে এবং নতুন নতুন সেবা যোগ হবে।



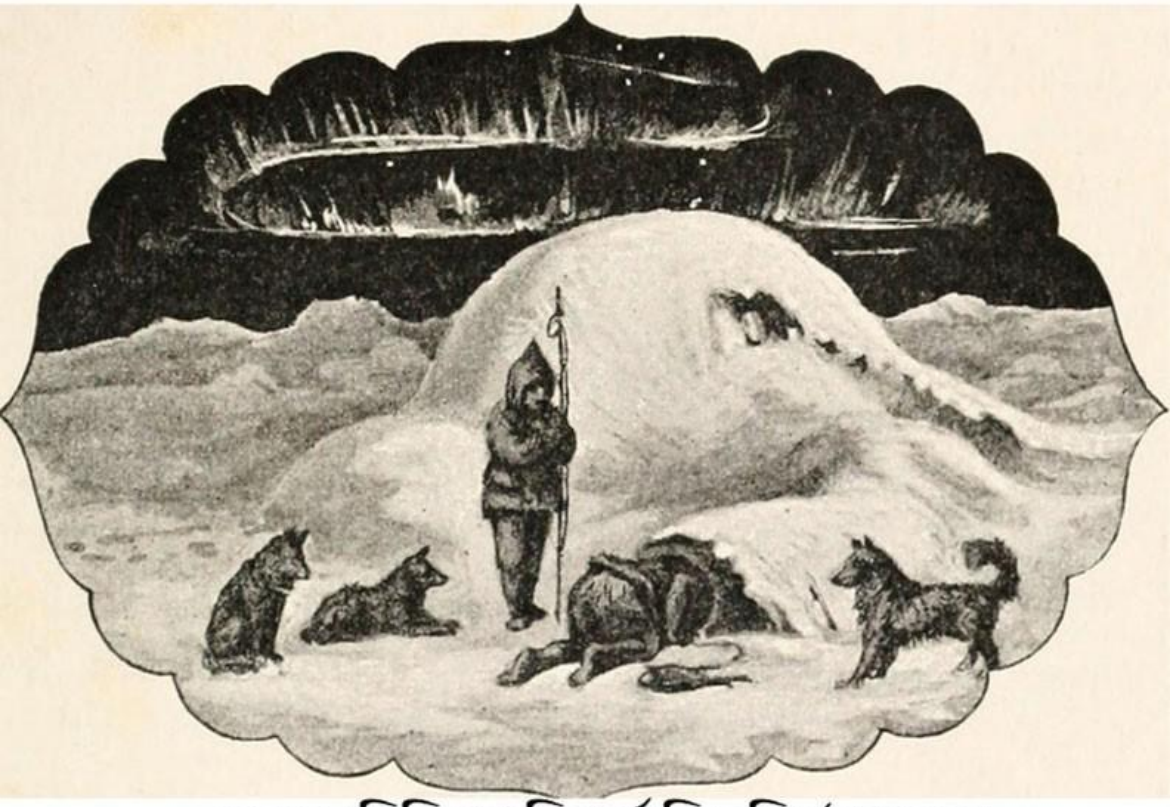
ওয়াইফাই পরিষেবার নির্দেশিকা (signage)

"Wireless Fidelity, wireless internet"

এর আগে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আমরা এক বিপুল তথ্য বিস্ফোরণের কথা বলেছি। এই বিস্ফোরণের পর থেকেই সমগ্র জ্ঞানের জগৎটা এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে, কোন বিভাগ কীভাবে বাড়বে তা আগে থেকে অনুমান করা খুবই শক্ত, হয়ত অসম্ভবও। কেন শক্ত বা অসম্ভব সেটা আমরা আগামী বারে দেখব। আর সেই বিস্তারিত আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে রঙ্গনাথনের পঞ্চম সূত্রের তাৎপর্য।

ক্রমশ

কুইকওয়ার্ন



মূল কাহিনিঃ রুডিয়ার্ড কিপলিং(সেকেন্ড জাঙ্গল বুক)

ভাষান্তরঃ ইন্দ্রশেখর , চিত্ররূপঃ শিমুল সরকার





পর্ব ১-ছেলেবেলার দিনগুলি





কৌতুকোর ঝাঁশুধোল
তার বাবাকে



আদরযত্নে,
সেবায়,
মায়ের
নজরদারিতে
বেড়ে ওঠে
ছোট্টো
কুকুরছানা।





আর তার সাথে সাথে
বেড়ে ওঠে
ছোট্টো কোতুকো

কাজকর্মে হাত লাগায় সে এখন







এলাকার নাম তুনিরিমিউট। বাংলা করলে তার মানে দাঁড়াবে "মাতোয়ার"। সার্থক নাম। গোটা পৃথিবীটারই কাঁধের ওপর মাতোয়ার হয়ে রয়েছে এই যে এলাকাটা। কেতুকোদের এই গ্রামে লোকজন খুব বেশি নেই। জনা তিরিশেক হবে বড়জোর। তার বয়েস এখন চোদ্দো। নিজেকে সে শক্তসমর্থ একজন জোয়ান বলেই মনে করে। কাজেই, বাবা যখন শিকারে বেরোয় তখন ঘরে বসে বসে পাখিধরার ফাঁদ বুনতে তার আর ভালো লাগেনা। "কাগিগা" র (গোন বাড়ি) আড্ডায় পুরুত আঙ্কেকক এর রোমাঞ্চকর গল্প বলার আসরেও তার এখনো যাওয়া মানা। বড়দের মতো শিকার থেকে ফিরে বুটজুতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়া, কিংবা শিকারীদের সঙ্গে জুয়ো খেলতে বসা ---

অবশ্য এখনো
কোতুকোকে কেউ
বড়ো বলে
ধরে না--

--কত কিছুই তো করতে তার মন চায়। কিন্তু ওরা তাকে সে সব করতে দিলে তবে তো।

সে সব কথা বলতে গেলে সবাই মুচকি হাসে আর বলে, আগে বড় হ!

আর কত বড়া হবে কোতুকো? অবশ্য এবারে বাবা তাকে একটা কুকুর দিয়েছে। তার মানে বড়ো হবার প্রথম সিঁড়িটা পেরোন গেছে অবশেষে।

কুকুরছানাটা কে শক্তপোক্ত আছে। নইলে, কেতুকোর যন্ত্রণাতির ঠেলায় অ্যাদ্দিন বেঁচে থাকাই কঠিন হত তার। ঘড়ি ঘড়ি তার মুখে ঠেলে মাংসের টুকরো ঢোকানো হচ্ছে। তড়াতাড়ি যাতে বড় হয়ে যায়।




জা চোয়াইচোই (বাঁয়ে যাও), ও হাহা (থামো),
আইয়া, জা আউয়া (সোজা যাও)।
গলায় একটা বকলস
আটকে দড়ি বেঁধে
টেনে টেনে তাকে নিয়ে
সারাদিন ঘরের
ভেতর সাংঘাতিক
সব অভিযান চলে।


ঘুমোবার সময়েও ছাড়াছাড়ি হয় না।
একসঙ্গে জড়াজড়ি করে ঘুমোয় দুটিতে।



পর্ব ২–বড়ো হয়ে ওঠা

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ইগলুর মুড়ঙ্গে বাকি কুকুরদের সঙ্গে তার ঠাঁই জোটে। শক্তপোক্ত কয় কুকুরদের গুঁতোয় সবচেয়ে ঠান্ডা কোনাটিতে গিয়ে কোনমতে রাত কাটিয়ে পরদিন খোলা আকাশের নিচে খাটুনির জীবন।

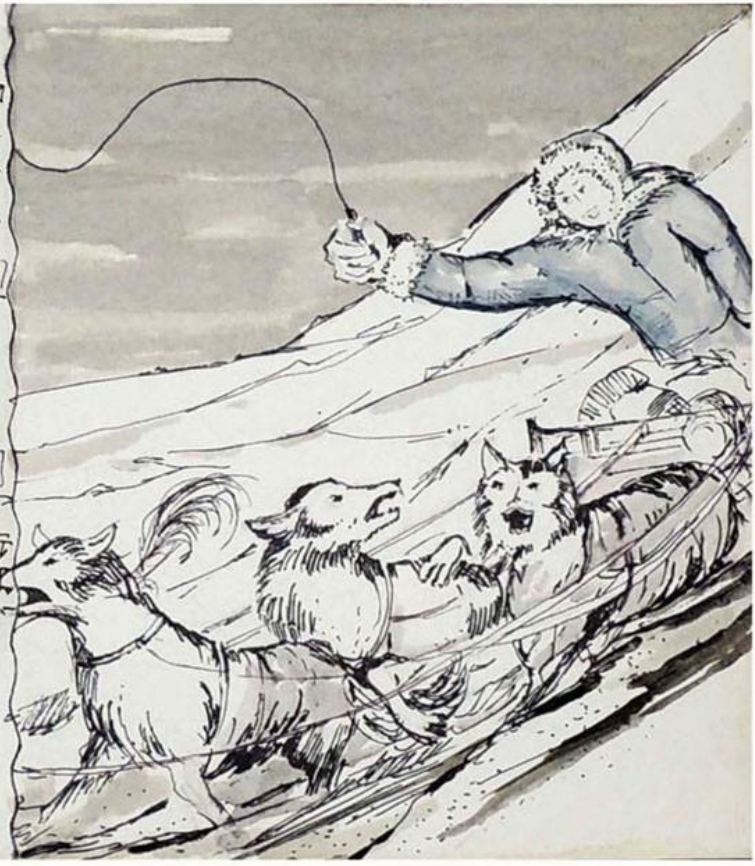
স্লেজের লাগামের ধর্ষায় তার ঘনশ্রস্ত কাঁধে ক্ষত সৃষ্টি করে। এ' সবই বড়ো হবার দাম যে!

বড়ো হবার দাম অবশ্য কোকুকোকেও কম দিতে হচ্ছে না। কুকুরে টানা স্লেজ চালানো সহজ কথা নয়। সবক'টা কুকুরকেই আলাদা আলাদা দৈর্ঘ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সবচেয়ে দুর্বলটা থাকবে সবচেয়ে কাছে। সর্দার কুকুরের দড়ি হবে সবচেয়ে লম্বা।

ছুটতে ছুটতে ঝগড়া করাটা কুকুরের একটা বদস্বভাব।



যে রকম লক্ষণ দেখা দিলে, অপরাধী কুকুরটির নাম ধরে হেঁকে পঁচিশ-ফুটি চাবুকের নাথাটাকে ঠিক তার কাঁধে আছড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু যদি কুকুরের নাম ধরে ডেকে তারপর চাবুক যদি নিশানা ভুল হয়ে অন্য কুকুরের গায়ে পড়ে তাহলে যে দুজনের মধ্যে লড়াই অবধারিত। তাতে অবশ্য কুকুরের দড়াদড়ি জড়িয়ে গিয়ে স্লেজ ছোটাবার দফারফা।



স্লেজ চালানোর পাশাপাশি দুজন মিলে চলে বরফে গুঁড়ি মেরে শিকার শিকার খেলা



সারাদিন শিকারের পরে ক্লেজ-বোঝাই শিকার নিয়ে ঘরে ফেরে কান্ত কোম্পুকো। খেঁকে থেকে গেয়ে ওঠে —




গানের সুর ভেসে যায় হিমবন্ত সুদূর উত্তরের শীতল বাতাসে


বড়ো হয়ে উঠছিল তার পুষ্যিটিও
একদিন সন্ধেবেলা খাবার সময় সে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল স্বয়ং সর্দারকুকুর পিটুকেই।

তারপর যুদ্ধে জিতে

•••• দখল করে নিল দলনেতার পদ।

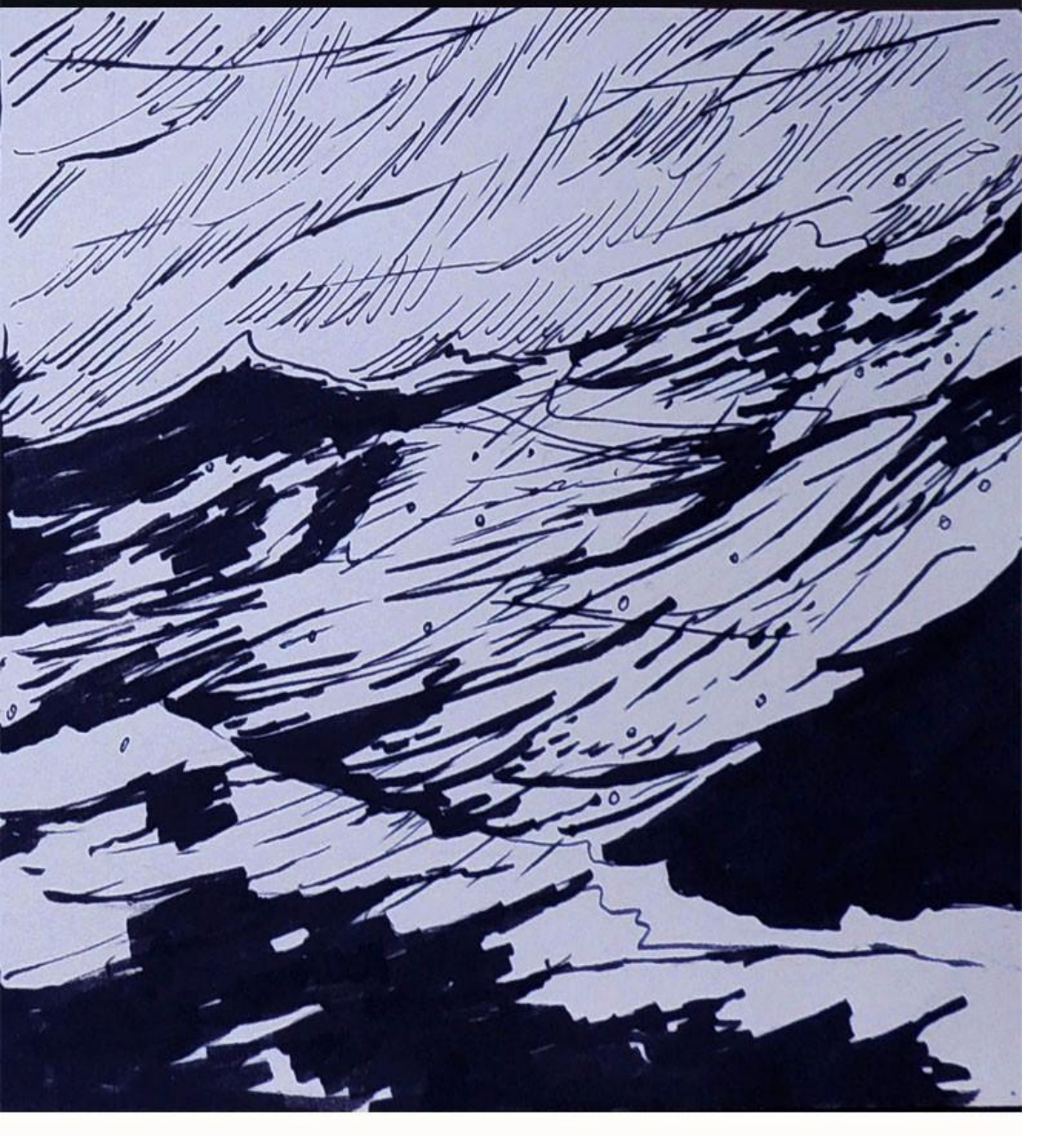



...এবারে তার গলায় উঠবে আমার বকলশ।
পিটুর বদলে তাকে নিয়েই সিল শিকারে
যাবে প্রিয়বন্ধু কোতুকো।

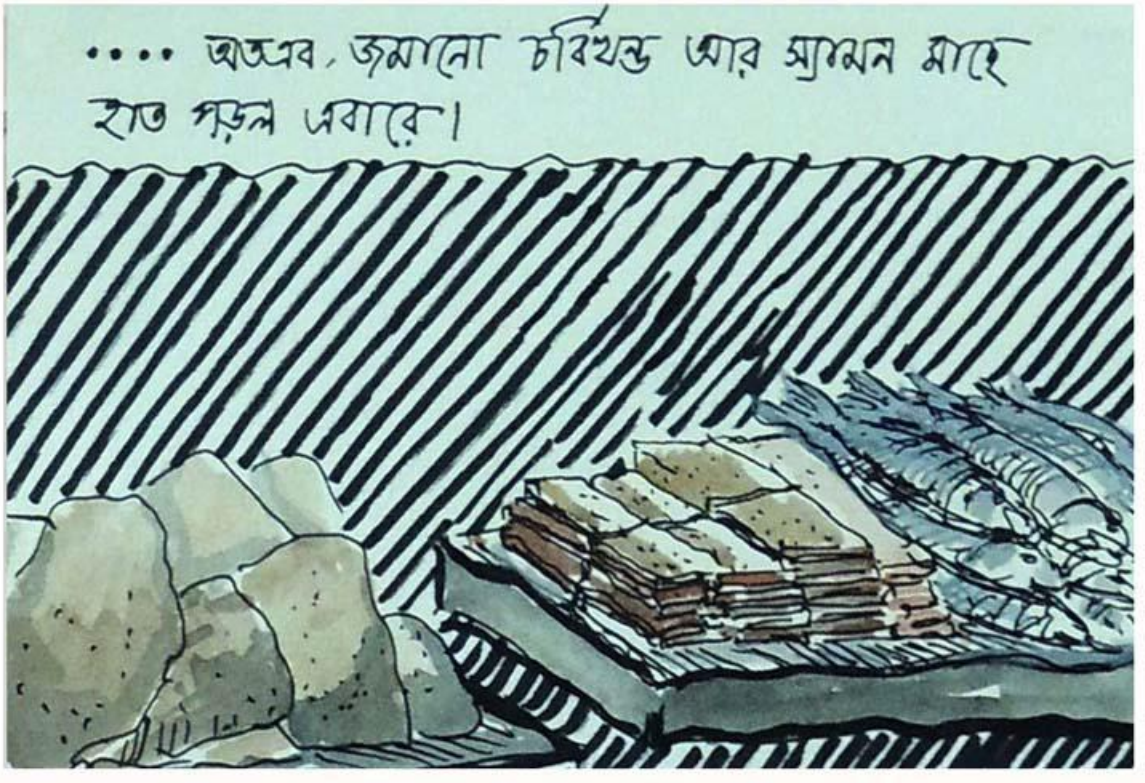


পর্ব ৩–সংকটের দিনগুলি

কিন্তু বিপদ এল।




সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলল প্রকৃতির রুদ্ররোষ।


.... অতএব, জমানো চর্বিখন্ড আর খাদ্যের মাহে
হাত পড়ল এবারে।



ডিসেম্বরের এক রাতে শিকারের খোঁজে বার হয়ে একটা দ্বীপিকের ভেতর থেকে তিন মহিলা আর এক কিশোরীকে উদ্ধার করে আনল গ্রামের শিকারিরা। জানা গেল, সমুদ্রে নারহোয়াল শিকার করতে গিয়ে তার খড়্গের আঘাতে কাহিল হয়ে মারা গিয়েছে তাদের পুরুষেরা।

ইন্যুইট নিরাশ্রয়কে ফিরিয়ে দেয় না। গ্রামের নেতা কাদলু অতিথিদের ভাগ করে দিল বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে।

কিশোরীটি ঠাঁই পেল কাদলুর ইগলুতে। পোশাক আশাক দেখে মালুম হচ্ছিল, সে 'এলসমেয়ার' অঞ্চলের মেয়ে। সমবয়সী কোতুকোর সঙ্গে তার ভাবও জমতে দেরি হল না তার।

ওদিকে অবস্থা তখন ক্রমেই আরো খারাপ হচ্ছে





এর মধ্যেই একদিন হঠাৎ করে কেতুকোর কুকুরটা পাগল হয়ে গেল। কিছুদিন ধরেই তারি মনমরা হয়ে থাকছিল সে। তারপর হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠে ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করে লেজ নাড়ে আর মাথা দিয়ে গুঁতোয় কেতুকোকে।





কেতুকোর ভয় হচ্ছিল। তার ডাকে বিছানা ছেড়ে উঠে এল কাদলু।

পরদিন পিটুর পালা এল। একটা খাড়াই বরফের চাঁই জ্যান্ত খাবার ভেবে এক লাফে তার মাথাটা গিয়ে কামড়ে ধরল সে।




পাগল হয়ে গেছে বেচারা।
শ্রেফ খিদেয় আর অন্ধকারে থেকে থেকে। এ রকম হয়।
কী হয়েছে ওর?
জলাতঙ্ক?


পাগল জীবটাকে মেরে ফেলার জন্য হারপুন তুলতেই
..একুটে হারিয়ে গেল ধুসরাক্ষ্মাট অন্ধকারের ভেতরে।

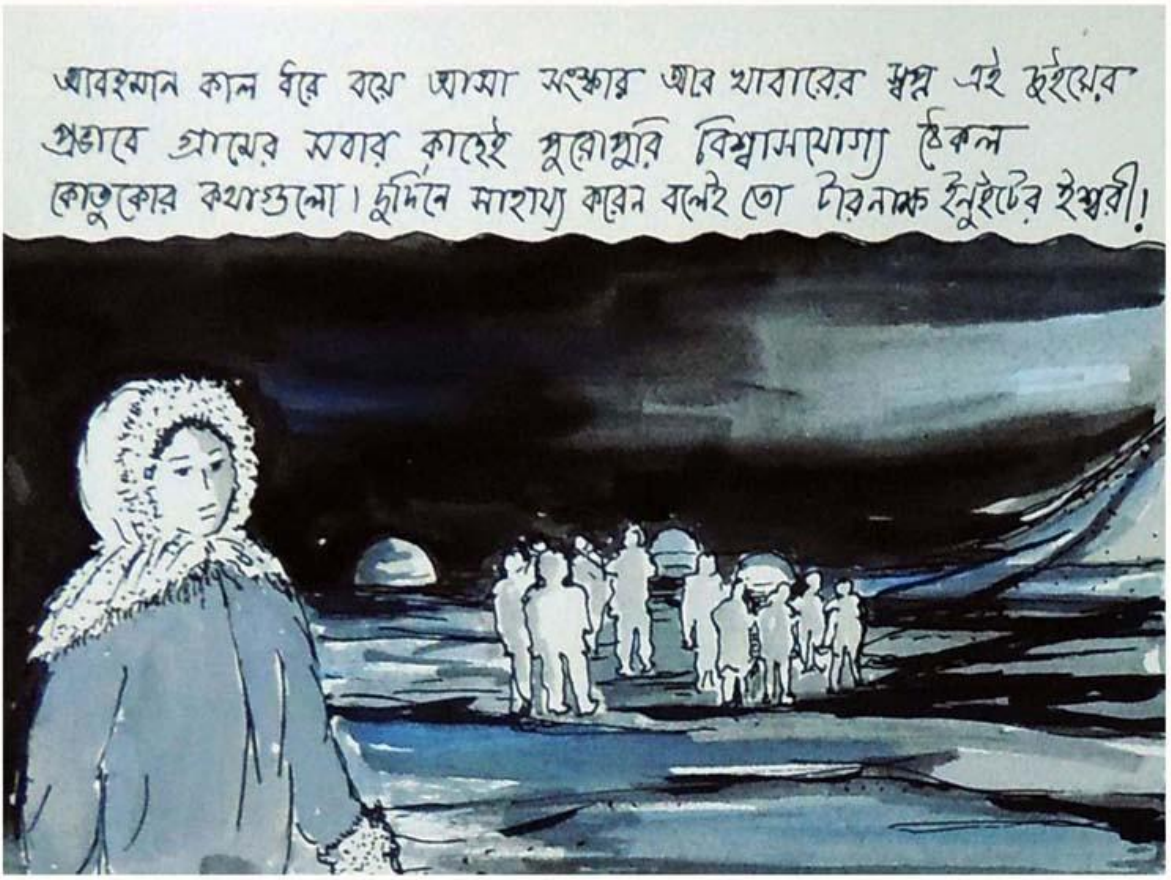
আরো অন্ধকারে মৃদু দপদপে চর্বির আলোয় ঝুর্বাত বুড়িরা এখন ভূতের গল্প বলা শুরু করেছে।



কাল্পনিক ভূত নয়। গ্রামের মৃত শিকারীদের আত্মার সাথে দেখা হবার গল্প। তাদের বলে দেওয়া যোবহ ভবিষ্যতের হাড় হিম করা পূর্বাভাষ।




-- আমি পরিষ্কার শুনেছি টারনাক এর কথা। পাথরের বাড়িতে ফেলে আমার পেছনে আসতে আসতে তিনি বলছেন, উত্তরের দিকে রওনা হও। আমি নিজে তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব সুন্দর, সমতল সমুদ্রবরফের বুকে সিলদের চারণভূমিতে----


আবহমান কাল ধরে বয়ে আসা সংস্কার আর খাবারের স্বপ্ন এই দুইয়ের প্রভাবে গ্রামের সবার কাছেই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য ঠেকল কেতুকোর কথাগুলো। দুর্দিনে সাহায্য করেন বলেই তো টারনাক ইনুইটের ইশ্বরী!



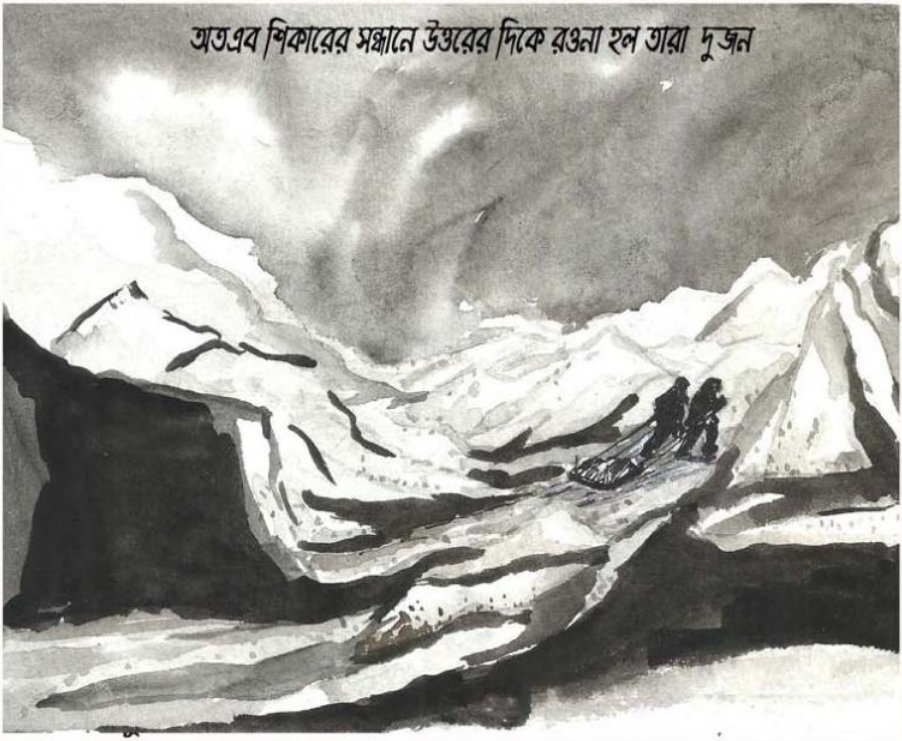
হঠাৎ কোতুকোদের আশ্রয়ে থাকা সেই এলসমেয়ারের মেয়ে বেরিয়ে এসে বলে--





পর্ব ৪-উত্তরে আরো উত্তরে

অতএব শিকারের সন্ধানে উত্তরের দিকে রওনা হল তারা দুজন



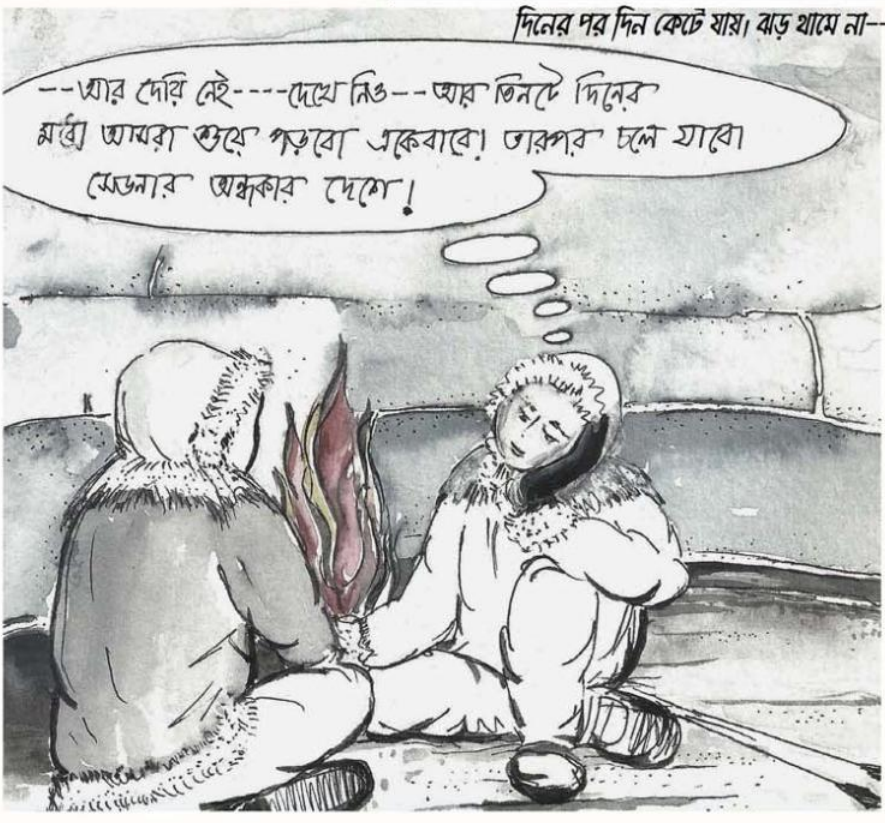



একদিন হঠাৎ কোতুকো পেছনদিকে ঘুরে কিছু শুনে চেঁচিয়ে উঠল
টারনাকের গর্জন
আ
আ! আ!


খানিক বাদে পেছন ঘুরে তারা দেখে
একটা দুমাথাওয়ালা কুকুরের রূপ ধরে টারনাক..... পেছন পেছন আসছেন.....



*কুইকওয়ার্ন – ইনুইটদের ভয়াল মৃত্যুদূত কুকুরদেবতা





তাদের চোখের আড়ালে প্রকৃতির খেলা কিন্তু চলছিলই। শীত কেটে গিয়ে আসছিল উষ্ণতা। হঠাৎ একদিন কেঁদে উঠল তাদের পায়ের তলায় সমুদ্রে ভাসমান বরফের স্তর-----




কুইকোয়ার্ন এখনো অপেক্ষায় আছেন--
চলো আমরা ওঁর শরণ নিই। এমনিতেই তো মরবো, কিন্তু কুইকোয়ার্নের যদি দয়া হয় তাহলে--
গ র র র
গ র র র


পায়ের নিচের বরফস্তরের অস্থিরতা এখন চরম সীমায় উঠেছে। কানফাটানো শব্দ করে ছিটকে ছিটকে উঠছে টন টন ওজনের অতিকায় সব বরফের চাঁই।...
ক ড় ক
চা র
চ ড় চ ড়
ক ড় ক ড়

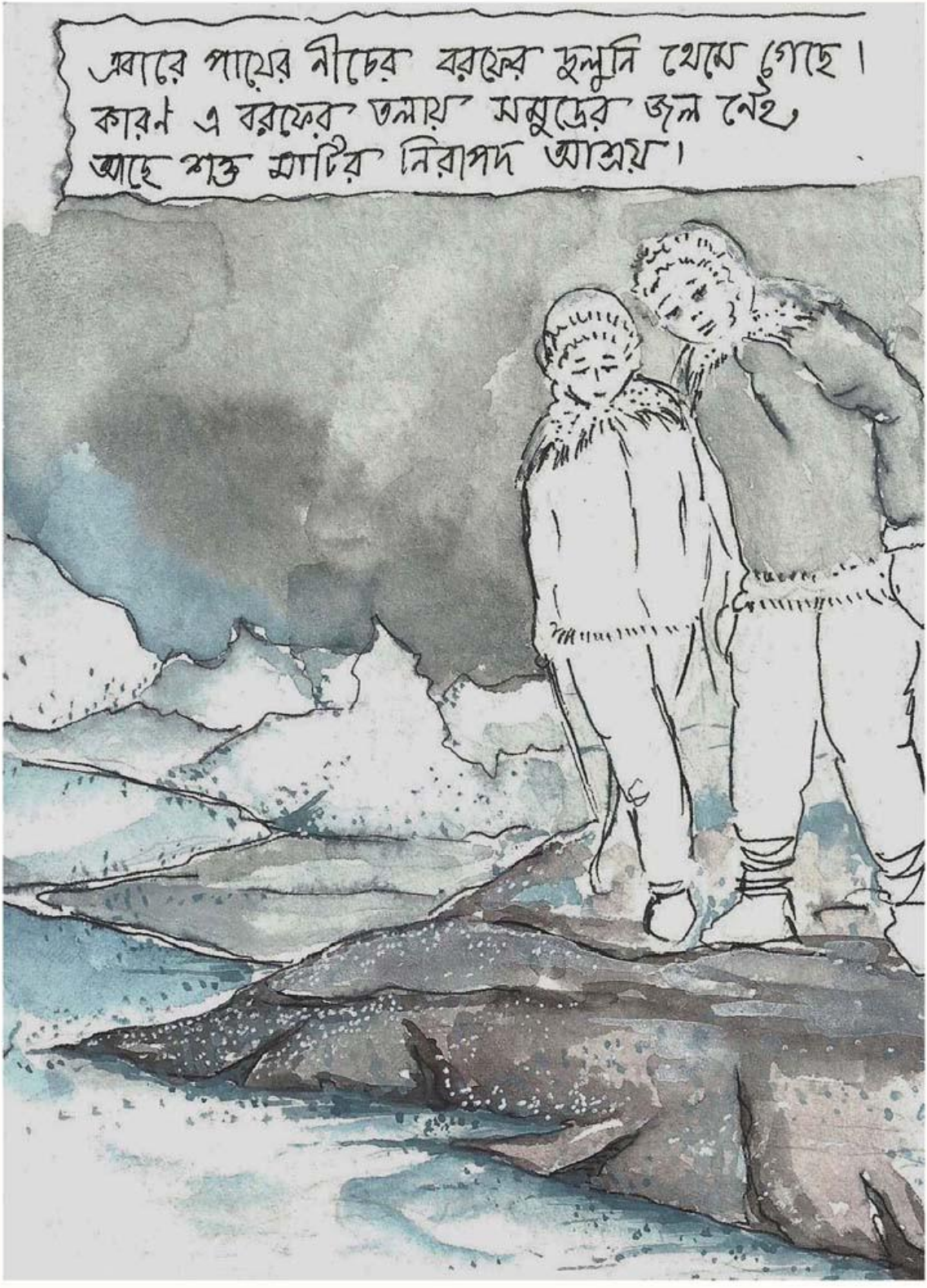


এত তাড়াতাড়ি বসন্ত এসে বরফের ফেটে যাওয়া বিশ্বাস হচ্ছিল না কোতুকোর

হঠাৎ এলসমেয়ারের মেয়ের কথায় চমক ভাঙল তার। কুইকওয়ার্ন ছুটে যাচ্ছেন----



তাঁর পিছুপিছু বেশ কিছুদূর ছুটে যাবার পর





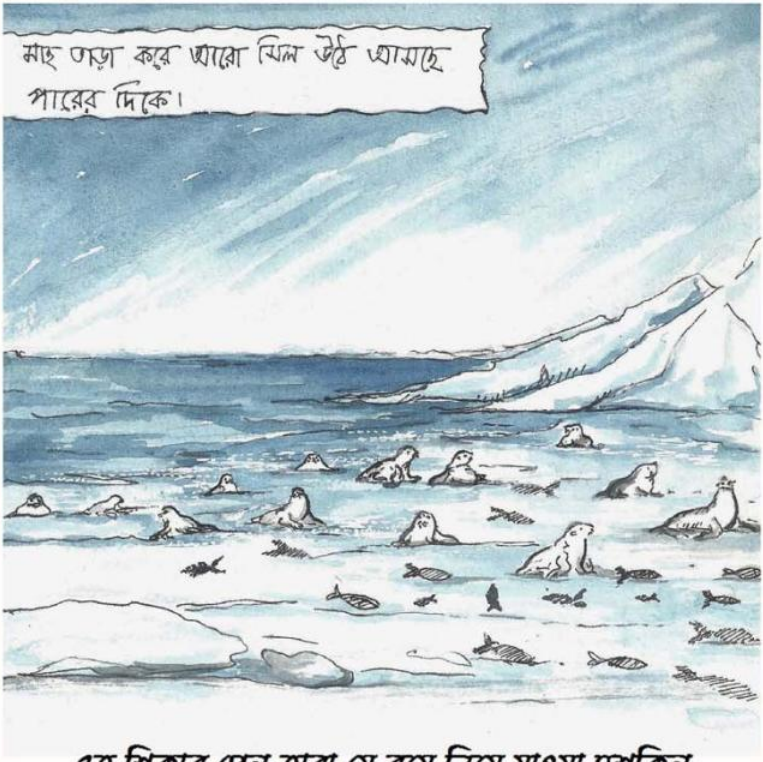
এমন সময় হঠাৎ তারা দেখে কুইকওয়ার্ন কাছে আসছেন। কিন্তু কুইকওয়ার্ন কোথায়? এতো সেই পালিয়ে যাওয়া পিটু আর কোতুকোর কুকুরটা! বকলপ একসঙ্গে আটকে গিয়ে দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন দু মাথা ওয়ালা কুকুরদেবতা!!!!



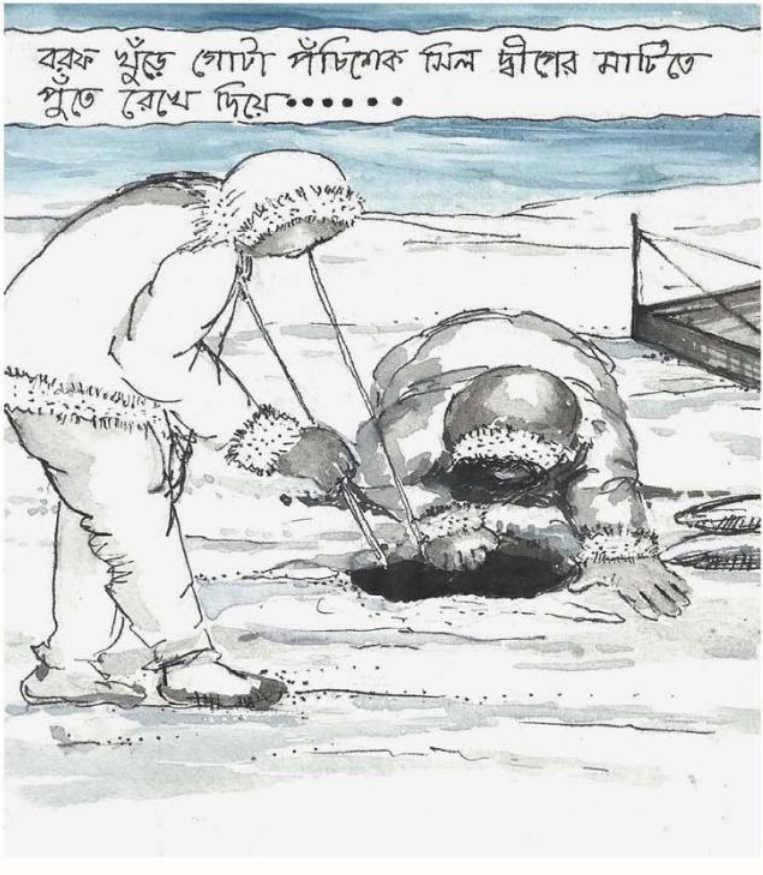


চারপাশে ফের খাবারের ছড়াছড়ি





এত শিকার পেল তারা যে বয়ে নিয়ে যাওয়া মুশকিল



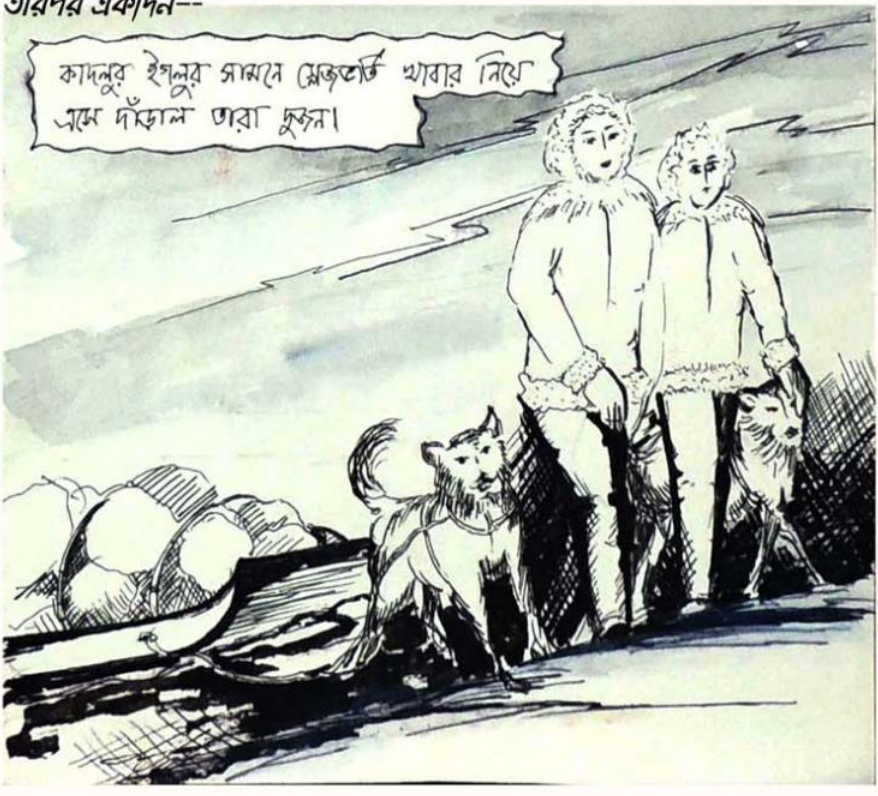
বাকি শিকার নিয়ে এবার বাড়ির পথে রওনা

হলদে আর কালো, দুই কুকুর মিলে প্রাণপণে টানছিল স্লেজটাকে। তাতে অবশ্য কোন আপত্তি ছিল না তাদের। পেটভর্তি খাবার থাকলে, প্রভুর জন্য দুনিয়ার কোন পরিশ্রমকেই পরোয়া করে না ইনুইটের কুকুর।



তারপর একদিন--

কাদলুর ইগলুর সামনে স্লেজভর্তি খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল তারা দুজন।

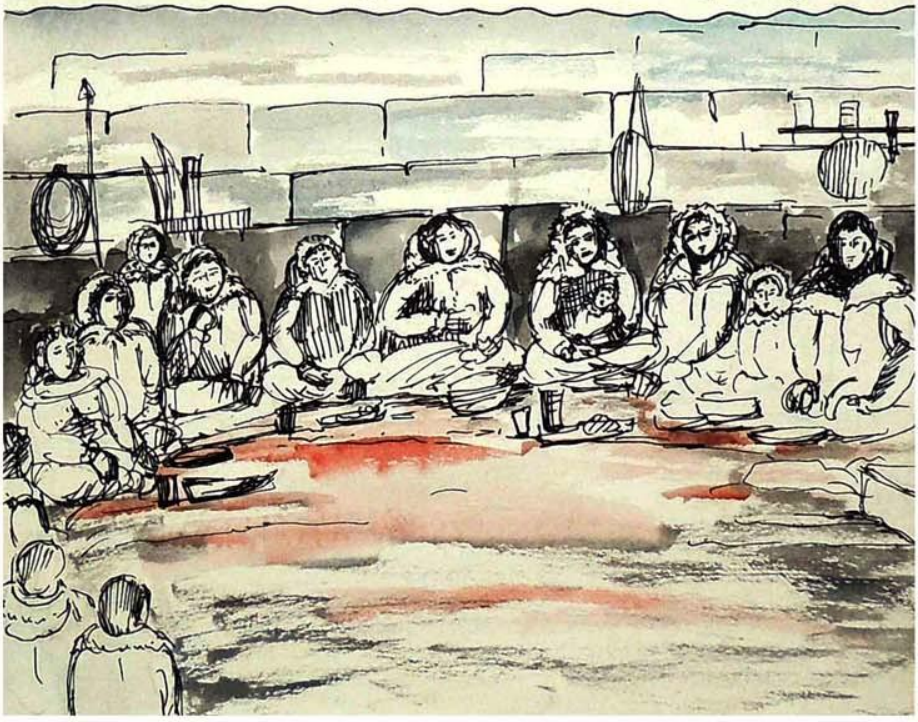


কুকুরদুটোর ডাকে ভেতর থেকে সাড়া দিল মাত্র তিনটে কুকুর। বাকিরা মানুষের পেটে গেছে ততদিনে।



তবে কাদনুর মুখে জানা গেল গোটা গ্রামে একটা মানুষও মরেনি এখনো। গ্রামের কুকুরেরা একে একে নিজেদের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে মানুষদের।

উজ্জ্বল আলোকে ঘিরে বসে শিকারিরা বহুদিন পর পেটপুরে মাংস খেতে খেতে কোতুকো আর সেই মেয়েটির মুখে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনছিল।



পাশাপাশি বসে গল্প বলছিল কিশোর ও কিশোরীটি, আর তাদের মাঝখানে কান খাড়া করে বসেছিল হলদে আর কালো রঙের কুকুর দুজন।



ঠিক হল পরদিন গ্রামের অন্য কয়েকজন শিকারি গিয়ে বরফে পোঁতা মিলগুলো তুলে নিয়ে আসবে। হেমন্তের ঝড়ে যে শিকারভূমির পথ দুর্গম করে দিয়েছিল, প্রাকবসন্তের ঝড় আবার তাকে সুগম করেছে। কুকুরদের খুঁজে বার মিলদের নতুন চারণভূমি মাত্রই দুটিনদিনের পথ। তুনুনিরমিউটে খাবারের অভাব আর হবে না।





ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। উত্তরে মেয়েটা একটু হতাশ ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকিয়ে খালি হাত দুটো ওপরে তুলে ধরল। অনাথা, বিদেশী মেয়ে। পরের আশ্রয়ে বাস। হাত তার একেবারে খালি। তার নতুন ঠাকুমার সংসার সাজাবার জন্য যৌতুক তো কিছুই আনতে পারবে না। সেই কথাটিই বোঝাতে চাইল যেন সে ওইভাবে।




ঘরের এখান ওখান থেকে
সংসারের হাজারো খুঁটিনাটি
জিনিসপত্র---পাথরের বাতি,
কেটলি, এম্ব্রয়ডারি করা হরিণের
ছাল, ছুঁচ, চামড়া ছাড়াবার ছুরি- যেখানে যা পেল, দুহাতে
ঝেঁটিয়ে এনে জমা করতে লাগল মেয়েটার কোলের ওপর!



কোতুকো বেশ ভালো ছবি আঁকতে পারত। এলসমেয়ারের মেয়ের সঙ্গে আলাদা ইগলুতে সংসার পাতবার কিছুদিন পরে , তিমির দাঁতের লম্বা একটা পাতের ওপর আঁচড় কেটে কেটে ছোট ছোট স্কেচ-এ সে ওপরের সবটা গল্প এঁকে রেখেছিল। সেই যে বছর শীতে সমুদ্র পুরোপুরি জমল না, সেই বছরে বৌ কে নিয়ে সে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির দেশ এলসমেয়ারে। যাবার সময় এই ছবিতে গল্পটা দিয়ে গিয়েছিল কাদলুকে। পরের গ্রীষ্মে, নিকোসিরিং-এর নেটিলিং হ্রদের পাড়ে কাদলু সেটাকে হারিয়ে ফেলল। স্থানীয় এক ইন্যুইট সেটা কুড়িয়ে পেয়ে বেচে দিল তিমি শিকারি জাহাজের এক দোভাষীর কাছে। দোভাষীর কাছ থেকে সেটা কিনেছিল হান্স ওলসেন নামের এক জাহাজি। লণ্ডন থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে শ্রীলংকার বন্দরে এক মণিকারের কাছে ঝুটো মুক্তোর বদলে সেটা সে বেচে দিয়ে যায়। অবশেষে কলম্বোর একটা বাড়ির আবর্জনার স্তুপের মধ্যে সেটাকে খুঁজে পেয়ে আমি এখানে তার অনুবাদ করলাম।

রুডিয়ার্ড কিপলিং

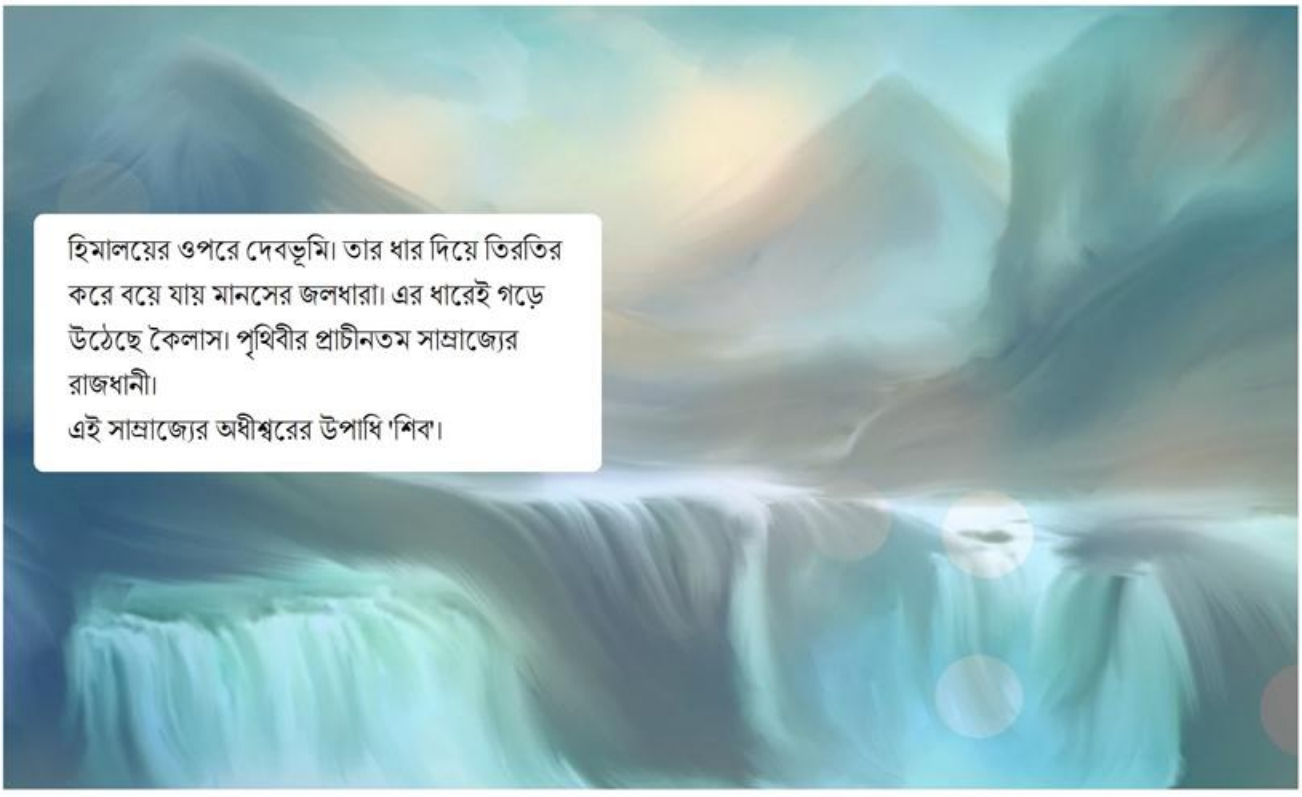
গ্রাফিক নভেল



কালাকেতু

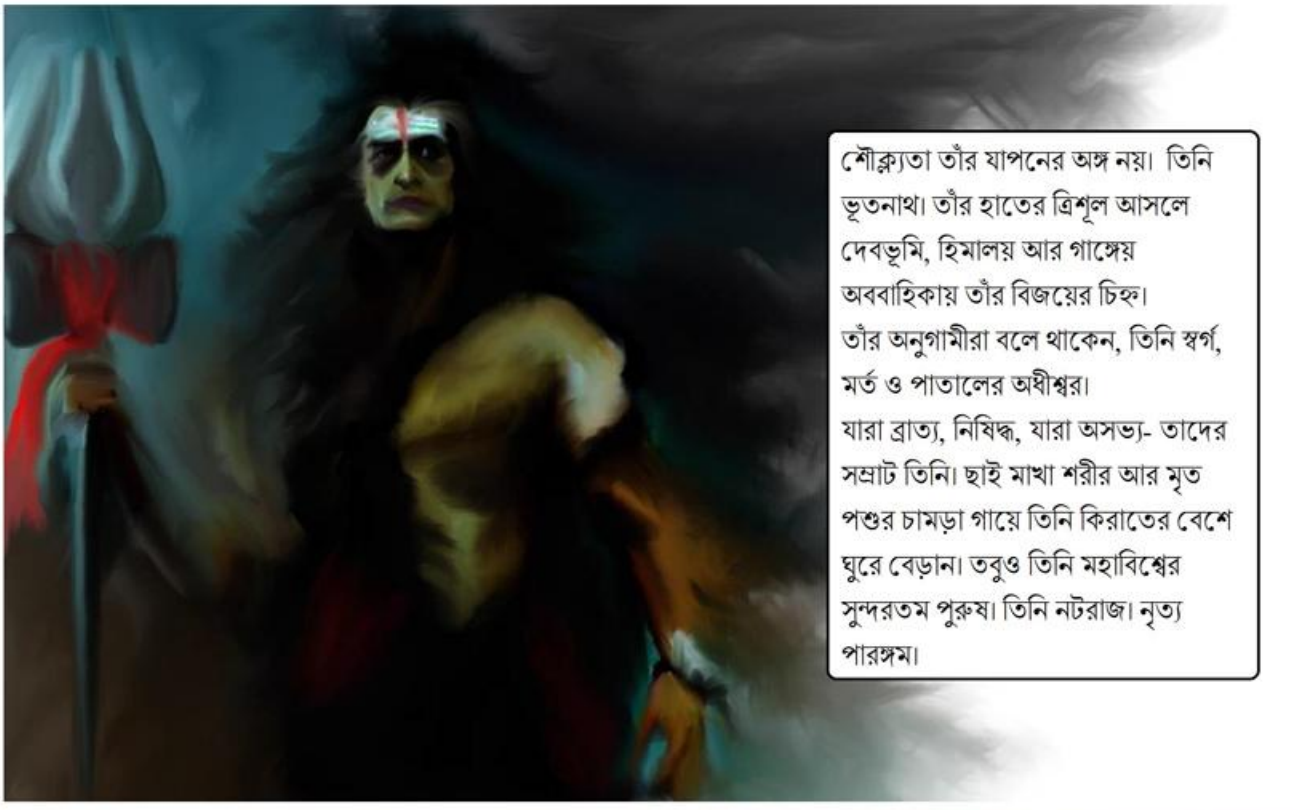
হিমাচলের বুনো গাছ

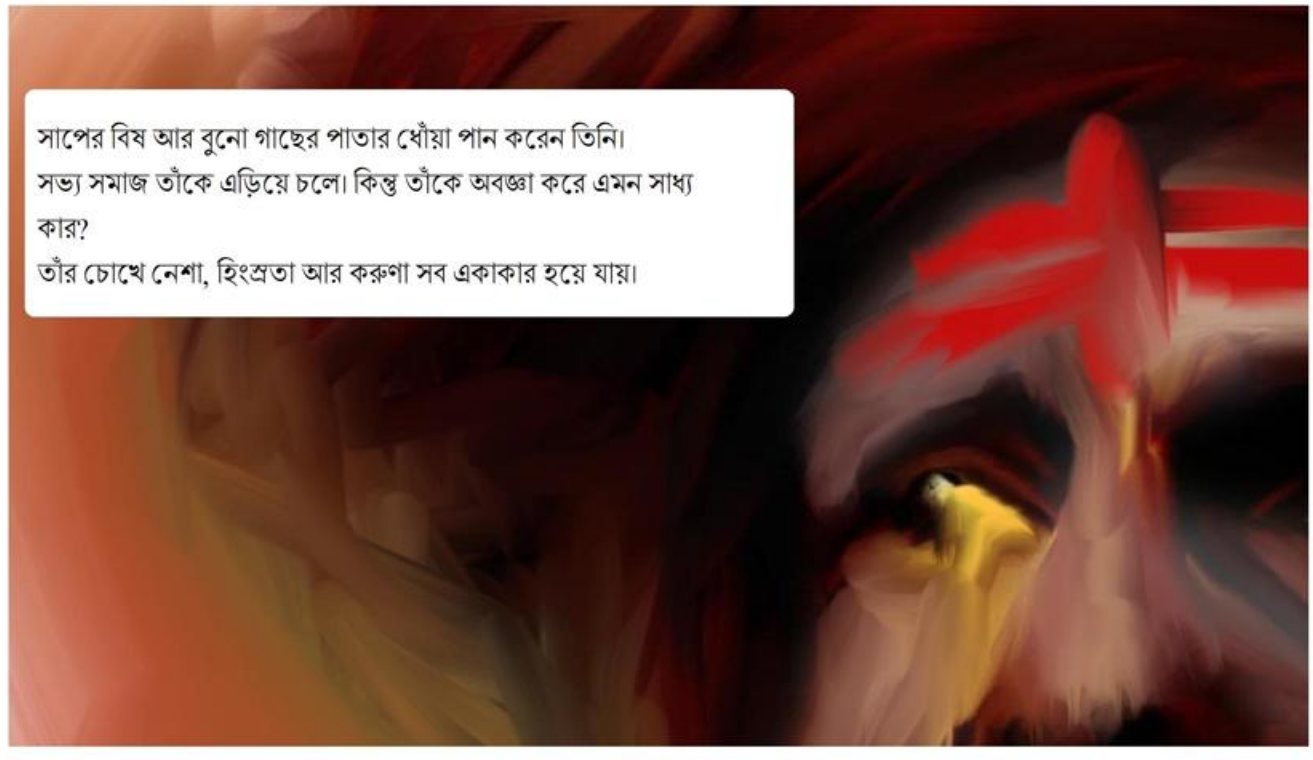
লেখায় রেখায়
অতনু দেব


হিমালয়ের ওপরে দেবভূমি। তার ধার দিয়ে তিরতির করে বয়ে যায় মানসের জলধারা। এর ধারেই গড়ে উঠেছে কৈলাস। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্যের রাজধানী।
এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের উপাধি 'শিব'।

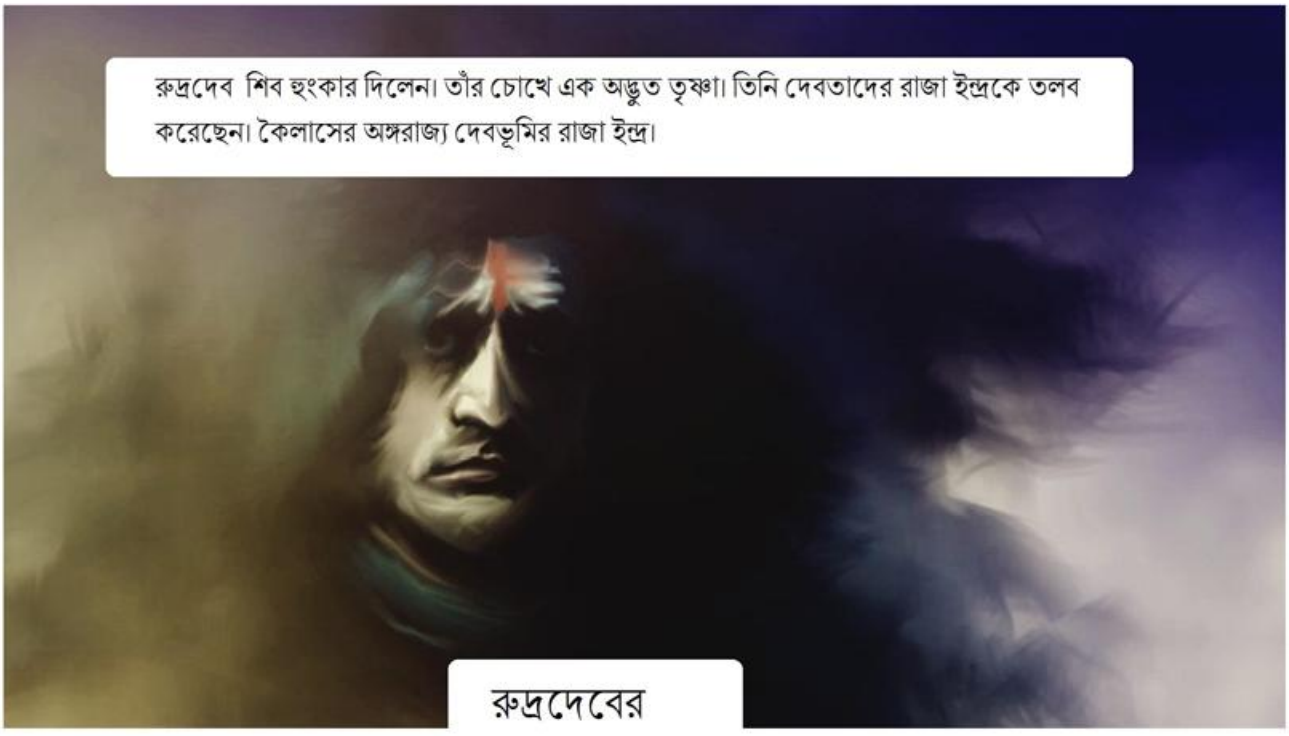

কথিত আছে, ১ম শিব জন্ম নিয়েছিলেন সভ্যতার আদি লগ্নে। তিনি আদিপুরুষ। মহাবিশ্বের বুকে ঠিকরে আসা আলোর প্রাচীনতম রেণু হলেন শিব। তাঁর কপালে ত্রিকালের বিনাশ চিহ্ন আঁকা।
বর্তমান শিব আসলে বিষ্ণুর পুত্র। তাঁর পিতামহ ব্রহ্মা। তাঁর প্রপিতামহের নাম ১ম শিব।


মহাদেব শিব করুণার সাগর। আবার বিনাশের দেবতা।
দেবকূলের আদিপুরুষ হয়েও তিনি শৌখিন নন।


শৌক্ল্যতা তাঁর যাপনের অঙ্গ নয়। তিনি ভূতনাথ। তাঁর হাতের ত্রিশূল আসলে দেবভূমি, হিমালয় আর গাঙ্গেয় অববাহিকায় তাঁর বিজয়ের চিহ্ন।
তাঁর অনুগামীরা বলে থাকেন, তিনি স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের অধীশ্বর।
যারা ব্রাত্য, নিষিদ্ধ, যারা অসভ্য- তাদের সম্রাট তিনি। ছাই মাখা শরীর আর মৃত পশুর চামড়া গায়ে তিনি কিরাতের বেশে ঘুরে বেড়ান। তবুও তিনি মহাবিশ্বের সুন্দরতম পুরুষ। তিনি নটরাজ। নৃত্য পারঙ্গম।


সাপের বিষ আর বুনো গাছের পাতার ধোঁয়া পান করেন তিনি।
সভ্য সমাজ তাঁকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার?
তাঁর চোখে নেশা, হিংস্রতা আর করুণা সব একাকার হয়ে যায়।

রুদ্রদেব শিব হুংকার দিলেন। তাঁর চোখে এক অদ্ভুত তৃষ্ণা। তিনি দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে তলব করেছেন। কৈলাসের অঙ্গরাজ্য দেবভূমির রাজা ইন্দ্র।





রুদ্রদেবের
হুংকার
মানে
মহাপ্রলয় আসন্ন।





* পুরন্দর হ'ল ইন্দ্রের অপর নাম। তিনি নগর/ পুর ধ্বংস করতে ওস্তাদ।

আপনার স্তবগান গাইছিলাম। বেদের মন্ত্রে 'রুদ্রদেব'কে স্থাপন করছিলাম।

পুরন্দর ইন্দ্র ভয় পেয়েছেন।

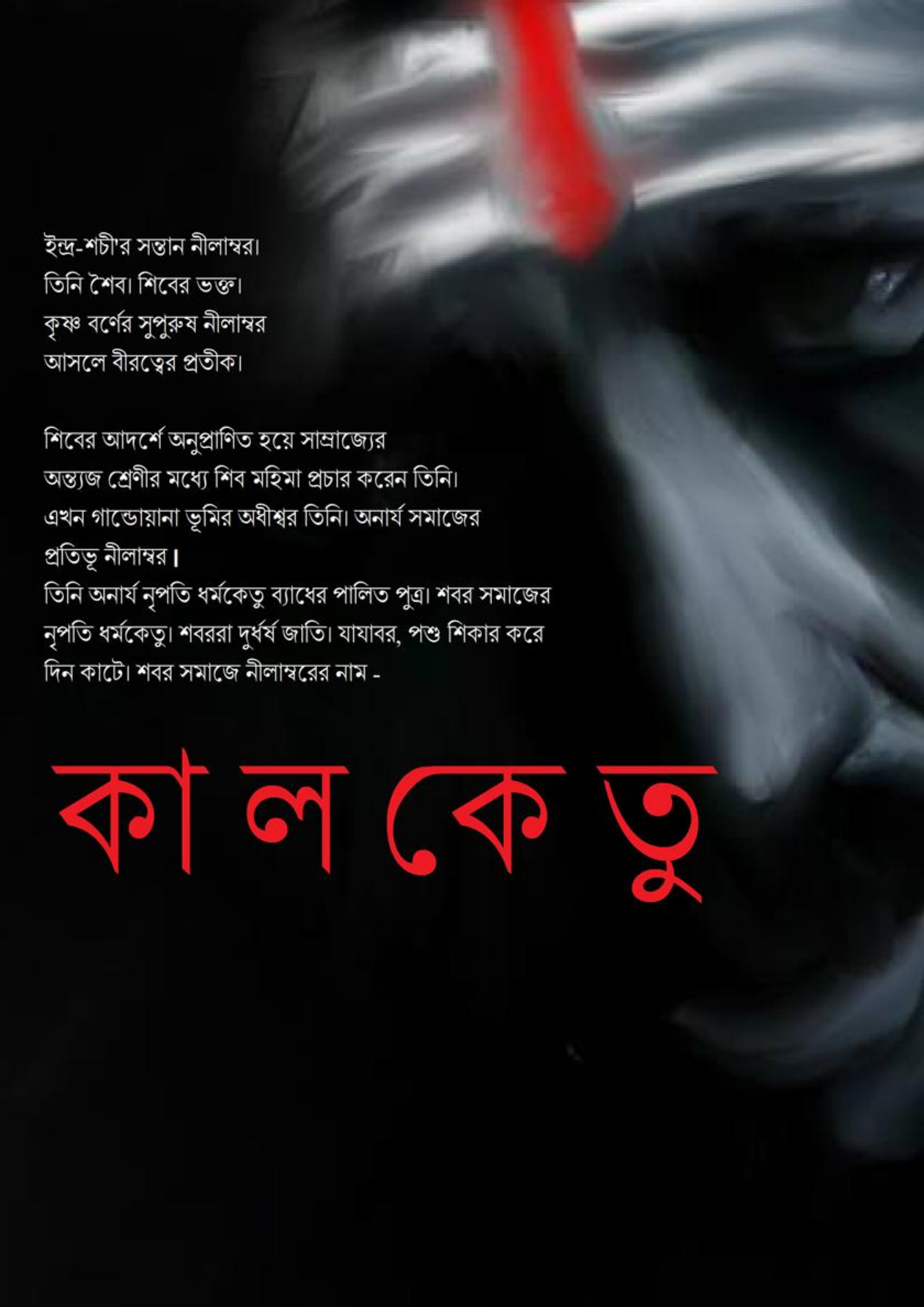
বজ্রবিদ্যুতের সময় অতিক্রান্ত। এখন আশ্বিন সমাগত। তাই বেদগান গাইছিলাম। একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। আগামী মাস থেকে প্রজাদের ফসল কর এবং নৈবেদ্য নেওয়া হবে।

সেসব নিয়ে আমি ভাবিত নই। আমার অন্য সমস্যা ...। আমার উদ্বেগ তোমার দৃষ্টিগোচর হয়নি?

হিমাচলের উপত্যকায় একধরণের বুনো গাছ পাওয়া যায়। সাপের বিষের ন্যায় ...

ওই গাছ আমার চাই।


একটা ছোট খটকা আছে। সে উপত্যকা আসলে আমার পত্নী উমার এলাকা। তাঁর পিতা হিমালয় আমাদের বিবাহের সময় উপহার দিয়েছিলেন...
... আর তুমি তো অজ্ঞাত নও, ... আমাদের দুজনের ঝগড়ার পর থেকে সে এখন হিমাচলেই আশ্রয় নিয়েছে।
দেবী চণ্ডীর* এলাকা থেকে সেই বুনো গাছ আনতে গেলে যুদ্ধ অবধারিত। ... এদিকে দেবসেনাপতি কার্তিক এখন গাঙ্গেয় অববাহিকায় গিয়েছেন। মা চণ্ডীও এমাসেই বাপের বাড়ি ... এমতাবস্থায় যুদ্ধ করা সমীচীন নয়!
মহাদেব নাছোড়বান্দা। তাঁর কথা ফেলা যাবে না। এদিকে মা চণ্ডীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাও শ্রেয় নয়। তবে লড়াই আসন্ন।
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই লড়াই আমাদের ভবিতব্য।
উপায় একটাই। আমার পুত্র নীলাম্বরকে খবর দিতে হবে। তবে তাঁর অনার্য বাহিনী সুশিক্ষিত নয়। অসভ্য। আর উপায় নেই!
*উমার অপর নাম



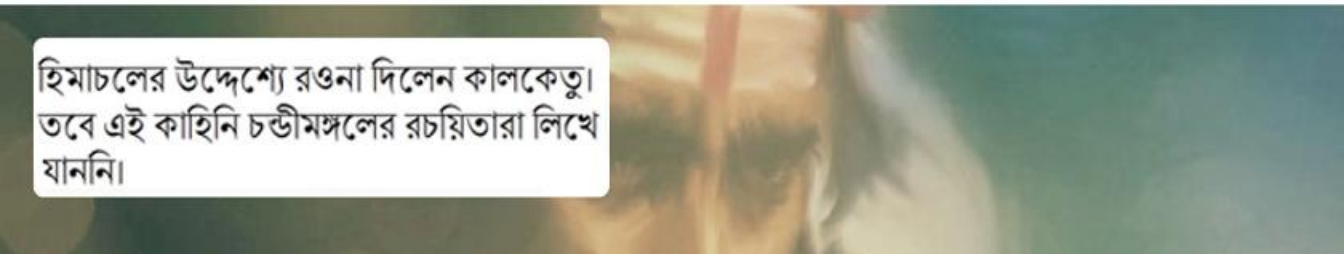
ইন্দ্র-শচী'র সন্তান নীলাম্বর।
তিনি শৈব। শিবের ভক্ত।
কৃষ্ণ বর্ণের সুপুরুষ নীলাম্বর
আসলে বীরত্বের প্রতীক।

শিবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্রাজ্যের
অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে শিব মহিমা প্রচার করেন তিনি।
এখন গান্ডোয়ানা ভূমির অধীশ্বর তিনি। অনার্য সমাজের
প্রতিভূ নীলাম্বর।
তিনি অনার্য নৃপতি ধর্মকেতু ব্যাধের পালিত পুত্র। শবর সমাজের
নৃপতি ধর্মকেতু। শবররা দুর্ধর্ষ জাতি। যাযাবর, পশু শিকার করে
দিন কাটে। শবর সমাজে নীলাম্বরের নাম -

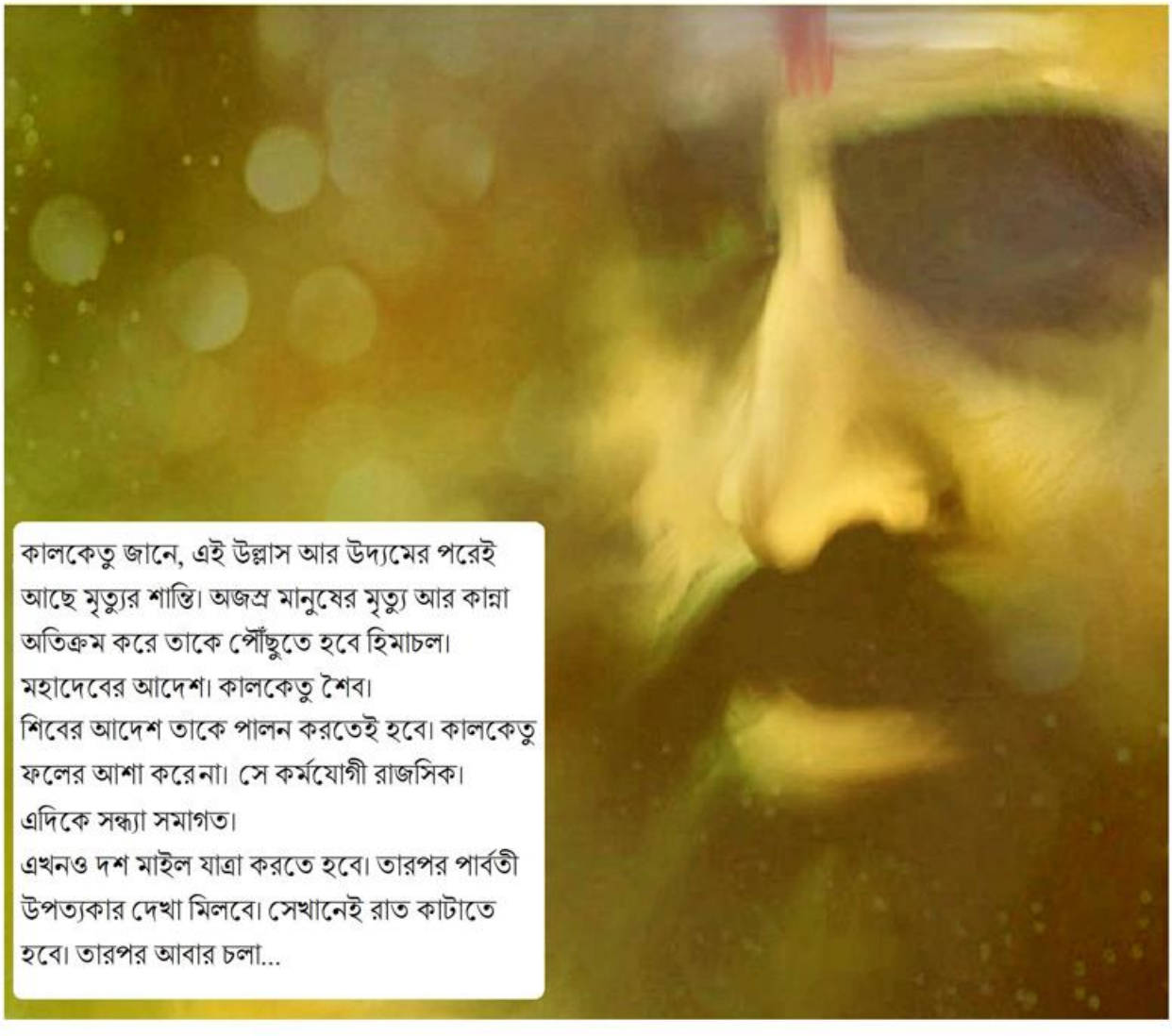
কালকেতু


বার্তা পৌঁছে গেল কালকেতুর কাছে... ।
আবার যুদ্ধ! আবার রক্ত!
মায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা
দুষ্কর। আমি শৈব। নিরুপায়।
অন্যকোন উপায় নেই?


শবর সেনাদের খবর
দিতে হবে। এবার
হিমাচলের দিকে যাত্রা...
প্রচণ্ড শীত সহ্য করা...
শবরদের পক্ষে অসম্ভব।


হিমাচলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কালকেতু।
তবে এই কাহিনি চন্ডীমঙ্গলের রচয়িতারা লিখে
যাননি।

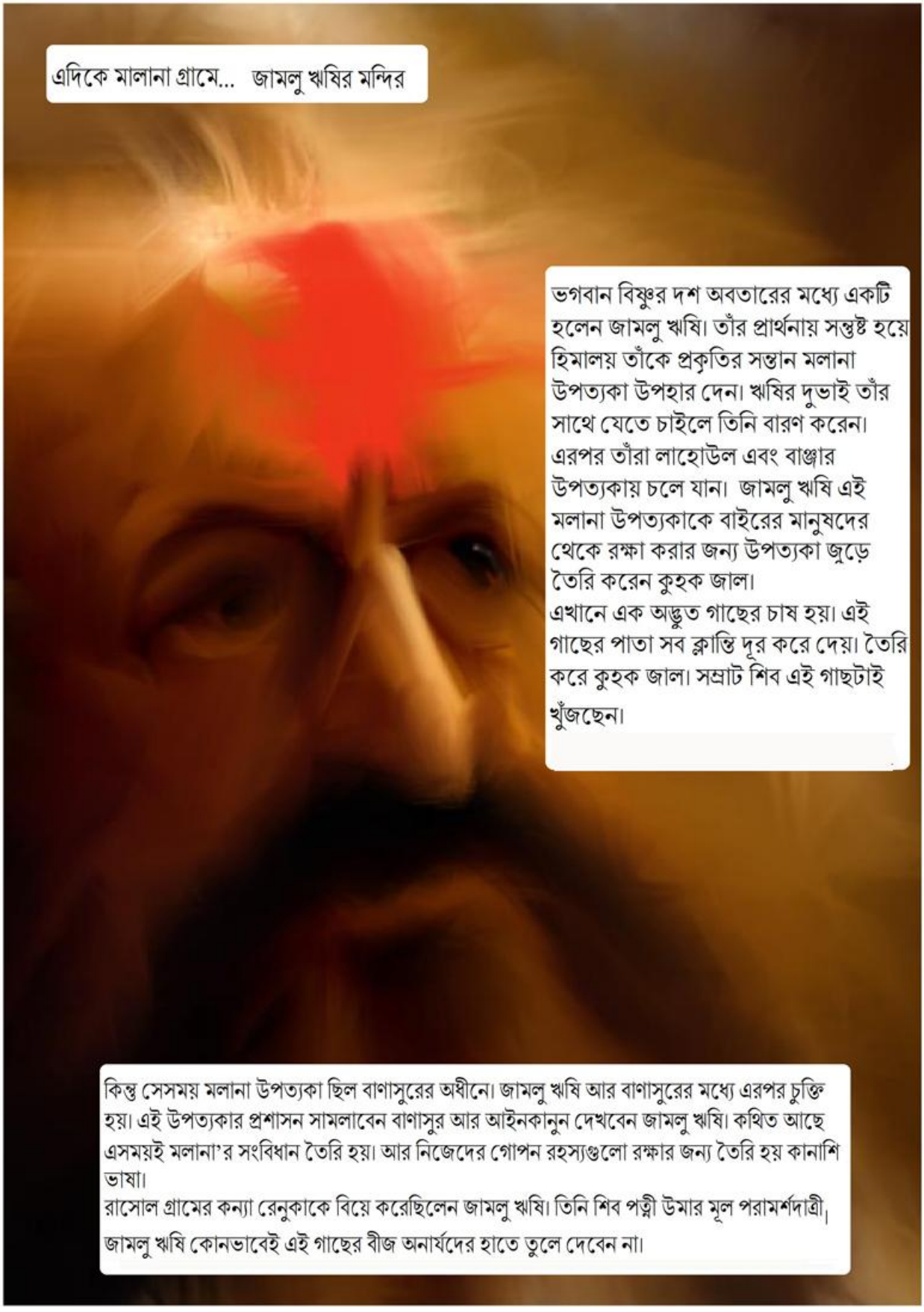

গন্ডোয়ানা অতিক্রম করে মেঘের চাঙড় ধেয়ে এল আর্যাবর্তে। সাথে কালকেতুর সেনা।


কালকেতু জানে, এই উল্লাস আর উদ্যমের পরেই আছে মৃত্যুর শান্তি। অজস্র মানুষের মৃত্যু আর কান্না অতিক্রম করে তাকে পৌঁছুতে হবে হিমাচল।
মহাদেবের আদেশ। কালকেতু শৈব।
শিবের আদেশ তাকে পালন করতেই হবে। কালকেতু ফলের আশা করেনা। সে কর্মযোগী রাজসিক।
এদিকে সন্ধ্যা সমাগত।
এখনও দশ মাইল যাত্রা করতে হবে। তারপর পার্বতী উপত্যকার দেখা মিলবে। সেখানেই রাত কাটাতে হবে। তারপর আবার চলা...

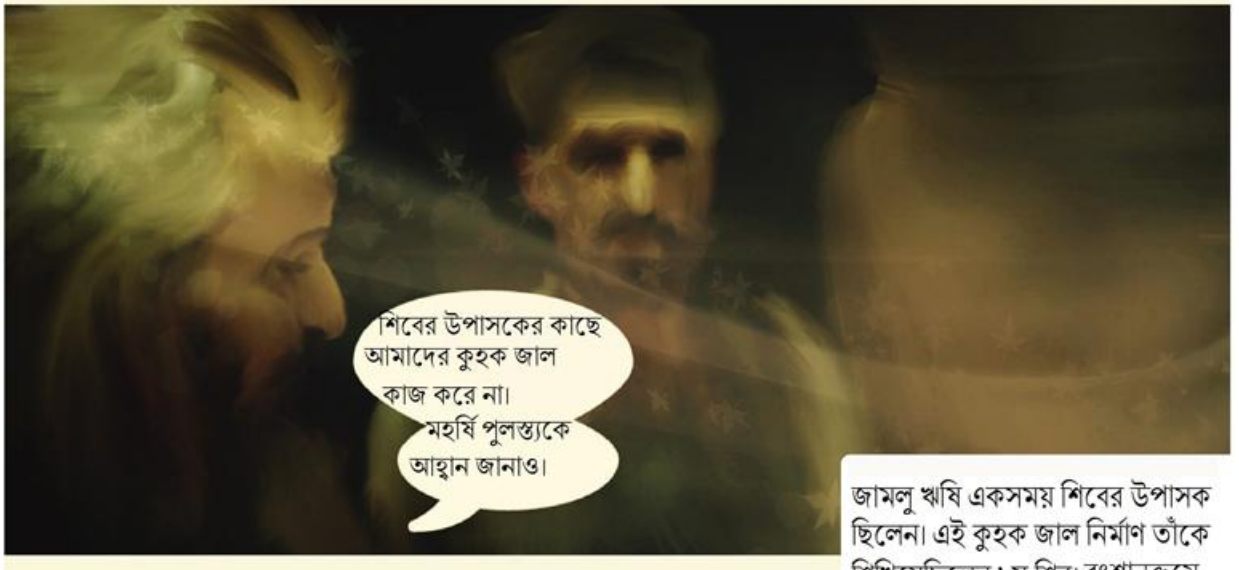
ক্রমে সবিতৃর আলো ম্লান হয়ে আসে। গোধূলির আলো-ছায়া খেলা করছে পার্বতী উপত্যকায়। অশ্বারোহী কালকেতু চারদিক নিরীক্ষণ করতে থাকে।
উপত্যকায় একটু ফাঁকা জায়গা খুঁজতে হবে। এদিকে শীত বাড়ছে।
এসব পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে ঝুপ করে। মহাদেবের নাম নিয়ে এখানেই থেকে যেতে হবে।



রসোল পাস অতিক্রম করে আরও ৩১৮০ যোজন পথ এগিয়ে এসেছে কালকেতু ও তার সেনাবাহিনী। এরপর নাগার হয়ে আরও ৩৬০০ যোজন অতিক্রম করলে পাওয়া যাবে চন্দ্রখনি পাস।
কালকেতু চারদিক দেখে নেয়। অবশেষে রাত কাটানোর জায়গা পাওয়া গেল।
কাছেই কুল্লু উপত্যকা।
এই রাতে নিঝুম দ্বীপের মত জেগে থাকে কালকেতু। ক্লিন্ন অতীতবেত্তা লোকজন বেঁচে থাকে রূপকথার গল্প অবলম্বন করে। কালকেতু রূপকথা তৈরি করে। এই অভিযান সফল হলে নতুন করে ইতিহাস লিখতে হবে।


এদিকে মালানা গ্রামে... জামলু ঋষির মন্দির
ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে একটি হলেন জামলু ঋষি। তাঁর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে হিমালয় তাঁকে প্রকৃতির সন্তান মলানা উপত্যকা উপহার দেন। ঋষির দুভাই তাঁর সাথে যেতে চাইলে তিনি বারণ করেন। এরপর তাঁরা লাহোউল এবং বাঞ্জার উপত্যকায় চলে যান। জামলু ঋষি এই মলানা উপত্যকাকে বাইরের মানুষদের থেকে রক্ষা করার জন্য উপত্যকা জুড়ে তৈরি করেন কুহক জাল।
এখানে এক অদ্ভুত গাছের চাষ হয়। এই গাছের পাতা সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। তৈরি করে কুহক জাল। সম্রাট শিব এই গাছটাই খুঁজছেন।
কিন্তু সেসময় মলানা উপত্যকা ছিল বাণাসুরের অধীনে। জামলু ঋষি আর বাণাসুরের মধ্যে এরপর চুক্তি হয়। এই উপত্যকার প্রশাসন সামলাবেন বাণাসুর আর আইনকানুন দেখবেন জামলু ঋষি। কথিত আছে এসময়ই মলানা'র সংবিধান তৈরি হয়। আর নিজেদের গোপন রহস্যগুলো রক্ষার জন্য তৈরি হয় কানাশি ভাষা।
রাসোল গ্রামের কন্যা রেনুকাকে বিয়ে করেছিলেন জামলু ঋষি। তিনি শিব পত্নী উমার মূল পরামর্শদাত্রী, জামলু ঋষি কোনভাবেই এই গাছের বীজ অনার্যদের হাতে তুলে দেবেন না।



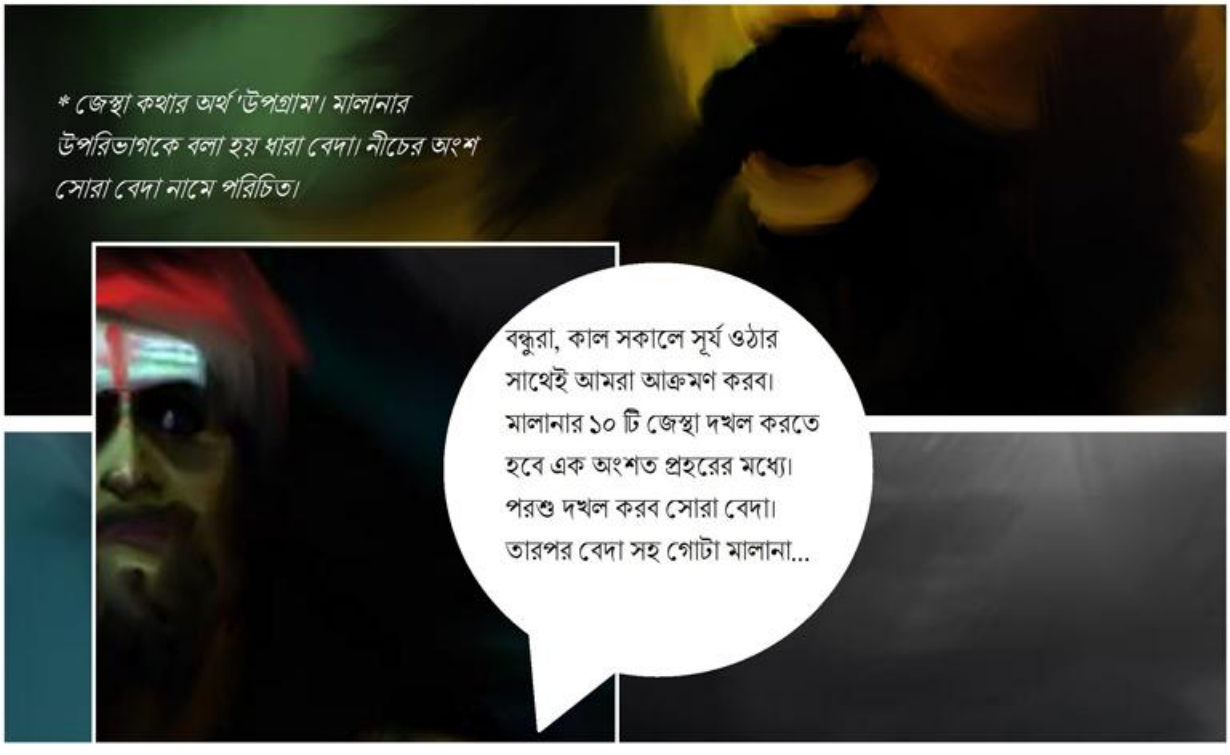


জামলু ঋষি একসময় শিবের উপাসক ছিলেন। এই কুহক জাল নির্মাণ তাঁকে শিখিয়েছিলেন ১ম শিব। বংশানুক্রমে তাই শিব ও শৈব - সকলেই এই কুহক জাল বিনষ্ট করতে জানে। একারণেই ঋষি চিন্তিত। কালকেতুর জায়গায় অন্য কেউ এলে তিনি ভাবিত হতেন না। কেননা, তারা কুহকজালে বিভ্রান্ত হয়ে মালানাকেই খুঁজে পেত না।





মিহি-স্নিগ্ধ নীলচে-সবুজ এই রাত পোহালেই বদলে যাবে মালানার জনজীবনের রূপরেখা। সহস্র বছর ধরে লুকিয়ে রাখা জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যাবে গোটা ভারতবর্ষের জন্য। হিমাচলের বুনো গাছ ছড়িয়ে যাবে গাঙ্গেয় অববাহিকায়। অনার্যদের কাছে পরাজিত হবে আর্য অহমিকা। সহস্র বছরের অপমানের বদলা নেওয়া যাবে। চারদিকে উড়বে অসভ্যদের বিজয়কেতন।




কালকেতুর বাহিনী ছুটছে
অংল জেস্থা দখলের জন্য।
অংল জেস্থায় বয়ে গেল রক্তের বন্যা। অজস্র মানুষের পায়ের ধুলোয় ছেয়ে গেল উপত্যকার আকাশ-বাতাস।
দাউদাউ আগুনে ধ্বংস হতে থাকে একের পর এক জনপদ। সমাজের চোখে অসভ্য-বর্বর যারা, তারা দখল নিল সভ্য সমাজ অধিকৃত গ্রাম-গঞ্জের। এই তান্ডবলীলা চলল সারাদিন ধরে...
প্রিয় সাথী,
মহাদেবের দিব্যি... আজ
প্রলয়নৃত্য দেখবে হিমাচল!
আকাশে বাতাসে অলুক্ষুনে কান্নার রোল...। সভ্যতার গর্বে গর্বিত জনপদ আর তার বুকে বেঁচে থাকা পিপীলিকা সদৃশ মানুষজন এরকম মহাপ্রলয় দেখেনি ইতিপূর্বে। আর্যাবর্তে এ ঘটনা বিরল।
অনার্য সেনা আরও বিপুল উৎসাহে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের তথাকথিত অশিক্ষিত আক্রমণে দিশেহারা হিমাচল। তাদের অগ্রভাগে রয়েছে শবর রাজপুত্র কালকেতু। এলোমেলো বাতাসে তার চুল উড়ছে। সাথে বজ্রনির্ঘোষ, 'হর হর মহাদেব'।

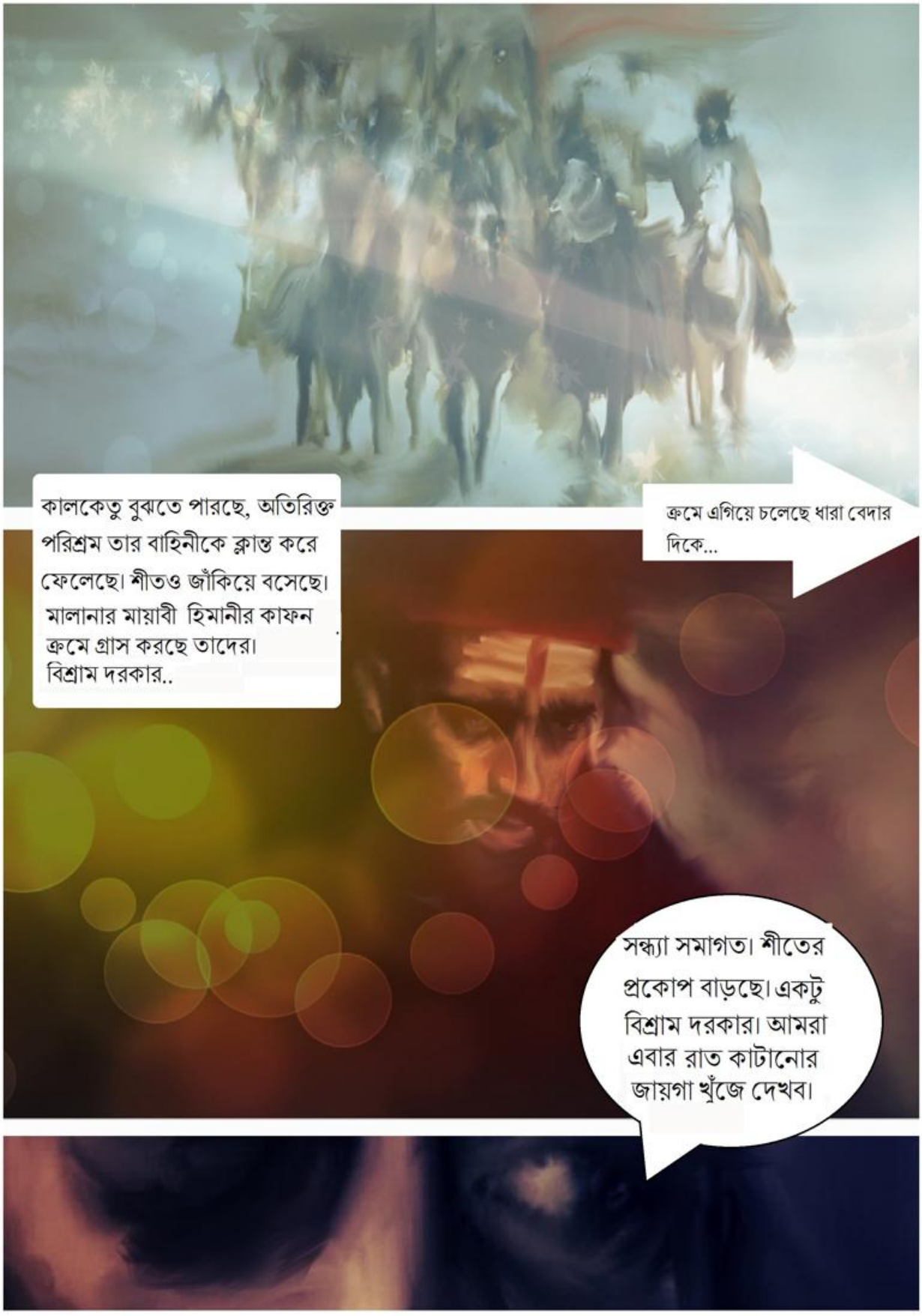

জয়ের আনন্দে কালকেতুর বাহিনী মেতে উঠেছে উৎসবে
সর্দার, মালানায় ব্রাত্য লোহারদের নৃপতি গঞ্জিকা আপনার জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। সন্ধি প্রস্তাব আছে। আপনার দলের হয়ে এই লড়াইতে ওরা অংশগ্রহণ করতে চায়।
তাঁকে বলে দাও সভ্যদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে তাঁকে স্বাগত। আর তাঁর পাঠানো উপহার দেখতে আমি আগ্রহী।
উপহার দেখে কালকেতু আপ্লুত হয়ে যায়। কিন্তু এই লড়াই তাকে চালিয়ে যেতেই হবে। এখন শুধু বুনো গাছ সংগ্রহের লড়াই নয় এটা।
সহস্র বছরের হতাশা আর শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ এটা। তার বাহিনী এখন লাগামছাড়া। যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেও কেউ শুনবে না।
কালকেতু নিজেও এই উপত্যকার দখল নিতে চায়।
লোভে চকচক করে ওঠে ওর চোখ। ক্ষমতার লোভ। শক্তির উন্নাসিকতা...
সাথী, অস্ত্রে শান দাও।
কাল অবশিষ্ট ৫টি জেস্থা দখল করব।
আজ আমরা সবক'টা জেস্থা দখল করতে পারিনি।

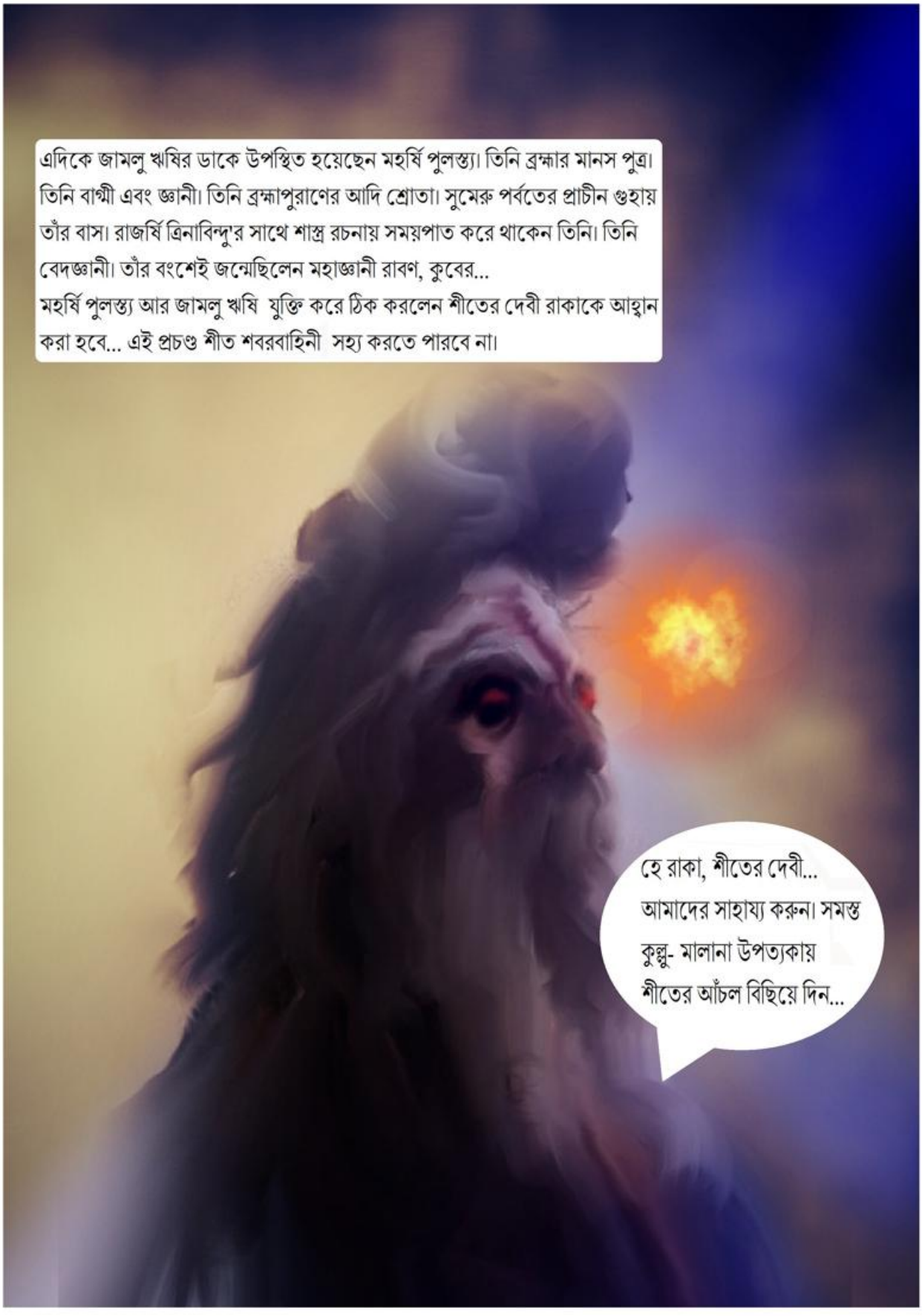
পরদিন সকাল হতে না হতেই কালকেতু ও তাঁর সেনা তান্ডব শুরু করল ...

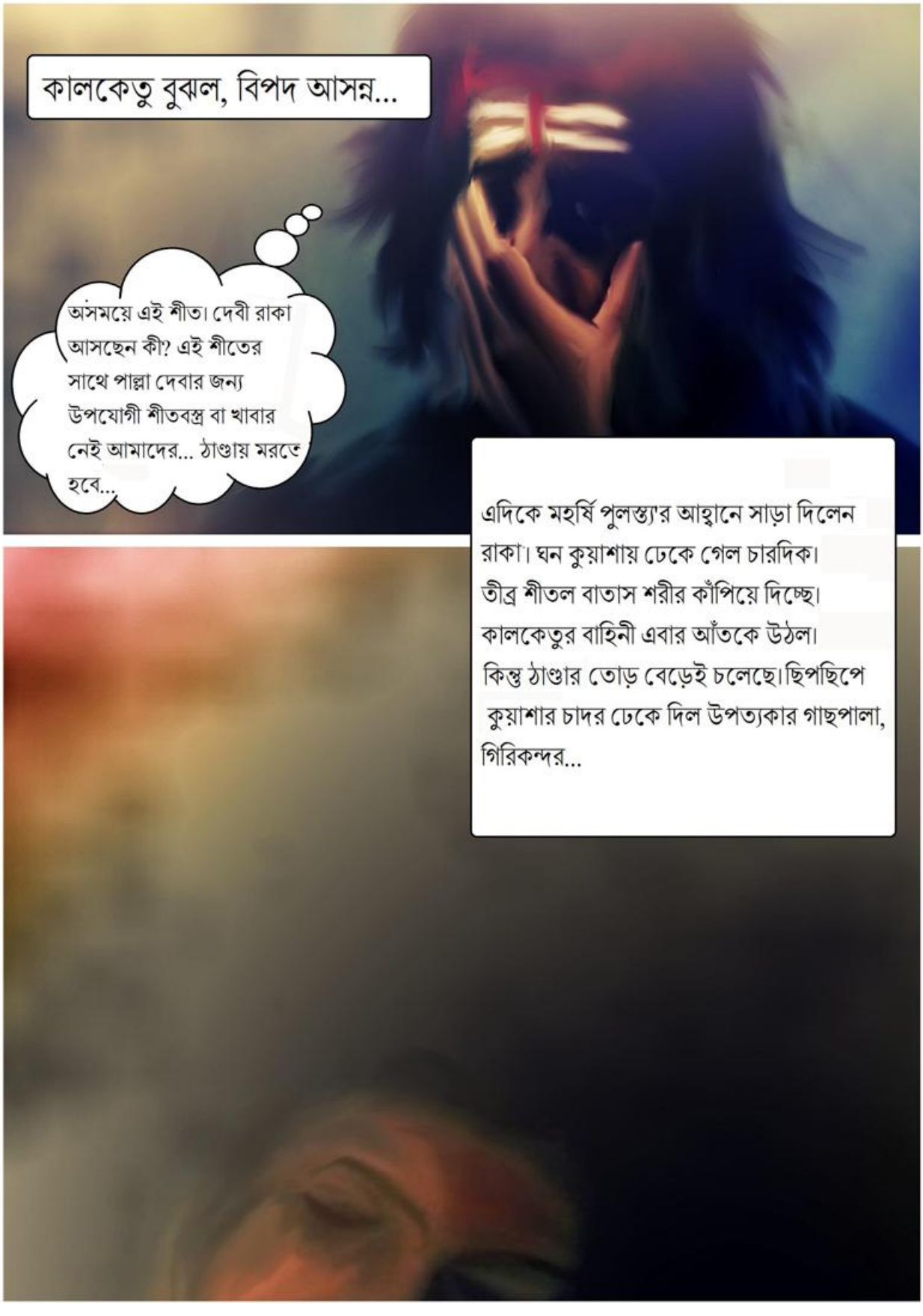
উপত্যকায় বয়ে গেল রক্তের নদী। অবাধে চলল লুণ্ঠন। মানুষের কান্নায় ভিজে গেল হিমাচলের মাটি। পাহাড়ে পাহাড়ে কালকেতুর বিজয়বার্তা রটে গেল।

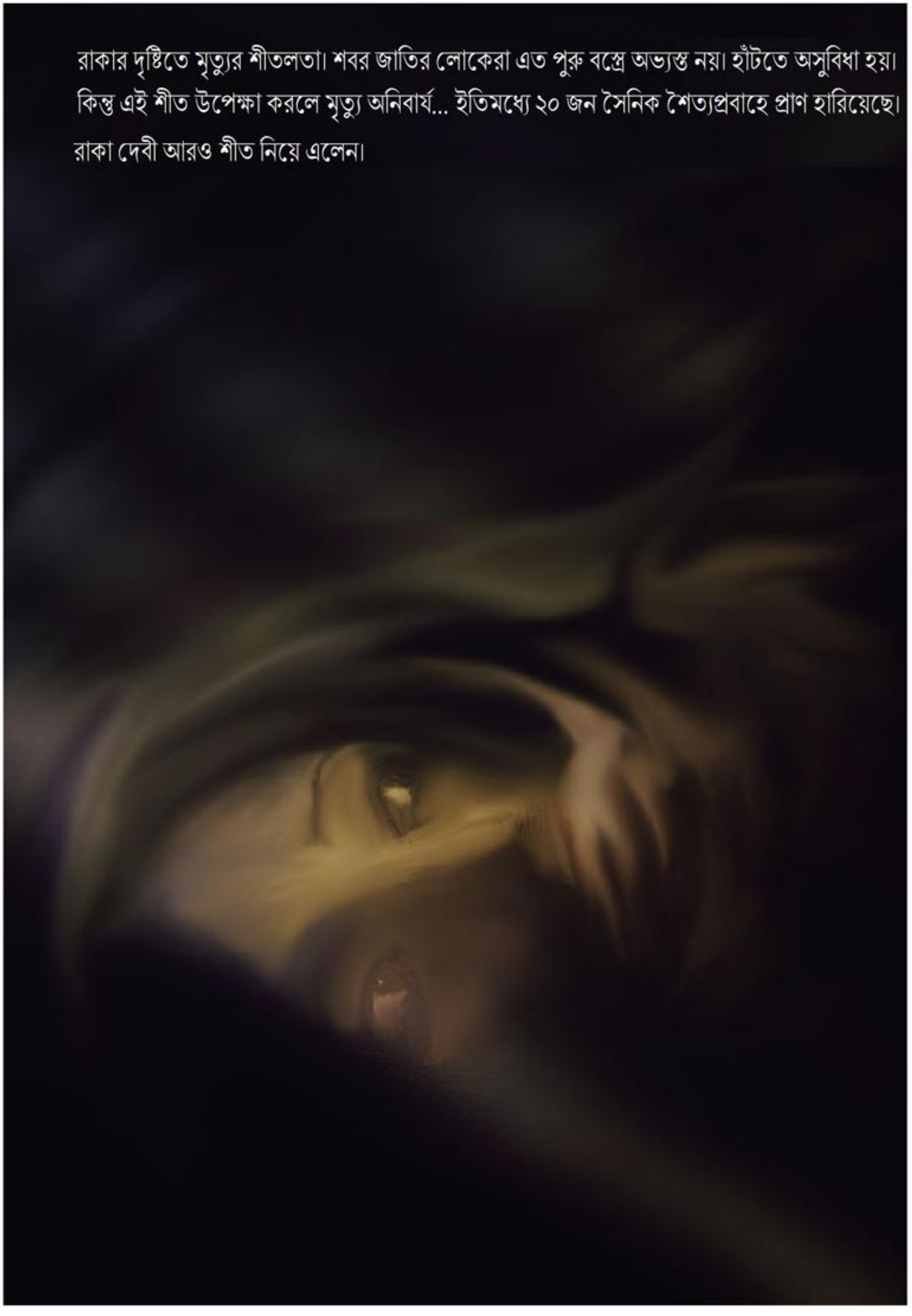


একে একে দখল করল রালু জেস্থা, পিথালু জেস্থা, সেন্নপ জেস্থা, কৈবর্ত জেস্থা, জুমাকিল জেস্থা... অরণ্য নদী পাহাড় কেঁপে উঠছে সভ্যতার আদিম সন্তানদের বিজয় বার্তায়।
কালকেতু আরও এগিয়ে চলেছে..এবার লক্ষ্য ধারা বেদা আর সোরা বেদা।


কালকেতু বুঝতে পারছে, অতিরিক্ত পরিশ্রম তার বাহিনীকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। শীতও জাঁকিয়ে বসেছে। মালানার মায়াবী হিমানীর কাফন ক্রমে গ্রাস করছে তাদের। বিশ্রাম দরকার..
ক্রমে এগিয়ে চলেছে ধারা বেদার দিকে...
সন্ধ্যা সমাগত। শীতের প্রকোপ বাড়ছে। একটু বিশ্রাম দরকার। আমরা এবার রাত কাটানোর জায়গা খুঁজে দেখব।


এদিকে জামলু ঋষির ডাকে উপস্থিত হয়েছেন মহর্ষি পুলস্ত্য। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। তিনি বাগ্মী এবং জ্ঞানী। তিনি ব্রহ্মাপুরাণের আদি শ্রোতা। সুমেরু পর্বতের প্রাচীন গুহায় তাঁর বাস। রাজর্ষি ত্রিনাবিন্দু'র সাথে শাস্ত্র রচনায় সময়পাত করে থাকেন তিনি। তিনি বেদজ্ঞানী। তাঁর বংশেই জন্মেছিলেন মহাজ্ঞানী রাবণ, কুবের...
মহর্ষি পুলস্ত্য আর জামলু ঋষি যুক্তি করে ঠিক করলেন শীতের দেবী রাকাকে আহ্বান করা হবে... এই প্রচণ্ড শীত শবরবাহিনী সহ্য করতে পারবে না।
হে রাকা, শীতের দেবী... আমাদের সাহায্য করুন। সমস্ত কুল্লু- মালানা উপত্যকায় শীতের আঁচল বিছিয়ে দিন...

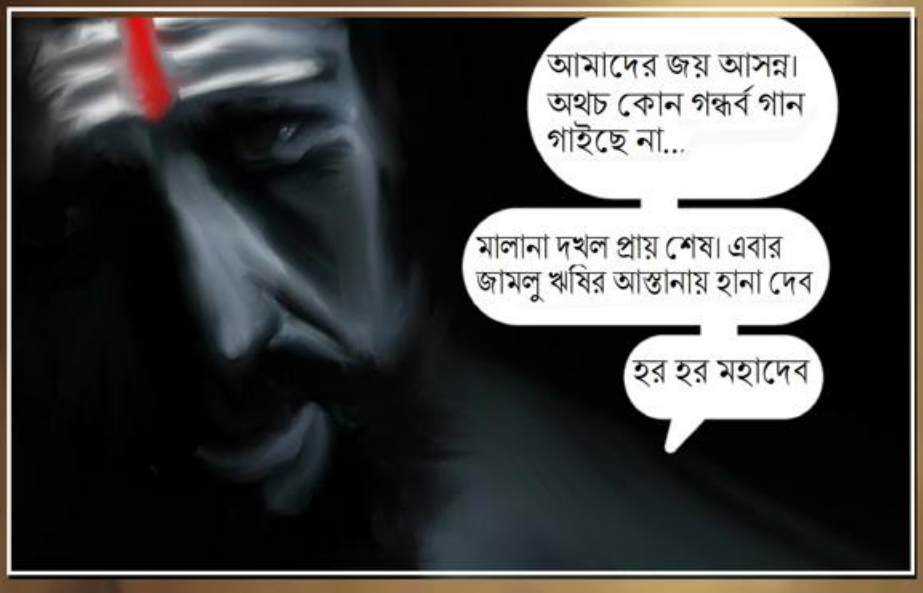

কালকেতু বুঝল, বিপদ আসন্ন...
অসময়ে এই শীত। দেবী রাকা আসছেন কী? এই শীতের সাথে পাল্লা দেবার জন্য উপযোগী শীতবস্ত্র বা খাবার নেই আমাদের... ঠাণ্ডায় মরতে হবে...
এদিকে মহর্ষি পুলস্ত্য'র আহ্বানে সাড়া দিলেন রাকা। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল চারদিক।
তীব্র শীতল বাতাস শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে।
কালকেতুর বাহিনী এবার আঁতকে উঠল।
কিন্তু ঠাণ্ডার তোড় বেড়েই চলেছে।ছিপছিপে কুয়াশার চাদর ঢেকে দিল উপত্যকার গাছপালা, গিরিকন্দর...


রাকার দৃষ্টিতে মৃত্যুর শীতলতা। শবর জাতির লোকেরা এত পুরু বস্ত্রে অভ্যস্ত নয়। হাঁটতে অসুবিধা হয়।
কিন্তু এই শীত উপেক্ষা করলে মৃত্যু অনিবার্য... ইতিমধ্যে ২০ জন সৈনিক শৈত্যপ্রবাহে প্রাণ হারিয়েছে।
রাকা দেবী আরও শীত নিয়ে এলেন।

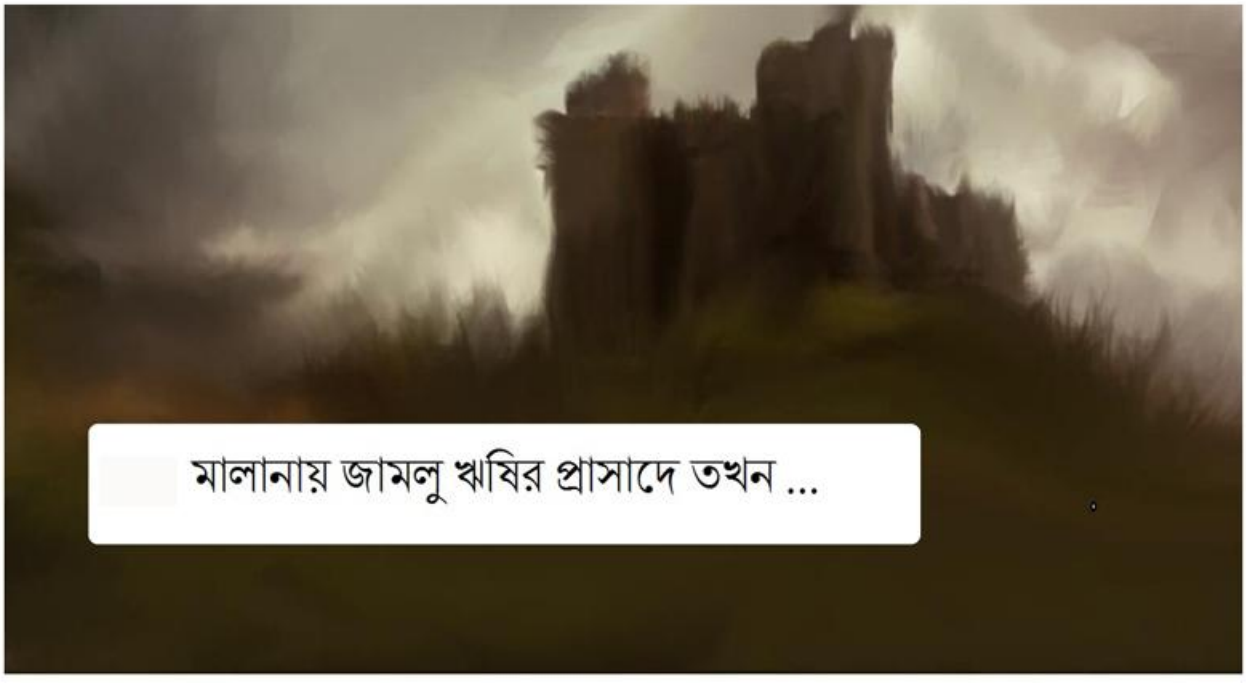

অনেক কষ্টে একটা ভাঙা শিব মন্দির খুঁজে পাওয়া গেল। কালকেতুর সেনা ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে। উপযুক্ত শীতবস্ত্র ও খাবারের অভাবে ভুগছে সবাই।
কালকেতু শীতের কথা ভেবেছিল। কিন্তু এতটা আশা করেনি। কালকেতু ভেবে পাচ্ছেনা, মহর্ষি পুলস্ত্য কেন এরকম করলেন? রাকাকে তিনি ডাকলেন কেন? জামলুর চালাকি?
হে পিতৃদেব, পুরন্দর ইন্দ্র... আপনার সাহায্য চাই। আপনি ছাড়া এসময় আমাদের সাহায্য করার লোক নেই... সাহায্য করুন।


কী কারণে এই অসময়ে আহ্বান করলে পুত্র? আমি তোমায় কী সাহায্য করতে পারি?
পুত্রের ডাকে সাড়া দিলেন ইন্দ্র। তিনি জানেন ভুল করছে নীলাম্বর।
এই প্রবল শীত থেকে বাঁচার জন্য শীতবস্ত্র, গরম মাংস আর সোমরস দরকার।
সে না হয় দিলাম। কিন্তু এত রক্তপাত কেন? তুমি অভীষ্ট থেকে বিচ্যুত হয়েছ। মহাদেব রুষ্ট হচ্ছেন। যতটুকু কাজ দেওয়া হয়েছে, সেটুকু হয়ে গেলে রক্তপাত বন্ধ করে দাও।
ইন্দ্র আর কথা না বাড়িয়ে বললেন, 'তথাস্তু'।
একথা আপনি বলছেন পুরন্দর? অনার্য বাহিনীর এই উত্থানে আপনি আতংকিত?


ইন্দ্রনাদ পর্বতের বিখ্যাত ভালুকের চর্ম নির্মিত বস্ত্র আর পিতৃদত্ত অস্ত্র নিয়ে কালকেতু দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজ সকালে মালানার দিকে রওনা দেবে তারা। মায়াবী কুহক, শীত - কোন কিছুই তাদের পথ রোধ করতে পারেনি।
তারা চিরকালের হতভাগ্য। নিয়তির সাথে এই লড়াই তাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তবে এই মৃতের স্তূপ দেখে দেখে মন কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।
এই মৃত্যু, রক্ত প্রভৃতি সত্য, তবু শেষ সত্য নয়। আসলে সত্য বলে আমরা যা কিছু জানি, প্রকৃত প্রস্তাবে তা শুধু শক্তিমানের তৈরি করা ভাষ্য। আজ আমরা যখন সত্য নির্মাণ করছি, তখন সবাই এত ... ?????


আমাদের জয় আসন্ন। অথচ কোন গন্ধর্ব গান গাইছে না...
মালানা দখল প্রায় শেষ। এবার জামলু ঋষির আস্তানায় হানা দেব
হর হর মহাদেব


কোথায় লুকিয়ে আছেন জামলু ঋষি... আপনার কুহক জাল আর কাজ করবে না... দিনের আলোয় দেখুন আপনার উপত্যকা আজ ধ্বংস ... আমি পুরন্দর পুত্র

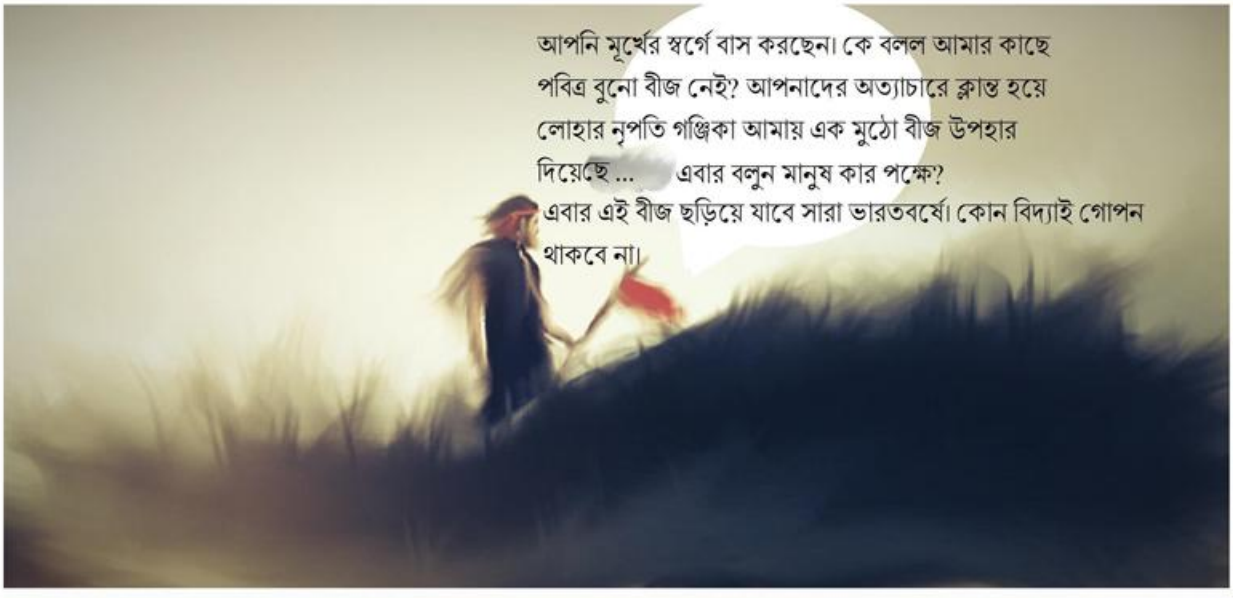

মালানায় জামলু ঋষির প্রাসাদে তখন ...

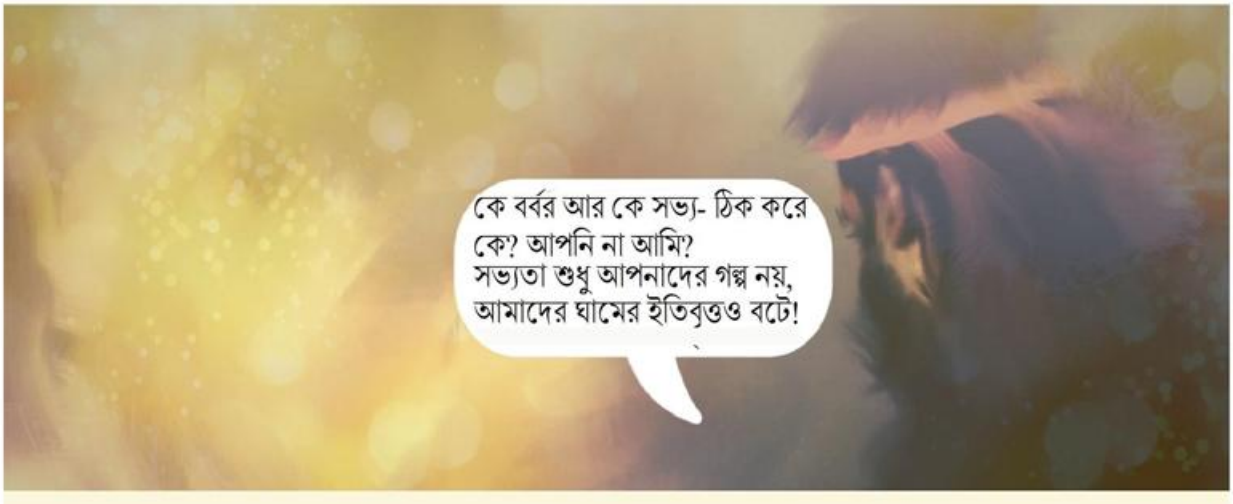

বন্য গাছের সমস্ত ক্ষেত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি গাছও জীবিত নেই। আর ওই গাছের সমস্ত বীজ এখানেই জ্বালিয়ে দাও...
এত মানুষের জীবন নিয়েও একটি বীজ বা দানা তুমি পাবে না কালকেতু... জঙ্গল দস্যু!

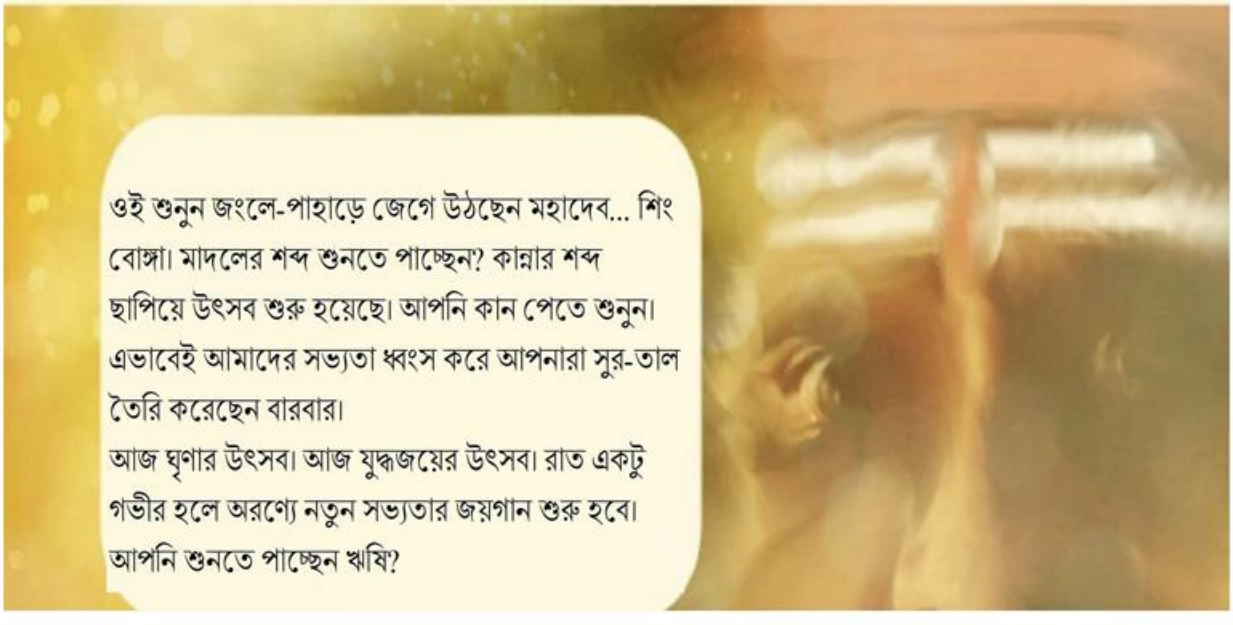


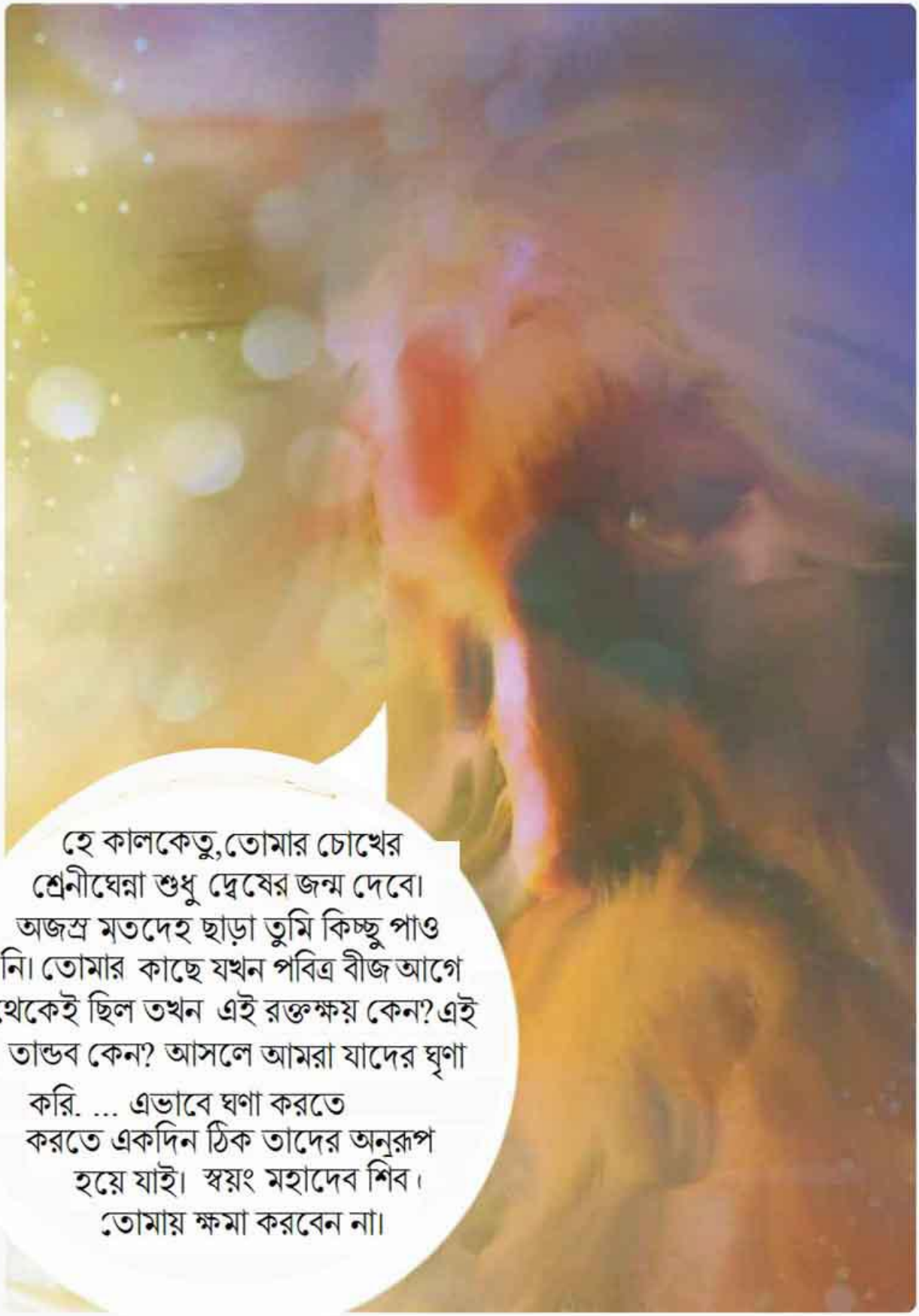

তখনই কালকেতুর প্রবেশ...
হে আর্য, জঙ্গল দস্যু হওয়াটা আমার কাছে লজ্জার নয়। এই পৃথিবীর আদি-অনন্ত ওই জঙ্গলের ওপরেই নির্ভরশীল...
কালকেতুর চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল বুনো গাছের বীজ। আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে গেল সব বীজ...

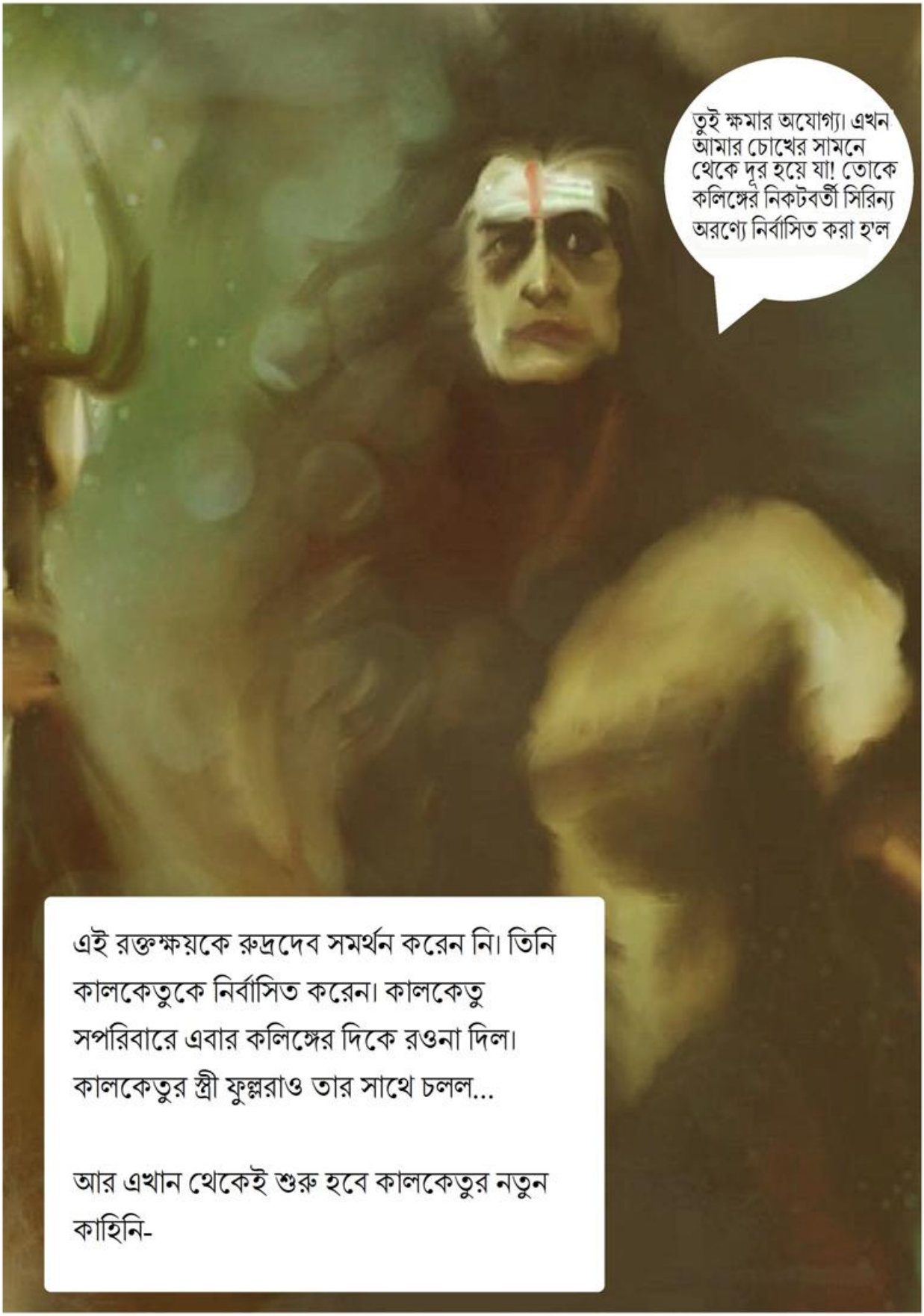

হে শবর কুমার, তুমি পিশাচ। এই নরমেধ করে তুমি ভাবছ, ইতিহাস তোমায় নায়কের মর্যাদা দেবে... তা তুমি পাবে না। যে বীজের জন্য তুমি এই সনাতন সভ্যতা ধ্বংস করলে, তা তুমি পেলে কোথায়?
ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে আসছে এই কাহিনির শেষ অধ্যায় ...
এত ধ্বংস, হত্যা কেন? এই বীজ আমাদের উত্তরাধিকার। আমরা একে অন্যের হাতে তুলে দেব কেন? তুমি বীর নও। হিংস্র জানোয়ার কোথাকার!
অনার্যের কাছে এই পরাজয় ... তুমি সহ্য করতে পারছ না...
অব্রহ্মন্যা নৃপব্যাজ্যাঃ শূদ্রা ভোক্ষন্তি মামিতি। এই দুনিয়া একদিন আমাদের হবে।
আর আক্রমণ? নরমেধ? অনার্যদের সভ্যতা ধ্বংস
করল কারা?


আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কে বলল আমার কাছে পবিত্র বুনো বীজ নেই? আপনাদের অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে লোহার নৃপতি গঞ্জিকা আমায় এক মুঠো বীজ উপহার দিয়েছে ... এবার বলুন মানুষ কার পক্ষে?
এবার এই বীজ ছড়িয়ে যাবে সারা ভারতবর্ষে। কোন বিদ্যাই গোপন থাকবে না।


কে বর্বর আর কে সভ্য- ঠিক করে কে? আপনি না আমি?
সভ্যতা শুধু আপনাদের গল্প নয়, আমাদের ঘামের ইতিবৃত্তও বটে!


ওই শুনুন জংলে-পাহাড়ে জেগে উঠছেন মহাদেব... শিং বোঙ্গা। মাদলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? কান্নার শব্দ ছাপিয়ে উৎসব শুরু হয়েছে। আপনি কান পেতে শুনুন। এভাবেই আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করে আপনারা সুর-তাল তৈরি করেছেন বারবার।
আজ ঘৃণার উৎসব। আজ যুদ্ধজয়ের উৎসব। রাত একটু গভীর হলে অরণ্যে নতুন সভ্যতার জয়গান শুরু হবে।
আপনি শুনতে পাচ্ছেন ঋষি?


হে কালকেতু,তোমার চোখের শ্রেনীঘেন্না শুধু দ্বেষের জন্ম দেবে। অজস্র মতদেহ ছাড়া তুমি কিচ্ছু পাও নি। তোমার কাছে যখন পবিত্র বীজ আগে থেকেই ছিল তখন এই রক্তক্ষয় কেন? এই তান্ডব কেন? আসলে আমরা যাদের ঘৃণা করি. ... এভাবে ঘণা করতে করতে একদিন ঠিক তাদের অনুরূপ হয়ে যাই। স্বয়ং মহাদেব শিব। তোমায় ক্ষমা করবেন না।



এই রক্তক্ষয়কে রুদ্রদেব সমর্থন করেন নি। তিনি কালকেতুকে নির্বাসিত করেন। কালকেতু সপরিবারে এবার কলিঙ্গের দিকে রওনা দিল। কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরাও তার সাথে চলল...

আর এখান থেকেই শুরু হবে কালকেতুর নতুন কাহিনি-

চণ্ডীমঙ্গলের গল্প



কালকেতু



কালবেত

ব লা বা হু ল্য

এই আখ্যানের সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক। এঁদের কেউ কোন পৌরাণিক অথবা বিশেষ ধর্মের চরিত্র নন।